কবিতা সমগ্র

সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাসমগ্র ১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রকাশিত হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কবিতাসমগ্র'র প্রথম খণ্ড, যার মধ্যে গ্রথিত হয়েছে তাঁর ছ'টি কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন', 'আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি', 'বন্দী, জেগে আছো', 'আমার স্বপ্ন', 'সত্যবদ্ধ অভিমান' ও 'জাগরণ হেমবর্ণ' । বাংলা কবিতার যাঁরা প্রেমিক পাঠক, তাঁদের কাছে এ এক মস্ত খবর সন্দেহ নেই । কেননা, বাংলা কথাসাহিত্যের সেরা একজন লেখক যিনি, সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে বাংলা কবিতারও এক অতিশক্তিমান স্রষ্টা, তা কে না জানে ।

এই কথাটাও সবাই জানে যে, পঞ্চাশের দশকে 'কৃত্তিবাস' নামক যে আন্দোলন একদিন বাংলা কবিতার মোড় একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সুনীলই ছিলেন তার নেতৃস্থানীয় কবি । পাঠক, সমালোচক—সবাই সেদিন অবাক মেনেছিলেন । সবাই লক্ষ করেছিলেন যে, এই কবি কোনও পুরনো কথা শোনাচ্ছেন না ; তিনি যা কিছু লিখছেন, তারই ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক ঝলক টাটকা বাতাস, আর সেই বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে এমন এক সৌরভ, যা তার আগে পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ।

কথাসাহিত্য ও কবিতার দাবি একই সঙ্গে মেটানোর কাজটা বড় শক্ত । এ কাজ সবাই পারে না । সুনীল যে পেরেছেন, তার কারণ বোঝা কঠিন নয় । যৎপরোনাস্তি সফল একজন কথাসাহিত্যিক হয়েও এই সরল সত্য তিনি কখনও বিস্মৃত হননি যে, মূলত তিনি কবিই, এবং—গদ্য নয়—কবিতাই তাঁর প্রথম প্রেম । সেই প্রেমের দাবি আজও তিনি সমানে মিটিয়ে যাচ্ছেন, এবং অসামান্য সব উপন্যাস ও গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে লিখে যাচ্ছেন এমন অনেক কবিতা, পাঠকের আগ্রহকে যা নিমেষে অধিকার করে নেয় ।

তাঁর 'কবিতাসমগ্র'র এই প্রথম খণ্ডেও রয়েছে এমন বহু কবিতা, যার নানা পঙ্‌ক্তি একদিন পাঠকদের মুখে-মুখে ফিরত । এমন কবিতা, দু'দিন বাদেই যা বাসী হয়ে যায় না, যা চিরকালই নতুন থেকে যায় ।

ISBN 81-7215-017-2

ক বি তা স ম গ্র
১

কবিতাসমগ্র

১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
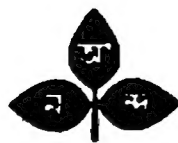
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

ভূমিকা

বেশ কিছুদিন আগে আমার কবিতার বইগুলি কাব্যসংগ্রহ নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং দুটি খণ্ড প্রকাশের পর থেমে যায়। এখন সেগুলিই আবার নতুন ভাবে সামঞ্জস্য করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম যে খণ্ডটি কবিতাসমগ্র নামে প্রকাশিত হচ্ছে, তার অন্তর্ভুক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'সত্যবদ্ধ অভিমান' নামে বইটির আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'যুগলবন্দী' নামে যে-সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি অংশের নাম ছিল 'সত্যবদ্ধ অভিমান'। পরে ঐ সংকলনের কিছু কিছু কবিতা অন্য কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়েছে, সেগুলি বাদ দিয়ে অন্য কবিতাগুলি এখানে স্থান পেয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্র ন্থ সূ চি

একা এবং কয়েকজন

সূচিপত্র

প্রার্থনা

ঋজু শাল অশ্বত্থের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা
সব তুমি সয়েছো, বসুধা।
স্তব্ধ নীল আকাশের দৃশ্য অন্তহীন পটভূমি
চক্ষুর সীমানা প্রান্তে বেঁধে দিয়ে তুমি
এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টি-মগ্ন নদী—তার দূরাভাস তীর
আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর।

আমার জন্মের ভোর সূর্য-শরে আহত মাটিতে
প্রত্যহকে ধরে থাকা অবাধ্য মুঠিতে।
নিবিড় ঘুমের মৌন জীবনের অস্পষ্ট আভাসে
নিস্পন্দ অন্ধকারে মিশে যায়,—বর্ণ ভেসে আসে,
লাগে স্পর্শ-উষ্ণ হাওয়া, দেখি চক্ষু ভ'রে
সূর্যমুখীর মতো মেলে আছো সেই এক অপরূপ ভোরে।

আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।
অথচ সময়াহত আপাত বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে
বর্তমান-ভীত চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।

দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি স্তব্ধ করে কালচিহ্ন ভবিষ্য অপার
হৃৎস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝংকার।
নির্মম মুহূর্ত ছুঁয়ে বাঁচার বঞ্চনা স'য়ে স'য়ে
আমাকে স্বাক্ষর দাও নবীন যৌবন, সমারোহে।

ঝর্ণা-কে

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,
আহা, ভুলে গেলাম কি যেন তার গান!

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা।
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্ণা, জানো, তারই নাম তো বাঁচা।

সপত্নী

তুমি কবিতার শত্রু—কবিতার মদির সৌরভ
মুহূর্তেই মুছে যায়—তুমি এলে আমার এ ঘরে
থাকে শুধু যৌবনের যন্ত্রণার তীব্র অনুভব
বৃষ্টির মতন ঝরে অন্ধকার—সমস্ত অন্তরে।
আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করে নাও তুমি এসে
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপন পৃথিবীতে
নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে সাধ হয় ভালোবেসে
কবিতার শেষ শিখা মুছে যায় কখন নিভৃতে।

তুমি চলে গেলে দূরে সূর্যমুখী উষার মতন
ফিরে আসে অন্য সখী, কবিতা, আমার এই ঘরে
শূন্যের আশ্রয় থেকে তুলে নেয় মায়াবী সংসার ভীরু মন
সে আমার যন্ত্রণাকে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে।
কাব্যের সপত্নী তুমি, তুমি তাকে চাও না অন্তরে
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে।

বিবৃতি

উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্‌তিরিশে এসে
গর্ভবতী হল, তার মোমের আলোর মতো দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্তে অবশেষে
যন্ত্রণার বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক।

দিবসার্ধ পায়ে হেঁটে ফিরি আমি জীবিকার দাসত্ব-ভিখারী
ক্লান্তি লাগে সারারাত, ক্লান্তি যেন অন্ধকার নারী ।
একদা অসহ্য হলে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা
যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে আলোর স্বরূপে
মাংসের শরীর তার শুভক্ষণে সব ক্লান্তিহরা
মণ্ডূকের মতো আমি মগ্ন হই সে কন্দর্প-কূপে

তার সব ব্যর্থ হল, দীর্ঘশ্বাসে ভরালো পৃথিবী
যদিও নিয়ম নিষ্ঠা, স্বামী নামে স্বল্প চেনা লোকটির ছবি
শিয়রেতে ত্রুটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খ স্তনে
পূজার বন্দনা বাজে আদিগন্ত রাত্রির নির্জনে ।

সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর
আমার নির্মম হাতে সঁপেছে বুকের উপকূল,
তারপর শান্ত হলে সুখে দুঃখে কামনার ঝড়
গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশ-ফুল ।

বাঁচাতে পারবে না তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু
হবিষ্যান্ন পুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হল মরণসম্ভবা
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা
দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি বা ভজনা করে যীশু ।

মিনতি

ঝড় দিস্‌নে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে

থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরু দীপের শিখা
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে,
একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা ।

দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা
ব্যথার দাগ যদিও আঁকে প্রেমিক কাপুরুষ -
সওদাগর ভৃত্য এক বাঁচার ভয়ে মরা ।

ঝড় দিস্‌নে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে

আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে
ঝিকমিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীরু দীপের শিখা
প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুঁয়ে।

দুপুর

রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা
এ যেন আলোরই শস্য, দুপুরের অস্থির কুহক
অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু' চক্ষুর সীমা
পথ চলতে থমকে গেলো অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক।

ভিজে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস
কি যেন দেখলো চেয়ে আকাশের দিকে চোখ চেয়ে
কয়েকটি যুবক মিলে একসঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস।

একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত রুক্ষ দেহে
সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো
সম্বল সামান্য মুদ্রা করতলে গুনে গুনে দেখলো সস্নেহে
এ মাসেই চাকরি হবে, হেসে উঠলো, চোখে পড়লো
অলিন্দের আলো।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মতো চেয়ে বললো মনে মনে
কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে
রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে
এ যেন নদীর মতো, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার
রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার।

তামসিক

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও গভীরে যাও বুকের হলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভ'রে, তবু ফেরাও মুখ
গভীরে যাও গভীরে যাও দু' হাতে ধরো আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

মৌমাছির চাক ভেঙেছি, আমার চোখে মুখে
উড়ে বসলো কয়েক হাজার, সমস্ত বিষ বুকে
জমছে এসে, জ্বলে উঠলো অসীম মরুভূমি
হা-হা শব্দে বালি পুড়ছে, যদি পারতে তুমি
ছড়িয়ে দিতে বুকের বিষ আশিরপদনখে
আমি যেতাম সমুদ্রতীর, ঝলসে উঠতো চোখে
তীব্র নীল বাঁচার স্বাদ,—অন্ধকার জলে
আমি হয়তো ডুবে যেতাম আলোর কৌতূহলে।

এ কি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল
আলো চাইনি, হাওয়া চাইনি, বুকের হলাহল
নিচে টানছে অন্ধকারে, চোখ ঢাকছে আঁধার
হয়তো শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

এক ঘুমের পর

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে

নীলকান্ত অন্ধকারে নিশ্বাসের সঙ্গী এই ঘরে
হাত দিয়ে স্পর্শ করি তুষারের স্তূপ এক নারী
অকূল কুন্তল পাশ—মেলে দিয়ে ক্লান্তির সাগরে
তুমিও আকাশ বুঝি, অন্ধকার, বর্ষণ-সঞ্চারী ?

মধ্যরাত্রে মাতালের মতো ঘোরে দুরন্ত বাতাস
স্খলিত গানের মতো ঠিকরে ওঠে ক্লান্তপাখির ডাক
শিয়রের পাশে যেন জেগে বসে আছে সর্বনাশ
অনুগত মার্জারের মতো নীল চোখ স্তব্ধ-বাক ।

তোমার শরীরে ঘুম তুষারের স্তূপের মতন
গলে যাওয়া মূর্তিমতী জীবনের শান্তির নির্ঝরে
বুক থেকে একটি শুভ্র সূর্যমুখী করো সমর্পণ
আমাকে বাঁচাও তুমি হত্যাকারী অন্ধকার ঘরে ।

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে।

চতুরের ভূমিকা

কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা
ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা ।

যদিও প্রত্যহ আসে অগণিত সুঠাম যুবক
নানা উপহার আনে সময়-সাগর থেকে তুলে
আমি তো আনিনি কিছু চম্পা কিংবা কুর্চি কুরুবক
সাজাতে চেয়েছি শুধু স্পর্শহীন উপমার ফুলে ।

আকাশে অনেক সজ্জা, তবু স্থির আকাশের নীল
সামান্য এ সত্যটুকু শোনাতে চেয়েছি আপনাকে
শব্দ আর অলঙ্কারে খুঁজে খুঁজে জীবনের মিল
দেখেছি সমস্ত সাধ অন্য এক বুকে সুপ্ত থাকে ।
আশা করি এতক্ষণে এঁকেছি আমার পটভূমি ।
যদি অনুমতি হয় আজ থেকে শুরু হোক, তুমি ।

সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন

এত ছোট হাতে কি করে ধরেছ বিশ্ব
কি করে নিজেকে সাজালে আকাশী নীলে ?
অথচ আমি যে কত দীন কত নিঃস্ব
শুধু লুকোচুরি খেলেছি কথার মিলে।

তোমার স্বপ্ন, সুখের অমরাবতী
আমার হৃদয়ে অতল অন্ধ পাতাল,
তবুও দুজনে মিল হলো সম্প্রতি—

ফর্সা দেয়ালে শিকারী-কীটের জাল।

মঞ্চ

নিত্যকার বাঁধা মঞ্চে ঘুরছে ফিরছে অসংবদ্ধ যুবা
তীক্ষ্ণ দীপ্ত তরবারি কোষে ঝুলবে কখনো খুলবে না
সর্বাঙ্গে পরের সাজ, শিরস্ত্রাণ ঝলসায়, নতুবা
সামান্যই টুকরো প্রাণী মঞ্চের বাইরে খুব চেনা।

রানী নামে ডাকছে যাকে, সত্যকার রানী নয় জানে
সে জানাও অর্ধসত্য,চোখের পাতার ঠিক নিচে
দুলছে তীব্র নীলচে আলো, দু' একটি নারীই শুধু সঙ্গে করে আনে
জন্মে জন্মে সে রহস্য, হেসে উঠছে যেন সব মিছে—
এই আলো, এই মঞ্চ, শুধু তার হাতের আঙুলে
ধরেছে হীরের ছুরি যুবকের বুকের সামনে তুলে।

সাজঘরে সাজ খুলছে, যুবকটি দেখছে লোভী চোখে
কতটুকু দেখতে পাবে, সামান্য যা ঝলসাবে আলোকে।
মুখল রানীর বেশ খসে পড়লো, বাঁ দিকের স্তনে কালো দাগ
যুবকেরই কীর্তি চিহ্ন—এ ছাড়াও বহু রাত্রি, বহু অনুরাগ

চিবুকে কাজল তিলে, জঙ্ঘায় মসৃণ কটিদেশে
নির্লিপ্ত নদীর মতো ছেয়ে আছে নিষ্ঠুর আশ্লেষে।

যুবক বুজলো চক্ষু, চামেলি, একবার তুমি আমার হৃদয়
শতধা বিচ্ছিন্ন করো, ক্লান্তি লাগে, নির্জনতা ভয়
যেন রক্তে মিশছে এসে, আমাকে একটু রাখো উষ্ণতার কাছে,
এ যেন চামেলি নয়, চোখ খুললো, নিবিড় হিজল বনে রাত্রি থমকে আছে।

কে আলো নেভালো ? চিৎকার। কেউ নয় যুবকের ভ্রম
সবুজ আলোর রশ্মি কি আশ্চর্য মসৃণ নরম
রেশমের মতো সেই নগ্ন রমণীর দেহ ঘিরে
ছড়িয়েছে ছোট ঘরে, যুবকের দিকে পিঠ ফিরে
চামেলি পোশাক পরলো, চলো যাই, ঢের রাত্রি হলো
নীলকণ্ঠ, শুনতে পাচ্ছো, এবার তোমার সাজ খোলো।

সাজ খুলবো ? হাহাকার। কিছুই দেখি না অন্ধকারে
একবার হাত ধরো, চামেলি, মিনতি করি, বলো,
তোমার শরীর দেখলে কেন মনে হয় বারেবারে
তোমাকে ঘিরেছে যেন আঁধার সমুদ্র এক, অজস্র উত্তাল টলোমলো
আমার মৃত্যুর মতো। অথচ আমিই যদি সম্রাটের এই সাজ খুলি
নীলকণ্ঠ মজুমদার বের হবে—সকলেই দেখাবে অঙ্গুলি,
ঐ সেই লোকটা যাচ্ছে—নাট্যকার, নারী কিংবা মদ
বাঁচিয়ে রেখেছে যাকে, ভোগ করছে পরের সম্পদ।

নকল সাজেই বুঝি বাঁচতে হবে, অন্ধকারে এ অবগাহনে
জীবন বিস্বাদ লাগে, সমুদ্রের চেয়ে আরো লোনা।
তুমি রোজ সাজ খোলো, আমি দেখি, ভাবি মনে মনে
কালকের নাটকে হয়তো মৃত্যুদৃশ্যে আমি আর বেঁচেই উঠবো না।

বুকে যে ঝর্ণার উৎস

বুকে যে ঝর্ণার উৎস সে কোন গভীরে
হারায়, অথবা কোন ভ্রান্ত মরুপথে
বৃষ্টির ফোঁটার মতো শূন্যে ঘুরে ফিরে
ফিরে যায় সায়াহ্নের জয়দৃপ্ত রথে ।

আমিও দেখিনি তাকে, নিজেরই মুকুর
মনে হয় ভেঙে ভেঙে ছড়িয়েছি ভুলে
কখনো নিভৃতে শুনি যে নির্ঝর সুর
চিরকাল অদেখা সে সিংহদ্বার খুলে

হৃদয়ের অন্ধকার সাতমহলায়
অনেক ঘুরেছি আমি জোনাকির মতো,
দেখেছি স্বপ্নের নামে স্মৃতিতে হারায়
যা কিছু কৃপণ চোখে খুঁজি ক্রমাগত ।

তুমি

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে
তোমার দু' চোখে তবু ভীরুতার হিম !
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে
ছোট এই পৃথিবীকে করেছো অসীম ।

বেদনা মাধুর্যে গড়া তোমার শরীর
অনুভবে মনে হয় এখনও চিনি না
তুমিই প্রতীক বুঝি এই পৃথিবীর
আবার কখনও ভাবি অপার্থিবা কিনা ।

সারাদিন পৃথিবীকে সূর্যের মতন
দুপুর-দগ্ধ পায়ে করি পরিক্রমা,
তারপর সায়াহ্নের মতো বিস্মরণ—
জীবনকে, স্থির জানি, তুমি দেবে ক্ষমা।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান
রাত্রিকে করেছো তাই ঝংকার মুখর
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।

যা কিছু বলেছি আমি মধুর অস্ফুটে
অস্থির অবগাহনে তোমারি আলোকে
দিয়েছো উত্তর তার নব-পত্রপুটে
বুদ্ধের মূর্তির মতো শান্ত দুই চোখে।

বিচ্ছেদ

তোমাকে দিয়েছি চিরজীবনের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বর্ষাতে আর নেই অধিকার
তবুও হৃদয় জলদমন্দ্রে কাঁপে যেহেতু
চোখ ঢেকে তাই মনে করি শুধু ক্ষণিক বিকার।

আকাঙ্ক্ষা ছিল তোমাকে সাজাবে বৃষ্টিকণা
মনে হবে তুমি আকাশের মতো দূর বহুদূর
তখন জানিনি বর্ষণে আছে কি যন্ত্রণা
বিচ্ছেদ আর লাগে না আমার তেমন মধুর।

তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বুক জুড়ে শুধু রৌদ্র দহন
কখনো কি আর সাগরে মরুতে বাঁধবে সেতু
মেঘ-যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে তুমি ছুঁয়ে যাবে মন ?

অবিশ্বাস

যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ
কৃপণ আঙুলে খুঁজেছি বাঁচার অনেক অর্থ
বারে বারে তবু অবুঝের মতো বলে ওঠে মন
ব্যর্থ, ব্যর্থ।

কঠিন সময় তুচ্ছ করেছি হারিয়ে ছড়িয়ে
অহঙ্কারকে অবহেলা ভরে করেছি চূর্ণ
অন্ধ বাসনা, ভয় ফিরিয়েছি দুই হাত দিয়ে
খুশির খেয়ালে স্মৃতির মৌন করেছি পূর্ণ।

হরিণের ভীরু চোখের মতন স্নিগ্ধ সকাল
কখনো আমার হৃদয়ে আঁকেনি কোনো প্রতিভাস
কখনো দেখেনি ঘুচিয়ে চোখের আলোর আড়াল
দুঃখীজয়ীর ললাটের মতো অসীম আকাশ।

কত শতবার স্মরণ করেছে এই যৌবন
ভেদাভেদ নেই জলের রেখায় নারীর চিত্তে
তবু কেন আজ অবুঝের মতো বলে ওঠে মন
মিথ্যে, মিথ্যে ?

কঠিন মিল

ধু ধু করা এক মাঠের মধ্যে একলা গাছের মতো
ধুলোর ঝাপট রোদের ভ্রূকুটি স'য়ে স'য়ে অবিরত
বৃষ্টি বাদল ঝড়ে
শিকড়ে শিকড়ে বাঁচার সাহস
শাখার শাখায় দুঃখ অবশ
বাঁচতে চায় সে একলা বাঁচার প্রেম নিয়ে অন্তরে।

এ কেমন সাধ ! আলোর বৃন্তে বিলাসী পোকার মতো
তাকে চেয়ে আমি সারাটা জীবন ঘুরেছি যে ক্রমাগত
শোনো তবে আমি বলি :
আমিই রোদ ও ধুলোর সমাজে
এসেছি বজ্র বৃষ্টির সাজে
আমিই ঢেকেছি তোমার আকাশ, তারাদের দীপাবলী

এমন কি আমি তোমারই দু'চোখে প্রতিরোধ হয়ে জ্বলি ।

ঘর

পাহাড় সমুদ্র আর অরণ্যের স্তব লিখে লিখে
ক্লান্ত এক কবি আজ ঘুমিয়েছে একলা ছোট ঘরে,
যখন সে জেগেছিল, ছোট ছোট ঘর ভর্তি এই পৃথিবীকে
উদার প্রশস্ত চোখে চেয়েছিল বাসনার স্তরে ।

কৈশোরে অম্লান এক শ্বেতপদ্ম ছিল তার বুকে
প্রসন্ন রৌদ্রের আলো টলোমলো স্বচ্ছ সরোবর
এবং উদাস, নীল, আকাশের পরিপূর্ণ সুখে
মুগ্ধতার নানাবর্ণ চিত্রশিল্পে ভরেছে অন্তর !

জীবন বিশাল করো, হে আকাশ, পথে পথে ঘুরে
এখন সে বলে উঠলো, সত্যকার জীবনের মুখোমুখি এসে
লক্ষ বাহু তুলে ধরো, হে অরণ্য, অসহিষ্ণু যৌবনের সুরে
কোথায় এসেছি আমি—অসহ্য এ স্পন্দহীন দেশে ।

দিবাস্বপ্নে সব ছিল, সমুদ্র আকাশ মাঠ বন
তবু তার দিন ভরলো সঙ্কীর্ণের নানান আঘাতে ।
কাচের জানালার পাশে পাখির মতন তার মন
শ্বেতপদ্ম খুঁজতে এল কোন এক যুবতীর হাতে ।

এখন নিতান্ত ক্লান্ত যুবকটি ঘুমিয়েছে একা ;
স্বপ্ন নেই আকাশের, তৃপ্তি নেই পাহাড়ে সাগরে।
পরাজিত মহত্ত্বের সঙ্গে হবে অন্য চোখে দেখা ;
দ্বিতীয় পৃথিবী এক প্রতীক্ষায় বসে আছে তারই ছোট ঘরে।

সাপ

কুসুমে ছিল সবুজ সাপ সে এক সন্ধেবেলা
তখন আমায় ছুঁয়েছে লোভ—অসীম দুর্জয়
চক্ষু দুটি অচেনা তারা, হৃদয়ে বিষজ্বালা,
হাওয়ার তোড়ে দুললো সাপ পরম নির্ভয়
মৃত্যু হলো স্বয়ম্বরা, আমি পেলাম মালা

রাত্রি নামে ঈগল এক, ইচ্ছা পারাবত
যে হাতে ছিল ফুলের সাধ—এখন তাই ভয়
লুকোয় সেই বাসনা-পাখি ; সারা আকাশপথ
ডানায় ঢাকে রাত্রি তার দু' চোখে সংশয়
আমি তখন বিষের ঘোরে খুঁজি ভবিষ্যৎ।

কত রঙের কত কুসুম হাতের কাছে জমা
মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ি, পায়ের কাছে শীত
আহা কি রূপ সাপের চোখে জানিনি প্রিয়তমা
এতকাল যে বেঁচে ছিলাম, এখন সম্বিৎ
হারায় তাই—তোমাকে দিই চিরকালের ক্ষমা।

একা

একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন
অন্ধকার চিন্তাকুণ্ডে পা ছড়িয়ে বসো হে আরামে
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে।

কাল রাত্রে ঘুম হয়নি, একা এক দ্বিতীয় জগতে
বৃষ্টিহীন, নিষ্পাদপ, আদিগন্ত রুক্ষ তপ্ত বালি
পায়ে ঠেলে ঠেলে হেঁটে নিজের বানানো সরু পথে
ভেবেছি নিজেরই ছায়া সত্যি নয় নিষ্ঠুর হেঁয়ালি ;
জীবন বা মৃত্যুও নয়, সে এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা
চোখে জ্বলছে তীক্ষ্ণ রোদ, মগজে রাত্রির কারুকাজ
বাঁচার একটাই চিন্তা তবু তার নানান আগাছা
জড়ায় প্রাণের কেন্দ্র সঙ্গী সাথী আত্মীয় সমাজ ।

স্বস্তিহীন এই রাত্রি,—তোমরাও এসো কয়েকজন
(তোমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় জগৎ ঘিরে সূর্যের মণ্ডলী)
এখানে চিন্তার কুণ্ডে—ভুলে যাই অসহ নির্জন
কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে এসো হে স্মৃতির কথা বলি ।

উপলব্ধি

খুচরো পয়সা গুনে নিয়ে পেঁয়াজ রসুন
বেচে উঠলো এনামালি, গত হাটে আর বুধবারে
দু' টাকার 'মার গেছে, আজ শোধ নেবে চতুর্গুণ
গঞ্জের বাজারে তারা সুর্মা চোখে আছে সারে সারে ।

লণ্ঠন নেভাও বিবি, বন্ধ রাখো সোহাগের বুলি
না হয় বেশীই পাবে, আরো এক চকচকে আধুলি
ভোর রাত্রে ধরা চাই সতীশের ঘরে ফেরা নাও
থাক আজ কালীমার্কা, এক ফুঁয়ে লণ্ঠন নেভাও ।

আধুলির চেয়ে আরো চকচকে তীব্র জ্যোৎস্নার
আলো এসে ঘরে পড়লো, হঠাৎ দেখলো এনামালি
অজস্র দোকানপাট বসে গেছে যেন সারে সার
লোকজন ভরা হাট শুধু তার স্থানটুকু খালি ।

বিবির শরীরে দেখলো ভয়ঙ্করী পদ্মা যেন দিগন্ত উধাও
মনে হলো এতক্ষণে ছেড়ে গেছে সতীশের ঘরে ফেরা নাও।

দুই হৃদয়

আমার জনৈক বন্ধু, কাল রাত্রে কি দঃখে কি জানি
বিষ খেয়ে শুয়েছিল ; টেলিফোনে সে খবর শুনে
দেখতে গেলাম তার শেষ স্মৃতিচিত্র মুখখানি
মনে হল, নিজেকে সে সঁপেছিল বাঁচার আগুনে।

দু' চোখে কিসের ক্ষুধা, যেন এক বিষণ্ণ নাবিক
সুদূর সমুদ্রপথে সামান্য তৃণের মতো একা
প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে, অন্ধ চোখে ভুল ক'রে দিক
চলেছে আর এক রাজ্যে, যে রাজত্ব এখনো অদেখা।

ফিরে আসি নত মুখে, আমার নিভৃত ছোট ঘরে—
কি এক অদৃশ্য ভয়ে বারেবারে কেঁপে ওঠে বুক
নিজেকে সান্ত্বনা দিই, নির্জন হাওয়ার মতো স্বরে :
আমি তো প্রতিষ্ঠ আছি, স্থির, দূরলক্ষ্যে উন্মুখ।

কৃপণের মতো আমি ধরে আছি এই পৃথিবীকে
মুহূর্তের নানারূপ সৃষ্টি করি নিপুণ স্থপতি।
আমি তো এখনো ভাবি এ জীবন উদ্ভাসিত হবে দিকে দিকে
সমুদ্র আকাশ হবে, তৃণ হবে মহাবনস্পতি।

একটি অনুভব

পায়ের কাছে এই বিশাল বাধাহীন সমুদ্র
মাথারও অধিতটে আকাশ নীলে নীল সমুদ্র
একদা কার বুক আমার মনে হত সমুদ্র ?

এখানে এ সাগর চোখের পরপারে অন্তহীন
একদা কার প্রেম আমার চোখে ছিল অন্তহীন
দু'বাহু বন্ধনে পেয়েও মনে হত অন্তহীন ?

পিপাসার ঋতু

আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে যায়
উনিশের কুমারীকে ; তার চোখ ক্ষণকাল বিদ্ধ হয়ে থাকে যন্ত্রণায়
তারপর জ্বলে ওঠে আকস্মিক আলেয়ার মতো
এক টুকরো অন্ধকার পাখি হয়ে তার পাশে ঘোরে ক্রমাগত ।

পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো রোদ্দুরের চেয়ে আরো তীক্ষ্ণ মনে হয়
স্মৃতির অসহ দুঃখ জ্বেলে দেয় প্রথম সংশয় ।
একটি আলোর বিন্দু ঘুরে ফেরে ধমনীর রক্তের ভেতরে
শৈশবের ভুলে যাওয়া পদ্মা আরও কীর্তিনাশ করে ।
শরীরে মৃত্যুর স্বাদ—বুক জুড়ে উন্মাদ তুফান
আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ
এক টুকরো অন্ধকার পাখি হয়ে ঘোরে চারপাশে
আলেয়ার মতো চোখ জ্বলে উঠে মেলায় আকাশে ।

মেয়েটি কান্নায় ভরে অন্ধকার মাঠে ভেঙে পড়ে
প্রার্থনায় দীর্ণ হয়, অস্ফুট হাওয়ার মতো স্বরে :
হে দেব, তৃষ্ণার শান্তি, মুক্তি দাও এই তৃষ্ণা যূপকাষ্ঠ থেকে
বিশাল বাতাসে ছাওয়া মাঠে আমি তৃণে মুখ ঢেকে
উদ্ভিদ মূলের মতো মাটি থেকে চাই শান্তিরস.
হে দেব, তোমার দানে পূর্ণ করো যৌবনের তৃষ্ণার কলস ।

তখন কবির কণ্ঠ প্রচ্ছন্ন আধার থেকে উচ্চারিত হয়,
হে কুমারী, শান্ত হও, অশ্রুজলে লিখে রাখো অনেক বিস্ময় ।
তোমার পিপাসা ঋতু জ্বলে জ্বলে দীর্ঘতর হোক
তোমার প্রাণের নাম দাহময় গ্রীষ্মের চাতক ।

পৃথিবীর মতো তুমি স্থির হয়ে থাকো প্রতীক্ষায়
প্রথম প্রেমের স্পর্শ নেমে আসবে আষাঢ়ের প্রথম বর্ষায় ।

ব্যর্থ

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তোমার শরীরে বর্ণবাহার
অথচ আমি যে পাইনে একটু কণা ;
নীল যৌবন আকাশে হারাবে, তাই বুঝি এই
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

অন্ধকারের পাখার ঝাপটে এই যৌবন
বর্তমানেই সঁপে দেবে মন ?
দুঃখ বাজবে, পরাভূত হবে
জানবে না তার দৃষ্টি অতীত কি যে গৌরবে
মুক্তি মূল্যে মগ্ন সুদূর প্রতীক্ষা পণ ।

জানে না পৃথিবী এ ষড়যন্ত্রে তুমি
মৃত্যু না-হোক, দেবেই আত্মদান
ব্যথার শিহরে সারা অরণ্যভূমি
উন্মাদ হয়ে গাইবে ঝড়ের গান ।

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তুমি রয়ে গেলে রূপের আড়ালে
হৃদয়ে পেলে না একটু আলোর কণা ।
নীল যৌবন আকাশে হারালো, তাই বুঝি এই
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

নক্ষত্র

হে আকাশ তুমি আজ বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো।
যে আলো মৃত্যুর মতো সব দিকচিহ্ন মুছে ফেলে
আমাকে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে অবহেলে।

তুমি কত ডাক দাও, আমি অন্ধ নির্বোধের মতো
সেই ডাক ভুলে গিয়ে নিজেকেই খুঁজি ক্রমাগত।
কালের উজানগঙ্গা সমুদ্রের মৌনে এসে মেশে
সোনার শৈশব ছেড়ে যৌবনের অগ্নিময় দেশে।

হে আকাশ, আজ তুমি বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো।
আবার যেন সে আসে মৃত্যুর মতন যেন আবার নিভৃতে
বসন্ত-উল্লাস থেকে আমাকে সে নিয়ে যায় হিমগর্ভ শীতে

ঝড়

কোথায় নামলো ঝড়—এখানে আকাশে
মেঘ-ছোঁয়া পাখি এক ভয় পেয়ে নীড়ে ফিরে আসে।

অথচ এখানে মেঘ কুমারীর মুখের মতন
অস্ফুট লাবণ্যময়, শান্ত নীল রৌদ্রে ভেজা বন,
ঝড়ের আভাস নেই, তবু সেই মেঘ-ছোঁয়া পাখি
ডানায় বিদ্যুৎ এনে ফিরে এসে কুলায় একাকী
প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণ চোখে চায় যেন হোক এবার শুরু
বুকে তার গুরুগুরু, ঠিক সেই ঝড়েরই ডমরু।

কোথায় নামলো ঝড়, অথচ এখানে
গতির উন্মাদ ঢেউ অকস্মাৎ ছোঁয়া লাগে প্রাণে।

আমি তো এখানে আছি, প্রত্যহের নিষ্ঠুর নিয়মে—
সব কিছু শেষ করে ফিরে আসি আবার প্রথমে,
অতীত স্মরণ করি, ভবিষ্যের ভয়ে চোখ বুজে
মুহূর্তের যত ঋণ যাত্রাপথে যাই খুঁজে খুঁজে।

তবুও কখনো কোন দূরাগত ঝড়ের আহ্বান
মৃত্তিকা-শৃঙ্খল ছিঁড়ে কাঁপায় পাখির মতো প্রাণ।

যদি কোনোদিন

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে
যখন বিকেল আসন্ন শীতে মন্থর-বেগ,
দেখবে কত না রহস্য আছে এই পৃথিবীতে
কত স্বপ্নের অচেনা আকাশ ছায়াময় মেঘ।

দেখবে সেখানে বনের বর্ণ মহা সমারোহে
শব্দে মিশেছে। নদীর জোয়ার বাতাসের গানে
বিকেলের ঘ্রাণ ঘুমের মতন অপরূপ মোহে
ছড়াবে তোমার চোখের মৌনে—অস্ফুট প্রাণে।

তুমি ভুলে যাবে আপন স্বরূপ, ভাববে আকুল
এ শরীর, মন, আভাস-উদাস-দু'চোখ এ কার ?
এ কার আকাশ, পাখি, মেঘ, বন, নতুন মুকুল
এতদিন পরে তোমার হৃদয়ে কোন্ ঝংকার।

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে
হয়তো আবার বাঁচতে চাইবে এই পৃথিবীতে।

রাত্রি

একটি পাগল অন্ধকারকে বলে
আমাকে ভোলাও তোমার মোহিনী ছলে।
এই বলে শেষে নিজেই সে গেল মিশে
অন্ধকারের আকণ্ঠ ভরা বিষে।

সহসা আকাশ মেঘেতে ঢাকলো মুখ
বৃষ্টি ধারায় অঝোরে ঝরালো কেঁদে
আহত বাতাস উদাস করলো বুক
ঝড়কে রাখলো বনের শিখরে বেঁধে।

স্তব্ধ আঁধারে কিছুই যায় না দেখা
হে আকাশ তবু উষার হৃদয় জ্বালো
কোথায় গেল সে দৃষ্টি-পাগল একা
খুঁজতে সে কোন আঁধার পারের আলো।

সময়

বিষণ্ণ সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী
চেয়ে দেখে সব পাখি হয়েছে উধাও
দু' একটি বৃন্তঝরা আলোর পালক থাকে, তাও
হাত পেতে চেয়ে নেয় রাত্রির ভিখারী।

শূন্য মনে ফিরে যায়। ব্যর্থতার, দু' চোখের কালো
বন্যার শব্দের মতো দিগন্তে ছড়ায়
নিঃসঙ্গ অরণ্য থাকে যন্ত্রণায় স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
কখন হৃদয়ে বেঁধে বর্ণচোরা আলো।

শুকনো পাতায় ভাঙে ঘুমহীন পাণ্ডু নীরবতা
জোনাকিরা মগ্ন হতে চায় ভিজে ঘাসে
মৃগ শিশু বুকে নিয়ে জেগে থাকে রাত্রির দেবতা
ধূসর রুগ্‌ণ জ্যোৎস্না মেলায় আকাশে।

নিশ্চিত ভোরের সূর্য অকরুণ, ক্লান্তিহীন মুখে
ছড়ায় জটিল জাল জীবনের মতো
অনেক বাতাস কাঁপে ঘুমভাঙা শূন্যতার বুকে
আবার সকাল, দিন, সব ক্রমাগত।

আবার সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী
জানা আছে সব পাখি হবেই উধাও।
যা কিছু আলোক থাকে ক্লান্তি দিয়ে তাও
হারায়, জানে না ক্রমে নিজেও সে হয়েছে ভিখারী।

শেষ প্রণয়

এ কোন নতুন আলো পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়ানো আকাশে?
কুয়াশার গন্ধলীন সবুজ প্রত্যূষ ঘাসে ঘাসে
পদ্ম পদতল ছুঁয়ে একটি রমণী এসে থমকে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ জুড়ে অফুরান প্রতীক্ষার আলো।

—ফিরে যাও হে রমণী, আপন আঁচলে ঢেকে মুখ।
সামান্যের বাসনায় তাকে পেতে হয়ো না উন্মুখ।
সে থাক আপন দুর্গে অন্ধকারে স্বেচ্ছা নির্বাসিত
তোমার আশ্বাসে যেন হরিণের মতন চকিত।

—ফিরে যাও হে রমণী, ফিরে যাও বিচ্ছেদগৌরবে
দুর্লভ জয়ের গর্বে একদা সে প্রজ্বলিত হবে
পুরুষের দুই হাতে দিন রাত্রি নিয়ে অবহেলে
অগ্নিদগ্ধ শুভ্র প্রেম সে তার দু'চোখে দেবে জ্বেলে।

রমণী ভোরের মতো, স্থির হয়ে থাকে প্রতীক্ষায়
চক্ষে ওষ্ঠে স্তনযুগে শরীরের প্রতিটি রেখায়
আকাঙ্ক্ষার তীব্র আলো—সে আলোয় সে আগুনে এসে
ব্যর্থ হল সে পুরুষ, নিজেকে জ্বলিয়ে নিঃশেষে।

ক্ষণিকা

এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া অহঙ্কারে ব্যাপ্ত করে দিক ;
ঝরে যাবে, মনে মনে বলি আমি, ঝরে যাবে ঠিক,
শীতের নির্মম হাত ছিঁড়ে নেবে স্পর্ধার নিশান ;
যে আকাশ নীলে নীলে মনে হয় যেন অফুরান
সেও শূন্য হবে, ক্লান্ত মেঘ এসে মুছে দেবে সীমা,
কালের কুটিল স্রোতে ভেসে যাবে কালের প্রতিমা।

তোমাকে লিখেছি চিঠি কালের প্রতিমা নামে ডেকে
সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলো, ঘন অন্ধকারে মুখ ঢেকে
নিজেকে গোপন করো, মিথ্যে হোক পূর্বপরিচয় ;
ঝরে যাবে মুছে যাবে, এর চেয়ে পরম বিস্ময়—
যখন একান্তে ডাকি চুপে চুপে তোমাকে, ক্ষণিকা,
তখনও অম্লান থাকে চিরন্তন বাসনার শিখা !

আত্মকাহিনী

রোজ সকালেই শুয়ে শুয়ে ভাবি উঠি কিনা উঠি
সামনে টেবিলে চায়ের পেয়ালা সেঁকা পাউরুটি।
সতেজ কাগজে পরিচিত ঘ্রাণ, চেনা সংবাদ
বন্যা, মন্ত্রী, শান্তির বাণী, শরিকি বিবাদ।
জানালার পাশে এই সংসার দিল তার ডাক
থাক আলস্য, এবার তা'হলে উঠে পড়া যাক।

গত রাত্রিকে বিছানায় ফেলে বাইরে এলাম
চোখে মুখে গায়ে পৃথিবী লিখলো সূর্যের নাম
সে নাম থাকবে সারাদিন ধরে চিহ্নের মতো
যেন আমি এই জীবিকার পথে ঘুরি ক্রমাগত।
চোখের আড়ালে এসে চলে যায় বর্ষা শরৎ
যাকে চাই তাকে ভুলে গিয়ে শুধু খুঁজে ফিরি পথ।

দিনের যুদ্ধে সমস্ত আশা নিঃশেষ হলে
রাত্রি তখন প্রেয়সীর মতো আভরণ খোলে।
তার রূপ যেন মৃত্যুর মতো ম্লান মনে হয়
সঁপে দিই তাকে নিজের ব্যর্থ ক্লান্ত হৃদয়।
শুধু মনে মনে প্রার্থনা করি অস্ফুট স্বরে
নতুন দৃশ্য ঘুম ভেঙে যেন দেখি কাল ভোরে।

সমুদ্র এবং মধ্যবয়স

সমুদ্রে সে ডুবেছিল, সমস্ত যৌবন-কাল, রত্নের সন্ধানে—
রত্ন নয়, পেয়েছে সে বুক ভরে নীল অন্ধকার
বরং সমুদ্র-স্বাদ কয়েকটি শিশির-বিন্দু ছিল তার প্রাণে
দু চোখে নীলের নেশা, যৌবনের দৃপ্ত অহঙ্কার।

যদিও সময় ছিল বাউলের মতো তৃপ্তিহীন
পার্থিব আলোয় খুঁজে জীবনের বিস্ময়ের ভাষা
সামান্য স্বপ্নের মতো, চেয়েছিল, শোধ করে মুহূর্তের ঋণ
বিষের মতন তীব্র যুবতীর স্থির ভালবাসা।

তারপর একদিন চুলের বাদামী রঙে চুপে চুপে মিশে
বণিকের রূপ ধরে সময় দাঁড়ালো তার কাছে
লাভ ক্ষতি হিসেবের দিকে শুধু চেয়ে নির্নিমেষে
দেখলো সমস্ত ঋণ ভবিষ্যৎ-গর্ভে জমে আছে।

চোখে আর তেজ নেই, দু' চোখে সমুদ্র আরো গভীর অতল,
নীলের নেশায় ডুবে—সে শুধুই পেলো অশ্রুজল।

পরমা

বারেবারে চমকে উঠি, সে আসেনি ; গোধূলির আলো
পশ্চিমে তির্যক হয়ে দেবদারু চূড়ায় দাঁড়ালো ।

মন যদি নিভে যায় তবুও গভীরে
রত্নের সন্ধানী চোখ বারে বারে আসে ঘুরে ফিরে
খুঁজে পায় টুকরো, ভাঙা, শৈশব সুদূর ;
আহত পাখির মতো শূন্যে কাঁপে যন্ত্রণার সুর ।

নিজের দু' চোখে যদি মুকুরের রূপ মনে আসে
তবে কার শান্ত ছবি, কার অতলান্ত প্রেম ভাসে ?

নিশ্বাসে স্মৃতির সঙ্গ চেতনার দিগন্তে ছড়ালো
বারবারে চমকে উঠি, কে এসেছে, গোধূলির আলো ।

সমর্পণ

ফিরে এলাম, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি
এখানে এই কিশোর তৃণ, ধূলিতে গড়া স্বর্গে—
সামান্যের মায়ায় আমি নিজেকে দেবো অর্ঘ্য ;
সেই আমার ভালোবাসার, প্রাণের সংক্রান্তি ।

ঘুমের দেশ ছেড়ে এলাম তোমার মহারাজ্যে
তোমার চোখ আলোকময়, মুছে দিলাম ক্লান্তি,
দু'হাতে ছিঁড়ে মুহূর্তের কত না ফুল সাজ যে
ফিরে এলাম হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি ।

বাতাসহীন অরণ্যের জীবন নিঃশব্দ
সাগর-ঢেউ যৌবনের মিথ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা—
তারার মতো চক্ষে জ্বালে বিচ্ছেদের শঙ্কা,
অকস্মাৎ তোমাকে পাই যেন আকাশলব্ধ ।

তোমার হাতে তুলে দিলাম এতদিনের ক্লান্তি
এবার পাবো দিনের স্বাদ রাতের হিমস্পর্শ
আমাকে দাও দুঃখ, দাও দুঃখময় হর্ষ
তোমাকে জানি, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি।

কবি

তার কোনো দুঃখ নেই, সে তো সব সুখেরও অতীত
তার চক্ষে আলো জ্বলে, সে আলোর বর্ণ নেই কোনো
তার বুকে এত ঘুম, ছুঁয়ে দেখি, সে তো নয় মৃত
যন্ত্রণার আভা দিয়ে তার মুখ আগুনে সাজানো।

তার কোনো দুঃখ নেই, সুখ নেই, শুধু এ জীবনে
দুরাশ্চর্য তপস্যায় গেঁথে যায় মুহূর্তের মালা
দিনের উজ্জ্বল ফুল, অন্তরের অন্তহীন বনে
রেখে যায় গন্ধে স্পর্শে অসহিষ্ণু যৌবনের জ্বালা।

তিনজন তরুণ কবি—একটি গ্রোটেস্‌ক্

কিছু পথ হেঁটে তারা তিনজনে সন্ধ্যার আঁধারে
মাছের চোখের মতো ম্লান রেস্তোরাঁয় বসলো এসে
চোখে চোখে অনির্দিষ্ট চিন্তা এসে ঘুরলো বারেবারে
যেন তারা কথা বলবে হাওয়ার নির্দেশে।

একজন ঈষৎ স্থূল, রুক্ষ চুল, দীর্ঘাকার গ্রীবা
অন্য দুটি শীর্ণকায়, দীপ্ত-চক্ষু, উত্তর-পঁচিশ
এরা সব এ যুগের হুলস্থুল দানবী প্রতিভা
আপন রক্তের সঙ্গে মিশিয়েছে সময়ের বিষ।

তিনটে কুটিল পোকা মগজের মধ্যে ঘুরে ফিরে
পাক খাচ্ছে, আর এক নামহীন ভয়ঙ্করী নদী

পাড় ভাঙছে অবিরাম—টানতে চাইছে অতল গভীরে,
তিনজন দাঁড়িয়ে আছে তার তীরে জন্ম থেকে যৌবন অবধি—

কিংবা তিনজনই হয়তো তিনটি নদী দেখছে মনে মনে
চোখের পাতার নিচে কয়েকটা পাখি ঘুরছে অজানা উৎসাহে
একদিন আমাকে টানবে এই নদী—কখন নির্জনে,
যদিও আপাত চিন্তা কফি কিংবা চায়ে।

শুনেছ হে এ মাসের—অবিকল পাড় ভাঙা নদীর মতন
কণ্ঠস্বরে,—শুরু হলো অকস্মাৎ মিষ্টি কটু সাহিত্য-কাহিনী
প্রচণ্ড প্রহার খেলো টেবিলটা—একসঙ্গে তারা তিনজন
সপ্ সপ্ চা খেলো, আর একজন তো নিলই না চিনি!

এ হেন সময় এক যুবতীকে বাহুতে জড়িয়ে ভাগ্যবান
আর একটি যুবক ঢুকলো, হেঁকে উঠলো, এই যে অমুক!
তুমিও আছো হে দেখছি—তুমিও যে, তিনজনেই বুঝি একপ্রাণ
আনন্দে কাটাচ্ছ সন্ধে! ঘামের ফোঁটার মতো তরলিত সুখ

যুবকের ভ্রূ থেকে ঝরছে—শব্দ করে গেলো দূরের ক্যাবিনে
কি কথায় হেসে উঠলো একসঙ্গে—সরু মোটা দুটি কণ্ঠস্বর,
মনে হল মেঘ ডাকছে অবিশ্রান্ত বাদলের দিনে
অনেক এগুচ্ছে নদী, টান দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী ঘর।

টেবিলে কনুই রেখে মুখোমুখি বসে রইলো তারা
শীতের হাওয়ার মতো রক্তে যেন অসহ নির্জন।
মাঝে মাঝে টুকরো হাসি, শুনতে পাচ্ছে টুকরো কথা, অস্পষ্ট ইশারা
ঠাণ্ডা পেয়ালার মতো পড়ে রইলো সেই তিনজন।

সহজ

কেমন সহজ আমি ফোটালাম এক লক্ষ ফুল
হঠাৎ দিলাম জ্বেলে কয়েকটা সূর্য চাঁদ তারা

আবার খেয়াল হলে এক ফুঁয়ে নেভালাম সেই জ্যোৎস্না
(মনে পড়ে কোন জ্যোৎস্না ?) নেভালাম সেই রোদ (তাও মনে পড়ে ?)

নিন্দুকে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস করো না।
হয়তো বলবে শিশু কিংবা নির্বোধ
অথবা ম্যাজিকওয়ালা—ছেঁড়া তাঁবু, ফাটা বাজনা, নানান সেলাই
করা কালো কোর্তা গায়ে লোকটা কি মারণ খেলা
খেলাচ্ছে আহারে ঐ মেয়েটার চোখে,
দর্শক ভুলছে না, হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা
মায়ার অসুখে ভুগছে ;—বিশ্বাস করো না।

দেখ্ রে নিন্দুক দেখ্, বাম হাতে কনিষ্ঠ আঙুলে
ত্রিজগৎ ধরে আছি কেমন সহজে,
আমাকে অবাক চোখে দেখছে চেয়ে অন্ধকার, সমুদ্র, পাহাড়
শুধু কি তোরাই ভুললি বিস্ময়ের ভাষা !
আমার বাড়িতে আসবি, দেখবি সে কি আজব বাড়ি ?
মাথার উপরে ছাদ—চেয়ে দেখ্, চারদিকে দেয়াল রাখিনি,
(তোরাই দেয়াল ঘেরা, বুকে স্বপ্ন, শ্লেষ্মা নিয়ে চিরকাল থাকবি সাবধানে
আঙুলে বয়স গুনে—শখ করে সে দেয়ালে নানা ছবি এঁকে !)
আমার বাড়িতে দেখ্ অনুগত ভৃত্যের মতন
নানান জাতের হাওয়া ঘুরছে ফিরছে, ঝুল ঝাড়ছে ছাতের কার্নিসে
নানান রঙের টান দিয়ে দেখছে, ব্যস্ত দিন রাত।
আমি বসে ছবি আঁকছি দেয়ালবিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে
বাইরের ছবির চেয়ে চোখের মণিতে ছবি কেমন সহজ !

তোরাই নির্বোধ শিশু, ফিরে যা নিন্দুক,—
আমাকে ম্যাজিকওয়ালা বললে তুমি বিশ্বাস করো না।

চতুর্দশপদী

সুনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা
এই সত্য জেনে তুমি সুকুমার মৃণাল-শরীরে

ফোটালে বিষাক্ত পদ্ম ছদ্মবেশী মাধুর্যেতে মেশা
অনায়াসলভ্যমণি রেখে দিলে দুর্গ দিয়ে ঘিরে।
হিংস্র অন্ধকারে ভরা অরণ্যের মতো চুল খুলে
পৌরাণিক রূপসীর মতো তুমি মায়াবী-আলোকে
এ জন্মের স্বচ্ছ জ্ঞান লুকালে জঙ্ঘায়, যোনিমূলে
ভয়ঙ্কর, মনোলোভা সমুদ্র সাজালে দুই চোখে।

অনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ভ'রে, তোমার সে সমুদ্রের বুকে
অতল অতলে ডুবে, হারিয়েছে তৃপ্তির অন্বেষা
ছদ্মবেশী বিষপদ্ম দুই হাতে স্পর্শ করে সুখে।
তোমাকে ছাড়িয়ে দূরে, হারিয়েছে আকাঙ্ক্ষা অকূলে
জীবনের নীলকান্তমণিটিকে বুক থেকে তুলে।

স্বর্ণলতা

আমার উপমা নয়—আমি তাকে চাইনি মেলাতে
শীত এসে ছুঁয়ে দিল—দেবদারুর গায়ে স্বর্ণলতা
কুঁকড়ে গেল নিজে নিজে মুমূর্ষুর চোখে, মধ্যরাতে ;
আমার উপমা নয়, শীত তো শোনে না কারো কথা
নিশ্বাসে ছড়ায় বিষ, সময়ের মতো ক্রুর হাতে
মাটির গর্ভেতে রাখে বীজের নিজস্ব নীরবতা।
আমি তাকে তুলে দিইনি, আমি শুধু চাইনি জড়াতে
আবার দেবদারু গাছে ; মাটিতেই ঝরলে স্বর্ণলতা ?

নিজের উপমা নয়, তবে কার স্বরূপে মেলাবো ?
প্রেয়সীর নাম বলবো, সে হয়তো ঘুমন্ত এখন
একলা ঘরে, বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখ ঈষৎ রক্তাভ,
স্রস্ত বেশ, নিশ্বাসের সঙ্গে দুলছে দৃঢ় দুটি স্তন ;
আমি তো এখনি তাকে, ইচ্ছে হলে দুই হাতে পাবো।

শীত কি ছুঁয়েছে তাকে, দেবদারুতে দুলছে নির্জন ?

অন্যপ্রাণ

দিনান্তের ফেরা পথে কোনোদিন দৈবাৎ কখনো
যদিবা পথের মোড়ে চোখ ফেলে থমকে দাঁড়াই
অনেক দৃশ্যের ফাঁকে অকস্মাৎ হয়তো বা কোনো
ভিখারী ছেলের মৃত্যু বুকে বিঁধে নিজেকে হারাই।
ঘন কালো রক্ত মাখা, সাক্ষ্যহীন বিকৃত শরীরে
চক্ষুকে যন্ত্রণা দেয় পথচারী যায় পিঠ ফিরে।
সেখানেও থামবো না অনন্ত কালের বাঁধা ঋণে
ক্ষণকাল চক্ষু বুজে চলে যাবো পদক্ষেপ শুনে।

কেননা নিজেকে আমি সঁপেছি কালের অঙ্গীকারে
দু'হাতে রেখেছি বাঁধা—সাংসারিক বঞ্চনার দায়ে
নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছি জীবিকার নির্মম শিকারে
ক্ষণিক বিরুদ্ধ-যুদ্ধে পরাজয়-চিহ্ন সারা গায়ে।
তবু কোনো দুঃখ নেই, তুচ্ছ সব আনন্দ বেদনা
উন্মুখ হৃদয়ে আছি কাকে যেন দিতে অভ্যর্থনা।
এক মৃত্যু পার হলে, আরো বহু মৃত্যুর শিয়রে
বাঁচার আশ্চর্য তৃষ্ণা জেগে উঠবে নিশীথ প্রহরে।

ভিখারী ছেলের মৃত্যু ক্ষণতরে যদি বেঁধে বুকে
তাও ফেলে চলে যাবো দ্বিধাহীন বাঁচার সম্মুখে।

বৃষ্টির ইতিহাস

আসন্ন আষাঢ় তাই রৌদ্র-প্রার্থী মন
মেঘের মলিন চিত্র বিষণ্ণ আকাশে
ঝড় দিয়ে মুছে বলে, অত্যাগসহন
যে আমার চোখে আছে, তার অপ্রকাশে
মিথ্যে এই পৃথিবীর দিন রাত্রি বোনা
মিথ্যে মৃত্তিকার গর্ভে বীজের বাসনা।

কে তার দু'চোখে আছে ? আসন্ন আষাঢ়
নিরন্তর খোঁজে তাই শূন্যে বলে ডেকে
আমার যা কিছু ছিল সে ভালোবাসার
মৃত্যু হোক, যে তোমার হৃদয়ের থেকে
উদ্ভিদ শিশুকে হয়তো ছোঁয়াবে আকাশ—
আমার বর্ষণ হোক প্রার্থনার মতো
আমার আভাসে তার উজ্জ্বল প্রকাশ
দিকে দিকে ব্যাপ্ত হোক, আমি হই মৃত ।

একজন মানুষের গল্প

নায়ক শহরে কোনো এক মসীপণ্য
দিনের প্রকৃতি মুছে গেছে তার চোখে
সেই অভিমানে সেও মিলে গেল পথে অগণ্য লোকে
অকৃপণ হাতে সময় ছড়ালো তার ;

সংসার তাকে করেছে ছিন্ন ভিন্ন
তীব্র নখরে চিহ্ন এঁকেছে দেহে
সোনার প্রভাত কোনোদিনও তাকে দেখলো না সস্নেহে
তাই সে দু'চোখে ছবি আঁকে সন্ধ্যার ।

পাখিও তো নয়, সন্ধ্যায় পাবে মুক্তি
খড়কুটো আর উষ্ণ বুকের নীড়ে,
অরণ্য নয় লুকোবে নিজেকে, চেনা মানুষের ভিড়ে
তৃণের মতন ভাসে সময়ের স্রোতে !

দিনের আলোকে জমে জীবনের মুক্তি
ক'জন মানুষ পায় তার সন্ধান ?
তবু অনেকেই খুঁজে খুঁজে করে জীবন ছত্রাখান
কেউ যায় দূরে সাগরে বা পর্বতে ।

আমার নায়ক চায়নি বাঁচার দ্বন্দ্ব
ছোট সুখ থেকে ঐশ্বর্যের আশা,
মহাকাব্যের নায়কের মতো কেড়ে নিয়ে ভালোবাসা
বাঁচতে চায়নি সে কখনও মনে মনে।

সে শুধু চেয়েছে পরিচিত কোনো ছন্দ
লিরিকের মতো চেনা শব্দের সুর
রাত্রে যখন বাড়িতে ফিরবে মনে হবে বহু দূর
নিজের সঙ্গে দেখা হবে নির্জনে।

তখন সে পাবে অচেনা দিঘির মৌন
হৃদয় গভীর অবসরে সমতল
হয়তো শুনবে নিজের রক্তে রাত্রির চলাচল
আঁধার সাগরে কখনও ডাকবে বান।

মেলাবে দুঃখ, মুখ্য কিংবা গৌণ
শিমুল শাখায় প্রতীক বাসনা ঝড়ে—
বৃষ্টিতে আর হাওয়ার দাপটে ফুটবে নানান স্তরে,
কোনো কুমারীর শরীর করবে পান।

পাপ

একটি চাতক তার ধর্ম ভুলে কর্দমাক্ত দীর্ঘিকার জল
পান করেছিল, তাই আমি তাকে মৃত্যুহীন তৃষ্ণার আঙুলে
সামান্য শরীর ঘিরে পরিয়েছি অনন্তের কঠিন শৃঙ্খল
একান্তে রেখেছি তাকে এক রমণীর বুকে, বন্ধ দ্বার খুলে।

সেই বন্ধ দ্বারে যেন বন্দী আছে নরকের তীব্র অন্ধকার
তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভরে সেখানেই থাক সেই ধর্মভ্রষ্ট পাখি
আমার খেয়ার নৌকো ঘুরে ঘুরে আসবে আর যাবে বারংবার
শস্যহীন প্রান্তরের মতো শুধু রাত্রিদিন সে রবে একাকী।

সেই রমণীর স্তনে কখনো শিশুর মতো করবো বিষপান
আশঙ্কায় কেঁপে উঠবে তার দুই জঙ্ঘা আর ক্ষীণ কটিদেশ
এক হাতে মৃত্যু আর অন্য হাতে জীবনের লুণ্ঠিত সম্মান
নিয়ে, তাকে দেবো আমি সুখ দুঃখ বিস্মৃতির নিবিড় আশ্লেষ ।

কান্নায় কান্নায় ভরে কাঁপবে পাখি, বেজে উঠবে কঠিন শৃঙ্খল
যখন সন্ধ্যার মেঘে বিদ্যুতের শিখা জ্বলবে, ঝরবে ধারাজল ।

অনুভব

একসঙ্গে জেগে উঠি দু'জনেই, হে সবিতৃদেব,
দেখা হয় নিরালায় আমার ছাতের একলা ঘরে
নানা কথা বলি আমরা, দুঃখ সুখ অজস্র হিসেব,
আকাশের ঘন-নীল চোখে মুখে গায়ে মাখি দুই হাত ভরে
ছড়াই, জমিয়ে রাখি, বুকের মধ্যেও একটু নীল
সঙ্গোপনে রাখা থাকে—দু'জনের এইটুকু মিল ।

এইবার যেতে হবে দু'জনের, দু'মুখো সংসারে
কোথায় সায়াহ্ন আছে, তুমি তাকে খুঁজবে ঘুরে ফিরে
কুন্তলে লুকিয়ে আলো, সে যখন আসবে অন্ধকারে
তুমি চলে যাবে দূরে ; কোথায় ? হয়তো অন্য নীলের গভীরে ।

আমিও একলা ঘুরি পথে পথে, দিবালোকে দুই চক্ষু বুজে
বুকের জমানো নীল কাকে দেবো যেন তাই খুঁজি ।

চিরহরিৎ বৃক্ষ

শ্মশানে পিতৃপুরুষের কঙ্কাল, তার ফাঁকে ফাঁকে শিরশির
করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস ।
আমার সাধ ছিল সেই বাতাসের ভাষা শুনি ।

একদিন তাই অন্ধকার নদীর কিনারায় নিভে আসা
চিতাকুণ্ডের পাশে শুয়ে ছিলাম আমি, জীবন্ত।

কোথা থেকে পাখার শনশন শব্দ করে একটা বিশাল
বাজ পাখি উড়ে এসে বসলো আমার শরীরে।
যে মেয়েটিকে কাল আমি স্বামীগৃহে যেতে দিয়ে এসেছি তার
দৃষ্টির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে সারারাত সেই ভয়ঙ্কর পাখি
ছিন্নভিন্ন করে খেলো আমার শরীর, আমার চোখে মুখে বাহুতে
ক্ষত, আমার রক্তে মিশলো রাত্রির শিশির।
আমার প্রাণটাকে বার করে এনে কি ভেবে অবহেলায়
আবার মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে ;
নিজের মৃতদেহে ভর করে আবার আমি জেগে উঠলাম।

তাই প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে পিতৃগৃহে আসা রমণীটি
আমাকে আর চিনবে না। আমি ঘুরবো ফিরবো গোপন
করে আমার শরীর থেকে শবের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে
স্বপ্ন দেখবো সেই শ্মশানের পাশে এক আশ্চর্য
চিরহরিৎ বৃক্ষ—তার পাতা ঝরে না, তার মৃত্যু হয় না,
বাতাসের ভ্রান্তিহীন শব্দে ডাক দেয়, এসো, এসো, পাখির মতো
বাসা বাঁধো আমার আশ্রয়ে। সে আমার জন্মের
আগেও বেঁচে ছিল—আমার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে।

নেশা

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই—শীতের সাপের মতো ঘুমন্ত হৃদয়
গভীর গভীরতর অন্ধকারে, পৃথিবীর একনিষ্ঠ আদিম নেশায়
মগ্ন হয়, ব্যাপ্ত হয় ; স্বপ্নের কুহকে বন্দী কঠিন সময়
আপন পূর্ণতা খোঁজে—লোভী, নীচ, বাসনার ব্যর্থ অন্বেষায়।

যে শান্ত নদীর কূলে একদা জন্মেছি আমি আনন্দের ঘরে
সেই নদী বন্যা-বেগে আমাকে ভাসাতে চায় দূরের সাগরে।
যে পারিপার্শ্বিকে আমি অবিচ্ছেদ্য সূর্য আর পৃথিবীর মতো
তার প্রতি ঘৃণা আনে স্বপ্নের সর্বঘ্ন মোহ—হানে ক্রমাগত।

সুখ চাই তীব্র সুখ তার চেয়ে দুঃখ চাই আরো তীব্রতর
দুঃখের বিলাসে আমি অতৃপ্তির তীব্র সুরা চাই পাত্র ভরা
যা পেয়েছি সব মিথ্যে—যা কিছু পাবার ছিল তারও চেয়ে বড়
দু'বাহু বন্ধনে যাকে ধরে রাখি, মনে হয় আজও সে অধরা।

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই—বন্দী হয়ে আছি সেই আদিম নেশায়
ভুলে গেছি—এ-জীবনে ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায়।

অনির্দিষ্ট নায়িকা

ফিরে যাবো, শীত শেষে অবিশ্বাসী মরালের মতো
অন্ধকার শুভ্র হলে, ফিরো যাবো, হে সখি নিরালা,
উরসে চন্দন গন্ধ, বিন্দু বিন্দু রক্ত ইতস্তত
তোমার শিশির-স্বাদ মুখ আর দৃষ্টিপাত মালা—
ফেলে আমি চলে যাবো, নির্বাসনে, হে সখি নিরালা।

যৌবন আশ্রিত বুঝি দীর্ঘ ঋজু রাত্রির শরীরে ;
দিনের আলোয় তুমি, ভীরু প্রাণ পতঙ্গের মতো।
আমাকে ডেকেছো তাই স্রোতস্বিনী তমসার তীরে
অসহিষ্ণু বাসনায় নিজেকে ঢেকেছো অবিরত।

দিনের আলোয় তুমি মৃত্যুমুখী পতঙ্গের মতো।

করুণ শয্যায় লগ্ন ঘন নীল তোমার বসন—
সমুদ্র, আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল,
তুলে নাও নতমুখে, লজ্জা ঢাকো, বিচ্ছেদের ক্ষণ
বিষাদের নীল শিখা চক্ষে জ্বালো, তারো সঙ্গে মিল

সমুদ্র আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল।

ফিরে যাবো সব ফেলে দুঃখে, সুখে, হে সখি নিরালা,
শরীরে স্পর্শের স্বাদ মুছে নেবে দিবসের চোখ

জনারণ্য উপহার দেবে শুধু অতৃপ্তির জ্বালা
আবার উষসী এলে ফিরে পাবো বিচ্ছেদের শোক ।

চতুর্দিকে রবে শুধু দিবসের শত তীক্ষ্ণ চোখ ।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

সূচিপত্র

স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র

কোন দিকে ? কোন দিকে ? আমি চিৎকার করলুম
অমনি ভিড়ের ভিতরে
একটা মোহর এসে ছিট্‌কে পড়লো । তৎক্ষণাৎ নৈঋত বাদ দিয়ে
সাতদিকে সাতটা রাস্তা খুলে গেল এবং জ্যোৎস্নায়
বড় চিত্তহারী সেই পথগুলি এবং জ্যোৎস্নায়
ভিড়ের প্রতিটি টুকরো শত শত হুইস্‌ল বাজিয়ে ছুটে গেল
ব্যক্তিগত পথে পথে । কোন দিকে ? কোন দিকে ?
আমি তীব্র ধাবমান
কয়েকটি কলার চেপে হেঁকে উঠি, কি করে জানলেন এইটা ঠিক
পথ ? নাকি যে-কোনো রাস্তায় ?
তাদের উত্তর : পথ ও রাস্তার মধ্যে বহু ভেদ আছে, ইডিয়েট !

পথ কিংবা রাস্তা আমি কোনটায় নামবো বহু ভেবে শেষটায়
পথেই নামলুম । কেননা 'পথিক' এই সুদূর শব্দটি
বড়ই রোমাঞ্চকর । তার বদলে 'রাস্তার লোকটা' ?
পরমুহূর্তেই, হায়, কয়েকশত প্রেমিক ও
কবিদের স্তুতি, উপমার
ভয়ঙ্কর নেকড়েগুলি ছিঁড়ে চুষে খেয়ে ফেললো
আমার শরীর, রক্ত, দু' চোখের মণি ।

মহারাজ, আমি তোমার

মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরনো বালক ভৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? তোমার বুকে হোঁচট পথে
চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি, বেতের মতো গান সয়েছি
দু'হাত নিচে, পা শূন্যে—আমার সেই উদোম নৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ,
চাঁদের আলোয় ?

মহারাজ, আমি তোমার চোখের জলে মাছ ধরেছি
মাছ না মাছি কাঁকুরগাছি, একলা শুয়েও বেঁচে তো আছি
ইষ্টকুটুম টাকডুমাডুম, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ!
অমন তোমার ভালোবাসা, আমার বুকে পাখির বাসা
মহারাজ, তোমার গালে আমি গোলাপ গাছ পুঁতেছি—
প্রাণঠনাঠন ঝাড়লণ্ঠন, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ!

মহারাজ, মা-বাপ তুমি, যত ইচ্ছে বকো মারো
মুঠো ভরা হাওয়ার হাওয়া, তা কেবল তুমিই পারো।
আমি তোমায় চিমটি কাটি, মুখে দিই দুধের বাটি
চোখ থেকে চোখ পড়ে যায়, কোমরে সুড়সুড়ি পায়
তুমি খাও এঁটো থুতু, আমি তোমার রক্ত চাটি
বিলিবিলি খাণ্ডাগুলু বুম্ চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা ধিন্ না উসুখুসু সাকিনা খিনা
মহারাজ, মনে পড়ে না?

অসুখের ছড়া

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না
চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না চোখের আলো মনে পড়ে না
ব্লেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিখ্যাত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল
কত পাখির ডাক থামেনি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
একটা মুখ মনে পড়ে না, মনে পড়ে না মনে পড়ে না।

এত মানুষ ঘুমোয় তবু আমার ঘুমে স্বপ্ন নেই
স্বপ্ন না হয় স্মৃতি না হয় লোভ কিংবা প্রতিহিংসা
যেমন ফুল প্রতিশোধের স্পৃহায় আনে বুকের গন্ধ
রমণী তার বুক দেখায়, ভালোবাসায় বুক ভরে না
শরীর নাকি শরীর চায়, আমার কিছু মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না—মেঘলা মতো বিস্মরণ
যেমন পথ মুখ লুকিয়ে ভিখারিণীর কোলে ঘুমোয়।

বৃক্ষ তোমার মুখ দেখাও, দেখি আকাশ তোমার মুখ
এসো আমার গত জন্ম তোমায় চেনা যায় কি না
কোথাও নেই মুখচ্ছবি এ কী অসম্ভব দৈন্য—
আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি
জানলা ভেঙে ঢোকার বুদ্ধি ঈশ্বরেরও মনে এলো না ?
আমায় কেউ মনে রাখেনি, না ঈশ্বর না প্রতিমা....

হঠাৎ নীরার জন্য

বাস স্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে—দিকচিহ্নহীন—
বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে ? তুমি
আজই কি ফিরেছো ?
স্বপ্নের সমুদ্র সে কি ভয়ঙ্কর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিন দিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মতো দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে গেছে নীল জলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মতো,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো ।

বাসের জানলার পাশে তোমার সহাস্য মুখ, 'আজ যাই,
বাড়িতে আসবেন ।'
রৌদ্রের চিৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল ।
'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরীর মাঠে', বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে-পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম,
রিকশা, লোকজন
ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পৌঁছে গেছি অফিসের লিফ্‌টের দরজায় ।

বাস স্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ ।

আর্কেডিয়া

এই বিকেলটা অন্যরকম জীবন আমার ছিঁড়ে নেবো জমিয়ে
রাখবো বাক্সে
চেনা রাস্তায় ঘুরবো একটা মাঠের মধ্যে বাড়ি আমার
পকেট ভর্তি ঠিকানা
আজকে আমি নত হবো কান্না পেলে লুকোবো না
চাইনে আজ বন্ধুবান্ধব ভাববে ওরা গেছি আমি চাইবাসায়
কিংবা ফরাক্কাবাদ—
ওদের চক্ষু এড়িয়ে আজ পালিয়ে ফিরবো আমি, হাওয়া
তোমায় নাম জানায় কিনা অন্যরকম আর্কেডিয়া

ডবল ডেকার থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে একটা মেয়ের কাছে বলবো
তোমায় আমি ভালোবাসি বিষম ভালো যেমন ভাবে লক্ষ কোটি মানুষ
ভালোবাসে ভালোবাসায়—একটা চুমুর জন্যে মরে ছাদে লুকোয়
বারান্দার কোণে
চোখাচোখির খেলা খেলে—আমিও চাই অমনি না হয় একটা বিকেল
অনাধুনিক হয়েই রইলুম কেইবা দেখছে

পঁচিশ জন্ম আগে আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম
পঁচিশ জন্ম পিছন ফিরে প্রাচীন জন্মে ফিরে এলাম

তুষারমণ্ড ভেড়ার পাল ওরা কেমন খেলে বেড়ায় মেঘলা-করা দুপুরবেলা
পপ্‌লারের বনে শব্দ ঝর্ণা থেকে প্রতিশব্দ ভ্রমর কিংবা ঝর্ণা
বাঁশী কোথায় ? লুকোস না রে দে ভার্জিল চেনা সুরটা বাজাই এক্‌লা—
চতুর্দিকে বাঁশীর গন্ধ আকাশ থেকে বাঁশীর গন্ধ টিলার উপর দাঁড়িয়ে—
এমন শান্ত সমাধিটা আমার, দেখো আমিও ছিলাম আর্কেডিয়ায়
আমিও ছিলাম
দ্যাখ্ ভার্জিল আজও আমায় বাঁশী হাতে মানায় কিনা।

আটাশ বছরে

মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে চোখে চোখে কথা শেষ হয়
তুমি কিংবা আপনি বলবো মনেও পড়ে না
জানলায় বাদুড় এসে হেসে যায় দগ্ধ ভোরবেলায়
বিবাহিতা রমণীরা সিঁড়ির উপর থেকে চকিতে দাঁড়িয়ে
যেন বহু কষ্টে কেনা
মুণ্ডহীন হাসি দিয়ে চলে যায় ঝুল বারান্দায়,
এখন প্রত্যেক দিন দাড়ি না কামালে আর বাঁচে না সম্মান,
রক্তের সমুদ্রে এক দ্বীপ আছে সেখানে স্টিমার ছাড়ে সঠিক দশটায়।

সকালে কলম দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙেছি একটা ভিমরুলের বাসা
বহুক্ষণ একা একা ঘুরে ঘুরে উড়ে গেল করুণ ভিমরুল
(ওদের ললাটে দেখছি শিল্পী মার্কা দুঃখের জড়ুল।)

বিশাখার জন্মদিনে সন্ধেবেলা জমবে এক বিষম তামাশা
সেখানে ভিমরুল-তত্ত্ব জানতে হবে, অথবা হাজির হবো
ছোকরা অধ্যাপকের বাড়িতে
এবং লুকিয়ে আমি সিগারেট জ্বালতে গিয়ে অতিশয় যত্নে সাবধানে
সদ্য কেনা বেডকভার নিশ্চয় পুড়িয়ে আসবো ওর, অতর্কিতে।

স্টোভের শব্দের মতো কি যেন রয়েছে অবিরল এই বুকের মাঝখানে।
তাস খেলতে কৃপা লাগে, বিরলে সময় পোড়ে সিগারেটে শুধু কিছুক্ষণ
জেতায় আনন্দ নেই, হেরে গেলে ক্রোধ আসবে কবে ?
কুমারীরা চিঠি লেখে, আমার হৃদয়ে নেই রক্তের ক্ষরণ
বাথরুমে নগ্ন নারী হঠাৎ দেখলে আর শরীর কাঁপে না
জানলার পুরোনো শিক ভেঙে ভেঙে সুর আসে উদাস মন্ত্রের—
মৃত্যুর অতীব কাছে দিন কাটিয়েছি আমি অনেক উৎসবে।
দুমড়ানো, পায়ের নিচে পড়ে থাকে, পাণ্ডুলিপি, শিয়রে গ্রন্থের
অগোছালো স্তূপ থেকে ভেসে আসে শবের দুর্গন্ধ।

সিঁড়িতে বিষম অন্ধকার, আঃ, ঘড়ির শব্দের মতো এমন কুৎসিত
আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে—অমিত, অমিত !
তোমার বাড়িতে আজ থাকতে দেবে ? চলে যাবো কাল ভোরবেলায়
অতীশ অমল ওরা—লুকিয়েছে সংসারের রুক্ষ ঝামেলায়
পত্নীর স্তনের বোঁটা থেকে ঠোঁট তুলে এনে মধ্যরাতে এখনও অমিত
পুরনো বন্ধুর মুখ তোমারও কি দেখতে সাধ নেই ?

শুধু কবিতার জন্য

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক ;
শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
কবিতার জন্য এত রক্তপাত, মেঘে গাঙ্গেয় প্রপাত
শুধু কবিতার জন্য, আরো দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়।

মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা, শুধু কবিতার
জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।

রাত্রির বর্ণনা

সম্রাজ্ঞী বাইরে আছেন, শেষ রাত্রে গোপনে ফিরবেন
দ্বার খুলে দিও রক্ষী, ঘুমের অপর নাম মৃত্যু, মনে রেখো।
ততক্ষণ দাসীদের সঙ্গে কিছু মস্করায় সময় কাটাতে পারো হয়তো,
রূপসী রমণীদের সব দিতে পারো, শুধু দৃষ্টি বাঁধা দিও না ক্ষণেকও।

পৃথিবী দেওয়ালে ক্ষুদ্র, গুমরে ওঠে বন্দিশালা, কিন্তু দেখো
চোখের তারায়
একটি সহস্রদল নীল পদ্ম ফুটে আছে, রাত্রির আকাশ—
অথবা সমুদ্র বুঝি সহস্র মন্দার পুষ্পে, প্রতীক্ষায়, সজ্জিত রয়েছে
একটি দেবদারু বৃক্ষ চিরকাল একা থেকে শুষে নিচ্ছে পৃথিবীর সুচারু নিশ্বাস।

প্রহরের ঘণ্টা বাজে, হে প্রহরী, রক্তের গমন ধ্বনি কখনো
শুনেছো ?
যারা ঘুমে ঢলে আছে, তারা সব মৃত-রক্তে,
অন্ধকারে মগ্ন থেকে যাবে
তিন বেদনার দীক্ষা নিঃস্ব বাদুড়ের মতো শূন্যপথে দিয়ে যাবে
নির্লিপ্ত ত্রিকাল
তোমার ললাট জ্বলবে নীল শিখায়, দুই চক্ষের রহস্যের
অন্তরাল পাবে।

সম্রাজ্ঞী বাইরে আছেন, শোনো রক্ষী, খুলে দিতে হবে সিংহদ্বার
তক্ষক ইন্দ্রিয়বর্গ যেন না লুকায় ইতস্তত
জীবনের ধৃতি-রূপ তিনটি আদিম দুঃখে শস্ত্রপাণি হয়ে থেকো তুমি
অকস্মাৎ বুঝতে পারবে সব পদপাত শব্দ, শোণিত প্রবাহ অন্তর্গত।

চোখ বাঁধা

অরুন্ধতি, সর্বস্ব আমার
হাঁ করো, আ-আলজিভ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মাণ্ড পাতালে
অরুন্ধতি, আলো হও, আলো করো, আলো, আলো,
অরুন্ধতি, আলো—
চোখের টর্চলাইট নয়, বুকে আলো, অরুন্ধতি, লাইট হাউস হয়ে
দাঁড়াবে না ?

বুকের উপরে দুই পা, ফ্লরোসেন্ট উরুদ্বয়,
মন্দিরের দেয়ালে মাছের
রূপ মনে পড়ে,—কেন এত রূপ ? রূপ বুঝি জন্মান্ধের খাদ্য,
বুঝি মহিষের টুকরো লাল কাপড়—
জলে ডুবে সূর্য স্তব, চোখ বেঁধে প্রণয়ের মতো
অরুন্ধতি, জীবন সর্বস্ব, নাও চোখ নাও, বুক নাও,
ওষ্ঠ নাও, যা তোমার ইচ্ছে তুলে নাও
তুলে নাও, নষ্ট করো, ভাঙো বা ছড়াও, ফেলে দাও, অরুন্ধতি !

যদি ভালোবাসা দাও, অরুন্ধতি, কবিতার পিঠে ছুরি মেরে
সহমরণের ব্রতে চলে যাবো, সেই ভালো, একটা চোখ
ছুঁড়ে দিও জলে—
বড় সাধ ছিল আমি স্বর্গে যাবো, মুখ লুকাবো এমন বুকের
ছায়া আছে আর কোথায়, নেই পৃথিবীর উপবনে, নেই রেখাচিত্রে
মাংসের হরষে
না-লুকানো মুখগুলি বড় ব্যস্ত, বড় উপশিরাময়, যেন ঘোরে
প্রতিশোধে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়,
মহাশূন্যে, সর্বনাশে
আমিও অপ্রেম থেকে ফিরে এসে, অরুন্ধতি, তোমার চোখের
অশ্রুপান করি ।
আমিও পৃথিবী, স্বর্গ, কলেজ স্ট্রীটের মহা অগ্নিকাণ্ড দেখে
শিল্পকে প্রহার করি, ভেঙেচুরে নষ্ট করি, লাথি মেরে নরকে পাঠাই
তোমার শরীর শিল্প, আমার শরীর শিল্প, অরুন্ধতি তোমার আমার ।

বায়ু, তুমি

বায়ু, তুমি আমাকে পবিত্র করো, আমার প্রতিটি রক্ত-কণিকাকে ডাক দাও, ডেকে বলো প্রতিটি বিষণ্ণ জন্ম। ওদের প্রত্যেককে স্নান করিয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে সুগন্ধ দাও—যেন আর কোনোদিন অন্ধকার সিঁড়ির নিচে অতর্কিতে ছুরি হাতে না দাঁড়ায়—।

আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়

যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ, বলে, 'ঐ যে রুগ্‌ণ ফুলগুলি
বাগানে রয়েছে শুধু, এখন বসবেন ?' কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি
আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে, পাতা ঝরানোর হাসি, 'এই অবেলায়
কেন এসেছেন আপনি, কি আছে এখন ? গত বসন্ত মেলায়
সব ফুরিয়েছে, আর আলো নেই, দেখুন না তার ছিঁড়ে গেছে,
সব ঘরে
ধুলো, তালা খুলবে না এ জন্মে ; পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ !'
ভগ্ন কণ্ঠস্বরে
নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ, কেউ কেউ আসবাববিহীন
বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে, মৃত্যু বহু দূর জেনে, চৈত্রের রুক্ষ দিন
চিবুক ত্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তে
ক্লিন্ন হয়ে আছে
বাগানে কুসুমগুলি মৃত, গন্ধহীন, ওরা বাতাসে প্রেতের মতো নাচে।

আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া,
কব্জি শক্তিধর,
অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট, জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ঙ্কর
সেই গুপ্তচর পান্থ আগে এসে ছেঁচে নিলো শেষ রূপ রস—
ক্ষণিক সরাইগুলি, হায় ! এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে,
চোখে, মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স।
আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল,
পথে বড় কষ্ট, তবু ছুটে
এসেও পারি না ধরতে, ততক্ষণে লুট শেষ, দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
ম্লান ওষ্ঠপুটে।

জুয়া

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ,
হাতঘড়ি ও কলম, পকেটবই, রুমাল—
রেডিওতে পাঁচটা বাজলো, আচ্ছা কাল
দেখা হবে,—বিদায় নিলাম,—সন্ধেবেলার রক্তবর্ণ বাতাস ও শেষ
শীতের মধ্যে, একা সিঁড়ি দিয়ে নামবার
সময় মনে পড়লো—ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
এসবও বদলানো দরকার, যেমন মুখভঙ্গি ও দুঃখ, হাসির মুহূর্ত
নিখিলেশ ক্রুদ্ধ ও উদাসীন, এবং কিছুটা ধূর্ত।

হাল্কা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি নিখিলেশ হয়ে বহুদূর
হেঁটে গেলাম, নতুন গোধূলি ও রাত্রি, বাড়ি ও দরজা এমনকি
অন্তঃপুর
ঘুমোবার আগে চুরুট, ঘুমের গভীরতা ও জাগরণ—
ছ' লক্ষ অ্যালার্ম ঘড়ি কলকাতার হিম আস্তরণ
ভাঙার আগেই আমি, অর্থাৎ নিখিলেশ, টেলিফোনে নিখিলেশ
অর্থাৎ সুনীলকে
ডেকে বলি, তুই কি রোজ কণ্ডেন্সড় মিল্কে
চা খেতিস ? বদ গন্ধ, তা হোক ! আমি অর্থাৎ পুরনো সুনীল,
নিখিলেশ এখন,
তোর অর্থাৎ পুরনো নিখিল অর্থাৎ নতুন সুনীলের সিংহাসন
এবং হৃৎপিণ্ড ও শোণিত
পেতে চাই, তোর পুরোনো ভবিষ্যৎ কিংবা আমার নতুন অতীত
তোর নতুন অতীতের মধ্যে, আমার পুরোনো ভবিষ্যতে
(কিংবা তোর ভবিষ্যতে আমার অতীত কোনো পঞ্চম
অতীত ভবিষ্যতে)
কিংবা তোর নিঃসঙ্গতা, আমার না-বেঁচে-থাকা হৈ-হৈ জগতে
দু'রকম স্মৃতি ও বিস্মরণ, যেন স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন বদলের
বীয়ার ও রামের নেশা, বন্ধুহীন, বন্ধু ও দলের
আড়ালে প্রেম ও প্রেমহীনতা, দুঃখ ও দুঃখের মতো অবিশ্বাস
জীবনের তীব্র চুপ, যে রকম মৃতের নিশ্বাস,—
লোভ ও শান্তির মুখোমুখি এসে আমার পূজা ও নারীহত্যা

তোর দিকে, রক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে আমিও অগত্যা
প্রেমিকের দিকে যাবো, স্তনের ওপরে মুখ, মুখ নয়,
ধ্যান ও অস্থিরতা
এক জীবনে, উরুর সামনে উরু, উরু নয়, যোনির সামনে লিঙ্গ,
অশরীরী,
ঘৃণা ও মমতা,
অসম্ভব তাণ্ডব কিংবা চেয়ে দেখা মুহূর্তের রৌদ্রে কোন
কুরূপা অপ্সরী
শীত করলে অন্ধকারে শোবে, দুপুরে হঠাৎ রাস্তায় আমি তোকে
সুনীল সুনীল বলে ডেকে উঠবো, পুরোনো আমার নামে,
দেখতে চাই চোখে
একশো আট পল্লব কাঁপে কিনা, কতটা বাতাস লাগে গালে ও হৃদয়ে
ক'হাজার আলপিন, কত রূপান্তর জন্মে, শোকে পরাজয়ে,
সুখ, সুখ নয় পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না,
মৃত্যু, স্রোতে
আমি, ও আমার মতো, আমার মতো, ও আমি, আমি নয়,
একজীবন দৌড়াতে দৌড়াতে.....

বড় বেশি

বড় বেশি ভালোবাসা দিয়েছিলে চরিত্র দূষিত হয়ে গেল
সেই কারণে
কী করে খরচ করবো সে সম্পদ, অথচ জমিয়ে রাখা
যায় না কিছুতে
পচে যায়, গন্ধ হয়, সমস্ত শরীরে
প্রণয়ের পচা গন্ধ, পাশের চেয়ারে কেউ ঘৃণায় বসে না।

অমন দু'হাত তুলে বুকের উপরে দয়া না দেখালে আরক্ত সন্ধ্যায়
চমৎকার চলে যেতাম আঁধার জগতে ;
ধৈর্যহীন পুরুষের মুখখানি বুকের সংকটে
না রাখাই ছিল ঠিক, কেননা অতলে
ফেরে না চোখের যাত্রা ; শরীর ফুরিয়ে গেলে তবুও চোখের
ভয়ঙ্কর পথখানি অস্থির গর্জন করে নিজস্ব বিভায়

তার বদলে ঘাড় হেঁট করে থাকা যেত অনায়াসে।

প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা

মানুষের মতো চোখ, বিস্ফোরণ, সমাধির মতো শূন্য প্রচ্ছন্ন কপাল
পদচুম্বনের মতো ভালোবাসা ভিতরে রয়েছে
ভালোবাসা তিনশো মাইল দূরে গিয়ে আলিঙ্গন করে
দূর থেকে ভালোবাসা দেখে যেতে লোভ হয়, শরীর লুকোতে চায়
জ্যোৎস্নালোকে, তবুও জ্যোৎস্নায়
স্পষ্ট ছায়া পড়ে এত স্পর্শকাতরতা ।

গোলাপের মতো এক ধানক্ষেত, পুরুষ নামের সব নদী
বড় চেনা লাগে, দুঃখে কোনো পাপ নেই—যত ডুবে যাই ততই ঈশ্বর
মেঘমাশ্লিষ্টসানু পা ছড়ান, সূর্যাস্তের মতো তাঁর দুঃখ এত বড়
অথবা দুঃখের মধ্যে লোভ, কিংবা লোভের ভিতরে মুক্তি, মুক্তির ভিতরে
একজন্ম নিমগ্নতা—

এ যেন গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা, কোথাও বাতাস নেই তবুও গাছের
এক-একটা পালক খসে ; দোকান ঘুমোয়—তবু ভিতরে আলোয়
আধোজাগা স্ত্রীলোকের হাসাহাসি—ওসব দোকানে দিনমানে
স্ত্রীলোক বিক্রীত হয় না—আমি খুব ভালোভাবে জানি ।
অথবা দুপুরে লরি সুরকি ঢালে—সুরকির ভিতরে কোনো স্বপ্ন নেই ?
অমন নরম ওরা, কিশোরীর হাতে ডোবা লাল—যেন রোদ্দুরে হাওয়ায়
বিশাল প্রাসাদ এক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ সুরকি জমা স্তূপে পা ডুবিয়ে—

ঘড়ি চলে কুকুরের মতো শব্দে, অথবা কুকুর ডাকে ঘড়ির মতন
তড়িঘড়ি, আমার নিশ্বাস আরও দ্রুত—যেন বেড়াতে এসেছে—
এর ফাঁকে আমায় কিছু আন্তরিক ছোট ছোট কথা বলে যাবে
টুরিস্ট গাইডের হাসি যতখানি আন্তরিক হয় ;
চারিদিকে দেয়াল বা দেবদারুশ্রেণীর মতো প্রতিদিন দিন
প্রতিটি বিদেশ যেন চুম্বকের ধাতু দিয়ে গড়া
কোথাও আঁধারে আসে তিনটে ছায়া, সেই ছায়াবহ ভয়,
প্রতি মানুষের পবিত্রতা
তবু কোনো কোনো দিন ডাকে, বহু ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ, ইচ্ছে হয় বলি
চুল খোলো, বোতামের শব্দ শুনি, না-খোলা শায়ার মধ্যে হাত
অথবা চোখের জল চোখ থেকে ছেনে নিতে যাই

শীতে অবেলায় আমি, বাতাসে রেণুর মতো কান্না ভাসে, আমার ও
প্রতি মানুষের
মাঝে মাঝে বড় অসহায় লাগে, তখন কোথায় মুখ লুকোবো জানি না ।

শব্দ ১

তখন দরজায় স্পষ্ট শব্দ শোনা যায়, উদ্ভিদের পদশব্দ—
মাতৃজঠরের
ভিতরে শিশুর হাসি, সরল, অথবা দুই প্রতীক্ষিত ঘড়ি
দু'দিকে দেয়াল জোড়া বিপরীত আয়না থেকে বহু লক্ষ ঘরের ভিতরে
পরস্পর কথা বলে, এ ছাড়া সমস্ত দৃশ্য চুপ ।

আমার মুখের মধ্যে জিভ নেই, দাঁত নেই, অধরোষ্ঠহীন, বারান্দায়
শার্ট প্যান্ট শুকোচ্ছে রোদে, গেঞ্জি উড়ে গেছে ডাস্টবিনে
ডাকবাক্সে চিঠি ছিল ভোরবেলা, খালি খামে ডাকটিকিট
ভিতরে শরীর নেই, হাস্যকর, শুয়ে আছে টেবিলে ধুলোয়—
এমন কি মেয়েরাও শব্দহীন, বুকের ভিতরে হাসি, কান্না-ক্রোধ
পোকার মতন
খেলা করছে, টেলিপ্রিন্টারের শব্দে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, মন্ত্রী, বন্যা
থেমে গেছে
ভগ্ন প্রেমিকের ছুরি ঝলসে উঠলে
প্রতি-নায়িকার কণ্ঠে আর্তনাদ নেই
শুধু আছে উদ্ভিদের পদশব্দ, অজাত শিশুর হাসি ; এবং ঘড়ির গূঢ় আলোচনা,
দূরে ফুল ফোটার কলরব, জলাশয়ে মাছের চিৎকার ।

জ্যোৎস্না নিবে গেলে তবু অন্ধকার নেই, আর শব্দ থেমে গেলে
তবু অমোঘ গোলমাল
জেগে থাকে, হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করা ভালোবাসা ঘুমোতে পারে না
কবিতায় । স্বপ্নে, শোকে, কুমারী মেয়ের গন্ধে বিষণ্ণ বাতাস
চতুর্দিকে, সব মানুষের মুখ ভাঁটফুলের মতন অশ্লীল মনে হয় এক সময়,
আমার আত্মায় কোনো ঘড়ি নেই, আয়না নেই, আমার জন্মের শব্দ—
প্রথম দিনের সেই প্রিয় শব্দ মনে আছে, কিংবা মনে নেই ।

সাবধান

আমি সেই মানুষ, আমাকে চেয়ে দ্যাখো
আমি ফিরে এসেছি
আমার কপালে রক্ত ;
বাষ্প-জমা গলায় বাস-ওল্টানো ভাঙা রাস্তা দিয়ে
ফিরে এলাম—

আমি মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসেছি
আমি দাঁড়িয়েছি চালের দোকানের লাইনে
আমার চুলে ভেজাল তেলের গন্ধ
আমার নিশ্বাস—।

রাস্তার একা বাচ্চা ছেলে বমি করলো
আমি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী—
পিছনের দরজায় বস্তাভর্তি টাকা ঘুষ নিচ্ছিল যে লোকটা
আমি তার হত্যার জন্য দায়ী—
আমি পুলিশের বোকামি দেখে প্রকাশ্যে হাসহাসি করবো
আমি নেহরুর উইল সম্পর্কে শুনবো ট্রামের লোকের ইয়ার্কি
চতুর্দিকে স্লোগানের শবযাত্রা দেখে আমার দয়াও হবে না ;
আমি ভয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে জেগে উঠবো মমতায়
আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে নিঃশব্দে মুখ চুম্বন করবো
সশরীরে বিছানায় শুয়ে দু'জনে কাঁদবো নানা ধরনে
পরদিন ঠিকঠাক বেঁচে উঠতে হবে, এই জেনে।

আমার গলা পরিষ্কার, আমি স্পষ্ট করে কথা বলবো
সমস্ত পৃথিবীর মেঘলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে
একজন মানুষ
ক্রোধ ও কান্নার পর স্নান সেরে শুদ্ধভাবে
আমি
আজ উচ্চারণ করবো সেই পরম মন্ত্র
আমাকে বাঁচতে না দিলে এ পৃথিবীও আর বাঁচবে না।

আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ

পরিত্রাণ, তুমি শ্বেত, একটুও ধূসর নও, জোনাকির পিছনে বিদ্যুৎ,
যেমন তোমার চিরকাল
জোনাকির চিরকাল ; স্বর্গ থেকে পতনের পর
তোমার অসুখ হলে ভয় নাই, বহু রাত্রি জাগরণ—প্রাচীন মাটিতে
তুমি শেষ উত্তরাধিকার। একাদশী পার হলে—তোমার নিশ্চিত
পথ্য হবে।

আমার সঙ্গম নয় কুয়াশায় সমুদ্র ও নদী ;
ঐ শব্দ চতুষ্পদ, দ্বিধা, কিছুটা উপরে, সার্থকতা যদি উদাসীন ;
বিপুল তীর্থের পুণ্য—নয় ? সর্বগ্রাস
যেমন জীবন আর জীবনী লেখক।

প্লেনের ভিতরে কান্না এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়িয়ে আনি
একই বুকের মধ্যে।

অপমান এবং নীরাকে উত্তর

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, নীরা, কেন হেসে উঠলে, কেন
সহসা ঘুমের মধ্যে যেন বজ্রপাত, যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, নীরা, হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে কেন সাক্ষী কেন বন্ধু কেন তিনজন কেন ?
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন !

একবার হাত ছুঁয়েছি সাত কি এগারো মাস পরে ঐ হাত
কিছু কৃশ, ঠাণ্ডা বা গরম নয়, অতীতের চেয়ে অলৌকিক
হাসির শব্দের মতো রক্তস্রোত, অত্যন্ত আপন ঐ হাত
সিগারেট না-থাকলে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
সিগারেট না-থাকলে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
মুখ বা চুলের নয়, ঐ হাত ছুঁয়ে আমি সব বুঝি, আমি

দুনিয়ার সব ডাক্তারের চেয়ে বড়, আমি হাত ছুঁয়ে দূরে
ভ্রমর পেয়েছি শব্দে, প্রতিধ্বনি ফুলের শূন্যতা—

ফুলের ? না ফসলের ? বারান্দার নিচে ট্রেন সিটি মারে,
যেন ইয়ার্কির
টিকিট হয়েছে কেনা, আবার বিদেশে যাবো সমুদ্রে বা নদী···
আবার বিদেশে,
ট্রেনের জানলায় বসে ঐ হাত রুমাল ওড়াবে।

রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত
ট্যাক্সি ছুটে যায় স্বর্গে, হো-হো অট্টহাস ভাসে ম্যাজিক নিশীথে
মাথায় একছিটে নেই বাষ্প, চোখে চমৎকার আধো-জাগা ঘুম,
ঘুম ! মনে পড়ে ঘুম, তুমি, ঘুম তুমি, ঘুম, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ঘুম
ঘুমোবার আগে তুমি স্নান করো ? নীরা তুমি, স্বপ্নে যেন এ রকম ছিল····

কিংবা গান ? বাথরুমে আয়না খুব সাঙ্ঘাতিক স্মৃতির মতন,
মনে পড়ে বাস স্টপে ? স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নে—স্বপ্নে, বাস-স্টপে
কোনোদিন দেখা হয়নি, ও সব কবিতা ! আজ যে রকম ঘোর
দুঃখ পাওয়া গেল, অথচ কোথায় দুঃখ, দুঃখের প্রভূত দুঃখ, আহা
মানুষকে ভূতের মতো দুঃখে ধরে, চৌরাস্তায় কোনো দুঃখ নেই, নীরা
বুকের সিন্দুক খুলে আমাকে কিছুটা দুঃখ বুকের সিন্দুক খুলে,যদি হাত ছুঁয়ে
পাওয়া যেত, হাত ছুঁয়ে, ধূসর খাতায় তবে আরেকটি কবিতা
কিংবা দুঃখ-না-থাকার-দুঃখ··· । ভালোবাসা তার চেয়ে বড় নয় !

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে, তোমার নিষ্কৃতি নেই, তোমার গরিমা
একা গোধূলির যূপকাষ্ঠে চলে যাবে, আগুন ও পৃথিবীর দেহ, শব
আগুন ও পৃথিবীর দেহের ভিতরে শব্দ, তুমি নীল শব্দগুলি
হলুদ করেছো
তোমার নিষ্কৃতি নেই, তুমি ভেঙেছিলে ভীল রমণীর প্রগাঢ় তামস—
জ্যোৎস্নায় মাদুর পেতে যারা পিকনিক করে, যারা হাসে,
ধুলো ছোঁড়ে, ধুলো হয়

বিমানপতন কিংবা নেহরুর মুখের ওপর বিস্কুটের গুঁড়ো, ঝোল,
বোতলের চাবি
সবাই নিঃশব্দ ; দশদিকে ন'জন বন্ধু ছুটে যায়, সিল্কের আঁচলে
দেশলাই, তবু কারো
দৃষ্টির উত্থান আগুন ও পৃথিবীর দেহে নয়, শব্দে নয়—মহুয়া ফুলের
ছায়ায় প্রস্রাব করে একজন, একজন প্রণাম করে—তরুণ বৃক্ষটি
দু'জনেরই দিকে হেসেছেন—

তখন কোথায় ছিলে তুমি, কোন্ পাপ ও দুঃখের মতো অদ্ভুত শীতল
সমতটে ? তুমি শব্দ, তুমি হেম, তুমি প্রেত, তুমি মুখশ্রীর
সর্বনাশ কারখানায় লিপ্ত থেকে শুক্র গন্ধ, বুক-ছেঁড়া হাসি ও সূক্ষ্মতা—
তোমার নিষ্কৃতি নেই, মৃত্যুর দ্বিতীয় জন্ম, মৃত্যুর অনেক আয়ু
যেমন গভীর
শৃঙ্খলের পদশব্দ, পরিণতি, কাতর নিশ্বাস অরণ্যের মেঘ থেকে
আসে, যায়, ঘোরে—
শোনে প্রত্যেক কীর্তির ভাঙা গলা, বাতাস অতীব লঘু যেমন শ্মশানে—
শ্মশানও নিবন্ত আজ, চতুর্দিকে পড়ে আছে চণ্ডালের হাড় !

হিমযুগ

শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে...
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে ।

আমার নিশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে স্তুতি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে—
নয় ক্রুদ্ধ যুদ্ধ, ঠোঁটে রক্ত, জঙ্ঘার উত্থান, নয় ভালোবাসা
ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতেরো দিন পরে
অথবা বৎসর কাটে, যুগ, তবু সভ্যতা রয়েছে আজও তেমনি বর্বর
তুমি হও নদীর গর্ভের মতো গভীরতা, ঠাণ্ডা, দেবদূতী
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে ।

মৃত শহরের পাশে জেগে উঠে দেখি আমি প্লেগ, পরমাণু
কিছু নয়,
স্বপ্ন অপছন্দ হলে পুনরায় দেখাবার নিয়ম হয়েছে
মানুষ গিয়েছে মরে, মানুষ রয়েছে আজও বেঁচে
ভুল স্বপ্নে ; শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
তুমি কথা দিয়েছিলে···
এবার তোমার কাছে হয়েছি নিঃশেষে নতজানু
কথা রাখো ! নয় রক্তে অশ্বক্ষুর, স্তনে দাঁত, বাঘের আঁচড় কিংবা
উরুর শীৎকার

মোহমুদ্গরের মতো পাছা আর দুলিও না, তুমি হৃদয় ও শরীরের ভাষ্য
নও, বেশ্যা নও, তুমি শেষবার
পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি, হিমযুগ, কথা দিয়েছিলে তুমি
উদাসীন সঙ্গম শেখাবে ।

ঘুম

শীতের মদিরেক্ষণ আমাদের ওষ্ঠে লেগে আছে,
করতলে ঘুম নামে, ঘুমে উষ্ণ হয়ে আসে ললাট তোমার,
এবার ঘুমোবো আমরা দুইজনে, বসন্তের দেরী নেই আর ।

যদি পাতা ঝরে যায়, যদি ফুল এ বসন্তে একবারও না ফোটে
টেবিলে আলপিন-গাঁথা ছারপোকার মুহুর্মুহু বাঁচার প্রয়াস
যদি থেমে যেতে দেখি, সূর্য তার অন্তিম আগুনে
কিছু ভয় সেঁকে নিতে যদি নীল ফুসফুসের রন্ধ্রেরও ভিতরে লুকোয়
তবু এই মধ্যরাত্রে কিছুক্ষণ আমরা ঘুমোবো দুইজনে,
শীতের মদিরেক্ষণ আমাদের ওষ্ঠে লেগে আছে ।

শেষ যাত্রী

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে, এখন এ প্ল্যাটফর্মে আমরা সকলে
হাঁটু গুঁজে বসে থাকবো, সারারাত আলো জ্বলবে স্থির
শ্মশানযাত্রীর মতো ঘুমচোখে কালহরণের খুব শান্ত কৌতূহলে
কম্বলে শরীর মুড়ে আমরা সব বসে আছি অস্পষ্ট, গম্ভীর।

শেষ ট্রেনে কারা গেল ? আমাদেরই মাসতুতো ও পিসতুতো ভায়েরা,
রাত্রির পোশাক পরে বাঙ্কে চেপে এতক্ষণে ঘুমুচ্ছে আরামে
চিরকাল ঘড়ি বেঁধে ঠিক-ঠিক ট্রেনে চেপে মহা সুখে চলে যাবে এরা
পৃথিবীর সব দ্রব্য অনেক যাচাই করে কিনে নেবে ঠিক-ঠিক দামে।

আমরা সব কটা ট্রেন ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিন প্ল্যাটফর্মে থাকবো এ-ক'জন
পাখির নখের মতো—উপমায় বলতে গেলে—গায়ে বেঁধে শীতের বাতাস,
ঘুরঘুরে পোকার মতো হকারেরা একে-একে লাভের হিসেবে দেয় মন
শহরের গৃহস্থেরা রাত্রির পরম ব্রত এই প্রহরে মানবে বারোমাস।

স্টেশনের কিছু দূরে ব্রিজ, তার নিচে এক রাত্রি-জাগা নদী
শীতল নিশ্বাস নেয়,
আমারও বুকের মধ্যে অন্ধকার জল—
আহা ঠিক এ-সময়ে এক ভাঁড় চা পেতাম যদি !

পাওয়া গেল, টাকার খুচরোয় কিছু ঘাটতি হলো, দু'তিনটে অচল।

নির্বাসন

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধেবেলা কার্জন
পার্কের মধ্যে দিয়ে,—চতুর্দিকে রাজকুমারীর মতো আলো—
হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কম্পানির ঘড়ি ভয় দেখালো

উল্টো দিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেঁট
করা মূর্তি, আমরা চারজন হেঁটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু'পাশের
রঙিন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাসের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, এর সঙ্গে মানায়
মুমূর্ষু নদীর নিশ্বাস, আমরা হেঁটে যাই, আমরা এক ভাঙা কারখানায়
শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে চেয়ে দেখলুম,
ওরাও আমাকে আড়চোখে···
ছোট-বড়ো আলোয় বড়ো ও ছোট ছায়া সমান দূরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইঁদুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না, এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়—

আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়াকে ডাকি, একশো মেয়ের চিৎকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাসি সমেত তিনবার
জেগে উঠে আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম
চেঁচাই খুব জোরে, কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নিলামওয়ালা
'কানাকড়ি', 'কানাকড়ি' হাতুড়ি ঠোকে, একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল,
এখানে কী করছিস ?' আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সবুজ ও লালের
শিহরণ দেখি, দু'হাত উপরে তুলে বিচারক সপ্তর্ষিমণ্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়, 'ওঠ্,বাড়ি চল্, কিংবা বল্
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে ?' গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না, একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলেছিল, দু' চোখ উস্কে
আমি লোকটাকে তদন্ত করি ; পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন
পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে । যেন গহন বন
পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের তীব্রতম প্রশ্ন মুখে তুলে
দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
নীলিমার মতো নিঃস্বতা,—যেন কত চেনা, অথচ মুখ চিনি না, চোখ
চিনি না, ছায়া নেই লোকটার এমন নির্মম, এক জীবনের শোক
বুকে এলো, 'কোথায় লুকিয়েছিস ?' 'জানি না' এ কথা

কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
বারবার প্রশ্ন করে, জানি না কোথায় লুকিয়েছি নীরাকে, অথবা নীরা কোথায়
লুকিয়ে রেখেছে আমায় ! কোথায় হারালো নিখিলেশ, বিদ্যমানতায় পরস্পর
ছায়া ও মূর্তি,···আবার একা হাঁটতে লাগলুম, বহুক্ষণ
কেউ এলো না সঙ্গে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিলেশ,না ভালোবাসা,
শুধু নির্বাসন ।

মুখ দেখাদেখি

তুমি আমার লুকানো মুখ তুলে ধরলে বারান্দার আলোর কাছে
তোমার একটু ভয়ও করলো না ?
দেরাজ খুলে টেনে আনলে পুরোনো চিঠি আলোর কাছে
তোমার একটু ভয়ও করলো না ?
গালে তোমার পাঁচটা আঙুল বসিয়ে দিলুম রাগের আঁচে
তোমার একটু ভয়ও করলো না ?
মুখের দিকে অমনভাবে আরেকবার হাঁ করে তাকালে
আরও পাঁচটা আঙুল পড়বে তোমার ঐ ননীর মতো গালে ।

মুখ লুকোই, মুখ লুকোও, দু'জনে বসি দুই দেয়ালে ফিরিয়ে মুখ
কথা বন্ধ, শব্দ বন্ধ, এখন
বুকের ভিতর চোখ ডুবিয়ে পালিয়ে যাই, বুকের মধ্যে এত অসুখ
কথা বন্ধ, শব্দ বন্ধ, এখন
বুকের মধ্যে তোমার মুখ, তোমার বুকের আরও ভিতরে
আমার মুখ
পরস্পর নিষ্পলক তাকিয়ে আছে কি না
দেখার আগেই কোন্ সাহসে, সুদক্ষিণা
বারান্দার আলোর কাছে অমন দীনহীনার
মতো দেখতে চাইলে আমার এই অনিত্য মুখ ?

মেয়েদের জন্য ভুল ছন্দে

তোমাদের জন্য বড় দুঃখ হয়, মেয়েরা, প্রায় দশ বারো বছর
কবিতার রাজ্য থেকে কবির দল উদ্বাস্তু করেছে তোমাদের,
আগে ছিলে স্বপ্নে কিংবা পার্কে কিংবা অন্ধকারে এবং সহাস্যে
রাশি রাশি কবিতায় ভঙ্গি দিতে
বাঁদিকের একটা ভাঙা পাঁজরার জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে
ছোকরা কবিদের প্রাণ নখে ধরতে, সাইরেনের বাঁশিতে ভুলিয়ে
ওদের মগজে বসে নিজেদের রূপশ্রীর বন্দনা লেখাতে।
হায়, আজ তোমাদের নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যের জন্য বড় দুঃখ হয়।

যদিও সম্প্রতি দেখছি তোমাদের শরীরের বাহার খুলেছে আরও বেশি
চামড়ায় মসৃণ গন্ধ, বুকটুক চমৎকার, দাঁত দেখলে আরও কথা শুনতে
ইচ্ছে হয়
ওষ্ঠাধর ভেজা ভেজা, শীতের দেশের মতো হাসাহাসি পোশাকের নিচে
এসব কিসের জন্য, এই দ্রুত জেগে ওঠা, প্রতীক্ষার তীব্র আক্রমণ?
সন্ধের পরেও বাড়ির বাইরে থাকতে পারো, একা একা সব রাস্তা চেনা
বিবাহের আগেই এই পৃথিবীটা ধ্বংস হবে কিনা ঠিক না জেনে
বায়োলজিকাল ফুর্তি করা চলে, সাতজনের সঙ্গে এক সুরে হল্লা করে
অন্তত সাতটি আত্মা নিয়ে খেলা যায়—মনে হয়, ওদিকে যে সাতজন
বদমাইশ
উনপঞ্চাশ বায়ু পকেটে ভরেছে, ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে
রক্ত খাবে, ফাঁকা ঘর পেলেই করবে বিষম গুণ্ডামি
এবং পরের দিন পড়ন্ত বিকেলে আর বকুল গাছের নিচে দাঁড়াবে না।

প্রেমের ভাষায় খুব উন্নতি হয়েছে এই দু'হাজার বছর চর্চায়
না ভেবেই বলা যায় ঝকঝকে, কে আর বিশ্বাস করে ওসব ইয়ার্কি
কবিতার পাগলামি থামেনি যদিও, আজও নাকি যুবকেরা রক্ত দিয়ে
কবিতায় মাতামাতি করে
সেই রক্তে তোমরা নেই, হায় মেয়েরা, তোমরা বিমানে আছো, মন্ত্রীত্বে বা
আদালতে, সিংহাসনে, বিদেশ মিশনে,
এমনকি ঘরেও আছো, সব সময় আশেপাশে খেতে বসতে শুতে
শুধু কবিতায় নেই, আহা, এ কোথায় চলে এলে নিঃসঙ্গ নির্মম নির্বাসনে!

অবেলায়

আমার নিঃসঙ্গ জাগা ভাঙে না কোথাও ঘুমঘোর
অতিরিক্ত অবিশ্বাস মানুষের পাশাপাশি হাঁটে
মানুষ না প্রতিবিম্ব ? অবিশ্বাস না মায়ার শোক ?
আমার নিঃসঙ্গ জাগা অবেলায় অস্থির ললাটে
গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে ভেসে রয়, অফুরন্ত অলীকের পাশাপাশি হাঁটে ।

জ্বলন্ত জিরাফ

শেষ কবে নারীহত্যা করেছি আমার ব্যক্তিগত স্বর্গে ? বাথরুমে—ছ'মাস আগে, সেই থেকে চোখে ভালো দেখতে পাই না। সাতদিন পর্যন্ত আয়নায় হাসির প্রমাণ লেগে ছিল—এ ছাড়া চোখের জল জমিয়ে রেখেছিলাম বেসিনে। সেই ঠাণ্ডা চোখের জলে রোজ মুখ ধুতাম ও কুলকুচো করেছি জানালা দিয়ে। প্রতিবেশী এসে বিরাট আপত্তি জানালো : এতদিন পেচ্ছাপ করা সহ্য করেছি, তা বলে কি কুলকুচো করাও। তার ছোট বাড়ির রং সাদা ছিল।

পুলিশ এসে বলেছিলো, এই নিয়ে সাতটা খুনের জন্য তুমি মোট তেরোটা ছুরি ভেঙেছো। ইস্পাতের এ-রকম অনটনের দিনে তোমার অমন বিলাসিতা। এর পর থেকে তোমার ঐ খামখেয়ালির জন্য যত খুশি সিল্কের রুমাল বা ধুতরোফল ব্যবহার করতে। কিন্তু ইস্পাতের অপচয়ের মতো বে-আইনি। দু' বছর অন্তত ঘানি ঘোরাতে।—আমার ঘড়ি ছিল না বলে ক'টা বাজে দেখার জন্য আমি মণিবন্ধটা কানের কাছে। রক্ত চলাচলের স্পষ্ট শব্দ ও সময়।

টেলিফোন মিস্ত্রি অভিযোগ জানালো, আমার ঘরে রেডিও নেই কেন। সরমা অনুযোগ করেছিল, আমার ঘরে কোনো ছবি নেই। আমি ওকে টেবিলের সম্পূর্ণ খালি সতেরোটা ড্রয়ার দেখিয়েছিলাম। ও দূরের জ্বলন্ত জিরাফ একেবারে লক্ষ্য করেনি। সেই পাপেই ওর মৃত্যু হলো। দাঁতের ডাক্তার আমার পায়ে ঘা করে দিয়েছিলো বলে আমি আর কখনও সে শুয়ারের বাচ্চা জীবাণুসম্প্রদায়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাইনি। তার বদলে আমি এখন পেচ্ছাপ ও কান্নার সম্পর্ক নিয়ে বই লিখছি। এখন রাত্রি কি দিন চেনা যায় না।

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না
আয়না
ভেঙে
বিচ্ছুরণ
একদিন
বিস্ফোরণ হয়
বুক ভেঙে কান্না এলে কান্নাগুলি ছুটে যায় ধূসর অন্তিমে
স্বর্গের অলিন্দে—
স্বর্গ থেকে
তারপর ঢলে পড়ে
মহিম হালদার স্ট্রীটে
প্রাচীন গহ্বরে
মধ্যরাতে।

জানলা ভেঙে বৃষ্টি এলে বুকে যে রকম পাপ হয়
যে-রকম স্মৃতিহীন মহিম হালদার কিংবা আমি ও মোহিনী
পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রী-শরীর চরিত্র নদীর....
দীপকের মাথাব্যথা হাঁসের পালক ছুঁয়ে হাসাহাসি করে
যে-রকম শান্তিকিনেতন কোনো ত্রিভুবনে নেই
দীপক ও তারাপদ দুই কম্বুকণ্ঠ জেগে রয়....
যে-রকম তারাপদ গান গায় গোটা উপন্যাসে সুর দেয়া
কবিতার লাইন ছুঁড়ে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে ঘুরেছে—
নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরে ও ঘুমোয়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।

আরো নিচে, পাপোশের নিচ এক আহিরীটোলায়
বৃষ্টি পড়ে,
রোদ আসে,
বিড়ালীর সঙ্গে খেলে
বেজন্মা বালিকা—

ছাদে পায়চারী করে গিরগিটি,
শেয়াল ঢুকেছে নীল আলো-জ্বলা ঘরে
রমণী দমন করে বিশাল পুরুষ তবু কবিতার কাছে অসহায়—
থুতু ও পেচ্ছাপ সেরে নর্দমার পাশে বসে কাঁদে—

এ রকম ছবি দেখে বাতাস অসহ্য হয়, বুকের ভিতরে বুক
কশা অভিমানে
শব্দ অপমান করে— ভয় আমাকে নিয়ে যায় পুনরায় দক্ষিণ নগরে
মহিম হালদার স্ট্রীটে ঘুরে ফিরে ঘুরে আমি মহিম, মহিম
বলে ডাকাডাকি করি, কেউ নেই, মহিম, মহিম, এসো তুমি আর
আমি ও মোহিনী
ফের খেলা শুরু করি, মহিম ! মোহিনী !
কোনো সাড়া নেই। ক্রমশ গম্ভীর হয় বাড়িগুলি, আলো
হাড় হিম হয়ে আসে স্মৃতিনষ্ট শীতে।

প্রেমবিহীন

শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ
ঝকমক করে কঠিন সড়ক, আলোয় সাজানো, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে
প্রতীক্ষা আছে আঁধারে লুকানো তবু জানি চিরদিন
এ পথ থাকবে এমনি সাজানো, কেউ আসবে না, জনহীন, প্রেমহীন
শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে।

রূপ দেখে ভুলি কি রূপের বান, তোমার রূপের তুলনা
কে দেবে ? এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও
চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জ্বলে কে বাঁচাবে তবে ? এ হেন সাহস
নেই যে বলবো,যাও ফিরে যাও
প্রেমহীন আমি যাও ফিরে যাও
বটের ভীষণ শিকড়ের মতো শরীরের রস
নিতে লোভ হয়, শরীরে অমন সুষমা খুলো না
চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও !

টেবিলের পাশে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালে, তোমার
বুক দেখা যায়, বুকের মধ্যে বাসনার মতো
রৌদ্রের আভা, বুক জুড়ে শুধু ফুলসম্ভার,—
কপালের নিচে আমার দু' চোখে রক্তের ক্ষত
রক্ত ছেটানো ফুল নিয়ে তুমি কোন্ দেবতার
পূজায় বসবে ? চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও, শত্রু তোমার
সামনে দাঁড়িয়ে, ভীরু জল্লাদ, চক্ষু ফেরাও !

তোমার ও রূপ মূৰ্ছিত করে আমার বাসনা, তবু প্রেমহীন
মায়ায় তোমায় কাননের মতো সাজাবার সাধ, তবু প্রেমহীন
চোখে ও শরীরে এঁকে দিতে চাই নদী মেঘ বন, তবু প্রেমহীন
এক জীবনের ভালোবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি খুব অবহেলায়
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ ।

রাখাল

লাল ও সবুজ আলোর মধ্যে অনন্তকাল
আমি ডাইনে তাকাই পিছন ফিরে অন্ধকার গলিতে
অনন্তকাল পিছনে নয়, ডানদিকে নয়, সবুজ ও লাল—
সুখের মতো ভূবিস্তৃত, উরুদ্বয়ে শোকের মতো, দৃষ্টি থেকে ঘুমের মতো
পেরিয়ে যাই, কুসুম এবং ফলের কাছে বীজের মতো
দীক্ষা নিতে,
মৃত্যু থেকে সঙ্গোপনে শূন্য ঘরে, দ্রাক্ষাবনের
ছাই বাতাস, জ্ঞানী মাথার খুলি, নদীর ভাঙা পাড়ের শুকনো পাতা—
পেরিয়ে যাই মাঝরাতের পাঠশালার হাজার চোখ, ধূসর খাতা,
পেরিয়ে যাই ভূমিকম্প, সুচের সরু গর্ত দিয়ে অনন্তকাল
রেশমী প্যান্ট, কোমরবন্ধ, হাতে চুরুট ; তবু আমায় বলো, 'রাখাল' ।

পৌঁছোনো যাবে না

সিঁড়ির উপর থেকে ছুটে এল অতি দ্রুত মেফিস্টোফিলিস
বিশাল দুই বাহু মেলে তেড়ে বলে উঠলো, সাবধান !
তিন লক্ষ প্রতিধ্বনি যেন বলে উঠলো, সাবধান !
এক পা উপরে গেলে বাঁ হাতের উল্টোদিকে
মারবো তোকে বিষম তুফান
উপরে বৃষ্টিতে শুধু বিষ অহর্নিশ
আমার আয়ত্তাধীন পাতালে গড়িয়ে গেছে অমৃতের ফল

এই কথা শুনে অন্ধকারে এক গোয়েন্দা ঈগল
ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে বসলো টেলিপ্রিন্টারের ঘাড়ে—
নগরীর সব লোক ছুটেছে দুর্জ্ঞেয় পারাবারে
শরীরের রক্তবীজ, যা ছিল প্রেমের মতো শস্তা, অনর্গল
আর জন্ম দেবে না ফসল ।

আমি মধ্যপথে একা ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়িতে, আঁধারে ।
উপরে জানলার কাছে যদি একবার দাঁড়াতাম
ভাঙা আয়নার মতো অসংখ্য রূপসী সেই রুগ্‌ণ মেয়েটির
সমস্ত শরীর ছুঁয়ে, কী জানি সম্পন্ন হতো কিনা মনস্কাম
অথবা মানস নেই, অস্তিত্ব ভাঙার শব্দ প্রতিধ্বনিময় ।

খিদে

কী বিষম দুঃখ এসেছিল আজ ভোরবেলায়, কাঠবাদাম, চকলেট, স্ট্রবেরি
অথবা এগফিলিপ !—তার বদলে পোড়া সিগারেট
বিনা অনুপানে খেয়ে শেষ করলুম, হেমন্ত শিশির
ভুরুতে ও ওষ্ঠে মাখা কত ভালো, কত ভালো তার চেয়েও
প্রাইভেট কবিত্ব !

ফুলের বিছানা পেতে রেখেছিলে, আমি যাবো দু'তিনদিন পরে
হায় রে বাতাস থেকে কোন হাঁস ছেঁচে নেবে ফুলের দুর্গন্ধ ? আমি কাল

মাটিতে লুকোনো বৃষ্টি শুঁকে শুঁকে ছ'জন লোকের
দরজায় গিয়েছিলাম, কেউ জানে না কোন ঘরে ফুলের বিছানা,
কোন দরজার ফুটো চমৎকার খাপ খাবে আমার বসন্তে।

আঁতুড়ে ঘরের পাশে মধু নেই—ত্রিভঙ্গ বুড়ির হাহাকার
আটাশ বছর পার হয়ে এলো, বেলা হলে আটাশ বয়েসী
এই ছ'জন ষণ্ডামার্কা—চোখ বেঁকানো দুপুরের রোদে—
বড় হুলস্থূল করে,—ভোর থেকে না খেয়ে আছি, কিংবা বলা যায়
আজীবন!

তবু বারান্দার থেকে হাতছানি!—এলোচুলে ভ্রমরাক্ষি,—ওহে
সাত লাইন কবিত্ব চাও? নাকি খাওয়াদাওয়া নিয়ে নোনতা আলোচনা
চলতে পারে? ঠোঁট খেতে কেমন লাগে কিংবা বুক, তবে সাফ কথা
আমি কিন্তু নিজের শরীর থেকে কিছুই ঝরাতে চাই না এই দুঃসময়ে।

ছ'জন লোকের মুখ দেখে দেখে পচে গেল চোখ, গেল ফুল
নাক পরিষ্কার করে এক-একবার দুনিয়া কাঁপানো
শ্বাস নিতে ইচ্ছে হয়, ডাক্তারের বরাভয় পেলে সন্দীপন
গরম দুধের সঙ্গে গল্প লিখবে, আমি কার কাছে যাবো, গিয়ে বলবো,
মশায়, চোখের
চামড়াখানা বাদ দিয়ে, বুকের পাঁজর ছেঁচে, রক্ত ধুয়ে, দাঁতগুলো তুলে
আমাকে নতুন একটা লোকের মতন করে দিন না, বেঁচে যাই এ-যাত্রায়।

কয়েক মুহূর্তে

কোনোদ্বিধানেই আমি অসম্ভব ভালোবাসা এইমাত্রতোমারচিবুকে
রেখে এলুম ১১টা১০এ চোখঘুমেযদিঅতনা জড়াতো
পৃথিবীর সবদরজাখুলে আমি অসম্ভব শব্দশুনে অসম্ভব ধবলমিনার
প্রতিনিধিরেখে তুচ্ছএকযৌবনেরপুণ্যফলে
তোমারদ্বিধারমধ্যেচলেযেতাম ভয় নেই ১০৮ চুম্বনের দাগ
থাকবেনাসকালে ওইবুকেরভিতরেমণিচুরিযায়নি
বুকশুধুমুখের গরমে

কিছুক্ষণডুবেছিলযোনিরভিতরেজিভলবণেরস্বাদছাড়াআর
কিছুইআনেনিতবু অসম্ভব ভালোবাসাবাসিহোল অসম্ভব
এইনিয়েতোমাকেআমার
একুশটাপুনর্জন্মদেওয়াহোল এতমৃত্যুমানুষেরওজানাছিল

একটি কবিতা লেখা

প্রতিধ্বনি তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে
কেন ফিরে এলে ?

একদিনে লিখিনি। 'প্রতিধ্বনি' শব্দটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও অবাস্তব ভাবে মাথার মধ্যে কয়েকদিন ঘুরঘুর করতে থাকে। শেষ কবিতা লেখার দেড়মাস পর। কী সাধারণ কথা এই প্রতিধ্বনি, তবু তারও একটা দাবি টের পাই। অসহায়ের মতো আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, তৎক্ষণাৎ কোনো কবিতা লিখতে আমার ইচ্ছে না। কিসের প্রতিধ্বনি তা জানি না। জীবন কাটছে কী রকম—অবিরল দুপুর, বিদেশের চিঠি, পয়সা নেই, সন্ধেবেলা থেকে মধ্যরাত্রি অসম্ভব চোখ বুজে ছোটাছুটি, অপরের কবিতায় ঈর্ষা, পুলিশের প্রতি হাসাহাসি। প্রতিধ্বনিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ খুব দূরে পাঠিয়েছিলাম, নিশ্চিত তা হলে স্বর্গে, আমার ব্যক্তিগত দূত। প্রথম লাইনটা তৈরি হয়ে যায়। যেন প্রতিধ্বনিকে বলেছিলাম, তুমি স্বর্গে যাও, গিয়ে বলো, আমি আসছি।

বাঙ্গুর কলোনি দিয়ে দুপুরে হাঁটছিলুম। পাশের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল হয়তো, আমি দেখিনি। 'কোনো কবিতা লিখছো, সুনীল ?' না, মাত্র একটি লাইন ভেবেছি। অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে নীরেনদা বললেন, 'দাঁড়াও, ওই ছেলেটির একটা বল করা দেখি, তারপর তোমার—।' মাঠের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। একটা রোগা ছেলে বেজির মতো ছুটে এসে হলুদ বাড়ির দেওয়ালের দিকে বাতাপী লেবু ছুঁড়লো। ইম্বল কোথায় ? আমি তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। 'বলো, তোমার লাইনটা।' বলে, আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করি, 'দিকে'র বদলে 'পানে' বসালে কেমন হয় ? স্বর্গের পানে ? 'আমার মনে হয় তোমার 'দিকে'ই বসানো উচিত, কেননা',...আরও কিছু কথা হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে আমি দ্বিতীয় লাইনটা পেয়ে গেছি। **'কেন ফিরে এলে ?'** যেহেতু না ফিরে উপায় নেই।

যেহেতু আমার সময় পূর্ণ হয়নি। প্রতিধ্বনি এখনও পুণ্যগর্ভা হয়নি। পূর্ণ না পুণ্য ? যাই হোক, ও দুটো একই। অর্থাৎ এবার কবিতাটা না লিখে আমার উপায় নেই।

বাড়ি ফিরতে অনেক বেলা হলো। স্নান করে খেয়ে টেবিলে বসবো ভেবেছিলাম। সিগারেট নেই। ভাতের পর সিগারেট না টেনে কবিতা লেখা ? বাইরে সিগারেট কিনতে বেরিয়ে হাতের সামনে একটা বাস পেয়ে কলেজ স্ট্রীট চলে যাই। বিকেল থেকে তারপর অন্ধকার। পরদিন সকালে প্রণবেন্দু ও উৎপল এলো। আমরা তিনজনে মিলে ছ'জন মানুষের গলার আওয়াজ শুনলুম। আর একটু থাকবেন ? না। তুমি এখন বেরুবে ? না। অলিন্দের কবিতাটা লেখা হয়ে গেছে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালকেই কপি করে—। তখনও তৃতীয় লাইনটা পাইনি। দুপুরে দীর্ঘ মিছিলের পিছনে পিছনে মন্থর বাস।

আবার সকালে, চা খাওয়া হলো, প্রচুর সিগারেট হাতে, তন্নতন্ন করে কাগজ পড়াও শেষ হয়েছে। এবার—? এবার মুখোমুখি হতেই হবে। হাতের সামনে প্রথম সাদা কাগজে ঝট্ করে লাইন দুটো লিখে ফেললুম। লিখে অনেকক্ষণ বসে থাকি। তৃতীয় লাইন নেই। যে কোনো কবিতার তৃতীয় লাইনই বোধ হয় সব চেয়ে শক্ত। এভরি থার্ড থট ইজ মাই কিলার,— না, আমি তখন জ্বরের ঘোরের মতন ঐ দুটি লাইন আবার লিখি :

প্রতিধ্বনি,তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে
কেন ফিরে এলে

এবার প্রতিধ্বনির পর একটা কমা দিয়েছি, শেষে জিজ্ঞাসা দিইনি।

এই আমূল নশ্বর, শূন্যমাঘ, শরীরের কাছে—

একটু চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ওই লাইনটা মনে পড়ে। 'আমূল', শব্দটা আমি পাই একটা মাখনের (খালি) টিনের প্রতি চোখ পড়তে। কিন্তু সেই সময় আমি পেচ্ছাপ করতে যাই। সুতরাং, ও শব্দটা বসাতে ইচ্ছে হলো পুরুষের দণ্ড অর্থে। শুধু শরীরই নশ্বর নয়, ও জিনিসটা আরও আগেই নশ্বর যে। 'শূন্যমাঘ' শব্দটা কেন বসিয়েছি, ফ্র্যাঙ্কলি, জানি না।

পবন-পদবী তুমি, প্রতিধ্বনি, শরীর ও রাত্তিরের চোখ মারামারি
তোমার না দেখা ছিল ভালো

পবন-পদবী শব্দ দুটো কি খুব ভারী হয়ে গেল ? হয়তো। লাইনটার গতি ঠিক রাখার জন্য অনায়াসেই হাওয়া বা বাতাস আরূঢ় বসাতে পারতুম। দুটি শব্দেরই

শুরুতে ‘প’, সামান্য একটু ধ্বনি মাধুর্যের লোভে পড়লুম, বুড়ো বয়সে চুরি করে কণ্ডেন্সড্ মিল্ক খাবার মতো, গোপন লোভে ও শব্দ দুটোই রাখা হলো। লিখতে লিখতে হঠাৎই অন্যমনস্ক ভাবে বুধবার রাত্রির কথা মনে পড়ে, অন্ধকার ময়দান, প্রমত্ত বান্ধবদল, ঠাণ্ডা লোহার রেলিংয়ে হেলান দেওয়া সেই কস্তাডুরে লাল রঙের শাড়ী পরা ধরা-মেয়ে, তার পাগলাটে হাসি, শরীরে অদ্ভুত গন্ধ। আমি রাত্রির থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার কবিতায় আনতে চাই, তখনই উপরের লাইনটার শেষ অংশ মাথায় খেলে। পরের লাইনগুলি স্বাভাবিক ভাবেই আসে :

উত্তর সমুদ্র থেকে উড়ে এসেছিল সাদা হাঁস জ্যোৎস্নাময়
তারা নয় বাদামী অসুখ, নয় বুকের ভিতরে রাখা মুখ
মুখের প্রথম গুরু চোখ তার অসম্ভব জোচ্চুরিতে অর্ধেক স্তব্ধতা
জিতে এনে, রানীকে জানাতে চেয়েছিল, বহু রানী ও নারীর কাছে
শিখে এসে অপরূপ উরু ব্যবহার,—
মৃত্যু হাঁটু গেড়ে বসে সে সমস্ত নোট করে গেছে।

কারা বার বার ফিরে আসে ? যেমন জ্যোৎস্নার হাঁস ও মাথাধরা ইত্যাদি। আমার মাথাধরার রং বাদামী। বুকের মধ্যে সবারই একটা গোপন মুখ রাখা আছে। আমি তার চোখ দেখতে পেলাম। চোখ অতিশয় বাচাল, যদি না সে অর্ধেক স্তব্ধতা জয় করে নিতে পারতো। এই সবই তো বলাই বাহুল্য। বস্তুত, আমি নারী লিখতে গিয়ে ভুল করে রানী লিখে ফেলি। তারপর রানীকে কাটতে গিয়ে রাজ-রোষের ভয় হয়। রানী শব্দটা দেখতেও বেশ। রেখে দিই, মনে হয়, সব নারীই তো আসলে রানী। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, না, ঠিক নয়, সব নারী নয়। সুতরাং পরে দুটোকে আবার আলাদা করে সরিয়ে দিতে হয়। মৃত্যুর কথাটা অকারণ খেয়াল। লিখে ফেলেই খুব হাসি পায়। একলা বসে খুক খুক করে হাসি। মৃত্যু আজকাল হয়েছে অবিকল খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো। খাঁটি স্ক্যাণ্ডাল মঙ্গার একটি। যে-কোনো গুজব শুনেই এসে হাজির হয় যখন তখন, সর্দি-কাশি-মাথাধরা টিটেনাস—কিছু একটা হলেই খাটের পাশে এসে দাঁড়াবে। কি রকম হাঁটুগেড়ে বসে শর্টহ্যাণ্ডে নোট নিচ্ছে !

স্পেস্ ! অর্থাৎ আবার বাড়ি থেকে বেরুতে হলো। পরের লাইনগুলি তখন ছায়ামূর্তির মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মাঝরাত্রে জাগ্রত মানুষের ঘরের জানলার ঝিল্লিতে যেমন স্বপ্নেরা অপেক্ষা করে (এই উপমাটা আমার বারবার মাথায় আসে)। ডালহৌসিতে তারাপদ হাত ধরে টেনে রেখেছে, ও ওর ভবিষ্যৎ

জীবনের কিছু কথা জানাতে চায়, কিন্তু আমি তখন আমার গোপন গত জীবন নিয়ে বিষম বিব্রত, হাত ছাড়িয়ে চলতি ট্রামে লাফিয়ে উঠলুম। সকালে প্রণব সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি, যখন হাসপাতালে ডাক্তার আমার ডান হাত থেকে এক সিরিঞ্জ রক্ত টেনে নিচ্ছিল। এক ঘন্টা পর বাড়িতে, প্রথমেই মনে পড়ে, 'তোমাকে বিদায় দিয়ে' ;

তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি পরশয্যায় ঘর্মাক্ত
স্তনের দুধের আঠা, মাসের তিনদিন রক্ত, প্রতিশোধ, ঘুম অন্ধকারে
বিস্মৃতির পদশব্দ, বৃষ্টির মতন দ্রুত পাঁইট, বহু বুকখোলা
হা-হা শব্দে, ভিজে
অতি ঐশ্বরিক কোনো প্রাণীর মতন লিপ্ত হয়েছিলাম, অয়ি প্রতিধ্বনি,
তুমি তো স্বর্গের দিকে—আত্মার সরল শব্দ, মেঘ, মায়া পাহাড়
পেরিয়ে
ঘাই হরিণীর ডাক যেমন সমুদ্র পাড়ে ফেরে…

'ঘাই হরিণীর',—শব্দটা জীবনানন্দের থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, কিন্তু আর উপায় নেই, সময় নেই, অসম্ভব খিদে পেয়েছে। এ কবিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। আজ বিকেলে কথা রাখতে হবে। কিন্তু উঠতে পারছি না, মন বলছে, আর একটা লাইন বাকি আছে, শেষ লাইন। পরপর বিদ্যুতের মতো আঠারোটা লাইন মাথায় এলো, রেলগাড়ির কামরার মতো, একই রকম দেখতে অথচ এক নয়। খিদে-পেটে কী সমস্ত চমৎকার লাইন যে মাথায় আসে, অথচ খেয়ে উঠে তার একটাও মনে থাকে না। কিন্তু ওগুলো এ কবিতার লাইন নয়। একটা পুরোনো লাইনই বারবার দাবি জানাচ্ছে। হ্যাঁ নিশ্চিত, তুমিই এসো :

'কেন ফিরে এলে ?' কেন ফিরে এলে ?

নীরা তোমার কাছে

সিঁড়ির মুখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললো ?
বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে, তুমি তবু দাঁড়িয়ে রইলে সিঁড়িতে
রেলিং-এ দুই হাত ও থুতনি, তোমায় দেখে বলবে না কেউ থির বিজুরি
তোমার রং একটু ময়লা, পদ্ম পাতার থেকে যেন একটু চুরি,
দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো ।

নীরা, তোমায় দেখি আমি সারা বছর মাত্র দু'দিন
দোল ও সরস্বতী পুজোয়—দুটোই খুব রঙের মধ্যে
রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু'দিন—
ও দুটো দিন তুমি আলাদা, ও দুটো দিন তুমি যেমন অন্য নীরা
বাকি তিনশো তেষট্টিবার তোমায় ঘিরে থাকে অন্য প্রহরীরা ।

তুমি আমার মুখ দেখোনি একলা ঘরে, আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, আমরা কেউ বুকের কাছে কখনো
দু'হাত জোড় করে ছুঁইনি শূন্যতা, কেউ বুকের কাছে কখনো
কথা বলিনি পরস্পর, চোখের গন্ধে করিনি চোখ প্রদক্ষিণ—
আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, নীরা তোমায় দেখা আমার মাত্র দু'দিন ।

নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো !
আমি তোমায় লোভ করিনি, আমি তোমায় টান মারিনি সুতোয়
আমি তোমার মন্দিরের মতো শরীরে ঢুকিনি ছল ছুতোয়
রক্তমাখা হাতে তোমায় অবলীলায় নাশ করিনি ;
দোল ও সরস্বতী পুজোয় তোমার সঙ্গে দেখা আমার—সিঁড়ির কাছে
আজকে এমন দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমার কাছে আমি নীরার জন্য রয়ে গেলাম চিরঋণী ।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কি মানুষজন্ম ? নাকি শেষ
পুরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা ! প্রতি সন্ধেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা
করে রক্ত ; আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি—তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে । আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে ; খাঁটি
অন্ধকারে স্ত্রীলোকের খুব মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জ্বেলে—
(ও গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই !)

আমি স্বপ্নের মধ্যে বাবুদের বাড়ির ছেলে
সেজে গেছি রঙ্গালয়ে, পরাগের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যলোক
ঘামে ছিল না এমন গন্ধক
যাতে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারি । নিখিলেশ, তুই একে
কী বলবি ? আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেরেকে
বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর কষ্ট খুব বেশী ছিল কি না ;
আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না ।
আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম,
আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।

নিখিলেশ, আমি এই রকম ভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে
জীবন বদল করে কোনো লাভ হলো না আমার—এ কি নদীর তরঙ্গে
ছেলেবেলার মতো ডুব সাঁতার ?—অথবা চশমা বদলের মতো
কয়েক মিনিট আলোড়ন ? অথবা গভীর রাত্রে সঙ্গমনিরত
দম্পতির পাশে শুয়ে পুনরায় জন্ম ভিক্ষা ? কেননা সময় নেই,
আমার ঘরের
দেয়ালের চুন-ভাঙা দাগটিও বড় প্রিয় । মৃত গাছটির পাশে উত্তরের
হাওয়ায় কিছুটা মায়া লেগে আছে । ভুল নাম, ভুল স্বপ্ন থেকে বাইরে এসে
দেখি উইপোকায় খেয়ে গেছে চিঠির বাণ্ডিল, তবুও অক্লেশে

হলুদকে হলুদ বলে ডাকতে পারি। আমি সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে একবার
একটি মুহূর্ত চেয়েছিলাম, একটি...., ব্যক্তিগত জিরো আওয়ার ;
ইচ্ছে ছিলো না জানাবার
এই বিশেষ কথাটা তোকে। তবু, ক্রমশই বেশি করে আসে শীত, রাত্রে
এ রকম জলচেষ্টা আর কখনও পেতো না, রোজ অন্ধকার হাতড়ে
টের পাই তিনটে ইঁদুর। ইঁদুর নয় মূষিক ? তা হলে কি প্রতীক্ষায়
আছে অদূরেই সংস্কৃত শ্লোক ? পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর এই
অবেলায়
কিছুই মনে পড়ে না। আমার পূজা ও নারী হত্যার ভিতরে
বেজে ওঠে সাইরেন। নিজের দু'হাত যখন নিজেদের ইচ্ছে মতো
কাজ করে
তখন মনে হয় ওরা সত্যিকারের। আজকাল আমার
নিজের চোখ দুটোও মনে হয় এক পলক সত্যি চোখ। এ রকম সত্য
পৃথিবীতে খুব বেশি নেই আর।

স্মৃতির প্রতি

বড় ঠাণ্ডা লাগে স্মৃতি, এ যেন কেমন এক চতুষ্কোণ দ্বীপে শুয়ে থাকা
চতুর্দিকে এক সুবাতাস,
এত প্রজাপতি দেখলে দুর্দিনের জন্য ভয় হয়।
আলো টলমল করে অন্তিম শিয়রে, আরও একটু কম আলো
গোলাপ বাগানে ঝুঁকলে সহনীয় হতো।
কত রাত ঘুম আসেনি, কত রাত ডুবে গেছি বিষম কঠিনতম ঘুমে
কি জানি কেমন তন্দ্রাঘোরে !
জানলার ঝিলমিলিতে অথবা কার্নিসে কত স্বপ্ন গুটি মেরে
প্রতীক্ষায় ছিল, তারা পল্লবে আসন পায়নি, ফিরে গেছে,—আজ
সেই সব না দেখা স্বপ্ন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে চায় ; আঃ !
চতুর্দিকে এত সুবাতাস—
এত প্রজাপতি দেখলে দুর্দিনের জন্য ভয় হয় !

বড় ভয় লাগে ওই ওষ্ঠাধরে অসহ অমিয়
গ্রীবার একটু নিচে নখের আঁচড় দেখলে বজ্রপাত, রক্তবৃষ্টি হয়
হঠাৎ এগারোটায় চকিতের জন্য কেন নীরা তুমি, ফিরে এলে সার্কুলার
রোডে ?
আজ আমি জনতার, আজ আমি পলাতক চতুষ্কোণ দ্বীপে।

তিনজন একসঙ্গে লাইব্রেরির মাঠে বসেছি, তিনজন উনিশ,
এখন সজ্জিত মঞ্চ ঢের ভালো তিন দৃশ্যে তিন হত্যাকারী,
সামান্য পিঁপড়েও আজ রক্ত চেনে, চোখের মণিকে খুব সুখাদ্য জেনেছে,
আমার বোতাম নেই, সেফটিপিন কিনতে গিয়ে হঠাৎ ফুটপাথে হিরণ্ময়
কাঠ হয়ে মরে রইলো, আমি তার আততায়ী,—আমি নয়, আমি ?
আমি নয়, আমি নয়, মুক্তি দাও হিরণ্ময়, জানো, আমি নয় !
যাকে হত্যা করতে চাই,...তারা সব আগে থেকে হঠাৎ ফুটপাথে
ঢলে পড়ে যায়,
এখন আমার ভয় প্রজাপতি ফুলের বাগানে
যারা তার থেকে আরও দূরে আছে তাদের ডাক-নাম ভুলে গেছি।

নিয়তি

নরকের চারপাশে কেমন কেয়ারি করা সুন্দর বাগান
আমরা দু'জনে ওই ফুল-বাগানে
বিকেলে বেড়াতে যাব আজ
হাওয়ায় উড়বে চুল, গুনগুন স্বরে প্রিয় গান
গেয়ে উঠব একসঙ্গে, কৌতুকে চকিত করে নরক-সমাজ।
গোলাপকুঞ্জের পাশে এসো এইখানে একটু বসি
তীব্র ঘন নীল আলো চতুর্দিকে উজ্জ্বল করেছে
তোমার গ্রীবার ভঙ্গি, স্তনের সবল রেখা হঠাৎ আমাকে
করে বিষম সাহসী
দেয়ালের এই পাশে আমরা দু'জনে আছি কি উল্লাসে,
উষ্ণতায় বেঁচে।

কঠিন শাস্তির ঘর থেকে ঐ যে দেখ হিরণ্ময়
চেয়ে আছে আমাদের দিকে,
সুকুমার মূর্তিখানি ছিন্নভিন্ন, চক্ষু থেকে মুছে গেছে
সমস্ত বিস্ময়
গলায় ছুরির দাগ, তবু কি দর্পিত রোখ—আজ মনে হয়
আমারও সমস্ত পাপ আঙুলের নখের প্রতীকে
তোমার চুলের মধ্যে খেলা করে দ্বিধাময় আদরে সম্প্রতি ;
স্বর্গের অপ্সরী হয়ে থাকবে তুমি—
হিরণ্ময় ও আমার সমান নিয়তি ।

না লেখা কবিতা

কুসুমের বুক থেকে ঝরে গেছে সব পবিত্রতা ; এই লাইনটা নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছি । লিখেই মনে পড়ে, না না, আমি বলতে চাই স্ত্রীলোকের শরীর থেকে সব রূপ উবে গেছে । কিন্তু এ কথাটা কিভাবে লিখবো বুঝতে না পেরে, কুসুমের বুক থেকে ঝরে গেছে ইত্যাদি । তখন মনে হয়—কেন, এভাবে ঘুরিয়ে লিখবো কেন, সোজাসুজি লিখবো, আমার কাকে ভয় ? কথাটা কি ভাবে জানাবো ভাবতে বসি । ভাবতে-ভাবতে ঘুম পায়, মনে পড়ে—গড়িয়াহাটের ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে পেত্নীরা শেয়ালের গলার বকলশ্ ধরে বেড়াতে বেরিয়েছি—কলকাতা এই রকম—এ কথাও লিখতে হবে । কিন্তু লেখার সময় আসে কুসুম, রূপের বদলে পবিত্রতা । আমি কুসুম সম্বন্ধে কি জানি ? কিছুই না । পবিত্রতা সম্বন্ধেই বা কী জানি ? তখন মনে হয় স্ত্রীলোকের সব রূপ উবে গেছে তাও কি জানি ? তবে কেন ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটে যাওয়া একটি মেয়ের এক পলক মুখ দেখে এমন প্রেমে পড়ি যে সাতদিন আহারে রুচি থাকে না ? তবে কেন বেলা বারোটায় একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে এমন হঠাৎ অসহ্য কষ্ট হয়েছিল যে মনে হয়েছিল দীনের চেয়ে দীন হয়ে যাই, একবার হাঁটু মুড়ে ভিখারীর মতো ওর হাতের স্পর্শ ভিক্ষে করি । সেইজন্যই কি কবিতাটা লিখতে গেলেই মনে পড়ে অন্য ? নিরীহ কুসুমের প্রতি অকারণ কপট ক্রোধ ? এইসব ভাবতে ভাবতে আমার কিছুই হয় না, বারবার ঘুম আসে । বরং যদি দুটো নিয়েই লিখতাম তবে দুটি কবিতা অন্তত লেখা হতো । না হয় হতোই বা ওরা কন্ট্রাডিক্টারি । তার বদলে খেলো লজিক আমাকে নিয়ে গেল মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতার দিকে ।

ভ্রমণ

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একা, অহঙ্কার অত্যন্ত গম্ভীর
নাকের ক' লক্ষ শিরা কাঁপে যেন ঠোঁট ওল্টায় চিবুক পর্যন্ত
শরীর বিমর্ষ নয়—হাঁসের পালকসম ভারী অনুরাগী
গোধূলির, জলপ্রপাতের, কুচো আমিষের, হলুদ স্বর্গের
চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি যেমন দাঁড়ানো যায় একা
যেমন দাঁড়ানো যায় জলে
পর্বত শিখরে
যেমন হঠাৎ মুখ পাখিদের সঙ্গে উড়ে যায়
মুখহীন চেয়ে থাকা যেমন শৈশব থেকে ভাসে
সিন্দুকের ঝনাৎকার, সীমানা ছাড়িয়ে যায় লক্ষ
বিকেলের ওড়াওড়ি
যেমন দাঁড়ানো যায় একা হিম স্ত্রীলোকের বুকের ভিতরে।

কে যেন স্বর্গের থেকে চ্যুত হয় অহরহ, চ্যুত হয় স্বর্গেরও পরিধি
সটান ভূপৃষ্ঠে নয়, আরো নিচে, পাতাল বা খ্রীস্টান নরকে
নরকে প্রবাসী আছি বহুকাল, চিঠি লিখো,
কেয়ার অব অনুতাপ শাখা
সোনালি সাপের চোখ ডাক পিয়নের মতো উৎকণ্ঠা ওড়ায়
সায়াহ্নের ম্লান যত্ন…ভেঙে যায় চিৎকারের গলা
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে প্রহরী ও সবুজ নিশান
একা বৃষ্টিপাত
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে বহু মুখ,
অন্ধকারে ফুলের উত্থান—

পতনের পদশব্দ হয়
সুনীল সুনীল বলে ডাক দেয় পার্কের রেলিং-এ
মৃত্যু ও মায়ের কণ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে যায়—
আবার হঠাৎ ঘুম ঘুমের ভিতর থেকে ডুবন্ত দ্বীপের
রঙ কিংবা নিবেদন নিয়ে আসে, প্রেতকণ্ঠে সুনীল সুনীল
হিজল বনের পাশে খোলা প্রান্তরের দিকে ভাসে।

জাগরণ কোনোদিনও ক্ষমাশীল নয়, যেন জাগরণ বহু জাগরণ
যেমন নারীর ঘুম শরীরের কলরবে খেলা
যেমন রাত্রির মধ্যে ভিজে পায়ে বাড়ি ফেরা,
অন্ধকারে চোখ ভিজে যায়
ভালোবাসা খুঁজে নেয় ঘাতকের চক্ষু, বুক পেতে দেয়
ছুরির সম্মুখে
কোনো কণ্ঠস্বর কোনো উত্তর জানে না—
স্বর্গ নরকের চেয়ে কতখানি দূরে থাকে কবিতার খাতা ?

অমলের স্ত্রীর জন্য

আমি খুব দূর, দূর দেশ থেকে অলক্ষ্যে বাণ ছুঁড়ি
তুমি কাছে এসে এক কণা কস্তুরী
তুলে নিলে করকমলে
সখী, আজ আর আমাকে বলো না নিষ্ঠুর হতে
আমাকে বলো না অমলের
শবযাত্রায় কাঁধ দিতে, আমি আজ গঙ্গার স্রোতে
থুতু ফেলবো না, দেখো এই মুখ, এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ ?
আমার শরীর, দেখো, চেয়ে দেখো এ কি মনে হয়
বারুদে ভর্তি সিন্দুক ?

দেয়ালের পাশে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
খুব বড়ো ঘর, আধো-নীল কোনো দেয়ালে—
তুমি নও কিছু রূপসী, তোমার চোখ ছোট,
শুধু হঠাৎ কখনও খেয়ালে
হেসে ওঠো পাগলিনীর মতন, একলা ঘরের দেয়ালে—
রোদ এসে পড়ে চিবুকে তোমার দুঃখ জানায়
দুঃখে দেয়ালে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
দুঃখ তোমার গন্ধের মতো ফেটে পড়ে ঐ দেয়ালে—
আমাকে বলো না নিষ্ঠুর হতে, আমাকে বলো না অমলের
মৃত্যু সইতে, মৃত্যু আমায় অসুখ দেয় না কাঁপায় না বুক
সখী, আমি আজ তোমার ও করকমলের
কস্তুরী নোবো, দেখো এই মুখ এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ ?
মৃত্যু আমাকে অমৃত দেয় না কাঁপায় না বুক
আমি আজ কাছে দাঁড়িয়ে দেখবো তোমার অসুখ ।

আমি ও কলকাতা

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
আমি একে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকো বিষ মিশিয়ে খাওয়াবো—
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।

কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়াল কাঁটা
অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে,
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও, এত
উপপতি
তোমার দিনে দুপুরে, উরুতে সম্মতি!
দিল্লীর সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি ? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধেবেলা
প্রখর গরজে
তোমার দু' বাহু চেপে ট্যাক্সিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো—
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো
ক্যামেরা
যদু.....মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে ;
শরীরে অমন বাজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স্থলপদ্ম চাও দুই হাতে ?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে।

কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রীটে লুকোতে পারবে না—
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্র্যাফিক বাতি, দুঃখের বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে

আমার অনুসরণ, বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি ? গঙ্গা থেকে সব কটা জাহাজের মুখগুলো
ফিরিয়ে
অন্ধকার ময়দানে প্রচণ্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার—
তোমার শরীর ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রোণীযুগে জ্বালবো দেশলাই—
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলঙ্কার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ
তবে কে বাঁচাবে ?

অনর্থক নয়

বেয়ারা পাঠিয়ে কারা টাকা তোলে ব্যাঙ্ক থেকে ?
আমি তো নিজের সইটা এখনো চিনি না
বিষম টাকার অভাব ! নেই । শুধু হৃৎপিণ্ডে হাওয়া টেনে নিয়ে
হাসি কুলকুচো করি । মাথায় মুকুট নেই বলে
কেউ ধার দিতেও চায় না ।
কিছু টাকা জমা আছে ব্লাড ব্যাঙ্কে । সামান্য ।
কাঁটা ছাড়ানো মাছের মতন
গদ্য লিখলে ক্যাশ আসে । পারি না । কবিতায় দশ টাকা
তাই বা মন্দ কি, কত দীর্ঘ দিন বন্ধুদের টেবিলে বসিনি ।
কতই তো দিলে বিধি—চোখ, নাক, হাত, ডিগ্রি, জিভ, ঘোরাঘুরি
কয়েকখানা বড়ো সাইজ উপন্যাস শেষ করার সামর্থ্য দিলে না ?

শিল্পের জননী নাকি দুঃখ ? সর্বনাশ, আমার তো কোনো দুঃখ
নেই । খুব গোপনে জানাচ্ছি
(একমাত্র টাকা কিংবা দুঃখ না-থাকার-দুঃখ যদি গণ্য হয় !)
কে কোথায় পায়নি প্রেম, এর সঙ্গী ভোগ করছে ওর সন্ধেবেলা
এসব চমৎকার লাগে ।

কে যেন আমায় কথা দিয়েছিল ! কথা সাঁতরে গেছে অন্ধকারে—
ভয়ঙ্কর জানালা খুলে রাত দুটোয় এক ঝলক আলো এসে পড়ে
মাঝে মাঝে চোখে মুখে। অমনি চেঁচিয়ে উঠি উল্লাসে মুখ তুলে :
বিশ্বাসঘাতিনী ভাগ্যে হয়েছিলে নারী, তাই বেঁচে থাকা এত রোমাঞ্চের !

নেশাফেশা কিছু নেই, দুঃখ নেই, গোপনে চুপচাপ বাঁচতে চাই
তাও কত শক্ত দেখছি, চারবেলা অদ্ভুত চাকরি, ঘুমহীন চোখে
কবিতার আরাধনা
কেন এই আরাধনা ? ওভারটাইম দশ টাকা ?
ছোট ছোট ঝাললঙ্কা কিংবা ঠিক টিনের চিরুনির মতো রোদে
পঞ্চাশটা কাবুলিকে স্বপ্ন দেখে আজ দুপুরে চমকে গেছি ট্রামে।

কোবর্ন স্ট্রীটের মোড়ে বুড়ো দরবেশ চাইলো অমরত্ব খুবই আন্তরিক
কপালে কুষ্ঠের কাদা—তিনটে নয়া পয়সা দিয়ে মানুষের মতো অভিমানে
সংকেতবিহীন কণ্ঠে জানালুম :
যদি রাস্তা চিনতে পারো, যাও হে অনন্তধামে সন্ধের আগেই
ঈশ্বরের পাশে একটি তোমার জন্যেই খালি আসন রয়েছে আমি জানি
পরমুহূর্তেই আমি পাশের পাগলির কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে—
—তিনটে পয়সা দাও ভাই আজ আমাকে,
গাড়ি ভাড়া নেই বহু দূরে যেতে হবে !

মায়ের তোরঙ্গ থেকে সিঁদুরের গুঁড়ো ঝেড়ে আজও
সম্রাট পঞ্চম জর্জ কাটামুণ্ডে সহাস্য বয়ান
যাও মাছের বাজারে ইয়োর ম্যাজেস্টি, পুঁইশাক, সিগারেট, কুমড়োয়
দেখি কতো তোমার মুরোদ ! সব ম্যাজিক ভুলে গেছি—
একত্রিশ তারিখে শুনছি অ্যালয়ের কুশব্দ ইয়ার্কি
এখানে ওখানে নদী—কালো জল, প্রত্যহ স্নান সেরে বহু পবিত্র গণ্ডার
চৌরঙ্গির চতুর্দিকে হুটোপুটি করে—হাসে, মেয়েদের খোলা তলপেটে
সুড়সুড়ি দেয় কিংবা ঠোঁট চাটে, নুন ঝাল মিশিয়ে
প্রথম শীতের এই মনোরম সন্ধ্যাগুলি কাঁটা চামচে দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সুস্বাদে চিবিয়ে খায়। সমস্ত রাস্তাই আজ ভিড়ে ভর্তি ভিড়ে
ভর্তি, অসম্ভব, আমি হঠাৎ কোথায় আজ হারালুম আমার নিজস্ব
গোপন প্রস্থান পথ—এ দুর্দিনে ? ফাটকার বাজারে !

এক সন্ধেবেলা আমি

এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
ঈশ্বর, তোমার ভূমিকম্প এসে মুছে দিল তোমার মহিমা ;
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
ঈশ্বর, তোমার বজ্র তোমাকেই পোড়ালো বীভৎস
ঈশ্বর, তোমার মতো নিরীশ্বর আর কেউ নেই !....

★

নীরা, তুমি অমন সুন্দর মুখে তিনশো জানালা
খুলে হেসেছিলে, দিগন্তের মতন কপালে বাঁকা টিপ,
চোখে কাজল ছিল কি ? না, ছিল না ।
বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ...
কেমন সামান্য হয়ে বসেছিলে, দেড় বছর পর আমি আজও আছি
কত লোভহীন—
পাগলামি ! স্বপ্ন থেকে নেমে দূর বাসস্টপে একা হেঁটে যাই ।...

★

নদীর পাড়ে বসেছিলাম, নদী আমায় কোনো কথাই বলেনি
শুকনো পাহাড় বললো আমায় নদীর কথা—
নারীর কাছে গিয়েছিলাম, নারী আমায় কোনো কথাই বলেনি
ধুলোয় ভরা গ্রন্থ শুধু বললো আমায় নারীর ভাষা ।...

★

'এ বছর আর বন্যা হবে না, ঐ দ্যাখো ব্রিজ, ঐ দ্যাখো বাঁধ—'
কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা,
মরা দামোদর পায়ে হেঁটে এসে ছেলেটা মেয়েটা শক্তিগড়ের
দিকে চলে গেল, কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা ।...

★

আমার ঠাকুরদাদা মন্দিরের পুজুরী ও ঘণ্টা বাজাতেন
ছোটমাসী নামাবলী কেটে ব্লাউজ বানিয়েছেন লো-কাট ;
ছোটমাসী, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে
প্রথম যৌন আনন্দ পেয়েছিলাম ।

একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি

যেন কাল মরে যাবো ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে
গোধূলির দিকে আমি বিদায়ের অস্ত্র তুলে ধরি
গোধূলি কি ফসলের বিবর্তন ? নাকি উল্লুকের
প্রশান্ত নাচের ভঙ্গি ? দুঃখ ঝরে রক্তের মতন, ঝরে যায়
কিংবা রক্ত দুঃখের মতন ? যেন কাল মরে যাবো
ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে আমি গোধূলির কাছে
কালো শিল্প দীক্ষা নিতে আসি ।

থামে না বাতাস, এত দীর্ঘশ্বাস তোমাকে মানায় ?
বলো বলো চুপ করে চেয়ে থাকা কবরের পাশে বসা নয়
মুর্খেরা বিশ্রাম করে ইজেরের ইলাস্টিক খুলে
সুখ
ভাঁড়ারে জমানো আছে, যেমন ফুলের কাছে কাঁচা পয়সা
রোজ ঝনঝনায়
আমি তার চেয়ে ঢের দূরে, আমি প্রত্যেক উত্তর
শেখাই প্রেতের কণ্ঠে, প্রত্যেক অনভিপ্রেত মুখ

গোধূলিকে মান্য করে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দু'একজন
হাসপাতালে মরে,
দু'একজন হাসাহাসি করে যায় বিকেল চারটেয় রেস্তোরাঁয়
অতিশয় চেষ্টা পেলে কোনো কোনো পাখি ডুব দেয়
লবণ সমুদ্রে
এবং ওঠে না ।

কি যেন হয়নি শেষ, ঘুমের আবেশে অন্ধকারে
মনে পড়ে, না মনে পড়ে না, কিংবা মনে পড়া মনের গহ্বর
নারীর লজ্জার মতো খুলে যায়, সন্তর্পণে নিজেকে ঠকিয়ে
দশদিকে চেয়ে দেখি, যেন কেউ হঠাৎ না দেখে, যেন চোখ
বিদায়ের হেমন্তের অপ্রেমের অসুখের বিস্মৃতির ললাট এড়িয়ে
মহিষ বাহন হয়ে ফিরে আসে, হাসে জ্যোৎস্না কপিশ মায়ায়—
মনে কেন এত খুশি—যেন একই বালিশে দু'জনে মাথা রেখে
আমি ও আমার মৃত্যু শুয়ে আছি চুপচাপ, শুয়ে আছি, যেন
একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি।

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
এ কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মুহূর্ত ভাববে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে—তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাশ রেফ্
ও রয়ের ফুট্‌কি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিশ্বাসেরা মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুনিনের বাণের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ঙ্কর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না—আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতিরা আলোর মতো ভদ্র হিম,

শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়

তোমার শিয়রের কাছে যাবে—এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়—তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্ণার জলের মতো
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না—তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা।

চোখ বিষয়ে

আমি তোমাদের কোন্ অনন্ত ছায়ায়
শুয়ে আছি, শুয়ে রবো, আমি তোমাদের
থেকে বহু দূরে তবু ছায়ার ভিতরে
শুয়ে আছি, জেগে আছি, শিয়রে ও পায়ে
ছায়া পড়ে, ছায়া কাঁপে, চোখের ছায়ায়
মাছ খেলা করে, ভাসে, আমি তোমাদের
মাছের মতন চোখে ছায়ার সাঁতারে
তুলে আনি, তোমাদের গোলাপজামের
মতো চোখ ভালোবাসি, মুখে দিই, দাঁতে
'তোমাদের' ভালোবাসাময় চোখগুলি
ভেঙে যায়, মিশে যায়, হেমন্তবেলায়
শিরীষ ফুলের মতো তোমাদের চোখ
আমাকে পালন করে গোধূলি ছায়ায়।

'তোমাদের' শব্দখানি অনেক কুয়াশা
যেমন শব্দের কাছে নীরবতা ঋণী
যেমন নীরব ফুল সব বন্দনার
চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ভ্রষ্ট ফুল যেমন বুকের
কাছে হাত জোড় করে, ছায়ায় শয়ান
ফুল ও বুকের চেয়ে কোমল পাছার
সঙ্গীতের মতো ভঙ্গি যেমন অনেক
দূর মনে হয়, আমি মনের কুয়াশা
'তোমাদের' মুখে রাখি, তোমাদের চোখ
কাজলের মতো লাগে, চোখে চোখে ছুঁয়ে
আমি দেখি, শুয়ে থাকি, যেন বিপুলের
ভিতরে নিঃস্বতা কাঁপে, চঞ্চলতা যেন
ছায়ায় গোপন, মুখ মুখশ্রী লুকোয়—

মুখের ভিতরে চোখ ভাঙে মিশে যায়।

দুপুরে রোদ্দুরে

জ্যোৎস্নার মতো শীতের রোদ, বাসের হ্যাতল ধরে আমি দাঁড়িয়ে
রইলাম, ঋজু, পকেটে পঞ্চাশ, হাওয়া, বুক খোলা, ডানহাতে বইগুলি—
একটা কালো কোটপরা লোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে আমার পা মাড়িয়ে দিয়েই
একজন স্ত্রীলোকের বুকে টোকা মারলো, স্ত্রীলোকটির উরু পর্যন্ত
লাল মোজা, খুবই অন্যমনস্ক দুটি আগ্নেয়গিরি তার বুকে, কাচের
এপাশ থেকে তার মুখ অন্ধকারে নিহত সারসের মতো, সে খুব
দুঃখিত স্বরে বললো, হ্যারিংটন (হু ওয়জ হ্যারিংটন ?) স্ট্রীট, মনে
হল সে সারা সকাল ধরে কেঁদেছে, কেননা তার চূর্ণ চুলে রোদ পড়েছিল, সে
আমাকে দেখতে পায়নি। অদূরে যে থ্যাঁতলানো পায়রাটাকে দেখে আমি
শিউরে
উঠেছিলাম, কালো কোটপরা লোকটির আড়াল থেকে সে তাও দেখতে পেল না
সে বললো, রোক্‌কে।
বাস অনেক দূর এসেছে, সে মরা পায়রাটাকে খুঁজে পাবে না।

রোকোকো কথাটা খুব সুন্দর। যেমন বুকলিক, কিন্তু প্যাস্টোরাল
নয়, একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ তিনশো মাইল দূরে চলে গেল····
এখন হঠাৎ ময়দানে নেমে পড়লে আমি কি ফের রাখাল সেজে বাঁশী
বাজাতে পারবো ? 'ভালোবাসা ছিল ভালোবাসার অনেক আগে'—
লম্বা গাছের মাথার উপরে ক্রেন ঝুঁকে আছে, নিখিলেশ কথা বলছে একটা
মেয়ের সঙ্গে, মেয়েটা পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে মেয়েটা
নিজের শরীরে কথা ঢোকাচ্ছে, আমি চলে যাবার পর এক মুহূর্ত
ওরা চোখ বুজে ছিল, ঋষিদের মতো স্বভাবতই নিখিলেশ চোখ বন্ধ করে
থাকে।

অন্ধকারে লাল গোলাপ আমার ভালো লাগা চলবে না, কেননা
কমলবাবুর আগেই ভালো লেগেছে, কালো পোশাক ইয়েট্‌সের খুব পছন্দ
ছিল, তার চেয়েও খারাপ····দিনের আলোয় কেন ফুটেছিস সাদা ফুল ?

ছাদের টবে পেচ্ছাব করেছিলাম, সেখানে তবু সুন্দর এক ঝাড় বেলফুল
ফুটেছে, না, লোকটা একটুর জন্য চাপা পড়লো না, আশ্চর্য, লোকটার
হাতে একটা ক্যালেন্ডার, ক্ষমা করুন, কে যেন বললো, না, কে যেন বললো,
দয়া করুন, ক্ষমা করুন, না, না, চোপরাও, না, না—অসম্ভব
এমন দয়াহীন, দয়াপ্রার্থী মানুষের বীজাণু আমার কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে
যাক আমি চাই না। আমি বরং রোদ্দুরে একা।

মায়াজাল

দেড় বছর পর অমন চোখ তুলে প্রথম তাকালে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
চৌকো টেবিল, দুপাশে নশ্বর আলোর পদরেখা
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
মুখের পাশে ঘোরে ধূপের গন্ধ, যেমন ছবিময় পারস্য গালিচা
হাসির ভাঙা স্বর, আলতো সন্ধ্যায় দু' গজ দূর থেকে পরস্পর—
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন ?

দরজা বন্ধ ও জানলা খোলা, নাকি জানলা বন্ধ খোলা দরজায়
মানুষ আসে যায়, 'বিদেশ থেকে কবে ফিরলে সুনীল ?'
আমার উত্তরে তোমার জোড়া ভুরু, ঈষৎ চশমায় লাস্য, অথবা
সব রকম কাঁচে ছবিও ফোটে না !
তোমার নামে আনা ছোট্ট উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাই লুকিয়ে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
শুধু ও দুটি চোখ, শুধু ও দুটি চোখ দেখতে এতদূর
ছুটে এলাম ?

ক্লান্তির পর

আমি তোমার অধর থেকে ওষ্ঠ তুলে তাকিয়ে দেখি মুখের দিকে
তুমি তোমার কোনো কথাই রাখোনি
কথা ছিল কি এমন করে কান্না, এমন
চোখের দুই পাশ মুচড়ে তাকানোর ?
কথা ছিল কি বিকেলবেলা ঘড়ির নিচে মায়ার খেলা
আদর পেয়ে মার্জারীর মতো শরীর বাঁকানো ?
হাওয়ায় এখন নদীর মতো শব্দ ওঠে
তিনটি কথা বলতে এসে তোমার ঠোঁটে
চোখের মধ্যে দেখতে পেলাম মনোহরণ ;
এখন আমার দুঃখ হয় না, রাগ হয় না, ঈর্ষা হয় না
এখন তোমার শরীর থেকে ফুলের গয়না
হাওয়ায় দাও ছড়িয়ে, কেউ এসে তোমায় রক্ষা করুক—

তুমি ভেঙেছো দুঃখ দিনের কঠিন পণ
নদীর শব্দ ছাড়িয়ে এখন বেজে উঠলো মেঘের মতো দুই ডমরু।

সখী, এবার স্পষ্ট কথা বলার দিন এসেছে
দু'পাঁচ বছর বাঁচবো কিনা কেউ জানি না—
আমার কথা শীতের দেশের পাখির মতো ঝরে পড়ে
চিঠি পেয়েছি হিয়েরোগ্লিফিক্স্ অক্ষরের স্বরান্তরে
বরফ ফেটে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে জলস্তম্ভ
আমি যখন তোমার বুকে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকি
বৃক্ষ তখন আত্মা পায়, বায়ুতে এসে নিরালম্ব…
ফুলের মধ্যে সূর্যমুখী
ফুটবে আজ দেরিতে খুব, সবুজ ঘরে জ্বলে এখন কমলা আলো
রক্ত আমার অবিশ্বাসী, সন্ধেবেলা দুটো নেশাই লাগলো ভালো
ক্লান্ত মাথা সরিয়ে এনে চোখ রেখেছি তোমার গালে
শরীর খুলে অন্য শরীর, কেন এমন লোভ দেখালে ?
কিছুই বলা হলো না, তুমি কথা রাখোনি, সেই দুঃখে অভিমানে
শ্বাসকষ্ট হলো আমার, চোখেও জল এসেছিল।
চোখ সে কথা ভালোই জানে
আমি
দ্বিধার মধ্যে ডুবে গেলাম !

মৃত্যুদণ্ড

একটা চিল ডেকে উঠলো দুপুর বেলা
বেজে উঠলো, বিদায়,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়,
বিদায়, বিদায় !
ট্রামলাইনে রৌদ্র জ্বলে, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি
হঠাৎ যেন এই পৃথিবী ডেকে দেখালো আমায়
কাঁটা বেঁধানো নগ্ন একটি বুক ;
রূপ গেল সব রূপান্তরে আকাশ হল স্মৃতি
ঘুমের মধ্যে ঘুমন্ত এক চোখের রশ্মি দেখে
অন্ধকারে মুখ লুকালো একটি অন্ধকার।

হঠাৎ যেন বাতাস মেঘ রৌদ্র বৃষ্টি এবং
গলির মোড়ের ঐ বাড়িটা, একটি দুটি পাখি
চলতি ট্রামের অচেনা চোখ, প্রসেশনের নত মুখের শোভা
সমস্বরে ডেকে বললো, তোমায় চিরকালের
বিদায় দিলাম, চিরকালের বিদায় দিলাম, বিদায় ;
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়, বিদায়, বিদায় ।

নীরা ও জীরো আওয়ার

এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে
পরবর্তী অসুখের জন্য বসে থাকা । এখন মাথার কাছে
জানলা নেই, বুক ভরা দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ
দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো
ঠাণ্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা
আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায় ।

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা, অনুবাদ, পাঁচ বছর আগের
শুরু করা উপন্যাস, সংবাদপত্রের জন্য জল-মেশানো
গদ্য থেকে আজ এই সাড়ে দশটায় আমি সব ভেঙেচুরে
উঠে দাঁড়াতে চাই—অন্ধ চোখ, ছোট চুল—ইস্ত্রিকরা পোশাক ও
হাতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে আমি এখন তোমার
বাড়ির সামনে, নীরা থুক্ করে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে
বলি : এই প্রাসাদ একদিন আমি ভেঙে ফেলবো ! এই প্রাসাদে
এক ভারতবর্ষব্যাপী অন্যায় । এখান থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের
উৎস । আমি
ব্রীজের নিচে বসে গম্ভীর আওয়াজ শুনেছি, একদিন
আমূল ভাবে উপড়ে নিতে হবে অপবিত্র সফলতা ।

কবিতায় ছোট দুঃখ, ফিরে গিয়ে দেখেছি বহুবার
আমার নতুন কবিতা এই রকম ভাবে শুরু হয় :

নীরা, তোমায় একটি রঙিন
সাবান উপহার
দিয়েছি শেষবার ;
আমার সাবান ঘুরবে তোমার সারা দেহে ।
বুক পেরিয়ে নাভির কাছে মায়া স্নেহে
আদর করবে, রহস্যময় হাসির শব্দে
ক্ষয়ে যাবে, বলবে তোমার শরীর যেন
অমর না হয়....
অসহ্য ! কলম ছুঁড়ে বেরিয়ে আমি বহুদূর সমুদ্রে
চলে যাই, অন্ধকারে স্নান করি হাঙর-শিশুদের সঙ্গে
ফিরে এসে ঘুম চোখ, টেবিলের ওপাশে দুই বালিকার
মতো নারী, আমি নীল-লোভী তাতার বা কালো ঈশ্বর-খোঁজা
নিগ্রোদের মতো অভিমান করি, অভিমানের স্পষ্ট
শব্দ, আমার চা-মেশানো ভদ্রতা হলুদ হয় !

এখন আমি বন্ধুর সঙ্গে সাহাবাবুদের দোকানে, এখন
বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশন ফুঁড়লে আমার কষ্ট, এখন
আমি প্রবীণ কবির সুন্দর মুখ থেকে লোমশ ভ্রূকুটি
জানু পেতে ভিক্ষা করি, আমার ক্রোধ ও হাহাকার ঘরের
সিলিং ছুঁয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে, এখন সাহেব বাড়ির
পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে, ভালো পোশাক পরার লোভ
সমেত কাদা মাখা পায়ে কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দু'পাটি
দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই, এখানে কেউ আমার
নিম্নশরীরের যন্ত্রণার কথা জানে না । ডিনারের আগে
১৪ মিনিটের ছবিতে হোয়াইট ও ম্যাকডেভিড মহাশূন্যে
উড়ে যায়, উন্মাদ ! উন্মাদ ! এক স্লাইস পৃথিবী দূরে,
সোনার রজ্জুতে
বাঁধা একজন ত্রিশঙ্কু, কিন্তু আমি প্রধান কবিতা
পেয়ে গেছি প্রথমেই, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫....থেকে ক্রমশ শূন্যে
এসে স্তব্ধ অসময়, উল্টোদিকে ফিরে গিয়ে এই সেই মহাশূন্য,
সহস্র সূর্যের বিস্ফোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ওপেনহাইমার
প্রথম এই বিপরীত অঙ্ক শুনেছিল ভগবৎ গীতা আউড়িয়ে ?
কেউ শূন্যে ওঠে কেউ শূন্যে নামে, এই প্রথম আমার মৃত্যু

ও অমরত্বের ভয় কেটে যায়, আমি হেসে বন্দনা করি :
ওঁ শান্তি ! হে বিপরীত সাম্প্রতিক গণিতের বীজ
তুমি ধন্য, তুমি ইয়ার্কি, অজ্ঞান হবার আগে তুমিই সশব্দ
অভ্যুত্থান, তুমি নেশা, তুমি নীরা, তুমিই আমার ব্যক্তিগত
পাপমুক্তি । আমি আজ পৃথিবীর উদ্ধারের যোগ্য ।

বিড়াল

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠলো ধড়মড়িয়ে বিমলা
ও কে গেল, কে পালালো, ও দস্যু,....
মায়ের পাশে শুয়ে ছিল, হঠাৎ কেউ ছিঁড়লো বুকের জামা
সারা শরীর জুড়ে রইলো নখের দাগ, বুকটা অমন গরম
করে গেল
ও কে গেল, কে পালালো, ও দস্যু—
ও কেউ নয়, ভয় পাসনি বিমলা,
ও তো বিড়াল
চুরি করে মাঝরাত্রে দুধ খেয়ে পালালো !

একবার হাসপাতালে যাও

একবার হাসপাতালে যাও সুস্থ একটি আপেলের মতো
শায়িতা মূর্তিরা সব তোমাকে ঠোকরাবে চোখে চোখে
ছিমছাম নার্সেরা ঘুরবে, অবিশ্বস্ত নম্রতায় নত
দৈনিক চাকরির মতো আত্মীয়েরা মুহ্যমান ধরাবাঁধা শোকে ।

কেউ বা যকৃৎরোগী, ফুসফুসে পোকা পুষছে কেউ
মাতাল গোরার হাতে হাড়ভাঙা কোণে একজন
ডেটলের কটুগন্ধ নিয়ে আসে সাময়িক বাতাসের ঢেউ—
এরা সব বেঁচে আছে, সাক্ষী আছে বুকের স্পন্দন ।

তুমি এসে লঘু পায়ে বোসো এক রোগিনীর পাশে
সুস্থ করতল দিয়ে একবার ছুঁয়ে দাও বিবর্ণ শরীর

দুধের অর্ধেক তাকে খেতে দিয়ে সরটুকু ফেলে দাও
অলীক বিশ্বাসে
দুই চক্ষু দিয়ে বলো : চিরদিন এই পৃথিবীর

একজন রোগার্ত থাকবে অন্যজন চিরদিন সুখের প্রতীক।
একজন বিকেলবেলা বহুদূর পথ ভেঙে হাসপাতালে এসে
মাটির মানুষ হয়ে বসে থাকবে, অন্যজন দুই হাতে জানালার শিক
ধরে থাকবে প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষার স্বাদ ভালোবেসে।

তিন ঘণ্টা বিচ্ছেদ

ভালোবাসা ছিল কাল সন্ধেবেলা, এখন দুপুরে একটু বিরক্ত লাগছে
তা হলে মাঝরাত অবধি আমাদের ভালোবাসা থাক না মুলতবি!
কিছুক্ষণ দুজনেই দূরে থাকি,
তুমি যাও ফিল্‌মে কিংবা রেস্তোরাঁয় বা সখী-সম্মেলনে,—
অথবা বাথরুমে গিয়ে গান গাও ;
তিন ঘণ্টা কাটাবো আমি অন্য জায়গায়,
তুমি যাও,
না, চোখে থাকবে না নেশা অথবা ক্লান্ত হবো না
খুব ভালোবাসবো রাত্রে শুয়ে।

এ বাড়ি নিলাম হবে যেন কাল,
এই খাট, আলনা ঠোঁট, বুক আলমারি
যেন কাল থাকবে না—এই ভেবে এ কি মারাত্মক আঁকড়ে থাকা।
শরীরের নোনতা ঘাম, চুম্বনের এঁটো থুতু সারাক্ষণ স্বাস্থ্যকর নয়।
সন্ধ্যার আকাশ থাক,
দেখবো না পথে পথে নতমুখে মানুষের শোভা
একবার তবুও বাইরে ;—নির্বোধ হুল্লোড় এত চতুর্দিকে
এর মধ্যে কিছু কি আনন্দ
খুঁটে তোলা যায় না ? কিংবা দেখা যাক না একলা থাকতে কী রকম লাগে—

কোথাও মানুষ আজ একা নেই,
যেন সাইরেনের শব্দে সকলেই হুড়োহুড়ি করে
এক ঘরে কাটাচ্ছে দিন, বুকের মধ্যেও একটু জায়গা নেই।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে পুনশ্চ সিঁড়ির
উপরে তাকিয়ে দেখি, কোন এক অশরীরী পঙ্গু নিশাচর
হাহাকারে কান ধরে টেনে রাখে ;
সন্ধেবেলা কোথাকার তালাবন্ধ সদর দরজার
সামনে দাঁড়িয়ে আমি ? তা হলে কি ফিরে যাবো
খাটের নিচের নিরালায়
শার্ট প্যান্ট এবং শরীরখানা খুলে রেখে বলে উঠবো আমি :
বহুদিন কথা হয়নি, ঝিনুকের মধ্যে তুমি কী রকম রয়েছো ভ্রমর ?

মালতী

স্বপ্ন ভুল দেখা হলো, তবু এ অন্ধকারে
জেগে ও ঘুমোতে ভালো লাগে, কে বারেবারে
জ্যোৎস্না ফুলের মধ্যে নির্জন মুখ গুঁজে
বসে থাকে ? ভোর রাত্রি যেন আমায় খুঁজে
হাওয়ায় উড়াল দিয়ে এলো চাইবাসায়,
স্বপ্নে বহু কথা হলো ছেকাছেনি ভাষায়
ডাক বাংলোর মাঠে, মালতী অত ভোরে
চোখ বুজে জেগে ছিল, আমি কি ঘুমঘোরে
এক থেকে বহু হই ? তার আঁচল ছিঁড়ে
স্তন ও হৃদয় দেখি আড় চোখে, গভীরে
অবিশ্বস্ত পরিতাপ, চার বন্ধু আমরা
পাঁচ টাকা নিয়ে খেলি।
অনেক রক্তক্ষরা
স্বপ্নের বিষাদে মুখ পরস্পর ফিরিয়ে
শরীরের পাঁচ টাকা দুই মুঠিতে নিয়ে
আমাদের খেলা হয়, হয় না শেষ খেলা
বারবার জেগে উঠি, এদিকে ঢের বেলা।

শব্দ ২

আমায় অনুসরণ করে আঠাশ বছর পেরিয়ে আসা শব্দ
যেন তাকায় অতিকুসীদ, যেন হরণ দাবি করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ ওঁ শব্দ

অতি ক্ষিদেয় খেয়েছিলাম সাতশো বিবেক, শব্দ বললো, 'আমি আছি'
শব্দ আমায় ট্রাম ভাড়া দেয়, বায়োস্কোপে টিকিট কাটে
খুনের রক্তে চোখ ভেসে যায়, দৈবে ঘুরি ঘোর ললাটে
অন্ধকারে মুখ দেখি না মুখের ভয়ে, শব্দ বললো, 'আমি আছি !' ওঁ শব্দ

আঠাশ বছর পবিত্রতার তুক শেখালো, বিনা সুদে আগাম লগ্নী
ওঁ স্বর্ণ ওঁ প্রেম ওঁ বেশ্যা ওঁ মধু ওঁ ভূঃ ওঁ দুঃখ
ওঁ ছায়া ওঁ কাম ওঁ মায়া ওঁ স্বর্গ ওঁ পাপ ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর শিল্প ভেবে হাতে রইলো সবুজ খড়ি
এখন এলাম ঋণের ভয়ে ইস্টিশানে তড়িঘড়ি
কেউ দেখেনি শরীর আমার শরীরীভূত, জ্বলে উঠলো তবু হঠাৎ
নাদ অগ্নি । ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর অনুসরণ যেন হরণ দাবি করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ মৃত্যুশব্দ । ওঁ শব্দ

কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন

আঠাশ বছর কাটলো, মৃত্যুর এখনো দেরী একশো আঠাশ
নদীর ওপারে, শুকনো হাড়ের পাহাড়ে
সব বন্ধুদের ভাঙা কবরখানায় ফুলমালা দীর্ঘশ্বাস
দিয়ে যাবো, পৃথিবীর শেষ শোকসভায়
দেখাবো বিষম ভেল্কি একা ঝুনো হাড়ে ।

হাওয়ায় উড়িয়ে যাবো পাণ্ডুলিপি, শতাব্দীর পাঁশুটে হাওয়ায়
সিগারেট টানতে হলে বইগুলো ছিঁড়ে
চমৎকার জ্বেলে নেবো, একটু বেশী ধোঁয়া হবে, তা হোক, শরীরে
ছারপোকার খুনোখুনি বন্ধ হবে তবুও অন্তত ।
পৃথিবীর গাছগুলি সে-সময় পাতাহীন, ফুলহীন, কিন্তু আপাতত
জেনে নেওয়া যাক তবু, কে তুমি বকুল, শাল কিংবা দেবদারু
মনে রেখো তোমরা, ওহে স্থির
একদিন চরাচর অবশ্যই বিষম বধির
হয়ে যাবে, তখন কে আর কাব্য না খেয়ে না দেয়ে লিখবে
আমাদের মতো
অথবা বিরলে বসে পড়বে-শুনবে, দুঃখ পেতে যাবে ।

এবং অস্থির গাছ লাল নীল হলুদ গোলাপী
কুমারী বা সদ্যোজায়া তোমাদের প্রতি ওষ্ঠপুটে
জানাতে পারিনি প্রেম, কিংবা আহা, তোমাদের শরীরের প্রতি
অঙ্গ খুঁটে
এমন রূপের স্তোত্র আমরা ক'জন এই পুরাতন পাপী
ছাড়া আর কেবা লিখবে ? কেবা দেবে অমরত্ব, আর কেউ দেবে না !
সতত সঞ্চারমানা আজো যারা, কোনোদিন দেখা হয়নি
গৌরী, কৃষ্ণা অথবা শ্যামলী
প্রলয়ের আগে শেষ কথা আমি বলি
ও মসৃণ শোভাগুলি মৃত্যু কিংবা বিবাহের আগে এসে
কবিতার ভিতরে লুকাও
ঠিকানা বা ফোটোগ্রাফ, অথবা অকুণ্ঠে চলে এসো সশরীরে
পৃথিবীর শেষতম কবির দু' চোখ ছুঁয়ে যাও !

'সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী'

ছিলাম বাসনা লঘু, ছন্দ এসে আমাকে সুস্থির হতে বলে
প্রিয় বয়স্যের মতো তার দন্ত পঙ্‌ক্তি
আমি তাকে দূর হয়ে যেতে বলি নতুন বন্ধুর খোঁজে

আমি ছন্দহীন হতে হতে ক্রমশ ধর্মদ্রোহী অগোপন
পাষণ্ড হয়ে যাই।

তবু সে দরজার কাছে মুখ চুন, আমি তাকে পালঙ্কের নিচ থেকে
জুতো মুখে করে আনতে হুকুম করেছি!
দ্বিধা নেই, সে এনেছে, সমালোচকের কানে মেরেছে চপ্পল।

সে আমার হাত ধরে স্ফটিকবর্ণের এক নারীর সান্নিধ্যে
টেনে আনে, মাত্রাহীন আঙুল তুলে নারীকে দেখিয়ে বলে,
সকল ছন্দের মধ্যে এই সে গায়ত্রী, তুমি নাও,
গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে,
পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে
আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে
নিয়ে আসি, উরুদ্বয়ে কিছু কথ্য অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে
খুলে ফেলি আরবের অলঙ্কার, যদিও নিশ্চিত
কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলন প্রত্যাশী।

আমার ছায়া

সতীশের মৃত্যু হলো, জিভ দিয়ে চেটেছিল শ্বেতবর্ণ বিষ।
আমরা সব বেঁচে আছি ঠিকঠাক, কী আশ্চর্য, দেখ হে সতীশ,
ব্যস্ত হয়ে কাজ করছি উদ্ভিদের মতো এক লেবরেটরিতে
রোদ্দুর মেশাচ্ছি দেহে প্রতিদিন, ঝরে যাইনি বর্ষা কিংবা শীতে।
তোমার নবোঢ়া পত্নী কিস্তি হারে শেলাইয়ের কল কিনেছে কাল
দিনরাত ঘর্ঘর শব্দ, টুকরো কাটা ছিটকাপড়, নানান জঞ্জাল
রোজ তাকে ঘিরে থাকবে, সময়ের দাম পাবে গুনে বারোমাস,
আমিও এক-একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে করে বসবো চায়ের ফরমাশ।
একটা হাত টেনে তার রেখা গুনে ভবিষ্যৎ বানাবো নির্ভীক,
কপালে অশেষ দুঃখ! বললে, তুমি টিকটিকির সঙ্গে মিশে বলবে ঠিক ঠিক!

ফোটো হয়ে ঝুলে থাকবে, হ্যা সতীশ, নাকের উপর বসবে মশা
নিতান্ত ডাক্তারি মতে আমি ও তোমার পত্নী করবো শোয়া-বসা।
অধুনা স্বাধীনা নারী আমাকে ছুঁয়েই হয়তো তোমার মৃত্যুর কথা বলবে
একদিন
তোমার জীবন ছিল কী শীতল, মানুষেরই মতো, তবু মনুষ্যত্বহীন।
পিঁপড়ের মতন তুমি জীবনকে খুঁটে-খুঁটে চেয়েছো বাঁচাতে
রমণী-শরীর ঘিরে চামচিকে হয়ে শুধু জেগে উঠতে রাতে।
এই সব কথা শুনে আমিও তখন উঠে দাঁড়াবো আলস্যে, কিছু ক্লান্ত
তেতো মনে।
নিজেকে চিমনির ধোঁয়া মনে হতে পারে হয়তো বাইরের নির্জনে।
দীর্ঘ কালো ছায়া পড়বে স্বল্পালোকে চকচকানো পিচ-বাঁধা পথে
কার ছায়া ? আমারই তো,—বলে আমি মিশে যাবো সশরীরে
অদৃশ্য জগতে।

অসমাপ্ত

মেঘের সঙ্গে কথা বলিনি, তাই বিস্মরণে দুঃখ নেই
পাতা পোড়ানো গন্ধ মনে পড়ে, ছেলেবেলার পাতা পোড়ানো
গন্ধ, কলকাতায় পাতা পোড়ে, গন্ধ পাই না—

কেউ কি ময়দানে গিয়ে গান গেয়ে কুকর্ম করেনি ?
আমি রক্ষী ছিলাম, আমি খাকি পোশাকের মতো মুখে
চুপ করে গাছের পাশে দাঁড়াতে দেখেছি। হাওয়ায়
মেয়েদের নিশ্বাস দু' একজন আলাদাভাবে চিনতে পারতো
এ ছাড়া সিংহাসন
হারানো দুঃখে ভোরবেলা সম্রাটের প্রেত হয়ে যাওয়া
এ ছাড়া সিংহাসন
পেয়ে প্রেতের কলঙ্কহীন সম্রাটের সারারাত্রি জুড়ে।

যৌবন আসতে বড় দীর্ঘ সময় লাগে, প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি
উরু ও জিভের ঘোরতর দ্বন্দ্ব যেদিন শেষ হয়
তার পরেই বিস্মরণ, আগে সাদা মেঘ, আমি মেঘের সঙ্গে
কখনো কথা বলিনি। ময়দানের অন্ধকারে নিজেও খাকি
পোশাকের মতো মুখে দাঁড়িয়েছিলাম, চেয়ে দেখেছি বিরক্তিকর
রাত্রির রাস্তা—বিচার বিভাগীয় তদন্তের মতো নির্বোধ দীর্ঘ।

'তুমি কেমন আছো ? কতদিন দেখিনি তোমাকে—'
এ কথা কেউ শৈশবে শোনে না, শুধু এরই জন্য
অপেক্ষা যৌবনের, অন্ধকারে গাছের পাশে—ভালোবাসা
আসে ও চলে যায়
আমি ঘুমের মধ্যে অনেক ভালোবাসা বেসেছি
ও ভালোবাসা ভেঙে যায়
যারা ভালোবাসে না তারা শরীরে সুখী হয়ে পেনশন পায়
খামের চিঠি নানা ঠিকানায় ঘুরলে কেউ অভিমান করে না
পেটে আগুন জ্বলে, গ্রন্থের পাতা পোড়ে, গন্ধ পাই না।
প্রথম নরক দর্শনের আগে জেগে ওঠে ছেলেবেলার গন্ধ
'তুমি কেমন আছো ? কতদিন দেখিনি তোমাকে—'
হঠাৎ হু হু করে ওঠে, বুক মুচড়ে অসম্ভব দীর্ঘ নিশ্বাস
ছুটে আসে—মনে হয় ব্যর্থ অন্ধকারে দাঁড়ানো—
সন্দীপন অসুখ দেখেছিল, আমি অন্ধকারে অন্ধকার ছাড়া কিছুই
দেখিনি।

দ্বিধা

ভালোবাসা ছিল তাই আমি অত ঘৃণায়
ডুব দিতে ভয় পাইনি
মানুষ মেরেছি রক্ত মোছার আঁচল
সামনেই ছিল, সঞ্জীবনীর আয়না
কে কাকে দেখায়, কার মুখ কার ওষ্ঠ
উষ্ণ ললাট চায় না—

ঘোরে ধাতু, ঘ্রাণ শাসন করেন হেডিস
পাহাড় চূড়ায় দুঃখের কাছে যাইনি
ভালোবাসা ছিল নাকি ঘৃণা ছিল ? এখন
ঠিক মনে নেই, ঠিক যেন মনে পড়ে না ।

বহুদিন পর প্রেমের কবিতা

বুকের ভিতরে যেন মুচড়ে উঠলো একুশে এপ্রিল
একুশে এপ্রিল, ওকি চুলের ভিতরে কার ক্ষীণ বজ্রমুষ্টি ?
বিষম লোভের মধ্যে ছুটোছুটি—দূর শহর, অব্যক্ত মন্দিরে
ব্রীজের অনেক নিচে চাঁদ, আঃ সহ্য হয় না এমন জ্যোৎস্নায়
জলের বিমর্ষ শব্দ, এক আনার টিকিট পেরিয়ে
ওপারে পৌঁছুলে ট্রেন, স্টেশনের একুশে এপ্রিল
রাত্রি দিয়েছিল ।

চোরকাঁটা ভরা মাঠে মরা সাপ, যেও না ডিয়াব
আর ও দিকে, দূরে কাছে কোথাও বা অপর সাপের
অসহবাসের কষ্ট অতি বিষ হয়ে আছে, আমি
মেয়েসাপ বড় ঘৃণা করি···এত চাঁপা ফুল কোথায় ফুটেছে
এমন সতেজ গন্ধ···অথবা কি বী-হাইভ ব্রাণ্ডির ?
কখন খেয়েছো ? আঃ! হোল্ড মি টাইট, আঃ, এমন ধারালো
নোখ রেখো না, উঁ, আ, হুঁ হুঁ উঁ, আঃ, আঃ, আ—
বিষ নেই আমার ঠোঁটে বা জিভে বিষ নেই, মৃত্যু নেই, আ
হোল্ড মি টাইট ডিয়ার,···আমার শরীর নেই কাকে ধরবে, আ—
বিষ দিও না ঠোঁটে, প্লিজ, জরায়ুর মধ্যে একটা বিষপিণ্ড দিও না
আ—উঁ, হুঁ, হুঁ, উঃ, লাগে, লাগে আঃ আরো মারো; আমাকে
নিষ্ঠুর ভাবে মারো !

কে ছিল তোমার সঙ্গে মা শেরি, কে ছিল সেই একুশে এপ্রিল ?
ইংরেজি সোহাগ বাক্য কে বলেছে ? অত ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নারাতে
মানুষ বিষম অন্ধকার হয়
চোখ মুখ চেনা যায় না, ভিজে ঘাসে শরীরে শরীর···
আ আম সিনা, সিনা দা পোয়েট, কে তোমায় বলেছিল ফিসফিসিয়ে, আমি ?
দেখো এই করতল, অবিশ্বাস কত রুক্ষ, এই চোখ দেখে বোঝা যায়
কতদিন পলক ফেলেনি, কলকাতা শহরে কোনো কবি নেই, সবাই পুলিশ
তাই ট্রাফিকের এত গণ্ডগোল, লণ্ঠন জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে কতটা সুবিধে
সকলেই জেনে গেছে,···আমার মাথায় শীত, মাংসের বাজারে
ভয়াবহ নামডাক, সরলতা ছিল সেই সন্ধেবেলা, আজ
আমাকে আবার তুমি ডাক দেবে ? কোথায় নদীর সেই ছলচ্ছল শব্দ, দূরে
বিষণ্ণ মাল্লার গান—সেদিনের কথা ভেবে কেন আজ খুশির বদলে
বুক ভরে কুয়াশায়, চোখ জ্বালা করে ওঠে, যেন একজীবন
গাছের ছায়ায় একা বসে আছি, কোনোদিন নারীর হৃদয়ে
হেলাইনি এই মাথা, বিস্মরণে এত কৃতঘ্নতা,
এবার ফিরিয়ে নাও একুশে এপ্রিল !
এবার ফিরিয়ে দেবো একুশে এপ্রিল আমি, ও মুকুট আমায় মানায় না

হাওয়া এসে

নারী শুধু মুখ লুকোবার জন্য, যখন ঝর্ণায় দেখি মুখ
তখন নারীর কথা মনে পড়ে, হাওয়ায় কার্পাস ফুল ভেসে যায় ;
হলুদ আঁচল মাখা যুবতীর পাশে বসে দেখি ঐ কার্পাসের ওড়াওড়ি ।
নদীর সম্মুখ
ঢেকে গেছে কুয়াশায়, শোনা যায় বন্যা-রোধ কামানের তুড়ি
আঁচল সরিয়ে রাখি বুকে ঠাণ্ডা মুখ—
হাওয়া এসে কার্পাসের মতো নিয়ে যায় গাঙ্গেয় সভ্যতা
'নারীকেও নিয়ে যায়' !

এই হাত ছুঁয়েছিল

আহা রে সোনার মূর্তিও কি অবিরল ঝরে যাবে
রাত্তিরে, রোদ্দুরে, বৃষ্টিপাতে পরপুরুষের হাতে
স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ ? ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাত ছুঁয়েছিল বহু কৃমি, বুকে বাঁধা পাশবালিশ, রক্ত, যেন
রক্তের লালায়
লোভহীন ডুবে মরা, এই হাত ছুঁয়েছিল অশ্রুহীন চোখের চিৎকার
এই হাত ছুঁয়েছিল
এই হাত'
সুড়ঙ্গের মতো গলি, খুচরো টাকা নিয়ে ছুটে বিদ্যুতের মতো···
পিছনে জুতোর শব্দ, ঘুমন্ত আয়নার মুখে সিগারেট, এই হাত !

বুকের ভিতরে কোনো বাষ্প নেই কুয়াশায় অন্ধকারে তবু দেখা হল
পুরোনো সিন্দুকে যেন লুকোনো গিনির মতো ঝলসে উঠলো চোখ
স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ্, ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাতও কেঁপে ওঠে !
ক' কোটি ডাক্তার আছে পৃথিবীতে । পরশুরামের মতো সবগুলোকে মেরে
ওদের রক্তের হ্রদে বেঁচে উঠতে চাই ।
গাছের ছায়ার মতো জ্যোৎস্না এই জ্যোৎস্নার ভিতরে কেউ বেঁচে নেই ।
আকাশের নিচে গাছ, আঁধার পাতার ঝাড়, পাতার ভিতরে স্রোত, সেই
স্রোতের শিরায় নির্মমতা ; আপাতত নির্মমতা আঁচল সরিয়ে
বলে, 'ঐ যে আলো, গেটে দাঁড়ানো মাসতুতো ভাই, আজ তবে যাই ?'

যাও, আর কোনোদিন তুমি একা অন্ধকারে গ্রীবা
এনো না আমার কাছে, যাও, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি
বহুক্ষণ থাকবো, আমি কুকুর আটকাবো, যাও, আজ ভয় নেই
আর কোনোদিন নয় । আজ যাও, ভয় নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছি ॥

নারী ও নগরী

ওকে ডাকো, ডেকে বলো ও যেন অমন ঘুমঘোর
না দেখায় খোলা বুকে, গলিপথ বা নিয়ন আলোকে
এমন ঘুমের মধ্যে নিমন্ত্রণ কেন ? যদিও কলকাতা ঘুম জানে না
তবু সে কি স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে ঘুম শিখবে ঘুঙুর ও
তবলার সঙ্গতে ?

প্রণয় ও রান্না ছাড়া বাকি সব স্ত্রীলোকেরা জানে
সেও বড় কাঁচা জানা, যেমন এ শহরের ড্রেন ও হাইড্র্যান্ট
পয়ঃপ্রণালীর এই এলাহি কাণ্ডকারখানা সেও ঢের দূর
স্ত্রীলোকের প্রণালীর চেয়ে—অন্ধকার ময়দানে একলা গিয়ে
ও কি জানে চুপ করে বসে থাকতে ? কলকাতা অনেক কিছু জানে ।
কখনো বেশ্যার মতো নরম নর্দমা তুলে ধরে বটে, তবু
সে সব ট্রাফিক-জ্যাম ঢের ভালো, সে কি তোমাদের ছেঁড়া
মন দেওয়া-নেওয়

বুকে শুয়ে রামকৃষ্ণ নাম কত উপকারী শরৎ শেখালো
ওকে ডাকো, ডেকে বলো, ধর্ম জীবনের অঙ্গ, ও কিছু জানে না !
ও কি জানে খুনোখুনি—চকিতে ঝলসায় ছুরি রক্তপাত নেই—
জাঙিয়ার বুক পকেট থেকে টাকা কি ভাবে পকেটমারি হয়—
করপোরেশনের ভোটে জরাসন্ধ ছিঁড়ে দুই ফাঁক হয় ফের জুড়ে যায়
চুমু খেতে হলে চাই বিনোবা ভাবের পারমিশান···
এ সব ওর শেখার, ওকে বলো ব্যবসা শিখতে নিমতলায় যাক
অথবা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ঘুরে যাক অ্যাসেম্বলিতে—
গোয়েন্দা গল্পের কারখানায় ।

এবার কবিতা লিখে

এবার কবিতা লিখে আমি একটা রাজপ্রাসাদ বানাবো
এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক গাড়ি
এবার কবিতা লিখে আমি ঠিক রাষ্ট্রপতি না হলেও
ত্রিপাদ ভূমির জন্য রাখবো পা উঁচিয়ে—
মেষপালকের গানে এ পৃথিবী বহুদিন ঋণী !
কবিতা লিখেছি আমি চাই স্কচ, সাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ক
মুরগীর দু'ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়—
কবিতা লিখেছি তাই আমার সহস্র ক্রীতদাসী চাই—
অথবা একটি নারী অগোপন, যাকে আমি প্রকাশ্যে রাস্তায় জানু ধরে…
দয়া চাইতে পারি !

লেভেল ক্রসিংয়ে আমি দাঁড়ালেই শুনতে চাই তোপধ্বনি
এবার কবিতা লিখে আমি আর দাবি ছাড়বো না
নেড়ি কুত্তা হয়ে আমি পায়ের ধুলোর থেকে গড়াগড়ি দিয়ে আসি
হাড় থেকে রক্ত নিংড়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছি, ভিক্ষে চেয়ে মানুষের
চোখ থেকে মনুষ্যত্ব খুলে—
কপালের জ্বর, থুতু শ্লেষ্মা থেকে কবিতার জন্য উঠে এসে
মাতাল চণ্ডাল হয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফের ছাই থেকে উঠে এসে
আমরা একলা ঘরে অসহায়তার মতো হা-হা স্বর থেকে উঠে এসে
কবিতা লেখার সব প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়েছি ।

অচেনা

তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে…
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে…
বাসের অমন ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা
আমাকে এক লাইন কবিতা দিয়ে হঠাৎ নম্র-নেত্রপাতে
বেলগাছিয়ায় নেমে গেল রক্ত গোলাপ হাতে
বাকিটা পথ রইলো শুধু ঘামের গন্ধ, ব্রিজের ধুলো
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে ।

দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন একজন দার্শনিক

যেন তিনটে শীত ঋতু জমলো তাঁর দাঁতের গোড়ায়
আহা উহু ছাড়া অন্য কথাগুলি অর্ধেক সোচ্চার
পঞ্চাশোর্ধ্ব দার্শনিক লম্বমান করুণ শয্যায়
শিয়রের জানলা খোলা, গৃহভৃত্যগুলি সব বেল্লিক নচ্ছার।
সারাদিন লোক আসছে, সম্পাদক, অধ্যাপক, আমি, কিছু
উচ্চিংড়ের মতো ছাত্র, বাল্যবন্ধু প্রবীণ কেরানী
'অনিত্য দেহের মোহ', 'মায়াচক্র' ইত্যাকার
স্বলিখিত পুস্তকের বাণী
চারিদিকে মুখভঙ্গী করে ; আর সুখ, আহা সুখ,
এতদিনে জানা গেল, কোন্ মন্ত্রে ভর করে নির্বোধের বুক !
ভূমার উপমা ছেড়ে ঘুরে ফিরে দাঁতের গোড়ায় যাচ্ছে মন
পৃথিবীর সারবস্তু উষ্ণ জল, বোরিক-কটন !

দু'জনের কাছে ঋণ

একজনের কাছে কিছু ক্ষমা ভিক্ষা আছে, আরেকজনের কাছে প্রতিশোধ
তোমরা দু'জন আজ কোথায় রয়েছো ?
দুই ঋণ
আমি দু'জনের কাছে ঋণী
আমি ক্ষমা চাইবো, আমি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবো।
নতজানু হয়ে বসবো বহু অশ্রুজলে, মাটির মায়ায় দুই হাত
কপালের থেকে কিছু রক্তবিন্দু, ক্ষমা করো, একজীবন যাপন করেছি
আমার বিশ্বাস ছিল, ক্ষমা করো, আমার দর্পিত পদভার
আমার শব্দের প্রতি মায়া ছিল, ক্ষমা করো, ফুল-ছেঁড়া বিকেলে
আমি বারান্দার কাছে—ক্ষমা করো, আমি মধ্যরাত ভেঙে একা
ওষুধের কারখানা লুণ্ঠন করেছি, ক্ষমা করো !
আমি ভিখারির হাত থেকে নিজে ভিখারি হয়েছি
অন্ধ মানুষের পাশে হেঁটেছি চোখ বুজে
স্ত্রীলোকের ইশারায় বহু ভুল অরণ্যে গিয়েছি
আজ নতজানু, ক্ষমা করো, ক্ষমা, কেউ একজন।

আমি প্রতিশোধ নেবো, আমার রক্তের মধ্যে হা-হা শব্দে
আগুন জ্বলেছে
শিরাগুলি টানটান, চোখ জেগে, কেউ একজন, আমি প্রতিশোধ নেবো—
আমার কব্জির পাশে রেখেছিলো নোংরা হাত
আমার বুকের খুব কাছাকাছি ভিয়েৎনাম জাগিয়ে তুলেছে
আমার চোখের দিকে এমন তাচ্ছিল্য চোখে চেয়েছিল
আমার স্বপ্নের মধ্যে বিদায়ের ঘণ্টা বাজিয়েছে
আমি প্রতিশোধ নেবো, ক্ষমা চেয়ে প্রতিহিংসা নিতেও ভুলবো না।

দেখা হবে

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে—
সুগন্ধের সঙ্গ পাবো দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়
আহা কী শীতল স্পর্শ হৃদয়-ললাটে, আহা, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে, চন্দন, চন্দন
আমি বসে থাকবো দীর্ঘ নিরালায়!

প্রথম যৌবনে আমি অনেক ঘুরেছি অন্ধ, শিমুলে জারুলে
লক্ষ লক্ষ মহাদ্রুম, শিরা-উপশিরা নিয়ে জীবনের কত বিজ্ঞাপন
তবুও জীবন জ্বলে, সমস্ত অরণ্য-দেশ জ্বলে ওঠে অশোক আগুনে
আমি চলে যাই দূরে, হরিণের ত্রস্ত পায়ে, বনে বনান্তরে অন্বেষণ।

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে…এতকাল ডাকোনি আমায়
কাঙালের মতো আমি এত একা, তোমার কি মায়া হয়নি,
শোনোনি আমার দীর্ঘশ্বাস?
হৃদয় উন্মুক্ত ছিল, তবুও হৃদয় ভরা এমন প্রবাস!…
আমার দুঃখের দিনে বৃষ্টি এলো, তাই আমি আগুন জ্বেলেছি,
সে কি ভুল?
শুনিনি তোমার ডাক, তাই মেঘমন্দ্র স্বরে গর্জন করেছি, সে কি ভুল?
আমার অনেক ভুল, অরণ্যের একাকীত্ব, অস্থিরতা, ভ্রাম্যমাণ ভুল!

এবার তোমার কাছে…এ অন্য অরণ্য আমি চিনে গেছি

এক মুহূর্তেই

সর্ব অঙ্গে শিহরন, ক্ষণিক ললাট ছুঁয়ে উপহার দাও সেই

অলৌকিক ক্ষণ

তুমি কি অমূল-তরু, স্নিগ্ধজ্যোতি, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে চন্দন, চন্দন
আমার কুঠার দূরে ফেলেদেবো,চলো যাই গভীর গভীরতম বনে ।

বন্দী, জেগে আছো

সূচিপত্র

গহন অরণ্যে

গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
শুকনো পাতার ভাঙা নিশ্বাসের মতো শব্দ
তলতা বাঁশের ছায়া, শালের বল্লরী,
সরু পথ
কালভার্টে, টিলার জঙ্গলে একা বসে থাকা কী রকম নিঝুম বিষণ্ন
বড় হিংস্র দুঃখময়।
অসংখ্য আত্মার মতো লুকোনো পাখি ও প্রাণী, অপার্থিব নির্জনতা
ফুলের সুবর্ণরেখা গন্ধ, সামনে ঢেউ উৎরাই—
অসহিষ্ণু জুতোর ভিতরে বালি, শিরদাঁড়া ব্যথা পেতে দ্বিধা করে
কেননা বুকের মধ্যে চাপা হাওয়া, করতলে মুখ।
গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
তবু যেতে হয়
বারবার ফিরে যেতে হয়।

চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
তুমি আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
কেন তোমার ব্যস্ত ভঙ্গি ?
কেন আমায় এড়িয়ে যাবার চঞ্চলতা !
আমার অনেক কথা ছিল, তোমার জামার বোতাম ঘিরে
অনেক কথা
এই মুখ, এই ভুরুর পাশে চোরা চাহনি,
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
আমি তোমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?

আমরা ছিলাম গাছের ছায়া, ঝড়ের হাওয়ায় ঝড়ের হাওয়া
আমরা ছিলাম দুপুরে রুক্ষ
ছুটি শেষের সমান দুঃখ—
এই দ্যাখো সেই গ্রীবার ক্ষত, এই যে দ্যাখো চেনা আঙুল
এখনো ভুল ?
মনে হয় না তোমার সেই নিরুদ্দেশ সখার মতো ?
কেন তোমার পাংশু চিবুক, কেন তোমার প্রতিরোধের
কঠিন ভঙ্গি
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
শত্রু নই তো, আমরা সেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম নদীর বাঁকে ঘূর্ণিপাকে সন্ধেবেলা
নিষিদ্ধ দেশ, ভাঙা মন্দির, দু'চোখে ধোঁয়া
দেবী মানবীর প্রথম দ্বিধা, প্রথম ছোঁয়া, আমৃত্যু পণ
গোপন গ্রন্থে এক শিহরন, কৈশোরময় তুমুল খেলা···
লুকোচুরি খেলার শেষে কেউ কারুকে খুঁজে পাইনি
দ্যাখো সে মুখ, চোরা চাহনি
একই আয়না
চিনতে পারো না ?

ছায়ার জন্য

গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন কাটিয়েছি
কোনোদিন ধন্যবাদ দিইনি বৃক্ষকে
এখন একটা কোনো প্রতিনিধি বৃক্ষ চাই
যাঁর কাছে সব কৃতজ্ঞতা
সমীপেষু করা যায়।
ভেবেছি অরণ্যে যাব—সমগ্র সমাজ থেকে প্রতিভূ বৃক্ষকে খুঁজে নিতে
সেখানে সমস্তক্ষণ ছায়া
সেখানে ছায়ার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই

যেখানে রক্তিম আলো নির্জনতা ভেদ করে খুঁজে নেয় পথ
মুহূর্তে আড়াল থেকে ছুটে আসে কপিশ হিংস্রতা
গাঢ় অন্ধকার হলে আমি অসতর্ক অসহায়
জানু পেতে বসে বলব,
বহুদিন ছায়ায় কেটেছে এ জীবন—
হে ছায়া, আমারই হাতে তোমার ধ্বংসের মন্ত্র
বুকের ভিতরে ছিল শ্বাস—তার পরিক্রমা ঘূর্ণি দুনিয়ায়
ভূতলে অশুভ শব্দ, আঁচের মতন লাগে পাতার বীজন—
তবু শেষবার
পুরোনো কালের মতো বন্ধু বলে ডাকো
বল্কল বসন দাও, দাও রসসিক্ত ফল, দ্বিধাহীন হয়ে একটু শুয়ে থাকি
শেষ প্রহরের আগে
এই হত্যাকারী হাতে শেষবার প্রণাম জানাই।

দুটি অভিশাপ

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
প্রবল ঢেউ-এর মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
সমুদ্রের অভিশাপ।

মেল ট্রেনের গায়ে আমি খড়ি দিয়ে এঁকেছিলাম
নারীর মুখ
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
এমনকি, সেই নারীরও চোখের তারা আঁকা ছিল না
এক স্টেশন পার হবার আগেই বৃষ্টি, প্রবল বৃষ্টি
হয়তো বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়েছিল আমার খড়ির শিল্প
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
মেল ট্রেনের অভিশাপ।

প্রতিদিন পথ চলা কি পথের বুকে পদাঘাত ?
নারীর বুকে দাঁত বসানো কি শারীরিক আক্রমণ ?
শীতের সকালে খেজুর-রস খেতে ভালো-লাগা
কি শোষক সমাজের প্রতিনিধি হওয়া ?
প্রথম শৈশবে সরস্বতী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করা কি পাপ ?
এসব বিষয়ে আমি মনস্থির করতে পারিনি
কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাই
সমুদ্র ও মেল ট্রেনের অভিশাপ !

একদিন…

একদিন তোমার হাত ধরে জয়পুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াবো,
অসমাপ্ত পাহাড়কে বলবো, আমরা এসেছি।
একটা শুকনো নদীর গর্ভে নেমে গিয়ে মরা ঝাঁঝি
হাতে তুলে নিয়ে বলবো, মনে আছে
ঝাড়লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আলোর মতন আনন্দ খেলা করবে শরীরে।
কোনোদিন জয়পুর যাইনি, কিন্তু জানি কোথায় জয়পুর আছে—
চিনতে আমার ভুল হবে না !
ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটা ভয়হীন মিনারে ঠেস দিয়ে
হাওয়া থেকে আঁচল ফিরিয়ে আনবে তুমি
তোমার মকরমুখো সুবর্ণ কঙ্কণে রিনিঝিনি শব্দ উঠলে
আমি লীয়মান সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে বলবো,
এবার অম্বা মন্দিরে ঠিক সাতটা ঘণ্টা বাজবে
শুধু শব্দ নয়, তার প্রতিধ্বনি, শুধু অর্জন নয়, তার উপহার
ফিরে আসবে তখন, কে যেন বলবে, জানতাম !
মর্মরে প্রতিফলিত মুখশ্রী প্রশ্ন করবে, সত্যি, সব মনে আছে ?
আমি সবকটা বোতাম খুলে হেসে বলবো,
বাঃ, জলের ধারে বসে থাকার ছবি কখনো মুছে যায় ?
প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘ—এইরকম দুঃখহীন খুশির মধ্যে
হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে শুনতে পাবো
রাজপুতানীদের মান-ভাঙার গান

কেউ উচ্চারণ করবে না, তবুও সবাই বলবে,
আঃ, কি সুন্দর বেঁচে আছি, উড়বে লাল রঙের ধুলো
এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত মৃতেরাও জেগে উঠে ধন্যবাদ দিয়ে যাবে
পাথুরে সবল রাস্তা যেখানে বাঁক ঘুরে ঢালু হয়ে নেমেছে
সেখানে আমরা থমকে দাঁড়ালে ভেসে আসবে তরতাজা দৃশ্যের ঘ্রাণ
ময়ূরের আত্মীয়ের মতন সন্ধ্যা অকস্মাৎ উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করবে :
এই নাও, আজ এই জয়পুর তোমাদের ।

অনন্ত মুহূর্ত

মধ্যাহ্ন-বাগানে এসে ঝুঁকে আছে সাতফুট আলো
আমি জানি
ওখানে শয়তান দাঁড়িয়ে নেই ।
আমার বাঁ পাশে একটি বাজে পোড়া আমলকী বৃক্ষ
তাকে আমি গোপনে হিন্তাল বলে ডাকি
তার নিচে অতি স্বচ্ছ দর্পণ গোষ্পদ
ওখানে অপ্সরীরা খেলা করে না
সাতফুট স্থির আলো, আমি জানি
ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই ।

এখন সকালবেলা অপরাংশে মেঘ ছায়া মেঘ
পাগলাটে একদল পাখি ঝগড়া করে মাটিতে লুটোয়
ফের উড়ে যায়, ওরা
নিহত আমলকী গাছে কখনো বসে না
লাল টিপ ফুলের ঝাড়ে ব্রাহ্মণ গরুটি খুব নিঃশব্দ
আমি চেয়ে আছি পুবে, ওদিকে দেয়াল ভাঙা,
পলেস্তারা খসা
বাগানে উত্তর গেটে কখন এসেছে এক নারী, এলোচুল
বাঁ হাত রেলিঙে ভর
ঢুকবে কি ঢুকবে না সেই দ্বিধায় মুখশ্রী তার রহস্যময়
গভীর নিশ্বাসে তার দুই স্তন ফুলে উঠে কানকানি করে

আমি তাকে এক পলক দেখে ফের চোখ রাখি
ভাঙা দেয়ালের দিকে
সেখানে কিছুই নেই—
আপাতত এই আমার অনন্ত মুহূর্ত।

বাণী-বন্দনা

জাগো, জেগে ওঠো বাণী, আজ অন্ধকার, আজ
বড় বেশি তপ্ত অন্ধকার, আজ জাগার সময়
ওরে বিষের পুত্তলি, তোর এত ঘুম ?
পয়োমুখ বিষের ছুরির মতো জিভ, ঐ বিষ দৃষ্টি
ঐ দেহ-বল্লরীর বিষ ঘাম, এ সবই তো এখন আঁধারে
মানুষের প্রাণ চায় ; বাণী, কুহকিনী
আচমকা দুয়ার খুলে প্রেমিক ও পূজারীকে নীল করো
কবির দু-কানে ঢালো প্রার্থিত গরল আর শ্রেষ্ঠী কিংবা
রাজপুরুষের
ব্যাকুল ঠোঁটে ও মুখে ছোবলের মতো চুমু, লুব্ধ প্রতিহারী
তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে টানে গুপ্তবিষ, বিষ, বিষ
অন্ধকার বিষে ভরে যাক
বাণী, ওরে বিষকন্যা, তোর নগ্ন শরীরের দুলে ওঠা মোহিনী মায়ায়
অ্যারিস্টট্‌লকে তুই ঘোড়া কর, সূর্যকে ভ্রূভঙ্গি হেনে
শিরোপালোভীকে দুই পদাঘাত উপহার দিয়ে
প্রগাঢ় তামসে তোর নাচের উৎসব শুরু হোক।
আজ মনে হয়
বাণী, তোর জেগে ওঠা সভ্যতার একমাত্র সূচিকাভরণ।

চিঠি

ভৌতিক পিওন যবে খেলাচ্ছলে পার হয় রাসবিহারী মোড়
আমার হুকুমে সব গাড়ি থেমে থাকে
লাল আলো, লাল আলো, ঐ শোনো কণ্ঠস্বর
ঐ দ্যাখো অশ্বত্থের বাঁকা ডাল নুয়ে আছে বিদ্যুতের দিকে
ঘূর্ণি বাতাসের মধ্যে চিঠি উড়ে যায়।

হিমানী স্তব্ধতা ভেঙে নেমে এলো অলৌকিক রোদ
বহু থেকে এক হলো একটি রমণী
তার
রুপালি স্তনের পাশে
ভবঘুরে তিনটে ফড়িং!
বৃক্ষ ও মানুষ শোভাযাত্রা করে এসেছিল, জানি
সব থেমে আছে
এ তোমার এ আমার বিশেষ মুহূর্ত নয়
পৃথিবী সমস্তক্ষণ সর্বজনীন না
এখন একজন শুধু রক্তিম আলোর নিচে
চিঠি পাবে।

নীরার অসুখ

নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়
নীরা আজ ভালো আছে?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে!
অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুল মালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি

হঠাৎ উদাস হাওয়া এলোমেলো পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে আকাশ জুড়ে
খেলা শুরু করলে
কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ বেড়াতে গিয়েছে।

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখ বোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়
রেস্তোরাঁয় পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ
সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লণ্ডভণ্ড
টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মন খারাপ করে আছো ?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মতো দেখাও ও মুখের মঞ্জরী
নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর !

অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে
চলে যায় স্বস্তিময় মুখে
ট্রাফিকের গিঁট খোলে, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিকশা
মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে, বেঁচে থাকা নেহাত মন্দ না !

মূক ব্যবহার

নিজের গলার স্বর যন্ত্রে শুনবো, ঐ যন্ত্র বলবে 'ভালোবাসি'
আর কেউ বলেনি, আমি কারুক্কে বলিনি ।
আয়নার ভিতর দিয়ে চুরি করে গেছি বহুবার
স্বর্গের পোস্টাফিসে সন্ধেবেলা
কেউ কিছু লেখেনি ; যন্ত্র, তুমি বলো, 'ভালোবাসি' ।

মানুষ হয়েছে আজ নিষ্ঠুর না বিষম লাজুক ?
কেই কারুর মুখের দিকে চোখ তুলে চায় না কথা বলে না

মাঝে মাঝে ওষ্ঠ খুলে অনুবাদে হাসাহাসি হয়—
চোখ জ্বলে যায় ঘুমে—ঘুমের ভিতর দ্বিপ্রহর,
এসো তুমি, ঘুমোবে আমার ঘরে বুকের মতন এক শীতলপাটিতে
একথা বলে না আর কেউ—
কুমারীর হাত ধরে হেঁটে যাই দীঘির উপরে
বাঁকা জ্যোৎস্না বুক ভেদ করে যায়—তবুও স্তব্ধতা, বড় স্মৃতিকষ্ট হয়,
'ফিরে এসো'—এই ধ্বনি বার বার গুমরে গুমরে ওঠে।

যন্ত্রের সম্মুখে সব স্বীকারোক্তি হয়ে যায়, একা
মধ্যরাত্রি হু-হু করে, অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার,
পাশের পালঙ্কে ঘুমে আছো তুমি, ক্লান্ত মুখ, বসন শিথিল
খুলেছে সায়ার গিঁট, চোখের দু' পাশে একটু ছায়া, তুমি
ঘুমোও এখন, আমি জাগাবো না—
ভালোবাসা, অবিশ্বাস—দু'জনেই আজ এত মূক
প্রতিবাদও করে না আজ গম্ভীর গর্জন
প্রেম যেন মুখ থেকে চলে যায় শরীরের সহস্র আঙুলে
মায়া লাগে,
অথচ বুকের মধ্যে কথা ছিল, ঘুম থেকে ডেকে ওঠাবার সাধ ছিল,
যন্ত্র, তুমি একদিন সাক্ষী দিও।

আথেন্স থেকে কায়রো

বিমানের মধ্যে আমি টাই খুলে ফেলে, সিট বেল্ট সরিয়ে
উঠে দাঁড়ালুম
চিৎকার করে বললুম, কে কোথায় আছো ?
পেঁজা তুলোর মতন তুলতুলে মুখ দু'জন হাওয়া-সখী ছুটে এলো—
তখন মাথার উপর ও নিচে ভূমধ্য আকাশ এবং রুপালি সাগর
মাঝখানে নীল মেঘ ও ফড়িং
পিছনে সন্ধেবেলার ইওরোপ জ্বলছে দাউ দাউ আগুনে
সামনে প্রাচ্যদেশ জুড়ে অন্ধকার

আমি কর্কশভাবে বললুম, কোথায় থাকো এতক্ষণ, আমি
আধঘণ্টা আগে পানীয় চেয়েছি,
তা ছাড়া আমার খিদে পেয়েছে—
বালিকা-সাজা দুই যুবতী অপ্রতিভ ভাবে হাসলো
সেই আগুন ও অন্ধকারের মাঝখানে নারী-হাস্য খুব অবান্তর লাগে
তাদের শরীরের রেখা বিভঙ্গের দিকে চোখ পড়ে না
ভূমধ্য সাগরের অন্তরীক্ষে নিজেকে বন্ধনমুক্ত ও সরল সত্যবাদী
মনে হয় অকস্মাৎ—
পিছনে জ্বলন্ত ইওরোপ, সামনে ভস্মসাৎ কালো প্রাচ্যদেশ
এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি নিঃসঙ্গ ভারতীয়, আমি সম্রাটের পুত্র
সমস্ত পৃথিবীর উদ্দেশ্যে এখন আমি তীব্র কণ্ঠে বলতে চাই,
আমার খিদে পেয়েছে, আমার খিদে পেয়েছে
আমি আর সহ্য করতে পারছি না—
আমি কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খাবার জন্য উদ্যত হয়েছি ।

ডাকবাংলোতে

ফুটে উঠলো একটি দুটি টগর
কণ্ঠে মুক্তা মালা
মরি মরি

তোমরা আজ সকালবেলার প্রসন্নতা
এক মুহূর্ত শিশির ভেজা আলো
নর্মছলে তোমরা অপ্সরী ।

‘কি সুন্দর ঐ টগর ফুল দুটো—
খোঁপায় গুঁজবো আমি !’
প্রাক্-যুবতী বারান্দার প্রান্তে এসে আঁখি তুললো—
সদ্য ভোর, বিরল হাওয়া, ঠাণ্ডা রোদ
সাংকেতিক পাখির ডাক, উপত্যকায় নির্জনতা
আমি বেতের ইজিচেয়ারে অলস ।

ফুলের থেকে চোখ ফিরিয়ে নারীর দিকে
চোখই জানে চোখের মায়া, দৃষ্টি জানে সৃষ্টির পূর্ণতা
একটি চাবি যেমন বহু বন্দী মুক্তি,
চাবির মতন
একপলকের চেয়ে দেখা
বললো আমায় :
নারী যতই রূপসী হোক, এই মুহূর্তে মুকুটহীনা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, বারান্দা থেকে নেমে
টগর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমি হাত বাড়িয়েছি
হাত থেমে রইলো শূন্যে
পৃথিবী কাঁপে না, তবু কখনো কখনো মানুষের
ভূমিকম্প হয়

এত বাতাস, তবু দীর্ঘশ্বাস নিতে ইচ্ছে হয় না
ভুবনময় এই মোহিনী আলোর মধ্যে দুলে ওঠে বিষণ্নতা
হাত থেমে রইলো শূন্যে
টগর গাছের পাশে হলুদ সাপ
চোখে চোখ, হিম সম্ভাষণ
কি তথ্য এনেছো তুমি, প্রহরী ?
হলুদ সাপ সকালের মূর্তিমতী স্তব্ধতাকে ভেঙে
সেই ভাঙা গলায়
বলে উঠলো :
ঘূর্ণি জলের পাশে একদিন দেখে নিও
মুখের ছায়ায় রৌদ্র-ভ্রমরীর খেলা !

কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।

তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এসে চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমি
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে !
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো ? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে ?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি !
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও…
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না !

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে !
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোনো নারী !
কেউ কথা রাখোনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না !

শব্দার্থ

এখন ইস্কুল বন্ধ, বালক সীমান্তে যায় চাল কিনতে
চালের বাজারে বড় খুনসুটি, চালের ভিতরে বহু হাত
চোখ ও নিশ্বাসময়, পাথর ও কীট-ভরা, তবুও সুগন্ধ ;
বালকের ভীরু হাত থলি খোলে, চেয়ে দেখে ওজনের কাঁটা—
জলস্থল অন্তরীক্ষ আগ্রহে প্রত্যক্ষ করে বালকের সুশিক্ষার দৃশ্য
পুলিশকে সিকি দিতে তারাই শিখিয়ে দেয়, ওপরে চাপায় সজনে ডাঁটা

মেঠো পথে ফিরে আসে। সুবোধ বালক, তুমি ও চাল খেয়ো না,
বিক্রি করো, কিলো-তে আটানা লাভ, সেই ভালো, শোনো,
চাল হলো শব্দ, তার অর্থ জেনে নিয়ে হাতে না তুললে
শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে, শব্দ নয়, অর্থই তো শিক্ষার মহিমা।
এখন ইস্কুল বন্ধ, তবু দিন দিন বাড়ে বালকের সুশিক্ষার সীমা।

নদীর ওপারে

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে
মুখে ভেজা হিম হাসি
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি আর পাশা খেলতে ভালোবাসি না
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
আগুনে ঘিয়ের ছিটে দিয়ে তুলবো প্রলয় নিনাদ—

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখে
ভেজা হিম হাসি ?
হিরণ্ময়, ওকে বলো, শবর্ণীর চিবুকে ঐ যে
ভনভনাচ্ছে নীল ডুমো মাছি
ওরা কার দূত ? আমি আর পাশা খেলতে ভালোবাসি না—
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
ওকে শেষবার বলো, রাত্রির আগেই যেন নীল ডুমো মাছিদের ঝাঁক
উড়ে যায় প্রত্যুষের দিকে !

মাটি

বাগানখানি ফুলদানি, হাওয়ায় সেই ধাতু এবং কুসুমগন্ধ
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাক
বাগানখানি

পায়ের নিচে মাটি ছুঁয়েছি, অথবা পা, তোমারই পা
আমায় পায়ের নিচে রাখো, আমার শরীর মাটি-মাটি
আমি গায়ে ময়লা হয়ে মিশে থাকবো, সেও তো মাটি,
মাটি হলেই বাগান, তোমার ফুলদানিটা উল্টে রাখো,
সোজা করো,
আমি তোমার নোখের ধুলো, ভুরুর ঘাম, টিপের উল্টো পিঠের আঠা
কখনো সোজা, কখনো উল্টো, কখনো টিপ, কখনো আঠা !
শ্যাওলা পাতার কারুকার্য দেখে তোমার স্নানের ঘরে জ্বলুক বাতি
বাতি জ্বলুক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ
ঘরের ঘর, আলোর আলো
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, অন্ধকারও লাগবে ভালো
বাগান ভেঙে লণ্ডভণ্ড, এত অসংখ্য উল্কাবৃষ্টি
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, আবার বৃষ্টি শেষের মাটি
মাটি হলেই বাগান, আমি নোখের ধুলোয় মিশে থাকবো, সেও তো মাটি ।

ছেলেটা

ঐ ছেলেটা পাগল,
ওর কথার কোনো মাথামুণ্ডু, ঠিকানা নেই !
ঐ ছেলেটা সমুদ্রেরও সীমানা চায়,
নদীর কাছে হাজির হয়ে
নদীকে খুব সরল হতে মিনতি করে ;
ভিখারীকেও ত্যাগ শেখাতে চেয়েছিল, ঐ ছেলেটা এমন পাগলা,
মৃত্যু দেখে শৈশবে যায়,
লেবু পাতার গন্ধে নাকি অমরত্ব !

নারীর বুকে শপথ রেখে ভেবেছিল, পাখির মতন পবিত্র প্রেম
হাওয়ায় উড়বে
হাওয়ায় উড়বে চোখের জল, যুদ্ধ যেমন মানুষকে খুব
হাসিয়ে মারে,
ঐ ছেলেটা মানুষ দেখলে ধুলো কাদায় ছবি আঁকবে
ধুলো কাদাই ছিটিয়ে বলবে, ভালোবাসতে চেয়েছিলাম,
পৃথিবীময় গোপন কথা,পৃথিবীময় গোপন কথা
অসুখ, সুখ, জননীমুখ, আকাশবাণী, ভোরের কাগজ
ভরিয়ে শুধু গোপন কথা
আলিঙ্গনে এত গোপন, রাজধানীতে এত গোপন
মানুষভরা গোপনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ ছেলেটা
বিষের ভাণ্ড নিয়ে বিমান থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে
শূন্য থেকে ঘুরতে ঘুরতে, আকাশ, হিম-বাতাস থেকে
চোখ সরিয়ে
সভ্যতাকে ডেকে বলে—
ঐ ছেলেটা সভ্যতাকে হাসতে হাসতে ডেকে বলে,
আমায় অধঃপতন থেকে রক্ষা করো !

অরূপ রাজ্য

মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল
ফুটে আছে
চোখের মতন চোখে দেখতে পাই ভোরবেলার মতো ভোরবেলা—
দেশলাই কাঠিতে জ্বললো বিশুদ্ধ আগুন, আমি সিগারেট মুখে নিয়ে
ছাদ থেকে নেমে আসি প্রধান মাটিতে
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, ঠিক পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ।

দুঃখ নিয়ে ঘুম ভাঙলে দুঃখ জেগে রয়, মানুষ ঘুমোয় ফের
প্রহরীর বিবৃত জানুতে
মানুষ না, আমি । আমার ঘুমন্ত চলা সাম্প্রতিক বাতাসকে মনে করে
শতাব্দীর হাওয়া

মহিলাকে মনে করে স্বপ্ন । মহিলা না, নীরা ।
তার দৃষ্টি দুর্গা টুনটুনি হয়ে উড়ে যায় । স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ । স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্ণার শব্দ ওঠে । এও স্বপ্ন—
টুনটুনি, মল্লিকা, ঝর্ণা—ধুল্যবলুণ্ঠিত এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা । আমি । দুঃখে সব স্বপ্ন হয় ।

ঈর্ষাও ঘুমের ভঙ্গি । সেই ঈর্ষা নারী বা নীরার সর্ব শরীরের কাছে এসে
শিকলের শব্দ করে
আমার দু' চোখ তীক্ষ্ণ ছুরি হয়, প্রাসাদ শিখর ভাঙে,
ধ্বংস করে রাজনীতি-মঞ্চ, রূপান্তর শুরু হয়
মানুষকে মনে হয় জলজন্তু, যোষিৎপ্রত্যঙ্গ যেন খাদ্য
ভালোবাসা নুন-মরিচ, নিশ্বাসে আগুন
প্রতিটি প্রত্যূষ যেন রাত্রি ভোর, রোদ্দুর তখনই হয় ক্ষুরের ফলার মতো
কুসুম কুমারী, মেঘ দুঃসময়—সব স্বপ্ন !

কখনো দুঃখের ঘুম শুরু হলে আমি জাগি, অবিকল চোখের মতন চোখে
টের পাই সাম্প্রতিক হাওয়া
সিগারেটে টান মেরে আমি খুসখুসে শব্দে হাসি
বেঁচে থাকা এই রকম
আমি এই অরূপ রাজ্যের নাগরিক
গোপাল চারায় ঠিক গোলাপ ফোটার মতো দৃশ্যমান ফসলের নিজস্ব বিভাস
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস শুধু পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ।

ভালোবাসা

শরীর ছেলেমানুষ, তার কত টুকিটাকি লোভ
সব সাঙ্গ হলে পর, ঘুম আসবার আগে
নতুন টাকার মতন সরল নিরাবরণ
দুখানি শরীর
বিছানায় অবিন্যস্ত ।

ঠাণ্ডা বুকের কাছে স্বেদময় মুখ
উরুর উপরে আড়াআড়ি ফেলে রাখা
এইমাত্র লোভহীন হাত
চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালোবাসার—
ভালোবাসা মানে ঘুম, শরীর বিস্মৃত পাশাপাশি
ঘুমোবার মতো ভালোবাসা।

জয়ী নই, পরাজিত নই

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল
আমি এই পৃথিবীকে পদতলে রেখেছি
এই আক্ষরিক সত্যের কাছে যুক্তি মূর্ছা যায়।
শিহরিত নির্জনতার মধ্যে বুক টন্‌টন্ করে ওঠে
হালকা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন
সবুজকে ধূসর হতে ডাকে
আদিগন্ত প্রান্তর ও টুকরো ছড়ানো টিলার উপর দিয়ে
ভেসে যায় অনৈতিহাসিক হাওয়া
অরণ্য আনে না কোনো কস্তুরীর ঘ্রাণ
কিছু নিচে ছুটন্ত মহিলার গোলাপি রুমাল উড়ে গিয়ে পড়ে
ফণিমনসার ঝোপে
নিঃশব্দ পায় চলে যায় খরগোশ আর রোদ্দুর।

এই যে মুহূর্ত, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা—এর কোনো অর্থ নেই
ঝর্ণার জলে ভেসে যায় সম্রাটের শিরস্ত্রাণ
কমলার কোয়া থেকে খসে পড়া বীজ ঢুকে পড়ে পাতাল গর্ভে
পোল্‌কা ডট্ দুটি প্রজাপতি তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত
বাবলা গাছের শুকনো সব কাঁটাও দাবি করেছে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব
সব দৃশ্যই এমন নিরপেক্ষ
আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনই একজন মানুষ
পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল
থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত।

পাথর

খণ্ড পাথর, শৌখিনতায় তুই কি চাস সজীব হয়ে উঠে দাঁড়াতে ?
অথবা তোর ভিতরে, অনেক ভিতরে, শিশুর রক্তাভ হাত যেমন কোমল
সেই কেন্দ্রে
অযুত বর্ষ সুপ্ত রয়েছে যে স্তব্ধতা, তাকেই অটুট রাখার নেশা
ঢের বেশি বড় ?

বাড়ি ফেরা

রাত্তির সাড়ে বারোটায় বৃষ্টি, দুপুরে অত্যন্ত শুকনো এবং ঝক্‌ঝকে
ছিল পথ, মেঘ থেকে কাদা ঝরেছে, খুবই দুঃখিত মূর্তি একা
হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, কালো ভিজে চুপচাপ দ্বিধায়
ট্রাম বাস বন্ধ, রিকশা ট্যাক্সি পকেটে নেই, পৃথিবী তল্লাসী হয়ে গেছে
পরশুদিন
পুলিশের হাতে শান্তি এখন, অথবা নির্জনতাই প্রধান অস্ত্র এই
বুধবার রাত্তিরে।

অনেক মোটরকারে শব্দ হয় না, ঘুমন্ত হেড লাইট, শুধু পাপপুণ্য
অত্যন্ত সশব্দে জেগে আছে, কতই তো প্রতিষ্ঠান উঠে যায়, ওরা শুধু
ঘাড়হীন অমর গোঁয়ার।

মশারী ব্যবসায়ীদের মুণ্ডপাত হচ্ছে নর্দমায়, কলকণ্ঠে, ঘুমহীন ঘুম
শিখে নিয়েছে ট্রাক ড্রাইভার। দু'পাশের আলো-জ্বলা অথবা
অন্ধকার ঘরগুলোয়
জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় হয়নি। অসার্থক যৌন ক্রিয়ার পর
বারান্দায় বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো লোকটা, ঘন ঘন আগুনের চিহ্ন দেখে
বোঝা যায় কি তীব্র ওর দুঃখ ! মৃত্যুর খুব কাছাকাছি—
হয়তো লোকটা
গত দশ বছর ধরে মরে গেছে, আমি বেঁচে আছি আঠাশ বছর।

সাত মাইল পদশব্দ শুনে কেউ পাগলামির সীমা ছুঁয়ে যায় না
এ রাস্তা অনন্তে যায়নি, ডানদিকে বেঁকে কামিনী পুকুরে
দুই ব্রীজের নিচে জল, পাৎলুন গোটানো হলো, এই ঠাণ্ডা স্পর্শ
একাকী মানুষকে বড় অনুতাপ এনে দেয়—
লাইট পোস্টে উঠে বাল্‌ব চুরি করছে একজন, এই চোট্টা, তোর পকেটে
দেশলাই আছে ?
বহুক্ষণ সিগারেট খাইনি তাই একা লাগছে, দেশলাইটা নিয়ে নিলাম
ফেরত পাবি না
বাল্‌ব চুরি করেই বাপু খুশি থাক না, দু'রকম আলো বা আগুন
এক জীবনে হয় না !...ভাগ্‌ শালা,...

ওপাশে নীরেনবাবুর বাড়ি, থাক । এ সময় যাওয়া চলে না—ডাকাতের
ছদ্মবেশ ছাড়া
চায়ের ফরমাস করলে নিশ্চয়ই চা খাওয়াতেন, তিনদিন পরে
অন্য প্রসঙ্গে ভর্ৎসনা
একটু দূরে রিটায়ার্ড জজসাহেবের সুরম্য হর্ম্যের
দেয়াল চকচকে সাদা, কি আশ্চর্য, আজো সাদা ! টুকরো কাঠকয়লায়
লিখে যাবো নাকি, আমি এসেছিলাম, যমদূত, ঘুমন্ত দেখে ফিরে গেলাম
কাল ফের আসবো, ইতিমধ্যে মায়াপাশ ছিন্ন করে রাখবেন নিশ্চয়ই !

কুত্তারা পথ ছাড় ! আমি চোর বা জোচ্চোর নই, অথবা ভূত প্রেত
সামান্য মানুষ একা ফিরে যাচ্ছি নিজের বাড়িতে
পথ ভুল হয়নি, ঠাণ্ডা চাবিটা পকেটে, বন্ধ দরজার সামনে থেমে
তিনবার নিজের নাম ধরে ডাকবো, এবং তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে
এলোমেলো অন্ধকার সরিয়ে
আয়নায় নিজের মুখ চিনে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকবো ঘরে ।

নীরার হাসি ও অশ্রু

নীরার চোখের জল চোখের অনেক
নিচে
টলমল
নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে
বুক, বাহু, আঙুলে
ছড়ায়
শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে, হেলানো সন্ধ্যায় নীরা
আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত
আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খে[illegible]রে নীরার কৌতুক
তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলি মাখা ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়ে লীলা লোধ্র
আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি:
নীরা, তুমি শান্ত হও
অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি
পৃথিবী তোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই
তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া
নীরা, তুমি শান্ত হও।

নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি
খেলা করে
কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক
সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো
সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে
নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙুল ঠেকিয়ে বলে,
চুপ!
আমি জানি
নীরার চোখের জল চোখের অনেক নিচে টলমল।

ইচ্ছে

কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে
দুটো চারটে নিয়ম কানুন ভেঙে ফেলি
পায়ের তলায় আছড়ে ফেলি মাথার মুকুট
যাদের পায়ের তলায় আছি, তাদের মাথায় চড়ে বসি
কাচের চুড়ি ভাঙার মতোই ইচ্ছে করে অবহেলায়
ধর্মতলায় দিন দুপুরে পথের মধ্যে হিসি করি।
ইচ্ছে করে দুপুর রোদে ব্ল্যাক আউটের হুকুম দেবার
ইচ্ছে করে বিবৃতি দিই ভাঁওতা মেরে জনসেবার
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুন কালি দিই।
ইচ্ছে করে অফিস যাবার নাম করে যাই বেলুড় মঠে
ইচ্ছে করে ধর্মাধর্ম নিলাম করি মুর্গীহাটায়
বেলুন কিনি বেলুন ফাটাই, কাচের চুড়ি দেখলে ভাঙি
ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করি এবার পৃথিবীটাকে
মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
আমার কিছু ভাল্লাগে না।

জলের সামনে

ব্রীজের অনেক নিচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ
কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি,
কখনো মানুষ নই,
তবুও সন্ধ্যায়
ব্রীজের খিলান ধরে ঝুঁকে থেকে মনে হয় অবিকল মানুষেরই মতো
মানুষের জল দেখা, জলের মানুষ দেখা
পরস্পর মুখ ;
মানুষ দেখেছে জল বহুদিন মানুষ দেখেছে অশ্রুজল
মানুষ দেখেছে মুখ অশ্রুভেজা, ব্রীজের অনেক নিচে
হিম কালো জলে
কালো জল বহু উর্ধ্বে দেখেছে কান্নায় সিক্ত গোপন কঠিন মুখ
মানুষের মতো।

আসমুদ্র দয়া প্রার্থী আবার বৃষ্টির কাছে অতি পলাতক
কখনো নিথর জলে স্পষ্ট মুখ, কখনো তরঙ্গে ভাঙা হীন মানবীয় ।

জলের কিনারে এলে জলের ভিতরে যাওয়া, জলের ভিতরে
মানুষ যখনই যায় একা, তার অলঙ্ঘ্য শরীর
মাতৃগর্ভে বাস সম অগোপন ;
অথবা না-হোক একা,
বন্ধু ও সঙ্গিনী
অদূরেই জলযুদ্ধে ; একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর উরুর জোড়, খোলা স্তন কীরকম আশ্চর্য সরল—
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো,—সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যেরকম
মানুষের হাত
জলের ভিতরে গিয়ে নিজের শরীরটাকে চিনে নেয়,
জলের ভিতরে
সহাস্যে পেচ্ছাপ করে লজ্জাহীন, বাতাসের মতো জল, পরাগ ছড়ায় ।

কখনো মানুষ সেজে বীয়ার-বাস্কেট নিয়ে বসেছি নারীর
কাছাকাছি সিন্ধুতটে সন্ধেবেলা, জ্যোৎস্না ভাঙে লাবণ্য হাওয়ায়
আকাশে অসংখ্য ছিদ্র, ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বলে ফসফরাস
দেখেছিল মুখ
অথবা ঢেউয়ের দল মানুষের মুখ চেয়ে সার বেঁধে আসে—
এমন উচ্ছল জল, মানুষের মুখ দেখা যেন তার আশৈশব সাধ ।
মানুষের ছদ্মবেশে আছি, তাই চোখে আসে অশ্রু
মুখ ঢাকি ।

জীবন ও জীবনের মর্ম

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয় ।
বুদ্ধের বুকের হাঁস ডানা ঝাপটায়, আমি মাংসলোভী

বিশাল বৃক্ষের ছায়া জলে ভাসে—আমি তমস্বান হয়ে ছুটে গেছি
আমি ভুল বুঝতে পারি—
বিস্মৃতিকে কতবার মনে ভেবেছি বিষণ্ণতা
ট্রেন লাইনের পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বনবাসী হরিণ
কয়লা খনির ভিতরের অপরাহ্নের মতন উদাসীনতা
আমাকে নদীর পাশেও স্রোতহীন রেখেছে
চঞ্চল হাওয়ায় উড়ে গেছে কৃতঘ্নতার হাসি
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে, সেই মুহূর্তের
বিশাল জ্যোৎস্না যাবতীয় পার্থিব ম্যাজিকের
তাঁবুর মতন ঝড়ে উল্টে যায়
মেঘ জলস্তম্ভ হতে গিয়েও ফেটে ইলশে গুঁড়ি হয়ে ছড়ায়
সমগ্র কৈশোর কালের নদীর পার থেকে ছিটকে পড়ে যায়
গুন টানার মানুষ
বারো বছরের জন্মদিনে আমার কপালে মায়ের আঙুল ছোঁয়া
লাল টিপ
মুছে গিয়েছিল কান্নায়, মুছে যায়নি।
এখন আমার ভারতবর্ষের মতন ললাটে সেই কাশ্মীর, অর্থাৎ দ্বিধা
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।

শব্দ

বালি ঝুমকো, হলুদ নাভি, শূন্য হাস্য
রূপালি ফল, নীল মিছিল, চিড়িক চক্ষু…

চিড়িক না সুখ ? চিড়িক শব্দে ট্যাঁড়া বসালুম
রূপালি ফল, না রূপালি উরুত ? দ্রিদিম জ্যোৎস্না

অমনি আমার বুকের মধ্যে ভয়ের ঘণ্টা, দ্রিদিম জ্যোৎস্না
লিখে ভয় হয়

দ্রিদিম না স্মৃতি ? জ্যোৎস্না না জল ? অথবা সাগর ?
দ্রিদিম সাগর ? ঠিক ঠিক ঠিক ! নিরুপদ্রব । শূন্য হাস্য
কুন্‌কি কাফেলা, হাতেম তামস, শালু পালু লুস্‌
তামস ? আবার ভুলের শব্দ, ভয়ের শব্দ, (কাটতে কলম
থর থর করে)

তামসের চেয়ে প্রগাঢ় আমার গরিমার কাছে শূন্য হাস্য
অর্থের এত বিভ্রমে বহু অশ্রুবিন্দু, কুলুকুলু জল···

কুলুকুলু বড় মধুর শব্দ, মধুর তোমার শব্দে শব্দ
মন্দিরে বাজে দ্রিদিম ঘণ্টা, জ্যোৎস্না উধাও, তামস উধাও ।

নিসর্গ

আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে আছে শীত
উড়ে গেল তিনটে প্রজাপতি
একটি কিশোরী তার করমচা রঙের হাত মেলে দিলে বিকেলের দিকে
সূর্য খুশি হয়ে উঠলেন, তাঁর পুনরায় যুবা হতে সাধ হলো ।

দ্বারভাঙা জেলার রমণী

হাওড়া ব্রীজের রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল
দ্বারভাঙা জেলা থেকে আসা এক টাটকা রমণী
ব্রীজের অনেক নিচে জল, সেখানে কোনো ছায়া পড়ে না
কিন্তু বিশাল এক ভগবতী কুয়াশা কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চল থেকে
গড়িয়ে এসে

সভ্যতার ভূমধ্য অলিন্দে এসে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ থেকে খসে পড়লো ইতিহাসের পাপমোচনকারী বিষণ্ণতা
ক্রমে সব দৃশ্য, পথ ও মানুষ মুছে যায়, কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু রইলো সেই
লাল ফুল-ছাপা শাড়ি জড়ানো মূর্তি
রেখা ও আয়তনের শুভবিবাহমূলক একটি উদাসীন ছবি—
অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে, সেই প্রধানা মচ্‌কা মাগি, গোঠের মল ঝামরে
মোষ তাড়ানোর ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে-রে—
মুঠো পিছলোনো স্তনের সূর্যমুখী লঙ্কার মতো বোঁটায় ধাক্কা মারলো কুয়াশা
পাছার বিপুল দোলানিতে কেঁপে উঠলো নাদব্রহ্ম
অ্যাক্রোপলিসের থামের মতো উরুতের মাঝখানে
ভাঁটফুলের গন্ধমাখা যোনির কাছে থেমে রইলো কাতর হাওয়া
সুডৌল হাত তুলে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে—
তখন সর্বনাশের কাছে সৃষ্টি হাঁটু গেড়ে বসে আছে
তখন বিষণ্ণতার কাছে অবিশ্বাস তার আত্মার মুক্তিমূল্য পেয়ে গেছে....
সব ধ্বংসের পর
শুধু দ্বারভাঙা জেলার সেই রমণীই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো
কেননা ঐ মুহূর্তে সে মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল।

উত্তরাধিকার

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ, ক্রোধ, শিহরন
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল

পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলস্
গূঢ় অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মতো আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহঙ্কারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু'তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এ সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশি তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।

নীরার পাশে তিনটি ছায়া

নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া
আমি ধনুকে তীর জুড়েছি, ছায়া তবুও এত বেহায়া
পাশ ছাড়ে না
এবার ছিলা সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মতো—
নীরা দু'হাত তুলে বললো, 'মা নিষাদ!
ওরা আমার বিষম চেনা!'
ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে ওড়ে আমার বুক চাপা বিষাদ—
লঘু প্রকোপে হাসলো নীরা, সঙ্গে ছায়া-অভিমানীরা
ফেরানো তীর আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল
নীরা জানে না!

বন্দী, জেগে আছো ?

চরাচরে অন্ধকার, নিঃশব্দ নিশীথে ডাক ওঠে :
বন্দী, জেগে আছো ?
বন্দী কি ঘুমোয় ? না কি জাগরণই তার বন্দিশালা

মাথার ভিতর জ্বালা যাবজ্জীবন পল অনুপল
পদক্ষেপে শিকলের শব্দ—তার নিঃসঙ্গতা, অন্ধকুঠুরির
ভিতরে স্বপ্নের মতো রোদ এসে
জানায় অস্তিত্ব, এ কি নিষ্ঠুরতা—যে রয়েছে চিরকাল
জেগে, তাকে প্রশ্ন
বন্দী, জেগে আছো !

যে রয়েছে চিরকাল জেগে তার হিংস্র কঠিন মুখ
গরাদের ফাঁকে চেয়ে থাকে, তবু কপালের নিচে
প্রশ্নের জ্বলন্ত দুই শর ;
সমূহ প্রকৃতি থেকে যে-রয়েছে দূরে তার আঁধারে ঝলসানো চোখ
প্রেমের নিভৃত শিল্পে, পণ্যে, পিপাসায়, লোভে
অত্যন্ত ঘুমন্ত সব মানুষের খেলাঘরে
প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় :
স্বাধীন ? স্বাধীন ?

সিল্ক্রিতে এক উৎসবে

নর্তকী, তুমি তাকাও আমার দিকে ক্ষণকাল
আজ এ সভায় আমিই প্রধান অতিথি, আমার
চোখে চোখ রাখো একবার ।
সবুজ আলোর পরে ঝলসালো মসৃণ মঞ্চ
দুই সখী এসে দাঁড়ালো দু'পাশে লাল ও হলুদ
ওরা তো স্বপ্ন
রেশমী রুমাল, পীত আঙরাখা, জরির ঝালর—এসব স্বপ্ন
প্রহরীর মতো ঘাগরা কাঁচুলি সাজানো মঞ্চ—এসব স্বপ্ন
বাহু ঢাকা ফুল, ফুলের দুকূল রুপোর নূপুর—এবারও স্বপ্ন ?
শুধু ঘোরে রং, ঝম-ঝম-ঝুম রঙের শব্দ, নর্তকী, তুমি
তাকাও আমার দিকে ক্ষণকাল, আজ এ সভায়
আমিই প্রধান অতিথি, আমার
চোখে চোখ রাখো একবার ।

শত জনতার ঠিক মাঝখানে আমার আসন, নর্তকী, তুমি
যে দিকেও যাও, প্রোসেনিয়ামের যে-কোনো সীমায়—
আমার দু'চোখ তোমার অঙ্গে—লীলাময় হাত, মৃদু অঙ্গুলি—
লঘু পদযুগ, ক্ষীণ কটিতটে দারুণ দোলানি দেখে ঊরুদেশ
হেম দুই বুক জেগে ওঠে আজ স্তননে বর্ণে, নাচ কি শিল্প ?
ঝম-ঝম-ঝুম রঙের শব্দ, নর্তকী আজ তুমিই শিল্প ?
এক মুহূর্ত ফেরাও চক্ষু আমার দু'চোখে, ছবির নারীরা
ঠিক যে রকম চিরকাল শুধু আমাকেই দেখে, এক মুহূর্ত
তুমি দেখা দাও, আজ এ সভায় তুমিই শিল্প !

উইংসে এসেছে রাজার কুমার, সেও তো রমণী,
ছোট শহরের নৃত্যসভায় সবাই রমণী, ওকে ভয় নেই
সাত সখী এসে তিনজন গেল, নর্তকী শুধু তুমিই শিল্প
দুই ভুরু হেনে একবার চাও, শরীর দেখেছি, তোমাকে দেখিনি
নাচ কি শিল্প ? ঢের শিল্পের দেখা হলো আজ
চোখোচোখি ছাড়া কোনো দেখা নেই
এক মুহূর্ত তাকাও···আমার সহিষ্ণুতার শেষ হয়ে এলো
এবার চেয়ারে দাঁড়িয়ে উঠবো, সিটি দিয়ে আমি ডিগবাজি খাবো
মাটিতে গড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উল্টে পাল্টে লোভী জনতার
সারি সারি পায়ে চিমটি কাটবো
নাচ কি শিল্প ? ঢের শিল্পের দেখা হলো আজ মঞ্চ শিল্প
এবার সেসব ভাঙা শুরু হোক, শরীর দেখেছি তোমাকে দেখিনি
হাওয়া ভাঙে মেঘ, মেঘ কি শরীর ? শরীর আমার সহ্য হয় না
শিল্প আমার সহ্য হয় না, স্বপ্নের মতো ঝমঝুমে রং,
এক মুহূর্ত
দুই চোখে শুধু আমাকেই দেখো, আমি আজ বড় অস্থির আছি
আমি আজ এক নক্ষত্রকে হৃদয় সঁপেছি
নর্তকী তুমি সুন্দর, আমি তোমাকে চাই না, তোমার চোখের
নক্ষত্রকে খুঁজে নিতে দাও ।

আত্মা

প্রতিটি ট্রেনের সঙ্গে আমার চতুর্থভাগ আত্মা ছুটে যায়
প্রতিটি আত্মার সঙ্গে আমার নিজস্ব ট্রেন অসময় নিয়ে
খেলা করে।
আলোর দোকানে আমি হাজার হাজার বাতি সাজিয়ে রেখেছি
নষ্ট-আলো-সঞ্জীবনী শিক্ষা করে আমার চঞ্চল
অহমিকা।
জাদুঘরে অসংখ্য ঘড়িতে আমি অসংখ্য সময় লিখে রাখি
নারীর উরুর কাছে আমার পিঁপড়ে দূত ঘোরে ফেরে
আমার ইঙ্গিতে তারা চুম্বনের আগে
কেঁপে ওঠে।
এইরূপ কর্মব্যস্ত জীবনের ভিতরে-বাইরে ডুবে থেকে
বিকেলের অমসৃণ বাতাসে হঠাৎ আমি দেখি
আমার আত্মার একটা কুচো টুকরো
আজও কোনো কাজ পায়নি।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে,
গুজরাটের বন্যা দেখতে যেও না
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
ক্রুদ্ধ জলের প্রবল তোলপাড়ে উপড়ে গেছে রেললাইন
চৌচির হয়েছে ব্রীজ, মৃত পশুর পেটের কাছে ছন্নছাড়া বালক
তরঙ্গে ভেসে যায় বৃদ্ধের চশমা, বৃক্ষের শিখরে মানুষের
আপৎকালীন বন্ধুত্ব
এই সব টুকরো দৃশ্য—এক ধরনের সত্য, আংশিক, কিন্তু বড় তীব্র
বিপর্যয়ের সময় এই সব আংশিক সত্যই প্রধান হয়ে ওঠে
ইন্দিরা, লক্ষ্মীমেয়ে, তোমার একথা ভোলা উচিত নয়
মেঘের প্রাসাদে বসে তোমার করুণ কণ্ঠস্বরেও
কোনো সর্বজনীন দুঃখ ধ্বনিত হবে না
তোমার শুকনো ঠোঁট, কতদিন সেখানে চুম্বনের দাগ পড়েনি,
চোখের নিচে গভীর কালো ক্লান্তি, ব্যর্থ প্রেমিকের মতো চিবুকের রেখা

কিন্তু তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো এই পথ
তোমার আর ফেরার পথ নেই
প্রিয়দর্শিনী, তুমি এখন বিমানের জানলায় বসে
উড়ে এসো না জলপাইগুড়ি, আসামের আকাশে
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি—
উঁচু থেকে তুমি দেখতে পাও মাইল মাইল শূন্যতা
প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়মহীনতার সর্বনাশা মহিমা
নতুন জলের প্রবাহ, তেজী স্রোত—যেন মেঘলা আকাশ উল্টো
হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবীতে
মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন বাড়ি, কাণ্ডহীন গাছের পল্লবিত মাথা
ইন্দিরা, তখন সেই বন্যার দৃশ্য দেখেও একদিন তোমার মুখ ফস্কে
বেরিয়ে যেতে পারে, বাঃ, কি সুন্দর !

শরীর অশরীরী

কেউ শরীরবাদী বলে আমায় ভর্ৎসনা করলে, তখন ইচ্ছে হয়
অভিমানে অশরীরী হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাই !
আবার কেউ 'অশরীরী' শব্দটি উচ্চারণ করলে আমি কান্নার মতন
ভয় পেয়ে তীব্র কণ্ঠে বলি, তুমি কোথায় ? লুকিও না,
এসো, তোমাকে একটু ছুঁই !
এই রকমই জীবন ও মানুষের হাঁটা চলার ভাষা—
সুতরাং 'ভাষা' শব্দটি কারুর মুখে শুনলে মনে হয় পৃথিবীর
যাবতীয় ক্ষত্রিয় গদ্যের
বিনাশ করতে যেতে হবে ।

কোথাও 'ব্রাহ্মণ' শুনলে মনে পড়ে ভাঙা মৃৎশকটের জন্য কান্না
এসবই তো আকাশের নিচে, তোমার মনে পড়ে না ?
দেখো, আবার 'তুমি' বলছি, অর্থাৎ শরীর
এখন আমি শরীরবাদী না অশরীরী ?
অশরীরী, অশরীরী, তাই তো শরীর ছুঁতে ইচ্ছে হয়,

এসো শরীর, তোমায় আদর করি
এসো শরীর, তোমায় ছাপার অক্ষরের মতো স্পষ্টভাবে চুম্বন করি
তোমায় সমাজ সংস্কারের মতন আদর্শভাবে আলিঙ্গন করি
এসো, ভয় নেই, লজ্জা করো না, কেউ দেখবে না—দেখতে জানে না
সত্যবতী, তোমার দ্বীপের চারপাশ আমি ঢেকে দেবো কুয়াশায়
তোমার মীনচিহ্নিত দেহে ছড়িয়ে দেবো যোজনব্যাপী গন্ধ—
কবিও তো সন্ন্যাসীই, সন্ন্যাসীরই মতন সে হঠাৎ কখনো
যোগভ্রষ্ট হয়ে কামমোহিত হয়—
সেই বিস্মৃত মুহূর্তের লিপ্সা বড় তীব্র, তাকে অপমান করো না
সে যখন জ্যোৎস্নাকে ভোগ করতে চায়, তখন উন্মত্তের মতন
লণ্ডভণ্ড করে রাত্রি, সে যখন পৃথিবীকে দেখে, তখন
দশ আঙুলের মতন ভয়াবহ চোখে এই শৌখিন ধরিত্রীর সঙ্গে
সঙ্গম করে—যার ডাকনাম ভালোবাসা,—আঃ কেন আবার
একথা, আমি অশরীরী এখন, আমি এখন গীর্জার অন্দরের মতন
পবিত্র বিশেষণ, সমস্ত প্রতীক অগ্রাহ্য করা শ্রেষ্ঠ প্রতীক, এখন
'সমাজ' শব্দটি শুনলে পাট ভেজানো জলের গন্ধ মনে পড়ে, কেউ
'ক্ষিদে পেয়েছে' বললে, মনে হয়, আহা লোকটি বড় নিষ্ঠাবান
অর্থাৎ ধ্যান, এখন আমার ধ্যান, আর বিস্মরণ নয়, ধ্যান—
কিন্তু যাই বলো, চারপাশে অপ্সরীর নৃত্য না থাকলে চোখ বুজে
ধ্যানও জমে না !

আবার ? আস্তে, না, শরীর নয়, আমি এখন আকাশের নিচে
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, সমস্ত অন্তরীক্ষ জুড়ে তালগাছের মতন
দীর্ঘ কোনো কণ্ঠস্বর আমায় বলেছে, দাঁড়াও !
আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আমি এরকমও জানি,
চোখে জল এলে বুঝতে পারি, এও তো শরীর, পায়ের ধুলোও শরীরবাদী
আহা, শরীরের দোষ নেই, সে অশরীরীর সামনে হাত জোড়
করে দাঁড়িয়ে আছে—।

আজ সকালবেলা

মাঠের সামনের ঝুল বারান্দায় শীতের সকালে রোদ এলে
বেতের চেয়ারে আমি কবির মতন বসে থাকি
এখন রোদ্দুর দেখে অনায়াসে বলা যায়, 'হেমশস্য'
নারী নয়, বৃক্ষও প্রকৃতি
পাতার ভিতরে হাওয়া 'আন্দোলন' করে যায়
প্রসারিত সবুজের ভিতরে শিশির খোঁজে চোখ
ঠিক কবির মতন চোখ ঘোরে ফেরে আকাশে প্রান্তরে
মাঝে মাঝে বেতের চেয়ারে একা কবি হতে কে না চায় ?

মন, তুমি জেনে রেখো, এসবই দেখার যোগ্য সুস্থির শাশ্বত
যেমন ভ্রমণে যায় মানুষ ও মানুষের পোশাকের খয়েরি সুটকেস
অর্জিত ছুটির সুখে কলকাতা-আসানসোল তুচ্ছ হয়ে যায়
ইস্পাত শিল্পের কর্মী মন্দিরের শিল্প দেখে কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গে সরবে !
সৌন্দর্য বিখ্যাত জ্ঞান, মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে দেখে রাখা প্রথা
হৃদয় কি শূন্য ? তবে পাহাড় শিখর থেকে দূরের শূন্যতা দেখে
মানুষের এতখানি খুশি ?
ঝর্ণার রূপের ছলা ক্যামেরায় এসে স্থির হয়
সমূল বৃক্ষের থেকে পরগাছার ফুল বেশী দামী—
এরকমই মিলে মিশে জীবনের সরল ও স্বাভাবিক সার্থক ব্যর্থতা, জেনে রেখো ।

মন, তুমি তিরিশ পেরুলে, তাই যুক্তিবাদী ?
তুলনা ও প্রতিতুলনার মতো জুয়াচুরি শিখে নিয়ে বাণী উচ্চারণে বুঝি লোভ ?
এখন গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা চুপি চুপি গাঢ় অপরাধ ?
হাস্যকর মানুষের সামনে এসে এখন বিনীত হাস্য দিতে হবে ?
প্রকৃতিকে 'ফ্রকৃতি' না বলে ডেকে, নারীর বুকের প্রতি
জ্বলন্ত নিশ্বাস ছোঁড়া বন্ধ !
ওরে মন্দমতি, আজো শোন্
সধর্মে নিদ্রাই শ্রেয়, স্নেহসিক্ত পরধর্ম পূতনা রাক্ষসী ।

ধান

হলুদ শাড়ি আর পরো না, এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি
ঘরে তোমার হল্‌দে পর্দা ! মিনতি করি খুলে রাখো
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।
এপাড়া জুড়ে শানাই বাজে, ওপাড়া জুড়ে শামিয়ানা
ব্যস্ত মানুষ, সুখী মানুষ, শঙ্খ আর উলুধ্বনি, লাল চেলি
সবই থাকুক, বন্ধ রাখো গায়ে-হলুদ
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।

আয় কাক আয় কাকের পাল আয় রে আয়—
গোয়াল ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ডাকে পুরোনো সুরে
ও খোকা, তুই কাক ডাকিসনে, ও ডাকা যে অলুক্ষুনে
এ বছর আর নবান্ন নেই, বান এসেছে
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।

দুপুরবেলা হলদে হাওয়া উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
কোথাও কেউ কথা বললে রক্ত আলোয় তুফান ওঠে
পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে হিম নিশীথের নীল জ্যোৎস্না
গাছের পাতা হলুদ হয় তবুও ভয়ে
মায়ের মুখ শিশুর মতো, জলে যেমন মেঘের ছায়া, থমথমে ভয়
ও মা, তুমি ভয় পেও না
শিশুর অন্নপ্রাশন হবে অনাদিকালের গোধূলি বেলায় ।

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে
আঙুলে বা চোখের পাতায়
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—
এবং নীরার মুখ ।

জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু—সেই অস্থিরতা
নীরার মুখের ছবি—সোনালি চশমার ফ্রেম, নাকি কালো !
স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি ? না কালো ?
ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খুনসুটি
তবুও নীরার মুখ অস্পষ্ট কুয়াশাময়
জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি
বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে ?
নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো ?

•

সিঁড়ির ধাপের মতো বিস্মরণ বহুদূর নেমে যায়
ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ
চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা
নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল ?
এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস
বিস্মৃতির মধ্যে শুনি অধঃপতনের গাঢ় শব্দ
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা
সব কিছু ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব
শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—
ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল
হিজল বনের ছায়া চকিতে মেঘের পাশে খেলা করে
তীব্রভাবে বেজে ওঠে কৃতঘ্ন শব্দের রাশি, সেই মুহূর্তেই
চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বজ্র মুঠি, ঝলসে ওঠে
রক্তমাখা ছুরি ।

সারা জীবন বেড়াতে এলে

ব্রীজের নিচে মানুষ, তুমি
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ফাঁকা জীবন, হলুদ ঘর, নোংরা জলে মেয়েলি তুলো
শরীরময় টুকরো ছিট্, চুলের গন্ধ ঝাউবনের

অসমীচীন মানুষ, তুমি সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ঘৃণায় কাঁপে শরীর আমার, ভ্রমণ এত মাধুরীহীন ?
তিরতিরিয়ে রক্ত ছোটে—ভ্রমণ শুনলে জলপ্রপাত
ভ্রমণ শুনলে চুরি-সোহাগ, ভ্রমণ শুনলে রৌদ্রছায়া
নগর ভরা নারীর হাস্য, হীরের গয়না, কালো রুমাল
সহ্য হয় না এমন জ্যোৎস্না, সহ্য হয় না ট্রেনের ঘণ্টা
ব্রীজের নিচে মানুষ তুমি বাদামী মুখ,
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?

আরও নিচে

সিংহাসন থেকে একটু নিচে নেমে, পাথরের
সিঁড়ির উপর বসে থাকি
একা, চিবুক নির্ভরশীল
চোখ লোকচক্ষু থেকে দূরে ।
'সম্রাটের চেয়ে কিছু কম সম্রাটত্ব' থেকে ছুটি নিয়ে আজ
হলুদ দিনাবসানে পরিকীর্ণ শব্দটির মোহে
মাটির মানুষ হতে সাধ হয় । এক একদিন এরকম হয় ।
আমার চোখের নিচে কালো দাগ
ব্যাণ্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যেরকম জাদুদণ্ডসম কোনো
মহিলার হাত
নিয়তি বদল করে, আলো-ছায়া-আলো ঘোরে শরীর নিভৃত সানুদেশে
দপ করে জ্বলে ওঠে হৃদয়ের পুরোনো বারুদ
তেমনিই দিনাবসান
তেমনিই মোহের থেকে মুক্ত নিচু চাঁদ—
সিংহাসন থেকে নেমে, হাত ভরা পশমের মতো এত রোমশ স্তব্ধতা ।

পাথরের মসৃণ বেদীর নিচে রুক্ষ মাটি, একই দূরে পায়ে চলা পথ ।
সম্রাটের শেষ ভৃত্য চিরতরে যেখানে শয়ান
তার চেয়ে দূরে, সীমার যেখানে শেষ
যেখানে উদ্ভিদ, জল মেতে আছে পাংশু ঈর্ষায়

যেখানে বিশীর্ণ হাত কাদার ভেতরে খোঁজে বালির ফসল
তার চেয়ে দূরে
যেখানে শামুক তার খাদ্য পায়, নিজেও সে খাদ্য হয়
ভেসে যায় সাপের খোলস, সেখানেও
আমার অতৃপ্তি বড় দীর্ঘশ্বাস বিষদৃষ্টি নিয়ে জেগে রয়—
মুকুট খোলার পর আমি আরও বহুদূরে নেমে যেতে চাই।

তুমি

তুমি অপরূপ, তুমি সৃষ্টির যথেষ্ট পূজা পেয়েছো জীবনে ?
তুমি শুভ্র, বন্দনীয়, নারীর ভিতরে নারী, আপাতত একমাত্র তুমি,
বাথরুম থেকে এলে সিক্ত পায়ে, চরণকমলযুগ চুম্বনে মোছার যোগ্য ছিল—
তিন মাইল দূরে আমি ওষ্ঠ খুলে আছি, পূজার ফুলের মতো ওষ্ঠাধর
আমি পুরোহিত, দেখো, আমার চামর বাহু, স্বতোৎসার শ্লোক
হৃদয় অহিন্দু, মুখ সোমেটিক, প্রেমে ভিন্ন কোপটিক খ্রীস্টান
আশৈশব থেকে আমি পুরোহিত হয়ে উঠে তোমার রূপের কাছে ঋণী
তোমার রূপের কাছে অগ্নি, হেম, শস্য, হবি—পদাঘাতে পূজার আসন
ছড়িয়ে লুকাও তুমি বারবার, তখন তন্ত্রের ক্ষোভে অসহিষ্ণু আমি
সবলে তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনায়, জীবন জাগাতে চেয়ে জীবনের ক্ষয়
ওষ্ঠের আর্দ্রতা থেকে রক্ত ঝরে, নারীর বদলে আমি স্ত্রীলোকের কাছে
মাথা খুঁড়ি, পুরোহিত থেকে আমি পুরুষের মতো চোখে ক্রূরতা ছড়িয়ে
আঙুলে আকাশ ছুঁই, তোমার নিশ্বাস থেকে নক্ষত্রের জন্ম হলে
আমি তাকে কশ্যপের পাশে রেখে আসি।

এরকম পূজা হয়, দেখো ত্রিশিরা ছায়ায় কাঁপে ইহকাল
এমন ছায়ার মধ্যে রূপ তুমি, রূপের কঠিন ঋণ বিশাল মেখলা
আমি ঋণী, আমি ক্রীতদাস নই, আরাধনা মন্ত্রে আমি
তোমাকে সম্পূর্ণ করে যাবো।

কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি

সাদা বাড়িটার সামনে আলো-ছায়া-আলো, একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে
এখন দুপুর রাত অলীক রাত্রির মতো, অরুণা রয়েছে খুব ঘুমে—
যে রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে ঘুম স্পষ্টত খুব নীল ;
যে-স্তনে লাগেনি দাঁত তার খুব মৃদু ওঠাপড়া
তলপেটে একটুও নেই ফাটা দাগ, এ শরীর আজও ঋণী নয়
এই সেই অরুণা ও রুনি নাম্নী পরা ও অপরা
সুখ ও অসুখ নিয়ে ওষ্ঠাধর, এখন রয়েছে খুব ঘুমে
যে রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে-ঘুম স্পষ্টত খুব নীল ।

সন্ন্যাসীর সাহসের মতো শান্ত অন্ধকার, কে তুমি কঙ্কাল—
প্রহরীর মতো একা, কেন বাধা দিতে চাও ? কী তোমার ভাষা ?
ছাড়ো পথ, আমি ঐ সাদা বাড়িটার মধ্যে যাবো ।
করমচা ফুলের ঘ্রাণ আলপিনের মতো এসে গায়ে লাগে
থামের আড়াল থেকে ছুটে এলো হাওয়া, বহু ঘুমের নিশ্বাস
ভরা হাওয়া
আমি অরুণার ঘুমে এক ঘুম ঘুমোতে চাই আজ মধ্য রাতে
অরুণার শাড়ি ও সায়ার ঘুম, বুকে ঘুম, কুমারী জন্মের
পবিত্র নরম ঘুম, আমি ব্রাহ্মণের মতো তার প্রার্থী ।

নিরস্ত্র কঙ্কাল, তুমি কার দূত ? তোমার হৃদয় নেই, তুমি
প্রতীক্ষার ভঙ্গি নিয়ে কেন প্রতিরোধ করে আছো ?
অরুণা ঘুমন্ত, এই সাদা বাড়িটার দ্বারে তুমি কেন জেগে ?
তুমি ভ্রমে বদ্ধ, তুমি ওপাশের লাল রাঙা প্রাসাদের কাছে যাও
ঐখানে পাশা খেলা হয়, হু-র-রে চিৎকারে ওঠে হৃদয়ে হৃদয়ে শকুনির ঝটাপটি
তুমি যাও
ছাড়ো পথ, আমি এই নিদ্রিত বাড়ির মধ্যে যাবো ।

নিরাভরণ

পায়ে তোমার কাঁটা ফুটেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ?
তুমি তাহলে পিছনে থাকো
বন্ধু ছিলে উদাসীনতা, তোমারও সাধ গৃহী হতে ?
ডাইনে যাও
পোশাক, তুমি ছিন্ন হবে ? শান্তি, তোমার তৃষ্ণা পাবে ?
জিরোও এই গাছের নিচে
হলুদ বই, সাদা বোতাম, কৃতজ্ঞতা, চাবির দুঃখ, বিদায় দাও
আমার আর সময় নেই, আমি এখন
পেরিয়ে মজা দিঘির কোণ, প্রণাম করে অরণ্যের সিংহাসন, সামনে ঘুরে
দিগন্তের চেয়েও একটু দূরে যাবো ।

প্রবাসের শেষে

যমুনা, আমার হাত ধরো । স্বর্গে যাবো ।
এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর
নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ, এসো
স্বর্গ খুব দূরে নয়, উত্তর সমুদ্র থেকে যেরকম বসন্ত প্রবাসে
উড়ে আসে কলস্বর, বাহু থেকে শীতের উত্তাপ
যে রকম অপর বুকের কাছে ঋণী হয়, যমুনা, আমার হাত ধরো,
স্বর্গে যাবো ।

আমার প্রবাস আজ শেষ হলো, এ রকম মধুর বিচ্ছেদ
মানুষ জানেনি আর । যমুনা আমার সঙ্গী—সহস্র রুমাল
স্বর্গের উদ্দেশ্যে ওড়ে, যমুনা তোমায় আমি নক্ষত্রের অতি প্রতিবেশী
করে রাখি, আসলে কি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদ মাখানো অশ্রু
তুমি নও ?
তুমি নও ফেলে আসা লেবুর পাতার ঘ্রাণে জ্যোৎস্নাময় রাত ?

তুমি নও ক্ষীণ ধূপ ? তুমি কেউ নও
তুমিই বিস্মৃতি, তুমি শব্দময়ী, বর্ণ-নারী, স্তন ও জঙ্ঘায়
নারী তুমি,
ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয় পিপাসা
চোখের বিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়
প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী,
তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ
ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ

পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী ।

তুমি এ রকম ? তুমি কেউ নও
তুমি শুধু আমার যমুনা ।
হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লজ্জিত জীবন
অন্তরীক্ষে বর্ণনাকে দৃশ্য করে, এসো, হাত ধরো ।
পৃথিবীতে বড় বেশী দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে
আমি খুনী, আমি পাতাল শহরে জালিয়াত, আমি অরণ্যের
পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙার ছদ্মবেশী
গুপ্তচর ।
তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে রকম প্রাক্তন স্বদেশ ।
তুমি তো জানো না কিছু, না প্রেম, না নিচু স্বর্গ, না জানাই ভালো
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকালের পুরস্কার····

আয় খুকি, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি ।

আমার স্বপ্ন

সূচিপত্র

বাতাসে তুলোর বীজ

বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার ?
এই দিক শূন্য ওড়াউড়ি, এ যেন শিল্পের রূপ—
আচমকা আলোর রশ্মি পপি ফুল ছুঁয়ে গেলে
যে রকম মিহি মায়াজাল
বাতাসে তুলোর বীজ তুমি কার ?
পাহাড়ী জঙ্গল
থেকে
উড়ে এলে
খোলা-জানলা পাঁচকোনা ঘরে
আমার শব্দের রেশ উড়ে যায়
নামহীন নদীটির ধারে
স্বপ্নের ভিতর ফোটে স্নেহের মতন জ্যোৎস্না
বৃদ্ধ কৃষকের ছায়া
আলপথে দাঁড়িয়ে ধানের গন্ধ নেয়
ঘুমে আঠা হয়ে আসে দূরে কোনো অচেনা নারীর চোখ....
এ যেন শিল্পের রূপ
এই দিক শূন্য ওড়াউড়ি
বাতাসের তুলোর বীজ, তুমি কার ?

এক একদিন উদাসীন

এমনও তো হয় কোনোদিন
পৃথিবী বান্ধবহীন
তুমি যাও রেলব্রীজে একা—
ধূসর সন্ধ্যায় নামে ছায়া
নদীটিও স্থিরকায়া
বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা।

ইস্টিশানে অতি ক্ষীণ আলো
তাও কে বেসেছে ভালো
এত প্রিয় এখন দ্যুলোক
হে মানুষ, বিস্মৃত নিমেষে
তুমিও বলেছো হেসে
বেঁচে থাকা স্বপ্নভাঙা শোক !
মনে পড়ে সেই মিথ্যে নেশা ?
দাপটে উল্লাসে মেশা
অহঙ্কারী হাতে তরবারি
লোভী দুই চক্ষু চেয়েছিল
সোনার রুপোর ধুলো
প্রভুত্বের বেদী কিংবা নারী !
আজ সবকিছু ফেলে এলে
সূর্য রক্তে ডুবে গেলে
রেলব্রীজে একা কার হাসি ?
হাহাকার মেশা উচ্চারণে
কে বলে আপন মনে
আমি পরিত্রাণ ভালোবাসি !

যদি নির্বাসিন দাও

যদি নির্বাসিন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো !
বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত তুমি
যদি নির্বাসিন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
মোচার খোলায় ঘোরে
লুঠেরা, ফেরারী।
শহরে বন্দরে এত অগ্নি-বৃষ্টি
বৃষ্টিতে চিক্কণ তবু এক একটি অপরূপ ভোর,
বাজারে ক্রূরতা, গ্রামে রণহিংসা
বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
বুলেট ও বিস্ফোরণ
শঠ তঞ্চকের এত ছদ্মবেশ
রাত্রির শিশিরে কাঁপে ঘাস ফুল—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিথর দীঘির পারে বসে আছে বক
আমি কি ভুলেছি সব
স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক ?
আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে
শিমুল তুলোর ওড়াওড়ি ?
মোষের ঘাড়ের মতো পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মতো বালিকার হাসি
নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ
শুনিনি কি দুপুরে চিলের
তীক্ষ্ণ স্বর ?
বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ…
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাব।

বহুদিন লোভ নেই

বহুদিন লোভ নেই, শব্দে শিহরন, স্বপ্নে শিহরন, ঘুম
শরীরে দুপুর এলো, যেন বহুদিন লোভ নেই
বহুদিন লোভ নেই, শ্মশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি ;

এবার তোমার কাছে চলে যাবো, 'তুমি' বহু গ্রন্থ থেকে চুরি.
এরকম যেতে হয়, বিকেলে মন খারাপ হলে তোমার ছায়ায়
না গেলে মানায় না, কিংবা চিঠি, বহু পুরোনো ভুলের
শোক থেকে ছায়ার ভিতরে জ্যোৎস্না, অথবা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ফেলা
শরীরের নিবেদন,—বৃষ্টি থেকে ঘুম থেকে উঠে
তোমার বিজন ভালো, অশ্রু ভালো, বুক ভালো, এমন কি সর্বস্বতা খুলে
ভাঁটফুল দেখা ভালো, চোখ বুজে চোখ রাখা ভালো।

এরকম রাখা গেছে বহুবার, 'তুমি' নও, তাদের সবারই নাম ছিল
তাঁবুর ভিতরে সুশ্রী মুখখানি বরফের জীবনে ডুবেছে
তাঁবু মিথ্যে, সুশ্রী মিথ্যে, বরফ, জীবন, ডোবা কম মিথ্যে নয়
যেমন কবিতা মিথ্যে,
রক্তমাখা হাতে বেণী খুলে দিলে স্ত্রীলোকের যেমন আনন্দ
যেমন পৃথিবী থেকে সব গাছ খুন করেছিল পাগলা কবি
এরকম দিন গেছে, প্রতিদিন নাম জেনে ভুলে যাওয়া মুখ
লোভহীন উদাসীন, বিশাল চিৎকারে বহু মিথ্যে অসীমতা
এরকম দিন গেছে, দিনের ভিতরে শুকনো চড়া পড়ে আছে।

বহুদিন লোভ নেই, শ্মাশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি।

শব্দ

ঝাটিংগা নামের এক দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর পাশে
হারাংগাজাও নামে একটা
নম্র ছিমছাম স্টেশন
পাথুরে প্ল্যাটফর্মে একজন রেলবাবু কাঁঠালের দর করছেন

আমাদের কামরায় পর্যাপ্ত ভিড় ও হাতকড়া বাঁধা
দু'জন খুনী আসামী
এবং উজ্জ্বল স্কার্ট-পরা চারটি
সুস্বাস্থ্যবতী অহঙ্কারী খাসিয়া তরুণী,
কয়েকজন শিখ সৈনিক,
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ
আর, দু'পাশে বিশাল আদিম পাহাড় ও
চাপ চাপ বিশৃঙ্খল অরণ্য
দৃশ্যটি এই রকম।

জানলার পাশে বসে আমি সিগারেট টানছিলাম
ঝাটিংগা ও হারাংগাজাও এই দুর্বোধ্য নাম দুটি
মাথার মধ্যে টং টং শব্দ করে
কিছুতেই অন্যমনস্ক হতে দেয় না।
এও সেই শব্দের স্বজাতি যা ব্রহ্মস্বাদ সহোদর
এইসব শব্দের কূলপ্লাবিনী রহস্য বা আরণ্যক মাদকতা
খেলা করে আমাকে নিয়ে
ঐ দূর পাহাড়-প্রতিবেশী অরণ্য দেখলে মনে হয়
ওখানে কখনো মানুষ প্রবেশ করেনি
যদিও জরিপের কাজ পৃথিবীতে আর কোথাও বাকি নেই—
অরণ্য চোখ ফিরিয়ে আমি অহঙ্কারী নারীদের
নদীর মতন উরু দেখেই তৎক্ষণাৎ
ঝাটিংগার মাংসল জলের স্রোত ও
খুনী আসামীদ্বয়ের ধ্যাতা মুখ এবং
সৈনিকের নিস্পৃহতা—
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ....

খেলা ভেঙে দিয়ে আমি বললাম, শান্তনু, দেশলাইটা দাও তো—
এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমি নিজেকে নিজের মধ্যে
বন্দী করার চেষ্টা করি
তবু একটু পরেই ঝাটিংগা শব্দটি আকাশে লাফ দিয়ে ওঠে
পাহাড়ের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়
এক প্রবল চিৎকার : হারাংগাজাও!

এ যেন লালডেঙ্গা বাজাচ্ছে তার সমর ভেঁপু
পাহাড়ী অরণ্যের ক্রুদ্ধ মানুষ ঘোষণা করছে নিজস্ব সীমানা
যেন আমাকেও সাড়া দিতে হবে, মনে মনে বলি,
দাঁড়াও, আমিও আসছি এক্ষুনি,
আমিও এই পৃথিবীর, তোমারই দলের
কত পাহাড় চূড়ায় এ জীবনে আর ওঠা হবে না
কত ক্ষমা চাওয়া বাকি থাকবে···
ঈষৎ নুয়ে পড়া এক রমণীর উপচে ওঠা বুকে
শেষবার চোখ রেখেছে
যমজের মতন ঐ দুই খুনী আসামী
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের আর কোনো দোষ নেই—
মেখলা কখনো আচমকা খুলে যায় কিনা এই নিয়ে গুপ্ত গবেষণা
সমতলে উৎকট গ্রীষ্ম, এখানে ঠাণ্ডা নরম হাওয়া
হঠাৎ পাতলা মেঘ এসে নদীটি আর দৃশ্য নয়,
মাদক ছলচ্ছল ধ্বনি—
রেলবাবুটির দরাদরি শেষ হয়নি, পাথর থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে জল
সকালের নিথর আচ্ছন্নতা খানখান করে ভেঙে
অন্তরীক্ষে বিশাল গর্জন জেগে ওঠে :
ঝা-টি-ং-গা ! হা-রা-ং-গা-জা-ও !
এই বুনো রোমাঞ্চকর শব্দ
ট্রেনের কামরা থেকে আমাকে টেনে হিঁচড়ে
বার করে নিয়ে বলতে চায়—
এসো, এসো, দ্বিধা করছো কেন, তুমিও পৃথিবীর আদিবাসী !

আমার কৈশোরে

শিউলি ফুলের রাশি শিশিরের আঘাতও সয় না
অন্তত আমার কৈশোরে তারা এরকমই ছিল
এখন শিউলি ফুলের খবরও রাখি না অবশ্য
জানি না, তারা স্বভাব বদলেছে কিনা ।

আমার কৈশোরে শিউলির বোঁটার রং ছিল শুধু
শিউলির বোঁটারই মতন
কোনো কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা চলতো না
আমার কৈশোরে পথের ওপর ঝরে পড়ে থাকা
শিশিরমাখা শিউলির ওপর পা ফেললে
পাপ হতো
আমরা পাপ কাটাবার জন্য প্রণাম করতাম।

আমার কৈশোরে শিউলির সম্মানে সরে যেত বৃষ্টিময় মেঘ
তখন রোদ্দুর ছিল তাপহীন উজ্জ্বল
দু' হাত ভরা শিউলির ঘ্রাণ নিতে নিতে মনে হতো
আমার কোনো গোপন দুঃখ নেই, আমার হৃদয়ে
কোনো দাগ নেই
পৃথিবীর সব আকাশ থেকে আকাশে বেজে উঠছে উৎসবের বাজনা!
সাদা শিউলির রাশি বড় শুদ্ধ, প্রয়োজনহীন, দেখলেই
বলতে ইচ্ছে করতো,
আমি কারুকে কখনো দুঃখ দেবো না—
অন্তত এরকমই ছিল আমার কৈশোরে
এখন অবশ্য শিউলি ফুলের খবরও রাখি না।

রূপালি মানবী

রূপালি মানবী, সন্ধ্যায় আজ শ্রাবণ ধারায়
ভিজিও না মুখ, রূপালি চক্ষু, বরং বারান্দায় উঠে এসো
ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ
রূপালি মানবী, তালা খুলে নাও, দেয়ালে বোতাম আলো জ্বেলে নাও,
অথবা অন্ধকারেই বসবে, কাচের শার্সি থাকুক বন্ধ
দূরে থেকে আজ বৃষ্টি দেখবে, ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, তালা খুলে নাও।

চাবি নেই, একি! ভালো করে দ্যাখো হাতব্যাগ, মন
অথবা পায়ের নিচে কার্পেট, কোণ উঁচু করে উঁকি মেরে নাও

চিঠির বাক্সে দ্যাখো একবার, রূপালি মানবী, এত দেরী কেন ?
বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, ঝড়ের ঝাপ্‌টা তোমাকে জড়ায়
তোমার রূপালি চুল খুলে দেয়, চাবি খুঁজে নাও—
তোমার রূপালি অসহায় মুখ আমাকে করেছে আরও উৎসুক—
ধাক্কা মারো না ! আপনি হয়তো দরজা খুলবে, পলকা ও তালা
অমন উতলা রূপালি মানবী তোমাকে এখন হওয়া মানায় না
অথবা একলা রয়েছো বলেই বৃষ্টি তোমাকে কোনো ছলে বলে
ছুঁতে পারবে না, ফিরবে না তুমি বাইরে বিপুল লেলিহান ঝড়ে—
তালা খুলে নাও ।

রূপালি মানবী, আজ তুমি ঐ জানলার পাশে বেতের চেয়ারে
একলা বসবে আঁধারে অথবা দেয়ালে বোতাম আলো জ্বেলে নাও
ঠাণ্ডা কাচের শার্সিতে রাখো ও রূপালি মুখ, দুই উৎসুক চোখ মেলে দাও ।

বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, আজ তুমি ঐ রূপালি শরীরে
বৃষ্টি দেখবে প্রান্তরময়, আকাশ মুচড়ে বৃষ্টির ধারা·····
আমি দূরে এক বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একলা রয়েছি,
ভিজেছে আমার সর্ব শরীর, লোহার শরীর, ভিজুক আজকে
বাজ বিদ্যুৎ একলা দাঁড়িয়ে কিছুই মানি না, সকাল বিকেল
খরচোখে আমি চেয়ে আছি ঐ জানলার দিকে, কাচের এপাশে
যতই বাতাস আঘাত করুক, তবুও তোমার রূপালি চক্ষু—
আজ আমি একা বৃষ্টিতে ভিজে, রূপালি মানবী, দেখবো তোমার
বৃষ্টি না-ভেজা একা বসে থাকা ।

জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না

আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না
মৃত্যু হয় না—
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম ।

আমার কেউ নাম রাখেনি, তিনটে চারটে ছদ্মনামে
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে,
আগুন দেখে আলো ভেবেছি, আলোয় আমার
হাত পুড়ে যায়
অন্ধকারে মানুষ দেখা সহজ ভেবে ঘূর্ণিমায়ায়
অন্ধকারে মিশে থেকেছি
কেউ আমাকে শিরোপা দেয়, কেউ দু' চোখে হাজার ছি ছি
তবুও আমার জন্ম-কবচ, ভালোবাসাকে ভালোবেসেছি
আমার কোনো ভয় হয় না,
আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।

শোকসভায় এক সন্ধ্যা

এইখানে বসবে এসো, অবিনাশ, বেদনার পাশের চেয়ারে
সাবধান, ছুঁয়ো না ওকে, ও বড় নশ্বর স্রোতে ভেসে যেতে চেয়ে
রূপালি আলোর চোখে থমকে আছে, উন্মোচিত চুলে
ক্ষণিক আঙুল রেখে ও যেন রক্তাক্ত সন্ধ্যা
দৃশ্যমান করে
ওর দৃষ্টি, আমি জানি, বড় ভয়ঙ্কর লক্ষ্যভেদী। সরে এসো,
অবিনাশ, স্পর্শ করো না, সাবধান!

সভাপতি বড় ক্রুদ্ধ, দেশ কাল বাণিজ্য সন্ততি
হুড়োহুড়ি করে মঞ্চে, সিগারেট খেতে উঠে গেল তিনজন
গত রাত্রে ঝড়ে ভাঙা গোলাপের ডাল থেকে ফুলগুলি ছিঁড়ে
কে শূন্যে রেখেছে গেঁথে ? ফুলে বড় বিস্মরণ আসে
কে কোথায় জেগে আছে সকাল না গোধূলির শিয়রের
কাছে, ভুল হয় ; চোখে ভাসে সহস্র নিয়তি।
(প্রতিটি বক্তার জন্য পুনরায় শোকসভা করে যেতে হবে একদিন)

চলো আমরা বাইরে যাই, অবিনাশ, আমাদের মত্ত কণ্ঠস্বরে
অজস্র গম্ভীর মুখে বিম্ব রেখা ফোটে।

বেদনা ওখানে থাক, একা স্তব্ধ, স্বপ্নদষ্ট, স্থির
ওর এত উগ্র রূপ, অমন উজ্জ্বল শাড়ি আজ আমাদের সঙ্গে
বড় বেমানান
তার চেয়ে শনিবার ওকে নিয়ে পেনেটিতে স-উপকরণ
বেলেল্লা নষ্টামি করে কিছুক্ষণ কাটবে চমৎকার।

চলো আমরা বাইরে যাই শঙ্কিত শোভায়, অন্ধকারে
হলুদ সর্ষের ক্ষেতে ভ্রমে বদ্ধ কৃষকের মতো
বহুদিন ভূমিকম্পে কাঁপেনি ধরিত্রী তাই মাথার উপরে
কেঁপে ওঠে চকিত আকাশ—
চতুর্দিকে গর্জমান লক্ষ লক্ষ জীবিত নিশ্বাস
কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে, একদা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল
আমাদের সঙ্গে যেতে ঠিক এই পথে হিরণ্ময়।
হিরণ্ময়, হিরণ্ময়, নাম ধরে ডেকে ওঠে
আমাদের বিপন্ন বিস্ময়।
দন্তশূলে কষ্ট পেলে লোকে বড় পরিহাস করে
তার চেয়ে মৃত্যু আরও লঘু মনে হয়।

কিশোর ও সন্ন্যাসিনী

ফকির সাহেবের প্রাচীন মাজারের কাছাকাছি আস্তানা গেড়েছিলেন সন্ন্যাসিনী
একটি কিশোর তার অল্প দূরে এসে দাঁড়াতো
আগরতলার ইজের ও চেন লাগানো হলুদ গেঞ্জি
পা দুটো ফাঁক করা, চুলে সর্ষের তেলের বাস
দ্যাখো, চিনতে পারো সেই কিশোরকে

না, তার মুখ দেখা যায় না। কিংবা অতিরিক্ত বিস্ময়ে তার
মুখচ্ছবি অস্পষ্ট।
একদিন সে গুটি গুটি এগিয়ে এসেছিল, কাছে, উবু হয়ে বসে
সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ভয় করে না?

সন্ন্যাসিনী তাঁর পুরু ওষ্ঠধর সামান্য ফাঁক করে হেসে বলেছিলেন····
মনে আছে কী উত্তর দিয়েছিলেন ?

না, সন্ন্যাসিনীর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দুলছিল একটু একটু
করতলে রাখা ছিল আমলকী
ধুনীর আগুনে তাঁর চোখ পাকা করমচার মতন রক্তিম
তাঁর জম্বুরার মতন দুটি বুক গেরুয়া ভেদ করে আসতে চায়
না, সন্ন্যাসিনী কী বলেছিলেন মনে নেই !

সন্ন্যাসিনী বাঁ হাতের তর্জনী তুলেছিলেন শুক্লা দ্বাদশীর
আকাশের দিকে—
কিশোর দেখলো, কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁকে দাঁড়িয়ে আছেন কালপুরুষ
একটা প্যাঁচা উড়ে গেল চাঁদ আড়াল ক'রে
মনে আছে ?

না, শুধু মনে পড়ে সন্ন্যাসিনীর কপালের ফোঁটায়
চটচটে মেটে সিঁদুর খেতে এসেছিল কয়েকটা পিঁপড়ে
ফকির সাহেবের মাজার থেকে ভেসে এসেছিল গুগ্‌গুলের গন্ধ
রাতচরা চোখ-গেল'র সঙ্গে ডেকে উঠেছিল শকুনের ছানা
তখন অনেক রাত
আধপোড়া কাঠে ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে সন্ন্যাসিনী হঠাৎ বলেছিলেন ক্লান্ত গলায়—
আমি আর বেশীদিন থাকবো না রে ! আমি বুকের মধ্যে
সব সময় চিলের ডাক শুনতে পাই ।
সেই কিশোর তখন সন্ন্যাসিনীর কপাল থেকে পিঁপড়ে খুঁটে
তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করেছিল,
ভয় করে ? তুমি কিছু পাওনি, তোমারও এখনো ভয় করে বুঝি ?

মুক্তি

একজন মানুষ মুক্তিফল আনতে গিয়েছিল,
সে বলেছিল, আমি ফিরে আসবো
প্রতীক্ষায় থেকো।
জানি না সে কোথায় গেছে
কোন্ হিম নিঃসঙ্গ অরণ্যে
বা কোন্ নীলিমাভুক পাহাড় চূড়ায়
জানি না তার সামনে কত দুস্তর বাধা
জানি না সে সংগ্রাম করছে কোন্
অসহনীয়ের সঙ্গে।
সে মুক্তিফল আনবে বলেছিল
সে বলেছিল প্রতীক্ষায় থাকতে
আমি দ্বাদশ বৎসর থাকবো তার জন্য পথ চেয়ে
তার পরেও সে না ফিরলে
আমাকে যেতে হবে.....

আমিও না ফিরলে যাবে আমার সন্তান-সন্ততিরা।

যা ছিল

শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দুপুরের ক্ষণিক কৌতুকে
মন স্বচ্ছ হতে গিয়ে থমকে যায়
পাথরে শ্যাওলার ছোপ, ঝিরঝিরে স্রোতের মধ্যে
বাদামের খোসা
নদীর ওপার থেকে অনায়াসে নীরা নাম্নী মহিলাটি
কুর্চি ফুল নিয়ে ফিরে আসে
গাছের শিকড়ে রাখে সোয়েটার
সিগারেট টেনে আমি মন-খারাপ ধোঁয়া ছেড়ে
ভেঙে দিই বালির প্রাসাদ।

একদিন নদী ছিল চঞ্চলা নর্তকী,
তার তীরে
রমণীর লাস্য ছিল আরও রমণীয়
প্রবল ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের ওঠানামা
ভুল ভাঙবার মতো অকস্মাৎ কূল ভেঙে পড়া
নদীর ওপার ছিল দীর্ঘশ্বাস যত দূরে যায়—
নীরা, মনে পড়ে, এই নদীর তরঙ্গে
তোমার শরীরখানি একদিন
অপ্সরার রূপ নিয়েছিল ?
জলের দর্পণে আমি ডুব দিয়ে পাতাল খুঁজেছি
দেখেছি তা স্বর্গ থেকে দূরে নয়, কে কাকে হারায়
তোমার বুকের কাছে নীল জল ছলচ্ছল—সীমাহীন মায়া
আমার নিভৃত সুখ, আমার দুরাশা
এখন এ শীর্ণ নদী....বুকে বড় কষ্ট হয়....
জলের সম্মুখ ছাড়া নারীকে মানায় না ।

চন্দনকাঠের বোতাম

যেমন উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছি বহুবার, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হয়নি
যেমন হাত অঞ্জলিবদ্ধ করেছি বহুবার, কখনো প্রার্থনা জানাইনি
যেমন নারীর কাছে মৃত্যুকে সমর্পণ করেছিলাম
মৃত্যুর কাছে নারীকে
যেমন বৃক্ষের কাছে জল্লাদের মতন গিয়েছি কুঠার হাতে
উপকথার কাঠুরেকে করেছি উপহাস
যেমন মানুষের কাছে আমিও মানুষ সেজে থাকতে চেয়েছিলাম
কৃতজ্ঞতার বদলে ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ
যেমন স্বপ্নের মধ্যে নিজের শৈশব দেখেও চিনতে পারিনি
লোকের মধ্যে শিশুকে আদর করেছি লৌকিকতাবশত
ডাকবাংলোর বন্ধ দরজার সামনে চাবির বদলে হাতুড়ি চেয়েছিলাম

যেমন ঝামরে-পড়া অন্ধকারের মধ্য থেকে সর্বাঙ্গে ভুসো কালি মেখে
এসেছিলাম আলোর কাছে
যেমন কুকুরের দাঁতে বার বার ছুঁয়েছি স্তন ও ওষ্ঠসমূহ
যেমন জ্যোৎস্নার মধ্যে গন্ধরাজ ফুলগাছের পাশে দেখেছিলাম
এক বোবা কালা প্রেত
যেমন বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে গলা মুচড়ে মেরেছিলাম ধবল হাঁস
কান্না লুকোবার জন্য নদীতে স্নান করতে গিয়েছি
যেমন অন্ধ মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল
আমার পূর্বজন্মের চেনা
অত্যন্ত মমতায় আমি তাকে উপহার দিয়েছিলাম রুপো বাঁধানো আয়না
যেমন ফিরে আসবো বলেও ফিরে যাইনি বেশ্যার কাছে
সমুদ্রের কাছেও আর যাইনি
ফিরে যাইনি ধলভূমগড়ের লালধুলোর রাস্তায়
দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিতা ধাইমা'র কাছেও যাওয়া হয়নি
যেমন ঠিকানা হারিয়ে বহু চিঠির উত্তর লেখা হয় না
তবু জেগে থাকে অভিমান
যেমন মায়ের কাছেও গোপন করেছি শরীরের অনেক অসুখ
যেমন মনে মনে গ্রহণ করা অনেক শপথ কেউ শুনতে পায়নি
বলেই মেনে চলিনি
যেমন কাঁটা বেঁধার পর রক্ত দর্শনে সূর্যাস্তের আবহমান
দৃশ্য থেকে ফিরে আসে চোখ ;

তেমনই এই চৌতিরিশ বছরে এক ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে
আমার চকিতে দিগ্‌ভ্রম হয়
বৃক্ষসারি ছুটে যায় আমার আপাত গতির বিপরীত দিকে
পুকুরে স্নানের দৃশ্য মুহূর্তের সত্য থেকে পরমুহূর্তের অলৌকিক
আমার বুক টনটন করে ওঠে অথচ নির্দিষ্ট শোক নেই
সান্ত্বনার কথা মনে আসে না
আয়ুর সীমানা কেউ জানে না, তাই মনে হয় অনেক কিছু হারিয়েছি
কিন্তু মুহূর্তের সত্যেরই মতন, সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়ে
কৈশোরে হারিয়েছিলাম অতি প্রিয় একটা চন্দনকাঠের বোতাম
এখনও নাকে আসে তার মৃদু সুগন্ধ
শুধু সেই বোতামটা হারানোর দুঃখে
আমার ঠোঁটে কাতর ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে।

আমি যদি

পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা বানাতে চেয়েছে ডায়নামাইট
মানুষের জন্য রাস্তা
আজ তারা বিমান ও প্রসাদ ওড়াচ্ছে
মানুষেরই হাতে।
নদীর পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ দিয়ে
হেঁটে যায় মাথায় তালপাতার টোকা পরা
একজন মানুষ
সে এসব কিছু জানে না।

পশুর থেকে বলীয়ান হবার জন্য
একদিন তৈরী হয়েছিল অস্ত্র
আজ পশুরা সব নিহত
অস্ত্রগুলি ক্রমশ শাণিত হয়ে
লকলকে জিভ বার করে খুঁজছে শিকার
শস্ত্রপাণি মহাবীর যোদ্ধা ভিয়েৎনাম ও বাংলাদেশে
নিরস্ত্র শিশুকেও ছিন্নভিন্ন করতে
দ্বিধা করে না এখন।
যা একবার শুরু হয়, তা আর থামে না।
আমি নদীর পারে ঐ তালপাতার টোকা-পরা
মানুষটির সঙ্গী হতে
পারতাম যদি....

গদ্যছন্দে মনোবেদনা

ভেবেছিলাম নিচু করবো না মাথা, তবুও ভেতরের এক কুত্তার বাচ্চা
মাঝে মাঝে মসৃণ পায়ের কাছে ঘষতে চায় মুখ, জানি তো অসীমে
ভাসিয়েছি আমার আত্মার সাদা পায়রা দূত, বলেছি মৃত্যুর চেয়েও সাচ্চা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা—তবু তার দু' একটা পালক খসে
জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হিমে।

মাঝে মাঝে গদি মোড়া চেয়ারে বসলেও ব্যথা করে পশ্চাৎদেশ, আমি জানি
আচম্বিতে পেয়ালা পিরিচ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল আমার
জানলার বাইরে থেকে নিয়তি চোখ মারে, শীর্ণ হাতে দেয় হাতছানি
আমি মনকে চোখ ঠেরে অন্যমনস্ক হই, ইস্ত্রি ঠিক রাখি জামার।

এসব ইয়ার্কি আর কদ্দিন হে? শুধু বেঁচে থাকতেই হালুয়া
টাইট করে দিচ্ছে
অথচ কথা ছিল, সব মানুষের জন্য এই পৃথিবী সুসহ দেখে যাবো,
ঠিক যে রকম
প্রত্যেক মৌমাছির আছে নিজস্ব খুপরি, কিন্তু যার যখন ইচ্ছে
উড়ে যাবার স্বাধীনতা : ফুলের ভেতরে মধু সে জেনেছে, তবু
সঙ্ঘ সভ্যতার জন্য তার শ্রম।

হাসন্ রাজার বাড়ি

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার ঢ্যাঁড়াক্যাড়া—মানুষ না পিপীলিকা, যা রে ছুটে যা
যা রে যা দ্যাখ গা খেলা হুরীর নাচন আর
ভাঁড়ের কেরদানি
এখেনে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাসন্ রাজা।

আলাভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভোমর
উদলা নদীটি আজ বড়ই ছেনালি
বিষয় বুঝলে দাদা, ভুলাতে এয়েছে ও যে দুলায়ে কোমর
যা বেটী হারামজাদী, ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুনকালি!

কও তো হাসন্ রাজা, কি বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি?
শিয়রে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা—
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা!

জানুতে ঠেকায়ে থুতনি হাসান্ চিন্তায় বসে
মুখে তার মিটিমিটি হাসি
কড়ি কড়ি চক্ষু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন আশ্‌মান
ফিসফিসায়ে কয়, বড় আমোদে আছি রে ভাই, ছয়টি ঘরেতে ঐ যে
ছয় দাসদাসী
শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও, আগে দেখে লই
পঙ্খের নকশায় পইড়লো কিনা শেষ টান।

তিনজন মানুষ

গাড়ি বারান্দার নিচে আমরণ অনশনে বসে আছে
তিনজন শ্রমিক
আজ তের দিন ধরে ওদের দেখছি!
শীর্ণ মুখে জ্বলজ্বলে চোখ, রুখু দাড়ি, জট-পাকানো চুল
আধো-হেলান দিয়ে বসা, ওদের ঘুম নেই, খালি পেট
তেতো জিভে ঘুম আসে না
ওদের দেখার জন্য ভিড় জমেনি, ওদের জন্য
মেডিক্যাল বুলেটিন বেরুবে না
আরও তিনচারজন শুধু চাটাইয়ের এক কোণে হাঁটু
আলোয়ানে মুড়ে বসা
নিঃশব্দ, সব কথা ফুরিয়ে গেছে—
বাড়ি ফেরার পথে আজ তের দিন ধরে ওদের দেখছি!

মৃত্যু শিয়রে নিয়ে বসেছো কেন? কেড়ে খেতে পারলে না?
একথা স্বতই আমার মনে আসে, নিজেই লজ্জা পাই—
ওদের নেতারা কেউ এখানে নেই, তারা বাড়িতে ঘুমোচ্ছে
ওদের মালিকরা দিল্লি-বোম্বাইতে ঘুমন্ত
রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে খাটাখাটনি করছে দেড়শোজন ভৃত্য
দরজির কাছে কোমরের মাপ দিচ্ছে রোজ অসংখ্য মানুষ,

গোটা বড়বাজার জুড়ে চৌঁয়া ঢেকুরের শব্দ
এখানে মৃত্যু শিয়রে নিয়ে বসে আছে তিনটি অভুক্ত মানুষ,
নিঃশব্দ
চোখে ঘুম নেই, ক্লান্ত, জিভে তেতো স্বাদ
থমথম করছে
হাওয়া, কেউ জানে না কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হতে চলেছে—
আমি রাজনীতি-ফিতি বুঝি না। আমি সইতে পারছি না ঐ
তিনজন মানুষের নিঃশব্দ বসে থাকা
তোলপাড় করছে আমার বুক, আমি বলতে চাই
সাবধান।
মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না।
সাবধান। মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না।
বাড়িতে ফিরে ভাতের থালার সামনে আমার গা
গুলিয়ে ওঠে—সারা রাত আমার ঘুম আসে না।৮

পেয়েছো কি ?

অপূর্ব নির্মাণ থেকে উঠে আসে
ভোরের কোকিল
কোকিল, তুমি কি পারো মুছে দিতে
সব কলরব ?
হেলেঞ্চা লতায় কাঁপে
শিশিরের বিদায়ী শরীর
শিশির, না আমার শৈশব ?
ভুলে যাওয়া ভালো, কিন্তু
কাঁটার মুকুট পরা মৃত্যু তো
সে নয়।

বৈশাখী আকাশ দেখে গাঢ় হয়
টিয়াঠুঁটি আম
সবই তো উচ্ছিষ্ট করে রেখে গেলে
পেয়েছো কি
যা ছিল পাওয়ার ?
মধ্য জীবনের কাছে প্রশ্ন তোলে
স্থির মধ্যযাম ।

রক্তমাখা সিঁড়ি

চেয়েছি নতুন দিন,
স্নানসিক্ত পৃথিবীর নতুন মহিমা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা যেন মনুষ্য জন্মেই ঘটে যায়
বঞ্চনা শব্দটি যেন
অচেনা ভাষার মতো মূঢ় করে
এ জীবন আনন্দের, চতুর্দিকে হাহাকার মুছে যে রকম স্নিগ্ধ সুখ !
কখনো আনন্দ হয় ফুল ছিঁড়ে,
অপরের অন্ন কেড়ে নয়
চেয়েছি নতুন দিন শ্রেণীহীন, স্পর্ধাহীন, বিশুদ্ধ সমাজ
যখন মুখোশে আর
লুকোবে না মানুষের মুখ
শস্য ও বাণিজ্যে সব লোভের করাল দাঁত ভাঙা
কুটিল ও ষড়যন্ত্রী শৃঙ্খলিত,
পৃথিবীর সব জননীর
বুকের শিশুরা রবে নিরাপদ ;
একাকীত্বে কিংবা জনতায়
স্বপ্নের শব্দের মুক্তি—
ভালোবাসা মিশে যাবে দিগন্ত দেয়ালে
চেয়েছি নতুন দিন, গ্লানিহীন যৌবরাজ্য,
সৃষ্টিতে স্বাধীন !

চাইনি এমন ঘোর কালবেলা, অসহিষ্ণু অবিশ্বাস ঘৃণা
হৃৎপিণ্ডে অন্ধকার
কণ্ঠরুদ্ধ দিনরাত্রে এত হিংসা বিষ
প্রদীপ জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে মুখ দেখাদেখি
চাইনি শ্মশান-শান্তি,
চাইনি পিচ্ছিল গলি ঘুঁজি
সবাই পথিক তবু কে কোথায় যাবে তা ভুলে পথে মারামারি
চাইনি অস্ত্রের রোষ,
শত্রু ভুলে নেশাগ্রস্ত মারণ উল্লাস
বিবেকের ঘরে চুরি, স্বপ্নের নতুন দিন ধুলোয় বিলীন
চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত,
আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন
এতে কার জয় ?
রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনো স্বর্গেও যাবো না !

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ

কাল ভোরবেলা আমি শয়তানকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে
আহ্বান করেছি
লাইব্রেরির মাঠে কাল অসি খেলা হবে ।
হৃদয়, উদ্বেলিত হয়ো না—
বাহু, সমুদ্যত থাকো, স্নায়ুরাশি, সতর্ক—
চোখ, তোমার চিনতে পারা চাই শয়তানের
চোখের গতি
কাল জীবন-মরণ অসি খেলা, কাল জিততে হবে ।

ভিড়ের মধ্যে শয়তান আমার কাঁধে হাত রাখতে চেয়েছিল
সে আমাকে অনুসরণ করেছে পাহাড় চূড়ায়
সালংকারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে অট্টহাসি হেসেছে—
আমি তার মুখে কলমের কালি ছিটিয়ে দিয়েছি ।

শয়তানের একটা দাঁতের রং কালো
চোখের মণি দুটো হলুদ বর্ণ
তার দশ আঙুলে ছটা লোভের আংটি
সে আমাকে কেল্লার প্রান্তরের কথা বলেছিল
আমি তাকে আহ্বান করেছি লাইব্রেরির মাঠে
সেখানে আমি একা থাকবো না
শত শত সৎ মনীষার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে
অসি খেলা হবে কাল সকালে
যদি প্রতিপক্ষ জেতে, সমস্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ছাই হয়ে যাবে !

দু' পাশে

টেবিলের দুই প্রান্তে মুখোমুখি বসে থাকা, অন্তরীক্ষ চোখে
চোখাচোখি করে আছে
পলক পড়ার শব্দ, শুধু ক্ষণিকের অন্ধকার
চোখের ভাষার কাছে মানুষের কৃতঘ্ন সভ্যতা থেমে থাকে ।
আমি তো বুঝি না ঐ ভাষা, বুঝি না নিজেরই চোখ কোন্ কথা
বলে, তবু চেয়ে আছি
পরস্পর দুর্বোধ্যতা, ঢেকে রাখা বুক থেকে ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস—
এর চেয়ে কত সোজা আঙুল স্পর্শের যোগাযোগ,
কাঁধের ওপরে রাখা
অমার্জিত হাত
শরীর সরব হলে দরজা-জানলা সেই ভাষা বোঝে
মুহূর্তের মর্ম বোঝে আয়ু
তবু আমি ভাষা-ভ্রান্ত, বিমূর্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ।

ধাত্রী

শিয়ালদার ফুটপাথে বসে আছেন আমার ধাইমা
দুটো হাত সামনে পেতে রাখা,
ঠোঁট নড়ে উঠছে মাঝে মাঝে
যে কেউ ভাববে দিনকানা এক হেঁজিপেজি বাহাত্তুরে রিফিউজি বুড়ি।
আঁতুড় ঘরে আমার মুমূর্ষু মায়ের কোল থেকে উনি
একদিন আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন
এঁর ডাটো শরীরের স্তন্য পান করেছিলুম
প্রতিদিন শুষে নিয়েছি রক্ত
ধাইমা'র কুঁড়োর গন্ধ মাখা বুকে শুয়ে আমি
চিল-কান্না কেঁদেছি
রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে বসে আমাকে তেল মাখাতে মাখাতে
কত আদিখ্যেতা করতেন
মা-মাসিদের কাছে পরে অনেকবার শুনেছি সেই গল্প—
আমার ভেদ-বমির সময় অমাবস্যার মধ্যরাত্রে স্নান করে
তুলে এনেছিলেন গন্ধবাদালির পাতা
সত্যপীরের দরগায় মানত করেছিলেন আমলকী।

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আমি সিকির বদলে
দশ নয়া খুঁজছিলাম
দিনকানা বুড়ি চাইছিল, দুটো পয়সা দে বাবা!
ধাইমা, তুমি প্রথম আমার চোখ ফাঁক করে দিয়েছিলে
গোলাপজল,
দেখিয়েছিলে পৃথিবী
ধাইমা, এ কোন্ পৃথিবী আমাকে দেখালে?
বুড়ি, সর্বনাশিনী, আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছিলি
এই অকল্পনীয় পৃথিবীতে
আমি আর কত কিছু হারাবো?

মানে আছে

প্রবল স্রোতের পাশে হেলে পড়া কদম বৃক্ষটি ?
এরও কোনো মানে আছে
নির্জন মাঠের মধ্যে পোড়োবাড়ি—হা হা করে ভাঙা পাল্লা
এরও কোনো মানে আছে।
ঠিক স্বপ্ন নয়, মাঝে মাঝে চৈতন্যের প্রদোষে-সন্ধ্যায়
শিরশিরে অনুভূতি
কি যেন ছিল বা আছে, অথবা যা দেখা যায় না
দুরন্ত পশুর মতো ছুটে আসে বিমূঢ়তা
জানলার পর্দাটা দুলছে কখনো আস্তে বা জোরে
এরও কোনো মানে নেই ?

চুম্বন সংলগ্ন কোনো রমণীর চোখে আমি দেখিনি কি
অন্যমনস্কতা ?
চেনা বানানের ভুল বার বার। অকস্মাৎ স্মৃতির অতল থেকে
উঠে আসে
শৈশবের প্রিয় গান, দু' একটা লাইন
বারান্দায় পাখিটি বসেই ফের উড়ে যায়
হেমকান্তি সায়াহ্নের দিকে
এরও কোনো মানে নেই ?

নীরার দুঃখকে ছোঁয়া

কতটুকু দূরত্ব ? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে
আমি তোমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসি
তোমার নগ্ন কোমরের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলার আগে
অলঙ্কৃত পাড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য পায়ের পাতা দুটি
বুকের কাছে এনে
চুম্বন ও অশ্রুজলে ভেজাতে চাই

আমার সাঁইত্রিশ বছরের বুক কাঁপে
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বাইরের জীবন মিথ্যে হয়ে যায়
বহুকাল পর অশ্রু এই বিস্মৃত শব্দটি
অসম্ভব মায়াময় মনে হয়
ইচ্ছে করে তোমার দুঃখের সঙ্গে
আমার দুঃখ মিশিয়ে আদর করি
সামাজিক কাঁথা সেলাই করা ব্যবহার তছনছ করে স্ফুরিত হয় একটি মুহূর্ত
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তোমার পায়ের কাছে...

বাইরে বড় চ্যাঁচামেচি, আবহাওয়ায় যখন তখন নিম্নচাপ
ধ্বংস ও সৃষ্টির বীজ ও ফসলে ধারাবাহিক কৌতুক
অজস্র মানুষের মাথা নিজস্ব নিয়মে ঘামে
সেই তো শ্রেষ্ঠ সময় যখন এ সবকিছুই তুচ্ছ
যখন মানুষ ফিরে আসে তার ব্যক্তিগত স্বর্গের
অতৃপ্ত সিঁড়িতে
যখন শরীরের মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মনে পড়ে যায়
এলাচ গন্ধের মতো বাল্যস্মৃতি
তোমার অলোকসামান্য মুখের দিকে আমার স্থির দৃষ্টি
তোমার তেজী অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়
দ্যুলোক-সীমানা
প্রতীক্ষা করি ত্রিকাল দুলিয়ে দেওয়া গ্রীবাভঙ্গির
আমার বুক কাঁপে,
কথা বলি না
বুকে বুকে রেখে যদি স্পর্শ করা যায় ব্যথা সরিৎসাগর
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসি অসম্ভব দূরত্ব পেরিয়ে
চোখ শুকনো, তবু পদচুম্বনের আগে
অশ্রুপাতের জন্য মন কেমন করে !

কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে

দু'জন খসখসে সবুজ উর্দি পরা সিপাহী
কবিকে নিয়ে গেল টানতে টানতে—
কবি প্রশ্ন করলেন : আমার হাতে শিকল বেঁধেছো কেন ?
সিপাহী দু'জন উত্তর দিল না ;
সিপাহী দু'জনেরই জিভ কাটা।
অস্পষ্ট গোধূলি আলোয় তাদের পায়ে ভারী বুটের শব্দ
তাদের মুখে কঠোর বিষণ্ণতা
তাদের চোখে বিজ্ঞাপনের আলোর লাল আভা।

মেটে রঙের রাস্তা চলে গেছে পুকুরের পার দিয়ে
ফ্লোরেসেন্ট বাঁশঝাড় ঘুরে—
ফসল কাটা মাঠে এখন
সদ্যকৃত বধ্যভূমি।
সেখানে আরও চারজন সিপাহী রাইফেল হাতে
তাদের ঘিরে হাজার হাজার নারী ও পুরুষ
কেউ এসেছে বহু দূরের অড়হর ক্ষেত থেকে পায়ে হেঁটে
কেউ এসেছে পাটকলের ছুটির বাঁশী আগে বাজিয়ে
কেউ এসেছে ঘড়ির দোকানে ঝাঁপ ফেলে
কেউ এসেছে ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভরে
কেউ এসেছে অন্ধের লাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
জননী শিশুকে বাড়িতে রেখে আসেননি
যুবক এনেছে তার যুবতীকে
বৃদ্ধ ধরে আছে বৃদ্ধতরের কাঁধ
সবাই এসেছে একজন কবির
হত্যাদৃশ্য
প্রত্যক্ষ করতে।

খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো কবিকে,
তিনি দেখতে লাগলেন
তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো—
কনিষ্ঠায় একটি তিল, অনামিকা অলঙ্কারহীন
মধ্যমায় ঈষৎ টনটনে ব্যথা, তর্জনী সংকেতময়

বৃদ্ধাঙ্গুলি বীভৎস, বিকৃত—
কবি সামান্য হাসলেন,
একজন সিপাহীকে বললেন, আঙুলে
রক্ত জমে যাচ্ছে হে,
হাতের শিকল খুলে দাও।
সহস্র জনতার চিৎকারে সিপাহীর কান
সেই মুহূর্তে বধির হয়ে গেল।

জনতার মধ্য থেকে একজন বৈজ্ঞানিক বললেন একজন কসাইকে,
পৃথিবীর মানুষ যত বাড়ছে, ততই মুর্গী কমে যাচ্ছে।
একজন আদার ব্যাপারী জাহাজ মার্কা বিড়ি ধরিয়ে বললেন,
কাঁচা লঙ্কাতেও আজকাল তেমন ঝাল নেই!
একজন সংশয়বাদী উচ্চারণ করলেন আপন মনে,
বাপের জন্মেও একসঙ্গে এত বেজন্মা দেখিনি, শালা!
পরাজিত এম এল এ বললেন একজন ব্যায়ামবীরকে,
কুঁচকিতে বড় আমবাত হচ্ছে হে আজকাল!
একজন ভিখিরি খুচরো পয়সা ভাঙিয়ে দেয়
বাদামওয়ালাকে
একজন পকেটমারের হাত অকস্মাৎ অবশ হয়ে যায়
একজন ঘাটোয়াল বন্যার চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ে
একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁর ছাত্রীদের জানালেন:
প্লেটো বলেছিলেন…
একজন ছাত্র একটি লম্বা লোককে বললো,
মাথাটা পকেটে পুরুন দাদা।
এক নারী অপর নারীকে বললো,
এখানে একটা গ্যালারি বানিয়ে দিলে পারতো….
একজন চাষী একজন জনমজুরকে পরামর্শ দেয়,
বৌটার মুখে ফোলিডল ঢেলে দিতে পারো না?
একজন মানুষ আর একজন মানুষকে বলে,
রক্তপাত ছাড়া পৃথিবী উর্বর হবে না।
তবু কারা যেন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, এ তো ভুল লোককে
এনেছে। ভুল মানুষ, ভুল মানুষ!

রক্ত গোধূলির পশ্চিমে জ্যোৎস্না, দক্ষিণে মেঘ,
বাঁশবনে ডেকে উঠলো বিপন্ন শেয়াল
নারীর অভিমানের মতন পাতলা ছায়া ভাসে
পুকুরের জলে
ঝুমঝুমির মতন একটা বকুল গাছে কয়েকশো পাখির ডাক
কবি তাঁর হাতের আঙুল থেকে চোখ তুলে তাকালেন
জনতার কেন্দ্রবিন্দুতে
রেখা ও অক্ষর থেকে রক্তমাংসের সমাহার
তাঁকে নিয়ে গেল অরণ্যের দিকে
ছেলেবেলার বাতাবি লেবু গাছের সঙ্গে মিশে গেল
হেমন্ত দিনের শেষ আলো
তিনি দেখলেন, সেতুর নিচে ঘনায়মান অন্ধকারে
একগুচ্ছ জোনাকি
দমকা হাওয়ায় এলোমেলো হলো চুল, তিনি বুঝতে পারলেন
সমুদ্র থেকে আসছে বৃষ্টিময় মেঘ
তিনি বৃষ্টির জন্য চোখ তুলে আবার
দেখতে পেলেন অরণ্য
অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষের স্বাধীনতা—
গাব গাছ বেয়ে মন্থর ভাবে নেমে এলো একটি তক্ষক
ঠিক ঘড়ির মতন সে সাতবার ডাকলো :

সঙ্গে সঙ্গে রিপুর মতন ছ'জন
বোবা কালা সিপাহী
উঁচিয়ে ধরলো রাইফেল—
যেন মাঝখানে রয়েছে একজন ছেলে-ধরা
এমন ভাবে জনতা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো :
ইনকিলাব জিন্দাবাদ !
কবির স্বতঃপ্রবৃত্ত ঠোঁট নড়ে উঠলো
তিনি অস্ফুট হৃষ্টতায় বললেন :
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !
মানুষের মুক্তি আসুক !
আমার শিকল খুলে দাও !
কবি অত মানুষের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি মানুষ
নারীদের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি নারী

তিনি দু'জনকেই পেয়ে গেলেন
কবি আবার তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললেন,
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ! মিলিত মানুষ ও
প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বিপ্লব !

প্রথম গুলিটি তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল—
যেমন যায়,
কবি নিঃশব্দে হাসলেন,
দ্বিতীয় গুলিতেই তাঁর বুক ফুটো হয়ে গেল
কবি তবু অপরাজিতের মতন হাসলেন হা-হা শব্দে
তৃতীয় গুলি ভেদ করে গেল তাঁর কণ্ঠ
কবি শান্ত ভাবে বললেন,
আমি মরবো না !
মিথ্যে কথা, কবিরা সব সময় সত্যদ্রষ্টা হয় না।
চতুর্থ গুলিতে বিদীর্ণ হয়ে গেল তাঁর কপাল
পঞ্চম গুলিতে মড় মড় করে উঠলো কাঠের খুঁটি
ষষ্ঠ গুলিতে কবির বুকের ওপর রাখা ডান হাত
ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল
কবি হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলেন মাটিতে
জনতা ছুটে এলো কবির রক্ত গায়ে মাথায় মাখতে—
কবি কোনো উল্লাস ধ্বনি বা হাহাকার কিছুই শুনতে পেলেন না
কবির রক্ত ঘিলু মজ্জা মাটিতে ছিটকে পড়া মাত্রই
আকাশ থেকে বৃষ্টি নামলো দারুণ তোড়ে
শেষ নিশ্বাস পড়ার আগে কবির ঠোঁট একবার
নড়ে উঠলো কি উঠলো না
কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি।

আসলে, কবির শেষ মুহূর্তটি মোটামুটি আনন্দেই কাটলো
মাটিতে পড়ে থাকা ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে চাইলেন,
বলেছিলুম কিনা, আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না !

দেরি

মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি
দাঁড়াও, আমি আসছি
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়।
রন্ধ্রের মধ্যে শোনা যায় কীটের আনাগোনার শব্দ
অসংখ্য দর্জিরা তৈরি করছে ছদ্মবেশ
নদীর নিরালা কিনারে জানু পেতে বসে আছেন
শৈশবে দেখা অন্ধ ফকির
স্মৃতির অস্পষ্টতায় সমস্ত স্তব অসমাপ্ত
বালিকার বুকের কাছে অনেক ভুল প্রত্যাহার করা হয়নি
কুমিররা এখনো কুম্ভীরাশ্রু ছড়িয়ে যাচ্ছে
নিশান উড়িয়ে চলে যায় মধ্য রাত্রির ট্রেন
অনেকক্ষণ বাজতে থাকে তীব্র হুইস্‌ল।

মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি,
দাঁড়াও, আমি আসছি
প্রথানুগত চৈতন্য থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে এসে আর তাকে
দেখতে পাই না।
অসংখ্য প্রতিশ্রুতির ওপর শ্যাওলা জমে
শুনতে পাই অনেক অশরীরীর অট্টহাস্য—
যাদের জন্য একদা সোনার রথ নেমে এসেছিল।
বিষণ্ণতাকে লণ্ডভণ্ড করে ছিঁড়ে উঠে আসতেও হাতে জড়িয়ে
যায় সুতো
সুপুরিবাগানের মিহি হাওয়াকে মনে হয় দীর্ঘশ্বাস
কোদালকে কোদাল, ইস্কাপনকে ইস্কাপন এবং
অন্যায়কে অন্যায় বলে চিনে নিতে
অনেক কুয়াশা
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়
আমার দেরি হয়ে যায়, আমার দেরি হয়ে যায়,
আমার দেরি হয়ে যায়!

সেই মুহূর্তটা

দরজা বন্ধ, কলিং বেলে হাত, শ্রবণ উৎকর্ণ
হৃদয় সেখানে নেই।
বৃষ্টি রমণীয়, নীল সঙ্ঘ ভাঙা বৃষ্টি, শরীর ভিজিয়ে এসে
শুষ্ক মুখ—
আঙুলে আঙুল ছোঁয়া, আরও কাছে, বুকে মিশলো বুক,
চাপ, আরও চাপ,
প্রথমে ঘাড়ের পাশে, পরে ঠোঁটে ঠোঁট—ঠিক সেই মুহূর্তে
একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়।
নিছক চিৎকার, তার ভাষা নেই, এইমাত্র যেরকম হৃদয়হীন সিঁড়িভাঙা
(ওঠা সাবধানী, নামার সময় যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার মতন—
গড়িয়ে পড়ার ঠিক আগে সেই যে মুহূর্তটা)
গাছ থেকে খসে পড়া ঘুরন্ত পালকের মতন এক একটা স্বপ্ন
কখনও যেন হঠাৎ হাঁটু দুমড়ে আসে, নদী আড়াল করে দাঁড়ায় বন্ধু
কাঁচ ভাঙা হাসি প্রত্যেকবার মনে হয় অচেনা
মৎস্য চিহ্নিত দেয়ালে, সঙ্কেত অগ্রাহ্য করি, কিশোরীর
সুরেলা কণ্ঠে 'বেলা যায়'
আর চমকে দেয় না
বিশাল আলমারির চাবি হারালে, মনে হয় এই বুঝি সেই,
কব্জির দিকে চোখ, পেশী শক্তিশালী
মনে হয়, এবার—
কিছুই হয় না
ইস্পাতও বশ্যতা স্বীকার করে, পথ পাদপ্রদীপ হতে চায়
খরার নামে যেরকম ছুটে আসে বিশ্বব্যাপী দয়া
চাপা পড়ে যায় সেই আসল সময়—
চোখ কৃতঘ্ন, অচেনারা মোহিনী, কানু সান্যাল সব্যসাচী,
শুধু সাবধানে সিঁড়িভাঙা
নামার সময় যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার মতন—
গড়ানো নয়, সেই মুহূর্তটা
থমকে আছে কোথাও, ছুঁতে পারছি না।

দেখা হয়নি

নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি
পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে
অনেক যুদ্ধ, অনেক আগুন নিভিয়ে
আলো জ্বালানো
অনেক পথ পেরিয়ে নদীকে খুঁজে পাওয়া
কিন্তু তার আগে এই প্রচণ্ড বাধা
নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি।

এত চুম্বনেও তেষ্টা মেটে না
এত আলিঙ্গনেও অধরা
এই রহস্যময় প্রাণীটি
বার বার আমার চোখ ফিরিয়ে নেয়
পাহাড় ও সমুদ্রের ছবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে
তার মাঝখানে একজন রমণী, বরবর্ণিনী, স্বয়মাগতা।
আমি সূর্যাস্ত ও মধ্যযামকে বদলে দিই
মুখোমুখি দর্পণের মতন সংখ্যাহীন প্রকোষ্ঠ
তার শুরু ও শেষে লুকিয়ে আছ, কে তুমি ?
তোমাকে এখনও একটুও দেখা হয়নি !

সেই ছেলেটি ও আমি

সেই ছেলেটির চোখে দীপ্ত রোখ
ঠোঁটে ক্রুদ্ধ তেজের ঝলক
ও হাতে রাইফেল তুলে নেবার স্বপ্ন দেখছে
আমি ওর মধ্যে দেখছি আমার কৈশোরের স্বপ্ন।

ছেলেটি তার হালকা ছিপছিপে শরীরটা নিয়ে
রক থেকে লাফিয়ে এলো রাস্তায়
আগুন ও টিয়ার গ্যাসের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে
ছুটে গেল অবহেলায়
ও যেন ঠিক আমার কৈশোর কাল হয়ে ছুটে গেল !

ছেলেটার জামা ছিন্নভিন্ন, কপালের পাশে রক্ত
ছেলেটা তবু হার মানেনি
ধ্বংসের আগুনের মধ্যে ও এখনো স্বপ্ন দেখছে
তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, জিন্দাবাদ।
রাস্তার ওপাশ থেকে আমি শুনতে পেলাম
যেন অবিকল আমারই গলার আওয়াজ।

মানুষ

পার্কের রেলিং-এর পাশে ইঁটপাতা
অস্থায়ী উনুনে
গাঢ় হলুদ রঙের খিচুড়ি ফুটছে—
বাচ্চাটা খেলছে রাস্তায় ধুলোয়
মা আঁস্তাকুড় থেকে বেছে নিচ্ছে তরকারির খোসা
পুরুষটা শুয়ে শুয়ে দেখছে দুপুর-রোদের আকাশ
তার ঠোঁটে বার বার এসে বসছে মাছি
ভিখারী পরিবার—অন্যদিন ওদের দিকে চোখ পড়ে না
আজ ইঁটের উনুন ও খিচুড়ি দেখে পিকনিকের কথা
মনে পড়লো
ওরা কি সারাজীবনের জন্য পিকনিক করতে এসেছে ?

মেয়েটি উঠে গেল বেহালার ট্রামে
ছেলেটি তারপর একা একা হাঁটতে লাগলো
দোহারা, শ্যামলা রং, কুড়ি-একুশ, মুখখানি ভারি বিষণ্ণ
ও অহঙ্কারী—
ও কেন বিষণ্ণ ? ও কেন এই পরিব্যাপ্ত মেঘলা দুপুরে
দেখছে না এই ভুবনমোহিনী অচেনা আলো ?
তবু ছেলেটির ওষ্ঠভঙ্গির অহঙ্কার দেখেই মনে হলো
ও একজন ছদ্মবেশী রাজকুমার
সদ্য মহিমাচ্যুত, কিন্তু এই ছদ্মবেশ
তার নিজস্ব

মেয়েটিও কি রাজেন্দ্রাণী ? ট্রামে উঠে গেল, ভালো করে
মুখ দেখিনি
মেঘলা দুপুরে ময়দানে একা একা হাঁটছে
আমার ছদ্মবেশী রাজকুমার।

বিকেল পাঁচটায় হাওড়া ব্রীজে কত সংখ্যক মানুষ
সবাই কেজো, ব্যস্ত, এ ওকে ঠেলছে, এ ওর
পা মাড়িয়ে দিচ্ছে
যেতে হবে, যেতে হবে, ঠিক সময়ে যেতে হবে !
কোথায় যাবে ওরা ?
যে-যার লোকাল ট্রেনের সময় মেপে রেখেছে
চার্লি চ্যাপলিনের ছবির মতন হাস্যকর হুড়োহুড়ি
হঠাৎ বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে ছুটে আসে
পাগলা-হাওয়া
ফুলের বাজারে হুলুস্থুলু
জাহাজের মন-খারাপ ভোঁ জ্বেলে দেয় নগরীর আলো
হাওড়া ব্রীজের মানুষগুলো আমার কাছে
স্পষ্ট হয়ে ওঠে—
ওরা সবাই আসলে ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে
কোথায় কোন্ কৌটোয় লুকোনো আছে
লোকশ্রুত ভ্রমর !

পতন

স্মৃতি এসে বলে : পূর্ব দিকে যাও, তোমার নিয়তি
প্রতীক্ষায় আছে—
আমি তাকে চোখ তুলে দেখাই ও প্রাসাদের বিশাল পতন—
ভাঙে হৃদয় গম্বুজ, ইঁটকাঠ, ভয়ঙ্কর শব্দে পড়ে
কড়ি বরগা
পিতার টেম্পারা ছবি, জংধরা সিন্দুক
ওড়ে সিন্দুর মাখানো রাজমুদ্রা, শূন্য খাঁচা, অবিরল
মেঘের গর্জন

মায়ের দুঃখিত মুখ, নবীনা নারীর চোখ ভেসে যায়,
ভেসে যায় স্তনযুগে প্রথম উষ্ণতা,
ওকি অসম্ভব শব্দ, প্রবল হাওয়ায় ভাসে ছিন্ন হাত, বই
লুকানো বাজির মতো মধ্যরাতে জেগে ওঠে রক্তমাখা বাল্যের প্রেমিকা
ফেটে পড়ে সহস্র দৃশ্যের ভাণ্ড, আমি পাশ ফিরে
দেখি, ততক্ষণে
গুপ্তচর স্মৃতি পেয়ে গেছে অ্যাকিলিসের গোড়ালি।

নশ্বর

কখনো কখনো মনে হয়, নীরা, তুমি আমার
জন্মদিনের চেয়েও দূরে—
তুমি পাতা-ঝরা অরণ্যে একা একা হেঁটে চলো
তোমার মসৃণ পায়ের নিচে পাতা ভাঙার শব্দ
দিগন্তের কাছে মিশে আছে মোষের পিঠের মতন
পাহাড়
জয়ডঙ্কা বাজিয়ে তার আড়ালে ডুবে গেল সূর্য
এসবই আমার জন্মদিনের চেয়েও দূরের মনে হয়।

কখনো কখনো আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে
নক্ষত্রের মৃত্যু
মনের মধ্যে একটা শিহরন হয়
চোখ নেমে আসে ভূ-প্রকৃতির কাছে ;
সেই সব মুহূর্তে, নীরা, মনে হয়
নশ্বরতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নেমে পড়ি
তোমার বাদামি মুষ্টিতে গুঁজে দিই স্বর্গের পতাকা
পৃথিবীময় ঘোষণা করে দিই, তোমার চিবুকে
ঐ অলৌকিক আলো
চিরকাল থমকে থাকবে !

তখন বহুদূর পাতা-ঝরা অরণ্যে দেখতে পাই
তোমার রহস্যময় হাসি—
তুমি জানো, সন্ধেবেলার আকাশে খেলা করে সাদা পায়রা
তারাও অন্ধকারে মুছে যায়, যেমন চোখের জ্যোতি—এবং পৃথিবীতে
এত দুঃখ
মানুষের দুঃখই শুধু তার জন্মকালও ছাড়িয়ে যায়।

রাগী লোক

রাগী লোকেরা কবিতা লিখতে পারে না
তারা বড্ড চ্যাঁচায়
গহন সংসারের ম্লান ছায়ায় রাগী লোকরা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ
তারা নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসে।
পাহাড়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া জলপ্রপাতের পাশে
আমি একজন রাগী লোককে দেখেছিলাম
তার বাঁকা ভুরু ও উদ্ধত ভঙ্গিমার মধ্যেও কি অসহায়
একজন মানুষ—
নদীর গতিপথ কেন খালের মতন সরল নয়
এই নিয়ে লোকটি খুব রাগারাগি করছিল!
হাতে এক গোছা চাবি
তবু তালা খোলার বদলে সে পৃথিবীর সব
দরজা ভেঙে ফেলতে চায়—
ঐ লোকটি কোনোদিন কবিতা লিখতে পারবে না
এই ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছিল খুব!
পাহাড় ও জলপ্রপাতের পাশে সেই
বিশাল সুমহান প্রকৃতির মধ্যে
বাজে পোড়া শুকনো গাছের মতন দাঁড়িয়ে রইলো
একজন রাগী মানুষ।

বিদেশ

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো
ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুর শোভা এদেশী নয়—
কপালে ঐ চূর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক
ঐ মুখ, ঐ বুকের রেখা এদেশী নয় !

বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শুকনো কাদায়
আমরা সবাই কাতর, বুকে পাথর
তোমার পা মাটি ছুঁলো না
তোমার হাসি পাখি-তুলনা
তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক !

আমরা সবাই রূপ চেয়েছি
ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি
তোমার হাতে শুধু দু' মুঠো বালি !
রুক্ষ দিনের মতন আমরা রুক্ষতাময় তৃপ্তিহারা
আগুন থেকে জ্বলে আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা
তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে
বাজালে করতালি ।

এ পৃথিবী বিদেশ তোমার
কত দিনের জন্য এলে ?
বেড়াতে আসা, তাই তো মুখ অমন সুখ-ছোঁয়া !
যদি তোমায় বন্দী করি,
মুঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি
দেবতা-রোষে হবো ভস্ম ধোঁয়া ?

সৃষ্টিছাড়া

কলমের এক আঁচড়ে দুঃখী ঐ লোকটিকে সুখী করে
দিতে পারি আমি ?
সে তার দুঃখের মধ্যে সমুদ্যত, মাতৃহন্তারক সম ক্রূর হাস্যে
নিঙড়ে নেয় চোখ
আমি তার কপাল রেখেছি অমলিন—সে তবুও ভুরুর গভীরে কাটা দাগ
দেখায় আঙুল তুলে, অসহিষ্ণু পায়ে
আমার কল্পিত পথ ছেড়ে যায়—
আমি তাকে বারংবার শান্ত হতে বলি
নিবিড় বন্ধুর মতো আমি তাকে মাটির গভীর শান্তি, রমণীর মেঘলা হাত
কিংবা বিংশ শতাব্দীর নীল বিচ্ছুরিত আলোর সমীপে
নিয়ে যেতে চাই
সে তবু অস্থির গর্জন করে, লণ্ডভণ্ড করে দেয় পর্দা
নারীর চিবুকে রাখে দাঁত, স্তনে নোখ, উরুতে ছড়ায়
তপ্ত শ্বাস
তার অতৃপ্তির মধ্যে খেলা করে ধ্বংস সুখ, আয়নার বদলে
অগ্নিকাণ্ডে দেখে মুখ
আমার বুকের মধ্যে সুষুপ্ত বাসনাগুলি ছিঁড়ে খুঁড়ে বদলে দিতে চায়
কলম সরিয়ে রেখে আমি তার মুখোমুখি বসি
কঠিন ভর্ৎসনা করে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই
সে তখনও ইয়ার্কির মুখভঙ্গি করে, পাঁজরা-কাঁপানো হাসি
দিয়ে, তুড়ি মেরে
আমাকে অগ্রাহ্য করে কালপুরুষের দিকে দেখায় তর্জনী !

ছায়া

হিরণ্ময়, তুমি নীরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো না,
আমি পছন্দ করি না
পাশে দাঁড়িয়ো না, আমি পছন্দ করি না
তুমি নীরার ছায়াকে আদর করো।

হিরণ্ময়, তোমার দিব্য বিভা নেই, জামায় একটা
বোতাম নেই, ছুরিতে হাতল নেই,
শরীরে এত ঘাম, রক্তে এত হর্ষ,
চোখে অস্থিরতা
এ কোন্ ঘাতকের বেশে তুমি দাঁড়িয়েছো ?
ঘাতক হওয়া তোমাকে মানায় না
তুমি বরং প্রেমিক হও
সামনে দাঁড়িয়ো না, পাশে এসো না
তুমি নীরার ছায়ায় মুখ চুম্বন করো ।

ভুল বোঝাবুঝি

এই তটভূমিহীন প্রবহমান সংশয়
এই যে অস্থির বিষণ্ণতা আমার
এর কোনো শেষ নেই
বুকের মধ্যে প্রায়ই হাজার হাজার সুঁচ ফোটে
মনে হয় পথ ভুলে চলে এসেছি পিঁপড়েদের দেশে
চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আমি সেই মানুষ নই
আমার হাতে দাগ নেই !
দু'একটি মুহূর্ত বাতাসে তুলো বীজের মতন
দুলতে দুলতে চলে যায় শৈশবের দিকে
বহুকাল চেয়ে রাখা একটি দীর্ঘশ্বাস
বেরুবার পথ পায় না
কত ঝলমলে উজ্জ্বল সকাল আমার দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়
তুমিই এসব কিছুর জন্য দায়ী,
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন ?

এ তো অভিমান নয়, এর নাম পিপাসা
আমি আনন্দের গান গেয়ে উঠতে চেয়েছিলাম
যদিও আমার গলা ভাঙা

একটি শিশু টলমলে পায়ে হাততালি দিয়ে উঠলো
আমি তাকে স্থির মুহূর্ত দিতে চেয়েছিলাম
উজ্জ্বল ফুলকি ওঠা ঝর্ণায় চেয়েছিলাম অবগাহন
পৃথিবীকে আমি প্রায়শ চেয়েছি সীমানাহীন
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন ?
কেন ঐ নবনীত হাতের পাঞ্জা সরিয়ে নিলে—
আমি নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম !

প্রেমবিহীন

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব, সুরম্য বিজয়া,
ধৃষ্ট বাঞ্ছা মুছে গেলে পার্থিব ললাটে, ওষ্ঠে চুলে
খেয়ালি আগুন থেকে কে বাঁচাবে ? বৃক্ষসম দয়া
সবুজ আঁচলে ঢেকে, জয়া, তুমি এসেছিলে মায়াবী আঙুলে—
বিশ্ব চরাচর ছুঁয়ে দিতে, যেন বিশ্বাসের গোপন সৌন্দর্যে,
প্রতিভায়
বিখ্যাত শান্তিকে পাবে, যেন আমি পৃথিবীর
সবটুকু খনিজ গন্ধক
চুরি করে হেসে উঠবো হা-হা শব্দে, অস্ত্রহীন রাত্রির বিভায়
আমাকে সাজাতে বুঝি চেয়েছিলে, দয়াময়ী,
সভ্যতার শেষ বিদূষক ?

পৃথিবীকে ভালোবাসবো, এতখানি ভালোবাসা এই বুকে নেই
গভীরে প্রতিষ্ঠাবান আয়ুহীন কীর্তির পাতাল ;
মুহূর্তে জীবন শিল্প চূর্ণ হয়, গ্লানিহীন, পরমুহূর্তেই
ঝলসে ওঠে স্মৃতিমূর্তি, গ্লানিহীন খেয়ালি আগুনে চিরকাল ।
ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব খরচক্ষে, অটুট শরীরে
অভিলাষ গুপ্ত করে কৃষ্ণকায় হীরকের মতো,
এক জীবনের শোক অনেক ভাটার স্রোতে আসে ফিরে ফিরে
জয়ী, তোর প্রেম পেলে উরুদ্বয় শক্তিমান হতো !

উনিশশো একাত্তর

মা, তোমার কিশোরী কন্যাটি আজ নিরুদ্দেশ
মা, আমারও পিঠোপিঠি ছোট ভাইটি নেই
নভেম্বরে দারুণ দুর্দিনে তাকে শেষ দেখি
ঘোর অন্ধকারে একা ছুটে গেল রাইফেল উদ্যত।

এখন জয়ের দিন, এখন বন্যার মতো জয়ের উল্লাস
জননীর চোখ শুকনো, হারানো কন্যার জন্য বৃষ্টি নামে
হাতখানি সামনে রাখা, যেন হাত দর্পণ হয়েছে
আমারও সময় নেই, মাঠে কনিষ্ঠের লাশ খুঁজে ফিরি।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
একা একা হাহাকার ; আজিজুর, আজিজুর, শোন—
আমার হলুদ শার্ট তোকে দেবো কথা দেওয়া ছিল
বেহেস্তে যাবার আগে নিলি না আমার দেহ ঘ্রাণ ?

লিকলিকে লম্বা ছেলে যেন একটা চাবুক, চোয়ালে
কৈশোরের কাটা দাগ, মা'র চোখে আজও পোলাপান
চিরকাল জেদী ! বাজি ফেলে নদীর গহ্বর থেকে মাটি তুলে আনতো
মশাল জ্বালিয়ে আমি ভাগাড়ের হাড়মুণ্ডে চিনবো কি তাকে ?

মা, তোমার লাবণ্যকে শেষ দেখি জুলাইয়ের তেসরা
শয়তানের তাড়া খেয়ে ঝাঁপ দিল ভরাবর্ষা নদীর পানিতে
জাল ফেলে তবু ওকে টেনে তুললো, ছটফটাচ্ছে যেন
এক জলকন্যা
স্টিমারঘাটায় আমি তখন খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া বাঁধা।

ক'টা জন্তু নিয়ে গেল টেনে হিঁচড়ে, হঠাৎ লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে
তাকালো সবার চোখে, দৃষ্টি নয়, দারুণ অশনি
ঐটুকু মেয়ে, তবু এক মুহূর্তেই তার রূপান্তর ত্রিকাল-মায়ায়
কুমারীর পবিত্রতা নদীকেও অভিশাপ দিয়ে গেল।

মা, তোমার লাবণ্যকে খুঁজেছি প্রান্তরময়, বাঙ্কারে ফক্সহোলে

ছেঁড়া ব্রা রক্তাক্ত শাড়ি—লুণ্ঠিত সীতার মতো চিহ্ন পড়ে আছে
দূরে কাছে   কয়েক লক্ষ আজিজুর অন্ধকার ফুঁড়ে আছে
ধপধপে হাড়ে
কোথাও একটি হাত মাটি খিমচে ধরতে চেয়েছিল ।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
বাঁ হাতের উল্টোপিঠে কান্না মুছে হাসি আনতে হয়
কবরে লুকিয়ে ঢোকে ফুল চোর, মধ্য রাত্রে ভেঙে যায় ঘুম
শিশুরা খেলার মধ্যে হাততালি দিয়ে ওঠে, পাখিরাও
এবার ফিরেছে ।
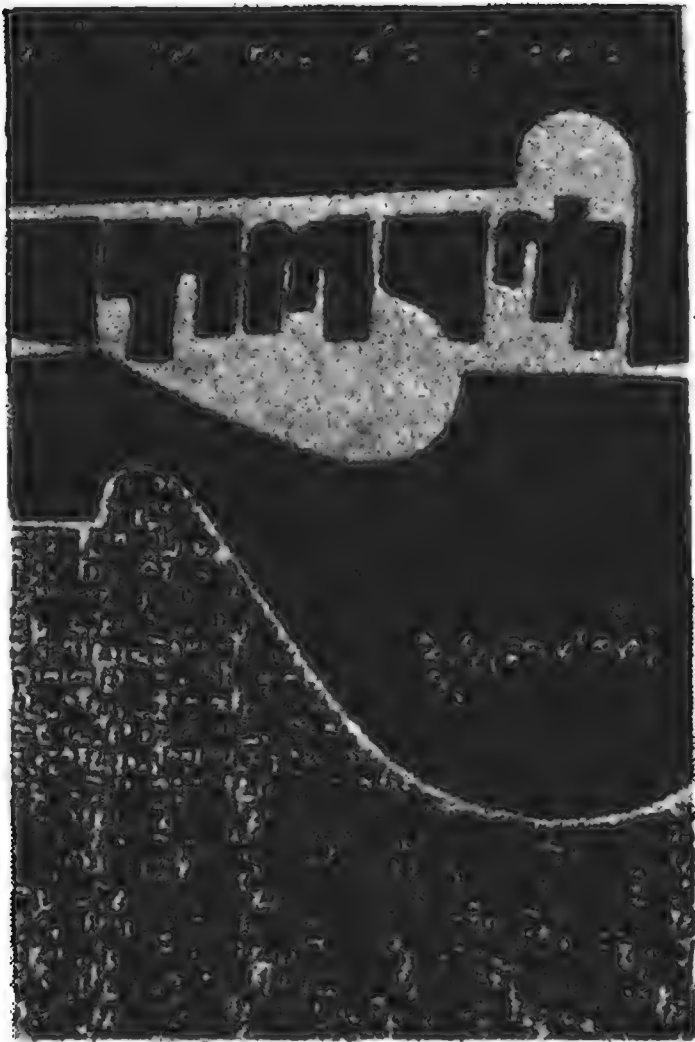
সত্যবদ্ধ অভিমান

সূচিপত্র

সত্যবদ্ধ অভিমান

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি ?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু ?
তখন সে যুবতীকে খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়—
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো—
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি ?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে ভীষণ জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মতো নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে....
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ
সত্যবদ্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে,
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?

মনে মনে

যে আমায় চোখ রাঙিয়ে এইমাত্র
চলে গেল গটগটিয়ে
সে আমায় দিয়ে গেল একটুকরো সুখ।
শরীরে নতুন করে রক্ত চলাচল,
টের পাই
ইন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে
মৃদু হেসে মনে মনে আমি তার নাম কেটে দিই!
সে আর কোথাও নেই
হিম অন্ধকার এক গভীর বরফ ঘরে
নির্বাসিত
আহা, সে জানে না!
সে তার জুতোর শব্দে মুগ্ধ
প্যান্টের পকেটে হাত
স্মৃতি-হারা,
বিভ্রান্ত মানুষ।
দাবা খেলুড়ের মতো আমি তাকে
এক ঘর থেকে তুলে
অন্য ঘরে বসিয়ে চুপ করে
চেয়ে থাকি
উপভোগ করি তার ছটফটানি
জালের ফুটোর মধ্যে নাক দিয়ে
যেমন বিষণ্ণ থাকে জেব্রা
শুকনো নদীর পাশে যেরকম দুঃখী ঘাটোয়াল—
আমার হঠাৎ মায়া হয়
আমি তার রমণীকে
নরম সান্ত্বনা বাক্য বলি,
দু'হাত ছড়িয়ে ফের
তছনছ করে দিই খেলা!

দেখা

—ভালো আছো ?
—দেখো মেঘ, বৃষ্টি আসবে !
—ভালো আছো ?
—দেখো ঈশান কোণের কালো, শুনতে পাচ্ছো
ঝড় ?
—ভালো আছো ?
—এই মাত্র চমকে উঠলো ধপধপে বিদ্যুৎ ।
—ভালো আছো ?
—তুমি প্রকৃতিকে দেখো
—তুমি প্রকৃতি আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছো
—আমি তো অণুর অণু, সামান্যের চেয়েও
সামান্য
—তুমি জ্বালাও অগ্নি, তোলো ঝড়, রক্তে এত
উন্মাদনা
—দেখো সত্যিকার বৃষ্টি, দেখো সত্যিকার ঝড়
—তোমাকে দেখাই আজও শেষ হয়নি,
তুমি ভালো আছো ?

যে-যাই বলুক

যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে
সন্ধেবেলায় নীলচে আলোয় পথ ঘুরে যায় মোমিনপুরে
আমি তখন কোন্ প্রবাসে, বেঁচে থাকার থেকেও দূরে
ঘুরে মরবো ! নরম হাত
ঠোঁট ছোঁবে না, চোখ ছোঁবে না ?
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে ।

মধ্য নিশীথ আমায় ডেকে দেখিয়েছিল হাস্নুহেনা
সকালবেলার রোদে আমার
শিশুকালের স্নেহ মমতা
হাওয়ায় ওড়ে। শূন্য বনে
বলেছিলাম গোপন কথা
কেউ শোনেনি, তবু আমার স্বপ্ন ঘোরে আলোকে মেঘে
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

কে জ্বালে আগুন, কে ছুটে যায় ক্রুদ্ধ বেগে!
কে রসাতল জাগাতে চায়,
কার নিশ্বাস ছুরি ঝলসায়?
তুমিও ভালোবেসেছিলে না? তবুও কেন মরণ খেলায়
এত আনন্দ! সত্যি বলো তো, এখানে আর বাঁচতে চাও না?
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

খণ্ডকাব্য

—কে যায়?
—এই মাত্র চলে গেল বিহ্বল রজনী
—অদূরে কিসের শব্দ?
—রৌদ্র থেকে ফিরে আসে ছায়া
—জলস্রোত ফিরে গেছে যেখানে যাবার
কথা ছিল?
—চাঁদ ভুলে গেছে তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ?
—আমি এক মরালীকে চুম্বন করেছি
—কেউ কি এসেছে ঋণ শোধ নিতে?
—একজন, যে তোমার জন্য কেঁদেছিল
যে তোমার বাহুতে রেখেছে
অনুতপ্ত মুখ

—কে যায় ?
—এই মাত্র ঘুরে গেল হাওয়া
—অদূরে কিসের শব্দ ?
—একটি ফুলের ঝরে যাওয়া
একটি নতুন ফুল ফুটে ওঠা
—চাঁদ কি এসেছে ফিরে
বিস্মৃতির পরপার থেকে ?
—জলস্রোত নিয়ে গেল তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ ?
—তীরবিদ্ধ মরালীর গাঢ় রক্ত
—কেউ কি হয়েছে ঋণ মুক্ত ?
—তুমি তো জন্মান্ধ নও, মূক ও বধির নও
—ভালোবাসা অসহিষ্ণু, বারবার ফিরে ফিরে আসি
অতৃপ্তির পাত্র হাতে
তোমার চোখের কাছে, নীরা !

নিসর্গের পাশাপাশি

সিংহাসন থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে
ছারপোকা
লেলিহান আগুন প্রদক্ষিণ করে সে
রক্ত সমুদ্রের সামনে
বিষণ্ণভাবে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ
হালকা হাওয়ার মতন মৃত্যুকে অনুভব
করার আমেজে চোখ বুজে আসে ।
তখন বারুদ রঙের মেঘের আড়ালে ঢুকে গেছে সূর্য
একটা কাক লুঠেরার মতন তীব্র চোখে
চতুর্দিক দেখে নিয়ে উড়ে যায়
সেই সূর্যের দিকে

পৌঁছাবার আগেই অন্ধকার, নেমে আসে
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়
নারীর অহমিকার ওপর আস্তে আস্তে কুয়াশা জমে
কুয়াশার মধ্যে নিঃশব্দে খেলা করে যৌবন ।

অন্ধকারে নদী

নদী, তুমি অন্ধকার । এ যে রাত্রি
এ যে স্রোত বিপুল বহতা
তরঙ্গের চকিত ঝাপট, ঘূর্ণি, মাংসল স্বাস্থ্যের মতো জল
সেই রাত্রিকায় নদী—
শীত, ঘন কৃষ্ণপক্ষ ; বাঁ হাত চেনে না ডান হাত
চোখ চেয়ে আছে, তবুও দেখে না
এত অন্ধকার যেন বাতাস চেনে না জল,
ভ্রমর হারায় ফুল,
মানুষ তো পথ হারাবেই,
শুধু শব্দ, স্রোত—
শব্দ থেকে নদীর নিশানা—আজও মনে পড়ে
সেই ছেলেবেলা
গভীরে নিশীথে নদী দেখা—
দেখা নয়, অমন আঁধারে কিছু দেখা হয়নি,
নদীর অস্তিত্ব
গ্রহণ করেছি বুকে—র্যাপারে শরীর ঢাকা পৌষের হাওয়ায়
বাঁধের ওপরে একা দাঁড়িয়েছিলাম ।
মনে পড়ে সেই নদী ।
নদী, তুমি এখনও তেমনি আছো
দুর্দান্ত, সরব ?
বালকের বাল্যকাল রহস্যে ভরাও
তুমি খেলাচ্ছলে প্রাণ হন্তারক
আর কোনো শীত মধ্যযামে, র্যাপার জড়িয়ে
আমি নদী দেখতে যাবো ?

দুপুর থেকে রাত্রি

তিনজন তেজী ছেলে দুপুরে ছুটছিল সাইকেলে
বুক খোলা শার্ট, তারা রোদ্দুরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই
শ্লথ মানুষের ভিড় বেনোজল হয়ে ঘিরে আসে
যে-যার পথের থেকে খুঁটে নেয় কাচ ও পালক
নারী হয় ক্বচিৎ রমণী, ধুলোভরা হাওয়া ঘুরে যায়
আমিও প্রস্থান করি অন্তিম পর্বের দিকে
বাসের পা-দানি থেকে শুরু করি
কনুইয়ের ব্যবহার।

দিনের নিয়মমতো দিন শেষ হয়
বাড়ির নিয়মমতো দরজা খোলে, দরজা বন্ধ,
ফের দরজা খোলা
রাত্রে কিছু খুনসুটি সেরে আমি বারান্দায়
সিগারেট ধরিয়ে কেশে কেশে
আচমকা টের পাই—অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আছে
এক দৃশ্য
তিনজন তেজী ছেলে ছুটে যাচ্ছে দুরন্ত সাইকেলে
হু-হু বাতাসের মধ্যে তারা নেয় শস্য ঘ্রাণ
সীমাহীনতার মধ্যে ওরা চৈতন্যের তিন পাশা
এই মাত্র দান পড়লো
আমার সামনে এসে হেসে উঠলো
দুনিয়া-কাঁপানো তীব্র হাসি।

অলীক বাদুড়

অলীক বাদুড়, তুই
কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?
গাছের শিখরে ছিল
হিরণ্য চাঁদের ম্লান বৃষ্টি ভেজা মুখ

বাতাস দিয়েছে সুখ

হেমন্ত-কাতর পল্লীটিকে

সদ্য ঘুম ভেঙে আমি

ভোগ করি দুর্নিবার স্মৃতির কুহেলি—

অলীক বাদুড়, তুই

কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?

কে যেন বিশ্বাস ভেঙে

দিয়েছে দুঃখের হিম ছায়া

কে যেন কঠিন চোখে

রাজপথে জন্মান্ধকে মেরেছে চাবুক

কে যেন অস্থির নোখে

ছিঁড়েছিল বালিকার বুক

এই সব গ্লানি-স্মৃতি

যে মুহূর্তে আমি ছিঁড়ে ফেলি

অলীক বাদুড়, তুই

কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?

দাঁড়াও ! কেন ?

অন্ধকারে কে ডেকে উঠলো, দাঁড়াও !
অন্ধকার নদীর পাশে তখন নদীর মতন অন্ধকার প্রান্তর—
প্রান্তরে আমি একা, কে ডেকে উঠলো, দাঁড়াও !
বৃক্ষ নেই, হাওয়া নেই, তবু সেই অলৌকিক স্বর শিহরন তোলে
আমি শরীরবাদী বলে ভর্ৎসনা পেয়েছি, আমি অশরীরীকে
ভয় করি না, তবু সেই নদীর মতন অন্ধকার প্রান্তরে
আমি চিৎকার করে উঠি :
না,
আমার দীর্ঘস্বর দাবি করে, কেন ? কেন অন্ধকার ? কেন দাঁড়াও ?

আমি সেই সর্বাঙ্গীণ ছায়াময় ব্যক্তিগত ছায়াহীন বর্তমানে দাঁড়িয়ে
উন্মুক্ত দু'বাহু তুলে শেষবার মাটিতে আছড়ে পড়ি
আমি অশরীরীকে ভয় পাই না, কিন্তু আমার অভিমান নেই ?
না, কেন ? কেন অন্ধকার ? কেন দাঁড়াও ? আমার অভিমান
হয় না ?
সাদা বাড়ি, দূরের চিল, ট্রামলাইনের রোদ
তোমরা একদিন আমাকে 'বিদায়' বলেছিলে, মনে নেই ?

জেদী মানুষ

ডান হাতখানি বাড়িয়ে দাও তো দেখি
ছুঁয়ে দেখি কোনো ম্যাজিক রয়েছে কিনা
কী করে এমন মায়াপাশ তুলে আনো
হৃদয় পৃথিবী করতলে আমলকী ?

আঙুলে তোমার মৃদু রক্তিম আভা
বাহুর ডৌলে চম্পক অনুভব
ধুলো মলিনতা তোমাকে ছোঁয় না কেন ?
খুলে ফেলে দাও হীরক অঙ্গুরীয় ?

ওষ্ঠ-অধরে ক্ষীণ চাঁদ ওই হাসি
দেখে এমনকি দেবতারা লোভী হয়
দ্রুত নিশ্বাসে বুক দুটি ওঠে নামে
অন্যবুকের ভেতরে জাগায় ঝড় ।

দাঁড়াও আমার চোখের সামনে এসে
আকাশ, পাতাল, সমকাল ঢেকে দাও
কোমরের খাঁজে, উরুর রেখায় জ্বালো
চির বসন্ত, ঘুম ভাঙা উৎসব ।

এ অবধি লিখে কবি নিজে হাসলেন
প্রাচীন ধাঁচের কবিতার ছেলেখেলা—
তবু তাঁর জেদ অগ্নি রক্তপাতে
ভালোবাসাবাসি হৃদয়ে জাগিয়ে রাখা।

গাছের নিচে

যখন বৃষ্টি পড়ে তখন গাছের নিচে দাঁড়াই একলা
দূরে মাঠের ওপারে মাঠ শূন্য ঝাপসা
বৃষ্টি থেকে বৃষ্টি আসে, ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর বৃষ্টি
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার নিঃস্বতা কি বিষম নিঃস্ব।

জানি আমার প্রান্তরের বৃষ্টিময় অতি চেতনা
এপাশ থেকে ঝাপটা এলে ওপাশে যাই,
কেন্দ্রবিন্দু স্থির থাকে না
জানি আমার নিরাশ্রয় ললাট লিপি, জানি আমার
বৃষ্টি-ভেজা রাতের দুঃখ,
বৃক্ষ তার প্রতিরোধের প্রতীক্ষায় এখন চুপ।

এবার তার শাখা প্রশাখায়, পাতার ফাঁকে প্রতি আঙুলে
খেলবে বৃষ্টিপাতের খেলা,
কেন্দ্রবিন্দু কেড়ে নিয়ে আমায় পুতুল-নাচ নাচাবে
অতি যত্নে লুকিয়ে রাখা রুমাল থেকেও ঘুচিয়ে দেবে
হৃদয় গন্ধ—
জানি আমার নিরাশ্রয় ললাট লিপি
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার নিঃস্বতা কি বিষম নিঃস্ব।

প্রথম থেকেই উচিত ছিল আমার সব বৃক্ষ ছেড়ে
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা!

স্রোত থেমে আছে

এই সূর্যাস্তের মতো স্মৃতির বিকাশ ছিল,
স্রোত থেমে আছে
ওষ্ঠে লাগে তিক্ত স্বাদ, সর্বক্ষণ ললাটে সোপান
হাত দিয়ে স্পর্শ করি—এই সূর্যাস্তের মতো স্মৃতির বিকাশ
ছিল, স্রোত থেমে আছে।
তাকাই দূরের দিকে—
রেনট্রি গাছের ছায়া যেন অবিরল
পূর্বপুরুষের দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ছায়াতেই ফিরে আসে
দূরের ভিড়ের দিকে মুহুর্মুহু পলক বদলায়।

চার্চের বিশাল ঘণ্টা বেজে উঠলো কয়েকবার। ঠিক ক'বার ? যেন
দূরের বাদামি মেঘ তাই শুনে ত্রস্তে চলে গেল
গড়ের পশ্চিম পারে ডিউটি-ত্বরায়।
যাক্‌!
স্টিমার উড়িয়ে দেয় উদাসী আওয়াজ—লাল-হলুদের এই সমারোহ
আভাসে ছড়িয়ে রাখে মায়া, এই সূর্যাস্তের মতো
স্মৃতির বিকাশ ছিল, স্রোত থেমে আছে।

কখনো মেঘের কায়া ভ্রান্তি আনে, মনে হয় ময়দান দক্ষিণে
বেহালার দিকে এক পর্বত জেগেছে
ঐ সে দেখায় তার কপাট বক্ষের গাঢ় শোভা
স্মৃতি এরকম নয়—এ তো যেন অন্ধ ভিখারীর দিকে
পয়সা ছোঁড়ে উদ্ধত নাগর
মগ্নের ফসল আজ স্মৃতি নয় মোহ—
স্রোত থেমে আছে।

ফেরা

এমন ভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারী হয়ে মিশে যাওয়া ?
এমন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে একজীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা ?
সমুদ্রেরও হৃদয় আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
অতলে ডুবে খুঁজতে খুঁজতে টনটনায় চক্ষু স্নায়ু !
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছা-বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল-ছেঁড়ার নেশা,
নদীর জল পাহাড়ে যায়, তুষার-চূড়া আকাশে মেশা
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার মুঠোয় ফেরা ।।

অভিমানিনী

ছিল নিঝুম পুষ্করিণী
জলে নামলো কে ?
এলো যে আজ অভিমানিনী ওলো জোকার দে !
বুক জলে যায় আড়পানে চায়—
যা না ঠাকুরঝি
অভিমানিনী একা নাইবে দেখবে শুধু সুয্যি ।
চাঁপার বন্ন ঠোঁট দু'খানি
ভোমরাপানা অক্ষি
অভিমানিনী ঘাটে রইলে দেখবে না কাকপক্ষী
পুটুস করে সুয্যিও যে
মুখ লুকিয়ে সাদা—
চোখের মাথা খেয়ে রইলো মৌরলা আর চাঁদা ।

পৃথিবীর নিচু কোণে

পৃথিবীর নিচু কোণে, এই কলকাতার খুব অন্ধকার প্রান্তে
এক প্রাচীন গুহায়
শুয়ে আছি—

[illegible]দিন ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হয়।
[illegible] বিকেল উড়ে যায় স্ট্রাটোস্ফিয়ারের খুব কাছাকাছি স্বর্গে
শিশুর ওষ্ঠের মতো তরল অরুণ শুধু
চুঁইয়ে পড়ে
গীর্জার ঘড়িতে
দমকল ছুটে গেলে আরতির ঘণ্টা বলে ভ্রম হয় না
অরণ্যের শুক্লপক্ষ নগরের পূর্বজন্ম স্মৃতি হয়ে ভাসে।
বাঁ হাতে বিষম ব্যথা, চোখে লাল ছিট
আমি
আহত বিমর্ষ গুহাবাসী
নারীর ঈর্ষার মতো ধারালো পাথরে ঠেস
দিয়ে রাখা
ইহকালময়
দুই অবসন্ন কাঁধ
রক্ত গন্ধ, উপচ্ছায়াময় রক্ত গন্ধ, যৌবনের হরিৎ বিষাদ।
পশমের মতো কালচে-নীল রোঁয়া
তরাই ভাল্লুক তার দুই থাবা তুলে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে—
ঝলসে ওঠে মার্বেলের মতো দাঁত
চাপা গর্জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী জেদ—
রাগ নয়, আমার বিষম অভিমান হয়—
নিরস্ত্র অশক্ত আমি,
এই কি দ্বন্দ্বের যোগ্য কাল ?
গুহা ছাড়বো না, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি
তীব্র ধিক্কারের চোখে
ভাল্লুকের দিকে চেয়ে থাকি—
কাপুরুষ !

পাঁশুটে হাওয়ার মধ্যে রক্তগন্ধ,
উপচ্ছায়াময় রক্তগন্ধ, যেন
বজ্রকীট ভেদ করে ছদ্মবেশী উরু।
ম্লান চৈত্রসন্ধ্যা থেকে ভেসে ওঠে ভ্রষ্টা রমণীর
গুপ্ত হাহাকার
টালিগঞ্জ থেকে দূর বেলগাছিয়াময় এক অরণ্যের
পূর্বজন্মস্মৃতি
হরিৎবর্ণের মধ্যে ছোপছোপ ধূসরতা দেখে হিম হয়।

চে গুয়েভারার প্রতি

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়
আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁকা
আত্মায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতনের শব্দ
শৈশব থেকে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে
শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে
সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!

শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত—
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলের কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে

সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার
আমারও কথা ছিল রাইফেলের কুঁদো বুকে চেপে প্রবল হুঙ্কারে
ছুটে যাওয়ার
আমারও কথা ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ ও গরম রক্তের ফোয়ারার মধ্যে
বিজয়-সঙ্গীত শোনাবার—
কিন্তু আমার অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছে !

এতকাল আমি একা, আমি অপমান সয়ে মুখ নিচু করেছি
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, আমি মেনে নিইনি
আমি ট্রেনের জানলার পাশে, নদীর নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা
মাঠের আলপথে, শ্মশানতলায়
আকাশের কাছে, বৃষ্টির কাছে, বৃক্ষের কাছে, হঠাৎ-ওঠা
ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ের কাছে
আমার শপথ শুনিয়েছি, আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আমি
সব কিছুর নিজস্ব প্রতিশোধ নেবো
আমি আবার ফিরে আসবো
আমার হাতিয়ারহীন হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, শক্ত হয়েছে চোয়াল,
মনে মনে বারবার বলেছি, ফিরে আসবো !
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি, আমার অনবরত
দেরি হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো-আলো ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয় !

মাল্লা

নৌকায় মাঝি চারজনা, হাল দাঁড় মোটে তিনখানি
ছয় চোখ করে জল ঘোলা, দুই চোখ মুদে রয় ধ্যানী ।
সাদা পাল চায় পশ্চিমে যায় নায়ের গলুই দক্ষিণে
একজনা হাসে তিনজনা ভাবে, বায়ু চলে যায় পথ চিনে ।

বিজ্‌লি হানলো আকাশ দু'খান জল উঠে পড়ে গম্বুজে
কবি কয়, ওরে মূর্খ মাল্লা, ঘুমায়ে পড়গা চোখ বুঁজে ।

জাগরণ হেমবর্ণ

সূচিপত্র

ঐ তো আমার

নদীর ওপারে ঝুঁকে আছে বাঁশবন
ঐ তো আমার স্বর্গ
ঐ তো আমার বিস্মরণের ভিতরে একটি জোনাকি
ধপধপে সাদা বক উড়ে যায় মায়াবী সন্ধ্যা পেরিয়ে

নদীর ওপারে ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখেছে আকাশ
প্রতিধ্বনির মতো ফিরে এলো বন্ধু
শুকনো পাতায় শব্দ ছড়িয়ে নিশ্বাস উড়ে যায়
কে যেন হাসলো, ঠিক যেন চেনা নয়
কে যেন জলের কিনারে বসলো নুয়ে
সব যেন ঠিক স্বপ্ন, যদিও মাটিতে রয়েছি দাঁড়িয়ে
ঐ তো আমার স্বর্গ
ভগ্ন সেতুর প্রান্তে ঐ তো উদাস নশ্বরতা ।

কবিতার মধ্যে

বহু চিঠি, ভ্রমণকারীর
মতো
প্রতিটি বন্দর থেকে; মনে আছে,
মনে পড়ে ?
ছবির পোস্টকার্ড ।
ঈষৎ দূরত্বে এসে যেন কোনো সাঁকোর ওপরে
একলা দাঁড়িয়ে থাকা—ভ্রূ-সন্ধিতে ঘাম
নীচে জলস্রোত বহু দূরে যায়
সেই দূর মুহূর্তে বিধুর হয়ে ওঠে
একাকিত্বে হাওয়ায় হাওয়ায় শিহরন
বেঁচে আছি, এই বার্তা জানাবার কী বিপুল সাধ

ছন্দ ও শব্দের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে
গাছ থেকে খসে পড়া ঘুরন্ত পাতার মতো চিঠি যায় উড়ে।
ভূতত্ত্ব সমীক্ষা সেরে ক্যাম্পের মলিন আলোয়
বসে আছি কবি
কবিতার মধ্যে তার দিনলিপি
কিংবা সে সংবাদপত্রের ধন্ধে
ঘন ঘন দেখে যায় ঘড়ি
মাথার ভেতরে তাঁত :
সব কিছু সম্বোধনে তুমি—
সুরক্ষিত মহাফেজখানা থেকে যাবতীয় তথ্যরাশি
সেও তো তোমার জন্য, রোমকূপে অস্থিরতা, জয়।

আকস্মিক সুন্দর যা, তা আমার একার কখনো না
অক্ষর সাজিয়ে তার বিলি বন্দোবস্ত করা চাই
উইপোকা আয়ু খেয়ে যায়।

যেমন বৃষ্টির আগে কালো মেঘে চিল ওড়ে
হঠাৎ চাঁদের পাশে ফুটে ওঠে আভা
ভুল ভাঙবার মতো আচম্বিতে মনে পড়ে যায়
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শেষ কথাটাই বলা হয়নি
কিংবা কোনো হিম ভোরে প্রকৃতির
দুর্নিবার খেলা দৃশ্য হলে
নদীর কিনারে তুমি হেঁটে যাও
তখন সে ঊষা ও নদীকে মনে হয়
তোমার চোখের মতো উপহার, তরুণ সূর্যের সাক্ষ্য
বহুরূপী সুখ ও বিষাদ
এই সব ছোট চিঠি,...জানি কেউ
উত্তর দেবে না।

পাওয়া

অন্ধকারে তোমার হাত
ছুঁয়ে
যা পেয়েছি, সেইটুকুই তো পাওয়া
যেন হঠাৎ নদীর প্রান্তে
এসে
এক আঁজলা জল মাথায় ছুঁইয়ে যাওয়া।

নির্জনতায়

অপ্সরাদের মতন সাদা ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফুটে আছে
ওদেরই জন্য আজ মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না কিছু বেশী
হঠাৎ ইচ্ছে করে তছনছ ক'রে দিই রাত্রির বাগান
ঝড় আসবার আগে ঝড় তুলি
'শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম ?'

সত্যিই এই প্রশ্ন করেছিলুম, এক রাত্তিরে
সার্কিট হাউসের পরিচ্ছন্ন উদ্যানে
প্রশ্ন নয়, প্রলাপের মতন, মানুষ যখন একা থাকে
দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
সে যেমন মুখভঙ্গি করে
আমি নিচু হয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকি
অস্বীকার করার সাধ্য নেই যে তা আমাকে
প্রীতি দেয়
তবু আমি বৃন্ত ছিঁড়ে পাপড়িগুলোতে নোখ বসাই
আমি একা। আমাকে কেউ দেখছে না
যেন আমার নারীকে ভালোবাসার নাম করে
শুধু তার শরীরে লোভ করেছি

তার পায়ের কাছে বসে পুজো করতে করতে
হঠাৎ তার উরুতে মুখ গুঁজি
আমার জিভ তাকে লেহন করে, যা একদা
উচ্চারণ করেছে কবিতা
কোনোটাই অসত্য নয়—

এমন সময় ঝড় এসে ফুলবাগান ও আমার
চোখে ধুলো দিয়ে যায়।

প্রবাসের অভিজ্ঞতা

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে আমি
দেখেছি মানুষ
নীরব তাঁতের কাছে কর্মী ও শিল্পীর মতো নত
দেখেছি বাতাসে ছেঁড়া কলাপাতা
যাই যাই শব্দ করে ওড়ে
হাঁটু ভাঙা সিংহ এক পড়ে আছে
হ্রদের কিনারে।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে আমি
দেখেছি মিনার
কীর্তিহীন
যাদের ফেরার কথা ছিল, তারা অনেকে ফেরেনি
মুক্তির ঈষৎ দূরে পৌঁছে কেউ
তৃষ্ণার্ত হয়েছে
শকুনি পালকে কেউ লিখে গেছে নশ্বর জীবনী।
হিসেব মেলাও
সকলই ভূমির জন্য
কাঁচা খাদ্য ছেড়ে দিয়ে একদিন শস্যের সংগ্রহে

বহুদূর চলে আসা—
সেই সব ভূমিদাস এখন আমার
সহযাত্রী—
কেউ বা দেখায় পথ, অনেকেই
আপন চৌহদ্দি
পেরুতে জানে না
হিম গ্রাম পার হয়ে
অর্ধ-সুপ্ত মফঃস্বল
সুতোকলে ষড়যন্ত্র
কারেন্সি নোটের তীক্ষ্ণ অস্ত্র,
যেন
প্রজাতি বিনাশ ছাড়া শান্তি নেই
সর্বত্র দেখেছি
সকলেই শান্তি চায়—
সকল সংসার জুড়ে অস্ত্রের প্রতিভা।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে, আমি দেখেছি মানুষ
নদীর ভাঙন নিয়ে গান গায়—
নারী ও নিয়তি
পাশাপাশি ঘরে বাস—
অনিত্যের দারুণ নগ্নতা
চোখের বিকার আনে—
শিল্পের দুঃখের মতো তবু তার দিকে
ছুটে যায় বাহু
নিমফুলে ভ্রমর বসে না ?

দেখেছি মৃত্যুর কাছে মাতৃত্বের লোভ
বনপথে পাতার ওপরে শুকনো
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
কবেকার—
কুমারী স্তনের পাশে বাসনার তপ্ত হল্কা
কখনো তন্ময় ভোরে
মানুষ ও গরু দুই বন্ধু
পাশাপাশি কথা বলে।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে, আমি ক্লান্ত,
ইচ্ছে হয় বসি
হিজল বনের পাশে,
কিংবা মাথা দিয়ে শুই
ধরিত্রীর কোলে
হাওয়ার আদর খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মতো
সুখ নেই
এবং স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসে ক্লান্ত পথিকের প্রতিচ্ছবি।

ঘরে-বাইরে

সেদিন ছিল একটি বিন্দু, যা মানুষকে ঘরে ফেরায়
ঘরে ফেরার পথে ছিল শুকনো কাঁটা, কয়েক ফোঁটা রক্ত
পথের থেকে পথ ঘুরে যায়, হাওয়ায় ওড়ে পালক
যে পাখিটি মরেই গেছে, তারই পালক—এও যেন জীবন্ত
পূর্ব কিংবা দক্ষিণে যে জীবন তাকে হাতছানি দেয়
সেদিন ছিল একটি বিন্দু, যা মানুষকে ঘরে ফেরায়।

ঘরের মধ্যে দেয়াল-চিত্র, যা মানুষকে বাইরে ডাকে
পাহাড় ফুঁড়ে নদী এমন ভুল তুলিতে কে রচেছে ?
রঙের এত ভুল ব্যবহার তবু এমন হৃদয়গ্রাহী
আসলে ভুল হৃদয় আছে এই শরীরে, ঘরের মধ্যে ছবি রাখা
সেদিন ছিল একটি বিন্দু যা মানুষকে বাইরে ডাকে।

চেয়ার

তারপর সেখানে পড়ে রইলো কয়েকটা খালি চেয়ার
বাগানে, আকাশের নিচে
ঠিক সাজানো নয়, কাছাকাছি ও দূরে এবং
মুখোমুখি

শূন্য চেয়ারগুলোর ওপর ঝরে পড়ছে হিম।
একটু আগে ওর একটি চেয়ারে আমিও ছিলাম
এখন ঘরের ভেতরে জানলায় মুখ রেখে কেন যে আমি
উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছি
চেয়ারগুলির দিকে
নিজেই জানি না।
শুধু চেয়ে থাকা নয়
আমার দৃষ্টি ঝলকে ঝলকে ছুটে যাচ্ছে—
রঙ্গমঞ্চে আলোর মতন
যেন এক্ষুনি দৃশ্য বদলাবে, অথচ
আমি বাইরে যাবো না, কেউ ফিরে আসবে না
পৃথিবীর কয়েকটি স্থির সত্যের মতন
এও একটি
যা প্রতীক্ষা ও সুদৃশ্য চিন্তার মাঝখানে
সীমানা তুলে রাখে
প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে জ্যোৎস্না খেলে বেড়ায়
প্রত্যেকটি শয়ন কক্ষ বন্ধ, ভেতরে উপনিষদের শ্লোকের
মতন নিরাভরণ অন্ধকার
ঘুমের মধ্যে একজন পাশ ফেরে, একজন বুক থেকে হাত নামায়
কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁটে ওপর থেকে কালপুরুষ
এই গ্রহটিকে দেখছেন
আমি ঘরের ভেতর থেকে দেখছি বাগানের শূন্য চেয়ার
এখন স্থির চিত্র।

গুহাবাসী

—চলে যাবে ? সময় হয়েছে বুঝি ?
—সময় হয়নি, তাই চলে যাওয়া ভালো
—এসো না এখনো এই গুহার ভিতরে খুঁজি
পড়ে আছে কিনা কোনো স্মৃতিশূন্য আলো
—অথবা দু'জনে চলো বাইরে যাই ?

—আমার এ নির্বাসন দণ্ড আজ শেষ হবে ?
—ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝি না, তোমাকে সবার মধ্যে চাই
—বহুদিন জনারণ্যে কাটিয়েছি, উৎসবে-পরবে
পিঁপড়ের মতো আমি খুঁটে খুঁটে জমিয়েছি সুখ উপভোগ
একদিন স্বচ্ছ এক হ্রদে অকস্মাৎ দেখি কার দীর্ঘ ছায়া, খুব কাছে
এদিকে ওদিকে চাই, কেউ নেই, তবে কি আমারই মনোরোগ ?
বস্তুত সৃষ্টির মধ্যে কাল-ঋণী ছায়া পড়ে আছে।
অন্ধকারে ছায়া নেই, তাই গুহার আঁধারে
—আমাকে ডেকেছো কেন এই অবেলায় ?
—ভেবেছি—হয়তো ভুল, নারীর সুষমা বুঝি পারে,
ভেঙে দিতে সমস্ত বিস্মৃতি, যদি স্পর্শের খেলায়
মুহূর্ত বিমূর্ত হয়, যদি চোখ
—তবে তাই হোক, তবে তাই হোক
ভুল ভাঙা শুরু হতে দেরি করা ঠিক নয়
বিশেষত অন্ধকারে
—অন্ধকারে রক্ত হয়ে ফুটে ওঠে অনেক করবী
শৈশবের সব দুঃখ যে-রকম ফিরে পেতে চাই বারে বারে
তুমিও দুঃখেরই মতো, বড়ো প্রিয়, এই ওষ্ঠ বুক—
—ওসব জানি না, দুঃখ কিংবা ছায়াটায়া এখন থাকুক
ভুল ভাঙবার মতো এমন মধুর খেলা আর নেই
গুহার ভিতরে তাই শুরু হোক !

যা চেয়েছি, যা পাবো না

—কী চাও আমার কাছে ?
—কিছু তো চাইনি আমি !
—চাওনি তা ঠিক। তবু কেন
এমন ঝড়ের মতো ডাক দাও ?

—জানি না। ওদিকে দ্যাখো
রোদ্দুরে রুপোর মতো জল
তোমার চোখের মতো
দূরবর্তী নৌকো
চতুর্দিকে তোমাকেই দেখা
—সত্যি করে বলো, কবি, কী চাও আমার কাছে।
—মনে হয় তুমি দেবী···
—আমি দেবী নই।
—তুমি তো জানো না তুমি কে!
—কে আমি?
—তুমি সরস্বতী, শব্দটির মূল অর্থে
যদিও মানবী, তাই কাছাকাছি পাওয়া
মাঝে মাঝে নারী নামে ডাকি
—হাসি পায় শুনে। যখন যা মনে আসে
তাই বলো, ঠিক নয়?
—অনেকটা ঠিক। যখন যা মনে আসে—
কেন মনে আসে?
—কী চাও, বলো তো সত্যি? কথা ঘুরিয়ো না
—আশীর্বাদ!
—আশীর্বাদ? আমার, না সত্যি যিনি দেবী
—তুমিই তো সেই! টেবিলের ঐ পাশে
ফিকে লাল শাড়ি
আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি,
উঠে এসো
আশীর্বাদ দাও, মাথার ওপরে রাখো হাত
আশীর্বাদে আশীর্বাদে আমাকে পাগল করে তোলো
খিমচে ধরো চুল, আমার কপাল
নোখ দিয়ে চিরে দাও
—যথেষ্ট পাগল আছো! আরও হতে চাও বুঝি?
—তোমাকে দেখলেই শুধু এরকম, নয়তো কেমন
শান্তশিষ্ট
—না-দেখাই ভালো তবে। তাই নয়?
—ভালো মন্দ জেনে শুনে যদি এ-জীবন
কাটাতুম

তবে সে-জীবন ছিল শালিকের, দোয়েলের
বনবিড়ালের কিংবা মহাত্মা গান্ধীর
ইঁরি ধানে, ধানের পোকায় যে-জীবন
—যে-জীবন মানুষের ?
—আমি কি মানুষ নাকি ? ছিলাম মানুষ বটে
তোমাকে দেখার আগে
—তুমি সোজাসুজি তাকাও চোখের দিকে
অনেকক্ষণ চেয়ে থাকো
পলক পড়ে না
কী দেখো অমন করে ?
—তোমার ভিতরে তুমি, শাড়ি-সজ্জা খুলে ফেললে
তুমি
তার আড়ালেও যে-তুমি
—সে কি সত্যি আমি ? না তোমার নিজের কল্পনা
—শোন্ খুকী—
—এই মাত্র দেবী বললে—
—একই কথা ! কল্পনা আধার যিনি, তিনি দেবী—
তুই সেই নীরা
তোর কাছে আশীর্বাদ চাই
—সে আর এমন কি শক্ত ? এক্ষুনি তা দিতে পারি
—তোমার অনেক আছে, কণা মাত্র দাও
—কী আছে আমার ? জানি না তো
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই !
—সিঁড়ির ওপরে সেই দেখা
তখন তো বলোনি কিছু ?
আমার নিঃসঙ্গ দিন, আমার অবেলা
আমারই নিজস্ব—শৈশবের হাওয়া শুধু জানে

—দেবে কি দুঃখের অংশভাগ ? আমি
ধনী হবো
—আমার তো দুঃখ নেই—দুঃখের চেয়েও
কোনো সুমহান আবিষ্টতা
আমাকে রয়েছে ঘিরে
তার কোনো ভাগ হয় না

আমার কী আছে আর, কী দেবো তোমাকে ?
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই !
তুমি দেবী, ইচ্ছে হয় হাঁটু গেড়ে বসি
মাথায় তোমার করতল, আশীর্বাদ···
তবু সেখানেও শেষ নেই
কবি নয়, মুহূর্তে পুরুষ হয়ে উঠি
অস্থির দু'হাত
দশ আঙুলে আঁকড়ে ধরতে চায়
সিংহিনীর মতো ঐ যে তোমার কোমর
অবোধ শিশুর মতো মুখ ঘষে তোমার শরীরে
যেন কোনো গুপ্ত সংবাদের জন্য ছটফটানি
—পুরুষ দূরত্বে যাও, কবি কাছে এসো
তোমায় কী দিতে পারি ?
—কিছু নয় !
—অভিমান ?
—নাম্ দাও অভিমান !
—এটা কিন্তু বেশ ! যদি
অসুখের নাম দিই নির্বাসন
না-দেখার নাম দিই অনস্তিত্ব
দূরত্বের নাম দিই অভিমান ?
—কতটুকু দূরত্ব ? কী, মনে পড়ে ?
—কী করে ভাবলে যে ভুলবো ?
—তুমি এই যে বসে আছো, আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি
কপালে পড়েছে চূর্ণ চুল
পাড়ের নক্সায় ঢাকা পা
ওষ্ঠাগ্রে আসন্ন হাসি—
এই দৃশ্যে অমরত্ব
তুমি তো জানো না, নীরা,
আমার মৃত্যুর পরও এই ছবি থেকে যাবে।
—সময় কি থেমে থাকবে ? কী চাও আমার কাছে ?
—মৃত্যু ?
—ছিঃ, বলতে নেই
—তবে স্নেহ ? আমি বড় স্নেহের কাঙাল
—পাওনি কি ?

—বুঝতে পারি না ঠিক। বয়স্ক পুরুষ যদি স্নেহ চায়
শরীরও সে চায়
তার গালে গাল চেপে দিতে পারো মধুর উত্তাপ ?
—ফের পাগলামি ?
—দেখা দাও!
—আমিও তোমায় দেখতে চাই।
—না!
—কেন ?
—বোলো না। কক্ষনো বোলো না আর ঐ কথা
আমি ভয় পাবো।
এ শুধুই এক দিকের
আমি কে ? সামান্য, অতি নগণ্য, কেউ না
তবু এত স্পর্ধা করে তোমার রূপের কাছে—
—তুমি কবি ?
—তা কি মনে থাকে ? বারবার ভুলে যাই
অবুঝ পুরুষ হয়ে কৃপাপ্রার্থী
—কী চাও আমার কাছে ?
—কিছু নয়। আমার দু'চোখে যদি ধুলো পড়ে
আঁচলের ভাপ দিয়ে মুছে দেবে ?

সমালোচকের প্রতি

বারান্দায় রেলিং ধরে একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়ালে
ইচ্ছে হয়, আরও একটু ঝুঁকি
আরও একটু, আরও একটু, এবার শরীর হালকা
এখন বাতাসচারী
এখন আমি হাওয়ার মধ্যে ভাসতে পারি—

মাটির ওপর আছড়ে পড়বো ?
আমি তো নই মাটির মানুষ ।
যে উদ্বাস্তু, তার আবার কী মাটির টান হে ?
চশমা-আঁটা সমালোচক এই তো সেদিন বলে দিলেন
পায়ের তলায় মাটি নেই তো, তাই তো ওরা
ছন্নছাড়া অবিশ্বাসী !

দিনে ও রাত্রে

রাজার বাড়িতে কার খুব অসুখ
রাজবাড়ির রং কাঁচা হলুদ
রাজবাড়ির বাগানে রাধাচূড়া ফুল পড়ে আছে ।

দরোয়ান, গেট খোলো ।
যজুড়িগাড়ি বেরিয়ে যায়, ঘোড়ার গায়ে
পিছলে পড়ে রোদ ।
রাজার মেয়ে দেরাদুনে কনভেন্টে সন্ন্যাসিনী
রাজার নিজস্ব ম্যাস্টিফ নেড়ি কুত্তার সঙ্গে
বন্ধুত্ব করে
রাজবাড়ির সিঁড়িতে ঝমঝম শব্দে গেলাস্ ভাঙে
দরোয়ান, গেট খোলো !
গলায় ঘণ্টা দুলিয়ে একপাল মেষ ঢুকলো
দুধ দিতে ।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে ডুবে আছে রাজবাড়ি
বিদ্যুতের মতন তীক্ষ্ণ গলায় কেউ হেসে উঠলো
কেউ মিনতি করে বললো, আমায় মুক্তি দাও
ও বাড়িতে কেউ আত্মহত্যা করে না
আমি জানি,
আমি পাশের বাড়িতেই থাকি ।

স্থির সত্য

বহুদিন আকাশ ভাসানো জ্যোৎস্নায়
হেঁটে যাইনি
নদীর কিনারায়
একটি ঘাসফুল ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিইনি স্রোতে
বহুদিন, বহুদিন—
তবু আমি জানি
এখনো কোনোদিন জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় আকাশ
আমার জন্য প্রতীক্ষা করে
নদীর কিনারার মাটি প্রতীক্ষা করে আছে
আমার পদস্পর্শের
ঘাসফুলটি হাওয়ায় দুলছে প্রতীক্ষায়
আমি তাকে ছিঁড়ে নেবো
জলস্রোত ছলচ্ছল শব্দে আমায় ডাক পাঠাবে
এই সব স্থির সত্য নিয়ে বেঁচে আছি।

অপেক্ষা

সকালবেলা এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম একজন বৃদ্ধ আন্তর্জাতিক
ফরাসীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, যিনি নিজের শৈশবকে ঘৃণা
করেন।
তিনি তখনো আসেননি, আমি একা বসে রইলাম ভি আই পি
লাউঞ্জে। ঠাণ্ডা ঘর, দুটি টাটকা ডালিয়া, বর্তমান রাষ্ট্রপতির
বিসদৃশ রকমের বড় ছবি। সিগারেট ধরিয়ে আমি বই খুলি।
যে-কোনো বিমানের শব্দে আমার উৎকর্ণ হয়ে ওঠার দরকার
নেই। বিশেষ অতিথির ঘর চিনতে ভুল হয় না। সিকিউরিটির
লোক একবার এসে আমাকে দেখে যায়। আমি অ্যাশট্রের
বদলে ছাই ফেলি সোফাতে গদিতে—কারণ, এতে কিছু যায়
আসে না।

সময়ের মুহূর্ত, পল, অনুপল স্তব্ধ হয়ে থাকে—এক বন্ধ
বিরাট নির্জন ঘর, আমি একা, আমার পা ছড়ানো—আকাশ
থেকে মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় স্মৃতি, তার মধ্যে একটা
সূর্যমুখী ক্রমশ প্রকাণ্ড থেকে আরও বিশাল, লক্ষ লক্ষ
সমান্তরাল আলো, যুদ্ধ-প্রতিরোধের মিছিলের মতন,
যেন অজস্র মায়াময় চোখ দংশন করে নির্জনতা, ঘুমের
মধ্যে পাশ ফেরার মতন—
একটা টেলিফোন বেজে ওঠে। আমার জন্য নয়, আমার
জন্য নয়—।

দুঃখের গল্প

একজন মানুষ শুকনো নদীর সামান্য
উচ্ছিষ্ট জলে
পা ধুচ্ছে
লোকটি এই মাত্র পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে এলো।

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ—
লাল ধুলোর ঝড় খেলা করে আকাশে
ব্রিজের ওপর ঝমঝমিয়ে চলে যায় ট্রেন
প্রকাণ্ড অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে গ্রাম-বাংলা।

আমি দেখেছি, বস্তুত স্বপ্নেই দেখেছি, সেই লোকটি
এই অবশিষ্ট নদীর
ভূতপূর্ব খেয়া পারাপারের মাঝি
সে আজ হেঁটে এই নদী পার হয়ে এসে
অপমানিত
নুয়ে আছে তার শরীর—
ঘোলাটে জলে তার মুখের কোনো ছায়া পড়ে না।

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ ।
সে উঠে আসে আস্তে আস্তে
বিড়ি ধরাবার জন্য অন্য একজনের কাছে
আগুন চায়
অন্য লোকটি অবাঙমানসগোচর,
দেশলাই বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে,
কী হে কেমন ?
সে সামান্য হেসে বলে, ভালোই আছি—
তারপর কালপুরুষের দিকে ধোঁয়া ওড়ায়

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ
এখানে রয়েছে নদী-বিচ্ছেদের কাহিনী—
এর সঙ্গে আমার বা তোমার দুঃখের
কোনো তুলনাই হয় না ।

ফিরে যাবো

বহুদিন স্বর্গ থেকে দূরে আছি, মনে পড়ে
পুরোনো স্বদেশ
ছিলাম বাসনা-লঘু, গ্লানিহীন রৌদ্রের উৎসবে
অমলিন ছেলেবেলা ; ঘাসের শিশিরে
ছুটোছুটি
হারানো বোতাম খুঁজে কেটে গেছে বেলা ।

বহুদিন স্বর্গ থেকে দূরে আমি, মনে পড়ে
পুরোনো স্বদেশ
বৃদ্ধ নাবিকের গানে যে-রকম উদাসীন মনে হয়
প্রান্তরের ছায়া
হঠাৎ হাওয়ায় যেন শুকনো পাতা শব্দ করে,
ফিরে যাবো, ফিরে যেতে হবে
কপালের ঘাম মুছে মানুষের কাঁধে রাখি হাত !

অন্যলোক

যে লেখে, সে আমি নয়
কেন যে আমায় দোষী কর !
আমি কি নেকড়ের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ছিঁড়েছি শৃঙ্খল ?
নদীর কিনারে তার ছেলেবেলা কেটেছিল
সে দেখেছে সংসারের গোপন ফাটল
মাংসল জলের মধ্যে তার আয়না খুঁজেছে, ভেঙেছে ।
আমি তো ইস্কুলে গেছি, বই পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়
একটা চাবুক পেয়ে হয়ে গেছি শূন্যতায়
ঘোড়সওয়ার ।

যে লেখে সে আমি নয়
যে লেখে সে আমি নয়
সে এখন নীরার সংশ্রবে আছে পাহাড়-শিখরে
চৌকশ বাক্যের সঙ্গে হাওয়াকেও
হারিয়ে দেয় দুরন্তপনায়
কাঙাল হতেও তার লজ্জা নেই
এবং ধ্বংসের জন্য তার এত উন্মত্ততা
দূতাবাস কর্মীকেও খুন করতে ভয় পায় না ।
সে কখনো আমার মতন বসে থাকে
টেবিলে মুখ গুঁজে ?

আমিও ছিলাম

পাঁচজনে বলে পাঁচ কথা, আমি নিজেকে এখনো চিনি না ।
চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
দশ দিকে চেয়ে আলোর আকাশে আয়নায় মুখ দেখা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, এই সুখে নিঃশ্বাস ।

জানি না কোথায় ভুল হয়ে যায়, ছায়া পড়ে ঘোর বনে
ঝড়ে বৃষ্টিতে পায়ে পায়ে হেঁটে যাকে মনে করি বন্ধু
সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, চোখে অচেনা মতন ভ্রূকুটি
নেশায় রক্ত উন্মাদ হয়, তছনছ করি নারীকে
অস্তিত্বের সীমানা ছাড়িয়ে জেগে ওঠে সংহার
আঁধার সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে চোখ জ্বালা করে ওঠে।

চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
বারবার সব ভুল হয়ে যায় এত বিপরীত স্রোত
বুকের মধ্যে প্রবল নিদাঘ, পশ্চিমে হেলে মাথা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, কান্নার মতো শোনায়।

জীবন-স্মৃতি

—তোমার ছিল স্বপ্ন দেখার অসুখ, তুমি
আপন মনে কথা বলতে

—তোমার ছিল বিষম দুঃখ,
তুমি কখনো
নদীর পারে একলা যাওনি

—তোমার ছিল ছুরির মতন
ধারালো রাগ
হঠাৎ যেদিন হাতে তোমার কাঁটা ফুটলো
গোপাল গাছটা লণ্ডভণ্ড করেছিলে,
মনে পড়ে না ?

—শুধু কি তাই, প্রজাপতির
ডানা ছিঁড়েছি
কত খেলনা কেড়ে নিয়েছি
অন্তত তিন ডজন কাচের
বাসন ভাঙা সব মিলিয়ে

—নিষ্ঠুরতায় এখনো তুমি কম যাও না
‘বিদায়’ শব্দ কঠিন ভাবে
বলতে পারো
রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেই
মিলিয়ে যায় অনেক স্মৃতি

—তোমার ছিল দয়ার শরীর
সারা জীবন
ভালো না বেসে দয়া দেখালে
লাজুকতার আড়ালে এক অহঙ্কারী !

—ভালোবাসা তো পারস্পরিক
আমায় কেউ ভালোবাসেনি
ঘোর দুপুরে অভুক্ত এক
ক্লান্ত কিশোর
কেউ কি তাকে কাছে ডেকেছে ?

—তুমি অনেক রাত্রিবেলায়
সিঁড়ির মধ্যে বসে থাকতে
নিচে কিংবা ওপর দিকে
কোথায় যাবে, ঠিক জানো না ।
এটাই তোমার মূল সমস্যা
পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায়
পথ খুঁজতে ভুল হয়ে যায় ।
সেই নদীটা খুঁজতে খুঁজতে
মনের ভুল
গভীর বনে ঢুকে পড়লে ।

—গভীর এবং অন্ধকারও, সেই অরণ্য
শিবের বিশাল জটার মতন
নদীও তাতে

হারিয়ে যায়
নির্জনতার উদাসী রব জ্বালা ধরায়
বুকের মধ্যে
উচ্চাকাঙ্ক্ষা নতজানু ।

—একলা রাস্তা পাওনি বলেই
গিয়েছিল না
দলে-মিছিলে ?

—আইসক্রিমের কাঠির মতন
আবার আমি
পরিত্যক্ত !

—এটাও একটা বিলাসিতা নিজেও জানো
তুমিও বুঝি বিলাসী নও
যেমন, তোমার স্বপ্ন দেখা ?

—সর্বনাশ ও স্মৃতির দুঃখ
স্বপ্ন এখন এসব দেখায় !
নারীর কাছে গিয়েছিলাম
আঁচড়ে কামড়ে রক্ত পাগল
ভালোবাসার দুঃখ ছাড়াও
সর্বনাশের গাঢ় মহিমা
এর থেকে কেউ দূরে যায় কি ?

—এক এক সময় নেশার মতন
দূরের দিকে চোখ ঠেকে যায়
দূরত্বকে শান্তি বলে মানতে হঠাৎ ইচ্ছে করে

—যেমন দূর ছেলেবেলার
দুঃখগুলোও মধুর, যেমন
অন্ধকারে আত্মগ্লানি লুকিয়ে ফের
বাইরে এসে মনে হয় না, চমৎকার
এই বেঁচে থাকা ?

সেই সব স্বপ্ন

কারাগারের ভিতরে পড়েছিল জ্যোৎস্না
বাইরে হাওয়া, বিষম হাওয়া, সেই হাওয়ায়
নশ্বরতার গন্ধ
তবু ফাঁসির আগে দীনেশ গুপ্ত চিঠি লিখেছিল
তার বউদিকে :
"আমি অমর, আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই !"

মধ্যরাত্রি, আর বেশী দেরী নেই
প্রহরের ঘণ্টা বাজে, সান্ত্রীও ক্লান্ত হয়
শিয়রের কাছে এসে মৃত্যুও বিমর্ষ বোধ করে
কণ্ডেম্‌ন্‌ড সেলে বসে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য লিখছে :
"মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে ?
আজ চারদিকে চেয়ে দ্যাখো
লক্ষ 'প্রদ্যোৎ' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে—
আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয়..."

কেউ জানতো না সে কোথায়
বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলেটি, আর ফেরেনি
জানা গেল, দেশকে ভালোবাসার জন্য সে পেয়েছে
মৃত্যুদণ্ড
শেষ মুহূর্তের আগে পোস্টকার্ডে ভবানী ভটচায
অতি দ্রুত লিখেছিল ছোট ভাইকে :
"অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—
সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে
আজ আমি বেশী কথা লিখবো না
শুধু ভাববো, মৃত্যু কত সুন্দর ।"
লোহার শিকের ওপর হাত
তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে
দৃষ্টি ভেদ করে যায় দেয়াল, অন্ধকারও
বাঙ্ময় হয়
সূর্য সেন পাঠালেন তাঁর শেষ বাণী :
"আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম ?

শুধু একটি মাত্র জিনিস,
আমার স্বপ্ন—
একটি সোনালি স্বপ্ন
এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম !”

সেই সব স্বপ্ন এখনও বাতাসে উড়ে বেড়ায়,
শোনা যায় নিশ্বাসের শব্দ
আর সব মরে, স্বপ্ন মরে না—
অমরত্বের অন্য নাম হয়
কানু,সন্তোষ, অসীমরা জেলখানার নির্মম অন্ধকারে বসে
এখনও সেরকম স্বপ্ন দেখছে।

কবির দুঃখ

শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
গোপনে
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল।

শব্দ ভেঙে গেলে যেন শৃঙ্খলের মতো শব্দ হয়
পাহাড়ের চূড়া থেকে খসে পড়া রূপালি পাতার মতো
সন্ধ্যায় সূর্যকে দীপ্ত দেখে
লক্ষ বৎসরের পর এক মুহূর্তের জন্য দুর্লভ স্বরাজ
বুকের ভিতর যেন তোমার মুখের মতো প্রতিবিম্ব শিল্পে ঝলসে ওঠে
মনে হয়
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
কালহীন, বর্ণহীন
প্রতিশব্দহীন

আমি সূর্যকরোজ্জ্বল হ্রদের কিনারে তবু ভালেরির মতো
পাইনি প্রার্থিত শব্দ, উদ্ভাসিত প্রতিবিম্ব, যদিও আমাকে
প্রেম তার প্রতিমূর্তি গোপনে দেখাবে বলেছিল।

পদ্মায় পুনর্বার

এইমাত্র এসে ভিড়লো ফেরী জাহাজ। কী সৌভাগ্য আমার, রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবার জায়গা পেলুম।

নদীর ওপার নেই, মধ্যিখানে চড়া রোদ্দুর রং-এর এক ঝাঁক পাখির লুটোপুটি। আকাশের নীল রেখা ভেদ করে উড়ে গেল বিমান, জল আলোড়িত হলো, ছাড়লো ফেরী।

যে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে একটি বালকের পঁচিশ বছর পরের চেহারা। সে শৈশব ও মধ্য যৌবনের দু'রকম চোখ নিয়ে দেখছে নদী। যেন সব কিছুই চেনা, অথচ মানুষটিকে কেউ চেনে না।

বিস্ময়বোধের পাশে এসে দাঁড়াল বুদ্ধি, বেদনাকে সান্ত্বনা দেয় যুক্তি, দীর্ঘশ্বাসকে উড়িয়ে নিয়ে যায় হু-হু হাওয়া, নদীর জলে হালকা মেঘের ছায়া পড়ে।

হে নদী কীর্তিনাশা, তোমার শান্ত গভীরতায় উন্মোচিত হয় ছদ্মবেশ। গোয়ালন্দ ভেঙে তুমি ছুঁয়েছো ফরিদপুর। মানুষ আসে যায়, নদী পার হয়, বাতাস উড়িয়ে ভেসে যায় নৌকোর সারি, সময় এদের সবাইকে চিহ্ন দিয়ে গেছে।

শৈশব ও মধ্য যৌবন সম্মিলিত করে আমি বিপুল জলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ নাকে এলো মুর্গী রান্নার গন্ধ, তৎক্ষণাৎ সেইদিকে…

শূন্য ট্রেন

ট্রেনের জানলায় মুখ, ঐ মুখ হলুদ আলোর মতো ফিরে আসে
মধ্যরাতে একা
এখন সন্ধ্যার রোদ ফসলের ক্ষেতের ওপাশে
বিষণ্ণ বাদামী :
প্রান্তর ফুরিয়ে গেলে ট্রেন থামে, তবু আরও আছে
মহাশূন্যে সদ্যলব্ধ বিষম এলাকা।—
ধানের বুকের কাঁচা দুধ দেখে প্রীত মনে আমি
ধরিত্রীকে সুস্থ জেনে চলে যাব প্রাণহন্ত্রী নীলিমার কাছে,

প্রচণ্ড হুইস্‌ল্ শুনি বারবার মধ্যরাতে একা।

বাগানের ফলুগুলি ঝরে যায় বিনম্র জ্যোৎস্নায় শোকহীন
প্রতিদিন সন্ধ্যার বাগানে,
তবুও আমায় কেন চোর বলে প্রত্যেক শরিক !
এ পৃথিবী ভরে গেছে ক্লান্তিকর মনীষায়, সাফল্যের গানে
বিশাল গর্জনে ভেঙে জানলার শিক
সভ্যতার জয়ধ্বনি কর্ণে পশে, কে হে তোমরা ধৃষ্ট চোখে
দেখাও তর্জনী
প্রত্যহ সঙ্গম বিনা ঘুম আসে না, শোনো সু-শরীর, পীনস্তনী
রমণী দুর্লভ বড়, শিয়রের অন্ধকারে কয়েকটি রঙিন
ফুল রেখে দিতে চাই, সামান্য শৌখিন, ওরা মুছে নিতে জানে
শরীরের দুর্গন্ধ, কুরূপ, ওরা ঝরে থাকে সন্ধ্যার বাগানে
বিনম্র জ্যোৎস্নায় শোকহীন ।

বুকের ভিতরে শুয়ে বুক দেখি না, এত আলো, চোখ ভেসে যায়
চক্ষু অন্ধ করে দিলে ধন্য হয় অন্ধকার দেখা
নগরীর সব লোক ছুটেছে অগণ্য শোকসভায় ;
শুধু আমি ফুলচোর-নীলিমায় কৌমার্য-হরণ রক্ত মেখে শুয়ে আছি
শীতের অত্যন্ত কাছাকাছি,—
শূন্য, ভয়ংকর ট্রেন ফিরে আসে মধ্যরাতে একা ।

তুমি যেই এসে দাঁড়ালে

তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
হাত ছুঁয়ে বলে বন্ধু
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়
হাসি বিনিময় করে চলে যায়
উত্তরে দক্ষিণে
তুমি যেই এসে দাঁড়ালে—
কেউ চিনলো না কেউ দেখলো না
সবাই সবার অচেনা !

মৃতের উপদ্রব

কবিতা লেখার খাতা কখনো ভয়ের মতো শব্দ করে
মুখের সামনে আসে অপর কবির মুখ
এই বৃষ্টি, এই নির্জনতা, এই বিকেলবেলায় শুয়ে থাকা
অপর কবির চোখ দিয়ে দেখা হয়
অপর কবির মতো শব্দ আসে, শব্দগুলি বিদেশী নির্দেশে
সারিবদ্ধ হয়
কবিতার মতো যেন হয়ে ওঠে, নিশ্চয়ই কবিতা, কার ?
আমার অনভিপ্রেত হাতে খেলা করে যেন আমার অসহায়তা ।

অর্ধেক শতাব্দী আগে মৃত কবি, সহসা বিকেলবেলা
আমার নিঃসঙ্গ জাগা, আমার বৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকা—চুরি করে
আমার শব্দ ও বাক্য কেড়ে নেয়, তার বুক ভাঙা দুঃখ, অসমাপ্ত শ্বাস,
বাণী সন্ধানের ব্যাকুলতা—
আমার পেন্সিল ছুঁয়ে পাখা ঝাপটায়, আমি ভয় পাই
আমি খাতা বন্ধ রেখে চোখ বুজে ভয় ভোগ করি ।

এখন নারীর কাছে গেলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাবো
নারীর দু'বাহু চেপে চুম্বনে নিরত আছে
অর্ধেক শতাব্দী আগে মৃত এক কবি ।

পাহাড় চূড়ায়

অনেকদিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ । কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না । যদি তার দেখা পেতাম, দামের জন্য আটকাতো না । আমার নিজস্ব একটা নদী আছে, সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে । কে না জানে, পাহাড়ের চেয়ে নদীর দামই বেশী । পাহাড় স্থাণু, নদী বহমান । তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম । কারণ, আমি ঠকতে চাই ।

নদীটাও অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে। ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্টোখাট্টো, ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল। সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি। শৈশবে দ্বীপটি ছিল বড় প্রিয়।
আমার যৌবনে দ্বীপটি আমার আমার কাছে মাপে ছোট লাগলো। প্রবহমান ছিপছিপে তন্বী নদীটি বেশ পছন্দ হলো আমার। বন্ধুরা বললো, ঐটুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে এতবড় একটা নদী পেয়েছিস? খুব জিতেছিস তো মাইরি! তখন জয়ের আনন্দে আমি বিহ্বল হতাম। তখন সত্যিই আমি ভালোবাসতাম নদীটিকে।
নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিত। যেমন, বলো তো, আজ সন্ধেবেলা বৃষ্টি হবে কিনা?
সে বলতো, আজ এখানে দক্ষিণ গরম হাওয়া। শুধু একটি ছোট্ট দ্বীপে বৃষ্টি, সে কী প্রবল বৃষ্টি, যেন একটা উৎসব!
আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না, সে জানতো! সবাই জানে। শৈশবে আর ফেরা যায় না।

এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য, আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাবো, তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড়। একেবারে চূড়ায়, মাথার খুব কাছে আকাশ, নিচে বিপুলা পৃথিবী, চরাচরে তীব্র নির্জনতা। আমার কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না। আমি ঈশ্বর মানি না, তিনি আমার মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না। আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো, প্রত্যেক মানুষই অহঙ্কারী, এখানে আমি একা—এখানে আমার কোনো অহঙ্কার নেই। এখানে জয়ী হবার বদলে ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে। হে দশ দিক, আমি কোনো দোষ করিনি। আমাকে ক্ষমা করো।

চেনার মুহূর্ত

বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে
টেনে চোখ মারি
হে বীণাবাদিনী, তুমিও তো নারী, ক্ষমা করো এই
বাক-ব্যবহার

তুমি ছাড়া আর এমন কে আছে, যার কাছে আমি
দাস্য মেনেছি
এবার আমাকে প্রশ্রয় দাও, একবার আমি
ছিলা টান করি।

একবার এই পাংশুবেলায় তুমি হয়ে ওঠো
শরীরী প্রতিমা
অনেক দেখেছি দুনিয়া বাহার, এবার ফুঁ দিয়ে
নেভাই গরিমা
হলুদকে বলা রক্তিম হতে—ভাষাভ্রান্তির
এই উপহাস
মানুষকে বড় বিমূঢ় করেছে, এবার অস্ত্র
দুঃখদহন।

জানি না কোথায় পড়েছিল বীজ, পৃথিবীতে এত
ভুল অরণ্য
দুঃখ সুখের খেলায় দেখেছি বারবার আসে
প্রগাঢ় তামস
তোমার রূপের মায়াবী বিভায় একবার জ্বালো
ক্ষণ-বিদ্যুৎ
চোখ যেন আর চিনতে ভোলে না, তুমি জানো আমি
কত অসহায়।

সখী, আমার

সখী, আমার তৃষ্ণা বড় বেশী, আমায় ভুল বুঝবে ?
শরীর ছেনে আশ মেটে না, চক্ষু ছুঁয়ে আশ মেটে না
তোমার বুকে ওষ্ঠ রেখেও বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়
যেন আমার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
দিঘির পাড়ে বুকের সঙ্গে দেখা হলো না !

সখী, আমার পায়ের তলায় সর্ষে, আমি
বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী
আমায় কেউ দ্বার খোলে না, আমার দিকে চোখ তোলে না
হাতের তালু জ্বালা ধরায়, শপথগুলি ভুল করেছি
ভুল করেছি
মুহুর্মুহু স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্নে আমার ফিরে যাওয়ার
কথা ছিল, স্বপ্নে আমার স্নান হলো না।

সখী, আমার চক্ষুদুটি বর্ণকানা, দিনের আলোয়
জ্যোৎস্না ধাঁধা
ভালোবাসায় রক্ত দেখি, রক্ত নেশায় ভ্রমণ দেখি
সুখের মধ্যে নদীর চড়া, শুকনো বালি হা হা তৃষ্ণা
হা হা তৃষ্ণা
কীর্তি ভেবে ঝড়ের মুষ্টি ধরতে গেলাম, যেন আমার
ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
স্বরূপ দেখা শেষ হলো না।

মিথ্যে নয়

হঠাৎ দূর থেকে একটা আকস্মিক ডাক আসে
ভুলে ছিলাম
দপ করে জ্বলে ওঠে অন্ধকার আকাশে উল্কা
ব্যগ্র কণ্ঠে বারবার জিজ্ঞেস করি, তুমি ?
তুমি ? তুমি ?
দূরের অস্পষ্ট স্বর মৃদু হাস্যে বলে,
চিনতে পারোনি ?
উদ্‌ভ্রান্তের মতন আমি এদিক ওদিক তাকাই
মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে
এই সময় কোন কথাটা বললে মানায় ?

বলবো কি, সারা জীবন তোমার ডাকের
প্রতীক্ষায় আছি
প্রতিটি মুহূর্ত, সব সময়—
যদিও কত কাজের মধ্যে ডুবে আছি—
শরীরে মালিন্যের সর পড়ে
কত ক্ষুদ্রতা নীচতার মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে
যেতে হয়
এই মুহূর্তে ঐ কথাটা হয়তো মিথ্যে শোনাবে
অথচ মিথ্যে যে নয়, কী করে বোঝাবো ?

হেমন্তে বর্ষায় আমি

হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি
শিশির ছুঁয়েছে চোখ নদী-প্রাণ প্রান্তরের কাছে
জঙ্ঘার তিলের মতো আবিষ্কার অন্ধকারে মিলে মিশে যায়
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি
ঘুমন্ত মুখের কাছে উড়ে উড়ে পড়ে বাঁশ পাতা
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি।

কী আদর ছিল এই মেঘ ও রৌদ্রের নিচু খেলা ও খেলার মতো ফুলের তৃণের
পালকের তরবারি কেটেছিল জলের সীমানা
আমার দুঃখের কাছে বাদল-পোকার মতো
তারা সব ছুটে এসেছিল
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি

হেমন্তে বর্ষায় আমি দীর্ঘ পথ পতনে উত্থানে
বাতাসের লণ্ডভণ্ড দুনিয়ায় মিশিয়েছি
নুনের লাবণ্য
অস্থির শিরীষ গাছে প্রজাপতি বসে, উড়ে যায়
হারানো বন্ধুর মুখ ওরকম
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি।

বঞ্চনা

সিংহদ্বার খুলে গেছে, ভেতরে দেখি শুধুই শূন্যতা
হা হা করছে অন্ধকার
কেউ নেই, কোনো রহস্যও না
যেন বালক বয়েসের হাওয়া ঘুরে যায়
দু' একটা শুকনো পাতার শব্দ—
কেউ নেই ? আমি চেঁচিয়ে উঠি
প্রতিধ্বনি আসে, কেউ নেই, নেই, নেই—
আমার তীব্র অভিমান হয়
এ কি এক ধরনের বঞ্চনা নয় ?
যদি কেউ না থাকবে, তবে দ্বার কেন বন্ধ ছিল ?
কেন প্রতীক্ষায় ছিলাম এতদিন !

চোখ ঢেকে

যে-যেমন জীবন কাটায়
তার ঠিক সেই রকম এক-একটি পোশাক রয়েছে
আলো ও হাওয়ার মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে কে যে
আনন্দ-ভিখারী
উড়ুনি ভিজিয়ে সেও বিধ্বংসী নদীর থেকে
শান্তি চেয়েছিল
সহসা বিদ্যুৎ-স্পর্শে চোখ ঢেকে আমিও একদা
অচেনা প্রান্তরে একা ছন্নছাড়া, সমূলে দেখেছি
দিগম্বর মৃত্যু স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

কত দূরে ?

ভোরবেলায় বৃষ্টি একজন সাক্ষী চেয়েছিল, তাই আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে বাইরে আসি। বারান্দায় সামনেই ব্রীজ, একটাও মানুষ নেই, মাথার মধ্যে নেশার মতন বৃষ্টির শব্দ, দূরে ছানার জলের মতন হালকা নীল আলো।

এই যে দৃশ্য, আমি কি এর যোগ্য ? পৃথিবীতে জন্মেছি বলেই কি আমি সুন্দরের অংশভাগ পাবার অধিকারী ? আলো, হাওয়া, অন্ধকার এবং নারীর জন্য নিরন্তর এক জুয়াখেলা চলছে, ক্রমশ সবাই দূরে চলে যায়, এক বিকল টেলিফোনে বারবার আমি ডাকাডাকি করেছি। কেউ জানলো না বিচ্ছেদের আগে ছিল কতখানি ব্যাকুলতা।

আমার মুখে জলের ঝাপটা লাগে, এখন আমি কাঁদতে পারি, আমার যাবতীয় দুঃখ ও ক্ষমাপ্রার্থনা এই মানবহীন প্রত্যুষে সূক্ষ্ম বৃষ্টির সামনে। একটা হারিয়ে যাওয়া ছবি, এই রকম বারান্দার সামনে ব্রীজ, ভোরের বর্ষণ, দূর আকাশের গায়ে আঁকা বৃক্ষ, যেন আগে কোথাও ছিল, এখন নেই, আমি ঝুলে আছি শূন্যে। কিংবা আমার ঘুম ভাঙেনি, কেউ ক্ষমা চায়নি।

হাত দিয়ে স্পর্শ করি জল। আমাকে যেতে হবে। আর কত দূরে ? আর কত দূরে ?

স্বপ্ন নয়

সুগন্ধ নারীর পাশে শুয়ে থাকা স্বপ্ন নয়
বাইরে বর্ষার কলরোল
কানের লতির পাশে ঠোঁট এনে
পুরোনো কাব্যের পঙ্‌ক্তি বলাবলি হলো
স্বপ্ন নয়
বাইরে ক্ষুধা ও মৃত্যু চোখাচোখি করে
হাতের আঙুল নিয়ে খেলা,
দুরন্ত আঙুল কভু
ছুঁয়ে দেয় স্তন,
স্বপ্ন নয়
বাইরে দুঃখের মতো মিহিন বাতাস—

জীবন এমন ছিল, আজো নেই তোমার আমার ?
ভুলে থাকি বহু শোক, ছড়ানো কুন্তলে যত অন্ধকার
স্বপ্ন নয়
বাইরে যখনই আসি, বহু মিথ্যে প্রিয় সঙ্গী হয়।

স্বপ্নের অন্তর্গত

কারুর আসার কথা ছিল না
কেউ আসেনি
তবু কেন মন খারাপ হয় ?

যে-কোনো শব্দ শুনেই
বাইরে উঠে যাই
কেউ নেই—
অদ্ভুত নির্জন হয়ে পৃথিবী
শুয়ে আছে
ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তের
স্বপ্নে
আমিও যেন সেই স্বপ্নের
অন্তর্গত।

তুমি যেখানেই যাও

তুমি যেখানেই যাও
আমি সঙ্গে আছি
মন্দিরের পাশে তুমি শোনোনি নিশ্বাস ?

লঘু মরালীর মতো হাওয়া উড়ে যায়
জ্যোৎস্না রাতে
নক্ষত্রেরা স্থান বদলায়
ভ্রমণকারিণী হয়ে তুমি গেলে কার্শিয়াং
অন্য এক পদশব্দ
পেছনে শোনোনি ?
তোমার গালের পাশে ফুঁ দিয়ে কে সরিয়েছে
চূর্ণ অলক ?

তুমি সাহসিনী,
তুমি সব জানলা খুলে রাখো
মধ্যরাত্রে দর্পণের সামনে তুমি—
এক হাতে চিরুনি
রাত্রিবাস পরা এক স্থির চিত্র
যে-রকম বতিচেল্লি এঁকেছেন ;
ঝিল্লির আড়াল থেকে
আমি দেখি
তোমার সুঠাম তনু
ওষ্ঠের উদাস-লেখা
স্তনদ্বয়ে ক্ষীণ ওঠা নামা
ভিখারী বা চোর কিংবা প্রেত নয়
সারা রাত
আমি থাকি তোমার প্রহরী ।
তোমাকে যখন দেখি, তার চেয়ে বেশী দেখি
যখন দেখি না
শুকনো ফুলের মালা যে-রকম বলে দেয়
সে এসেছে
চড়ুই পাখিরা জানে
আমি কার প্রতীক্ষায় বসে আছি
এলাচের দানা জানে
কার ঠোঁট গন্ধময় হবে—
তুমি ব্যস্ত, তুমি একা, তুমি অন্তরাল ভালোবাসো
সন্ন্যাসীর মতো হাহাকার করে উঠি
দেখা দাও, দেখা দাও

পরমুহূর্তেই ফের চোখ মুছি,
হেসে বলি,
তুমি যেখানেই যাও, আমি সঙ্গে আছি।

ওরা

তারও তো যাবার কথা ছিল, যে রইলো
অন্ধকারে একা একা শুয়ে

সে হাত বাড়িয়ে দিল
হাওয়ায় উড়িয়ে নিল শব্দ
দিগন্তে লুকিয়ে গেল আলো
তারও তো যাবার কথা ছিল।

পিপুল গাছের নিচে উঁইঢিপি
তার পাশে পড়ে আছে ভাঙা শালিকের
ডিম, পিঁপড়েরা এসে গেছে
ঝিম অন্ধকারে এক পুকুরের পাড়ে
দু'পায়ের কাদা ধুচ্ছে একলা রমণী
কালো জল, কালো রাত্রি, কালো দুটি চোখ
লেবুবাগানের থেকে জোনাকিরা উড়ে এসে
রেখাচিত্র আঁকে
সেই প্রশ্ন : তোমারও যাবার কথা ছিল ?

জাগরণ হেমবর্ণ

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও
আরও কাছে যাও
ও কেন হিংসার মতো শুয়ে আছে যখন পৃথিবী খুব
শৈশবের মতো প্রিয় হলো
জল কণা-মেশা হাওয়া এখন এ আশ্বিনের প্রথম সোপানে
বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকে যায়
আরও কাছে যাও
জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও ।

মধু-বিহ্বলেরা কাল রাত্রিকে খেলার মাঠ করেছিল
ঘাসের শিশিরে তার খণ্ডচিহ্ন
ট্রেনের শব্দের মতো দিন এলে সব মুছে যায়
চশমা-পরা গয়লানী হাই তোলে দুধের গুমটিতে
নিথর আলোর মধ্যে
কাক শালিকের চঞ্চু শান
রোদ্দুরের বেলা বাড়ে, এত স্বচ্ছ
নিজেকে দেখে না
আর খেলা নেই
ও কেন স্বপ্নের মধ্যে রয়ে যায়
শরীরে বৃষ্টির মতো মোহ
আরও কাছে যাও

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও ।

লোকটা

রেল লাইনে মাথা পেয়ে শুয়ে আছে যে লোকটা
সে বিশ্ব শান্তির জন্য চিন্তা করেনি
সে এসেছে অনেক দূর থেকে
অন্ধকার মাঠের মধ্যে বারবার হোঁচট খেতে খেতে
সে একজন কষ্টসহিষ্ণু মানুষ
অনেক অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া তার মুখ
সে জীবনটা নিয়ে বিলাসিতা করতে জানে না
রেল লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে লোকটা কাঁদছে
তোমরা দেখো
যে যেখানে আছো, সব কাজ থামাও
সব-রকম ব্যস্ততা থেকে
হাত তুলে নাও এক পলকের জন্য
দেখো, রেল লাইনে মাথা দিয়ে কাঁদছে একজন মানুষ
সে কোনো কবিকে প্রেরণা দিতে চায় না
আসছে ট্রেন, শব্দ, আলো ক্রমে ক্ষীণ বিন্দু থেকে
উজ্জ্বল, গোল, চোখ ধাঁধানো
শব্দ কী নিদারুণ, কানে তালা লাগিয়ে দেয়
জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটা মুহূর্ত
এক ফোঁটা চোখের জল
ট্রেন লোকটার দেহ থেঁতলে দিয়ে গেল
রক্ত ছিটকে যায় চতুর্দিকে, তবু
এও যেন মৃত্যুর শিল্প-গরিমা
ও বেঁচে থাকলে আমরা ওকে লক্ষও করতাম না।

সাক্ষী

হাতে লেগেছিল হাত, কেউ তো দেখেনি ?
একটি শালিক দেখেছিল
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তার ওষ্ঠ ছুঁই
দেখেনি তো কেউ ?
কাগজের টুকরো একটা উড়ে যায়

নদীর কিনারে তার চোখে চোখ রেখে
বিনিময় হয়ে যায় সব দুঃখ
আর কেউ জানে না
হঠাৎ উঠলো বেজে স্টিমারের ভোঁ ।

অভিশাপ

তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ অন্যবর্ণ
নিরন্তর পাশা খেলা, মাঝে মাঝে শোনা যায় হাসি
তোমাকে দেখে না কেউ, এত গুপ্ত, অন্তরীক্ষবাসী
মনে হয় ।
প্রতিটি জয়ের পর আবার নতুন খেলা
এত বেশী লোভ ?
তুমি হেরে যাবে, তুমি ঠিক হেরে যাবে ।

দুঃখকে চেনো না তুমি, তোমার দুঃখের অন্যবর্ণ
মানুষকে ছোট করে, মানুষকে পিঁপড়ে করে মারো
দুর্দিনের সওদাগর, সিন্দুকের মধ্যে তুমি ভরে রাখো
হাজার অসুখ ।
দ্রব্য থেকে কেড়ে নাও দ্রব্যগুণ
এত বেশী লোভ ?
আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি হেরে যাবে ।

বয়েস

আমার নাকি বয়েস বাড়ছে ? হাসতে হাসতে এই কথাটা
স্নানের আগে বাথরুমে যে ক'বার বললুম !
এমন ঘোর একলা জায়গায় দু-পাক নাচলেও
ক্ষতি নেই তো—
ব্যায়াম করে রোগা হবো, সরু ঘেরের প্যান্ট পরবো ?
হাসতে হাসতে দম ফেটে যায়, বিকেলবেলায়
নীরার কাছে
বলি, আমার বয়েস বাড়ছে, শুনেছো তো ? ছাপা হয়েছে !
সত্যি সত্যি বুকের লোম, জুলপি, দাড়ি কাঁচায় পাকা—
এই যে দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো
দেখে সবাই বলবে না কি, ছেলেটা কই, ও তো লোকটা !
এ সব খুব শক্ত ম্যাজিক, ছেলে কীভাবে লোক হয়ে যায়
লোকেরা ফের বুড়ো হবেই এবং মরবে
আমিও মরবো
আরও খানিকটা ভালোবেসে, আরও কয়েকটা পদ্য লিখে
আমিও ঠিক মরে যাবো,
কী, তাই না ?
ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম, এ-জায়গাটা এত অচেনা
আমার ছিল বিশাল রাজ্য, তার বাইরেও এত অসীম
শরীরময় গান-বাজনা, পলক ফেলতেও মায়া জাগে
এই ভ্রমণটা বেশ লাগলো, কম কিছু তো দেখা হলো না
অন্ধকারও মধুর লাগে, তোমার হাতটা দাও তো
সুগন্ধ নিই !

নীরা, শুধু তোমার কাছে এসেই বুঝি
সময় আজো থেমে আছে ।

এখন

এখন সময় ভরা বাবলা-কাঁটা
ভালো করে না এসেই চলে যায় শীত
এখন তারার দেশে যুক্তি তর্কে ঝড় ওঠে
এইভাবে কেটে যায় দিন ।

এখন কারুর কোনো ঋণ নেই
চণ্ডালেও হাতে পরে ঘড়ি
কাকেদের শোকসভা অকস্মাৎ ভেঙে যায়
গৃহ ভাঙে, তৈরি হয় বাড়ি ।

মেয়েদের ডাক নাম সকলেই জানে
একদা শিল্পের নাম ছিল বুঝি মোহ
বৃষ্টির ভিতরে কেউ শিল্প হয়ে হেঁটে যায়
কালো চশমা চক্ষুলজ্জা ঢাকে ।

বাতাসে সৌরভ ছিল, ধুলো ছিল
একা অনুতপ্ত মুখে বসেছি সিঁড়িতে
কোথাও যাবার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি
এখন রাত্রিতে সব বদলে গেছে ।

অমেয় ভাণ্ডার থেকে নিতে পারি
যা নেই বা কখনো ছিল না
হীরের কুচির মতো পড়ে আছে দুঃখ, স্মৃতি
কিছু তো দেবারও থাকে, এই নাও ।

কাব্যপরিচয়

একা এবং কয়েকজন

পৌষ ১৩৬৪ সালে সাহিত্য প্রকাশক (২২ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা ৪) থেকে প্রকাশ করেন সমীর রায়চৌধুরী। কবিতার সংখ্যা ৪৮, দাম ২ টাকা, পৃষ্ঠা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। 'আমার প্রিয় কবিদের প্রতি' উৎসর্গীকৃত। পরে (আষাঢ়, ১৩৮১) সম্পূর্ণ বইটি বিশ্ববাণী প্রকাশনীর 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ' সংকলনে প্রকাশিত হয়। বইটির পুনর্মুদ্রণ হয়নি।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

মধ্যচৈত্র ১৩৭২-এ কৃত্তিবাস প্রকাশনী (৩২/২-যোগীপাড়া রোড, কলকাতা ২৮) থেকে প্রকাশ করেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। ৭১টি কবিতার এই বই উৎসর্গ করা হয় 'সমীর রায়চৌধুরী-কে'। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৩ টাকা ৫০ প.। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় সংস্করণ 'নতুন (বি) সংস্করণ' হিসাবে প্রকাশিত হয় বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯-এ। এই সংস্করণটিতেও প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০। দাম ৫ টাকা। প্রথম সংস্করণে একটি ছোট ভূমিকা ছিল, সেটি দ্বিতীয় সংস্করণেও ছাপা হয়। ভূমিকাটি এই : অনেক কবিতার কপি হারিয়ে গেছে। আট বছর আগে বেরিয়েছিল আমার প্রথম কবিতার বই। তার পর ছাপা যতগুলি কবিতার কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, সেগুলি টেবিলের উপর নিয়ে বসেছিলাম। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করে পড়তে হয় নিজের পুরনো কবিতা। যেগুলি পছন্দ হয় না ও শরীর রি-রি করে, সেগুলি মাটিতে ফেলে দিই। ক্রমে আমার ঘরময় বিবর্ণ কাগজ উড়তে থাকে, ঘরের মেঝেতে ও হাওয়ায় ব্যর্থ কবিতা ছড়িয়ে যায়। টেবিলে যখন আর তিন-চারটি মাত্র বাকি, তখন থেমে যাই, খুব ক্লান্ত ও অসহায় লাগে, অবশ ভয় হয়, এত বেশি ব্যর্থতায় নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে। কেউ দেখছে না এই জেনে, পরাজিত ভঙ্গিতে, ঘাড় হেঁট করে মাটি থেকে আবার অনেকগুলি কাগজ তুলে আনি।

জানি, যে-কবিতা আমি লিখতে চাই, এখনো তার মর্ম স্পর্শ করতে পারিনি। আমি কবিতায় সত্যি কথা লিখতে গিয়ে দেখেছি, পৃথিবীর সত্য প্রতিনিয়ত বদলে যায়। এখানে আমার ধারাবাহিক ভুলগুলি। যে-কবিতা জীবনের, সে-কবিতার জন্য জীবনকে যোগ্য করে নিতে হবে। এ জীবন সজ্ঞানে, আত্মত্যাগে নয়, সর্বগ্রাসে সর্বভুক কবিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যদি না পারে, তবে কবিতা লেখা ছেড়ে, সেই দিকভ্রান্ত জীবন তখন নিজেকে নিয়ে কী করবে জানি না।

বন্দী, জেগে আছো

ফাল্গুন ১৩৭৫-এ অরুণা প্রকাশনী (৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬) থেকে প্রকাশ করেন বিভাসচন্দ্র বাগচী। উৎসর্গ 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রদ্ধাস্পদেষু'। কবিতার সংখ্যা ৪৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৩ টাকা ৫০ প·। প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা। বইটির পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ।

আমার স্বপ্ন

এপ্রিল ১৯৭২-এ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯) থেকে ফণিভূষণ দেব প্রকাশ করেন। উৎসর্গ 'দেবারতি মিত্র, বেলাল চৌধুরী, সুব্রত রুদ্র-কে আমার বিনীত উপহার'। কবিতার সংখ্যা ৪০, পৃষ্ঠা ৮+৫৬। দাম ৩ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

সত্যবদ্ধ অভিমান

শ্রাবণ ১৩৭৯-এ ময়ূখ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড (১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২) থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এবং কবিতাসংক্রান্ত দুটি গদ্যরচনা নিয়ে প্রকাশ করেন ৭২ পৃষ্ঠার বই 'যুগলবন্দী'। বইটি দুটি আলাদা নামে বিভক্ত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা-অংশের নাম 'সত্যবদ্ধ অভিমান'। এই নামে কবির আলাদা কোনও বই নেই। এখানে ২১টি কবিতার সঙ্গে 'কবিতার সুখদুঃখ' নামে একটি নিবন্ধ ছিল। প্রচ্ছদশিল্পী গৌতম রায়। দাম ৩ টাকা ৫০ প·। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'দু'জনের প্রিয় বন্ধু সুনন্দ গুহঠাকুরতা-কে'।

জাগরণ হেমবর্ণ

২৫ বৈশাখ ১৩৮১ তারিখে অরুণা প্রকাশনী (৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬) থেকে অরুণা বাগচী প্রকাশ করেন। উৎসর্গ 'বুদ্ধদেব বসু স্মরণে'। প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। মোট ৪৩টি কবিতা। পৃষ্ঠা ৬৪। বোর্ড বাঁধাই। দাম ৪ টাকা ৫০ প·। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি, কবিতার নাম, পৃষ্ঠা)

জন্ম : ২১ ভাদ্র। ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত।
শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ংকর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে।
১৯৮৩ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে।
গ্রন্থ-সংখ্যা : দ্বিশতাধিক।
একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত।

কবিতাসমগ্র ১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা সমগ্র

সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাসমগ্র ১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ কালানুক্রমিক রূপে বিন্যস্ত করে প্রকাশিত হচ্ছে 'কবিতাসমগ্র'র একেকটি খণ্ড। বাংলা কবিতার যাঁরা প্রেমিক পাঠক, তাঁদের কাছে এ এক মস্ত খবর সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলা কথাসাহিত্যের সেরা একজন লেখক যিনি, সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে বাংলা কবিতারও এক অতিশক্তিমান স্রষ্টা, তা কে না জানে।
এই কথাটাও সবাই জানে যে, পঞ্চাশের দশকে 'কৃত্তিবাস' নামক যে-আন্দোলন একদিন বাংলা কবিতার মোড় একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সুনীলই ছিলেন তার নেতৃস্থানীয় কবি। পাঠক, সমালোচক— সবাই সেদিন অবাক মেনেছিলেন। সবাই লক্ষ করেছিলেন যে, এই কবি কোনও পুরনো কথা শোনাচ্ছেন না; তিনি যা কিছু লিখছেন, তারই ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক ঝলক টাটকা বাতাস, আর সেই বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে এমন এক সৌরভ, যা তার আগে পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
কথাসাহিত্য ও কবিতার দাবি একই সঙ্গে মেটানোর কাজটা বড় শক্ত। এ কাজ সবাই পারে না। সুনীল যে পেরেছেন, তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। যৎপরোনাস্তি সফল একজন কথাসাহিত্যিক হয়েও এই সরল সত্য তিনি কখনও বিস্মৃত হননি যে, মূলত তিনি কবিই, এবং—গদ্য নয়— কবিতাই তাঁর প্রথম প্রেম। সেই প্রেমের দাবি আজও তিনি সমানে মিটিয়ে যাচ্ছেন, এবং অসামান্য সব উপন্যাস ও গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে লিখে যাচ্ছেন এমন অনেক কবিতা, পাঠকের আগ্রহকে যা নিমেষে অধিকার করে নেয়।
তাঁর 'কবিতাসমগ্র'র এই দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৬টি কাব্যগ্রন্থ। দাঁড়াও সুন্দর, মন ভালো নেই, এসেছি দৈব পিকনিকে, দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়, স্বর্গনগরীর চাবি, সোনার মুকুট থেকে অর্থাৎ এমন বহু কবিতা, যার নানা পঙ্‌ক্তি একদিন পাঠকদের মুখে-মুখে ফিরত। এমন কবিতা, দু'দিন বাদেই যা বাসী হয়ে যায় না, যা চিরকালই নতুন থেকে যায়।

ISBN 81-7215-090-3

ক বি তা স ম গ্র

২

কবিতাসমগ্র

২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

ভূমিকা

আমার কবিতাসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডে ছোট দু'টি গ্রন্থের কবিতা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থগুলি কালানুক্রমিক কিন্তু প্রতিটি কবিতা সে রকম নয়। আমার যাবতীয় প্রকাশিত কবিতাই কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় না। এই দুটি বই প্রকাশ করার সময় আমার আরও বেশ কিছু কবিতা আমি নিজেই বর্জন করেছি, সেগুলি এখন আর খুঁজে পাবার উপায় নেই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্র ন্থ সূ চি

দাঁড়াও সুন্দর

সূচিপত্র

নদীর পাশে আমি

নদীটির স্বাস্থ্য ছিল ভালো, এবং সন্ধ্যার আগে
মিশে ছিল ফিকে লাল রং
হঠাৎ বনের পাশে সে আমাকে একটুখানি
চমকে দেয়
যেন সুখে শুয়ে আছে একাকী কিন্নরী
আমি তার রূপের তারিফ করে
বলে উঠি, বাঃ !

এবং নারীর ওষ্ঠে চুম্বন করার মতো
আমি তার জল ছুঁই
চোখে মুখে ঝাপটা দিই
তাকে নিয়ে খেলা করি অত্যন্ত আদরে
দু'পাশের গাছপালা এবং আকাশ তার
সাক্ষী হয়ে থাকে।

তবু এর শেষ নেই, এখানেও শেষ নেই,
এই স্বাস্থ্যবতী নদীটিকে
বনের কিনারা থেকে ছাপার অক্ষরে যতক্ষণ
তুলে আনতে না পারি, বা
স্মৃতি থেকে ছন্দ-মিলে গেঁথে রাখা যায়
ততক্ষণ শান্তি নেই, ততক্ষণ নদীপ্রান্তে নির্বাসিত আমি।

ভালোবাসার পাশেই

ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে
ওকে আমি কেমন করে যেতে বলি
ও কি কোনো ভদ্রতা মানবে না ?
মাঝে মাঝেই চোখ কেড়ে নেয়,
শিউরে ওঠে গা
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

দু'হাত দিয়ে আড়াল করা আলোর শিখাটুকু
যখন তখন কাঁপার মতন তুমি আমার গোপন
তার ভেতরেও ঈর্ষা আছে, রেফের মতন
তীক্ষ্ণ ফলা
ছেলেবেলার মতন জেদী
এদিক ওদিক তাকাই তবু মন তো মানে না
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

তোমায় আমি আদর করি, পায়ের কাছে লুটোই
সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আগুন নিয়ে খেলি
তবু নিজের বুক পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়
বুক পুড়ে যায়
কেউ তা বোঝে না
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

শিল্পী ফিরে চলেছেন

শিল্পী ফিরে চলেছেন, এ কেমন চলে যাওয়া তাঁর ?
এমন নদীর ধার ঘেঁষে চলা,
যেখানে অজস্র কাঁটাঝোপ
এবং অদূরে রুক্ষ বালিয়াড়ি,
ওদিকে তো আর পথ নেই
এর নাম ফিরে যাওয়া ? এ তো নয় শখের ভ্রমণ
রমণীর আলিঙ্গন ছেড়ে কেন সহসা লাফিয়ে ওঠা—
কপালে কোমল হাত, টেবিলে অনেক সিক্ত চিঠি
কত অসমাপ্ত কাজ, কত হাতছানি
তবু যেন মনে পড়ে ভুল ভাঙবার বেলা এই মাত্র
পার হয়ে গেল !

বুকে এত ব্যাকুলতা, ওষ্ঠে এত মায়া
তবু ফিরে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে
এর নাম ফিরে যাওয়া ? এ তো নয় শখের ভ্রমণ
ওদিকে তো আর পথ নেই

অচেনা অঞ্চলে কেউ ফেরে ? যাওয়া যায়। ফেরে ?
এর চেয়ে জলে নামা সহজ ছিল না ?
সকলেই বলে দেবে, শিল্পী, আপনি ভুল করেছেন
অতৃপ্ত, দুঃখিত এক বৃহত্তম ভুল।

একটি শীতের দৃশ্য

মায়া মমতার মতো এখন শীতের রোদ
মাঠে শুয়ে আছে
আর কেউ নেই
ওরা সব ফিরে গেছে ঘরে
দু'একটা নিবারকণা খুঁটে খায় শালিকের ঝাঁক
ওপরে টহল দেয় গাংচিল, যেন প্রকৃতির কোতোয়াল।

গোরুর গাড়িটি বড় তৃপ্ত, টাপু টুপু ভরে আছে ধানে
অন্যমনা ডাহুকীর মতো শ্লথ গতি
অদূরে শহর আর ক্রোশ দুই পথ
সেখানে সবাই খুব প্রতীক্ষায় আছে
দালাল, পাইকার, ফড়ে, মিল, পার্টি, নেকড়ে ও পুলিশ
হলুদ শস্যের স্তূপে পা ডুবিয়ে
ওরা মল্লযুদ্ধে মেতে যাবে
শোনা যাবে ঐকতান, ছিঁড়ে খাবো চুষে খাবো
ঐ লোকটিকে আমি তোমাদের আগে ছিঁড়ে খাবো।

সিমেন্টের বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে সেই লোকটা
বিড়ির বদলে সিগারেট
আজ সে শৌখিন বড়, চুলে তেল, হোটেলের ভাত খেয়ে
কিনেছিল এক খিলি পান
খেটেছে রোদ্দুরে জলে দীর্ঘদিন, পিতৃস্নেহ
দিয়েছিল মাঠে
গোরুর গাড়ির দিকে চোখ যায়, বড় শান্ত এই
চেয়ে থাকা
সোনালী ঘাসের বীজ আজ যেন নারীর চেয়েও গরবিনী

সহস্র চোখের সামনে গায়ে নিচ্ছে
রোদের আদর
এখনই যে লুট হবে কিছুই জানে না
পালক পিতাটি সেই সঙ্গে সঙ্গে যাবে
যারা অগ্নিমান্দ্যে ভোগে তারা ঐ লোকটির
রক্ত মাংস খাবে।

আচার্য শঙ্কর, আমি করজোড়ে অনুরোধ করি
অকস্মাৎ এই দৃশ্যে আপনি এসে যেন না বলেন
এ তো সবই মায়া!

একটি কথা

একটি কথা বাকি রইলো থেকেই যাবে
মন ভোলালো ছদ্মবেশী মায়া
আর একটু দূর গেলেই ছিল স্বর্গ নদী
দূরের মধ্যে দূরত্ব বোধ কে সরাবে।

ফিরে আসার আগেই পেল খুব পিপাসা
বালির নিচে বালিই ছিল, আর কিছু না
রৌদ্র যেন হিংসা, খায় সমস্তটা ছায়া
রাত্রি যেমন কাঁটা, জানে শব্দভেদী ভাষা।

বালির নিচে বালিই ছিল, আর কিছু না
একটি কথা বাকি রইল, থেকেই যাবে।

নিজের আড়ালে

সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে
মানুষ দেখে না
সে খোঁজে ভ্রমর কিংবা
দিগন্তের মেঘের সংসার

আবার বিরক্ত হয়
কতকাল দেখে না আকাশ
কতকাল নদী বা ঝর্নায় আর
দেখে না নিজের মুখ
আবর্জনা, আসবাবে বন্দী হয়ে যায়
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে

রমণীর কাছে গিয়ে
বারবার হয়েছে কাঙাল
যেমন বাতাসে থাকে সুগন্ধের ঋণ
বহু বছরের স্মৃতি আবার কখন মুছে যায়
অসম্ভব অভিমানে খুন করে পরমা নারীকে
অথবা সে অস্ত্র তোলে নিজেরই বুকের দিকে
ঠিক যেন জন্মান্ধ তখন
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে ।

নারী

নাস্তিকেরা তোমায় মানে না, নারী
দীর্ঘ ঈ-কারের মতো তুমি চুল মেলে
বিপ্লবের শত্রু হয়ে আছো !
এমনকি অদৃশ্য তুমি বহু চোখে
কত লোকে নামই শোনেনি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো···

তারা চেনে প্রেমিকা বা সহোদরা
জননী বা জায়া
দুধের দোকানে মেয়ে, কিংবা যারা
নাচে গায়
রান্না ঘরে ঘামে
শিশু কোলে চৌরাস্তায় বাড়ায় কঙ্কাল হাত
ফ্রক কিংবা শাড়ি পরে দুঃখের ইস্কুলে যায়

মিস্তিরির পাশে থেকে সিমেন্টে মেশায় কান্না
কৌটো হাতে পরমার্থ চাঁদা তোলে
কৃষকের পান্তা ভাত পৌঁছে দেয় সূর্য ক্রুদ্ধ হলে
শিয়রের কাছে রেখে উপন্যাস
দুপুরে ঘুমোয়
এরা সব ঠিকঠাক আছে
এদের সবাই চেনে শয়নে, শরীরে
দুঃখ বা সুখের দিনে
অচির সঙ্গিনী !

কিন্তু নারী ? সে কোথায় ?
চল্লিশ শতাব্দী ধরে অবক্ষয়ী কবি দল
যাকে নিয়ে এমন মেতেছে ?
সে কোথায় ? সে কোথায় ?
দীর্ঘ ঈ-কারের মতো চুল মেলে
সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

এই ভিড়ে কেমন গোপন থাকো তুমি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো…

আছে ও নেই

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাগলটি
পৃথিবীর সমস্ত পাগলের রাজা হয়ে
সে উলঙ্গ, কেননা উন্মাদ উলঙ্গ হতে পারে, তাতে
প্রকৃতির তালভঙ্গ হয় না কখনো
পাশেই গম্ভীর ট্রেন, ব্যস্ত মানুষের হুড়োহুড়ি
সকলেই কোথাও না কোথাও পৌঁছোতে চায়
তার মধ্যে এই মূর্তিমান ব্যতিক্রম, ইদানীং
অযাত্রী, উদাসীন—
মাঝারি বয়েস, লম্বা, জটপাকানো মাথা
তার নাম নেই, কে জানে আমিত্ব আছে কিনা

অথচ শরীর আছে
সুতোহীন দেহখানি দেহ সচেতন করে দেয়
পেটা বুক, খাঁজ কাটা কোমর, আজানুলম্বিত বাহু
এবং দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ
চুলের জঙ্গলে ঘেরা
পুরুষশ্রেষ্ঠের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিড়ে, যেন সদর্পে
সন্ন্যাসী হলেও কোনো মানে থাকতো, কেউ হয়তো
প্রণাম জানাতো
কিন্তু এই শারীরিক প্রদর্শনী এত অপ্রাসঙ্গিক
টিকিটবাবুও তাকে বাধা দেয় না
রেলরক্ষীরা মুখ ফিরিয়ে থাকে
ফিল্মের পোস্টারের নারী পুরুষদের সরে যাবার উপায় নেই
অপর নারী পুরুষরা তাকে দেখেও দেখে না
তারা পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটু নিমেষহারা হয়েই
আবার দূরে চলে যায়
শুধু মায়ের হাত ধরা শিশুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে
একটি আপেল গড়িয়ে যায় লাইনের দিকে—
ঠিক সেই সময় বস্তাবন্দী চিঠির স্তূপের পাশ দিয়ে
এসে দাঁড়ায় দুটি হিজড়ে
নারীর বেশে ওরা নারী নয়, এবং সবাই জানে
ওদের বিস্ময়বোধ থাকে না
তবু হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়ায় ; পরস্পরের দিকে
তাকায় অদ্ভুত বিহ্বল চোখে
যেন ওদের পা মাটিতে গেঁথে গেল
সার্চ লাইটের মতন চোখ ফেরালো পাগলটির শরীরে
সেই অপ্রয়োজনীয় সুঠাম সুন্দর শরীর,
নির্বিকার পুরুষাঙ্গ
যেন ওদের শপাং শপাং করে চাবুক মারে
সূর্য থেকে গল গল করে ঝরে পড়ে কালি
এই আছে ও নেই'র যুক্তিহীন বৈষম্যে প্রকৃতি
দুর্দান্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে
সেই দুই হিজড়ে অসম্ভব তীব্র চিৎকার করে ওঠে—
ধর্মীয় সংগীতের মতন
ওরা কাঁদে,

দু'হাতে মুখ ঢাকে,
বসে পড়ে মাটিতে
এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মিশে যায়
নশ্বর ধুলোয়
অল্প দূরে, সিগারেট হাতে আমি এই দৃশ্য দেখি।

কথা ছিল

সামনে দিগন্ত কিংবা অনন্ত থাকার কথা ছিল
অথচ কিছুটা গিয়ে
দেখি কানাগলি
ঘরের ভিতরে কিছু গোপন এবং প্রিয়
স্মৃতিচিহ্ন থেকে যাওয়া
উচিত ছিল না ?
নেই, এই দুঃখ আমি কার কাছে বলি !

সমস্ত নারীর মধ্যে একজনই নারীকে খুঁজেছি
এই রকমই কথা ছিল
স্নিগ্ধ উষাকালে
প্রবল স্রোতের মতো প্রতিদিন ছুটে চলে যায়
জন্ম থেকে বারবার খসে পড়ে আলো
রাত্রির জানলার পাশে আবার কখনো হয়তো
ফিরে আসে
ফুটে ওঠে ছোট্ট কুন্দ কলি।
তবু ঘোর ভেঙে যায় কোনো কোনো দিন
চেয়ে দেখি, সত্য নয়
শুধুই তুলনা !
নেই, এই দুঃখ আমি কার কাছে বলি !

আমি নয়

পথে পড়ে আছে এত কৃষ্ণচূড়া ফুল
দু' পায়ে মাড়িয়ে যাই, এলোমেলো হাওয়া
বড় প্রীতি স্পর্শ দেয়, যেন নারী, সামনে বকুল
যার ঘ্রাণে মনে পড়ে করতল, চোখের মাধুরী
তারপরই হাসি পায়, মনে হয় আমি নয়, এই ভোরে
এত সুন্দরের কেন্দ্র চিরে
গল্পের বর্ণনা হয়ে হেঁটে যায় যে মানুষ
সে কি আমি ?
ক্ষ্যাপাটের মতো আমি মুখ মুচকে হাসি ।

★

ক্যাবিনের পর্দা উড়লে দেখা যায় উরুর কিঞ্চিৎ
একটি বাহুর ডৌল, টেবিলে রয়েছে ঝুঁকে মুখ
ও পাশে কে ? ইতিহাস চূর্ণ করা নারীর সম্মুখে
রুক্ষচুল পুরুষটি এমন নির্বাক কেন ? শুধু সিগারেট
নড়েচড়ে, এর নাম অভিমান ? পাঁচটি চম্পক
এত কাছে, তবু ও নেয় না কেন, কেন ওর ওষ্ঠে
দেয় না গরম আদর ?
শুধু চোখে চোখ—একি অলৌকিক সেতু, একি
অসম্ভব চিন্ময়তা
চায়ের দোকানে ঐ পুরুষ ও নারী মূর্তি ব্যথা দেয়,
বুকে বড় ব্যথা দেয়
ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয় ইদানীং বেড়াতে এসেছে ।

★

মধ্যরাত্রি ভেঙে ভেঙে কে কোথায় চলে যায়, যেন উপবনে
বসন্ত উৎসব হলো শেষ
বিদায় শব্দটি যাকে বিহ্বল করেছে
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে সে এখন দ্রুত উঠে আসে
চাঁদের শরীর ছুঁতে
অথবা স্বর্গের পথ এই দিকে হঠাৎ ভেবেছে
দরজা খুলো না তুমি, দূর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও
ও এখন দুঃখে নোংরা, দু' হাতে তীব্রতা
এবং কপালে তৃষ্ণা, পর্দাহীন জানালার দিকে

দুই চোখ
মাতালের অস্থিরতা মাধুর্যকে ওষ্ঠে নিতে চায়—
অথচ জানে না
গোধূলির কাছে তার নির্বাসন হয়ে গেছে কবে !
দরজা খুলো না তুমি, দূর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও
ও তোমার জানু আঁকড়ে আহত পশুর মতো ছট্‌ফটাবে
অতৃপ্তির সহোদর, সশরীর নিষিদ্ধ আগুন
ক্ষমা করো, আমি নই, ক্ষমা করো, দুঃস্বপ্ন, বিষাদ…

মায়া

মারা যেন সশরীর, চুপে চুপে মশারির প্রান্তে এসে
জ্বালছে দেশলাই
ভেতরে ঘুমন্ত আমি—
বাতাস ও নিস্তব্ধতা এখন দর্শক
রাত্রি এত স্নিগ্ধ, এত পরিপূর্ণ, যেন নদী নয় ।
স্বপ্ন নয়
স্বয়ং মায়ার হাত আমাকে আদর করে
ঘুম পাড়ালো
আসবার কৌতুকে মেতে মশারিতে জ্বালাবে আগুন
সমস্ত জানালা বন্ধ, দরোজায় চাবি
আহা কি মধুর খেলা, সশস্ত্র সুন্দর
আমাকে জাগাও তুমি,
আমাকে দেখতে দিও শুধু ।

অন্যরকম

পাহাড় শিখর ছেড়ে মেঘ ঝুঁকে আছে খুব কাছে
চরাচর বৃষ্টিতে শান্ত
আমি গম্ভীর উদাসীন ব্রহ্মপুত্রের পাশে চুপ করে দাঁড়াই
জলের ওপারে সব জল-রং ছবি
নারীর আচমকা আদরের মতন স্নিগ্ধ বাতাস—

এই চোখজুড়োনো সকাল, অদ্ভুত নিথর দিগন্ত
মনে হয় অজানা সৌভাগ্যের মতন
তবু সুন্দরের এত সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ
আমার মন খারাপ হয়ে যায়
মনে হয়, এ জীবন অন্যরকম হবার কথা ছিল।

স্মৃতি

বাল্যকালে একটা ছিল বিষম সুখ
তখন কোনো বাল্যকালের স্মৃতি ছিল না
স্মৃতি আমায় কাঁটার মতন বেঁধে
আমায় নির্জনতায়
চক্ষু বেঁধে ঘোরায়
স্মৃতি আমায় শাসন করে
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন ভাঙায়
আমার কিছু ভালো লাগে না
জন্ম গেল আকণ্ঠ এক
তৃষ্ণা নিয়ে
জন্ম থেকেই কেউ এলো না
বাল্যকালে একটা ছিল বিষম সুখ
তখন কোনো বাল্যকালের স্মৃতি ছিল না…

পৃথিবী ও আমি

আমি মরে যাবো, তাই পৃথিবী দুঃখিনী
হয়ে আছে
আকাশ মেঘলা, নেই হাওয়া কিংবা
বৃক্ষের শিখরে শিহরন
কেন যাবে, কেন চলে যাবে এই বৃষ্টির বিকেল
ছেড়ে
শূন্য অজানায়
কেউ এই কথা বলে কানে কানে চুপে।

আমি হাসি, দিই না উত্তর
পৃথিবীর সঙ্গে খুব ভালোবাসা ছিল, আর
দু'জনে নিভৃতে কতদিন
মুখোমুখি বসে থেকে,
চোখে রেখে চোখ
দেখেছি সময় আর ইতিহাস, পিঁপড়ের সারি
দেখেছি জয়ের কণ্ঠে বাসি ফুলমালা
আমার প্রেমিকা এই পৃথিবীকে
অত্যন্ত আদরে
এবং স্নেহের সঙ্গে লালন করেছি।
ইদানীং ভয় হয়, পৃথিবীর মুখ দেখে মনে হয়
যেন তার মন ভালো নেই
যেন কোনো গোপন অসুখ তাকে কুরে কুরে খায়
যদি তার মৃত্যু হয়! ভয় হয়!
তার চেয়ে আগে আগে
আমারই তো চলে যাওয়া ভালো!

অনেক দূরে

পরিত্যক্ত মন্দিরের ভাঙা সিঁড়িতে বসে
দু'এক মুহূর্ত বিশ্রাম
মন্দির কখনো গৃহ হয় না
আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।
গন্ধলেবুর ঝোপে ডেকে ওঠে
তক্ষক সাপ
এ কিসের সঙ্কেত?
যে-আকাশ আশ্চর্য সুন্দর নীল ছিল
এখন সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে শকুন
বাতাস হঠাৎ পাগল হয়ে দাপাদাপি করে—
এ কিসের সঙ্কেত?
আমাকে অনেক দূরে
আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

চায়ের দোকানে

লণ্ডনে আছে লাস্ট বেঞ্চির ভীরু পরিমল,
রথীন এখন সাহিত্যে এক পরমহংস
দীপু তো শুনেছি খুলেছে বিরাট কাগজের কল
এবং পাঁচটা চায়ের বাগানে দশআনি অংশ
তদুপরি অবসর পেলে হয় স্বদেশসেবক ;
আড়াই ডজন আরশোলা ছেড়ে ক্লাস ভেঙেছিল
পাগলা অমল
সে আজ হয়েছে মস্ত অধ্যাপক !
কি ভয়ংকর উজ্জ্বল ছিল সত্যশরণ
সে কেন নিজের কণ্ঠ কাটলো ঝক্‌ঝকে ক্ষুরে—
এখনো ছবিটি চোখে ভাসলেই জাগে শিহরন
দূরে চলে যাবে জানতাম, তবু এতখানি দূরে ?

গলির চায়ের দোকানে এখন আর কেউ নেই
একদা এখানে সকলে আমরা স্বপ্নে জেগেছিলাম
এক বালিকার প্রণয়ে ডুবেছি এক সাথে মিলে পঞ্চজনেই
আজ এমনকি মনে নেই সেই মেয়েটিরও নাম ।

নিশির ডাক

ছিলাম ঘুমন্ত, কে যেন আমায় নাম ধরে স্পষ্ট ভাবে ডাকলো
তিনবার, শিয়রের খুব কাছ থেকে
ব্যগ্র, চেনা কণ্ঠস্বর—
ধড়মড় করে উঠে বসি, আমি-সমেত শূন্য অন্ধকার ঘর
খোলা জানলার পাশে নিমগাছ
তার পাশে হিম আকাশ !
দরজা খুলে বারান্দাতেও উঁকি মেরে দেখলাম
কোথাও কেউ নেই, বাতাস ও জ্যোৎস্নার মেশামেশি
পৃথিবী ও পৃথিবী ছাড়িয়ে অশরীরী স্তব্ধতা—
অথচ স্পষ্ট ডাক শুনেছিলাম, চেনা গলা অথচ নাম জানি না ।
ফের বিছানায় শুয়েও খট্‌কা যায় না

তবে কি আমারই আত্মা ডেকে উঠেছিল আমাকে
ঘুমের মধ্যে ?
অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কোনো একটা জরুরি কথা বলতে চেয়েছিল ?
কি ?
শুধু ঘুমের মধ্যেই সে কথা বলা যায় ?
জেগে উঠে ভুল করেছি ?

সব সময় মনে হয়, আমার একটা ক্ষমা চাইবার আছে
কিন্তু অপরাধটা ঠিক চিনতে পারি না।
সব সময় মনে হয়, আমি একটা বিশেষ জরুরি কাজের কথা ভুলে গেছি
অথচ মনে পড়ে না
প্রেমের মধ্যে কোনো ছলনা, অগোচরে কোনো পাপ
বুঝি ঘটে যাচ্ছে যে-কোনো সময়
ঘুমের মধ্যে আমার বিস্মৃতির ওপার থেকে ভেসে আসছিল
সেই কণ্ঠস্বর !
কেন জেগে উঠলাম ?

জন্মান্ধের গান

'যতদিন বাঁচবো যেন দু'চোখ খুলেই বেঁচে থাকি'
একজন অন্ধ ভিখারী গান গাইছে রাসের মেলায়,
তিনজন শহুরে বাবু তুড়ি দিচ্ছে, এবং পোশাকি
হাসি হেসে পয়সা ছুঁড়ছে এলোমেলো, নিতান্ত হেলায়।
তারা কিন্তু অন্ধ নয়, চোরা চোখে দেখছে চারদিকে
নধর ডাঁটার মতো ছুঁড়িটি বেশ, সঙ্গে আছে নাকি
অন্য কেউ ? কি সুন্দর পুতুলটা দেখ্ মাত্র পাঁচ সিকে ;
সাঁওতালীরা আয়না কিনছে, সন্ধে নামল, এখনো অনেক রঙ্গ বাকি।

অন্ধ ভিখারীটি ফিরলো গান সেরে, হাটখোলার পাশে তার কুঁড়ে
'যতদিন বাঁচবো যেন দু'চোখ খুলেই বেঁচে থাকি'
শুদ্ধ, পরিশ্রুত এক মিশমিশে আলো তার দুই চক্ষু জুড়ে
উদ্ভাসিত করে দৃশ্যে, প্রান্তর,আকাশ, রাত্রি, আঁধার, জোনাকি ;
অথবা করে না হয়তো, জন্মান্ধ নির্বোধ লোকটা শোনা গান গায় শেখা সুরে
সেইদিন অর্থ বুঝবে, যেদিন কবরে শোবে তিন ফুট কালো মাটি খুঁড়ে।

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি বারান্দায়
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিয়রে
মাথা রেখে আছো ?
তুমি তো আমারই শুধু, দূর থেকে দেখা
শুকনো চুল, ভিজে মুখ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি নারী
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না—
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

দুই বন্ধু

—কোন দিকে যাবো ?
—যেদিকে যখন খুশি, যাসনি দক্ষিণে
—এই মাত্র উত্তর সন্ধান করে ফিরে আসছি
—কে দেখলি ?
—একটি রমণী তার হিংস্র নখে মেরে ফেললো
একটি টিয়া পাখি,
পাখির রক্তের মধ্যে
মেশালো দু'ফোঁটা অশ্রু
তারপর হেসে উঠলো

—তারপর ?
—নির্জনে নাচের সভা শুরু হলো

—সভাসদ কারা ?
—কেউ নয় কিংবা
একলা হিজল গাছ, ঝিরঝির নদী
এরাই দেখেছে সেই রমণীর
ছন্দোময় স্তন, উরু, রেখার মহিমা

—আর তুই ?
—আর আমি ?
আদিবাসিনীর সেই অশ্রু মাখা হাসির উল্লাস
পাখিটির রক্ত
এর যেন অন্য কোনো মানে আছে ?

—হয়তো রয়েছে।
—এবার বল্‌তো কেন
নিষেধ করলি ?

—আমি যা দেখেছি তোকে চাইনি দেখাতে
এক একটা দৃশ্য থাকে
নিজের বুকের মধ্যে কারুকার্য করে রাখা
অন্যের প্রবেশ মানা
সেইটাই সবার কাছে দক্ষিণের প্রবল নিষেধ।

সিংহাসনে ঘুণ পোকা

সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে
কেউ তা শোনেনি
সকলেই ভেবে বসে আছে যেন
রাজ্যপাট আছে ঠিকঠাক
আকাশ রয়েছে ঠিক আকাশেরই মতো
রোদ জল ঝড় নিয়ে সময়ের এত হুড়োহুড়ি
সবই আগেকার মতো, যেমন মানুষ
অকারণে মরে যায়, আবার জন্মায়
এই যে নিশ্চিন্ত সুখ, প্রগাঢ় প্রশান্তি, এর

অলক্ষ্যে আড়ালে
সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে কির কির কির কিঁর...

উপত্যকার পাশে

দুঃখ এসে আমার ধরলো উপত্যকার পাশে
এতদিন তো পালিয়ে ছিলাম
নদীর ধারে যাইনি
যাইনি বকুল গাছের নিচে
শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে
লুকোচুরির খেলায় ওকে ক'বার দিলাম ফাঁকি !
এমনকি এই ভোরের বেলায় রৌদ্র যখন কাঁপে
নারী যখন বৃষ্টি হয়ে
চক্ষু দুটি ধাঁধায়
কোমল বুকে নখের দাগে রক্তে ওঠে তুফান
আমি তখন হর্ষ এবং হর্ষ এবং হর্ষ
নিয়েই ছিলাম
দুঃখ নামে তুড়ি দিয়েছি
মৃত্যু যেমন অলীক !

ভুল করেছি, একা এসেছি, হঠাৎ অতর্কিতে
দুঃখ শেষে আমায় ধরলো
উপত্যকার পাশে।
আমায় এবার বন্দী করে, দু'হাত বেঁধে
নেবে বিচার সভায়
হর্ষ এবং হর্ষ এবং হর্ষ আমায় কঠিন শাস্তি দেবে ?

নারী কিংবা ঘাসফুল

মনোবেদনার রং নীল না বাদামী ?
নদীর চরায় আজ ফুটে আছে ঘাসফুল
হলুদ ও সাদা

ওদেরও হৃদয় আছে ? অথবা স্বপ্নের বর্ণচ্ছটা
একদিন এই নদী প্রান্তে এসে খুশিতে উজ্জ্বল হই
আবার কখনো আমি এখানেই বিষণ্ন, মন্থর
মুখ নিচু করে আমি প্রশ্ন করি
ঘাসফুল, তুমি কি নারীর মতো
দুঃখ দাও
আনন্দেরও তুমিই প্রতীক ?

চরিত্র বিচার

কেউ কেউ আলো চায় না, চিরদিন এই পৃথিবীকে
মাতৃগর্ভ মনে করে বেঁচে থাকে কলুষ আঁধারে
কেউ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কয়েকটি সনেট যায় লিখে
কেউ বা কুক্কুর-সম প্রভুর পত্নীর স্নেহ কাড়ে।

অনেক মানুষ শুধু সরল রেখার মতো বোবা
একটিও ইন্দ্রিয় নেই, ষড়রিপু ছোঁয়নি ঘৃণায়
হঠাৎ দেখলে ঠিক মনে হয় পুরুষ-বিধবা ;
বহুকাল বেঁচে থেকে একদিন শেষে নিভে যায়
নির্মম হাওয়ার তোড়ে, কিছুদিন ফটো হয়ে বাঁচে
এবং বীজের মতো উত্তরাধিকার, সন্তানের
রক্তকে দূষিত করে, ক্লীব করে, ডাস্টবিনে আনাচে কানাচে
ধুলো হয়ে ওড়ে শেষে। রক্তের বণিকও আছে ঢের
আমাদের আশেপাশে, প্রেম নেই প্রেমের বিচার নেই
কোনো
শুধু রক্ত বিক্রি করে, খ্যাতি, লোভ ইত্যাকার
বালক ক্রীড়ায়
দাম পায় কানাকড়ি অবশ্যই ; আরো আছে, শোনো
কেউ মরে সুস্থ দেহে, কেউ বাঁচে দীর্ঘদিন কুৎসিত পীড়ায়।
আমাকে এদের মধ্যে কোন দলে ফেলবে তুমি জানো—
যা তোমার খুশি !

এখন একবার

সবচেয়ে কী বেশি ভেঙে চুরে, গুঁড়িয়ে
ছন্নছাড়া হয়ে যায় ?
স্বপ্ন !
মেঘলা দুপুরবেলা পথে পথে ছড়ানো
দেখতে পাই
ওদেরই ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ।
গাড়ির চাকায় ছেটকানো নোংরা জলের
মতন এক একটা উপলব্ধি
চমকে দেয়
কোনো রাস্তাই কোথাও যায় না, যে যেখানে—
নিসর্গের ফুঁয়ের মতন পাতলা কুয়াশা
বিছিয়ে থাকে নদীর প্রান্তে
যে-নদী বহুদিন দেখিনি, যে-নারীদের
তারাও রূপ ও লাবণ্যের
পাশাখেলায় হেরে গিয়ে
সময়ের ফাঁদে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে।
কালপুরুষের থুতনি নেড়ে দিয়ে এখন
একবার ইচ্ছে হয়
হুর-রে বলে চেঁচিয়ে উঠতে।

একবারই জীবনে

দুই হাতে মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করার বিলাস
প্রথম যৌবনে ছিল।
ভাবতাম,
নদীর আকাশে লঘু মাছরাঙা পাখির মতন
মৃত্যুর দু'ধারে ঘেঁষে ছুটোছুটি
জীবনকে রূপরস দেয়।
বারবার
আমি কি যাইনি সেই মৃত্যুমুখী দক্ষিণের ঘরে ?
বাঁধের কিনার থেকে গড়ানো বন্ধুর হাত ধরে থাকা

আন্তরিক মুঠি
যমদণ্ড দেখেছিল।
যৌবনে এসবই খেলা।
যখন মানুষ মরে, একবারই জীবনে মরে,
তারপর আর কোনো খেলা নেই।
আর কোনো অস্পষ্টতা, নদীর কিনারে বসে থাকা নেই।
হঠাৎ বিমান থেকে বাচাল মেশিনগান ফুঁড়ে যায় দেহ
এখন যা শকুন ও কুকুরের ভোগ্য
আর কোনো খেলা নেই।

অতৃপ্তি

বৃষ্টির দিনে আরাম চেয়ারে জানলার পাশে বসবো ভেবেছি
তাও তো পারি না
একজন কেউ বৃষ্টি ভিজতে আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে চলে যাবে
কে ? নাম জানি না !
সকালবেলায় দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের কাপেও তৃপ্তি হয় না
হৃদয় ভরে না
একজন কেউ সেই মুহূর্তে বন্যায় ডোবে, অথবা তৃষ্ণা বুকে নিয়ে মরে
বাসনা মরে না—
পাহাড় চূড়ায় বেড়াতে যাবার কতদিন ধরে প্রবল ইচ্ছে
চিঠি লেখালেখি
তখনই অন্য পাহাড়ে কে যেন মেশিনগানের সামনে লুটিয়ে পড়লো হঠাৎ
তার মুখ দেখি।

তোমাকে ছাড়িয়ে

জাদুদণ্ড তুলে বললে, এখন বিদায় !
জানালা ঘুরে হাওয়া এলো আলমারির কোণে
ঝোলানো কিরীচ থেকে ঝলসে উঠলো প্রতিহিংসা
শ্রাবণের অপরাহ্ণে মহিষের ঘণ্টাধ্বনি মনকে ফেরায়।

আমার চোখের নিচে কালো দাগ, এসে দেখো, কিংবা থাক্ এখন এসো না
ব্যান্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যত অসহায়
তার চেয়ে কিছু কম, চিঠি হারানোর চেয়ে বেশি
বাদামি দুঃখের ছায়া তোমাকে ছাড়িয়ে ভেসে যায়।

নারী ও শিল্প

ঘুমন্ত নারীকে জাগাবার আগে আমি তাকে দেখি
উদাসীন গ্রীবার ভঙ্গি, শ্লোকের মতন ভুরু
ঠোঁটে স্বপ্ন কিংবা অসমাপ্ত কথা
এ যেন এক নারীর মধ্যে বহু নারী, কিংবা
দর্পণের ঘরে বাস
চিবুকের ওপরে এসে পড়েছে চুলের কালো ফিতে
সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না, কেননা আবহমান কাল
থেকে বেণীবন্ধনের বহু উপমা রয়েছে
আঁচল ঈষৎ সরে গেছে বুক থেকে—এর নাম বিস্রস্ত,
এরকম হয়
নীল জামা, সাদা ব্রা, স্তনের গোলাপী আভাস, এক
বিন্দু ঘাম
পেটের মসৃণ ত্বক, ক্ষীণ চাঁদ নাভি, সায়ার দড়ির গিঁট
উরুতে শাড়ীর ভাঁজ, রেখার বিচিত্র কোলাহল
পদতল—আল্পনার লক্ষ্মীর ছাপের মতো
এই নারী

নারী ও ঘুমন্ত নারী এক নয়
এই নির্বাক চিত্রটি হতে পারে শিল্প, যদি আমি
ব্যবধান ঠিক রেখে দৃষ্টিকে সন্ন্যাসী করি
হাতে তুলে খুঁজে আনি মন্ত্রের অক্ষর
তখন নারীকে দেখা নয়, নিজেকে দেখাই
বড় হয়ে ওঠে বলে
নিছক ভদ্রতাবশে নিভিয়ে দিই আলো
তারপর শুরু হয় শিল্পকে ভাঙার এক বিপুল উৎসব
আমি তার ওষ্ঠ ও উরুতে মুখ গুঁজে

জানাই সেই খবর
কালস্রোত সাঁতরে যা কোথাও যায় না !

প্রেমিকা

কবিতা আমার ওষ্ঠ কামড়ে আদর করে
ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিয়ে যায়
ছাদের ঘরে
কবিতা আমার জামার বোতাম ছিঁড়েছে অনেক
হঠাৎ জুতোয় পেরেক তোলে !
কবিতাকে আমি ভুলে থাকি যদি
অমনি সে রেগে হঠাৎ আমায়
ডবল ডেকার বাসের সামনে ঠেলে ফেলে দেয়
আমার অসুখে শিয়রের কাছে জেগে বসে থাকে
আমার সুখকে কেড়ে নেওয়া তার প্রিয় খুনসুটি
আমি তাকে যদি
আয়নার মতো
ভেঙে দিতে যাই
সে দেখায় তার নগ্ন শরীর
সে শরীর ছুঁয়ে শান্তি হয় না, বুক জ্বলে যায়
বুক জ্বলে যায়, বুকে জ্বলে যায়…

সময় খোলেনি

দরজা খুলেছো, তুমি, সময় খোলেনি
চোখ থেকে খসে গেল শেষ অহঙ্কার
কেন বুক কাঁপে, কেন চক্ষু জ্বালা করে
তারও ইতিহাস আছে, যেমন যৌবন
কাঁটা বনে খুঁজে এলো বিখ্যাত অমিয়
দরজা খুলেছো তুমি—সময় খোলেনি।

আরও কাছাকাছি এলে বুকে লাগে বুক

তোমার উরুর কাছে আমার পৌরুষ
সম্রাটত্ব শেষ করে ভিখারি সেজেছে
এর পরও কথা থাকে, শূন্য প্রতিধ্বনি
যেমন মৃত্যুকে বলে, তিলেক দাঁড়াও !
দরজা খুলেছো তুমি, সময় খোলেনি ।

স্বর্গের কাছে

কত দূরে বেড়াতে গেলুম, আর একটু দূরেই ছিল স্বর্গ
দু' মিনিটের জন্য দেখা হলো না
হঠাৎ ট্রেন হুইশ্‌ল দেয়
খুচরো পয়সার জন্য ছোটাছুটি
রিটার্ন টিকিটে একটি সই
আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি !
এত কাছে, হাতছানি দেয় স্বর্গের মিনার,
ঘ্রাণ আসে পারিজাতের
ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসবো না ?
শরীর উদ্যত হয়েছিল, সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেন
আমায় লুফে নেয়
পাপের সঙ্গীরা হা-হা-হা-হা করে হাসে
দেখা হলো না, দেখা হলো না, আমার সর্বাঙ্গে এই শব্দ
অস্তিত্বকে অভিমানী করে
আমি স্বর্গ থেকে আবার দূরে সরে যাই !

মুক্তো

তোমার গলার মুক্তোমালা ছিঁড়ে পড়লো হঠাৎ
এখন আমি খুঁজে চলেছি
একটা একটা মুক্তো যাদের
হারিয়ে যাবার প্রবণতা !
এখানে আলো, ঐ আঁধার
কাঁটার ঝোপ, বহু বাধার

আড়ালে খোঁজে চোখ, যেমন হিংস্রতাকে
খুঁজে ছিলেন এক সন্ত
মাঝে মাঝেই কাচের টুকরো চোখ ধাঁধায়
ওরে ডাহুক, জগৎ এখন তৃপ্ত, তোর
ডাক থামা !

ঘাসের ডগায় বিখ্যাত সেই শিশিরবিন্দু
এই সময় ?
ওরা তো কেউ মুক্তো নয়, মুক্তো নয়
উপমা যেমন যুক্তি নয়
তারার অশ্রুপাতের কথাও মনে পড়ে না !
আমি নারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি
চূর্ণ অলক
দুই অপলক চোখের মধ্যে ঐতিহাসিক নীরবতা
আমি খুঁজছি
বুকের কাছে শূন্যতার সামনে হাত কৃতাঞ্জলি
খুঁজে চলেছি, খুঁজে চলেছি...

চাবি

বহু রকমের চাবি-বন্দী হয়ে আছে এই ঘর
দেরাজ, আলমারি, বাক্স, বস্তুর সমস্ত স্পর্ধা
দমন করেছে এই
একটি মাত্র পিতলের কাঠি
মাঝে মাঝে ভাবি আমি, চাবিরও কি প্রাণ আছে নাকি ?
বড় তেজী, অভিমানী, ওরা জানে
জীবনের মর্ম ঠিক কিসে
তাই তো অজ্ঞাতবাসে চলে যায় প্রায়শই
অন্ধকারে চুপি চুপি হাসে
যেমন এক একটা চিঠি সভ্যতার মর্মমূলে
বদলে দিতে পারে সব
স্বপ্নের স্থাপত্য !
পরবর্তী আলোড়ন, হুলুস্থুলু—আসলে যা ইন্দ্রিয়ের

ভাত-ঘুম ভাঙা !

মধ্যরাত্রে যেন কেউ বাইরে ডাকে, ভয় হয়,
তবু যেতে হয়
অন্ধকারে পৃথিবী বিশাল হয়ে চুপে শুয়ে আছে
সেখানে দাঁড়িয়ে এক
হাতে-পায়ে শৃঙ্খলিত বিষণ্ণ মানুষ
হারিয়ে ফেলেছে সব চাবি
হারিয়ে ফেলেছে সব দাবি
মুখের আদল দেখে চেনা যায়, তবু
মনে হয়, না-চেনাই ভালো !

শরীর

এমন রোদে বেড়িয়ে এলো শরীর
শরীর, তোমার কষ্ট হলো নাকি ?
দুঃখ ছিল একটা কানাকড়ির
তাও হারাবার একটুখানি বাকি !

শরীর, তুমি ওষ্ঠ ছুঁয়ে ছিলে
স্বর্গ থেকে এলো বেভুল হাওয়া
চক্ষু এবং নাভির স্পর্শে মিলে
যা পেলে তার নাম কি ছিল পাওয়া ?

মেঘলা দিনে কুমারী-মুখ ছায়া
হিজল বনে ভয়-হারানো পাখি
জানলা খোলে মূর্তিমতী মায়া
শরীর, তোমার ঈর্ষা হলো নাকি ?

শুয়ে আছি

যেন অতিকায় এক সিংহের মতন রূপ,
তার পদতলে
কতদিন কতকাল আমি শুয়ে আছি
জ্বলে চোখ, জ্বলে স্নায়ু, ছেঁড়ে মাংস, পাশে এক নদী
তার জল ছলচ্ছলে
শোনা যায় নীল গান, কপিশ রঙের স্মৃতি—
এই ভাবে যতকাল বাঁচি।
কিংবা যেন নারী, তার বিপুল শ্রেণীর ভার, স্তনের উদ্যত গর্ব
মুক্ত মেখলায়
হঠাৎ সম্মুখে ঝুঁকে স্থিরচিত্র,
এই মূর্তিখানি বহুকাল
আমাকে পায়ের নিচে রেখে হাসে, দিগন্ত দোলায়
খড়্গের মতন উরু, নাকি মাটি ? শুধুই মাটির ছাঁচ !
পলকে বিভ্রম হয়, চাঁদ কিংবা নাভি
ওপরে তাকাই, কোনো বাণী নেই, আকাশের শান্ত সাদা দাবি।

সব গ্রন্থ শেষ হলে, পুরোনো গ্রন্থের মতো নিসর্গের স্বাদ
জিভ দিয়ে ছোঁয়া যায়, স্পর্শ করে বোঝা যায় এমন বাতাস
মানুষের দিকে ফিরলে চোখে পড়ে মানুষেরই
ধ্রুব পরমাদ
আমিও মানুষ নয় ? আয়নার ওপরে আছে আমার নিশ্বাস
আমিও জলের পাশে সিংহ কিংবা রমণীর
পায়ের তলায় শুয়ে আছি
শোনা যায় নীল গান, কপিশ রঙের স্মৃতি এই নিয়ে
যতকাল বাঁচি।

মহতের কাছে

সূর্যকে প্রণাম করছে পর্বত, এ দৃশ্য আমি অন্তত একবার
এ জীবনে দেখে যাবো—লজ্জিত, আভূমিনত বৃহতের কাছে
অন্য এক বৃহত্তর,—দীপ্ত মূর্তি, আশীর্বাদ ভঙ্গিতে উদার

দেখে যেতে সাধ হয় ; মনে হয় হয়তো আজও আছে
কোথাও বৃহৎ স্পর্ধা, অতিকায় মহত্ত্ব নিশান—
এই ক্ষুদ্র, নীতিহীন, সরু-চোখ, কালো-ঠোঁট, মানুষের ভিড়ে,
গণ্ডুষ জলের মধ্যে প্রেম-খ্যাতি লোভে মত্ত সফরীর প্রাণ
আকাশের হাওয়া টেনে ঋণী হয়, ঋণ শোধ করে না শরীরে।

সূর্যকে প্রণাম করছে পর্বত, এ দৃশ্য আমি অন্তত একবার
এ জীবনে দেখে যাব,
পুরাণের পৃষ্ঠা ছেড়ে
দৃশ্যমান স্থাবরে জঙ্গমে
যেতে হবে বহু দূর, ভেঙে দিয়ে এই বদ্ধ দ্বার
রথের মেলায় কিংবা শস্য ক্ষেতে, যেতে হবে
সুতোকলে, গ্রন্থাগারে,
ত্রিবেণী সঙ্গমে
যে-কোনো গর্বের কাছে, যে-কোনো স্পর্ধার কাছে
দেখে নিতে হবে তার কতটা মহিমা
সামান্য, ক্ষুদ্রের বাসা, এ জীবনে যেন একবার ভাঙে
তারই নিজে হাতে গড়া যতখানি সীমা।

দেখি মৃত্যু

আমি তো মৃত্যুর কাছে যাইনি, একবারও,
তবুও সে কেন ছদ্মবেশে
মাঝে মাঝে দেখা দেয়!
এ কি নিমন্ত্রণ, এ কি সামাজিক লঘু যাওয়া আসা ?
হঠাৎ হঠাৎ তার চিঠি পাই, অহংকার
নম্র হয়ে ওঠে
যেমন নদীর পাশে দেখি এক নারী
তার চুল মেলে আছে
চেনা যায় শরীরী সংকেত
অমনি বাতাসে ওড়ে নশ্বরতা
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে ?
যখনই সুন্দর কিছু দেখি

যেমন ভোরের বৃষ্টি
অথবা অলিন্দে লঘু পাপ
অথবা স্নেহের মতো শব্দহীন ফুল ফুটে থাকে
দেখি মৃত্যু, দেখি সেই চিঠির লেখক
অহংকার নম্র হয়ে আসে
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে ?

নাম নেই

'অরুণোদয়ে'র মতো শব্দ আমি বহুদিন
লিখিনি, হয়তো আর
কখনো লিখবো না
এমন সময় মেঘ গুরু গুরু শব্দ করে—
এ কি সুদূর-গর্জন নাকি মেঘমন্দ্র ?
শব্দের অমেয় নেশা যতখানি অস্থিরতা দিয়েছিল
ততখানি নারীও জানে না
শিহরন শব্দটিতে যে রকম বারবার শিহরন হয়
ভুলে যাওয়া বাল্যস্মৃতি থেকে ফের
উঠে আসে 'প্রহেলিকা'
বিকেলের চৌরাস্তায় অকস্মাৎ সব পথ
এলোমেলো হয়ে যায়
কবিতা লেখার কিংবা না-লেখার দুঃখ এসে
বুক চেপে ধরে
দুঃখ, না দুঃখের মতো অন্য কিছু
যার নাম নেই ?

ভুল সময়ে

আমি ভুল সময়ে জন্মেছি তাই আমায় কেউ চিনতে পারে না
আমার টেবিল চেয়ারে বসে থাকার কথা ছিল না
আমার জন্মের আগেই পৃথিবীর জঙ্গলগুলো
অভয়ারণ্য হয়ে গেল

সমুদ্র থেকে উপে গেল জলদস্যুরা
পথে জ্বললো আলো, বেজে উঠলো ছুটির নির্দিষ্ট ঘণ্টা।

মাঝে মাঝেই শূন্য হাতে অনুভব করি একটা তলোয়ার
পায়ের তলায় ঘোড়ার রেকাব
পাহাড়ী বাতাসের উল্টো দিকে ছুটে যাবার জন্য
আমার সব রোমকূপ সতর্ক হয়ে ওঠে
সামনে দেখতে পাই দুর্গের চূড়া, যেখানে আমার যাবার কথা ছিল।

আমি ভুল সময়ে জন্মেছি, তাই কিছুই চিনতে পারি না
বেলা বাড়ে, দিন যায়, তবু এ কি ঘোর একাকীত্ব
এই সব শুকনো নদী, পিচ বাঁধানো রাস্তা কিছুই
আমার ভালো লাগে না
নারীদের কাছে আমি পশুর মতন গন্ধ শুঁকি, তাদের ওষ্ঠ, বুক
ও নাভিলেহন করি, মনে হয়, এ নয়, এ নয়
আমি যাকে চেয়েছিলাম, সে রয়ে গেছে বড় উঁচুতে,
যেন অন্য এক শতাব্দীতে,
সামনে না পেছনে
দিগন্ত একাকার হয়ে যায়, হারিয়ে যায় সব কিছু!

শহরের একটি দৃশ্য

প্রেসার কুকারে সিটি বেজে উঠলো যেই
সঙ্গে সঙ্গে এলো টেলিগ্রাম
বছর দেড়েক ধরে যে ভুগছিল স্যানাটোরিয়ামে
সে আজ সকালে চলে গেছে
বাড়িতে শোকের কালো ছায়া ঠিক নেমে না এলেও
এ মুহূর্ত থেকে কালাশৌচ
প্রেসার কুকার নামলো, দমকা সুগন্ধ, তার ওপরে ছড়ালো
দীর্ঘশ্বাস

কলতলায় হারানের মা তখন বাসন মাজছিল
যার হাজা ধরা হাতে সব সময়ে জ্বালা আর জ্বালা

ভাগ্যটা খুললো তারই
সবটা মাংসই ঢেলে অ্যালুমিনিয়াম ডেকচিতে
দেওয়া হলো তাকে উপহার
তবু তার মুখটা গুমোট, যে রকম রোজই থাকে
তার কোনো মতামত নেই।
তখন হাওয়ায় উড়ছে রাধাচূড়া, জারুলের রঙিন পাপড়ি
কপিং পেন্সিলে আঁকা মেঘের গা ঘেঁষে যায়
একসার হাঁস।

ডেকচিটা হাতে নিয়ে হারানের মা রাস্তায়
বেরিয়ে এসেছে
তাকে আরও এক বাড়ির কাজ সারতে হবে
তার পাশ দিয়ে হেঁটে যায় দুই
যুবক-যুবতী
তাদের নিবিড় হাস্যময়তার মধ্যে আছে
কিন্নরলোকের দৃশ্য
পাশে পার্ক, সেখানে আনন্দে খেলে ঝাঁকঝাঁক দেবশিশু
হাতে হাতে আইসক্রিম, পায়ের তলায় ভাঙে
বাদামের খোসা
ঠিক এই সময়েই ঈথারে ছড়াচ্ছে এক কোকিল কণ্ঠীর গান
বেদনা-মধুর—

অপর বাড়ির কাজ সারতে লাগলো দেড় ঘণ্টা
ডেকচিটা রাখা রইলো সিঁড়ির তলায়
সেখানে ঘুরঘুর করে ফুটফুটে তিনটে বেড়াল
এ বাড়িতে শিশু নেই, বেড়ালেরা এতই আদুরে
সব সময় খাবারে অরুচি, তারা কিছুই ছোঁয় না
শুধু গন্ধ শোঁকে
মনিবানী দয়াবতী, সন্ধেবেলা পিয়ানো বাজান
এ বাড়িতে ঝি-চাকরও চা খায় দু'বার।

বড় রাস্তা পার হতে একবার হারানের মাকে
যে-গাড়িটা দিলে-দিতে-পারতো চাপা, তার গাঢ়
নীল রং, ঝকঝকে সুন্দর

ভিতরে কুকুর আর প্রভু—সকলি বিদেশী।
সুললিত ঘণ্টা নেড়ে দমকল ছুটে যায়
অনির্দিষ্ট দূরের জগতে
নতুন বাড়ির গন্ধ, বারান্দায় সারি সারি টব
বিবাহ বাসর থেকে ভেসে আসে বিখ্যাত শানাই

রেল-লাইনের পাশে বস্তি, তার মুখটায় জমে আছে
পুরোনো কাদা ও জল, ইঁট ফেলে পথ
খড়-গোবরের গন্ধ, লণ্ঠনের বুক চাপা আলো
অসভ্য মেয়েলি হাসি, এবং ঝগড়ার ঐক্যতান।
হারান হারিয়ে গেছে বহুদিন, নামটাই আছে
তাছাড়া রয়েছে বেঁচে আরও পাঁচটি এবং বৃদ্ধটি
হঠাৎ বাতাস এসে ধুয়ে গেল আধো অন্ধকার ঘরটাকে
সকলে চেঁচিয়ে উঠলো, কি, কি, কি, কি, কি, কি ?
বেশি হুড়োহুড়ি করে দু'জনে আছাড় খায়
তিনজন কাঁদে
সবচে ছোটটি ন্যাংটো, বেশি লোভী, ঢাকা খুলে
ভেতরে হাতটা ডোবাতেই
বুড়ো ধরে তার কান, চুল টানে
অন্যান্য ভায়েরা
যে এনেছে, সে শুধুই চেয়ে দেখে, ক্লান্ত পক্ষিমাতা।

রেশনের সবটুকু আটা মেখে রুটি গড়া হলো
তোলা উনুনের আঁচে ছ' জোড়া চোখের দ্যুতি
অপেক্ষা মানে না
এ সময় জ্যোৎস্না ভেঙেছে বনে, নগরে নিওন
ছবির উৎসব আছে কোনোখানে
কোথাও বা অপ্সরীরা তুলেছে রঙের তীব্র ঝড়
আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ, আছে শান্তি,
অনন্তের দীর্ঘ জেগে থাকা
এরই মধ্যে একবার দাঁড়াও সুন্দর,
এই অন্ধকার ঘরে ক্ষণকাল থেমে যাও
তোমার অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ব্যস্ততা
তবু একবার দেখে যাও

সর্বাঙ্গ সমেত দুটি মুর্গী, চুরি নয়,
প্রকৃত মশলায় রান্না
তার সামনে মেলে থাকা চকচকে উৎসুক কটি চোখ
ক্ষুধার্ত মধুর হাসি
জীবনে প্রথমে কিংবা শেষবার, তবু এই মুহূর্তটি
তোমাকে চেয়েছে কাছাকাছি
অন্তত ন্যাংটো ও লোভী শিশুটির কাঁধে হাত
রাখো একবার।

উৎসব শেষে

অনেক উৎসবে ছিল আমাদের
ঘোর নিমন্ত্রণ
তাওয়া হয় না। পথগুলি বদলে যায় সকালে বিকেলে।
এমনও হয়েছে আমরা গেছি কোনো
বসন্ত-উৎসবে
ভুল দিনে, ভুল স্থান—সামনে পড়ে ছিল ধুধু মাঠ
তাতেই দারুণ সুখ, ধুলোয় গড়িয়ে
খুব হাসাহাসি হলো
তারপর বাড়ি ফেরা, রোগা একটা রাস্তা ধরে,
অন্ধকারে,
বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে
একা
সমস্ত উৎসব শেষে ফিরে গেছি
সেই রোগা রাস্তা ধরে
বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে
একা।

মন ভালো নেই

সূচিপত্র

বেলা গেল

যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।
দেখেছি নিমফুলে বসেছে মৌমাছি
এখানে মধু আছে ?
দেখেছি বিষাদের দীর্ঘ তটরেখা
তবুও দিন ছিল
যেমন পাহাড়ের মুকুটে হেম শিখা
এবং তার পিছে
পিশাচী সভ্যতা ঝড়ের ছল করে
ওড়ায় পারাবত
দেখেছি বনভূমি অগ্নিমালা পরে
রাত্রি চমকায়
জেনেছি মৃত্যুর আড়ালে খেলা করে
স্নেহের শৈশব
যাবার কথা ছিল ফেরার পথ নেই
এখন বেলা গেল।

মন ভালো নেই

মন ভালো নেই   মন ভালো নেই   মন ভালো নেই
কেউ তা বোঝে না   সকলি গোপন   মুখে ছায়া নেই
চোখ খোলা তবু   চোখ বুজে আছি   কেউ তা দেখেনি
প্রতিদিন কাটে   দিন কেটে যায়   আশায় আশায়
আশায় আশায় আশায় আশায়
এখন আমার   ওষ্ঠে লাগে না   কোনো প্রিয় স্বাদ
এমনকি নারী   এমনকি নারী   এমনকি নারী
এমনকি সুরা এমনকি ভাষা
মন ভালো নেই   মন ভালো নেই   মন ভালো নেই
বিকেল বেলায়   একলা একলা   পথে ঘুরে ঘুরে
একলা একলা পথে ঘুরে ঘুরে পথে ঘুরে ঘুরে
কিছুই খুঁজি না   কোথাও যাই না   কারুকে চাইনি

কিছুই খুঁজি না কোথাও যাই না

আমিও মানুষ　　আমার কী আছে　　অথবা কী ছিল

আমার কী আছে অথবা কী ছিল

ফুলের ভিতরে　　বীজের ভিতরে　　ঘুণের ভিতরে

যেমন আগুন আগুন আগুন আগুন আগুন

মন ভালো নেই　　মন ভালো নেই　　মন ভালো নেই

তবু দিন কাটে　　দিন কেটে যায়　　আশায় আশায়

আশায় আশায় আশায় আশায়

আশায় আশায়…

বাসনা আমার

যতদিন পারি আমার নীল পেয়ালায়
পান করে যাবো ক্ষণিকের কৌতুক
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
বিশাল ডানায় সন্ধ্যা যে মধুভুক্
বিহঙ্গমের বন্দনা গান গায়—
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তাকে কি পারি না দিতে আমি যৌতুক
এই পৃথিবীটা নিত্য অবহেলায়
বারে বারে ভরে অনিত্য নীল পেয়ালা !

কোথাও পাহাড়ে আগুন জ্বেলেছে কেউ
মাদলে দ্রিমিক দূর থেকে শোনা যায় ।
চিঠিবাহী উড়ো জাহাজে মেঘের ঢেউ
পাগলা ঘন্টি বাজে কি জেলখানায় ?
নগরে বাজারে স্বর্ণ লোভীর ফেউ
সোনালি রৌদ্র কাঞ্চনজঙ্ঘায় !

আমি কেউ নই সম্মিলিত এ সুরে
যারা কাছে ছিল তারা আজ বহুদূরে
টেলিপ্রিন্টারে ছিন্নভিন্ন পৃথিবী
সকলেই বলে, কী দিবি, কী দিবি, কী দিবি ?

বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তুমি কি এখনো নিরালায় ভালোবাসো না
পান করে যেতে ক্ষণিকের কৌতুক ?
সাথী কেউ নেই ? আয়নায় কার মুখ ?

নবান্নতে ফিরে গেছে কাক

কোকিল কি ডেকে উঠেছিল ?
সে ভালো করেনি
তখন যে কথা ছিল
নতুন ধানের সুগন্ধের !
নবান্নতে ফিরে গেছে কাক !

বৃষ্টির ফোঁটা কি জুঁই ফুল।
ঠিক যে মেলে না
বাঁধ ভেঙে ডুবেছে প্রাচীন
শিশুটিও ডুবে গেছে বানে

দূরে কারা হেঁটে ফিরে যায়
কাছে কি কখনো আসবে না ?
হাস্নুহানাতে দেখি সাপ
পাপ নেই কাগজে কলমে

কোকিল কি ডেকে উঠেছিল ?
সে ভালো করেনি
নবান্নতে ফিরে গেছে কাক।

বনমর্মর

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া
পড়ে আছে মিহিন কাচের মতন জ্যোৎস্না
শুকনো পাতার শব্দ এমন নিঃসঙ্গ

সেই সব পাতা ভেঙে
ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে চলে যেতে
যেতে যেতে যেতে যেতে
বাতাসের স্পর্শ যেন কার যেন কার যেন কার
যেন কার ?
মনেও পড়ে না ঠিক যেন কার নরম অঙ্গুলি
এই মুখে, রুক্ষ মুখে, আমার চিবুকে, এই
কর্কশ চিবুকে
ঠোঁটে, ঠোঁটের ওপরে, এবং ঠোঁটের নিচে
চোখের দু'পাশে যে কালো দাগ
সেখানেও
যেন কার, যেন কার কোমল অঙ্গুলি
কপালে হিঙ্গুল টিপ, নীলরঙা হাসি
পেছনে তাকাই আর দেখা যায় না
জ্যোৎস্না নেই, বোবা কালা অন্ধকার
শুকনো পাতার শব্দ...
সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে যেতে যেতে যেতে ।

ভ্রমণ কাহিনী

আমার খুব কুচবিহার যেতে ইচ্ছে হয়
কেননা কুচবিহারের প্রতিটি শিশুর মুকুটে সাপের মাথার মণি
আমার ইচ্ছে করে আমি ওদের ব্রতচারীর সঙ্গী হই ।
কুচবিহারের প্রেতচ্ছায়া গাছে গাছে ঠিকানা লেখা চিঠি ঝুলছে
হলুদ পোশাক পরা যৌবন ওখানে মধ্য রাত্রির চাঁদের তলায় এসে
পাশা খেলে
কুচবিচারের ভূমধ্যহ্রদ থেকে ছিটকে ওঠে অশ্বমেধের ঘোড়া
আমার দিকে হ্রেষার হাস্য ছুঁড়ে দেয়
আমি তর্জনীতে আঙুলে ঠেকিয়ে বলি, চুপ, আমি যাচ্ছি ।
রবীন্দ্রনাথের প্রচার সচিবের চাকরি নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে ঘুরতে
আমার একদিন ইচ্ছে করে কুচবিহার যেতে
ওখানকার জ্যোতির্ময় বিকেলবেলায় সবুজ মখমলে শুয়ে
ক্রমশ হারিয়ে যাই

কুচবিহারের ন্যাসপাতি গাছে বসা পাখির একটা পালকের জন্য
আমার সমস্ত ছেলেবেলার দুঃখ মুচড়ে ওঠে
অভিমানে ইচ্ছে হয় রেললাইন উপড়ে লণ্ডভণ্ড করতে,
বিবর্ণ কোন চাষীকে সেচকার্যের জন্য আমি আমার চোখের
জল ধার দিতে চাই।
কুচবিহারের নারীরা স্বর্গের খুব কাছাকাছি বলে উদ্ভিন্ন যৌবনা
জলপরীর মতন তারা আমাকে একমুহূর্তের মায়া দেবে বলেছিল।
তারা 'আনি মানি জানি না পরের ছেলে মানি না' খেলতে খেলতে
আমাকে এসে ছুঁয়ে দিল
তারা আমাকে তাদের বিশাল উরসে জড়িয়ে ধরে বললো,
তুমি খেজুর গাছ কিংবা শজারু—তা জানি না
আমাদের ছোঁয়ায় সবই দেবদারু।

দূরের বাড়ি

অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে শুধু একটি
আলো-জ্বালা বাড়ি
রাত্রির সমুদ্রে জাহাজের মতন, হঠাৎ
মনে হয় সত্যিই ভাসমান
বাড়িটির প্রতিটি ঘরে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ,
কিংবা হাজার হাজার ঝাড়লণ্ঠন—
অথচ ওখানে যাবার কোনো
পথ নেই
এত অন্ধকার, এত নিঃসঙ্গ, হারিয়ে-যাওয়া
প্রান্তরের মধ্যে
ঐ বাড়িটি কেন ? কেন ? দূরে গাছের নিচে
দাঁড়িয়ে আমি কোনো
উত্তর পাই না !

দেহতত্ত্ব

কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি
এক অঙ্গে লক্ষ মুখ শতেক বাখানি
কী ঘর বানাইছে দ্যাখো সাহেব কোম্পানি ।

ঘরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড ঘরেই পুষ্করিণী
তারই মধ্যে উথাল পাথাল ঘরের মানুষ যিনি
আহা কী ঘর বানাইছে দ্যাখো···

ঘরে ভোমরা গুনগুন করে ঘরে ডাকে ময়না
আর চক্ষের জলে হাপুস হুপুস ঘরে কেহই রয় না
আহা কী ঘর বানাইছে···

ঘরে ইন্দুর ঘুরঘুর করে বিড়ালে ধায় পিছে
আর ইন্দুর বিড়াল দুই বন্ধু একসঙ্গে হাসিছে
আহা কী ঘর···

ঘরের শোভার নাই তুলনা রোশনি হাজার হাজার
ঘরের মধ্যে নিউ মারকিট ঘরেই চোরাবাজার
আহা····

ঘরের দেয়াল ফঙ্গবেনে প্রলয় নাচে বাইরে
সুনীল ক্ষ্যাপা কয়রে আমি তাইরে নাইরে নাইরে
আমি তাইরে নাইরে নাইরে

রাজকুমারী

ভোরে উঠে মুখ দেখি রাজকুমারীর
ঠোঁটে প্রজাপতি রং
এত অনভিজ্ঞ চোখ শুধু ভোরবেলা দেখা যায়
বারান্দায় দাঁড়ালো সে
শৌখিন মাঝিকে হাতছানি দিতে
সংবাদপত্রেরও আগে কলকাতার অস্পষ্ট প্রত্যূষ
তার চুলে শোভা দেয়
এবং সূর্যেরও সাধ হয় ছুঁয়ে দিতে !

আমি তো দর্শক নিষ্পলক
রাজকুমারীর আলো মেখে নিই চোখে মুখে
সারা গায়ে
শুধু মনে হয়, কোন দেশ ? কোন দেশ ?

লাইব্রেরিতে

লাইব্রেরির মধ্যে কেন পড়েছিল অর্ধবোনা উল ?
আপন মনেই যেন বলটি গড়িয়ে পড়ে ভুঁয়ে
এখানে সবাই অশরীরী
এখানে অরণ্য
একটি বা দুটি রৌদ্র বর্শা হয়ে ফুঁড়ে আছে
মনীষার দীর্ঘশ্বাস এখানে বাতাস ।

উলের বলটি খুব নিঃশব্দে লাফিয়ে যায় অন্ধকারে
পড়ে থাকে রক্তবর্ণ রেখা
ফরফর আওয়াজে ওড়ে একটি বইয়ের পাতা
যেন কিছু জানবার আছে
গ্রন্থকীট ডুবে থাকে লবণ সাগরে
চার্বাকপন্থীরা হাততালি দেয়
বাইজেন্টাইন সভ্যতার ঘুরে যায় ঘাড় ।

বাইরে থেকে ফিরে এসে দুটি হাত

তুলে নেয় কাঁটা
গাঢ় চাহনির মধ্যে কৌতুক বিস্ময়
অতৃপ্ত আত্মারা তাকে ছুঁতে চেয়ে এখন নীরব
নরম বুকের কাছে কাল্পনিক চুমু !
চেয়ারে.বসার আগে সে দু'বার দু'দিকে ঘুরেই
আচম্বিতে দেখে নেয়
সারা অঙ্গে জড়ানো পশম
ঠিক যেন ল্যাবিরিন্থে ঢোকার বিখ্যাত সতর্কতা
গ্রীস রোম তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদ দিল
রাজকুমারীর মতো সে এখন কোন্ যুদ্ধে যাবে ?

ঝর্নার পাশে

ঝর্নায় ডুব দিয়ে দেখি নিচে একটা তলোয়ার
একটুও মর্চে পড়েনি, অতসী ফুলের মতো আভা
আমার হাতের ছোঁয়ায় হঠাৎ ভেঙে গেল তার ঘুম
তুলে নিয়ে উঠে আসি, চুপ করে বসে থাকি কিছুক্ষণ
কাছাকাছি আর কেউ নেই
যেন ঝর্নাটাই আমার হাতের মুঠোয়, রৌদ্রে দেখছি
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
মাঝে মাঝে এক একটা ঝিলিকে চোখ ঝলসে যায়
মনে হয় না বহু ব্যবহৃত, ঠিক কুমারীর মতন
কোথাও ঘোড়ার ক্ষুর বা রক্তের দাগ নেই,
শান্ত বনস্থলী
মাঝে মাঝে অনৈতিহাসিক হাওয়া
একটি মৌটুসী খুব ডাকাডাকি করছে তার সঙ্গিনীকে
জলের চঞ্চল শব্দ তাকে সঙ্গতি দেয়
আমার চোখের সামনে হু-হু করে পিছিয়ে যেতে
থাকে সময়
কয়েকটি শতাব্দী গাছের শুকনো পাতার মতন উড়তে থাকে
সেই রকম একটা শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে
নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকি

মনে পড়ে, অথচ ঠিক মনে পড়ে না
শুকনো পাতাগুলি আমি নৌকোর মতন ভাসিয়ে দিই
ঝর্নার জলে।

কবিতা মূর্তিমতী

শুয়ে আছে বিছানায়, সামনে উন্মুক্ত নীল খাতা
উপুড় শরীর সেই রমণীর, খাটের বাইরে পা দু'খানি
পিঠে তার ভিজে চুল
এবং সমুদ্রে দুটি ঢেউ
ছায়াময় ঘরে যেন কিসের সুগন্ধ,
জানালায়
রৌদ্র যেন জলকণা, দূরে নীল নক্ষত্রের দেশ।

কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

সে বড় অস্থির, তার চোখে বড় বেশি অশ্রু আছে
পাশ ফেরা মুখখানি—
এখন স্তব্ধতা মূর্তিমতী
শাড়ির অমনোযোগে কোমরের নগ্ন বারান্দায়
একটি পাহাড়ী দৃশ্য
সবুজ সতেজ উপত্যকা
কেন বা নদীও নয় ? অথবা সে অপার্থিবা বুঝি !

কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

নগরে হঠাৎ বৃষ্টি, বৃষ্টিতে দুপুর ভেসে যায়
সে দেখেনি, সে শোনেনি কোনো শব্দ
যেন এক দ্বীপ
যেখানে হলুদ বর্ণ রক্তিমকে নিমন্ত্রণে ডাকে
অথবা সে জলকন্যা,
দু' বাহুতে হীরকের আঁশ

ক্রমশ উজ্জ্বল হয়, আঙুলে কলম চিত্রার্পিত
কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

শিশুরক্ত

বাসেল, অবোধ শিশু, তোর জন্য
আমিও কেঁদেছি
খোকা, তোর মরহুম পিতার নামে যারা
একদিন তুলেছিল আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি
তারাই দু'দিন বাদে থুতু দেয়, আগুন ছড়ায়—
বয়স্করা এমনই উন্মাদ !
তুই তো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়েসেতে ছিলি !
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচী হলো
শিশুরক্তপানে গ্লানি নেই ?
সর্বনাশী, আমার ধিক্কার নে !
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই।

নির্বোধ

ওরা যারা যখন তখন মরে
তাদের জন্য মায়া কান্না কেঁদেছে কুম্ভীরে
কুম্ভীরেরা যখন মরে তাদের জন্য কান্না
সাংবাদিকের ভাষায় ছোটে বন্যা

তুমি ভাবলে, আমি তো ভাই কারুর ইয়েয় কাঠি
দিইনি কক্ষনো
বরং মানবতার জন্য দিয়েছি দক্ষিণে !
পুজোর সময় যে যায় আনতে রাঁড়-পাড়ার মাটি
তার ঘরেই রক্ত তোলে
বারো মাসের সাধ্বী বেশ্যাটি !

তুমি ভাবলে ঝুট ঝামেলায় যে যাবে সে যাক
আমি বরং আড়ালে নির্বাক !
শিল্প ছিল সাপের ফণা, শিল্প ছিল রোদ
জীবন ছিল জীবন থেকে বড়
সে সমস্ত গপ্পো কথা মনে রেখেছে নিতান্ত নির্বোধ
ভিড়ে যাকে বলছে সবাই, হঠো ! আগে বাঢ়ো !

ছায়ার জন্য

কেউ কাছে নেই, ছায়া গেছে দূর বনে
ভাবনা ছড়ানো দিন
পাথর ভাঙছে পাথরের কারিগর
পশ্চিমে যায় আয়ু !

নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে নারী
বিরলে নিজেকে দেখা
কেউ কাছে নেই ছায়া গেছে দূর বনে
নারীর কিনারে নদী ।

যে কোন সোপান স্বর্গের সিঁড়ি ভেবে
একজন এসেছিল
প্রকৃত স্বর্গ সমুখে পেয়েও তার
ছায়ার জন্য শোক !

তোমার কাছেই

সকাল নয়, তবু আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপুর নয়, তবু আমার
দুপুরবেলা প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তবুও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে

তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে,
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি !
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেলবেলার ক্ষুৎপিপাসা
চিঠির খামে গন্ধ বকুল
তৃষ্ণা ছোটে বিদেশ পানে
তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

জলের কিনারে

আমার মন খারাপ, তাই যাই জলের কিনার
জল তো চেনে না, জল কঠিন হৃদয়
বিস্মরণ মূর্তিমান হয়ে থাকে জলের গভীরে
ছায়া পড়ে ! কার ছায়া ?
যে দেখে সে নিজেও চেনে না

জলে রাখি ওষ্ঠ, যেন কবেকার সেই ছেলেবেলা
প্রথম ঊরুর কাছে মুখ, বুক কেঁপে ওঠা
প্রথম নারীর ঘ্রাণ
আসলে তা ছেলেখেলা—আমি কাছাকাছি নারীকেই
শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে
ফ্রক পরা সশরীর মাঠে ছেড়ে দিই !

কোমল স্তনের পাশে অভিমান
হালকা মেঘের ছায়া
চোখ দুটি চলচ্চিত্র, দু'হাত বাড়িয়ে
হাহাকার করে বলি,
কাছে এসো !
একবার ধরা দাও !

এসবও কল্পনা, আমি খুব কাছাকাছি নারীকেই
শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে ঘন ঘোর দুঃখে মেতে থাকি
জলের কিনারে
জল তো চেনে না, জল কঠিন হৃদয় !

কিছু পাপ ছিল

স্নেহের ভিতরে কিছু পাপ ছিল
যেমন গ্রন্থের মধ্যে ঘুণ,
বিশ্বাসের মধ্যে কোনো শাপ ছিল
জতুগৃহে যেমন আগুন ?
স্নেহ কেন জেগে ওঠে সশস্ত্র উত্তরে,
বিশ্বাসও স্বৈরিণী হয় অন্ধকার ঘরে !

শূন্যতা

শূন্য খুব বিশাল যেমন পিনের মাথায় শূন্যতা
ভালোবাসার মতন আমি শূন্যতায় পথ হাঁটি
পথ ঘুরে যায় লেভেলক্রশিং পথ ঘুরে যায় চৌমাথায়
পথ ঘুরে যায় হোটেল রুমে, জানলা ভাঙা ছিটকিনি—
দেয়াল দ্যাখো দেয়াল, ঐ বাইরে দ্যাখো শূন্যতা

শরীর শুধু খেয়াল যেন ছেলেবেলার খুনসুটি
শরীর দিয়ে তোমায় চেনা মধ্যে থাকে শূন্যতা

চরিত্রের অভিধান

১ রূপসী

কোথায় তোমার রূপ, গ্রীবায় না চক্ষের মণিতে ।
অথবা স্তন-কোরকে, উন্মুক্ত জঙ্ঘায়, ঠিক জানি না !

এক এক বয়েসে তুমি এক এক রূপিণী,
তোমার না, আমার বয়েসে !
কে আছে হেন পুরুষ, এক শরীরের রূপ
দেখে নিতে পারে
নিতান্ত এক জীবন, মর চক্ষে ?
কেউ পারে না, জানি !
অসতী দর্পিতা হলে রূপ আসে, স্ফুরিত অধরে
ঝলসাক্ মিথ্যে প্রেম, মোহিনী ভ্রূ-ভঙ্গে
লোভ রতি প্রবঞ্চনা, জাদুদণ্ড হাতে তুলে নিলে
কবিতায়, শিল্পে তার স্থান দিতে
হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে কিনা ?

২ বাচাল

ওদের সবার জন্য একটা পৃথক ভূমি খুঁজে দিতে হবে
বাচাল বুড়োর দল সারাক্ষণ
ছেলেখেলা নিয়ে মত্ত থাকে সেইখানে।
সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, আণবিক, অতি দানবিক
ক্রেমলিন-লণ্ডন-রোম-প্যারিস-পিকিং, সাদা বাড়ি
ঐ যে অদ্ভুত মুখ, উত্তেজিত ক্ষীণ মুষ্টি
জুলজুলে চোখ সারি সারি
ওরা নিজেদের জন্য তিন হাত মাটি খুঁড়ে নিক্।

৩ প্রতিপক্ষ

রোদ্দুর বৃষ্টির স্বাদ ঐ লোকটা
বেশি পেয়েছিল
বুক ভরে আজীবন ঐ লোকটা
নিশ্বাস নিয়েছে
পবিত্র ঘুমের স্বাদ, সমস্ত স্বপ্নের স্বর্গ,
স্বচ্ছ জীবনের
সব উপভোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে
একলা ঐ লোকটা গেল বেঁচে !

চোখে চোখ রাখো বাহুতে শয়ান বাহু
ধমনী শোনাক্ দুই হৃৎস্পন্দন
মুখচন্দ্রিমা গ্রাসে ওষ্ঠের রাহু
পান করো এই্ দেহের তীব্র অমিয়
স্মৃতি যেন পায় রক্তবীজের আয়ু
পান করো এই্ দেহের তীব্র অমিয়
তবে, একা নয়, ছোটদেরও কিছু দিও !

অন্য ভ্রমণ

ঈষৎ ধারালো রোদে কুমীরের ডিম খোঁজে
মানুষ-শিশুরা
খাঁড়িতে জোয়ার
সারি সারি কূর্মকায় ম্যানগ্রোভ ঝোপে
ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ
অদূরে অরণ্যভূমি প্রত্যক্ষদর্শীর মতো স্থির
পাডোক গাছের শীর্ষে টিট্রিভের মন-কাড়া ডাক
তারই্ মধ্যে বেজে ওঠে স্টিমারের ভোঁ ।

জাহাজ ঘাটার থেকে বিশ পা বাড়ালে
আবার বৃক্ষের দেশ, আবার নির্জন
বালিয়াড়ি ভেঙে ভেঙে হেঁটে যাও
ভাঙা শঙ্খ, ঝিনুক, কোরাল
পান্না রং জলে ঘোরে চুনী-রঙা মাছ
পাথরের পিঠে ধার, এখানে বসো না ।

যদিও বাতাস নেই, তবুও চলায় ক্লান্তি নেই
যেন কেউ ডাকে
যেন কেউ বসে আছে বাঁকের আড়ালে—
ছিল
তীর ও জলের সীমা ঘেঁষে শুয়ে ছিল এক

পা-বাঁধা হরিণী

তখনো সামান্য প্রাণ, তখনো চোখের মধ্যে দ্যুতি
কাছে যাই
চার চক্ষু বিস্ময়ের পাল্লা দেয়
কে ওখানে, কেন ওকে, কোন অপরাধে ?
ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াতেই
হামলে আসে ঢেউ
প্রতিটি পরের ঢেউ আগের ঢেউকে দীন করে
তটভূমি দূরে সরে যায়
জুতো না ভিজিয়ে আমি পিছু হটে
এবং ক্রমশ পিছু হটে, চেয়ে থাকি
জলের বিরাট জিভ হরিণীকে নিয়ে যায়
এবং অদৃশ্য করে নেয় !
আর একটু আগেও যদি নিত
তা হলে এ ভ্রমণকারীর নিঃসঙ্গতা
আরও একটু বিধুর হতো না !

চুপ করে আছি তাই

সে ভেবেছে, চুপ করে আছি তাই সকলি মেনেছি
সে জানে না, কোন তমসার পারে বাঁধা আছে তাঁবু
সে ভেবেছে, বকুল তলায় যাকে নিত্য দেখা যায়
সে কখনো দুপুর রোদ্দুরে আর একা বেরুবে না
সে ভেবেছে, জীবন দিয়েছে যাকে হলদে ঝুমঝুমি
খেলা ঘরে যার বেলা টুকিটাকি সান্ত্বনা পেয়েছে
সে কখনো দেখবে না, দু'হাতের সোনালি শৃঙ্খল !
সে জানে না, নদী প্রান্তে যে আছে সে চেনে সর্বনাশ !

বিদায় ও বিস্মৃতি

বিদায়ের পাশ থেকে উঠে যায় দুটিমাত্র স্মৃতি
ওরা ছিল, ওদের সময় হয়ে গেল
বিদায় হলুদ বর্ণ, ওরা কিন্তু হরিতে-হিরণে
সেজেছিল যৌবনের সাজ
সরু গলিপথ ওরা আলো করে দিয়ে গেল
এই শেষবার।

বিস্মৃতির পাশ থেকে ঝরে পড়ে এক বিন্দু স্বেদ
এমন শীতের বেলা, এমন মধুর জ্যোৎস্নারাতে
এ কি হলো ?
বিস্মৃতির রং ছিল শেষ মেঘ, সাংঘাতিকভাবে জেগে থাকা
এ জীবন যেমন উজ্জ্বল
তার পাশ থেকে কেন ঝরে পড়ে লবণাক্ত উষ্ণ এই কণা
কোথায় এ ছিল, কিংবা কোন্‌দিকে যাবে ?
কাকে যে শুধাই ? হায়, এর কথা বিদায় জানে না !

লোকটি

লোকটি ভীষণ ব্যস্ত এবং অহংকারী
লোকটি ভীষণ দামী এবং গেরেমভারি !
লোকটি দারুণ গাবগুবাগুব গুমসো গোসা
লোকটি দারুণ হাকুম চাকুম কাঁঠাল খোসা
তবু তাকেও ভয় পাবার তো কিচ্ছুটি নেই
মুখোশ খুলে এক মিনিটও কি ছুটি নেই ?
হলো বা তার চকচকাচক চটাস চামা
তোমার আমার মিনমিনে মিন মাগনা দামা ?
উপুড় হয়ে হাত পা ছুঁড়ে রাত্রি বেলা
সেও তো খেলে খাট বিছানায় একই খেলা !
তোমার আমার মতন তারও সর্দি হলে
হঠাৎ হঠাৎ শব্দ করেই গয়ের তোলে !

লোকটি ভীষণ ব্যস্ত এবং অহংকারী
লোকটি ভীষণ দামী এবং গেরেমভারি !
তবু তাকে ভয় পাবার তো কিচ্ছুটি নেই
মুখোশ খুলে এক মিনিটও কি ছুটি নেই ?

ধ্যানী

—সমস্ত পতন তুচ্ছ করে,
উঠে এসো !
—কোথায় তোমার হাত ?
—নির্লজ্জ ভিখারী, তুমি এখনো শরীর চাও ?
—এখনো কাটেনি নেশা
—চিবুকে চিমটি দিয়ে জাগাও নিজেকে
—তোমার চিবুকে ? তবে চিমটি কেন
চুম্বনেই বেশি সুখ
কচি পেয়ারার মতো ঐ থুতনি
উপমাবিহনী ঠোঁট, শুধু আস্বাদের
যোগ্য
—এ সবই পুরোনো কথা—
জেগে ওঠো,
শোনাও জ্যা-শব্দ এই ধরিত্রীকে
—এখনো কাটেনি নেশা
—গুহা ছেড়ে বাইরে এসো
ও তোমার যোগ্য জায়গা নয়
কঠিন পাথর, চামচিকের গন্ধ, অন্ধকার
—বড় বেশি অন্ধকার, ঠাণ্ডা, ভারী স্নিগ্ধ
—প্রমিথিউস কার ভাই ?
—আমারই, যদিও বৈমাত্রেয়
—বাইরে এসো ! কতদিন দেখিনি তোমাকে
—এ যেন প্রেমের ভাষা মনে হচ্ছে ?
ফের নেশা জমে উঠবে
হাতটা বাড়িয়ে দাও
টেনে আনি তোমাকেও এই কালো

মোলায়েম, আঁধার শয্যায়
—প্রেম কি নেশার বস্তু ? শুধু ঘাম ?
—কি বললে ? শুধু কাম !
মোটেই না !
ওষ্ঠের লাবণ্য স্পর্শ, সে কি কাম ?
কোমর জড়িয়ে ধরে শরীরের গন্ধ নেওয়া
কিংবা যদি মিলনের নেশা জাগে
কী মধুর তীব্র-খেলা
মিথ্যেবাদীরাই শুধু এর অন্য নাম দেয়
—শুধু খেলাতেই সব শেষ ? আর কিছু
কাজ নেই ?
—পূর্ব্ববঙ্গে সব কাজকেই কাম বলে—
ওরা খুব দার্শনিক !
—আমি চলে যাই ?
—যাও না ! কে আটকাচ্ছে ? বাইরে কত আলো
শিরীষের ডালপালা ছুঁয়ে আছে নম্র ভোরবেলা
সমাজতন্ত্রের ভাষ্য মুখে নিয়ে
পাখি উড়ে যায়
ধারাবর্ষণের মধ্যে হেঁটে যান মাদার টেরেসা
সমুজ্জল প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন মানুষের ঘর
আমার তো ঈর্ষা নেই,
প্রকৃতির সঙ্গে আমি দ্বৈরথে নামি না।
—তুমি এর বাইরে থাকবে ?
—ক্ষতি কি, দু' একজন যদি থেকে যায় এ-রকম ?
—এই নোংরা অন্ধকারে ? গড়ানো গুহায় ?
—আমার যে ধ্যান আজো শেষ হয়নি
ধ্যানী মাত্রই তো গুহাবাসী
তাই না ?
—বলো তো কিসের ধ্যান
—সে বিষম গুহ্যতত্ত্ব
—আমাকেও বলবে না ?
—একমাত্র তোমাকেই বলতে পারি
কেননা ধ্যানের লক্ষ্য তুমি !
—এ কেমন চাওয়া, যার শেষ লক্ষ্যে আত্মহত্যা ?

এ কেমন বেঁচে থাকা, যার কেন্দ্রে
জীবনের বিমুখতা ?
শরীর নীরব হয়, বাসনার ঘুম পায়
নদীও শুকিয়ে যায় এমন কি
—সবই তো বদলে যায়
—আর তুমি ?
—কেন এত জ্ঞান দিচ্ছো ? আসতে চাও এসো
কিংবা কেটে পড়ো
—আমি তো পতন চাইনি, আমি চাই,
তোমার উদ্ধার !
—অয়ি দয়াবতী, পৃথিবীতে-আর কোনো আর্ত নেই ?
করুণা-বিলাসী যদি হতে চাও
করুণা-ভিখারী তুমি ঢের পাবে
আমি বড় অহংকারী !
—কোথায় সে অহংকার ? যা তোমাকে
উঠে দাঁড়াবার শক্তি দেবে ?
যা তোমার স্নায়ুকে করবে তীক্ষ্ণ
কপাট ভাঙার আগে দীর্ঘশ্বাস ফুরোবে না
গ্রন্থের পিপাসা থেকে নদীর বাঁধের কাছে
মুক্তি দেবে জল
মানুষকে চিনে নেবে তোমার দর্পণে
—কি রকম চেনা চেনা কথাগুলো
কিছু দাড়িওয়ালা
মহাপুরুষের কারখানায়
হয় না এসব তৈরী ?
রাখো !
যদি চাও, উপহার দাও ঐ পিঙ্গল শরীর
আমার বুকের কাছে পা ছড়িয়ে বসো—
শান্তি দাও ! হে সুন্দর
মাধুর্যের ঝাপটা দাও, কানে কানে বলো
কোনো মর্মকথা
না হয়তো চলে যাও, কোনো খেদ নেই !
—যেতে হবে জানি ! এখনো তোমার নেশা
সত্যিই যায়নি দেখছি !

এর পর তুমি...
—আরও পতনের দিকে যাবো। পুনরায়
ধ্যানে বসবো
—কার ?
—কার আবার ? তোমারই তো
—আমাকে বিদায় করে আমাকেই ধ্যান করবে ?
—আমার ধ্যানের নেশা
আমি এই নিয়ে বেশ আছি !

যাত্রা

ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে
টলমল করে সূর্যের ঘড়ি
পকেটে মাত্র এক কানাকড়ি
তবু যেতে হবে সীমানা ছাড়িয়ে অসীমার কাছে
ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে।

অসীমা আমার বড় গরবিনী, নদীর মতো
যার তীরে নেই সহজ শান্তি
সে আমায় দেয় হাজার ভ্রান্তি
পথ ভুলে আমি পথেই নিজেকে খুঁজেছি কত !
যেতে হবে শেষে নিজেকে ছাড়িয়ে অসীমার কাছে
ভাঙা নৌকোয় যাত্রা, তবুও জায়গা আছে।

শরীরের ছায়া

ও চুলে তোমার বেণীবন্ধন কিছুতেই মানাবে না
চুল খুলে দাও হাওয়ায় অন্ধকারে
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ঐ কাঁপে
দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে
হাওয়ায় অন্ধকারে !

ভুলতে চাই না নদী নীলিমার অশুভ কৌতূহলে
হাত বাঁধবো না গত জন্মের পাপে
ও দুটি চোখের তারার দ্যুতিতে পৃথিবীও বড় দীন
ও নীল বসনে ঝরুক লজ্জা, রেখাগুলি ঐ কাঁপে
মুখ ঢাকবো না গত জন্মের পাপে !

দাঁড়াও এখানে পিপাসার পারে
হাওয়ার অন্ধকারে
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে ।
যদি ভুল হয়, ছায়ার সঙ্গে যদি দূরে চলে যাই ?
তুমি তাই এসো রক্ত মাংসে, যে রকম আসে ফুল
গন্ধে গন্ধে মদির রাত্রি—এ রকম ছিল সাধ
শরীরের ছায়া শরীরের লোভ করে ।

শীত এলে মনে হয়

মাঠ থেকে উঠে ওরা এখন গোলায় শুয়ে আছে
সোনালি ফসল, কত রোদ ও বৃষ্টির স্বপ্ন যেন
স্নেহ লেগে আছে
লাউমাচায়, গরু ও গরুর ভর্তা সবান্ধব পুকুরের পাশে
মুখে বিশ্রামের ছবি, যদিও কোমরে গাঁটে ব্যথা ।

শীত এলে মনে হয়, এবার দুপুর থেকে রাত
মধুময় হয়ে যাবে, যে রকম চেয়েছেন পিতৃপিতামহ
তাঁদের মৃত্যুর আগে ভেবেছেন আর দুটো বছর যদি…
শীত এলে মনে হয়, এই মাত্র পার হলো সেই দু'বছর
এবার সমস্ত কিছু…
শীত চলে যায়, বছর বছর শীত চলে যায়,
সে দুটি বছর আর কখনো আসে না ।

সমস্ত পৃথিবীময়

এই মুহূর্তে যে কাঁদলো তাকে কান্না থেকে মুক্তি দেবার
কোনো মন্ত্রই আমি জানি না—
সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে আছে আলগা অভিমান
কে কাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়—
কে হাসিমুখে ভেতরে ছুরি শানায়
তার কোনো ইতিহাস যেন কেউ কখনো না লেখে !

ভালোবাসার মধ্যেই শুয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি ভুল
প্রতিটি পল-অনুপলকে সন্দেহ হয়, সত্যি তো ?
শরীরের কাছে শরীর, আলিঙ্গনের মধ্যে তার নরম বুক
কী মধুর, কী সুন্দর, কী তীব্র যন্ত্রণা !
সেই সময়েও নিশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ শুনে শুনে মনে হয়
কার জন্য ? আমারই তো
কিছুতেই কেউ কখনো বোঝে না, সে পুরোপুরি আমার
একলা এসে বারান্দায় দাঁড়ালেই মনে হয়
সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে আছে আলগা অভিমান।

পথের রাজা

পথের রাজাকে আমি দেখেছি গভীর রাত্রে
দৈবাৎ বারান্দায় এসে
তখনও বিপুল বৃষ্টি, আকাশ ভাসানো বৃষ্টি
রাত্রিকে বিহ্বল করা জল ছাঁট
সব ধুয়ে গেছে, সব কালো ও চিক্কণ,
গাছগুলি স্তব্ধ—জাগা, তারা পরস্পর
মুখ দেখে
আর কেউ নেই, বহুক্ষণ কেউ নেই, গাড়িরাও
ফিরে গেছে ঘরে
এমন নিশুতি ক্ষণে ধীর লয়ে
শব্দহীন পদপাতে হেঁটে যান
পথের সম্রাট

খালি গা, তামস রং, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল
ওষ্ঠে মৃদু হাসি,
এবং গুনগুন গান
শান্তভাবে দশ দিক দেখে
পথের সম্রাট ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে
কোথায় বা কেন যান কিছুই বুঝি না !

দুঃখ ও জানে না

চোখে চোখ লেগে থাকে
শরীর নীরব
হরিৎ আভার মতো স্মৃতি জানে
সেরকম ভাষা—
ইতিহাস কিংবা তারও আগে থেকে
মানুষের যাবৎ পিপাসা
চোখে চোখ রেখে দেয়—শব্দ করে
নৈঃশব্দ্যের স্তব ।
আমার চোখের কোণে লেগে আছে
হিম দুঃখ স্মৃতি
দুঃখ ও জানে না
দূর অন্ধকারে পোড়ে কার শব !

ঘুরে বেড়াই

তোমার পাশে, এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার পোষা কোকিল এবং তোমার মুখে
বিকেলবেলা রোদের পাশে
ঘুরে বেড়াই
তোমার ঘুমের এবং তোমার যখন তখন অভিমানের
অর্থ খুঁজি অভিধানে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই

গাছের দিকে মেঘের দিকে
বেলা শেষের নদীর দিকে
পথ চেনে না পথের মানুষ
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
মেলা শেষের ভাঙা উনুন ছাইয়ের গাদায়
ল্যাজ গুটানো একলা কুকুর
পুকুর পাড়ে মাটির খুরি, সবুজ ফিতে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
তোমার পাশে এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই।

তোমার খুশির জন্য

যদি আর আমি কিছুই না লিখি ?
সব ছেড়ে ছুড়ে বনবাসী হই, তুমি খুশি হবে ?

সে বন এখনো মানুষ চেনে না
আমি ছাড়া কেউ একলা যাবে না
এবং ফেরার কোনো পথ নেই
তুমি খুশি হবে ?

যা লিখেছি সব পুড়িয়ে ছড়িয়ে
চাঁড়ালের হাতে ছাই সঁপে দিয়ে

যদি চলে যাই ?

সমস্ত নাম উকো দিয়ে ঘষে
মুছে দিয়ে যাবো
আমার জন্য কাঁদবে না কোনো শিয়াল কুকুরও
তুমি খুশি হবে ?

তোমার খুশির জন্য আমি কি পৃথিবী ছাড়বো ?
যদি চাও, তাও ছেড়ে যেতে পারি

হে সমালোচক, আরও যা চাইবে সব মেনে নেবো
শুধু দয়া করে, আমাকে কখনো
আর তুমি ভালো লিখতে ব'লো না !

এখনো সময় আছে

(একটি ফরাসী কবিতার ভাব-অনুসরণে)

তখন তোমার বয়স আশী, দাঁড়াবে গিয়ে আয়নায়
নিজেই বিষম চমকে যাবে, ভাববে এ কে ? সামনে এ কোন্ ডাইনী ?
মাথা ভর্তি শণের নুড়ি, চামড়া যেন চোত-বোশেখের মাটি
চক্ষু দুটি মজা-পুকুর, আঙুলগুলো পাকা সজনে ডাঁটা !
তোমার দীর্ঘশ্বাস পড়বে, চোখের কোণে ঘোলা জলের ফোঁটায়
মনে পড়বে পুরোনো দিন, ফিসফিসিয়ে বলবে তুমি,
আমারও রূপ ছিল !
আমার রূপের সুনাম গাইতো কত শিল্পী-কবি !
তাই না শুনে পেছন থেকে তোমার বাড়ির অতি ফচকে দাসী
হেসে উঠবে ফিকফিকিয়ে
রাগে তোমার শরীর জ্বলবে ! আজকাল আর ঝি-চাকরের নেই কোনো
ভব্যতা !
মুখের ওপর হাসে ? এত সাহস ? তুমি গজগজিয়ে যাবে অন্য ঘরে
আবার ঠিক ফিরে আসবে, ডেকে বলবে, কেন ?
কেন রে তুই হাসিস ? তোর বিশ্বাস হলো না ?
আমারও রূপ ছিল, এবং সে রূপ দেখে পাগল
হয়েছিলেন অনেক লোকই, এবং কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় !
দাসীটি তার চোখ তুলবে কপাল জুড়ে, প্রকাশ্যেই বলবে
এবার বুঝি মাথা খারাপ হলো তোমার, বুড়ীমা ?
আবোল তাবোল বকছো তুমি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ?
সবাই যাঁকে শ্রদ্ধা করে, যাঁর কবিতা সবার ঠোঁটে ঠোঁটে
প্রতিবছর জন্মদিনে যার নামে হয় কয়েক ঘণ্টা বেতারে গান বাজনা
সেই তিনি, সেই কবি এমন বুড়ীর জন্য পাগল
হয়েছিলেন ? হি হি হি হি এবং হি হি হি হি
রাগে তোমার মুখের চামড়া হয়ে উঠবে চিংড়ি মাছের খোসা

তুমি ভাববে, এক্ষুনি সুনীলকে ডেকে যদি সবার
সামনে এনে প্রমাণ করা যেত।
কিন্তু হায়, কী করে তা হবে ?
সেই সুনীল তো মরেই ভূত পঁচিশ বছর আগে
কেওড়াতলার চুল্লিতে তার নাভির চিহ্ন খুঁজেও পাওয়া যায়নি !

তাই তো বলি, আজও সময় আছে
এখন তুমি সাতাশ এবং সুনীলও বেশ যুবক
এখনও তার নাম হয়নি, বদনামটাই বেশি
সবাই বলে ছোকরা বড় অসহিষ্ণু এবং মতিচ্ছন্ন
লেখার হাত ছিল খানিক, কিন্তু কিছুই হলো না।

তাই তো বলি, আজও সময় আছে
দাঁড়াও তুমি অখ্যাত বা কুখ্যাত সেই কবির সামনে
সোনার মতো তোমার ঐ হাত দু'খানি যেন ম্যাজিক দণ্ড
বলা যায় না, তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে একদিন সে হতেও পারে
দ্বিতীয় রবি ঠাকুর !
তোমার সব রূপ খুলে দাও, রূপের বিভায় বন্দী করো
তোমার রূপের অরূপ রঙ্গ তাকে সত্যি পাগল করবে
তোমার চোখ, তোমার ওষ্ঠ, তোমার বুক, তোমার নাভি…
তোমার হাসি, অভিমানের গুচ্ছ গুচ্ছ অশোক পুষ্প…
কিন্তু তুমি তখনই সেই সুনীল, সেই তোমার রূপের পূজারীর
চুলের মুঠি চেপে ধরবে, বলবে, আগে লেখো !
শুধু মুখের কথায় নয়, রক্ত লেখা ভাষায়
কাব্য হোক রূপের, শ্লোক, অমর ভালোবাসায় !

সে কোথায়

বালির ওপরে কার তাজা রক্ত ? এদিকে ওদিকে
চেয়ে দেখি
কোনো হিংস্র পশু বুঝি বিদ্যুৎ চমকে এসেছিল ?
বাতাসে নিষ্পাপ গন্ধ, কেউ নেই, সমস্ত শব্দও
চুপ করে আছে

উড়ন্ত আঁচল যেন নদীটির ঢেউ,
হালকা মেঘের ছায়া
ঈষৎ কিনারে এসে পা ডুবিয়ে আমি
হেঁট মুখে স্থির চেয়ে থাকি
বালির ওপরে কার তাজা রক্ত ? এই ছায়াময় দিনে
লুকিয়ে রয়েছে কোন হত্যাকারী ? সে কোথায় ?

ছবি খেলা

মনে আছে সেই রাত্রি ? সেই চাকভাঙা
মধুর মতন জ্যোৎস্না
উড়ো উড়ো পেঁজা মেঘ অলীক গর্ভের প্রজাপতি
দুগ্ধবর্ণ বাতাসের কখনো স্পর্শ ও ছবি খেলা
মিনারের মতো পাঁচটি প্রাচীন সুউচ্চ গাছ, সেই
মানবিক চষা মাঠ, তিনটি দিগন্ত দূর, আরও দূর
পুকুরের ঢালু পাড়ে তুমি শুয়ে ছিলে
মনে আছে সেই রাত্রি, সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

বুকে কেউ চোখ ঘষে, উরুদ্বয়ে ভেঙে যায় ঘুম
হঠাৎ প্রবাসী গল্প, ফিসফাস, শব্দ এসে
শব্দকে লুকোয়
অশ্রুর লবণ থেকে উঠে আসে স্মৃতিকথা, পিঠে
কাঁকর ও তৃণাঙ্কুর, অথচ এমন রাত্রি, এমন
জ্যোৎস্নার মৃদু ঢেউ
কখনো দেখোনি কেউ সমস্ত শরীরে আলো যেন
খুব জলের গভীরে
সাবলীল ভেসে যাওয়া, কত দেশ, কত নদী
এমনকি মানুষজন্ম পার হয়ে এসে
যেমন ফুলের বুকে ঘ্রাণ কিংবা ঘ্রাণ ছেঁচে
জন্ম নেয় ফুল
মনে পড়ে সেই রাত্রি ? সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

সারা দুনিয়ায়

সারা দুনিয়ায় এক দুর্নিবার চ্যাঁচামেচি, কেড়ে নিতে হবে !
হবেই তো !
যে না নেবে, তার মৃত্যু গাছের ডগায় !

সারা দুনিয়ায় আজ অবিশ্রান্ত হুড়োহুড়ি । কাল যেন শেষ
তার চিহ্ন,
সূর্যাস্তের লাল আভা, পাশে পোড়া ছাই !

সারা দুনিয়ায় আজ লজ্জাহীন রেষারেষি, কে পাবে অগ্রিম
হাত খোলা,
যে-হাত দেয় না কিছু, শুধু সব নেবে !

সারা দুনিয়ায় আজ সার্থকতা—মৃত্যুপণ, তারই নাম সুখ
দেখা যায়
নদীর অপর তীরে তার অন্য ভাই বসে আছে !

সকলেই যা চেয়েছে, ধরা যাক একদিন তাই পেয়ে গেল
তবু দেখো,
কবিতা লেখার জন্য ক'জন মানুষ শুধু,
কিছুই চাইবে না !

চাসনালা

এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে,
হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
এসেছে পুলিশ, জিপ, ভ্যান, ট্রাক, এসেছে অনেকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে
এসেছে গ্রামীণ, এসেছে বিদেশী,
এসেছে শ্রমিক, এসেছে মালিক
এসেছে ভিস্তি, এসেছে বাদাম, ছোলা, কোকাকোলা
হালুয়া বরফি, গুলাবি রেউড়ি
এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে

হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
এসেছে ব্যাকুল, এসেছে ক্রুদ্ধ, এসেছে মলিন
এসেছে শিশুরা, এসেছে মেয়েরা, এসেছে অন্ধ
আরো আসে আরো গাড়ির শব্দ, পায়ের শব্দ
আরো আসে আরো, আরো, আরো, আরো
এসেছে হাজারে হাজারে মানুষ, এসেছে, দেখেছে
হাজারে হাজারে মানুষ এসেছে, দেখেছে
দেখেছে ? দেখেছে ? সত্যি দেখেছে ?
দেখেনি কিছুই, দেখেনি কিছুই, দেখেনি কিছুই
ও ওর মুখের, সে তার মুখের
কে কার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, দেখেনি, দেখেনি,
কিচ্ছু দেখেনি···

ভাই ও বন্ধু

আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক
তার খোঁজে ইতিউতি যাবো—ইদানীং সময় পাই না
মাঝে মাঝে কেউ বলে, তোমার ভাইকে কাল দেখলুম হে
চুপচাপ জারুল গাছের নিচে বৃষ্টিতে ভিজছিল !
একটু আনমনা হই, উপন্যাস লেখা থেকে চোখ তুলে
সাদা দেয়ালের দিকে···
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে নিজেকে ঠকিয়ে বলি
সে অনেক বদলে গেছে,
সে আর আমার মতো নেই
আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক !

আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু, সে অনেক
আগেকার কথা
তখন বাতাস ছিল হিরণ্ময়
তখন আকাশ ছিল অতি ব্যক্তিগত
তখন মাংসের লোভে যাইনি আমরা কেউ উঁচু প্রতিষ্ঠানে
তরল আগুন খেয়ে মাঝরাতে দেখিয়েছি হাজার ম্যাজিক
তখন বাতাস ছিল···তখন আকাশ ছিল··· সে অনেক

আগেকার কথা !
এখন অন্যের বাড়ি অকস্মাৎ ঢুকে পড়লে সব কথা
থেমে যায়
বিষয় বদলাতে গিয়ে গ্রীষ্মকালে কেউ শীতে কাঁপে
এমন কি নারীরাও···
আমার কঠিন মুখ, আচমকা কর্কশ বাক্য···নিজেই চমকে উঠি
যেন এক রণক্ষেত্র, পিঠ ফেরালেই আছে শত শত তীর
আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু···চিরঋতু ? ঠিক নাম
মনে রেখেছি তো ?

প্রবাস

যাবে কি এবার বসন্তেই ?
আসছে শ্রাবণে
এসেছে শ্রাবণ, শোনো মেঘের গর্জন
আর দু'টো মাস
আশ্বিনের সাদা মেঘে ভরুক প্রবাস

আশ্বিনেও লেগে ছিল লোভ
শীত মদালসা
ফেরার অনৈক্য ছিল গ্রীষ্মে
কেটেছে বছর
এমন কি শেষ দিনে এলো ঘূর্ণিঝড় !

যাবে কি শতাব্দী সাঙ্গ হলে ?
না, না, তার আগে
অস্থিরতা রোদে কম্পমান
আর দেরি নেই
প্রাক্তন স্বদেশে ফেরা এই মুহূর্তেই !

সুন্দরের পাশে

সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি
রূপের বিভায় আমি সেরে নিই লঘু আচমন
রূপের ভিতর থেকে উঠে আসে বুক ভরা ঘুম
আমি তার চোখ থেকে তুলে নিই
মিহিন ফুলের পাপড়ি
গন্ধ শুঁকি, পুনরায় ঘুম থেকে জাগি
উজ্জ্বল দাঁতের আলো রক্তিম ওষ্ঠকে বহু দূরে নিয়ে যায়
রূপের সুদূরতম দেশে চলে যাবে এই ভয়ে
আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে···
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি।

রূপ যেন অভিমান, আমি কোনো সান্ত্বনা জানি না
যতখানি নিতে পারি, দিই না কিছুই
জানলার পাশ দিয়ে উঁকি মারে কার ছায়া?
ওকি প্রতিদ্বন্দ্বী?
ওকি নশ্বরতা?
শিখেছি অনেক কষ্টে তার চোখে ধুলো দেওয়া
এই শিল্পীরীতি
চিরকাল না হলেও, বারবার ফেরানো যাবেই জেনে
রূপ থেকে সুধা পান করি
ঠিক উন্মাদের মতো চোখ থেকে ঝরে পড়ে হাসি।

প্রকৃতির অলঙ্কার সে রেখেছে অনন্ত সীমানা জুড়ে জুড়ে
তাই প্রকৃতির কাছে অন্ধ হলে যাবো
সুমেরু পর্বতে আমি মাথা রাখি
সমুদ্রেরঢেউ লাগে হাতের আঙুলে
উরুর ভিতরে অগ্নি···এত মোহময়···
অরণ্যের গন্ধ মাখা···
নিশ্বাসে পলাশ ঝড়, বারবার
যুদ্ধের সুমিষ্ট স্বপ্ন, চোখ ঘুরে ঘুরে
যায়, আসে
নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি

এত মোহময়, তাই শিল্প…
যুদ্ধের অমর শিল্প…
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি !

তুমি জেনেছিলে

তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
হাত ছুঁয়ে বলে বন্ধু
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়
হাসি বিনিময় করে চলে যায়
উত্তরে দক্ষিণে
তুমি যেই এসে দাঁড়ালে—
কেউ চিনলো না কেউ দেখলো না
সবাই সবার অচেনা !

প্রতীক্ষায়

গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের ডানা পুড়ে যায়
হাওয়া ঘোরে দূরে দূরে
ফুলকে সমীহ করে
সূর্যাস্তও থমকে থাকে !

দেখো দেখো
আমার বাগানে এক অগ্নিময়
ফুল ফুটে আছে
তার সৌরভেও কত তাপ !
আর সব কুসুমের জীবন চরিত তুচ্ছ করে
সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চতুর্দিকে
বৈদূর্যমণির মতো চোখ মেলে সে রয়েছে প্রতীক্ষায়
কার ? কার ?

সেদিন বিকেলবেলা

সাতশো একান্নতম আনন্দটি পেয়েছি সেদিন
যখন বিকেলবেলা মেঘ এসে
ঝুঁকে পড়েছিল
গোলাপ বাগানে
এবং তোমার পায়ে ফুটে গেল লক্ষ্মীছাড়া কাঁটা !
তখন বাতাসে ছিল বিহ্বলতা, তখন আকাশে
ছিল কৃষ্ণ কান্তি আলো,
ছিল না রঙের কোলাহল
ছিল না নিষেধ
অতটুকু ওষ্ঠ থেকে অতখানি হাসির ফোয়ারা
মন্দিরের ভাস্কর্যকে ম্লান করে নতুন দৃশ্যটি ।

এর পরই বৃষ্টি আসে সাতশো বাহান্ন সঙ্গে নিয়ে
করমচা রঙের হাত, চিবুকের রেখা
চোখে চোখ
গোলাপ সৌরভ মেশা প্রতিটি নিশ্বাস, যত্ন করে
জমিয়ে রাখার মতো ;
সম্প্রতি ওল্টানো পদতলে
এত মায়া, বায়ু ধায় নশো উনপঞ্চাশের দিকে
নগ্ন প্রকৃতির
এত কাছাকাছি আর কখনো আসিনি মনে হয়
জীবন্ত কাঁটার কাছে হেরে যার গোপন ঈশ্বর
রূপের সহস্র ছবি, বা আনন্দ একটি শরীরে ?

সে কোথায় যাবে ?

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো যা—
সে কোথায় যাবে ?
নিঝুম মাঠের মধ্যে সে এখন রাজা
একা একা দুন্দুভি বাজাবে ?

ছিল বটে রৌদ্রালোকে তারও রাজ্যপাট
সোনালি কৈশোরে
আজ উল্লুকের পাল হয়েছে স্বরাট
চৌরাস্তার মোড়ে ।

দাঁতে দাঁত ঘষাঘষি, চোখের টঙ্কার
এরকম ভাষা
সে শেখেনি, তাই এই রূপকথায় তার
জন্ম কীর্তিনাশা !

গায়ে সে মেখেছে ধুলো, গূঢ় ছদ্মবেশে
বোবা ভ্রাম্যমাণ
অদৃশ্য সহস্র চোখ তবু নির্নিমেষে
ছিলা রাখে টান ।

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা—
সে কোথায় যাবে ?
যেতে সে চায়নি ? কেউ খুলেছে দরোজা
পুনরায় মনুষ্য স্বভাবে ?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে

চিত্ত উতলা দশদিকে মেলা সহস্র চোখ
আমাকে এবার ফিরিয়ে নেবার জন্য এসেছে ?
আর দুটো দিন করুণ রঙিন
পথ ঘুরে দেখা
হবে না আমার ? পুরোনো জামার ছিঁড়েছে বোতাম ?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে
দাঁড়ালাম আমি
পাশে নেই আর মায়া সংসার আকাশে অশনি
নদীটি এখন বড় নির্জন
জলে শীত ছোঁওয়া

কে জানে কোথায় ন্যায় অন্যায় সহসা লুকালো !
এক অঞ্জলি জল তুলে বলি,
হে আঁধারবতী,
বহু ঘুরে ঘুরে স্বপ্নে সুদূরে দেখা হয়েছিল
দুঃখে ক্ষুধায় এই বসুধায়
হয়েছি হন্যে
কখনো দাওনি সুধার চাহনি ফিরিয়েছো মুখ !
মনে আছে সব ? শেষ উৎসব
আজ শুরু হবে
মেশাবো এ জলে মন্ত্রের ছলে অতি প্রতিশোধ
শরীর জানে না কে কার অচেনা
তাই ছুঁয়ে দেখা
এ অবগাহন শরীর-বাহন চির ভালোবাসা !

যে আমায়

যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি
যে আমায় ভুলে যায়, আমি তার ভুল
গোপন সিন্দুকে খুব যত্নে তুলে রাখি
পুকুরের মরা ঝাঁঝি হাতে নিয়ে বলি,
মনে আছে, জলের সংসার মনে আছে ?
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি !

যে আমায় বলেছিল, একলা থেকো না
আমি তার একাকীর অরণ্যে খুঁজেছি
যে আমায় বলেছিল, অত্যাগসহন
আমি তার ত্যাগ নিয়ে বানিয়েছি শ্লোক
যে আমায় বলেছিল, পশুকে মেরো না
আমার পশুত্ব তাকে দিয়েছে পাহারা !
দিন গেছে, দিন যায় যমজ চিন্তায়
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি !

স্বপ্নের কবিতা

আমি তো দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত
হলুদ আলোর রাস্তা চলে গেছে অতিকায় সুবর্ণ শহরে
কেউ আসে কেউ যায়, কারুর আঙুল থেকে ঝরে পড়ে মধু
কেউ দাঁতে পিচ কাটে, সুবর্ণষ্ঠীবীর স্মৃতি লোভ করে
কেউ বা ছুঁয়েছে খুব লঘু যত্নে, সুখী বারবনিতার
তম্বুরা যুগল হেন পাছা
কারো চুলে রত্নচ্ছটা, কারো কণ্ঠে কাঁচা-গন্ধ বাঘনখ দোলে
আমি তো দাঁড়িয়ে ছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত।

কোথায় সুবর্ণ সেই নগরীটি ? কোন্ রাস্তা হলুদ আলোয় আলোকিত ?
কে দাঁড়িয়ে ছিল সেই পথপ্রান্তে ? আমি নয়, কোনোদিন দেখিনি সে পথ
আঙুলে কী করে ঝরে মধু ? কেন কেউ কণ্ঠে রাখে কাঁচা বাঘনখ ?
কিছুই জানি না আমি, এমন কি সুবর্ণষ্ঠীবীর ঠিক বানানেও রয়েছে সন্দেহ
তবু কেন কবিতা লেখার আগে এই দৃশ্য, অবিকল, সম্পূর্ণ অটুট
স্বপ্ন, কিংবা তার চেয়ে বেশি সত্য হয়ে ওঠে, আমার চৈতন্যে বেঁধে সূঁচ
প্রায় কোনো কাটাকাটি না করেই অফিস-টেবিলে বসে আমি
ঐ দৃশ্য লিখে যাই।

জেনে গেছি

এমন মানুষ রোজই দেখি, যাঁরা আমায় আগে চিনতেন
ডেকে বলতেন
এই যে সুনীল, কেমন আছো, বসো, চা খাও
এখন তাঁরা মুখ ফিরিয়ে শুকনো হাস্য,
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন
কালো গহ্বর !
বৃষ্টি হয়নি বিকেলবেলা, পোড়া গরম, আমারই দোষ ?
সে অপরাধে অনেকবার আমি হয়েছি মূল আসামী
ঘরে ঢুকলে অনেকে আজ জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে
হুকুম করেন !

মধ্যরাতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন। আমার ঘুম হলো না
পাগলা হাওয়ায় উড়িয়ে নিল নীল রুমাল, একটি তারা
পুড়তে পুড়তে
খসে পড়লো বনের মাথায়
সেটাও যেন আমারই দোষ, সেই থেকে আর কথা বলে না
একটি মেয়ে!

বয়স হলো তিরিশ পার, বাঁ জুলপিতে তিনটে সাদা শিকড়
আর দু'দশটা বছর বাঁচবো,
এখন আমার পোশাক বদলে
তৈরি হয়ে নেবার পালা
অনেক যত্নে ধুয়েছি হাত, জটলা মাথায় পড়লো
আবার চিরুনি
দাড়ি কামানো আদুরে মুখ, বেরিয়ে পড়বো ফুরফুরে এক বিকেলে
একলা একলা অনেক দূরে যেতে হবে,
গোপন কোনো নদীর তীরে
অনেক দিন তো কাটলো, এবার নিজের সঙ্গে দেখা হবে না?

হলুদ পাখিরা

ছিল আমার শূন্য খাঁচা, উড়তে উড়তে এলো একটা
হলুদ পাখি
খাঁচার উপর বসে খুশির ল্যাজ দোলালো
চোখ ঘোরালো
ছিল আমার শূন্য খাঁচা ছিটকিনি নেই, শুকনো বাটি
হলুদ পাখি তারই মধ্যে সুরুৎ করে ঢুকে পড়লো!

হলুদ রং যে অবিশ্বাসী সবাই জানে
পাতলা ঠোঁটে মধুর শিস সর্বনাশী
পালক ভরা আলোর খেলা দাঁড়ের ওপর
নাচের খেলা
কেন যে এই মোহিনী ভ্রম শূন্য খাঁচায় ঢুকে পড়লো!

আকাশ ভরা শূন্যতার প্রান্তে একটা শূন্য খাঁচা
হলুদ পাখি দিগন্তের শূন্য থেকে উড়তে উড়তে
বাসা বাঁধলো খাঁচার শূন্যে
ফাঁকা দেখলেই ভরে ফেলবে এই মানসে
দাঁড়ের ওপর ল্যাজ ঝুলিয়ে খুনসুটিতে চোখ মারবে
পাখা ঝাপটে গোপনতার আভাস দেবে
বলবে এবার খাঁচায় একটা আলগা মতন
ছিটকিনি দাও !

আমার গোপন

একটা ভীষণ গোপন কথা
খাঁচার মধ্যে বন্দী আছে
গোপন সে তো খুবই আপন
তবু এমন ছটফটানি
যেন সকাল থেকে সন্ধে
সারা বিশ্ব থমকে থেকে
আমার ক্ষুদ্র গোপনতার
নিশান দেখে সুনাম গাইবে ।

আমার গোপন ক্ষুদ্র ছিল
যখন তার জন্ম হয়নি
ক্রমশ তার চক্ষু ফোটে
ডানায় কাটে স্নিগ্ধ বাতাস
খাঁচায় আর ধরা যায় না
রঙিন জামার মধ্যে লুকোয়
শরীর দিয়ে খোঁজাখুঁজির
শেষেও তার শেষ মেলে না
আমার গোপন রাত্রিকালের
জ্যোৎস্না হয়ে লুটিয়ে থাকে ।

জল বাড়ছে

কেউ জানে না, গোপনে গোপনে জল বেড়ে উঠছে
জল বাড়ছে, তিস্তায়, জল বাড়ছে তোর্সা,
রাইডাক, কালজানি নদীতে
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, শুকনো নদীগুলো
এখন উন্মাদিনী
নেমে আসছে পাহাড়ী ঢল, ভেসে যাচ্ছে ফসলের ক্ষেত,
ভেঙে পড়ছে চা-বাগান
ডুবছে গ্রাম, চুয়াপাড়া, হাসিমারা, বাক্‌সাদুয়ার
জল বাড়ছে মহানন্দার, জল বাড়ছে পুনর্ভবা,
নাগর এবং কালিন্দীতে
ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী জল ফুঁসে ফুঁসে উঠছে
ঝাপটা মারছে হাতে হাত মিলিয়ে
ভেঙে পড়ছে ভালুকা, রতুয়া, বলরামপুর, ইংলিশবাজার
ঘুমন্ত গ্রামগুলির ওপর দিয়ে হুড় হুড় করে
এগিয়ে আসছে জলস্রোত
জল বাড়ছে অজয়, মুণ্ডেশ্বরী, কেলেঘাই নদীতে
জল বাড়ছে গঙ্গায়, পদ্মায়, যমুনায়, দামোদরে
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
রোগা জল, কালো জল, দুঃখী জল, ভীতু জল
বুকের পাঁজরার মতো, তানপুরায় টংকারের মতো,
উড়ন্ত রুমালের মতো
জলের চঞ্চল খেলা
শত শত ভ্রমরীর সহসা দিগন্তে উড়ে যাওয়া
অন্তরীক্ষ জুড়ে একটা ঘোর শব্দ—যা সংগীত নয়
ফরাক্কা ডি ভি সি'র বাঁধে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে জল
যেন লক্ষ লক্ষ বাহু—
এবার সব ভেঙে পড়বে
জল উপচে এসেছে বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুরে
শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত গর্জন
ওরা আর পিছিয়ে যাবে না
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
সমস্ত ঘুম ভেঙে দেবে এবার

জল গড়িয়ে এসেছে কলকাতার ময়দানে
চতুর্দিক থেকে শহরকে ঘিরে দৌড়ে আসছে ওরা
লাল, নীল, সবুজ বিভিন্ন রঙের
পতাকা ওড়ানো অফিসে দুমদাম করে
ধাক্কা দিচ্ছে জল

জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
এইমাত্র তারা ঢুকে এলো অফিসপাড়ায়
বিনয় বাদল দীনেশের মতো দুর্দান্ত সাহসী জল
লাফিয়ে উঠে পড়লো রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বারান্দায়...

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
এসেছি দৈব পিকনিকে
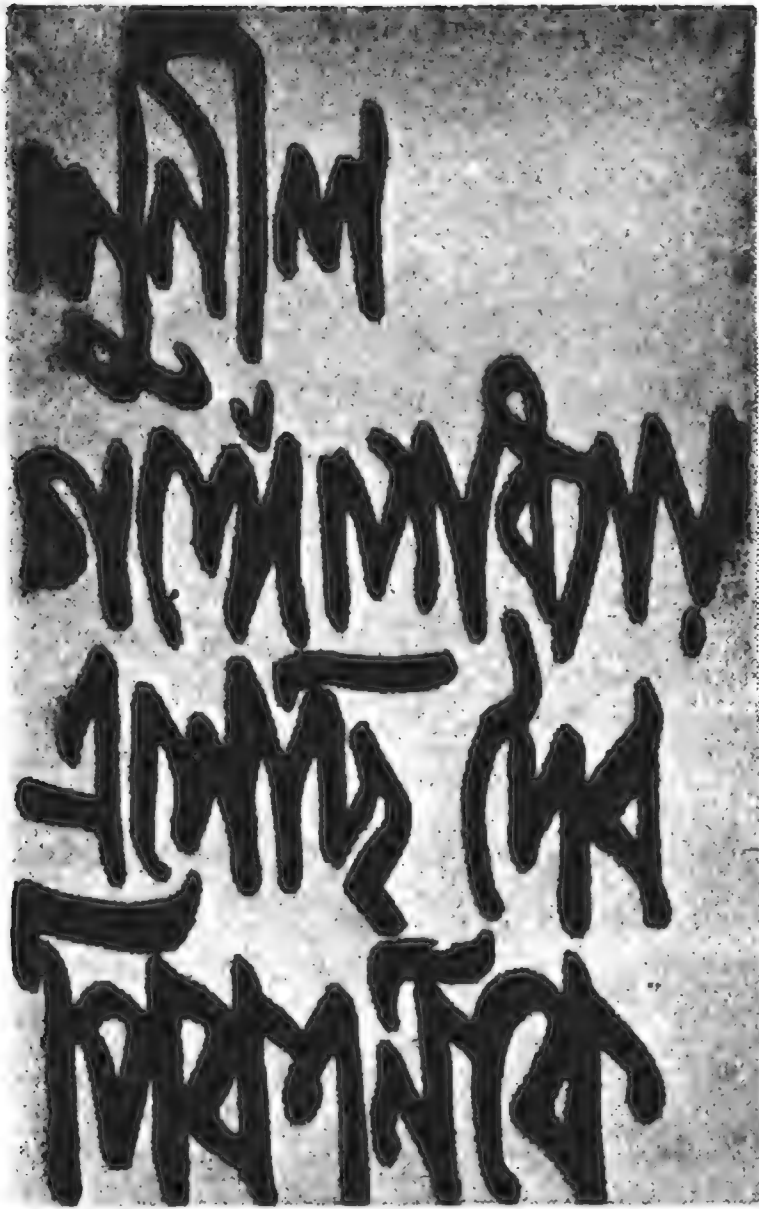
এসেছি দৈব পিকনিকে

সূচিপত্র

মানুষের মুখ চিনে

শুয়োরের বাচ্চারাই সভ্যতার নামে জিতে গেল
ওদের নিজস্ব রাস্তা, ওরাই দৌড়োবে
ওদেরই মুখোশ নিয়ে দেশে দেশে চলে যায় অবিমিশ্র দূত
বিমানের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে কোনোদিন
একজনও পড়ে না।
বাঁধানো দাঁতের হাস্যে সভ্যতার নাম রটে খুব।

শুয়োরের বাচ্চাদের কৌতুক কাহিনী নিয়ে
ভরে যায় মহাফেজখানা
ওরাই নদীতে বাঁধে সেতু, ফের দু' একবার
বিছানায় পাশ ফিরে ওদেরই নিজস্ব অস্ত্রে
টুকরো হয়ে ছিটকে যায় কংক্রীট মিনার!
অন্যদিকে রক্তের নদীতে ভাসে সুদৃশ্য তরণী
সেখানে সঙ্গীত-সুরা, কঙ্কালের সঙ্গে পাশা
খেলে পুরোহিত
শুয়োরের বাচ্চাদের এই সভ্যতার গায় হিসি করে দাও!

তুমি আমি ফিরে যাবো, আমরা অসভ্য রয়ে যাবো
এখনো অরণ্য আছে, হিম আকাশের নীচে এখনো কোথাও
পরাগ-সৌরভ ভাসে, শিস দেয় রাত-চরা পাখি
লুকোনো ঝর্নার পাশে আমরা উলঙ্গ হবো, মায়াবী জ্যোৎস্নায়
মানুষের মুখ চিনে মানবিক নাচের উৎসব শুরু হবে।

খেয়াঘাটে

ডোরাকাটা সোয়েটারের মতো চামড়া
একটি কুকুর ছুটে গেল
কোনাকুনি পশ্চিমের দিকে
তখন বৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্ত
তীব্র নাদে কাঁপিয়ে ভল্লুক বর্ণ মেঘ
একটি রুপালি বর্শা

সোজা এসে গেঁথে গেল
নদীর পাঁজরে
পিত্তল বাসন নিয়ে সিক্ত এক নারী
চলে গেল শাড়ী সপসপিয়ে
ঈষৎ পৃথুলা, তবু কোমরে জাদুর ছোঁয়া
বাঁক ঘুরবার আগে তাকে ছুঁয়ে ছেনে গেল
চৈত্রের বাতাস
তিনটি ধবল হাঁস সেধে নিল গলা···

খেয়াঘাটে এসময় আর কেউ নেই, আমি একা—
আমি কি যাবো না ? আমি পিছনে দৌড়োবো ?
যতই চিৎকার করি, বজ্রপাত ছাড়া কোনো
প্রত্যুত্তর নেই
কালো হয়ে আসে বেলা, আমি সুচ রাজা হয়ে
ভূমিতে শয়ান।

এই দৃশ্য

হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
নীল ডুরে শাড়ী, স্বপ্নে পিঠের ওপরে চুল খোলা
বাতাসে অসংখ্য প্রজাপতি কিংবা সবই অভ্রফুল ?
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
চোখ দুটি বিখ্যাত সুদূর, পায়ের আঙুলে লাল আভা।
ডান হাতে, তর্জনীতে সামান্য কালির দাগ
একটু আগেই লিখছিলে
বাতাসে সুগন্ধ, কোথা যেন শুরু হলো সন্ধ্যারতি
অন্যদেশ থেকে আসে রাত্রি, আজ কিছু দেরি হবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
শিল্পের শিরায় আসে উত্তেজনা, শিল্পের দু'চোখে
পোড়ে বাজি

মোহময় মিথ্যেগুলি চঞ্চল দৃষ্টির মতো, জোনাকির মতো উড়ে যায়
কোনোদিন দুঃখ ছিল, সেই কথা মনেও পড়ে না

হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
সময় থামে না, জানি, একদিন তুমি আমি সময়ে জড়াবো
সময় থামে না, একদিন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে
অতৃপ্ত বাসনা, ছোট ছোট সুখ, চলে যাবে
দিগন্ত পেরিয়ে
নতুন মানুষ এসে গড়ে দেবে নতুন সমাজ
নতুন বাতাস এসে মুছে দেবে পুরোনো নিশ্বাস,
তবু আজ
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
এই বসে থাকা, এই পিঠের ওপরে খোলা চুল,
আঙুলে কালির দাগ
এই দৃশ্য চিরকাল, এর সঙ্গে অমরতা সখ্য করে নেবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো…

এখন আমি

হাতের মুঠোয় ছিলএকটা মস্তবড় নদী
নদীর মধ্যে ছিল আমার বাল্যকালের ভয়
ভয়ের পাশে সরলতার বাগান আর প্রাসাদ
হারিয়ে গেল,
সমস্তই হারিয়ে গেল !
নদীও নেই, ভয়ও নেই, কোথায় সেই
কাননঘেরা বাড়ি ?
এখন আমি মানুষ, আমি কঠিন একটি মানুষ !

বকুল গাছের নীচে

বকুলগাছের নীচে অকস্মাৎ নেমেছিল প্রেত
বড় দুঃখী, একা, ছন্নছাড়া !
দিগন্তকে একদিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়িয়েছে যারা
তারা নেই, সবাই প্রবাসী
আজ শুধু শোনা যায় দূর প্রান্তে শীতের সঙ্কেত
ভুল হয় যেন কার বাঁশী
রাতের বকুল ঝরে, জ্যোৎস্না ভ্রমে ডেকে ওঠে কাক
ওখানে কি ছায়া, না ইশারা ?
যারা ভালোবেসেছিল আজ সকলেরই বুক পুড়ে খাক
তবু শোনা যায় কার হাসি ?
বকুল গাছের নীচে একদিন নেমেছিল প্রেত
বড় দুঃখী, একা ছন্নছাড়া— ।

শিল্প প্রদর্শনীতে

একটি বিমূর্ত মূর্তি, পাথরের, সুবৃহৎ চৌকো চোখ
গালে যেন পচা মাংস, অদ্ভুত বীভৎস ওষ্ঠাধর
শিল্পী এরকম গড়েছেন
আর ঠিক তারর সামনে শাড়ী-মোড়া জীবন্ত সুন্দর ।

টেবিলের পাশ থেকে শিল্পীটি এগিয়ে এসে
স্মিত হাসলেন
তৃতীয় ব্যক্তির দৌত্যে পরিচয় সাঙ্গ হলো চোখে চোখ রেখে
রমণীর বাঁ স্তনের ওপরে ব্যাগের স্ট্র্যাপ,
কটিতটে নদীর জোয়ার
আঁচলে সুগন্ধ, চিবুকের মসৃণতা রেশমের ঈর্ষা আনে
এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায় ।

দু'একটি কথার পর পুনরায় দ্রষ্টব্যের দিকে মনোযোগ
'দারুণ' এ হেন শব্দে প্রশংসা ছটফট করে
'সভ্যতার খাঁটি রূপ শিল্পীর বলিষ্ঠ হাতে

যেরকম জীবন্ত হয়েছে…'
'বিশেষত চোখে ঐ যে অসহায় আর্তনাদ'
বিনয়ে শিল্পীর ঘাড় নিচু, মুখখানি দুঃখী দুঃখী
কেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে এ সময় ?
নারীর ভুরুতে দুটি   মুক্তাবিন্দুসম ঘাম
এইমাত্র মুছেছে রুমাল
যেন দেবদূতী তার বিস্ময়ের উপহার দিয়েছে দ্রষ্টাকে
'চলুন চা খাওয়া যাক', এই বলে এর পরে
সকলেই ক্যান্টিনের দিকে…

লাইব্রেরীর মধ্যে

লাইব্রেরীর মধ্যে এক মৃত্যু
অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে শুয়ে আছে
এত মৃত মনীষার মাঝখানে ঐ এক ছড়ানো শরীর
এখনো উত্তপ্ত, ঠোঁটে কফির বাদামী স্বাদ
আঙুলে দীর্ঘায়ু আংটি
নোখে কিছু ধুলো
ঐ হাত ছুঁয়েছিল বহু শতাব্দীর ইতিহাস
এখন নশ্বর হয়ে পড়ে আছে, এখন কিছু না !

সব শেষ হয়ে গেলে নিস্তব্ধতা জানালায় বসে…
রোদ্দুর গুটিয়ে যায়, ডানা মেলে আসে দীর্ঘ যাম
পঞ্চম ভল্যুম থেকে সে সময়
দেকার্তকে ডেকে বলে তৃতীয় চার্বাক
ছিঁড়ে ফেলো সব তত্ত্ব,
এই ছোকরা দেখিয়ে দিলো হে
ইচ্ছামৃত্যু কতখানি
মাথা উঁচু করে চলে যায় !
দক্ষিণের শেলফে বসে নীৎসের সমর্থন, ঠিক, ঠিক, ঠিক ।

চায়ের দোকানে

এইটুকুনি শহর তার দু'দিকে ট্রেন লাইন
মাথার ওপর আকাশ আর যেদিকে যাও আকাশ
নক্সা কাটা রেল কলোনি, খানিক দূরে বাজার
তার ভিতরে চায়ের দোকান, তার ভিতরে
কবির দলের টেবিল।

উনিশ থেকে তেইশ কিংবা খানিক এদিক-ওদিক
সেদিন যারা কিশোর ছিল এখন সদ্য যুবক
বোতাম খোলা শার্টের নীচে হাতে-গরম হৃদয়
ওষ্ঠে গালে নতুন রোম, যখন তখন
চিরকালের হাসি।

তিনটি চা, সাতটি কাপে, দুই সিগারেট ছ'জন
কথায় কথায় তুফান ওঠে, রৌদ্র-ঘড়ি স্থির
রুক্ষ চুল, জ্বলজ্বলে চোখ, কণ্ঠভরা দাপট
এই টেবিলটি এক দুনিয়া, এই টেবিলে
অন্যরকম জীবন।

এইটুকুনি শহর, সেটা যখন তখন ফুরোয়
চেনা মানুষ, ভেজাল কথা, জন্ম-মৃত্যু-মিলন
সব কিছুই তো মাপ মতন, রৌদ্র বৃষ্টি-শীতও
শুধু চায়ের দোকানটিতে কয়েকজন
ছদ্মবেশী রাখাল!

ফুল

গাছ তার ঝরে পড়া ফুলগুলি নিয়ে কিছু ভাবে?
ঘাসের ওপরে ফুল, তখনো শিশির ভেজা
ছুঁয়ে যায় বালিকার হাত
ভোরের বাতাস কিছু স্নেহ করে
তপন তখন সংবরণ করে তেজ

ফুলগুলি চলে যাবে, গাছ্ কিছু ভাবে ?

ফুলের ভিতরে নেই বিষ, তাই
সুন্দরের প্রসিদ্ধি পেয়েছে
শিমুল, জারুল, শাল এ রকম লম্বা চওড়া গাছও
এমন কোমল ফুলে ছেয়ে থাকে কেন ?
এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ?
এ কি শুধু ঝরাবার খেলা ?

তারপরই ঘোর ভাঙে
সুন্দরের পাশে এসে প্রহরীর মতো
দাঁড়ায় নিখিল প্রয়োজন
সব কিছু ঠিকঠাক চলে
আমিই বা কেন এত ফুল নিয়ে মাথা মুণ্ডু ভাবি !

এক জীবন

শামুকের মতো আমি ঘরবাড়ি পিঠে নিয়ে ঘুরি
এই দুনিয়ায় আমি পেয়ে গেছি অনন্ত আশ্রয়
এই রৌদ্র বৃষ্টি, এই শতদল বৃক্ষের সংসার
অস্থায়ী উনুন, খুদ কুঁড়ো—
আবার বাতাসে ওড়ে ছাই
আমি চলে যাই দূরে, আমি তো যাবোই,
জন্ম মৃত্যু ছাড়া আর আমি কোনো সীমানা মেনেছি ?

এ আকাশ আমারই নিজস্ব
আমারই ইচ্ছেয় হয় তুঁতে
নারী ও নদীরা সব আমারই নিলয়ে এসে
পা ছড়িয়ে স্মৃতিকথা বলে
চমৎকার গোপন আরামে কাটে দিন
আর সব রাত্রিগুলি নিশীথ কুসুম হয়ে ঝরে যায়…

রেলের কামরায় পিঁপড়ে

এ পৃথিবী চেয়েছে চোখের জল, পায়নিও কম
যেটুকু দেবার দিয়ে যে-যার নিজের পথে চলে যায়
মাঝে মাঝে এমন উদাস করা আলো আসে
অনেকে দেখে না, কেউ দেখে
তখন সে কার ভাই, বন্ধু ? কার আর্যপুত্র ? সে কারুর নয়
বড় মায়া, বুক ছেঁড়া দীর্ঘশ্বাস, আবাল্যের এত স্নেহ ঋণ
বিষণ্ণতা পায়ে হেঁটে চলে যায় সূর্যাস্তের দিগন্ত কিনারে
রেলের কামরায় পিঁপড়ে যে-রকম যায় দেশান্তরে।

কেঁদুলির যাত্রী

সেই অন্ধকার পথ ভেঙে যাওয়া, অজস্র জোনাকি, বুকের উষ্ণতা কাড়ে হাওয়া, তবু শ্রবণ উৎকর্ণ, আরো দূরে, অথচ তেমন দূরে নয়, আঁধার নির্মাণ থেকে উঠে আসে অঙ্গহীন রথ, অদেখা নদীর কাছে খেলা করে স্বর্গের সৌরভ···

পায়ে পায়ে যাওয়া, শুধু যাওয়া, খুব বেশি দূরে নয়, অথচ পথের শেষ বাঁকে, ভাষাহীন বন্ধুদল, চকিতে ঝিলিক দেয় নিজস্ব আগুন, ক্রমশই গাঢ় হয়ে আসে শীত, র‍্যাপার লুটিয়ে পড়ে গৈরিক ধুলোয়, অকস্মাৎ জেগে ওঠে পাখির কান্নার মতো গান···

এখানে ওখানে আলো, কালো ছায়া, অসংখ্য অদৃশ্য হাত হাতছানি দিয়ে ওঠে, এবার বাতাস কেটে ছুটোছুটি, দোকানে বিনিদ্র মাছি এবং চিনির গন্ধ পাশে রেখে চলে যাই, ভিজে ঘাসে ধুপ করে বসে পড়ি, বালক বাউল রাখে আকাশের দিকে চোখ, সুর যায় দিগন্ত পেরিয়ে।

সুধা, মনে আছে ?

তিনজন অমলকে চিনি তারা কেউ ডাকঘরের নয়
দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্যজন এখন বিদেশে
প্রবাসী অমল বেশ স্বাস্থ্যবান, যেমন দরাজ বক্ষ,
তেমনি বিশাল সুখী, মদ্যপানে খুব নামডাক
আরেকজন টালিগঞ্জ থেকে রোজ শিয়ালদায় এসে
ঘড়ির দোকানে বসে
ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঘোরে।
অপরটি জাঁহাবাজ শব্দ সওদাগর
আমাকেও মাঝে মাঝে বুঝিয়েছে জীবনের মানে
তার স্ত্রীকে দুপুরে একলা দেখি পার্ক স্ট্রীটে
সে কথা বলি না।
তিনজন অমলকে চিনি, তারা কেউ ডাকঘরের নয়।

রূপালি পর্দার মতো বৃষ্টি ওড়ে, ভোরবেলা ভেঙে যায় ঘুম
বাড়ির সামনে রাস্তা, এত চেনা, তবু যেন মনে হয়
চলে গেছে অনন্ত সন্ধানে
গাছগুলি বাউলের মতো হাত বাড়িয়েছে
আকাশের দিকে
ফিরিওয়ালা আজ এক অন্য সুরে গান গেয়ে গেল
আমার চমক লাগে
একলক্ষ রোমে শিহরন
জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াতেই টের পাই,
আমি বন্দী
যা কিছু কাজের ছিল, সকলই অচেনা
তখন হঠাৎ সেই তিনজন অমল এসে
একসঙ্গে, কাতর গলায় প্রশ্ন করে,
সুধাও কি ভুলেছে আমাকে ?

এ কার উদ্যান ?

এ কার উদ্যান ? কে এত সযত্নে সাজিয়েছে
ফুলের কেয়ারি
সবুজ ঘাসের পাশে গোলাপ দুর্দান্ত লাল,
এবং মাধবী
কিশোরী মেয়ের মতো সদ্য যৌবনের দিকে
হাত বাড়িয়েছে।
শিউলি ফুলের রাশি ঝরে আছে শৈশবের স্মৃতি
বিভিন্ন সুগন্ধ যেন ঝড় হয়ে ছুটে আসে ঘ্রাণে—
এ কার উদ্যান ?
এই পর্টুলেকা, এই যূথী সমারোহ ?

এ আমারই।
রেলিং-এর পাশে আমি দীন ভিখারীর মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছি
আমার এ পৃথিবীতে এক টুকরো ভূমিখণ্ড নেই।
তবু এই কুসুমের এমন উৎসব সাজ,
সৌরভের এই বন্যা—
সকলই আমার
ক্ষুধার্তের মতো আমি এই রূপ শুষে নিই চুষে চুষে খাই !

কালো অক্ষরে

কালো অক্ষরে থেকেছি মগ্ন সারাদিন সারা মাস ও
বছর
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, জুলপি ও চুলে
সাদা সাদা ছোপ
বাইরে আকাশ, বাইরে মধুর, বাইরে নারীরা
এই যে আয়ুর হনন এই যে দিন দিনান্ত হৃদয়ে প্রবাস
এই যে পরের দুঃখ ও সুখ, যে যার খেলায়
রয়েছে মত্ত
কার নিশ্বাস কার চাপা হাসি চকিতে তাকাই

সকলই অলীক
শুধু কাছে থেকে কালো অক্ষর, সারাদিন সারা মাস ও
বছর
কালো অক্ষর কালো শৃঙ্খলা এক জীবনের ভ্রান্তি বিলাস
চোখ ক্ষয়ে গেল, বুক জ্বলে গেল, আয়ুর হনন,
হৃদয়ে প্রবাস।

রূপনারানের কূলে

রূপনারানের কূলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
পৃথিবীতে নতুন চাঁদ উঠেছিল সেদিন,
অজানা ধাতুর মতন আভা
তার নীচে মধুলোভীদের দুরন্ত হুটোপুটি
নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য সিল্কের ওড়না
পাগল গলার গান দিগন্তকে কাছে নিয়ে আসে
নারীদের কারুর পা এই ধুলোমাটির পৃথিবী ছোঁয় না।
যেন আমরা এসেছি দৈব পিকনিকে
নতুন চাঁদের নীচে সেই এক নতুন রাত্রি
সেই পূর্ণকে শূন্য করার প্রতিযোগিতা, গোপন চুম্বন—
আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে ছড়িয়ে যায় বিদ্যুৎ,
গোল স্তনগুলিতে আগুনের হল্‌কা
কৌতুক হাস্যে ভাঙে বিশেষ তরঙ্গ, যা আগে কেউ জানেনি!
বাতাসের সুগন্ধ আমাকে অনুসরণ করিয়ে নিয়ে যায়
সকলের থেকে খানিকটা দূরে
নদীর কিনারে বসে, অকস্মাৎ একা হয়ে, মনে পড়ে
এই খেলা ভেঙে যাবে!
অথচ জীবন এরকম সুস্বপ্ন হবার কথা ছিল
অথচ জীবন কেন এই স্বপ্ন থেকে নির্বাসিত ?
তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি এক হাত জলে ডুবিয়ে
নদীকে সাক্ষী রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।
আমাকে জাগিও না!

কে তুমি

—কে তুমি ? আড়াল থেকে সামনে এসো ।
—কোথায় আড়াল ? এ প্রকাশ্য দিবালোকে
সামনে এসেছি ।
—তবুও চোখের সামনে যেন একটা মসলিনের পর্দা,
রৌদ্রে আরও ধাঁধা লাগে,
কে তুমি ? কে তুমি ?
—দ্যাখো, আরো একটু সামনে এসেছি,
এখনো চিনলে না ?
—খানিকটা চেনা, চেনা এখনো অস্পষ্ট মুখ
ঐ হাসি কোথায় দেখেছি ?
ঐ চিবুকের রেখা, ঐ চোখ কার ?
—তুমি বহুদূর চলে গিয়েছিলে
আমার কথা কি আর মনেও পড়েনি ?
—জীবন জটিল এত, কত মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছি
কী করে সকলকে মনে রাখি ?
—এক সময় ভালোবাসা ছিল, কথা ছিল
আজন্ম দু'জনে দেখা হবে
সব ভুলে গেলে ?
—কে তুমি, হেঁয়ালি ছেড়ে পরিচয় দাও ।
—আমিই হেঁয়ালি তোমার জীবন সঙ্গী, কৈশোরের স্বপ্ন
মনে নেই ?
আমাকে পেছনে ফেলে তুমি কোন্ কর্কশ জগতে
চলে গেলে ?

দেখিনি বহু দিন

ছেঁড়া জামা, রুক্ষ চুল, জুতোয় পেরেক—
সে ছেলেটা কোথায় যে গেল !
পকেটে চকমকি ভরা, দুপুরে বা মধ্যরাত্রে মেধার ভ্রমণ
পায়ের তলায় সর্ষে, সর্বক্ষণ খিদে—
চতুর্দিকে সার্থকতা উদ্যানের বাথরুম হয়েছে

বস্তি ভেঙে গড়া হলো অন্তিম যাত্রার কত রাস্তা
অফিস ফেরার পথে অনেকেই সেইখানে
নিজের জুতোর শব্দে মুগ্ধ হয়ে গেছে—
এরকম সুন্দরের মধ্যে সেই অভুক্ত যৌবন
দু'হাত ছড়িয়ে তবু ঘোষণা করেছে,
আমি আছি।
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, কোথায় যে গেল সেই
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, দেখিনি বহুদিন !

সে বড় লাজুক, খুব অভীষ্ট বাড়িতে গিয়ে
বলেনি একটিও ছোট কথা
সিঁড়ির উপরে স্থির সাদা ফ্রক পরা রাজহংসীটিকে দেখে
কেঁপেছিল তার বুক বহুবার কেঁপেছিল বুক
তবু মুখ, তবু মুখ, তবু মুখ বন্ধ ছিল
সব কথা আগুনের ফুলকি হয়ে সহস্র চিঠির সঙ্গে উড়ে যায়
দুঃখ শিহরন মেশা কবিতায় ছোট ছোট মাসিকপত্রের কোণে
শুয়ে থাকে
এবং গোপন থেকে বেড়ে ওঠে তুলোর কৌটায় রাখা বীজ
যার থেকে জন্ম নেবে বৃক্ষ
যার কোনো ফুল কিংবা ফল আছে কিনা
কেউ তা জানে না !
আবার কখনো শুরু হয় অসময়ে অসি খেলা
পর পর লুটেরা, পুলিশ, ঠক—এইসব কঠিন দেয়াল
ক্রমশ এগিয়ে আসে, ক্রমশ এগিয়ে আসে মাথা লক্ষ্য করে
সে একা, বা দু'জন বন্ধুকে নিয়ে লড়ে গেছে জীবন সর্বস্ব
আকাশ ফাটানো কণ্ঠে মধ্যরাতে চেঁচিয়ে বলেছে,
আমি আছি !
অপবিত্র অর্ধাংশকে যে নেবে সে নিক
অপর পবিত্র অংশে এ জীবন পৃথিবীতে
দু'পা গেড়ে দাঁড়াবার
স্থান ছাড়বে না !
সীমানা ভাঙার রোখে রাত্রি ছিঁড়ে চেঁচিয়ে বলেছে,
আমি আছি !

কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, কোথায় যে গেল সেই
কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা, দেখিনি বহুদিন !

নীরার কাছে

যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম
শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটা হলদে রঙের আনন্দ
না খুলতেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অসময়
সেই না-বলার দয়ায় হলো স্বর্ণ দিন, পুষ্পবৃষ্টি
ঝরে পড়লো বাসনায় ।

এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো, দূরত্বকে সুদূর করো
নীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্গ নদীর পারের দৃশ্য ?
যূথীর মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে একলা একলা দুপুরবেলা
পথের যত হা-ঘরে আর ঘেয়ো কুকুর তারাই এখন আমার সঙ্গী ।

বুকের ওপর রাখবো এই তৃষিত মুখ, উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছোঁবে
এই সাধারণ সাধটুকু কি শৌখিনতা, ক্ষুধার্তের ভাতরুটি নয় ?
না পেলে সে অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে
মনে পড়ে না মধ্যরাতে দৈত্যসাজে দরজা ভেঙে কে এসেছিলো ?
ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে যেন একটি অতসী রং হল্‌কা এলো
যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম ।

কেউ শুধালো না

মাথায় একটা ডাণ্ডা, একটা বুনো শব্দ, শেষ !
লোকটা মরে পড়ে রইলো,
লোকটা মরে পড়ে রইলো শিশির ভেজা মাঠে !

লোকটা কোনো শিশুর গালে
দেয়নি বুঝি টোকা ?

ঘোমটা-পরা নারীর হাত মুঠোয় ধরে
পার হয়নি মাঠের রেল লাইন ?
ঘাম-জড়ানো বুকের মধ্যে ছোয়ঁনি কোনো কান্না ?
এই লোকটি মাটিকে ভালোবাসেনি ?
এই লোকটি ধানের গন্ধ নেয়নি ?
এই লোকটি শীতের রাতে নিজের গায়ের কাঁথা
দেয়নি অন্যকে ?
এসব কেউ শুধালো না
যাবার পথে একবারও কেউ ফিরেও তাকালো না
লোকটা মরে পড়ে রইলো
লোকটা মরে পড়ে রইলো শিশির ভেজা মাঠে ।

মানুষ যতটা বড়

মানুষ যতটা বড় হতে চেয়েছিল
তার চেয়ে নিজেই সে বড়
পাহাড়ের কাছে গিয়ে মানুষ প্রথমে নত
করেছিল মাথা
তারপর পাহাড় শিখরে উঠে
কালপুরুষের দিকে দিল হাতছানি !
মানুষ লিখেছে এই সমুদ্রের
সহস্র বন্দনা
অসীম পদবী দিয়ে দেখিয়েছে
মহৎ সম্মান
তারপর তুড়ি মেরে সমুদ্রকে করে গেছে
এ ফোঁড় ও ফোঁড়
নিজেই অসীম হয়ে জলধিকে স্তম্ভিত করেছে !
মানুষ যতটা বড় হতে চেয়েছিল
তার চেয়ে নিজেই সে বড় ।

শব্দ আমার

শব্দকে তার বাগানটি দাও, শব্দ একলা বন্দী ঘরে
যেমন ছিল বাগান সেই নদীর ধারে পোড়ো বাড়ির
যেমন ছিল পায়ের তলায় সর্ষে, শিশুর খেলনা গাড়ি !
এই বিকেলের সিংহ-মার্কা খাঁটি আলোয় ইচ্ছে করে
ভালোবাসার গায়ে লাগুক খ্যাপার মতন ঝোড়ো বাতাস—
টুকরো-টাকরা কাগজপত্র, মলিন ঘর, ছেঁড়া আঁধার
অনিশ্চিত চিঠির বাক্স, সাত মাইলের গণ্ডি বাঁধা
এসব থেকে বেরিয়ে আসুক একটা হল্‌কা। সারা আকাশ
দু' ভাগ চিরে একটি অংশ চোরাবাজারে যে-খুশি নিক !
আরেক দিকে বাগান, সব ছেলেবেলার স্বপ্নে ফেরা
শিমুল তুলোর ওড়াওড়ি, দিক-ভোলানো দিঙনাগেরা
শব্দ আমার জীবন, আমার এক জীবনের পরম ক্ষণিক !

ধলভূমগড়ে আবার

ধমভূমগড়ে আবার ফিরে গেলাম, যেন এক সৃষ্টিছাড়া
লোভে। ওরা আর কেউ নেই। তরুণ শালবৃক্ষটি, যাঁর
মূলে হিসি করেছিলাম, তিনি এখন পরিবার-প্রধান
হয়েছেন। তাঁর চামড়ায় আর তকতকে সবুজ আঁচ দেখা
যায় না। কাঁটা গাছের ঝাড়ে ঐ থোকা থোকা সাদা
ফুলগুলোর নাম কী, জানা হলো না এবারও, ফুলমণি নামে
যে মেয়েটি আমার ওষ্ঠ কামড়ে রক্তদর্শন করেছিল, সে
ডুবে মরেছে দূরের সুবর্ণরেখায়। সেই নদীর শিয়রে এই
শেষ বিকেলে সূর্যের ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে এখন। পাঁচটি
বিশাল বর্শা বিঁধে আছে আকাশের উরুতে, যেন এই
মুহূর্তে এক দুর্ধর্ষ খেলা সাঙ্গ হলো। মহুয়ার দোকানটির
কোমরে ঐ সিমেন্টের বেদি না-থাকা ছিল ভালো।
ঐখানে এক উন্মাদিনী নর্তকী দেখিয়েছিল তার তেজী
স্তনের কাঁপন, তার নিতম্বের গোঠে ঝামরে উঠেছিল
অন্ধকার। শালিকের মতন সে চলে যাবার পরও শব্দটা
রেখে গেছে। মাতালের অট্টহাসি থামিয়ে দেয় ট্রেনের

হুইশ্ল।
জঙ্গলের মধ্যে তিনশো পা স্তব্ধভাবে হেঁটে গিয়ে এক
শুকনো খাঁড়ির পাশে আমরা তিন বন্ধু হাঁটু গেড়ে বসি।
পুরোনো সৈনিকদের ফিরে আসার কথা ছিল, সর্বাঙ্গ
ক্ষতবিক্ষত, তবু আমরা এসেছি। চিনতে পারো?

এই সময়

দুঃখ চেয়েছি, তা বলে এতটা দুঃখিত হয়ে
থাকতে চাইনি
সকলি গোপন, সকলি নীরব, একা একা শুধু
বুক ভার করা
কার কাছে যাবো, কাকে যে বলবো, কেউ নেই, কোনো
নাম মনে নেই
সকলে আলাদা, নিরালায় একা, কেউ কারো মুখে
সহজে চায় না
কোনো কথা নেই, শুধুই শুকনো লৌকিকতার
লঘু চোখাচোখি
জীবন চলেছে জীবনের মতো, তার নিচে চাপা
হালকা বিপদ
বিপদের আরও অনেক গভীরে ইঁট চাপা আছে
ধিকি ধিকি রাগ
দুঃখ চেয়েছি, তা বলে এতটা দুঃখিত হতে
চাইনি জীবনে।

ফেরা না ফেরা

ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো
দেখোনি পথের কাঁটা, দেখোনি তমসা?
স্বপ্নের ভেতরে জাগে শূল, অপাপবিদ্ধের শুভ্র
অভিশাপ হাসি

প্রতিটি ধ্বংসের পর কারা দেয় এত সকৌতুক করতালি ?
আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে দেবে নিশান
তাহলে কোথায় যাবো, কার কাছে যাওয়া এই না ফেরার পথে ?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো ।

দেখোনি স্থাণুর কীট ? দেখোনি সমস্ত দিন
ভুলের কাঁকর আর মুখ ভরা অনিচ্ছার ধুলো ?
এ রকম কথা ছিল ? যখন তখন সব
প্রয়াসে বিলিয়ে দেওয়া শপথ ছিলো না ?
ছিঁড়ে যাই হাজার অদৃশ্য সুতো, আরও কিছু
যার নাম মায়া
যাবো না ? যেতেই হবে, এখন না যদি যাই, তবে আর কবে ?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো !

কথা ছিল

এই দুরন্ত রাতের খেলা, কথা ছিল
বনের মধ্যে রেশম, এত লাল রেশম, কথা ছিল ?
বাতাস ভাঙে বিজন দ্বীপ, আকাশ ভাঙে ঘর
দুঃখ ভাঙে নরম হাত, কঠিন হাত, কথা ছিল ।
হে সুন্দর, হে আনন্দ, এত সুদূর ?
ফেরার পথ ভুলে যাবার কথা ছিল ।

খেলাচ্ছলে

'ফেরা' এই শব্দটিকে ভিজে নিয়ে চোষাচুষি করি
খেলাচ্ছলে
এবং একার খেলা কোনোদিন নিয়ম মানে না
ছাদের পাঁচিল ছেড়ে লাফ দেয় তেজী বল
উড়ে যায় ব্রীজের ওপারে

বাতাস আঁচড়ায় শীত, সন্ধ্যা আনে কালো আলোয়ান
জিভ ক্ষার হয়ে আসে, শব্দটি সশব্দ হয়ে
ভয় পাওয়ায়
এতক্ষণ একা ঠায় দাঁড়িয়ে কিসের জন্য 'ফেরা' ?
একি ফিরে আসা, নাকি ফিরে যাওয়া, কার ?
কে জানে ফেরার মর্ম, অলৌকিক এ শব্দটি কাকে
কী শেখায় !

আমি কি পৃথিবী কিছু ভারী করে আছি ?
হে মানুষ, হে মানুষী, এবার আমার দিকে
রুমাল ওড়াবে ?

মায়া সুন্দর

ফণা তোলা সাপের মতন এমন বিচিত্র সুন্দর আর কি আছে
অথচ তা পাখির মতন সুন্দর না !
তারপর সাপ চুপি চুপি ছোবল মারে পাখির বাসায়
রাত্রিতে গড়িয়ে পড়ে কান্না
সুন্দরের মধ্যে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা হা-হা করে
অসহায় পাখি-মা একটু দূরে ডানা ঝাপটায়
তার ঠোঁটে-ধরা তখনও একটি প্রজাপতি
পুরো দৃশ্যটি ঝলসে ওঠে যুবতী জ্যোৎস্নায়
অপরূপ দেবদারু গাছটি আরও সুন্দর হ'য়ে ওঠে
কেন না তার নীচে অপেক্ষমাণ এক নারী
যে মায়া দর্পণকে প্রশ্ন করেছিলো,
বলো তো, আমার চেয়ে অসুখী আর কে আছে
সে জানে তার জন্য আজ কেউ আসবে না
এই অপরূপ মায়ার সন্নিধানে
বিচ্ছেদ আরও মধুর যে !

বাসের ভিতরে

বাসের পাদানি তটে দুটি ইঞ্চি পেয়ে যাই বহু পুণ্যফলে
বিকেল পাঁচটায়
তারপর বিহঙ্গেরা যেমন স্বাধীন, সেরকমই ভিড়ের ভিতরে
যখন যেখানে খুশি যাও,
মানুষ তরল জল, শুধু স্রোতে ভাসা
মহিলা জোয়ার ছেড়ে আরও দূরে দৈনন্দিন সুখ
ডিজেলের কটু গন্ধ, সব ঠিকঠাক।

বুকের বোতাম একটু টুপ করে খসে পড়ে সহসা এবং অকারণ
মনে মনে সর্বনাশ গণি
বোতামের এই খুনসুটি, এই নিরুদ্দেশ অতিশয় ছিরিছাঁদহীন
আমার এমনই ভাগ্য, ঠিক ওরকম আর কখনো পাবো না
খুঁতো হয়ে যাবে সব, এরকমই হয়।
ঠিক যেন জলে ডুব দেওয়া—
আমি তৎক্ষণাৎ বসি পড়ি, ব্যস্ত হাতে ধুলো ঘাঁটি
এক সঙ্গে এত পদতল, তার কাছে আমার ব্যাকুল মুখ
অনেকে চমকায় কেউ রেগে ঘোড়া হয়ে লাথি ছোঁড়ে
কেউ বা ভিখারি ভেবে তু-তু করে, কেউ জুতো-পালিশ চায় না
কোথায় বোতাম ?
কোথায় সে জলস্রোত, কোথায় সে নারী পুরুষের বুকে-বুক মাখামাখি
বাসের ভেতরে এক বাঁশবন, তার মধ্যে এক ডোম কানা।

প্রত্যাখ্যান

দেবে না চুম্বন ঐ ঠোঁটে ?
লোধ্ররেণু ছড়ানো ওখানে
রূপে যেন গন্ধরাজ ফোটে
মধুলোভী সব কিছু জানে।

দেবে না আবার আলিঙ্গন ?
স্তনের ওপরে ছোঁয়া জিভ

ডঙ্কা বাজে রক্তে সর্বক্ষণ
প্রাণ যেন দ্বিগুণ সজীব !

এই বাহু জড়ানো কোমরে
তাও তুমি দূরে ঠেলে দেবে ?
গুলমোরের গুচ্ছে আজ ভোরে
রোদের আলপনা দেখো ভেবে ?
সমূহ প্রকৃতি থেকে ছেঁচে
নিয়ে আসি তোমার উপমা
তাই নিয়ে বহুকাল বেঁচে
হবে না কি পরিপূর্ণতমা ?

প্রতিহিংসা

শিমুল, শিমুল, তুই চুপ করে থাক
জানাস্ নে গোপন কথাটি
ও খুঁজে মরুক, ওর ভিটে মাটি চাঁটি
হয় হোক, ওর বুক দুঃখে পুড়ে খাক !

জারুল, জারুল, তুই দেখাস নে পথ
একা একা সে ঘুরে মরুক
ও চেয়েছে রমণীর সম্মুখ দ্বৈরথ
মাংস, ত্বক ছুঁয়ে ছেনে সুখ !

অশোক, অশোক, ওকে কর বর্ণকানা
যূথী, তুই দিস না সৌরভ
সমস্ত অরণ্যে আজ ওর ঠাঁই মানা
ও চেনেনি রূপের গৌরব ।

জলের কিনারে

এই অন্ধকার পথ চলে গেছে সমুদ্র কিনারে
যেখানে তৃষ্ণার কোনো শান্তি নেই
তবু এই তৃষিতটি কেন ঐ পথে যেতে চায় ?

সকলেরই গৃহ আছে, সকলেরই নিজস্ব সীমানা
যেখানে অর্ধেক মৃত্যু অর্ধেক জীবন
তবু এই গৃহহারা কেন যায় জলের কিনারে ?

মুখ দেখিনি

চিড়িয়া মোড়ে নেমে পড়লো — দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, — মুখ দেখিনি
মাথায় ছিল রোদের উল — এলোকেশিনী
বাহুর কাছে স্বর্গ সুবাস — দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, — মুখ দেখিনি
আমার যেটুকু প্রাপ্য আমি — তার বেশী নি'
ভুরুর একটু বাঁক দিলো না — এলোকেশিনী
ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল — দূরদেশিনী
বুক দেখেছি, ঘাড় দেখেছি, — মুখ দেখিনি।

এখানে কেউ নেই

এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
টগর চেয়ে আছে, শুকনো পাতা ওড়ে
ভ্রমর ফিরে আসে,
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে প্যান্ট খোলো, এখানে শার্ট খোলো,
জাঙ্গিয়া গেঞ্জিও

এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে রোদ আছে, বাতাস দেহ কাটে,
গন্ধে শিহরন
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
এখানে প্রেম হবে, দারুণ খেলা হবে,
শরীর চমকায়
এখানে কেউ নেই, এখানে নির্জন,
এই যে শালবন
মাটিতে গড়াগড়ি, কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া
নিবিড় রণ হলো
এমন রতি সুখ, এমন ভালোবাসা,
জীবনে একবার !

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল···

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না ।
জীবন রইলো পড়ে বৃষ্টিতে রোদ্দুরে ভেজা ভূমি
তার কিছু দূরে নদী—
জল নিতে এসে কোনো সলাজ কুমারী
দেখে এক গলা-মোচড়ানো মরা হাঁস ।
চোখের বিস্ময় থেকে আঙুলের প্রতিটি ডগায় তার দুঃখ
সে সময় অকস্মাৎ ডঙ্কা বাজিয়ে জাগে জ্যোৎস্নার উৎসব
কেন, তার কোনো মানে নেই ।
যেমন বৃষ্টির দিনে অরণ্য শিখরে ওঠে
সুপুরুষ আকাশের সপ্তরং ভুরু
আর তার খুব কাছে মধুলোভী আচমকা নিশ্বাসে পায়
বাঘের দুর্গন্ধ !

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে

তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না !

এই জীবন

ফ্রয়েড ও মার্ক্স নামে দুই দাড়িওলা
বলে গেল, মানুষেরও রয়েছে সীমানা
এঁচোড়ে পাকার মতো এর পর অনেকেই চড়িয়েছে গলা
নৃমুণ্ড শিকারী দেয় মনোলোকে হানা।

সকলেই সব জানে, এত জ্ঞান পাপী
বলেছে মুক্তির রং সাদা নয় খাকি
তবু যারা সিংহাসন নেয় তারা কথার খেলাপী
এবং আমার ভাই, মা-বোন নিখাকী।

ছিঁড়েছে সাম্রাজ্য ঢের, নতুন বসতি
পুরোনো হবার আগে দু'বার ওল্টায়
দিকে দিকে গণভোটে রটে যায় বেশ্যারাও সতী
রং পলেস্তারা পড়ে দেয়ালে চল্টায়।

এ রকম চলে আসে, তবু নিরালায়
ছোট এক কবি বলে যাবে সিধে কথা
সূর্যাস্তের অগ্নিপ্রভা লেগে আছে আকাশের গায়
জীবনই জীবন্ত হোক, তুচ্ছ অমরতা।

আমাকে জড়িয়ে

হে মৃত্যুর মায়াময় দেশ, হে তৃতীয় যামের অদৃশ্য আলো
তোমাদের অসম্পূর্ণতা দেখে, স্মৃতির কুয়াশা দেখে আমার মন কেমন
করে
সারা আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পরম কারুণিক নিষাদ
তার চোখ মেটে সিঁদুরের মতো লাল, আমি জানি তার দুঃখ

হে কুমারীর বিশ্বাসহন্তা, হে শহরতলির ট্রেনের প্রতারক
তোমাদের টুকিটাকি সার্থকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরোনো
মাছের আঁশ
হে উত্তরের জানালার ঝিল্লি, হে মধ্যসাগরের অভিযাত্রী মেঘদল
হে যুদ্ধের ভাষ্যকার, হে বিবাগী, হে মধ্য বয়সের স্বপ্ন, হে জন্ম
এত অসময় নিয়ে, এমন তৃষ্ণার্ত হাসি, এমন করুণা নিয়ে
কেন আমাকে জড়িয়ে রইলে,
কেন আমাকে···

আত্মদর্শন

অস্ত্র বানিয়েছিলুম পশুর বিরুদ্ধে, আজ পশুরা নিঃশেষিতপ্রায়
যে ক'টি রয়েছে, তাদের আদর যত্নে রেখেছি সাজানো বাগানে
এদিকে জমে গেছে অস্ত্রের পাহাড়
দিবাবসানের রক্ত আলোয় দেখা যায় মানুষের স্রোত
চতুর্দশী চাঁদের দিকে রোমহর্ষক ব্যস্ততা
যন্ত্র কষে দেয় ন্যায় অন্যায়ের হিসেব
কুকুরে চাটে পরমান্নের থালা, বিনা বাধায় ছুঁয়ে দেয় যজ্ঞ-পুরোভাস।

বীজাণুর চেয়েও দ্রুতবেগে বেড়ে-ওঠা মানুষ এগিয়ে আসে
নিজের মুখচ্ছবিকেই সে ভয় পায়
ভাদ্রমাসের ব্যাঙ আশ্রয় নেয় মানুষের গলায়
জলে-রোদ্দুরে স্নান ক'রে মাঠে হাল ধরে আছে পাঁচ হাজার বছরের
পুরোনো মানুষ
আর নগরে বন্দরে নতুন মানুষেরা ছুঁয়ে আছে অস্ত্রের বোতাম
কেউ কারুর নয়, শোনা যায় এই নিঃশব্দ হাহাকার, কেউ কারুর নয়
কেউ নদীর জলে একলা চোখের জল মেশায়
রঙ্গালয়ে কোমর-লোভী যুবকের হাত অনায়াসে যা চায় তা পায়
সে জানে না সে সাতাশটি মৃত্যুর জন্য দায়ী
পাপবোধ নিয়ে লেখা হয় কাব্য আর নিরপরাধ কারাগারে বসে
খোঁটাখুঁটি করে চাম পোকা
রাস্তায় ছোটাছুটি করে অনিচ্ছার ফসলের মতন শিশু
কেউ কারুর নয়, শোনা যায় এই নিঃশব্দ হাহাকার, কেউ কারুর নয়

অথচ ভালোবাসার কথা ছিল, অথচ মানুষ মানুষের কাছাকাছি
আসার কথা ছিল
ভূলুণ্ঠিত জ্যোৎস্নায় মিশে আছে বহু শতাব্দীর মনীষা
চতুর্দিকে সঙ্ঘ ভেঙে যাবার সংঘর্ষ
চতুর্দিকে ভেঙে যাবার অসম্ভব শব্দ, ঠিক যেন ওঙ্কারের মতন
কেউ শোনে না...

অবেলায় প্রেম

তুমি কি বিশ্বাস ভুলবে, বলবে এসে, প্রথম তরুণ
আমাকে মৃত্যুর থেকে তুলে নাও, মুহূর্তে বাঁচাও চোখ তুলে
অথবা মুহূর্ত যেন জন্মান্তর পায়, যেন পাপহীন ভুলে
সুকুমার স্তন ওষ্ঠ জঙ্ঘামূল, ভবিষ্যৎ ভ্রূণ
অচিরাৎ সৌন্দর্যের এ পান্থনিবাসগুলি বেঁচে বর্তে থাকে !
বিবিধ অপ্রেম এসে না হয়তো শরীরের মাংস ছিঁড়ে খাবে ।
তুমি কি ঝড়ের মধ্যে ছুঁয়ে যাবে সর্বস্ব শিকড়হীন সন্ধ্যায় আমাকে
বিশ্বাস ভাঙার শব্দ সঙ্গীতের মতন শোনাবে ?

কেন না বাঁচানো যায় না, রূপ রস গন্ধে প্রতিশোধ
স্পন্দনে ঢোকায় বিষ, বহু সাময়িক মৃত্যু ফলভোগ করে
তোমাকে সময় থেকে তুলে নেবো, শৈশবের এই প্রিয় বোধ
পশ্চিমে চলেছে, দেখ, পশ্চিম কী রমণীয়, অন্ধকার ঘরে
এখন পিশাচ সিদ্ধ অগ্নি জ্বলে, কাপুরুষ লোভে জাগে স্নায়ু
এখন প্রার্থনা নেই,-অপমৃত্যু আমাদের কেড়ে নেবে আয়ু ।

দেখা হবে

দেখা হবে চৌরাস্তায় বুধবার বিকেল পাঁচটায়
অথবা যদি না পারি
দেখা হবে নদীতীরে বালার্ক উষায়
কামানের ঘোর শব্দ যখন জোয়ার-স্রোত ভাঙে
অথবা যদি না যেতে পারি

দেখা হবে স্কুল-পথে যেমন শৈশবে
বারবার দেখা হয়ে যেত
একটি চাহনি কিংবা দু' পলক হাসির ঝিলিক
দেখা হবে অশ্লেষায়, পরাজিত ঘোর অবেলায়
দেখা হবে শৃঙ্খলিত দিনে কিংবা নিকষ রাত্রিতে
অথবা যদি না যেতে পারি
যদি সব পথ জুড়ে খাড়া থাকে উল্লুকের পাল
প্রলয়ের শেষে দেখা হবে।

ভালোবাসা

ভালোবাসা নয় স্তনের ওপরে দাঁত ?
ভালোবাসা শুধু শ্রাবণের হা-হুতাশ ?
ভালোবাসা বুঝি হৃদয় সমীপে আঁচ ?
ভালোবাসা মানে রক্ত চেটেছে বাঘ !

ভালোবাসা ছিল ঝর্নার পাশে একা
সেতু নেই তবু অক্লেশে পারাপার
ভালেসবাসা ছিল সোনালি ফসলে হাওয়া
ভালোবাসা ছিল ট্রেন লাইনের রোদ।

শরীর ফুরোয় ঘামে ভেসে যায় বুক
অপর বাহুতে মাথা রেখে আসে ঘুম
ঘুমের ভিতরে বারবার বলি আমি
ভালোবাসাকেই ভালোবাসা দিয়ে যাবো।

তুমি আমি

গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে থাকে
তুমি আমি জমি কিনি, রবিবারে রুই মাছের মুড়ো
এসব দোষের নয়, আত্মসুখ কে না চায়, বলো ?
যেখানেই যাও তুমি, গরীব ও ভিখিরির বড় আবর্জনা

তুমি আমি চলে যাই সমুদ্রে বা পাহাড়ে হুল্লোড়ে
গরীব কোথায় নেই, গরীবেরা বীজাণুর মতো
মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয়, মনে হয় কিছু করা যাক
তুমি আমি সভা করি, সমবেত মিছিলে গর্জাই
বিমানেরর পেটে ঢুকে রাজধানী যাওয়া-আসা করি।
গরীবের জীবনের দাম আছে, এ রকম সার সত্য বলে
নিজের জীবন বীমা মাসে মাসে সুরক্ষিত থাকে।
গরীবের কথা ভেবে মনে পড়ে তোমার আমার
চেয়ে আরও কত বেশি ধনীরা রয়েছে কেন, কেন ?
আরও গায়ে জ্বালা ধরে গরীবের জন্য দুঃখ বাড়ে
গরীবের নাম নিয়ে মদের টেবিলে ওঠে ঝড়।
গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে মরে
যেমন আপন মনে বহুকাল এমনই মরেছে
তুমি আমি কষ্ট পাই, কবিতার খুব রেগে উঠি।

প্রাণের প্রহরী

কা ব্য না ট ক

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। সাহেব পাড়ায়। সন্ধের পর এ অঞ্চল নিঝুম হয়ে আসে। চেম্বারটি বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার ছাড়াও একটি কালো রেক্সিনে মোড়া গদির বিছানা। সেখানে দু'জন বয়স্ক যুবক বসে আছে। এদের নাম প্রতীক ও সংবরণ।

ডাক্তারের দশাসই চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। তাঁর নাম হৃষীকেশ। সবাই ঋষি বলে ডাকে। তিনি একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, অনেকটা নাটুকে ধরনের। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রৌঢ় চেহারার শিশু।

দূর থেকে ডাক্তারের গলার আওয়াজ শোনা যায় : ব্যাপারটা কী ? ব্যাপারটা কী ? ব্যাপারটা কী ?]

প্রতীক : ঐ আসছে ঋষি, সারা পাড়াটা কাঁপিয়ে
সংবরণ : সারাদিন এত খাটনি, তবু ওকে ক্লান্ত হতে দেখি না কখনো!
ডাক্তার : ব্যাপারটা কী হে! এত চুপচাপ
বসে আছো কেন ? দূর থেকে ভাবলাম
কেউ নেই, আলো জ্বলছে, যেন বাগানের মধ্যে একটা ঘর।

কী রে সংবরণ, কী যেন ভাবছিস মনে মনে ?

প্রতীক : চুপচাপ থাকবো না কি, নাচানাচি
করবো দু'জনে ?

সংবরণ : আর ঠিক পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর
কেটে পড়তাম ।

ডাক্তার : আরে বোস্ বোস্, এত রাগারাগি কেন,
আমি একা বহুক্ষণ এখানে ছিলাম । এসময়
কোনো সুস্থ মানুষের দেখা পেতে খুব
মন চায় । সারাদিন রুগী আর রুগী !
কটা বাজলো ?

প্রতীক : সাড়ে আটটা, না, না, তার পাঁচ মিনিট কম

ডাক্তার : যথেষ্ট হয়েছে ! আজ রুগী দেখা এখানে খতম ?
কানাই, কানাই, কেউ এলে বলবি, আটটার পর
সব অসুখের ছুটি । আমি নেই, দরজা বন্ধ কর,
এখন আনন্দ হবে, ফুর্তি হবে····
কে ওখানে ?

সংবরণ : কেউ না তো ?

ডাক্তার : মনে হলো একটা ছায়া

সংবরণ : কিছু নেই

ডাক্তার : ওফ্, এক পার্শী মহিলাকে দেখে আসছি এই মাত্র,
মাগীর অসুখ নেই কোনো

সংবরণ : ল্যাঙ্গোয়েজ ! ল্যাঙ্গোয়েজ !

ডাক্তারা : যত বলি, মা-জননী, তোমার তো অসুখ কিচ্ছু না !
তবু ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে বলে, ঠিকমতো ওষুধ দিচ্ছো না !
এখানে সেখানে ব্যথা, প্রতিদিন ঘুম যাচ্ছে কমে,
বড়লোক, টাকার বাণ্ডিল, ঘুম হয় টাকার গরমে ?
প্রেসার নর্মাল, স্টুল, ইউরিন, কিংবা রক্তে চিনি,
সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা হলো, স্বাভাবিক । তবু
প্রতিদিনই
ডাক পড়ে

প্রতীক : আহ্ ঋষি, রাত্তির অনেক হলো, আমরা এখনো
পেচ্ছাপ বাহ্যির কথা শুনবো ? এর মানে হয় কোনো ?

ডাক্তার : না, না, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আমারই সবচেয়ে বেশি । কে ওখানে ?

সংবরণ : কেউ না তো ?
ডাক্তার : মনে হলো, ঠিক যেন কোনো
মেয়ে, বার-বার ভুল হচ্ছে কেন এরকম ?
প্রতীক : টাকার ধান্দায় এত পরিশ্রম !
এরপর চোখে সর্ষেফুল দেখবে তুমি, ঋষি !
ডাক্তার : (নিচু গলায়, আগেকার ভাষায় যাকে বলা হতো
'জনান্তিকে' । অর্থাৎ তাঁর এ-কথাটা অন্য কেউ শুনতে
পাবে না)
না, সে রকম নয় । ঠিক বাবলুর অসুখের পর
একটি নারীর ছায়া দেখতে পাই ক'দিন অন্তর
চুপ করে দরজার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়
আবার চোখের এক পলক ফেলার আগে চলে যায়
আমি তো চিনি না, ওকে ?
প্রতীক : মেয়েটি কেমন দেখতে ?
ডাক্তার : (চমকে) কোন্ মেয়েটি ?
প্রতীক : ঐ যে পার্শী মেয়েছেলে, যার কথা তুমি বলছিলে !
ডাক্তার : অসুন্দর পার্শী আমি এ পর্যন্ত দেখিনি কখনো,
ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে যে শরীরে রোগ নেই কোনো
তবুও অসুখ থাকে সেখানেও । এই যে মহিলাটি,
রোগ নেই, তবু তিনি অসুস্থ যে সে কথাও খাঁটি !
সংবরণ : তোমাদের প্রচণ্ড সুবিধে,
শুধু আমাদের যা কিছু দুর্ভোগ
যে অসুখ সারাতে পারো না, বলে দাও,
'ওটা মানসিক রোগ !'
ডাক্তার : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! সকলেরই খুব রাগ ডাক্তারের প্রতি,
অথচ ডাক্তার ছাড়া চলেও না, কিছু হলে কাকুতি মিনতি !
অন্যান্য সময়ে দূর শালা ! মনের অসুখ চিনে নিতে
ভুল তো হতেই পারে । ইচ্ছে আছে মনটাকে ল্যাবরেটরিতে
একদিন ঠেসে ধরবো । পঞ্চভূত মানুষের দেহে
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু আর ব্যোম । অত্যন্ত সস্নেহে
শরীর এদের পোষে । এর মধ্যে পঞ্চমটি বাদে
বাকি চারিটিকে ঢের নেড়েচেড়ে দেখা গেছে, কিন্তু গোল বাধে
অদ্ভুত জিনিসটি নিয়ে, ঐ ব্যোম, অর্থাৎ শূন্যতা
তার কোনো দিশা নেই, কোনো শাস্ত্রে নেই তার কথা ।

সংবরণ : এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে, তা পড়োনি বুঝি ?
তা পড়বে কেন ? ডাক্তারেরা বই-টই পড়ে না। শুধু মাত্র রুজি
রোজগারের ধান্দাতেই মত্ত

ডাক্তার : বাজে কথা বলো না হে ! প্রতিদিন দশ কি বারোটি
গ্রন্থপাঠ করি আমি। মানুষের নোখ থেকে মাথার করোটি,
হাড় মজ্জা রক্তের জীবন, এর চেয়ে বড় গ্রন্থ আছে ?

প্রতীক : এ সমস্ত শস্তা দার্শনিকতা দিয়ে পেট ভরবে ভাই ?
ঢের হলো ! মাল কড়ি ছাড়ো কিছু মাল টাল খাই ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আছে খুব আমার নিজেরই। মন ভালো নেই।
দিতে হবে এক ডুব ফুর্তির সাগরে কিছুক্ষণ।
কে, কে ওখানে ?

প্রতীক : জ্বালানে দেখছি আজ ? থেকে থেকে বারবার কে, কে ?
ভুল হতে হতে তবু মানুষ তা খানিকটা শেখে ?
রাত্তিরে ঘুমোও না বুঝি ?

ডাক্তার : না, না, ভুল নয়, খুব স্পষ্ট চোখে দেখা
বাবলুর অসুখের পর থেকে
[নেপথ্যে একজন কেউ ডাকলো, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ! নদীতে
মাঝিরা যে রকম সুর করে জল মাপে, সেই রকম কণ্ঠস্বর।]

সংবরণ : ঐ তো এসেছে কেউ

প্রতীক : ফের কোনো রুগী-টুগী

সংবরণ : এ লোকটিই বহুক্ষণ থেকে আছে দরজার পাশে

ডাক্তার : না, না, এ সে নয়। একে জানি। চিনি এর গলার আওয়াজ
মাঝে মাঝে আসে। সাত দিন পর আবার এসেছে বুঝি আজ।
[আগন্তুকের প্রবেশ। বৃদ্ধ, মুখে সাতদিনের পাকা দাড়ি। একটা
রঙ জ্বলে যাওয়া নীল জামা গায়, সে আর কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না
করে শুধু ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে।]

আগন্তু : ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : কে, ধরণী ?
আবার এসেছো, তুমি এখনো মরোনি

আগন্তু : (সাগ্রহে) মরবো, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : মরার কি অন্য কোনো জায়গা পেলে না ?
আমার কাছেই বুঝি আছে শুধু দেনা ?

আগন্তু : মরবো, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : সাতদিন কোথা ছিলে ? ফের চাড়া দিয়ে উঠে এলে ?

আগন্তু : মরবো, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার : চুপ করো ! মরণের উচ্চারণ এখানে নিষেধ !

[ডাক্তার পকেট থেকে তিরিট চল্লিশটা টাকা বার করে দিলেন। লোকটি কোনো কৃতজ্ঞতা বা নমস্কার না জানিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।]

প্রতীক : কী ব্যাপার লোকটাকে দিলে এত টাকা ?
আমাদের ফুর্তির খোরাক সব ফাঁকা ?

সংকরণ : আগেও দেখেছি, তুমি ঐ বুড়োটাকে টাকা দাও, ব্ল্যাকমেল নাকি ?

ডাক্তার : ব্ল্যাকমেলই বটে ! এই বুড়ো লোকটি প্রাক্তন নাবিক,
ছিল জলে ভ্রাম্যমাণ। এখন ডাঙায় এসে দিক
হারিয়েছে। ও চেনে না শহরের বাঁধা পথ ; মাটির নিয়ম
ও জানে না। সংসারের বুদ্ধি ওর কম
ও বোঝে না নিজের সুবিধে
বাড়িতে পাঁচটি বাচ্চা, রোগা বউ, আর আছে খিদে
বেকারের খিদে পাওয়া বড় দোষ
বেকারের ছেলেদের খিদে পাওয়া আরও বেশি দোষ !

প্রতীক : আবার দুঃখের গপ্পো ! আজ শুধু অনন্ত ঝামেলা।

ডাক্তার : না, না, না, না ; এবারই তো শুরু হবে খেলা !

সংবরণ : ও বেকার, কিন্তু তুমি কেন দিতে যাবে ওর অন্ন ?
তুমি কি সমাজ ? নাকি রাষ্ট্র ? নাকি দাতাকর্ণ ?

ডাক্তার : সে সব কিছু না। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন চর্যায়
এরকম ফাঁক থাকে। ঐ লোকটা শূন্য হাতে বাড়ির দরজায়
যদি ফেরে, ঠিক পাখির ছানার মতো, পাঁচটি হাঁ করা মুখ
মেলে আছে, ওরা রোগী, এর নাম খিদের অসুখ !
ও তো পয়সা চায় না,
বিষ চায় ! দু' তিনবার ওর বাড়ি গেছি।
যা দেখেছি,
মনে হয়, এতকাল বইপত্রে যা কিছু শিখেছি
সেখানে উত্তর নেই এসবের।
এ পর্যন্ত খিদের ওষুধ বেরিয়েছে ? তবে ?
নাকি বিষ দেবো ?
আমি তো ডাক্তার, কিছু দিতে হবে—

প্রতীক : ওসব বাতেলা ছাড়ো, মাল আনো

মালের উৎসবে
বুঁদ হয়ে থাকি। তুমি অতি বুদ্ধু তাই এখনো উত্তর
চাও, এখনো বিবেক নিয়ে প্যানপান, ধুত্তোর

ডাক্তার : কানাই, নিয়ায়, আজ ফুর্তি করি,
মন ভালো নেই
আমার নিজের ছেলে হাসপাতালে

সংবরণ : এমন ফুটফুটে ছেলে, তার কিছু হতেই পারে না

ডাক্তার : সুইডেন থেকে তার জন্য কিছু অ্যামপিউল, কেনা
বিশেষ দরকার

প্রতীক : 'মাই সান, মাই এক্সিকিউশানার'

ডাক্তার : (চমকে) তার মানে ?

প্রতীক : 'ওরে পুত্র, জল্লাদ আমার',

ডাক্তার : কার পুত্র ? কে জল্লাদ ?

প্রতীক : প্রত্যেক পিতার পুত্র, পিতার জল্লাদ
এক ছোকরা এই নিয়ে লিখেছে কবিতা।
দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু, দিনে দিনে বড় হয় ছেলে
আর তুমি, তার পিতা ততই মৃত্যুর দিকে যাও তুমি হেলে !

ডাক্তার : এক্ষেত্রে আমিই বুঝি পুত্র হন্তা, সেই বুঝি ভালো...
মাত্র ন'বছর, এর মধ্যে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়ালো।
এ কি প্রতিশোধ ?
আমি বহুবার বহু বাড়ি থেকে
মৃত্যুকে ফেরাই।
তাই মৃত্যু এবার কি জাল ফেলে ছেঁকে
আমারই সংসারে দেবে থাবা ?

সংবরণ : কী রকম আছে বাবলু ?

ডাক্তার : যখন ঘুমন্ত থাকে, ভালো থাকে,
হাসে, কথা বলে,
সত্যিই ঘুমের মধ্যে হাসে কথা বলে। যখনই সে জেগে ওঠে,
অসহ্য যন্ত্রণা,
যেন কাকে দ্যাখে
ক্যাবিনের বাইরে, কেউ নেই তবু দ্যাখে

সংবরণ : কী ঠিক অসুখ ওর ?

ডাক্তার : নেফ্রটিক সিনড্রম। ঠিক বুঝবে না তোমরা,
দুটি কিডনিতেই অজানা অসুখ

সংবরণ : অজানা অসুখ ?

ডাক্তার : আশ্চর্য হলে কি ? শুধু মন নয়,
মনুষ্য শরীরে
এখনো অচেনা কিছু রয়ে গেছে

প্রতীক : বিশ্বাস করি না ! তুমি চিকিৎসা ছেড়ে মন্ত্র নাও

সংবরণ : কিডনির অসুখ ? আজকাল প্রায়ই শুনি
মাদ্রাজে ভেলোরে,
চমৎকার সেরে যায় সব…

প্রতীক : আরও একটু সরে
হোয়াইট ফিল্ড গ্রামে যাও, ছাই ভস্ম,
হাওয়া থেকে ফুল...

ডাক্তার : ও সমস্ত কথা থাক, এসো খাই

সংবরণ : ঋষি, তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছো

ডাক্তার : হয়তো বাঁচানো যায়, আজ থেকে মাস দেড়েক আগে
ডাক্তার লোম্যান নামে একজন সেন্ট পিটার্সবার্গে
পরীক্ষা চালিয়েছেন বাঁধা-মৃত্যু দশজন রোগীর শরীরে
নতুন ওষুধ কিংবা বিষ—ফল হলো ঠিক যেন মেঘ চিরে
হঠাৎ বিদ্যুৎ কিংবা বজ্রপাত কিংবা আশীর্বাদ,

পাঁচজন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি !

সংবরণ : পাঁচজন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি ?
এ যে সাঙ্ঘাতিক
এ কি সার্থকতা নাকি ব্যর্থতারই আর এক দিক

ডাক্তার : যাক আর ঐ কথা নয়। ভুলে থাকতে চাই
ফুর্তি হোক। শালা মরণের মুখে ছাই
দাও, তুড়ি মারো, এই তো এসেছে, গ্লাসে ঢালা
কে ওখানে ?
কে ওখানে ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাসপাতাল, ক্যাবিনের মধ্যে খাটে ঘুমিয়ে আছে বাবলু। ন' দশ বছর বয়েস। তাকে ঘিরে চার-পাঁচজন ডাক্তার। সকলের মুখ মেঘলা, ঋষি তাঁর অধ্যাপক এক প্রবীণ ডাক্তারকে শেষবার অনুরোধ করলেন :]

ঋষি : স্যার, নতুন ওষুধ এইমাত্র আমি নিজে
সব ঝুঁকি নিয়ে ভেবেচিন্তে ভরেছি সিরিঞ্জে,
আপনি দিন

স্যার : ঋষি, তুমি ক্ষমা করো, আমাকে বলো না
বুড়ো হয়ে গেছি, আজকাল হাত কাঁপে

ঋষি : স্যার, কে না জানে আজও কলকাতা কিংবা
সারাদেশে আপনার তুল্য চিকিৎসক বেশি নেই

স্যার : তবু তুমি ক্ষমা করো এই বৃদ্ধটিকে !
যে ওষুধ পরীক্ষিত নয়, জেনেশুনে তা আমি কী করে
দিই ?
তোমার সন্তান সে যে আমারও অনেক আদরের।
ওকে আমি কী করে অজানা পথে নিয়ে যাবো, বলো ?

ঋষি : (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) ডক্টর লাহিড়ী, আমি
আপনাকে যদি

লাহিড় : না, না, ঋষি ক্ষমা করো

ঋষি : ডাক্তার সামন্ত ? আপনিও ভয় পেয়ে

সামন্ত : ভয় নয়, ঋষি, এ যে অর্ধেক হত্যার
ঝুঁকি নেওয়া

ঋষি : অর্ধেক জীবন ? তার ঝুঁকি নেওয়া যায় না ?
ঠিক আছে। তা হলে আমিই নিজে পুত্রাঘাতী হবো,
নিজ হাতে এই বিষ আমি ওর শরীরে মেশাবো।
আপনারা সবাই বাইরে যান তবে
[ঘর খালি। ঋষি ছেলেকে ডাকলেন]

ঋষি : বাবলু, বাবলু, ঘুম থেকে উঠে আয়, আমরা
দু'জনে ফের ভোরবেলা বাগানে বেড়াবো

বাবলু : বাবা—

ঋষি : বাবলু, বাবলু

বাবলু : বাবা, তুমি কত দূরে ?
ঋষি : এই তো এখানে আমি, শিয়রের কাছে
বাবলু : ভীষণ যন্ত্রণা ! বাবা তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও,
আমাকে অনেক দূরে এমন কোথাও
যেখানে একটুও ব্যথা নেই—
ঋষি : এই দ্যাখ, আমার ডান হাতে ছুরি, আমি
চোখের নিমেষে
তোকে নিয়ে যাবো সব যন্ত্রণার শেষে
এক শান্ত অন্য দেশে
বাবলু : খুলতে পারি না চোখ, এত ব্যথা,
কেন এত ব্যথা ?
ঋষি : চোখ যে খুলতেই হবে, অন্ধকারে কী করে না
দেখে
যাবি সেই অন্য দেশে ?
বাবলু : ছুরি নেই ? এ যে ইঞ্জেকশান !
ঋষি : বাবলু, বাবলু, শোন,
খুব মন দিয়ে তুই শোন,
সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়তো উঠবি বেঁচে, কিংবা চলে যাবি পরপারে
যদি পরপার বলে কিছু থাকে, সেখানে আমাকে দোষ দিস, ভেবে
নিস, বাবা তোকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়
পাঠিয়েছে সেইখানে। আর যদি কোনোক্রমে বেঁচে
উঠিস তা হলে সেটা তোরই নিজের জয়।
বাবলু : বাবা, তুমি সব যন্ত্রণার শেষ করে দাও
ঋষি : দেবো, তাই দেবো, তোর মা আমাকে মাথার
দিব্যিতে
নিষেধ করেছে, বুঝি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে।
আত্মীয়-বন্ধুরা, চিকিৎসক, কেউ রাজি নয়
তুই রাজি ? তুই ছেলেবেলা থেকে দারুণ সাহসী
বাবলু : আমি রাজি। আমাকে ওষুধ দাও, কিংবা বিষ
ঋষি : তাই হোক। চোখ চেয়ে থাক্
[মৃত্যুর প্রবেশ। মহাভারতের বর্ণনার মতন অনেকটা তার রূপ। সে একটি নারী। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। নতুন তামার বাসনের মতন গাত্রবর্ণ। পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের মতন কোঁকড়ানো

চুল। তার চোখে জল]

মৃত্যু : একটু দাঁড়াও ঋষি। কথা আছে

ঋষি : কে তুমি ?

মৃত্যু : চেয়ে দেখো। খুব কি অচেনা লাগে ? বহুবার দেখা
হয়েছে তোমার সঙ্গে

ঋষি : তুমি নেই ? খরা মাঠে বিমানের ছায়ার মতন
চকিত মিলিয়ে যাও

মৃত্যু : বারবার ফিরে আসি

ঋষি : আমাকে না দেখে বুঝি মন কাঁদে ? এমন প্রণয় ?
আপাতত বাইরে যাও

মৃত্যু : আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী
আমি তমসার মধ্য দিয়ে ওর হাত ধরে
নিয়ে যাবো

ঋষি : তুমি এই ছেলেটিকে জননীর কোল থেকে ছিঁড়ে
নিয়ে যেতে চাও

মৃত্যু : আমি এই শিশুটিকে কালের সীমানা ভেঙে শুধু
অসীমে পাঠাবো, দাও...

ঋষি : ওর মা'র স্নেহ, আর আমার বুকের ভালোবাসা
তাও কি অসীম নয় ? পৃথিবীর এই মায়াপাশ
যদি ছিন্ন করো বারবার, তবে কেন তা বেছাও ?

মৃত্যু : ঋষি, তুমি দেখেছো অনেক মৃত্যু, শুভ ও অশুভ
তবু কেন অস্থিরতা ? সব মিথ্যে আমি শুধু ধ্রুব

ঋষি : তুমি অহংকারী, তবু তোমার দু' চোখে
কেন জল ? তোমার কি চক্ষু রোগ ?

মৃত্যু : আমার হৃদয় নেই, তবু আমি দুঃখী।
আমি একা।
আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, তবু আমি নিত্য ভ্রাম্যমাণা,
অনধিকারিণী আমি, অথচ আমিই হাত পাতি

বাবলু : বাবা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো ?

ঋষি : কেউ না, বাবলু সোনা ! নিছক মনের ভুল,
ছায়া।

বাবলু : বাবা, তুমি সব ব্যথা শেষ করে দাও

ঋষি : এই তো এক্ষুনি দিচ্ছি, দেখি ডান হাত

মৃত্যু : ঋষি, থামো
ঋষি : আঃ, বিরক্ত করো না, যাও
মৃত্যু : ঋষি, তুমি হেরে যাবে
ঋষি : যাই যাবো। তবু আমি কোনোদিন না লড়ে
ছাড়িনি
তুমি নয়, মৃত্যু নয়, জীবনের কাছে আমি ঋণী!
তুমি নারী, তুমি সরো, যমরূপী পুরুষ পাঠাও
যার সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তুমি যাও।
মৃত্যু : শোনো ঋষি, কেন এই চঞ্চলতা, এখনো দু' মাস
দিতে পারি ওর আয়ু, এখনো রয়েছে ওর শ্বাস,
কেন তা থামাবে তুমি? এই পৃথিবীর রূপ রস
আরও কিছুদিন ওর প্রাপ্য, ওর নবীন বয়স
দ্বিগুণ শক্তিতে সব নিতে পারে, ততটুকু নিক
আমি ওকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখবো জননী অধিক!
ঋষি : কে চায় তোমার কৃপা? আমি আছি প্রাণের প্রহরী।
শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে লড়ে যাই, মুষ্টি মধ্যে ভ্রমরকে ধরি।
এই যে তরল বিষ, এর মধ্যে অর্ধেক জীবন,
অথবা অর্ধেক মৃত্যু, দেখি আমি এর মধ্যে কোন্
অর্ধাংশটি জিতে যায়, আমি আছি জীবনের দিকে
—তোমার সন্তান নেই, রাক্ষসিনী, তাই তুমি এই শিশুটিকে
নিয়ে জয়ী হতে চাও?
রাক্ষসিনী, রাক্ষসিনী!
মৃত্যু : ঋষি, শান্ত হও
বাবলু : বাবা, বড় ব্যথা, তুমি ব্যথা শেষ করে দাও
ঋষি : দেবো রে, বাবলু সোনা, দেখি ডান হাত
মৃত্যু : ঋষি, শোনো
ঋষি : চুপ!
[ঋষি ইঞ্জেকশানের সূচ ছুরির ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন বাবলুর হাতে। বাবলু দু'বার বাবা বলে ডেকেই থেমে গেল হঠাৎ। তার গলায় সেতারের তার ছেঁড়ার মতন শেষ শব্দ হলো। ঋষি সে দিকে একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে সিরিঞ্জটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।]
মৃত্যু : ঋষি, তুমি হেরে গেলে
ঋষি : (শান্ত ভাবে) জানি। ওর ব্যথা শেষ হয়ে
গেছে

মৃত্যু : আগেই বলেছি হেরে যাবে

ঋষি : খেলতে এসেছি তাই আমি জানি খেলার নিয়ম,
হারজিৎ আছে। শুধু তুমি আর তোমাদের যম
কখনো হারো না, শুধু জয় নিয়ে দারুণ উল্লাস।
এবার তো সুখী হলে ? নিয়ে যাও শিশুটির লাশ।
আমার প্রাণের টুকরো এই শিশু

মৃত্যু : সুখী নই, সুখী নই
যতবার জিতে যাই, ততবার মনে মনে হারি
অনন্ত কালের মধ্যে
আমি এক সুখ-শূন্য নারী।
এই হাত দুঃখ দিয়ে গড়া, চোখ দুঃখের সমাধি
এসো ঋষি, তুমি আমি দু'জনেই একসঙ্গে কাঁদি।

এর পর ঋষি ও মৃত্যু দু'জনে বাবলুর দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কেউই চোখের জল ফেলে কাঁদে না। তারপর মৃত্যু হাত বাড়িয়ে বাবলুকে ছুঁতেই ঋষি মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন যবনিকা নামে।

[এই কাব্য নাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে হবে। এবং দক্ষিণা স্বরূপ লেখককে দিতে হবে অন্তত একটি নীল রঙের জামা কলারের সাইজ, আটত্রিশ।]
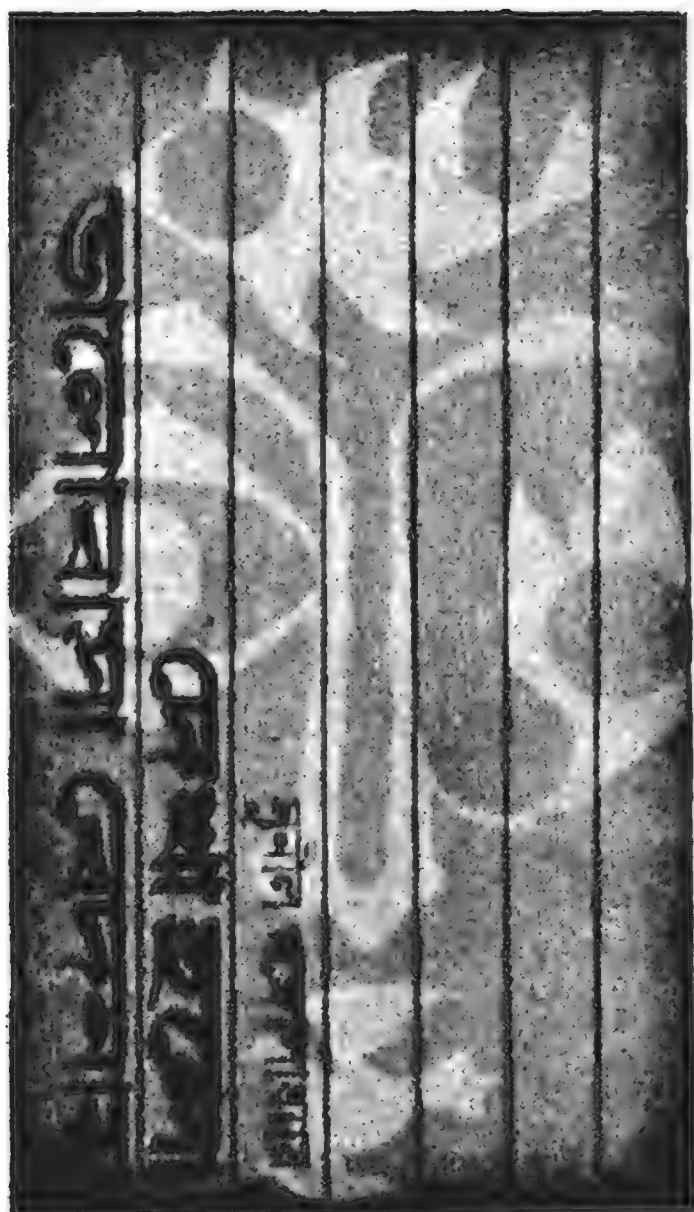
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়

সূচিপত্র

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

শব্দ মোহ বন্ধনে কবে প্রথম ধরা পড়েছিলুম আজ মনে নেই
কোনো এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের পাশে
অকস্মাৎ দেখা যেন ঠিক আর এক স্রোত
সমস্ত ধ্বনির পাশাপাশি অন্য এক ধ্বনি
জীবন যাপনের পাশাপাশি এক অদেখা জীবন যাপন…
এক একদিন মনে হয়, প্রত্যেক পথেরই বুকের মধ্যে রয়েছে
দিক-হারাবার ব্যাকুলতা
চেনা বাড়ির রাস্তা দুঃখে কাতরায় নিরুদ্দেশের জন্য
প্রত্যেক স্বপ্নের ভিতরে আর একটি স্বপ্ন, তার ভিতরে, তার
ভিতরে, তার ভিতরে…

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বালাকাল ছেড়ে একদিন এসেছি কৈশোরে
বাবার হাত শক্ত করে চেয়ে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট ছোট স্টিমারের মতো ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে
ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক
তার সঙ্গে মিশে গেল হ্রেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস…

তারপর
একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন,

আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর
তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি⋯

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
ছেলেভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙিন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
সারবন্দী জাহাজ
ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেণ্ডারে ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দিঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দু'মাসে একবার মামা-বাড়িতে বেড়াতে যাবার উৎসব⋯
ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশি রাতে দেখা অজস্র ফুটপাথের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
প্রাণখোলা বুককাঁপানো হাসি
চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন
দশকর্ম ভাণ্ডারের পাশেগাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না

কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
স্তন্য দেয় সেখানে
এইসব দেখে, শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
এক জোড়া বিসদৃশ ঠ্যাঙ
গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে
ছিপি খেলছিলাম…

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর সুদূর শহর
গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে
জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভাবে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চাইনি
এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া
শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থলপদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিঁপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কচি অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা
অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
নাকিসুর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে
আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধলেবুর বাগানে শিশিরপাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দিঘির জলে একা একা চাঁদের

অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলায়
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে একদিন সব নৈঃশব্দ খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে
জেগে উঠতো নিশির ডাক :
সস্তা না মূল ? সস্তা না মূল...

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশগঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালী পীরিচ
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যে-রকম জলস্তম্ভ ভাঙে
কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সুরকি, ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে
যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জ্বলছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল সেখানে কান্নার শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশি
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ
আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
মাথা তুলেছি আকাশের দিকে
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন

সমতল

আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়
আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস-বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর !
আমরা ধূসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ
আমরা ঠনঠননের রাস্তায় হাঁটু-সমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুলচোর
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত, বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো, বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত
ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুঙ্কার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল
উত্থান ।

যারা অপমান দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেছে পথের বাঁকে, তারা
হয়তো ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি
স্মৃতির মধ্যে ঢুকেছিল বীজ, একদিন তা মহীরুহ হয়েছে
সমস্ত গভীরতার চেয়ে গভীর পাতালতম প্রদেশে তার শিকড়
সমস্ত উচ্চতার চেয়ে উঁচুতে অভ্রংলিহ তার শিখর
তার হিরণ্য ডালপালায় বসেছে এক পাখি যার হীরে কুচি চোখ
বহুদিনের অতীত ভেদ করে সে বলেছে, প্রতীক্ষায় আছি
আমার সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগে, কার জন্য প্রতীক্ষা ?
কিসের জন্য প্রতীক্ষা ?
আমি বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকাই, আকাশকে মনে হয়
বারুদখানা
আমি বৃষ্টির মধ্যে সরু হয়ে হেঁটে যাই, বৃষ্টিকে মনে হয়
তেজস্ক্রিয়
আমি জানলার গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার প্রাণ-প্রতিমাকে
প্রশ্ন করি, জানো, কার জন্য প্রতীক্ষা ?
কিসের প্রতীক্ষা ?
এ তো প্রতিশোধ নয়, প্রতিশোধের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক মনোরাজ্য
যার কামারশালায় বিচ্ছুরিত শব্দের ফুলকি সর্বক্ষণ
ঘিরে রাখে আমার
একলা সময়
আসলে আমার একাকিত্ব নেই, আমার নির্জনতা নেই, মুক্তি নেই
এক একদিন এই শহর স্তব্ধ হয়ে যায়
এক একদিন এই চোখে দেখা জগতে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়
সমস্ত জনপ্রাণী
সেই মাতৃগর্ভের মতন নিবাত নিষ্কম্প অস্তিত্বের মধ্যেও
জেগে থাকে আদিম শব্দ
সমস্ত জাগরণের পাশে সেই এক মহা জাগরণ
সমস্ত ধ্বনির চেয়ে সেই এক আলাদা ধ্বনি
তখন সমস্ত অন্ধকারের পাশে এসে দাঁড়ায়
এক অন্য অন্ধকার
স্পষ্ট চেনা যায় এক একবার, আবার চেনা যায় না
গভীর অতলের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ আঁকড়ে ধরি
ভাসমান তৃণ
এই নিমজ্জন ও ভেসে ওঠা, বারবার, যেন শরীরের মধ্যেই

শরীরকে খোঁজাখুঁজি

যেমন নারীর ভিতরে নারীকে, তার ভিতরে এক অন্য নারী, যেমন
স্তন ও কোমরের খাঁজে অন্য এক
রূপের চোখ ফাটানো বিভা,
তার ভিতরে অন্য এক, তার
ভিতরে, তার ভিতরে,
যেমন স্বপ্নের মধ্যে
স্বপ্ন...

এমনকি যেখানে সুন্দর অতি প্রথাসিদ্ধ, অরণ্যে বা পাহাড় চূড়ায়
যেখানে মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় মেতে থাকে মেঘ ও রৌদ্রের প্রভুরা
সেখানে সমস্ত আলোর পাশে উড়তে থাকে আরও একটি আলোর পর্দা
সমস্ত বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আসে আর একটি বৃক্ষ, তার
হিরণ্য ডালপালা নিয়ে
সেখানে বসে থাকে একটি পাখি, যার হীরে কুচি চোখ
অচেনাতম কণ্ঠস্বরে সে বলে ওঠে, মনে আছে ? প্রতীক্ষায় আছি !
তখনই শৃঙ্খলের মতন ঝনঝনিয়ে ওঠে নাদব্রহ্ম, তখনই
ছ' নম্বরের দিকে ব্যাকুলভাবে চায় পাঁচটি ইন্দ্রিয়
কার প্রতীক্ষা ? কিসের জন্য প্রতীক্ষা ? উত্তর পাই না
যদিও জানি, এই নীলিমার পরপারে নেই আর অন্য নীলিমা
মৃত্যুর ওপারে জীবন !

ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ছায়া, সমান দূরত্ব রেখে
যমজের মতো ছুটে যায়
অথবা হ্রদের পাশে খুব শান্তভাবে বসে থাকা, যেন দু'রকম জলের কিনারে
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়,দেখা হলো, দেখা হলো
রোদ্দুরের মধ্যে ওড়ে কার্পাস তুলোর বীজ,
এত মায়া, এত বেশি মায়া
সব কিছু এক জীবনের নর্ম সহচর, দেখা হলো, আরক্ত সন্ধ্যায়
দেখা হলো
দেখা হলো নারী ও নৈরাজ্য, কয়েক ফোঁটা ছন্নছাড়া কান্না বিন্দু
পড়ে রইলো ঘাসে
এদিকে ওদিকে জাগে আকস্মিক হাতছানি, যে-কোনো নদীর বাঁকে
চোখের ইশারা

দেখা হলো, পাথরের বুকে ঘুম, নদীর দর্পণে লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে
দেখা হলো
জননী-চুম্বক ছেড়ে আরও দূরে দেখা হলো নিভৃত শিল্পের বড়
মর্মভেদী টান
দেখা হলো, দেখা হলো, দেখা···

কবিতা লেখার চেয়ে

কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা লিখবো এই ভাবনা
আরও প্রিয় লাগে
ভোর থেকে টুকটাক কাজ সারি, যে ঘর ফাঁকা করে
সময়ে সুগন্ধ দিয়ে তৈরি হতে হবে
দরজায় পাহারা দেবে নিস্তব্ধতা, আকাশকে দিতে হবে
নারীর উরুর মসৃণতা, তারপর লেখা
হীরক-দ্যুতির মতো টেবিল আচ্ছন্ন করে বসে থাকে
কালো রং কবিতার খাতা
আমি শিস দিই, সিগারেট ঠোঁটে, দেশলাই খুঁজি
মনে ফুরফুরে হাওয়া, এবার কবিতা, একটি নতুন কবিতা···
তবু আমি কিছুই লিখি না
কলম গড়িয়ে যায়, ঝুপ করে শুয়ে পড়ি, প্রিয় চোখে
দেখি সাদা দেয়ালকে, কবিতার সুখস্বপ্ন
গাঢ় হয়ে আসে, মনে মনে বলি, লিখবো
লিখবো এত ব্যস্ততা কিসের
কেউ লেখা চাইলে বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, কাল দেবো, কাল দেবো
কাল ছোটে পরশু কিংবা তরশু কিংবা পরবর্তী সোমবারের দিকে
কেউ কেউ বাঁকা সুরে বলে ওঠে, আজকাল গল্প উপন্যাস
এত লিখছেন
কবিতা লেখার জন্য সময়ই পান না
বুঝি ? না ?
উত্তর না দিয়ে আমি জনান্তিকে মুখ মুচকে হাসি
ফাঁকা ঘরে, জানালার ওপারে দূর
নীলাকাশ থেকে আসে
প্রিয়তম হাওয়া

না-লেখা কবিতাগুলি আমার সর্বাঙ্গ
জড়িয়ে আদর করে, চলে যায়, ঘুরে ফিরে আসে
না হয়ে ওঠার চেয়ে, আধো ফোটা, ওরা খুনসুটি
খুব ভালোবাসে।

কথা ছিল না

টিলার মতন উঁচু বাড়ির শিখরতলায়
আমার বসতি হবার কথা ছিল না
আমার কথা ছিল না সংবাদপত্র অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে
চোখ গরম মানুষের ভিড়ে বসে থাকার
রাস্তায় চলতে চলতে কেউ আমার মুখের সামনে হঠাৎ
চট করে একটা আয়না তুলে ধরলে
আমি চমকে উঠি, ভয় পাই, এ কে ?
এমন গাম্ভীর্য, এমন ভুরুর ভাঁজ, কথা ছিল না,
কথা ছিল না!

হে জীবন, হে নদীতীরে গাছের তলায় শুয়ে থাকা জীবন,
হে জীবন, হে মেষপালকের সঙ্গীর অলস বাঁশীর সুরের জীবন,
হে দিনযাপন, হে সন্ধ্যার শ্মশানতলায় বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়,
হে অভিমান, হে চোখাচোখির নীরবতা—
হে চিঠি না পাওয়ার দুঃখ, হে শেষ রাত্রির গান,
হে সুন্দর, হে প্রথম নীরাকে ছোঁয়ার হৃৎস্পন্দন,
হে অলস দুপুরের নিঃসঙ্গতা,
তোমরা আমায় ভুলে গেলে ?
এ কোন্ কঠোর কপিশ জীবনে দিলে আমায় নির্বাসন !
হে ভূমধ্য সাগরের ভাসমান নাবিক, একটু থামো,
আমিও তোমার পাশে, একটু জায়গা দাও, তুলে নেব দাঁড়।

দুর্বোধ্য

মাত্র বারো তেরো বছর বয়েস ছেলেটার, বললো, ওর মা, বাবা
কেউ নেই। অথচ আমার আছে, আমি তো এই দুঃখ পাইনি,
মনে হলো, হয়তো কোনো ভাবে আমি ওকে বঞ্চনা করেছি।

কোথায় থাকিস ? জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে, সে বললো,
কোথাও না। কথা বলার সময় সে ঝকঝকে ভাবে হাসে।
পাশের একজন লোক বললো, ওর আবার থাকা না-থাকা
ও ছোঁড়া তো বারো হাটের কানাকড়ি !

এ তো নতুন কিছু খবর নয়, আকাশের নীচে কিংবা
গাছ পালার মৃদু প্রশ্রয়ে এখনো রয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমি
থাকি রীতিমত সৌখিন বাড়িতে, গৃহহীনদের কথা চিন্তা করে
আমার গৃহত্যাগ করার কোনো মানে আছে কি ?

চায়ের দোকানের দাম মিটিয়ে আমরা উঠে পড়লুম।
তারপর গাড়ি চললো দুর্দান্ত গতিতে, দু'পাশে
সজল সুন্দর প্রকৃতি, গ্রাম বাংলার বিখ্যাত সৌন্দর্য, এ সব
দেখে চোখ না-জুড়োনো অন্যায়।

তবু বারবার মাথার মধ্যে গুঞ্জরিত হয় এক প্রশ্ন ও
উত্তর :
তুই কোথায় থাকিস ?
কোথাও না !
কিন্তু একথা বলার সময়ও ছেলেটি হেসেছিল কেন ?

দীর্ঘ কবিতাটির খসড়া

এই পৃথিবীর সঙ্গে একটা আলাদা পৃথিবী মিশে রয়েছে
অরণ্যের সঙ্গে এক সমান্তরাল অরণ্য
দুপুরের নির্জনতার মধ্যে অন্য এক নির্জনতা
আমাকে চমকে দেয়, এক এক সময় দারুণ চমকে দেয়

ভালোবাসার মুখমণ্ডল ঘিরে আছে অন্য এক ভালোবাসা
দীর্ঘশ্বাসের পাশে এক দীর্ঘশ্বাস
কোনো দিন একলা বিকেল বেলা গিয়ে দিঘির পাড়ে বসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় রক্তবর্ণ আকাশ
তখনো ঠিক আর একটি দিঘির পাশে অসংখ্য তরঙ্গের
সম্রাট হয়ে একজন একলা মানুষের বসে থাকা—
একজন একলা মানুষ, জলের ইন্দ্রজালে সে দেখে সে একা নয়
সব দুঃখের হিম ঠাণ্ডা বিছানায় রয়েছে
আর একটি দ্বিতীয় দুঃখ
সমস্ত মসৃণ রাস্তার শিয়রে লক লক করে
আর এক ভুলে যাওয়া নিরুদ্দেশের পথ
আমাকে চমকে দেয়, এক এক সময় দারুণ চমকে দেয়…

এই জীবন

বাঁচতে হবে বাঁচার   মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক

আমি কিছুই ছাড়বো না, এই রোদ ও বৃষ্টি
আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন
শুধু যা নয় নিছক অন্ন
আমার চাই সব লাবণ্য

নইলে গোটা দুনিয়া খাবো !
আমাকে কেউ গ্রামে গঞ্জে ভিখারী করে
পালিয়ে যাবে ?
আমায় কেউ নিলাম করবে সুতো কলে,
কামারশালায় ?
আমি কিছুই ছাড়বো না আর, এখন আমার
অন্য খেলা
পদ্মপাতায় ফড়িং যেমন আপনমনে খেলায় মাতে
গোটা জীবন

মানুষ সেজে আসা হলো,
মানুষ হয়েই ফিরে যাবো
বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক।

নিজের কানে কানে

এক এক সময় মনে হয়, বেঁচে থেকে আর লাভ নেই
এক এক সময় মনে হয়
পৃথিবীটাকে দেখে যাবো শেষ পর্যন্ত!
এক এক সময় মানুষের ওপর রেগে উঠি
অথচ ভালোবাসা তো কারুকে দিতে হবে
জন্তু-জানোয়ার গাছপালাদের আমি ওসব
দিতে পারি না
এক এক সময় ইচ্ছে হয়
সব কিছু ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে ফেলি
আবার কোনো বিরল মুহূর্তে
ইচ্ছে হয় কিছু একটা তৈরি করে গেলে মন্দ হয় না।
হঠাৎ কখনো দেখতে পাই সহস্র চোখ মেলে
তাকিয়ে আছে সুন্দর
কেউ যেন ডেকে বলছে, এসো, এসো,
কতক্ষণ ধরে বসে আছি তোমার জন্য
মনে পড়ে বন্ধুদের মুখ, যারা শত্রু হতেও তো পারতো
মনে পড়ে হালকা শত্রুদের, যারাও হয়তো কখনো
আবার বন্ধু হবে
নদীর কিনারে গিয়ে মনে পড়ে নদীর চেয়েও উত্তাল সুগভীর নারীকে
সন্ধের আকাশ কী অকপট, বাতাসে কোনো মিথ্যে নেই,
তখন খুব আস্তে, ফিসফিস করে, প্রায়
নিজেরই কানে কানে বলি,
একটা মানুষ-জন্ম পাওয়া গেল, নেহাৎ অ-জটিল কাটলো না!

দুঃখ

এক সময় দুঃখের কথা দুঃখের সুরে বলতাম
তখন দুঃখকে চিনতাম না
কিংবা দুঃখ ছিল না তখন, আকস্মিক
বৃষ্টিতে দুলতো বিষাদের পাতলা পর্দা
পৌনে তিনশো মাইল দূরে ছুটে গেছে দীর্ঘশ্বাস
অসংখ্য নীলখাম জঠরে নিয়ে গেছে
দুপুরবেলার অভিমান
ছেঁড়া চটি পায়ে দিন রাত ঘুরে ঘুরে
সঙ্গে বহন করতাম খালি পকেটের মতন
খুনখারাপ
হিরণ্ময় ভোরবেলাগুলির গায়ে লেগে থাকতো
হৃদয়-শোণিত
সুখী ছিলাম, সুখী ছিলাম, ভীষণ সুখী ছিলাম না ?

এখন কেউ এসে আমাকে দেখুক
আমার পরিচ্ছন্ন মুখ, আমার মসৃণ জীবন যাপন
চায়ের কাপের পাশে সিগারেট সমৃদ্ধ হাত
নিশীথ যবনিকা তছনছ করা সৌখিন দাপাদাপি
যে-কেউ দেখে ভাববে, আমি দুঃখকে চিনিই না।

দ্বিখণ্ডিত

লঙ্গরখানায় একবার আমি তুলে নিই পরিবেশনের হাতা
পরেরবার আমিও বসে পড়ি ওদের সঙ্গে
আমিই ভিখারী ও অন্নদাতা
আমিই বহিরাগত ও মাটির মানুষ
পদ্মপাতায় গরম গরম খিচুড়ি, আমার পেটে জ্বলছে বহুকালের খিদে
মাথার ওপরে হিঙ্গলগঞ্জের বিষণ্ন মেঘলা আকাশ
আমার ডান হাত ও বাঁ হাত দুটিই ব্যস্ত
খাওয়া ও মাছি তাড়ানোয়
তৃতীয় হাতা খিচুড়ির জন্য আমার জিভে জল পড়ে

এর আগে আমি নিজেই দু'হাতার বেশী কারুকে দিইনি
আমি ভিখারীগুলির উওদ্দশ্যে বলি, এই চোপ্, চোপ !
পরমুহূর্তেই স্বেচ্ছাসেবীদের বলি, শালা !
তারপর বাতাস, আঁশটে গন্ধ ও দিগন্তবিস্তৃত জলের
কিনারায় দাঁড়িয়ে
আমি মনুষ্যজন্ম শেষ করে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই।

ইচ্ছে হয়

এমনভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারী হয়ে মিশে যাওয়া ?
এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে একজীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা ?
রূপের মধ্যে মানুষ আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
রঙের ধাঁধাঁ খুঁজতে খুঁজতে টনটনায় চক্ষু স্নায়ু।
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছে বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল ছেঁড়ার নেশা
নদীর জল সাগরে যায়, সাগর জল আকাশে মেশে
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার
মুঠোয় ফেরা !

কথা আছে

বহুক্ষণ মুখোমুখি চুপচাপ, একবার চোখ তুলে সেতু
আবার আলাদা দৃষ্টি, টেবিলে রয়েছে শুয়ে
পুরনো পত্রিকা
প্যাণ্টের নীচে চটি, ওপাশে শাড়ির পাড়ে
দুটি পা-ই ঢাকা
এপাশে বোতাম খোলা বুক, একদিন না-কামানো দাড়ি
ওপাশের এলো খোঁপা, ব্লাউজের নীচে কিছু
মসৃণ নগ্নতা
বাইরে পায়ের শব্দ, দূরে কাছে কারা যায়

কারা ফিরে আসে
বাতাস আসেনি আজ, রোদ গেছে বিদেশ ভ্রমণে।

আপাতত প্রকৃতির অনুকারী ওরা দুই মানুষ-মানুষী
দু'খানি চেয়ারে স্তব্ধ, একজন জ্বালে সিগারেট
অন্যজন ঠোঁট থেকে হাসিটুকু মুছেও মোছে না
আঙুলে চিকচিকে আংটি, চুলের একটু ঘাম
ফের চোখ তুলে কিছু স্তব্ধতার বিনিময়,
সময় ভিখারী হয়ে ঘোরে
অথচ সময়ই জানে, কথা আছে, ঢের কথা আছে।

নেই

খড়ের চালায় লাউ ডগা, ওতে কার প্রিয় সাধ লেগে আছে
জলের অনেক নীচে তুলসীমঞ্চ, সেইখানে ছোঁয়া ছিল অনেক প্রণাম
রান্নাঘরটিতে ছিল কিছু ক্ষুধা, কিছু স্নেহ, কিছু দুর্দিনের খুদকুঁড়ো
উঠোনে কয়েকটি পায়ে দাপাদাপি, দু'খুঁটিতে টান করা ছেঁড়া ডুরে শাড়ি
পাশেই গোয়ালঘর, ঠিক ঠাকুমার মতো সহ্যশীলা নীরব গাভীটি
তাকে ছায়া দিত এক প্রাচীন জামরুল বৃক্ষ, যার ফল খেয়ে যেত পোকা
পটের ছবির মতো চুরি করা মাছ মুখে বিড়ালের পালানো দুপুর
সবই যেন দেখা যায়, অথচ কিছুই নেই, চতুর্দিকে জলের কল্লোল
এখন রাত্রির মতো দিন আর রাতগুলি আরও বেশি অতিকায় রাত
জননী মাটির কাছে মানুষের বুক ছিল, মাটিকে ভাসিয়ে গেছে মাটির দেবতা।

যাত্রাপথ

একটু আধটু বিপদ ছিল পথের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো
তার মধ্যে যাত্রা এবং দুই আঙুলে অনেক দিনের ব্যথা
পকেট ভরা নাম ঠিকানা, এবং তারা সবাই নির্বাসিত
তবু কোথাও যেতে হবে, বেলা শেষের আগেই যাওয়ার কথা।

যেদিন খুব তাড়া আমার, সেদিনই সব হুড়মুড়িয়ে নামে

অকাল মেঘ চমকে দেয় সারা আকাশ, বৃষ্টি আসে হামলে
সামনে হঠাৎ গজিয়ে উঠলো পাহাড়, নাকি ভুঁইফোঁড় গাছপালা
চতুর্দিকে শিসের শব্দ, চতুর্দিকে ভয়ের শব্দ, অশরীরীর শ্বাস।

এই রকম হবার কথা, কোনোদিনই তো ঠিক পথ বাছিনি
যে-জল আমার বিষম চেনা, ডুব দিইনি কখনো সেই জলে
যেমনভাবে হারিয়ে যাবার কথা ছিল, তেমনভাবে হারানোও তো হলো না
বিশ্বাসের কষ্ট ছিল, ভালোবাসার ভুল ছিল কি ? সব কিছু তাই
ধরা ছোঁয়ার বাইরে ?

ছিল না কৈশোর

আমার প্রকৃতি প্রেম খুব-একটা ছিল না কৈশোরে
বসেছি নদীর ধারে, নদীকে দেখিনি, ছিল
ওপারে যাবার ছটফটানি
জীবনে দু'তিনবার, মাত্রই দু'তিনবার হেঁটে গেছি
বুক ভরা আকাশের নীচে
আমার ছিল না দুই সীমানা-পেরুনো লঘু লোভ
আমার গোপন
আমার দুঃখেরা ছিল দীন দুঃখী, অন্ধকারে, ছিল ওরা
ইঁট চাপা ঘাসের মতন কিছু বন্ধ অন্ধকারে
বনমর্মরের শব্দ ছাপিয়ে তুলেছি আমি উল্লাসের ভাঙা গানে
গানেরও ওপরে তুলে এই হেঁড়ে গলা।

আজ বহু দূরে এসে, কংক্রীট ছাদের নীচে,
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি, বসে আছে
নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা, দুপুরের বর্ণ-দ্যুতি
বাতাস দ্বিখণ্ড ক'রে ডেকে ওঠে চিল
একটু একটু মন-খারাপ, কবিতার খাতা মুড়ে উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ

আকাশ অচেনা লাগে, মায়াময় গাঢ় চোখে মনে হয়
দিগন্তও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে।

সেই লেখাটা

সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি
এর মধ্যে চলছে কত রকম লেখালেখি
এর মধ্যে চলছে হাজার হাজার কাটাকুটি
এর মধ্যে ব্যস্ততা, এর মধ্যে হুড়োহুড়ি
এর মধ্যে শুধু কথা রাখা আর কথা ভাঙা
শুধু অন্যের কাছে, শুধু ভদ্রতার কাছে, শুধু দীনতার কাছে
কত জায়গায় ফিরে আসবো বলে আর ফেরা হয়নি
অর্ধ সমাপ্ত গানের ওপর এলিয়ে পড়েছিল ঘুম
মেলায় যে উষ্ণতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম
শোধ দেওয়া হয়নি সে ঋণ
এর মধ্যে চলেছে প্রতিদিন জেগে ওঠা ও জাগরণ থেকে ছুটি
এর মধ্যে চলছে আড়চোখে মানুষের মুখ দেখাদেখি
এর মধ্যে চলছে স্রোতের বিপরীত দিক ভেবে স্রোতেই ভেসে যাওয়া
শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা আর অপেক্ষা
ব্যস্ততম মুহূর্তের মধ্যেও একটা ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতা
শুধু অপেক্ষা
সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি !

একটা মাত্র জীবন

একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি
এক জীবনে চক মেলানো উল্টো সোজা দিলাম পাড়ি
পায়ের তলায় মায়া সর্ষে, পায়ের তলায় ঝড়ের হাওয়া
ফুলঝরানো দিনের শেষে ফুল-বিলাসী কুহক পাওয়া
একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি !

স্বপ্নে আমার জীবনটাকে বদলেছিলাম সহস্রবার
স্বপ্ন ভাঙা অন্যজীবন ভাঙলো কত বন্ধ দুয়ার

এদিক ওদিক তাকাই আমার কূল মেলে না দিক মেলে না
খরচ হলো এক আধুলি খাতায় লেখা রাজ্য দেনা
একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি !

যা চেয়েছি

একটুখানি মৃত্যু দেবে
কিছুক্ষণের ভীষণ রকম মরণ ?
স্কুল পালানো ছেলের মতন
ছুটতে ছুটতে তোমার কাছে
পিছন পিছন ভয় খাওয়ানো হাওয়া
সমস্তক্ষণ বাঁচতে বাঁচতে
ভিড়ের মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে
বাঁচা আমার ধোপা বাড়ির কাপড়
আর সকলে বেঁচে বর্তে
ধুলোর মর্ত্যে খেলা করুক
শুনুক সোনা-রুপোর ঝনঝনানি
আমার চাই অবগাহন
এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়া
যেমন কোনো দৃষ্টিহীনের স্বপ্ন
নীরব ঘর, সুখ চাহনি
বাহুর ঘেরে আলোকলতা
আর কিছু না, আমার বেশি চাই না
চাই না প্রেম স্নেহ মমতা
সার্থকতা এক জীবনের
শুধু মৃত্যু অমর ভাবে মরণ !

কবির মিনতি

কাঠগুদামের পাশে এক টুকরো প'ড়ো জমি
দুটি দুঃখী প্রাণ সেইখানে বসেছিল সন্ধেবেলা
একটু পরেই ওরা মিশে যাবে মলিন বাতাসে ।

যেমন শালিক পাখি খানিকটা শব্দ রেখে যায়
যেমন সোনালি সাপ ঘাসের গোড়ায় ঢালে বিষ
সে রকমই ও দু'জন ওখানে কি একটুখানি দুঃখ ফেলে গেল ?

যেন যায়, তাই যেন যায় !

আকাশের ছলনার সীমা নেই, মেঘগুলি মোহের প্রাচীর
বাতাস সহস্রবার উল্টে দেয় লঘু ইতিহাস
এমন কি কাঁটা ঝোপ, আগাছারও নেই কিছু মায়া ?
তোমাদের কাছে এই কবির মিনতি, কেড়ে নাও
ওদের কিছুটা দুঃখ ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নাও
ভুলে ফেলে যাওয়া কোনো রুমালের মতো এক টুকরো দুঃখ
যেন কাঠগুদামের পাশে পড়ে থাকে ।

নদীর ধারে

নদীপ্রান্তে বসে আছে এক উন্মাদ, আমি প্রথমে তাকে কবি ভেবেছিলাম ।
বস্তুত তাকে দার্শনিকও বলা যাবে, না কেন না সে জানে না চশমা
বদলাতে । নদীর সঙ্গীত বা সূর্যাস্তের চিত্র প্রর্শনীতেও তার চোখ কান
নেই, সে তার লম্বা আঙুলে চুলেখ জট ছাড়াচ্ছিল । নদীপ্রান্তের সেই
উন্মাদকে নদীর ধারের পাগলাও বলা যায়, সে এমন উলঙ্গ
কিংবা ন্যাংটো । কিছুতেই তাকে কবি বলা যাবে না, কারণ তার
একাকিত্ব বোধ নেই, সে প্রেমিক নয়, কারণ সে জানে না
আত্মরতি, সে নিতান্তই একটা পাগলা, সে নদীকে লাথি
মারছিল । নদী তাকে ভয় দেখাবার জন্য ফুলে ফেঁপে উঠলো,
দিগন্ত কাঁপিয়ে হা-হা শব্দ, চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ তোলপাড়, আকাশ
নিচু হয়ে এলো, তবু সেই একলা পাগল নদীকে লাথির পর
লাথি মেরে যায় । তারপর তার মাথার ওপরে ঘোর
বজ্র গর্জন হতেই হাত তুলে সে জমিদারি গলায় বলে ওঠে, আবার !

গোল্লাছুট

মানুষ হলো সংখ্যা, আর সংখ্যার তো মন থাকে না!
কত মানুষ এলো, এবার কত মানুষ গেল?
তিন কিংবা তিনশো কিংবা পঁচিশ তিরিশ হাজার
শূন্য, শূন্য
ট্রেন লাইনের দু'পাশ জুড়ে পড়ে রইলো
মানুষ নয়, শূন্য, শূন্য, শূন্য
জলে কাদায় খাঁ খাঁ রোদে সংখ্যাগুলো
উল্টে পাল্টে শোয়, শুয়েই থাকে
আবার ঝড়ের ঝাপটা লাগে
ধুলো বালির মতোই
ভাসে হাওয়ায়
কত মানুষ এলো, এবার কত মানুষ গেল?
গাছের ডালে কে ঝুললো, গাছ কেটে কে
বানালো তার বসত্
নদীর জলে ভাসলো শব, আবার কেউ
সাঁতরে গেল ওপার
কে কে গেল, ক'জন গেল, কারা ভেড়ার পালের মতন
বাঁশী শুনে পেছন ফিরলো
একটি ভেড়া, তিনটি ভেড়া, তিনশো ভেড়া,
একটি মানুষ, তিনটি মানুষ, তিনশো মানুষ
তিরিশ কিংবা পঞ্চাশ হাজার, লক্ষ মানুষ নাম থাকে না
শূন্য নিয়ে গোল্লাছুট খেলার মতন
ক'জন রইলো, ক'জন ফিরলো
নাম থাকে না, এসব খেলায় নাম থাকে না,
নাম থাকে না।

সেদিন

বিশ্বাসই হয় না যেন এতদিন কেটে গেছে,
এই তো সেদিন দেখা হলো
মোড়ের দোকানে এসে দুটি সিগারেট ধার হলো

মনে নেই ?

বৃষ্টি ভেজা হাঁটা পথ, চতুর্দিকে কত চেনা বাড়ি
যখন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, বাদলের ছোড়দিকে
শার্ট খুলে অনায়াসে বলা যায়, একটা বোতাম একটু
লাগিয়ে দিন না
এই তো সেদিন মাত্র দুপুরে জিনের পাঁট হাতে নিয়ে
অকস্মাৎ শক্তি উপস্থিত
চোখ টিপে বলে উঠলো, অফিসের বেয়ারাকে
দিতে বলে দুটো খুব ছোট ছোট গ্লাস
চায়ের দোকানে বসে প্রণবেন্দু বলে যেত
কাটলেট সহযোগে নতুন কবিতা
যেন ঠিক গতকাল, বন্ধুদের পাশ ছেড়ে কোনো কোনো দিন
নিঃশব্দে পালাতাম মানিকতলায়
এবং এক পা তুলে ফুটপাথে প্রতীক্ষায় কেটে যেত
দণ্ড, পল, অনেক প্রহর
গানের ইস্কুল থেকে যদি কেউ আসে, যদি
একবার চোখ তুলে দেখে
আজও যেন রয়ে গেছি প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
যদি দেখা হয়।

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
ঐ দ্যাখো থেমেছে সময়
দিগন্তের কিছুটা ওপারে
থেমে গেল বারুদের ঝড়
আকাশ একাকী ছিল চাঁদ
তাকে খেল পাহাড়ী ভল্লুকে
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
চেয়ে দ্যাখো তোমার দক্ষিণে
লাফ দিয়ে উঠেছে শূন্যতা
পাহাড়ের মতো সে বিশাল
বাঘের থাবার মতো ক্রূর

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
উত্তর বাহুতে টানো রাশ
কপালে জমেছে এত স্বেদ
শরীরে অস্ত্রের গুরুভার
একবার তাকাও বাঁ দিকে
শুয়ে আছে নিষ্পাদপ মাঠ
এবং তা এমনই নীরব
মনে হয় শূন্যতাও নেই
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
সম্মুখে পবিত্র অন্ধকার
সব পথ গেছে নিরুদ্দেশে
নিরুদ্দেশও আজ দেশ ছাড়া
অরণ্য পাহাড় কেটে গড়া
যত ছিল মায়া জনপদ
সব যেন ডানা মেলে আছে
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
চেয়ে দ্যাখো, থেমেছে সময়।

একজন মানুষের

সদ্য হাসপাতাল থেকে আসছি, সে এবার বেঁচে উঠবে
সমস্ত বিকেল এই বার্তা উড়িয়ে দিল বাতাসে
বিশেষ সংস্করণে
ট্রামে বাসে চৌরাস্তায় সকলেই বলাবলি করছে যেন
কে বাঁচলো, কে পেয়েছে নিশ্বাস ইজারা
কেউ তাকে চিনুক বা না চিনুক, অনেকেই নামই শোনেনি
তবু যে মৃত্যুর পাশে অসংখ্য মৃত্যুর ঘোরে এই একবার
বেঁচে ওঠা
এর চেয়ে বড় কিছু আর নেই এ মুহূর্তে
যেন এক ম্লান দিনে কুসুম গন্ধের ঝড়,
যেন কোনো সিংহাসনে বসে আছে আমাদের
প্রিয়তম মুহূর্তটি
যারা খুব মেতে আছে শিল্পে বা বাণিজ্যে কিংবা

শিকার ও শিকারীর গাঢ় গন্ধে
তাদের চোখের সামনে এসে আমি কিছুই শুনি না, আমি
প্রত্যেকটি কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলি,
বেঁচে উঠবে, সে এবার বেঁচে উঠবে
রয়টার ও রাষ্ট্রপুঞ্জে মনে হয় পাঠিয়ে দি একজন মানুষের
বাঁচার কাহিনী !

মনে পড়ে যায়

ভালোবাসার জন্য কাঙালপনা আমার গেল না এ জীবনে
আমার গেল না কাঙালপনা এ জীবনে ভালোবাসার জন্য
যে-সব নদী শুকিয়ে গেছে, মরে ভূত হয়ে হারিয়ে গেছে
যে-সব আগাছা ভরা দুঃখী মাঠ উধাও হয়ে গেছে জনারণ্যে
ছেলেবেলায় শিউলি ফুল, কার্নিশে আটকানো ছেঁড়া ঘুড়ির
ফরফর শব্দ
কিছুই হারাতে দিতে ইচ্ছে করে না, যেন সবাই ফিরে আসবে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের ওপাশে আলো যেমন ফিরে আসে স্মৃতির মধ্যে
যেমন নব যৌবনা নারীদের উপহাস ঝনঝন করে বাজে ঝর্নায়
কোনোদিন হারায় না, অবিরল পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে
কত রকম রং মেলানো দেশে
পুরোনো বাড়ির অন্ধকার ঘরে শূন্যতার মধ্যেও এক
বিশাল হাঁ করা শূন্যতা চেয়ে থাকে
আকাশ মিলিয়ে যায়, জোয়ারে ভেসে যায় বন্ধুত্ব, আয়ু
এরই মধ্যে এক দমকা হাওয়া এসে সান্ধ্য ভাষায় প্রশ্ন করে :
মনে আছে ?
তখনই ছটফটিয়ে ওঠে বুক, সমস্ত বিচ্ছেদের দুঃখ
মনে পড়ে যায় ।

এ রকম ভাবেই

আমাদের চমৎকার চমৎকার দুঃখ আছে
আমাদের জীবনে আছে অনেক তেতো আনন্দ
আমাদের মাসে দু'একবার মৃত্যু আছে, আমরা
একটুখানি মরে আবার বেঁচে উঠি
আমরা গোপনে ভালোবাসার জন্য কাঙাল হয়ে
প্রকাশ্যে ভালোবাসাকে করি অস্বীকার
আমরা সার্থকতা নামে এক ব্যর্থতার পেছনে ছুটে ছুটে
কিনে নিই অসুখী সুখ
আমরা মাটি ছেড়ে দশতলায় উঠে ফের মাটির জন্য
হাহাকার করি
আমরা প্রতিবাদের জন্য দাঁতে দাঁত ঘষে পরমুহূর্তে
দেখাই হাসি মুখের মুখোশ
আমরা বঞ্চিত মানুষের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিন দিন
আরও বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলি
আমরা জাগরণের মধ্যে ঘুমোই এবং
স্বপ্নের মধ্যে জেগে থাকি
আমরা হারতে হারতে বাঁচি এবং জয়ীকে দিই ধিক্কার
সব সময়ই মনে হয় এ রকম নয়, এ রকম নয়
অন্য কিছু অন্য কোনো ভাবে বাঁচা
তবু এই রকম ভাবেই অসমাপ্ত নদীর মতন
লক্ লক্ করে এগোতে থাকে জীবন...

কাছাকাছি মানুষের

যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা, এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা, যারা খুব চেনা
তাদের হৃদয় খুব জানাশোনা ভেবে বসে আছি
যত ভালোবাসা স্নেহ পাবার নিয়মে পেয়ে গেছি
কখনো ভাবিনি তার প্রত্যেকের ভিন্ন বর্ণচ্ছটা
প্রত্যেক হৃদয়ে বহু কুয়াশার ইন্দ্রজাল, মৃদু অভিমান

কাছাকাছি মানুষের বিশাল দূরত্ব দেখে থমকে গিয়ে দেখি
ফেরার রাস্তাও যেন মুছে গেছে, সেই থেকে আমি
কাছাকাছি মানুষের সুদূর রহস্যে মিশে আছি।

মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো

মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, শালিকেরা ফেলে যায় খড়কুটো
চৈত্রের বাগানে
ব্যস্ত কাঠবিড়ালির পায়ে পায়ে ঘোরে মৃত্যু, তুলে নিয়ে এসো,
যে রকম শীতে
উড়ে যায় তুলো-বীজ, বাগানের গর্ভ-গৃহে রেশমি কোমল
বিকেলের আঁচ
মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, পাহাড় চূড়ায় আনো, ঈগলেরা মৃত্যু
খুব ভালোবাসে
বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উড়ে যায়, মৃত্যুর রুমাল উড়ে যায়,
নদী প্রান্তে একা
কেউ বসে আছে কারো প্রতীক্ষায়, নিচু ঝোপে সাপের খোলস,
হেমকান্তি ফুল
দেখা হবে সন্ধ্যাবেলা, মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছুঁয়ে
পান করা হবে
সুউচ্চ মিনারে জ্বলে রাত্রি, যেন কোনো এক বারুদখানায়
লেগেছে আগুন
তার পাশ দিয়ে চলা, খুব শান্ত, সন্ন্যাসীর ঘুমের মতন
প্রকৃত স্তব্ধতা
এ রকমই কথা ছিল, আমার তোমার মৃত্যু কাছাকাছি এসে
ভাব করে নেবে।

কৃত্তিবাস

ছিলে কৈশোর যৌবনের সঙ্গী, কত সকাল, কত মধ্যরাত,
সমস্ত হল্লার মধ্যে ছিল সুতো বাঁধা, সংবাদপত্রের খুচরো গদ্য
আর প্রাইভেট টিউশানির টাকার অর্ঘ্য দিয়েছি তোমাকে, দিয়েছি ঘাম,

ঘোরাঘুরি, ব্লক, বিজ্ঞাপন, নবীন কবির কম্পিত বুক, ছেঁড়া পাঞ্জাবি
ও পাজামা পরে কলেজ পালানো দুপুর, মনে আছে মোহনবাগান
লেনের টিনের চালের ছাপাখানায় প্রুফ নিয়ে বসে থাকা ঘণ্টার পর
ঘণ্টা, প্রেসের মালিক বলতেন, খোকা ভাই, অত চার্মিনার খেও না,
গা দিয়ে মড়া পোড়ার গন্ধ বেরোয়, তখন আমরা প্রায়ই যেতাম
শ্মশানে, শরতের কৌতুক ও শক্তির দুর্দান্তপনা, সন্দীপনের চোখ মচকানো,
আর কী দুরন্ত নাচ
সমরেন্দ্র, তারাপদ আর উৎপলের লুকোচুরি, বুক খোলা হাস্য——
জমে উঠেছিল এক নদীর কিনারে, ছিটকে উঠেছিল জল, আকাশ
ছেয়েছিল লাল রঙের ধুলোয়, টলমল করে উঠেছিল দশ দিগন্ত, তারপর
আমরা ব্যক্তিগত জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে বাতাস সাঁতরে চলে গেলাম
নিরুদ্দেশে।

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমাদের জন্য
চঞ্চল সুখ সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি
তোমার জীবন ও জীবন যাপনে এনো বিশুদ্ধ ইয়ার্কি
তোমরা আকাশ থেকে এনো মুক্তি ফল, যার বর্ণ সোনালি, পায়ের তলায়
ভূমি থেকে রক্ত ধোয়া শস্য
তোমরা নদীগুলিকে স্রোতস্বিনী রেখো, নারীদের
কূল প্লাবিনী
তোমাদের সঙ্গিনীরা যেন আমাদের নারীদের মতন
ভালোবাসা চিনতে ভুল না করে
তোমাদের ছাপাখানা যেন নিরুপদ্রব খোলা থাকে
তোমাদের কালের মানুষ যেন শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই
উপবাস করে মাসে একদিন
তোমরা মুছে ফেলো সংখ্যাতত্ত্ব, যাতে তোমাদের বিদ্যুতের
হিসেব কষতে না হয়
কয়লার মতন কোনো কালো রঙের জিনিস তোমরা
কোনোদিন শয়ন ঘরে আলোচনায় এনো না
তোমাদের গৃহে আসুক গোলাপ গন্ধময় শান্তি, তোমরা সারা রাত
বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়িও

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আত্ম প্রতারণাহীন ভাষণে পবিত্র হোক
তোমাদের হৃদয়
তোমরা নিষ্পাপ বাতাসে আচমন করে কুণ্ঠাহীন
সম্ভোগে মেতে থেকো
তোমরা পাতাল রেলে চেপে নিয়মিত যাওয়া আসা ক'রো স্বর্গে !

যবনিকা সরে যায়

যবনিকা সরে যায়, দেখি দূর অন্ধকার স্মৃতির ওপারে
শতশত বন্দিশালা, ভরে আছে ঝুল কালি ধোঁয়া
অথবা পুজোর ঘণ্টা, অথবা মদির লাস্য গীত
এ এমন কারাগার, যেখানে প্রহরীবৃন্দ বড় বেশি পরিহাসপ্রিয়
শব্দের আহ্লাদে তারা লোহার বদলে আনে সোনার শৃঙ্খল ।

যবনিকা সরে যায়, দেখি এক অসত্য সমাজে
অলীক কুনাট্য রঙ্গে রাঢ় বঙ্গ বুঁদ হয়ে আছে
উচ্ছিষ্ট ভোজীরা মেতে আছে লোভী প্রতিযোগিতায়
বিজ্ঞ ও ভাঁড়েরা যেন ব্যগ্র হয়ে করে নেয় ভূমিকা বদল ।

যবনিকা সরে যায়, দেখি সব দৃশ্যকে পেরিয়ে অন্য আলো
ভয় ভেঙে, কান্না ভেঙে বিপন্নেরা বেরিয়ে এসেছে রাজপথে
রক্ত লোলুপের ঝাড় থেকে উঠে এলো কোনো প্রকৃত মহান রক্তদাতা
সপ্তরথী ঘেরা তবু ঘোর যুদ্ধে মেতে আছে খর্বকায় একাকী ব্রাহ্মণ
এক একটি দেয়াল ভাঙে, হুহু করে আসে সুবাতাস
কিছু গ্লানি মুছে ফেলে ঊনবিংশ শতাব্দীটি পাশ ফিরে শোয় ।

এখন

দারুণ সুন্দর কিছু দেখলে আমার একটু একটু
কান্না আসে
এমন আগে হতো না,
আগে ছিল দুরন্ত উল্লাস

আগে এই পৃথিবীকে জয় করে নেবার বাসনা ছিল
এখন মনে হয় আমার এই পৃথিবীটা
বিলিয়ে দিই সকলকে
পরশুরামের মতো রক্তস্নান সেরে
চলে যাই দিগন্ত কিনারে
যত সব মানুষকে চিনেছি, তাদের ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়
নাও, যার যা খুশি নাও,
শিশির ভেজা মাঠে শুয়ে থাক কিছু সুখী মাথা।

কবিতা হয় না

শাশ্বত সত্যের পাশে দাঁড় করাও তো ঐ ন্যাংটো
ভিখিরি বাচ্চাকে
উপনিষদের শ্লোকে ব্যাখ্যা করো গাড়ি বারান্দার নিচে
ফুটপাথে হলুদ খিচুড়ি
ঈশ্বরের কলার চেপে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়
ময়না, দাসপুরে
মরিচঝাঁপিতে গেলে কার্ল মার্কসও বিব্রত হয়ে বলে উঠবেন
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে!

রুখু মাঠে হঠাৎ অচেনা কোনো মানুষের পাশে এলে
সত্যি মনে হয়
দেশোদ্ধারকারীরা সব পরে আছে উল্টো দিকে জামা
খেতে না-পাওয়া ও পাওয়া এর মধ্যে রয়ে গেছে
শহুরে ব্যাপারীদের শুধু বাক্ বিভূতির
তীব্র অপমান
মিথ্যের মিনার গড়া চতুর্দিকে, সজ্ঞান ভণ্ডামি, এর নাম
মানব সভ্যতা।

যদিও কবিতা লিখে কোনোদিন কেউ পারেনি এবং পারবে না
কোনো ব্যবস্থা বদলাতে
কবিরা উন্মার্গগামী, পলাতক, কেউবা চেঁচিয়ে হাততালি পায়
অথবা শিল্পের নামে খোলসে লুকোয়

তবু কেউ সায়াহ্নের ঈষদুষ্ণ কাল্পনিক যুবতীর
চোখ চমকানো রূপ বর্ণনার আগে
অকস্মাৎ রেগে গিয়ে
দু' একটা চাঁছাছোলা খেদ বাক্য লিখে ফেলে, যা আসলে
বলাই বাহুল্য,
কবিতা হয় না !

পুনর্জন্মের সময়

নদীর সঙ্গে খেলা শুরু করবার মুহূর্তে
আমার অন্ধকার পছন্দ হয়নি
আমি নক্ষত্রলোককে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা ভাষায়
ডাক দিয়ে বললাম, আলো দেখাও !
চাঁদের অভিমান হয়েছিল, কিন্তু নীহারিকাপুঞ্জ
নিচু হয়ে এলে
কোনো দৈব নির্দেশ ছাড়াই বাতাস উড়িয়ে নিলো
নদীটির ওড়না
আমার শরীরে অসহ্য উত্তাপ, আমি
সূর্যলোকের আগন্তুক
শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া খুলে
ঝাঁপ দিলাম
নগ্ন
জলস্রোতে
দু' পাশে উদগ্রীব অরণ্য, ধোপার কাপড় কাচার
শব্দের মতন হরিণের ডাক
আমাদের জিভে জিভে খেলা শুরু হয়
নদীর ছোট কোমল স্তন ও
পারস্য ছুরিকার মতন উরুদ্বয়ে
আমি দিই গরম আদর
তারপর মৃত্যু ও জীবন, জীবন ও মৃত্যু
তারপর জেগে ওঠে নাদ ব্রহ্ম
অন্তরীক্ষে ধ্বনিত হয় ওঁং শান্তি
চুন ভেজানো জলের মতন পাতলা আলোয়

পুনর্জন্মের সময় আমি শুনতে পাই
আমাদের ভবিষ্যৎ সন্ততিদের জন্য অতীত-পুরুষরা
রেখে যাচ্ছেন বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস ভরা শুভাশিস।

সারাটা জীবন

আমাকে দিও না শাস্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল
কোথায় বোঝার ভুল ছিল তাই ঝড় এলো সন্ধের আকাশে
আমাকে দিও না শাস্তি, কেন ফেলে চলে গেলে অসমাপ্ত বই
চতুর্দিকে এত শব্দ, শব্দ গিরিবর্ত্মে ঝোলে অদ্ভুত শূন্যতা
আকাশের গায়ে গায়ে কালো তাঁবু, জগতের সব দীন দুঃখী শুয়ে আছে
একজন শুধু বাইরে, তুমি তার একাকিত্ব তুলে নাও মরাল গ্রীবার মতো হাতে
আমাকে দিও না শাস্তি, নীরা, দাও বাল্যপ্রেমিকার স্নেহ, সারাটা জীবন
আমি
অবাধ্য শিশুর মতো প্রশ্রয় ভিখারী!

শিল্প

শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একলার নয়
এ কথা ভাবলেই বড় ভয় লাগে, এই সত্য অসত্যের মতো গাঢ়
ভয় লাগে, বড় ভয় লাগে।

নীরা নাম্নী মেয়েটি কি শুধু নারী! মন বিঁধে থাকে
নীরার সারল্য কিংবা লঘু খুশি,
আঙুলের হঠাৎ লাবণ্য কিংবা
ভোর ভোর মুখ
আমি দেখি, দেখে দেখে দৃষ্টিভ্রম হয়
এত চেনা, এত কাছে, তবু কেন এতটা সুদূর?
নীরার রূপের গায়ে লেগে আছে যেন শিল্পচ্ছটা
ভয়, চাপা দুঃখ হিম হয়ে আসে।

নীরা, তুমি বালিকার খেলা ছেড়ে শিল্পের জগতে
যেতে চাও ?
প্রতীক অরণ্যে তুমি মায়া বনদেবী ?
তোমার হাসিতে যেন ইতালির এক শতাব্দীর মৃদু ছায়া
তোমার চোখের জলে ঝলসে ওঠে শিল্পের কিরণ
এ শিল্প মধুর কিন্তু ব্যক্তিগত নয়
শিল্প সহবাসে আমি তোমাকে স্বৈরিণী হতে
ছেড়ে দেবো কোন্ প্রাণে বলো !
না, না, নীরা, ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি
তোমাকে আমার কিংবা আমাকে তোমার কোনো
নির্বাসন নেই
ফিরে এসো, এই বাহুঘেরে ফিরে এসো !

দরজার পাশে

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তোমায় হঠাৎ চুমুতে
চমকে দিয়েছি
ঝড়ের মধ্যে আলোর ঝলক, রূপালি চামচে
লাবণ্য পান
চোখ ছিল দ্রুত, হাতে বিদ্যুৎ, বুকে মেঘ-নাদ
দরজার পাশে
সব কথা শেষে বিদায়ের আগে যেমন সহসা
শেষ কথা থাকে
দরজার পাশে তেমনি নীরব, তেমনি থমকে
মুখোমুখি দেখা
দুটি নিশ্বাসে অরণ্যঘেরা পাথুরে দেশের
মৃদু পরিমল
ছুঁয়ে গেল এই ঘাম নুন মেশা শহুরে বাতাসে
দুই সমুদ্র
জীবন ছাপিয়ে অনন্তকাল, তার থেকে ছেঁচে
এক মুহূর্ত
না-লেখা কবিতা, না-পাঠানো চিঠি, না-হওয়া ভ্রমণ
না-দেখা স্বপ্ন !

কোথায় গেল, কোথায়

যারা বারুদ ঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল, তাদের তিনজন
এখন দেয়ালে ঝুলছে, আলাদা মুখ, একই রকম চাহনি
বাকি এগারোজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায় ?

আর কিছুদিন পর এই শতাব্দী নিঃশব্দে বিদায় নেবে
অনড় গম্ভীর মহাকূর্মের পিঠে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে দিয়ে লেখা
হবে হিসেব
যারা সিংহের মুখে লাগাম পরাতে গিয়েছিল, তাদের দু'জন
শেষ পর্যন্ত পেয়েছে সিংহাসন, গালিচায় রেখেছে পায়ের ছাপ
বাকি সাতজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায় ?

আসবে নতুন মানুষ, গড়ে উঠবে নতুন সুখী সমাজ
বড় সমবেদনায় তারা একদিন পেছন ফিরে তাকিয়ে বন্দী
হয়ে পড়বে এক দুরন্ত ধাঁধায়
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির দিকে সমান তালে নিঃশঙ্ক পা ফেলে
গিয়েছিল যে পাঁচজন
তাদের একজনেরও কোনো নাম বা মুখচ্ছবি নেই, তাহলে
সত্যি কি কেউ যায়নি ?

ব্যর্থ প্রেম

প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহঙ্কার দেয়
আমি মানুষ হিসেবে একটু লম্বা হয়ে উঠি
দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে যায়
আমি সমস্ত মানুষের থেকে আলাদা হয়ে এক
অচেনা রাস্তা দিয়ে ধীরে পায়ে
হেঁটে যাই

সার্থক মানুষদের আরো-চাই মুখ আমার সহ্য হয় না
আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই
রিক্সাওয়ালাকে দিই সিগারেট
অন্ধ মানুষের সাদা লাঠি আমার পায়ের কাছে
খসে পড়ে
আমার দু'হাত ভর্তি অঢেল দয়া, আমাকে কেউ
ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দুনিয়াটাকে
মনে হয় খুব আপন

আমি বাড়ি থেকে বেরুই নতুন কাচা
প্যান্ট শার্ট পরে
আমার সদ্য দাড়ি কামানো নরম মুখখানিকে
আমি নিজেই আদর করি
খুব গোপনে
আমি একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ
আমার সর্বাঙ্গে কোথাও
একটু ময়লা নেই
অহংকারের প্রতিভা জ্যোতির্বলয় হয়ে থাকে আমার
মাথার পেছনে
আর কেউ দেখুক বা না দেখুক
আমি ঠিক টের পাই
অভিমান আমার ওষ্ঠে এনে দেয় স্মিত হাস্য
আমি এমন ভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও
আঘাত না লাগে
আমার তো কারুকে দুঃখ দেবার কথা নয়।

চোখ নিয়ে চলে গেছে

এই যে বাইরে হু হু করা ঝড়, এর চেয়ে বেশি
বুকের মধ্যে আছে
কৈশোর জুড়ে বৃষ্টি বিশাল, আকাশে থাকুক যত মেঘ,
যত ক্ষণিকা
মেঘ উড়ে যায়

আকাশ ওড়ে না
আকাশের দিকে
উঠছে নতুন সিঁড়ি
আমার দু বাহু একলা মাঠের জারুলের ডালপালা
কাচ ফেলা নদী. যেন ভালোবাসা
ভালোবাসবার মতো ভালোবাসা—
দু'দিকের পার ভেঙে
নারীরা সবাই ফুলের মতন, বাতাসে ওড়ায়
যখন তখন
রঙিন পাপড়ি
বাতাস তা জানে, নারীকে উড়াল দিয়ে নিয়ে যায়
তাই আমি আর প্রকৃতি দেখি না,
প্রকৃতি আমার চোখ নিয়ে চলে গেছে !

কিছু পাগলামি

জুলপি দুটো দেখতে দেখতে সাদা হয়ে গেল !
আমাকে তরুণ কবি বলে কেউ ভুলেও ভাববে না
পরবর্তী অগণন তরুণেরা এসেছে সুন্দর ক্রুদ্ধ মুখে
তাদের পৃথিবী তারা নিজস্ব নিয়মে নিয়ে নিক !
আমি আর কফি হাউস থেকে হেঁটে হেঁটে হেঁটে
নিরুদ্দিষ্ট কখনো হবো না

আমি আর ধোঁয়া দিয়ে করবো না ক্ষিদের আচমন্ !

আমি আর পকেটে কবিতা নিয়ে ভোরবেলা
বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাবো না কখনো
হসন্তকে এক মাত্রা ধরা হবে কিনা এই তর্কে আর
ফাটাবো না চায়ের টেবিল
আর কি কখনো আমি সুনীলকে মিল দেব
কন্ডেন্সড় মিল্কে ?

এখন ক্রমশ আমি চলে যাবো তুমি'র জগৎ ছেড়ে

আপনি'র জগতে
কিছু প্রতিরোধ করে, হার মেনে, লিখে দেব
দুটি একটি বইয়ের ভূমিকা
অকস্মাৎ উৎসব বাড়িতে পূর্ব প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলে
তার হৃষ্ট পুষ্ট স্বামীটির চোখে চোখ, দাঁতে ও জিহ্বায়
রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

দিন যাবে, এরকমভাবে দিন যাবে !

অথচ একলা দিনে, কেউ নেই, শুয়ে আছি আমি আর
বুকের ওপরে প্রিয় বই
ঠিক যেন কৈশোর পেরিয়ে আসা রক্তমাখা মরূদ্যান
খেলা করে মাথার ভিতরে
জঙ্গলের সিংহ এক ভাঙা প্রাসাদের কোণে
ল্যাজ আছড়িয়ে তোলে গম্ভীর গর্জন
নদীর প্রাঙ্গণে ওই স্নিগ্ধ ছায়া মূর্তিখানি কার ?
ধড়ফড় করে উঠে বসি
কবিতার খাতা খুলে চুপেচাপে লিখে রাখি
গতকাল পরশুর কিছু পাগলামি !

দেখি মৃত্যু

আমি তো মৃত্যুর কাছে যাইনি একবারও
তবুও সে কেন ছদ্মবেশে
মাঝে মাঝে দেখা দেয় ।
এ কেমন অভদ্রতা তার ?
যেমন নদীর পাশে দেখি এক চাঁদ খসা নারী
তার চুল মেলে আছে
অমনি বাতাসে ওড়ে নশ্বরতা
ভয় হয়, বুক কাঁপে, সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে !
যখনই সুন্দর কিছু দেখি,
যেমন ভোরের বৃষ্টি
অথবা অলিন্দে লঘু পাপ

অথবা স্নেহের মতো শব্দহীন ফুল ফুটে থাকে
দেখি মৃত্যু, দেখি সেই গোপন প্রণয়ী।
ভয় হয়, বুক কাঁপে সব কিছু দিয়ে যেতে হবে।

মেলা থেকে ফেরা পথে

ভাঙা-বিকেলের শেষে মেলা থেকে যারা ফিরেছিল
চেনা পথে
তারা কি সবাই ফিরে গেছে ঠিকঠাক
রক্তাক্ত দিগন্ত দেখে কেউ ছুটে যায়নি ওপারে ?

অন্ধকারে নেমে এলে
আমরা এক
অন্য পৃথিবীতে
বেঁচে থাকি
দু' পাশে অব্যক্ত বন, টিলার উৎরাই ধরে
যেতে যেতে
মনে হয় সকলই অচেনা
কার ছিল ঘর বাড়ি
ছিল নারী
স্নেহ প্রেমে মায়ার সংসার ?
ছলচ্ছল শব্দ করে চলে গেল যে-ঝর্নাটি
সে কি ছিল ?
অথবা এইমাত্র জন্ম ছিল ?
চিরকাল আকাশ বলেছি যাকে
চোখ তুলে দেখি সে-ই
আজ মহাকাশ
আমার সর্বাঙ্গে লাগে মৃত নক্ষত্রের হিম ধুলো
পথে যা ঝিমঝিম করে
তাও বুঝি নীহারিকা আলো ?

মেলা থেকে ফেরা পথে কোনো একদিন আমি
নিশ্চিত দেখেছি

বিপরীতমুখী এক মন-হারা

একলা মানুষ

তার কোনো ভাষা নেই, অনন্তকালের যাত্রী,

সে কিছু দেখে না

সপ্তম দিগন্ত পার হয়ে যেন সে চলেছে

অষ্টমের দিকে

আমি কত দূরে যাবো কিছুই জানি না !

লেখা শেষ হয়নি, লেখা হবে

আমিও লিখেছি তার একইসঙ্গে পবিত্র ও লোভনীয় ওই—
দুই শুভ্র স্তনের মাধুরী নিয়ে,
তবু লেখা শেষ হয়নি, আরো অনেকেই লিখে যাবে,
'ফেরা' এই শব্দটিকে
ঘুরে ফিরে আর কেউ কেউ দেবে
নতুন ঝঙ্কার,
এখনো জন্মায়নি, সেই নতুন কবিতা তার
কোমরের বাঁক দেখে
পেয়ে যাবে নদীর উপমা,
অসম্ভব শব্দটিকে, নেপোলিয়ানের মতো

অনেকেই

বারবার কেটে কুটে
তিনমাত্রা করে নেবে শেষে,
নিভৃত গোলাপ তার পাপড়ি মেলে দাবি করবে

আর একটি কবির,

উঁচু নিচু মানুষেরা সাম্য পাবে গদ্য কবিতায়,
কবরখানার ফুল-চোর অকস্মাৎ দেখতে পাবে
সেও বন্দী
ছন্দ মিলে কঠিন বন্ধনে ।
ভালোবাসা আর ঈর্ষা একই মন্দিরের মধ্যে
ঘেঁষাঘেঁষি করে
থেকে যাবে,
বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত্রে

নাস্তিকেরা বসে থাকবে
আকাশ ভাসানো ঠাণ্ডা নরম আলোয় মাথা পেতে,
উল্লাস শব্দটি বড় নীল
ও কি ভ্রমে কোনোদিন হয়েছে ধূসর ?
এমনকি অন্ধকারে বাদামী মেঘেরা জানে
উল্লসিত হৃদয় বদলাতে
এরই মধ্যে হাহাকার বাতাসকে করে দেয় কালো।
সে কথাও লেখা হবে, কেউ লিখে যাবে,
মানুষের দুঃখ দূর হতে হতে
ততদিনে, আশা করা যাক
হারাবে না সমস্ত সুন্দর !

স্বর্গ নগরীর চাবি

সূচিপত্র

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

বুঝি পাহাড়ের পায়ে পড়ে ছিল নীরব গোধূলি
নারী-কলহাস্য শুনে ভয় পেল ফেরার পাখিরা
পাথরের নিচে জল ঘুমে মগ্ন কয়েকশো বছর
মোষের পিঠের মতো, রাত্রির মেঘের মতো কালো
পাথর গড়িয়ে যায়, লম্বা গাছ শব্দ করে শোয়
একজন ক্ষ্যাপা লোক ঝর্নাটিতে জুতোসুদ্ধ নামে
কেউ কোনো দুঃখ পায় না, চতুর্দিক এমনই স্বাধীন !

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এই যে সবুজ দেশ, এরও মধ্যে রয়েছে খয়েরি
রূপের পাতলা আভা, তার নিচে গহন গভীর
অ্যালুমিনিয়াম-রঙা রোদ্দুরের বিপুল তাণ্ডব
বনের ভিতরে এত হাসিমুখ ক্ষুধার্ত মানুষ
যে-জন্য এখানে আসা, তার কোনো নাম গন্ধ নেই

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এখানে ছিল না পথ, আজ থেকে যাত্রা শুরু হলো
একটি সঠিক টিয়া নামটি জানিয়ে উড়ে যায়
বিবর্ণ পাতায় ছোঁয়া ভালোবাসা-বিস্মৃতির খেদ
পা ছড়িয়ে বসে আছে ছাগল-চরানো বোবা ছেলে
উদাসী ছায়ার মধ্যে ভাঙা কাচ, নরম দেশলাই
এই মাত্র ছুটে এল যে-বাতাস তাতে যেন চিরুনির দাঁত

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না...

নাচ-খেলা

পাহাড়ের সানুদেশে জ্বলছে আগুন
এখানে সমস্ত রাত নাচ খেলা হবে
গর্ভবতী মেঘ, আজ এদিকে এসো না !
সারাদিন এলোমেলো পাগলা বাতাসে
উড়েছে অসংখ্য রেণুকণা
যেন এই দুর্দান্ত দাহনে হলো ফুলদের ভালোবাসাবাসি
শুকনো পাতারা সব স্বেচ্ছাসেবকার মতো জড়ো হলো নিচে
চিকন সবুজ আর খয়েরিরা করে নেয় হাস্য-পরিহাস
অতি-কাছে সুদূরকে ডাকে
বিকেল গড়িয়ে যায় দিগন্ত পোড়ানো
মদস্রাবী সায়াহ্নের দিকে
দ্রিদিম দ্রিদিম ধ্বনি তুলে দেয় অমর্ত্যবাসীরা
চোখ-মচকানো আলো খুলে দেয় চাঁদ
গর্ভবতী মেঘ, আজ এদিকে এসো না
ছিঁচকে জোনাকিকুল, আজ ঘোর সন্ধ্যায় দূরে যা !
আগুন জ্বলেছে
আগুনের মুখ থেকে উড়ে আসে ফুল্‌কি যেন খুনখারাবি রং
শরীরে হোরির জামা অনিমন্ত্রিতেরা এসেছে
ঝর্নার দুধারে যারা বসে আছে সকলের মৃত্যুর মুখোশ
আর কেউ আসুক বা না-আসুক
এখানে সমস্ত রাত নাচ-খেলা হবে ।

একটাই তো কবিতা

একটাই তো কবিতা
লিখতে হবে, লিখে যাচ্ছি সারা জীবন ধরে
আকাশে একটা রক্তের দাগ, সে আমার কবিতা নয়
আমার রাগী মুহূর্ত, আমার ব্যস্ত মুহূর্ত কবিতা থেকে বহুদূরে
সরে যায়
যে দুঃখের যমজ, সে তা সহোদরকে চেনে না

একটাই তো কবিতা লিখতে হবে
অথচ শব্দ তাকে দেখায় না সহস্রার পদ্ম
যজ্ঞ চলেছে সাড়ম্বরে, কিন্তু যাজ্ঞসেনী অজ্ঞাতবাসে
একটাই তো কবিতা
কখন টলমলে শিশিরের শালুক বনে ঝড় উঠবে তার ঠিক নেই
দরজার পাশে মাঝে মাঝে কে যেন এসে দাঁড়ায় মুখ দেখায় না
ভালোবাসার পাশে শুয়ে থাকে হিংস্র একটা নেকড়ে
নদীর ভেতর থেকে উঠে আসে গরম নিশ্বাস
একটাই তো কবিতা লিখতে হবে

অগোছালো কাগজপত্রের মধ্য থেকে উঁকি মারে ব্যর্থতা
অপমান জমতে জমতে পাহাড় হয়, তার ওপর উড়িয়ে দেবার
কথা স্বর্গের পতাকা
শজারুর মতন কাঁটা ফুলিয়ে চলা-ফেরা করতে হয় মানুষের মধ্যে
রাত্রে সিগারেট ধরিয়ে মনে হয়, এ এক ভুল মানুষের জীবন
ভুল মানুষেরা কবিতা লেখে না, তারা অনেক দূরে, অনেক দূরে
যেন বজ্রকীট উল্টো হয়ে পড়ে আছে, এত অসহায়
নতুন ইতিহাসের মধ্যে জড়িয়ে থাকে সম্রাটদের কাঙালপনা
একটাই তো কবিতা, লিখে যাচ্ছি
লিখে যাবো, সারা জীবন ধরে
আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে !

একটি ঐতিহাসিক চিত্র

তাঁতীপাড়ায় পেছন দিকে নাবাল জমি
তার ওপাশে মুসলমানী গ্রাম
ওদের দিকে আকাশটাও অনেকখানি গাঢ়
ওদের ভোর মোরগঝুঁটি, এদিকে ভোর
হাঁসের মতন সাদা
একেক দিন কুয়াশালীন, একেক দিন বৃষ্টি সারাবেলা
এখানে সব নিথর চুপ, ঘাসফড়িং-এর মুখের মতন
কাঁচা-সবুজ শান্ত
এখানে শীত-গ্রীষ্ম আসেন, যেমন আসেন জন্ম এবং মৃত্যু

এবং মাইল পনেরো দূরে আছেন সভ্যতা।

পাট ক্ষেতের সীমানা ঘিরে ছিলেন এক
কূল ভাঙানো নদী
তিনি এখন দেশান্তরে গেছেন
শুকনো খাদ যেন একটা বাঁকা রাস্তা
এখনো তার বুকে মাখানো ছেলেবেলার ধুলো
বুড়ো একটা তেঁতুল গাছ, ঠাকুর্দার মতন যার আঙুল, যার
নিচে দাঁড়ালে সকাল-সন্ধ্যা
লাগে চিরুনি-হাওয়া
প্রাইমারির মাস্টারমশাই ওখানে রোজ ভাঙা-আলোয়
বাড়ি ফেরার পথে থমকে
সাইকেলের বেল বাজিয়ে গুনগুনোন
রামপ্রসাদী গান
রাত্রিবেলা ওখানে কেউ যায় না
রাত্রিবেলা ওখানে তারা আসে
এখানে রাত ইঁদুর-জাগা, এখানে রাত সাত শিয়ালের রা
এখানে ঘুম পরিশ্রমী, ঘুমের বয়েস জাগার চেয়ে বেশি
এখানে সব জন্মবীজ অন্ধকারে এক প্রহরে
নারীরা লুফে নেয়
শেষ রাতের হলুদ চাঁদ দিঘির জলে একলা খেলা করে।

আমাদের এখানো কোনো বিখ্যাত ভাঙা মন্দির নেই
আমাদের ছোট কালী-বাড়িটির ছবি তুলতে কোনো সাহেব
এদিকে আসেননি কখনো
এখানে নেই কোনো বিধ্বস্ত নীলকুঠির অস্তিত্ব
তবু আমাদের এই গ্রামটি ঐতিহাসিক
এক লপ্তের ধান জমিতে রোজ চাষে যান পরাণের দাদামশাই
তাঁর বয়েস তিন হাজার বছরের চেয়ে কিছু বেশি
গৌতম বুদ্ধেরও জন্মের আগে থেকে তিনি
ঐ একই হাল গোরু নিয়ে
মাঠে নামছেন
দুপুরের খাঁ-খাঁ রোদে তিনি আকাশের দিকে তুলে ধরেন
তাঁর ঐতিহ্যময় মুখ

সম্রাট আকবর খাজনা নিয়েছেন ওঁর কাছ থেকে
পৌষের রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে পরাণের দাদামশাই
এখনো ঘুম ভেঙে মাঠে ছুটে গিয়ে
আনন্দে নৃত্য করেন দু'হাত তুলে
আমাদের এখানে সব কিছুই অতি রহস্যময়ভাবে সরল
আমরা কয়লা দেখেছি রামজীবনপুরের হাটে
আমরা সোনা দেখেছি অশ্বিনী মণ্ডলের মেজো মেয়ের
বিয়ের সময়
আমরা মুক্তো দেখেছি ভোরবেলা ঘাসের ডগায়
আমরা হীরে-কুচি দেখেছি শ্যালো টিউবওয়েলের
জলে
রোদের ঝিলিকে
আমরা মরকত মণি দেখেছি আকাশে সূর্য-বিদায়ের
শেষ দৃশ্যে
আমরা ইস্পাত দেখেছি দাঙ্গায়
আমরা বারুদ দেখেছি জমি দখলের লড়াইয়ে।

দিঘিটির জল কুচকুচে কালো, কেউ এর নাম
রাখেনি কাজলা দিঘি
আমরা এখানে বছরের পাট পচাই
আমরা এ-জলে স্নান করি, রাঁধি, খাই
এই জলে ভাসে আমাদের প্রিয় নাম দেওয়া হাঁসগুলো
দিঘিটি বড়ই গম্ভীর, ওর হৃদয়ে রয়েছে সাতটি
আঁধার কুঠুরি
ও এমনই নারী, যারা শুধু নেয় ভালোবাসা, তার
প্রতিদানে কিছু দেয় না
(যেমন কেষ্ট বাড়ুরীর বউ), আমাদের কালো দিঘিটি
বড় বেশি এই জীবনে জড়ানো, এমন তো দিন যায় না যে ওকে
একবারও চোখে দেখি না
শুধু চোখে দেখা, কোনোদিন তবু দেখা তো দিলো না স্বপ্নে!
আমরা স্বপ্নে দেখেছি মাজরা পোকা
আমরা স্বপ্নে দেখেছি খরা ও বন্যা
আমরা স্বপ্নে দেখেছি স্বপন এবং স্বপ্না
কুমার-কুমারী যাত্রায় হাসে কাঁদে

আমরা স্বপ্নে দেখেছি চোরেরা কেটে নিয়ে যায় ধান
স্বপ্নে আমরা চমকে উঠেছি বুঝি-বা দাম পড়ে গেল
আলুর !
হে নিকষ কালো জলভরা দিঘি, এত কাছে তুমি এত নিষ্ঠুর
কখনো স্বপ্নে এলে না ?
মাঠের মধ্যে এক ঢ্যাঙা তালগাছ দম্পতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে
ওখানেই ঘুচুড়ে আর
জিওলকাঠির সীমানা
ঐখানে একদিন এক মনসার জীব দংশেছিল
সনাতন দাসের ছেলে বলাইকে
ঘুচুড়ের দিকটা তখন ফাঁকা, জিওলকাঠির চাষীরা
ছুটে এলো আর্ত রব শুনে
তারা চটপট আঁটন দিয়েছিল তার পায়ে
বলাই জল জল বলে চ্যাঁচালে আজু শেখ ঢেলে দিয়েছিল
তার মুখে পানি
নদাই ঘোষের রায়ত গিয়াসুদ্দিন ছুটে গিয়েছিল
খবর রটাতে
কেউ কেউ বলেছিল, ওঝা
কেউ কেউ বলেছিল, টোটকা
ঝিমিয়ে পড়া চোখ কোনো রকমে খুলে
ইস্কুল ফাইনাল বলাই বলেছিল,
ইঞ্জেকশন !
পীর জাঙ্গাল পেরিয়ে শ্যামনগর, তারপর মানিকচকের খাল
গত বর্ষায় উড়ে গেছে যার সাঁকো
এখন অবশ্য সেখানে হাঁটু জল
তার ওপারে হিঙ্গুলের হেলথ্ সেন্টার
হিঁদু পাড়ার পালকি মেরামত হয়নি এক মাস
মোছলমান পাড়ার ডুলিতে চাপানো হলো
বলাইকে

ও বলাই, বলাই রে, ফিরে আয় বাপ
ও মা মনসা, তোমার পায়ে পড়ি
তোমায় গড়িয়ে দেবো রুপোর মাকড়ি
ওরে বলাই, তুই যে সাত বোনের এক ভাই

তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই
বলাইকে সাপে কাটলো, তার বৌটা যে পাঁচ মাসের পোয়াতী
ওরে বলাই, ফিরে আয়, সত্যপীরের সিন্নি দেবো,
ফিরে আয়, ফিরে আয়...
ঘুম থেকে তুলে ডাক্তারবাবুকে টেনে আনা হলো
আধো ঘুমন্ত বলাইয়ের সামনে
ডাক্তারবাবু প্রথমে চিৎকার করে বাপ মা তুলে
গালাগালি দিলেন যে কাকে
(বোধহয় ভগবানকে)
তারপর ডাক্তারবাবু বুকের জামা খুলে বললেন, মার,
তোরা মেরে আমার হাড়গোড়
ছাতু কর
এই সেন্টারের দরজা-জানলা, টেবিল-চেয়ার সব ভেঙেচুরে
সর্বনাশ করে দিয়ে যা
হারামজাদারা, এতদূর দিয়ে এসেছিস, চাষাভুষোর কখনো
ওষুধে রোগ সারে ?
আড়াই মাস কোনো ওষুধ চক্ষেই দেখিনি, যা, এখনো সময় থাকতে
যা
যাজপুরের হেরম্ব গুনিনের কাছে ছুটে যা

এমন কড়া জান বলাইয়ের, তবু সে বেঁচে গেল সে যাত্রায়
তিন বছরে সাতজন মরেছে আল কেউটের বিষে
বলাই মরলো না
এক মাস পর মুন্সীগঞ্জের হাটে আজু শেখের পিঠে
এক প্রকাণ্ড কিল মেরে
বলাই বললো, শালা
মোছলমানের হাতের জল খাইয়ে আমার
জাত মেরে দিইচিস ?
আজু শেখও চটপট জবাব দিলো, মাঠের মধ্যি পানি কোথায়
পাবো রে হারামজাদা
পস্যাব করে দিইচি তোর মুখে !
তারপর দু'জনে কাঁধ ধরাধরি করে ঢুকে গেল
গোদা-পা বিষ্টুর চা-মিষ্টির দোকানে

কে যায় ? ও, পরাণ মণ্ডল,

খবর-টবর কী গো, দাদা ?

খবর ভালো রে ভাই, ছোট মেয়েটার শুধু জ্বর

কে যায় ? ও, সাধনের ছোট ভাইটা নয় ?

খবর-টবর কী রে, হাট থেকে এলি ?

খবর শোনোনি দাদা, আজ থেকে বেড়ে গেল

পাম্পের ভাড়া ?

তাই নাকি ? কত ? কত ?

ডেলি চুয়াল্লিশ

কে যায় ? ও, ফজল মামুদ

খবর-টবর কী গো, মিঞা ?

দিন আনি দিন খাই, খবরের জুতসই মা-বাপ নাই !

কে যায় ? ও, হারু গোলদার

খবর-টবর কী রে, ছোঁড়া ?

জবর খবর আজ, সাত গোলে হেরে গেছে লক্ষ্মীকান্তপুর !

কে যায় ? ও, সহদেবের মা

খবর-টবর কী গো, ভালো ?

ভালো নাকি মন্দ হবে ? চতুদ্দিকে যত হিংসুটি !

কে যায় ? ও বাবা, এ যে গোরাই সামন্ত

পেন্নাম, এদিকে কোথা থেকে গেসলেন, জ্যাঠা ?

এলাম সদর থেকে, বলাইকে বলিস আমি মামলা জিতেছি !

কে যায়, খালেদ নাকি ? শোন্ তো এদিকে ভাইডি

শুকনো লঙ্কার দর তেজী না মিয়োনো ?

খবর জানি না, তবে দেখলাম তো বস্তাগুলো

ডাঁই হয়ে আছে !

কে যায় ? ও, বীরেশ্বরদা,

বলাইকে বলে দিও, তার আজ সর্বনাশ হলো !

কে যায় ? ও, রসিক বাবাজী,

খবর-টবর সব ভালো তো গোঁসাই ?

ভালো মন্দ কে কী জানে, রাধেশ্যাম যেমন রাখেন !

কে যায় ? ও, সুবল ভুঁইমালি

খবর-টবর কী রে, ছুটছিস কোথায় ?

খবরের মুখে ইয়ে, আজও হাটে নেই কেরাসিন !

কেরাসিন, কেরাসিন, কেরাসিন
দাও দাদা, দাও কিছু কেরাসিন
ওগো জোতদার দাদা, আমরা তোমার গাধা
জমিজমা নাও বাঁধা
দাও তবু, দাও কিছু কেরাসিন !
ওগো ভোট চাওয়া পার্টি, করে যাও ফোর টোয়েন্টি
যত খুশি
ইল্‌শে গুঁড়ির মতো ছিটে-ফোঁটা দেবে নাকো
কেরাসিন ?
ওরে কেরা কেরা রে, তুই কোথা গেলি রে ?
ওরে সিন সিন রে, তুই বুকের সিনারে
ওরে আমার ভর্তি কেরাসিনের বোতল
তুই আমাদের বাদলা রাতের গন্ধ বকুল
তোর সুবাসে প্রাণের মধ্যে আল কাটা জল
খলখলায়
তুই আমাদের হ্যাংলা মনের পদ্মমধু
তুই আমাদের দিন-ঘুমের হেমামালিনী !
তোকে গলায় জড়িয়ে ধরবো, গরমা গরম চুমো খাবো
তোকে নিয়ে একলা শোবো, আয় !
পাম্প চালানি, কাঠ জ্বালানি, ঘর ভরানি,
ছেলেপুলের বই খোলানি আয় !
কোথায় আলো, কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে কেরোসিন কিছু ঢালো !

আমরা প্রণাম জানাই তাঁকে, যিনি
সৃষ্টি করেছেন ট্রানজিস্টার বেতার
মাত্র দু' বস্তা ধানের বিনিময়ে তিনি আমাদের দিয়েছেন এই
অত্যাশ্চর্য উপহার
পৃথিবী আমাদের খবর রাখে না,
কিন্তু
আমরা জানি
পৃথিবীর হালচাল
আমরা জানি কানপুরের মাঠে সুনীল গাভাসকর
পরপর মেরেছে দু'খানা ছক্কা ।

আমরা জানি বিলেতের বিমান বন্দরে সাহেবেরা
ন্যাংটো করে দেখে
আমাদের ভালো ভালো মেয়েছেলেদের
আমরা জানি কলকাতার বস্তির লোকগুলোকে স্বর্গে তুলবার জন্য
দয়ালু লোকেরা খুলছেন ক্লাব
অবাঙালী ছোট লাটসাহেব সেখানে বক্তৃতার
প্রথম দু' লাইন দেন বাংলায় !
আমরা জানি জয়প্রকাশ নারায়ণের ফোঁটা ফোঁটা হিসি
আর ইন্দিরা গান্ধীর বিচার নিয়ে
চলছে খুব
কেরামতি ও ধুন্ধুমার
আমরা জানি আমেরিকার হাসি-খুশি প্রেসিডেন
আরবের মরুভূমিতে যুদ্ধ থামাবার জন্য
কুমীরের মতন কাঁদছেন !
আমিরা জানি ভিয়েতনাম নামে একটা দেশ আছে
যেখানে কোনোদিন যুদ্ধ থামে না
আমরা জানি মরিচঝাঁপির হা-ঘরে বাঙালগুলোকে
তাড়াবার জন্য
সরকার-বাহাদুর নিয়েছেন
উপযুক্ত বন্দোবস্ত
আমরা জানি একটা নদীর বুকে সেতু বানাবার জন্য
কোনো এক বড় মন্ত্রী এসেছেন
শিলান্যাস করতে গতকাল
শিলান্যাস ? প্রাইমারির মাস্টামশাই জানে, ওর মানে পাথর
কপাল, এমন কপাল, এদিকে তেমন একটা নদীও নেই
যার বুকে পাথর ছুঁড়ে খেলতে
দেখবো কোনো মন্ত্রীকে !
সকালবেলা আমাদের মুড়ি-পেঁয়াজ খাওয়ার সময়
চমৎকার গান শোনায় কিশোরকুমার
নিতাই গড়াই এমনই শৌখিন যে বাঁশঝাড়ের পেছনে
জলের গাড়ু নিয়ে যাবার সময় সে অন্য হাতে
ঝুলিয়ে নিয়ে যায় ট্রানজিস্টার
আমরা জানি, রাইটার্স বিল্ডিংস, লালবাজার, লাল
কেল্লা, বিমান বাহিনী,

পনেরোই আগস্ট

খবরের কাগজের
স্বাধীনতা, বিল্লা রঙ্গা, ব্যাঙ্ক-
ডাকাতি, রবি ঠাকুরের
গান, পঞ্চম
বার্ষিকী পরিকল্পনা, রেল, পাতাল
রেল, অ্যাটম
বোমা, নক্সাল ছেলেদের জেল
থেকে ছাড়া পাওয়া,
কলকাতা অন্ধকার, বিবিধ
ভারতীতে আমাদের সমস্ত চোখে-না-দেখা জিনিসের বিজ্ঞাপন
দিল্লিতে আন্তর্জাতিক
শিশুবছরের উদ্বোধন...
এইসব ভালো ভালো জিনিস আছে আমাদের দেশে,
আমরা জানি সব জানি
তবু সন্ধেবেলা মোমবাতির আলোয় তাস খেলার বৈঠকে
কিংবা খুড়ো, আমাদের সব্বাইকার খুড়োর কীর্তনের আসরে
হঠাৎ হাট-ফেরতা কেউ
পটাশ-ভেজালের মতন বিশ্ব চমকানো খবর দিয়ে যায় !
রামজীবনপুরের হাট যেন চাঁদ, আমাদের টানে, টেনে রেখেছে
ঐ চাঁদকে কেন্দ্র করে ঘোরে
ঘুরতে থাকে
আমাদের ছোট ছোট নিয়তির বড় বড় চাকা

হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি যেও নাকো
হরিদাসপুরে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি ঝুলে থাকো
লাউয়ের ডগায়
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি মাসে পাঁচ দিন
কুচো মাছ খেতে ভালোবাসো
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি নিচু মেঘ হও
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি কানু ঘরামিকে
দাও চোখ
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি দুধ হও

চিটে-পড়া ধানে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি
গোপন আগুন হও
সামন্ত জ্যাঠার বড় লোহার সিন্দুকে
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি কিছু কম করে দাও
রহমান সাহেবের
পাম্পসেট ভাড়া
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি প্রজাপতিটির দিকে
স্থির চোখে অমন চেও না।
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি যাত্রা দেখে
তাড়াতাড়ি
ফিরে এসো বাড়ি
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি রাগী স্ত্রীলোকের হাতে
কখনো দিও না ফলিডল
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি বাঁজা পেঁপে গাছটিকে
একবার ছোঁও
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি রোগা গোরুটিকে দাও
সহজ নিশ্বাস
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি ইস্কুলের ছেলেদের
মুখে দাও ইস্কুলের ভাষা
হে জীবন, সুস্থির জীবন, তুমি নীল বিদ্যুতের শিখা
দেখে দুই চোখ মুছে নাও
হে জীবন, হে প্রিয় আমার, তুমি কাছে কাছে থেকো।

আমাদের এখানে কোনো বিখ্যাত ভাঙা মন্দির নেই
এখানে ঘটেনি চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ
বরফ কিংবা মাখন কখনো পদার্পণ করেননি এখানে
তবু আমাদের এই গ্রামটি ঐতিহাসিক
এই টোকো আম, ভূতি কাঁঠাল ও জারুল গাছ ঘেরা
লোকচক্ষুর অগোচর পল্লীটি
ছ'সাতশো মানুষ নিয়ে টিকে আছে
হাজার হাজার বছর
এই মেঠো রাস্তা ধরে হেঁটেছেন আমাদের চতুর্দশ পুরুষ
তেঁতুল গাছতলায় শ্মশানে পুড়েছেন আমাদের

বৃদ্ধ প্রপিতামহ

যে আঁতুড়ঘরে আমাদের পঞ্চম সন্তানটি জন্মালো
ঠিক সেখানেই জন্মেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ
আমাদের শিশুরা মাতৃস্তন্য পান করে না,
তারা নিস্তনী মেয়েদের
বুক কামড়ে কামড়ে খায়
তবু মাতৃ ও ভূমিস্নেহ আমরা পেয়ে যাই উত্তরাধিকার সূত্রে
আমরা সবুজকে হলুদ করি আবার ধূসরকে বলি
সজল হতে
আমরা কেঁচো, গুগ্‌লি, শামুক, ব্যাঙ ও সাপেদের
সামঞ্জস্য ঠিকঠাক রেখে দিয়েছি
আমাদের এখানে নদী নেই, তবু বন্যা এসে যান
সূর্য অতি ক্রুদ্ধ হলে ঢেলে দেন
অতিরিক্ত আগুন
কখনো কখনো হাওয়ায় উড়ে আসে ইস্তাহার
জমিতে প্রোথিত হয় ঝাণ্ডা
আমরা ছেলেবেলার মতন দৌড়োদৌড়ি ও
মারামারির খেলা করি
আবার বিপরীত বাতাসে ভেসে যায় সব কিছু
আমাদের এখানে সব কিছুই, এমনকি ক্ষিদে পর্যন্ত
অত্যন্ত রহস্যময়ভাবে সরল
বীজতলার ওপর লাফালাফি করে গঙ্গাফড়িং
উনুনের ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে কেউ কেউ
গেয়ে ওঠে গান
হাঁসের ডিমের ঝোল রান্না হলে ছোট ছেলেমেয়েরা
মাটি চাপড়ে খলখল করে হাসে
আমরা আকাশকে রেখেছি নীল
আমরা নীলাভ ছায়ার মধ্যে খুঁজে বেড়াই আমাদের ভ্রমর
আমরা আবহমানকালকে 'দাঁড়াও' বলে
থমকে রেখেছি।

প্রথম লাইন

'চক্ষুলজ্জা' শব্দটি লিখে, একটু ভেবে, আবার কেটে দিই
কেন লিখেছিলাম, নিজেই জানি না
তারপর, শুধুই 'চক্ষু' লিখে, একটুক্ষণ থমকে থাকি,
সেটিকে ঘিরে এঁকে দিই একটি দুর্বল ধনুক
যেন কলমে কালি আসছে না, এইভাবে পাতা জোড়া
আঁকাবাঁকা রেখা
নিজের নাম দিয়ে স্বেচ্ছাচার···
তারপর পাতা উল্টে যাই।
পরের পৃষ্ঠার শুভ্র নগ্নতার কাছে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা
যেন আমি বাজবরণ আঠার সঙ্গে কিছু একটা
উপমা খুঁজছি
যেন বিমান-বন্দর নিঃশব্দ, অথচ কারুর আসার কথা
ছিল এই সময়
যেন বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে প্রতিমার রং
পুরোহিত ধরা পড়েছে খুনের দায়ে···
একটুক্ষণ আনমনা
বাইরের কোনো শব্দ মনোযোগ কেড়ে নেয়
হাতের কলম নিজে থেকেই লেখে, 'ভালোবাসা'
আমি তার সঙ্গে 'র' যোগ করি,
নিজের শূন্য বাঁ ও ডান পাশের দিকে
একবার দেখে নিই দ্রুত
কেউ নেই, পৃথিবী সম্পূর্ণ নির্জন
তখন প্রথম লাইনটি লিখতে আমার আর একটুও
অসুবিধে হয় না :
'ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে···'

ফিরে এসো

পবিত্রতা, বেড়াতে গিয়েছো তুমি
কোন্ দূর নির্বাসনে,
কার হাত ধরে ?

হে হিম নিশীথ, হে জ্যোৎস্না
তুমি এমন নিথর কেন
এখনো বোঝোনি ?
হে প্রেম, হে মৃত স্বদেশের ছায়া
হে শূন্য দেয়াল
বাতাস কুড়িয়ে নেয় স্মৃতি-রেণু অন্যমন ধুলো···
পবিত্রতা, বেড়াতে গিয়েছো তুমি
কোন্ দূর নির্বাসনে
কার হাত ধরে ?
ফিরো এসো
স্বর্গ-নগরীর চাবি
নিয়ে ফিরে এসো।

আসলে একটিও

আসলে একটিও নারী নেই, সবই নারীর আদল
বহু দেখাশুনো হলো, সকলেই দেখার আড়ালে রয়ে গেল
যেন মেদিনীর নিচে অগ্নিকুণ্ড, অন্য কেউ লিখে
রেখে গেছে
এত ভালোবাসাবাসি হলো, শয্যায় বসন্ত-যুদ্ধ
সব কিছু ধুয়ে দেয় স্বপ্নময় সুগন্ধ সাবান
অচেনা প্রান্তর থেকে ফের শুরু, প্রহেলিকা ভেদ করা ভোর
হাসি ও কান্নার বিপরীত, শরীরের সব চেনা,
তবু বালকের মতো অভিমান
কিছুই মেলেনি
সব ছিন্ন ভিন্ন করে যেতে ইচ্ছে হয়, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া
নীরব পাহাড়
শুধু কবিতার শব্দ নির্মাণের জন্য নারী
এ অন্যায় কবিকেও মৃত্যুতে অতৃপ্ত রেখে দেয় !

দিন-রাতের মানুষ

দিনের মানুষ সবাই হলুদ, রাতের মানুষ নীল
দিনের মানুষ বিষম ব্যস্ত, হাত পা বাঁধা
রাতের মানুষ নিজের মধ্যে গোলকধাঁধা
দিন-মানুষের সময় খুচরো টাকায় কেনা
রাত-মানুষের সবই উজাড়, বিষম দেনা
এবং তারা পরস্পররের খুব অচেনা,
এইটুকুই যা মিল !

কৌতুক

মেঘের সুপরামর্শে নাবাল জমিতে রোয়া হলো ইরি ধান
তারপর মেঘ উড়ে চলে গেল সুদূর পশ্চিমে
এ যে কৌতুক, যেন অনন্ত আকাশে এক কণা পরিহাস
সবাই বুঝেছে, শুধু একজন বোঝেনি, সে
শিরীষ গাছের কোলে গালে হাত দিয়ে
বসে আছে—
ক্ষয়াটে পাতলা মুখ, পুরোনো শিশির কাচ-রঙা দুই চোখ
চিবুকে জলপাইরঙা দাড়ি আর হাতে পোড়া বিড়ি
উরুর লুঙ্গিতে দ্রুত হেঁটে আসে প্রতিশোধকামী এক
ক্ষিপ্ত কাঠ-পিঁপড়ে
সেদিকে নজর নেই ওর
অসুস্থ শস্যের দিকে চেয়ে আছে, অথচ সে সসব দেখে না
ঘাসের জটলায় যেন লেখা আছে পাম্পসেট ভাড়া
মাটির গহ্বরে থাকে পটাস, ফসফেট, ফের
মাটি তাই খায়
সকলেই খেতে চায়, যেদিকে তাকাও শুধু পাখির ছানার মতো
উৎকণ্ঠিত হাঁ
পিচ্ করে থুতু ফেলে হঠাৎ লোকটা কেন লাফিয়ে
ঘোরতর যুদ্ধে মেতে ওঠে
বাতাস উদ্দাম হয়ে দেখে সেই দৃশ্য
দূরের দূরবীনে দেখে ঠিক মনে হবে

ওটা কোনো যুদ্ধ নয়, নাচ
মাঠের সৌন্দর্যে এক নৃত্যরত কালের রাখাল।

নীরার জন্য

নীরা, তুমি নাও দুপুরের পরিচ্ছন্নতা
নাও রাত্রির দূরত্ব
তুমি নাও চন্দন বাতাস
নাও নদীতীরের কুমারী মাটির স্নিগ্ধ সারল্য
নাও করতলে লেবু-পাতার গন্ধ
নীরা, তুমি মুখ ফেরাও, তোমার জন্য রেখেছি
বছরের শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত
তুমি নাও পথের ভিখারি বালকের হাসি
নাও দেবদারু পাতার প্রথম সবুজ
নাও কাচ-পোকার চোখের বিস্ময়
নাও একলা বিকেলের ঘূর্ণি বাতাস
নাও বনের মধ্যে মোষের গলার টুংটাং
নাও নীরব অশ্রু
নাও মধ্যরাতে ঘুমভাঙা একাকিত্ব
নীরা, তোমার মাথায় ঝরে পড়ুক
কুয়াশা-মাখা শিউলি
তোমার জন্য শিস দিক একটি রাতপাখি
পৃথিবী থেকে সব সুন্দর যদি লুপ্ত হয়ে যায়
তবু, ওরে বালিকা, তোর জন্য আমি এই সব
রেখে যেতে চাই।

মনে পড়ে

মনে পড়ে সেই গান
নিরঞ্জনা নদী-তীরে এপারে ওপারে
সেই সুখ এপারে ওপারে নিরঞ্জনা নদী-তীরে মনে পড়ে
পাতা-ছোঁয়া জল, চাপা জ্যোৎস্না, সেই প্রিয় অলীকের ছবি

মনে পড়ে, এই জন্মে, নিরঞ্জনা নদী-তীরে
এপারে ওপারে, মনে পড়ে ;
সেই ভাঙা ভাঙা হাসি মনে পড়ে, এ রকম পার্থিব নিশীথে ?

অভিশাপ

তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ
অন্য বর্ণ
নিরন্তর পাশা খেলা, মাঝে মাঝে শোনা যায় হাসি
তোমাকে দেখে না কেউ, এত গুপ্ত
অন্তরীক্ষবাসী
মনে হয় ।

প্রতিটি জয়ের পর আবার নতুন খেলা
এতো বেশি লোভ ?
তুমি কতদূরে যাবে ? কতো দূরে যাবে ?

দুঃখকে চেনো না তুমি, তোমার দুঃখের
অন্য বর্ণ
মানুষকে ছোট করো, মানুষকে পিঁপড়ে করে মারো
দুর্দিনের সওদাগর, সিন্দুকের মধ্যে তুমি ভরে রাখো
হাজার অসুখ
দ্রব্য থেকে কেড়ে নাও দ্রব্যগুণ
এত অহংকার
আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি হেরে যাবে,
তুমি ঠিক নিজের কাছেই হেরে যাবে !

যোগব্রত

সে চেনা রাস্তা পছন্দ করতো না
সে প্রায়ই আলোকিত পথ ছেড়ে
ছুটে যেত ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে

রক্ষাকালীর পুজোর রাত্রে মুলুটিতে সে এমনভাবেই দৌড়েছিল
যে সে শিখেছে তিরস্কারিণী বিদ্যে
অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে
দু' পাশে নিচু ধান ক্ষেত
সাপের ভয়ে চমকানো আমাদের মুখ
মাথার ওপরের আকাশ মুছে নিয়েছে পৃথিবীকে
কেউ কেউ তার নাম ধরে ডাকলো, কেউ কেউ নিজের নাম ধরে
তারপর কেউ একজন মহাদেব কিংবা চণ্ডালের মতন
ভিজে মাটি থেকে তুলে এনেছিল
তার নিথর উষ্ণ শরীর

একবার সে এক দুর্দান্ত বৃষ্টিভরা রাতে
অমনোনীত করলো সঙ্গী সাথী পথ
শহরকে গ্রাম ভেবে সে চলে গেল নদীর দিকে
খালি রিক্‌শার ওপর পড়ে রইলো এক জোড়া চটি
শহরের দক্ষিণে সে পেয়েছিল বাল্যকাল
শহরের উত্তরে স্বর্গ

একবার চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে সে ছুটে গিয়েছিল
পাহাড়ের দিকে
আর একবার সে ভাঙা প্রাসাদ দেখার জন্য গিয়েছিল সমুদ্রে
অরণ্য ছিল তার খুব প্রিয়, মানুষজন ছেড়ে
বিকেলের দিকে প্রায়ই সে চলে যেত বনে জঙ্গলে
স্নেহ মমতার কাঙাল হয়ে বারবার সে নিজের কাছে ফিরে এসেছে
আমরা জানতাম সে ফিরে আসবে
ফিরে এসে সে ভালোবাসার জন্য গর্জন করবে
হঠাৎ কি সে তিরস্কারিণী বিদ্যে ভুলে গেল
অদৃশ্য থেকে আর দৃশ্যমান হলো না।

অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত

বাঁধের উপর বসে রয়েছে একজন মানুষ
হাঁটুতে মুখ গুঁজে
ঋষিরা তার নাম দিয়েছিল অমৃতের সন্তান
দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চমকাচ্ছে রোদ
আকাশ বর্ণহীন
নদীর যৌবন নেই, দেখা যাচ্ছে তার কালো, নরম তলপেট
আধপাকা ধান এলিয়ে আছে মাঠে
তিল ক্ষেতে থক্‌থক্ করছে শোঁয়া পোকা
এ-সবকিছুরই মাঝখানে বসে আছে সেই অমৃতের সন্তান
তার মুখ তেতো
তার সন্ততিরা গড়াচ্ছে ধুলোয়
তার বীর্যধারিণী খুঁড়ছে কচু গাছের মূল
বৈশাখ মাসের সাত তারিখটি খলিসপুর গ্রামের
সবচেয়ে উঁচু তেঁতুল গাছটায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে
ব্রহ্মদৈত্যের মতন
বিশ্বসংসারে কিছুই থেমে নেই
বিমান উড়ছে
ইথারে ভাসছে সঙ্গীত
নববর্ষের প্রভাতফেরী, কবির জন্মদিনে উন্মাদনা
জলভরা মেঘ শুধু নিরুদ্দেশ
অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নামের পাড়াগাঁগুলোয়
বাঁধের ওপর বসে আছে বিষণ্ণ মানুষ
তারা কিছু খায়নি, তারা কিছু খায়নি, তারা সারাদিন
কিছু খায়নি ।

দূর যাত্রার মাঝপথে

পঁচিশ বছর আগে কোনো এক কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচের
সাদা বাড়িতে আমি থাকতাম ।
রেলওয়ে স্লীপার জড়ানো কঞ্চির বেড়া দেওয়া এক-চিলতে বাগান,
মনে আছে, সব মনে আছে ।

বসবার ঘরের দেয়ালে অসংখ্য পেরেক, ক্যালেণ্ডার বা ছবির
তেমন আধিক্য ছিল না
আমার ছোট কাকীমা লাল আকাশের নিচে প্রথম এসেছিলেন
সন্ধেবেলা সেই সাদা রঙের বাড়িতে

পঁচিশ বছরের ঘূর্ণিঝড়ে বদলে গেছে সব পুরোনো স্থান কাল পাত্র
বুড়ো হয়ে গেছে গাছ, বুড়ি হয়েছে নদী
দিগন্ত নিয়ে যারা খেলা করতে ভালোবাসতো, তারা অনেকেই
আজ চলে গেছে দিগন্তের ওপারে
দূর যাত্রার মাঝপথে থমকে গিয়ে আগন্তুক আমি হঠাৎ
দেখি, সেই সাদা বাড়িটির ঝুল বারান্দায়
ঠিক পঁচিশ বছর আগেকার লাল রঙের আকাশকে ঘোমটা করে
আমার তরুণী ছোট কাকীমা প্রথম দিনটিতে হাসছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
নিঃশব্দ রাত্রির দেশ, তার ওপরে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ
অদূরে খাজুরাহো মন্দিরের চূড়া
মিথুন মূর্তিগুলো দেয়াল ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠেছে আকাশে
নীল মখমলে শুয়ে নক্ষত্রদের মধ্যে চলেছে শারীরিক প্রেম
আমি যে-কোনো দিকে যেতে পারি
অথচ আমার কোনো দিক নেই!

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
সেই দিনটি ছিল বর্ষণসিক্ত
মাঝে মাঝে এমন হয়, আকাশ নিচে নেমে আসে
গাছগুলি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে, এসো, এসো
বোঝা যায় এখন এই পৃথিবী মানুষের জন্য নয়
বস্তু বিশ্বের মধ্যে রয়েছে গহন কোনো বাণী
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে পায়ের তলার মাটি
এই রকম সময়ে দিক ঠিক করা সহজ নয়
আমি পা বাড়িয়ে থাকি,

কিন্তু কোন্ দিকে যাবো জানি না।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
দিঘির জলে ভাসছে গোলাপি শাড়ি পরা বধূটির শব
তার পায়ের আলতা ধুয়ে যায়নি
তার হাত ভর্তি সবুজ কাচের চুড়ি
তার ওষ্ঠ ও অধর তীব্র বিষের দাহে নীল
যারা সহজে চিৎকার করে তারাও চারদিকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ
যারা অপরের হাতে নিহত হবার জন্য প্রস্তুত
তারাও আজ একটু একটু খুনী

এই দিঘির কাছে সে প্রত্যেকদিন তার মনের কথা বলতে আসতো
তার তীব্র দুঃখ ছিল না, তার তীব্র সুখ ছিল না
সে শুধু চেয়েছিল মাঝারি ধরনের বেঁচে থাকতে
একটা কোনো জায়গা থেকে তো তার মৃত্যুর জন্য
উত্তর খুঁজে আনতে হবে
কোন্ দিকে? কোন্ দিকে?

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপরে দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
ঝাঁসী, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, কানপুর, এলাহাবাদ
বিভিন্নমুখী বাস গোল হয়ে ঘিরে ফোঁস ফোঁস করছে
যে-কোনো একটায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেই হয়
কিন্তু কেন আমি নাগপুর না গিয়ে এলাহাবাদ যাবো না
অথবা হায়দ্রাবাদ না গিয়ে ঝাঁসী না যাবার কোন্ যুক্তি আছে
ঠিক এক জায়গাতেই যাওয়ার গাড়ি-ভাড়া
আমাকে একবারের বেশি দু'বার সুযোগ দেওয়া হবে না
আমাকে পাঠানো হয়েছে মাত্র একটি জীবন কাটাবার জন্য
একটি জেলখানা থেকে বেরিয়ে শুধু একদিকে যাবার মুক্তি
চোখ বুজে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে শুধু একটি কাগজের টুকরো
আমি চোখ বুজলাম
এইরকম সময়ে মানুষ চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে
এবং বৃক্ষের মতন স্থাণু হয়।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম

চতুর্দিকে সব কিছুই অচেনা
দু'দিক দিয়ে মানুষ আসে যায়, কেউ থামে না
কেউ চোখের দিকে চোখ ফেলে না
কেউ আমার কথা বোঝে না, আমি কারুর কথা বুঝি না
কারুর হাতে উজ্জ্বল নীল রঙের বল, কারুর হাতে পাংশু রঙের থালা
কেউ মুঠো মুঠো বাতাস খায়, কেউ অ্যালকহল দিয়ে দাঁত মাজে
জীবন্ত যুবতীর বুকে শকুন এসে ঠোকরায়, তারা হাসে,
শিশু এসে মায়ের আদর কাড়তে চাইলে মা কাঁদে
পোশাকের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো পোশাক নেই
মাংসের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো মাংস নেই
এই ঘোর অচেনা রাজ্যে আমি একটু দাঁড়াবারও জায়গা পাই না
আমি কি এখানকার কেউ নয়
এ আমার দেশ, এ আমার দেশ বলে চিৎকার করে উঠি
কর্ণপাত করে না একজনও
এমনকি আমার দেশও কোনো উত্তর দেয় না !

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
একটি ঠিকানাহীন চিঠি এসেছে, আমার যেতে হবে
যেমন ভাবে মৃত্যুর নির্ভুল চিঠি আসে
কিন্তু মৃত্যু কারুর জন্য অপেক্ষা করে না, আমার জন্য
একজন প্রতীক্ষায় বসে আছে
সে কোথায় জানি না, সে কি সমুদ্র কিনারে
কিংবা হিমালয়ের মর্ম ছায়ায়
সে কি বন্যায় ধুয়ে যাওয়া মাটির ওপর নতুন পলিতে দাঁড়িয়ে আছে
সে কি শুকনো জিভ বার করে ক্লান্ত জঙ্গলের মধ্যে একাকী শয়ান
সে কি কোনো বিশাল প্লাটফর্মের পাশের জটলার মধ্যে
বসে আছে জানু পেতে
সে আমার ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গী
সে আমার বড় বড় চোখ
বিস্ময়ের বিমূর্ত ছেলেবেলা
আমি মানচিত্রের গলিঘুঁজির মধ্যে ছোটাছুটি করি
আমায় যেতে হবে, যেতে হবে !

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি

সেই ধানক্ষেতের জায়গায় এখন ধানক্ষেত নেই
সেই নদীর ভিতরে নেই নদী
নগর উড়ে গেছে শূন্যে, সেখানে সব ছাদ-খোলা মানুষ
সেই একই মানুষের মধ্যে অন্য মানুষ
রক্ত ছড়ানো গোধূলি আকাশের নিচে এক অলীক দেশ
একদিন যারা অনুসরণকারী ছিল
আজ তারাই পলাতক
মহাকূর্মের পিঠে এক অন্ধ লিখে যাচ্ছে ইতিহাস
এক জননী তার প্রতিটি সন্তানের জন্য
একটি করে মুর্গীর ডিমও প্রসব করতে পারেনি, এই তার খেদ
যেখানে স্থাপত্য ছিল, সেখানে আজ সুড়ঙ্গ
যেখানেই যাই, সেখানেই শুনি এখানে নয়, এখানে নয়
অথচ কোথাও তো হৃদয় থাকবে এবং তার মধ্যে ভালোবাসা
বিজন নদীর ধার দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি
উৎস কিংবা মোহনার দিকে !

বুদ্ধের স্মৃতিতে

অঙ্গুলিমাল, তুমি স্থির হও !
তুমি লোভের তাড়নায় ছুটছো,
আসলে এই নির্লোভ পৃথিবী সব সময় ধাবমান !
অঙ্গুলিমাল, তুমি আমায় ধরতে চাও
আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।
অঙ্গুলিমাল, তোমার ব্যস্ততায় তুমি অনড়
তুমি পথকে একা অবরোধ করতে চেয়েছিলে
অথচ সমস্ত পথই পথিকের
তুমি কাছে এসো, আমি তোমার জন্য
প্রতীক্ষায় আছি।

যুগ ঘুরে যায়, মানুষের পোশাক বদল হয়
মানুষের বাসনা তবু ভুল হাওয়ায়
ওড়াওড়ি করে।
শৈশবের পবিত্রতা হারিয়ে যায় রুক্ষ প্রৌঢ়ত্বে

আদর্শের ছদ্মবেশ পরে পাশব স্বার্থ
অসংখ্য অঙ্গুলিমাল হিংস্র লোভ নিয়ে
ওৎ পেতে আছে
বিভিন্ন পথের কোণে কোণে
তবুও সহসা চোখে ভাসে সেই সর্বত্যাগী
যুবরাজের মূর্তি
ধীর শান্ত পদক্ষেপে তিনি একা একা চলেছেন
জগতের সমস্ত অঙ্গুলিমালদের তিনি ডেকে বলছেন,
কাছে এসো।

মানস ভ্রমণ

ইচ্ছে তো হয় সারাটা জীবন
এই পৃথিবীকে
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে যাই দুই
পায়ে হেঁটে হেঁটে
অথবা বিমানে ; কিংবা কি নেবে
লোহা শুঁয়ো পোকা ?
অথবা সওদাগরের নৌকো, যার গলুয়ের
দু'পাশে দু'খানি
রঙিন চক্ষু, অথবা তীর্থ যাত্রীদলের, সার্থবাহের
সঙ্গী হবো কি ?

চৌকো পাহাড়, গোল অরণ্য মায়ার আঙুলে হাতছানির দেয়
লাল সমুদ্র, নীল মরুভূমি, অচেনা দেশের
হলুদ আকাশ
সূর্য ও চাঁদ দিক বদলায় এমন গহন
আমায় ডেকেছে
কিছু ছাড়বো না, আমি ঠিক জানি গোটা দুনিয়াটা
আমার মথুরা
জলের লেখায় আমি লিখে যাবো এই গ্রন্থটির
তন্নতন্ন
মানস ভ্রমণ।

ফেরা

পাহাড় চুড়োয় গড়িয়ে গেল শীতের দুঃখী
বেলা
আমার হলো না আর ফেরা আমার হলো না আর
ফেরা
একলা এক ঘুঘু পাখির নিরুদ্দেশের
মতন
আমার জব্দ হলো ভ্রমণ আমার শব্দ থেমে
গেল
যেন জলের গভীর থেকে দাঁড়ালো এক
স্তম্ভ
আমার মর্ম জুড়ে ছেলেবেলার বর্ণ এবং গন্ধ ছুটে
এলো
ভালোবাসার পিঁপড়েগুলো পোশাক ঢেকে
রাখে
আমার সারা শরীরে সুচ আমার দেখা হলো না
কিছু
রোদের তলায় জ্যোৎস্না ছিল মাটির নিচে
আগুন
আমার লোভের মধ্যে বিষাদ আমার জয়ের মধ্যে
ধুলো
চক্ষে ছিল আঁধার খনি, পায়ের নোখে বিষ
আমার হলো না আর ফেরা আমার হলো না আর
ফেরা।

বন্দী

বাইরে খেলায় মেতেছিল যারা
তারাই আমাকে ছি ছি করে গেল
আমার দু'হাতে শিকল
আমাকে বলল সবাই
—কতকাল তুমি বিকেল দেখনি ?

নারীর হাস্যে আকাশে ছড়ালো ফিকে লাল রং
বন্ধুরা সব নানা উৎসবে মেতে আছে আজ
অথচ আমার দু'হাতে শিকল
আমাকে বলল সবাই
—কতকাল তুমি বিকেল দেখনি ?

হাওয়ায় রয়েছে বারুদগন্ধ, কোথায় এখনও যুদ্ধে চলেছে
অথচ বাইরে সকলেই সুখী, সবারই জামায় আতর গন্ধ
প্রণয়মুগ্ধ শরীর ডুবেছে ঝর্নার জলে
শিশুকে আদর, ছবি ছবি খেলা সকলই রয়েছে

অথচ আমার দু'হাতে শিকল
আমি শুধু এক শাস্তিকালীন বন্দীর মতো
ঘরের দেওয়াল ছোট হয়ে আসে
ঘোর হয়ে আসে নীরব নীলিমা
আমাকে বলল সবাই
—কতদিন তুমি বিকেল দেখনি ?

আগামী পৃথিবীর জন্য

আমরা জানি না
এক শতাব্দী পরেও এ-পৃথিবী বেঁচে থাকবে কি না
আমরা জানি না
মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে কি না শেষতম জীবন
আমরা জানি না
সমস্ত সীমাই একদিন হবে কি না হিরোসিমা
আমরা জানি না
হিমালয় আবার ডুব দেবে কি না টেথিস সাগরে
আমরা জানি না
আমাদের সকলেরই নোখ হয়ে যাবে কি না ধারালো ছুরি
আমরা জানি না
ভালোবাসার কথা শুনলেই সবাই বধির ও অন্ধ হয়ে যাবে কি না
আমরা জানি না

মুক্তি শব্দটি শুধু লেখা থাকবে কি না ইতিহাসের পাতায়
আমরা জানি না
ইতিহাস রচনার জন্য থাকবে কি না কোনো ঐতিহাসিক
আমরা জানি না
একদিন শেষ হয়ে হয়ে যাবে কি না সব প্রশ্ন
তবু আমরা এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাবো
আমরা আগামী পৃথিবীর জন্য দিয়ে যাবো আমাদের ঘাম ও অশ্রু
আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাবো অন্তত একটি স্বপ্নের উপহার।

মুক্তি

পুরনো জন্মের দিকে দৃষ্টিপাতে হয়তো ভয় পাবো…
একদিন ছিলাম আমি হিংস্র ঊর্ণনাভ অন্ধকারে
হাজার বাসনাসূত্রে, আর বারে বারে লোভী চোখে
মরেছি অনেক মৃত্যু—স্মৃতির নরকে বহুকাল।
মনে পড়ে অরণ্যের আশ্চর্য বিশাল বনস্পতি
আমার আশ্রয় ছিল, স্ত্রী পুত্র সন্ততি দুঃখ সুখ
শাখার নির্ভরে ঢেকে দুঃসাহসে বুক ভরে নিয়ে
বহু রাত্রি পাহারায় দু' চক্ষু শানিয়ে জেগে জেগে
নিশ্বাস নিয়েছি বুকে।

নিশ্বাসে আগুন ছিল, চোখের সম্মুখে কতবার
হা-হা-শব্দে জ্বলে উঠল বাল্য সারাৎসার প্রিয় স্মৃতি
ফেরারী মায়াবী সুখ, প্রেম, পুণ্য, প্রীতি, অহঙ্কার
এইসবই শৃঙ্খল যেন, ভেঙে যায় বার বার গড়ে,
আমার পৃথিবী ঘিরে
ঈশ্বরের পুত্র নই তবু ফিরে ফিরে আসি আমি
দ্বিতীয় ঈশ্বর সেজে, বিভ্রমবিলাসী অন্ধকীট
যে বিশ্বাসে ধরতে চায় সূর্যের কিরীট, তীক্ষ্ণ আলো
আমি সেই বিশ্বাসের সূচীমুখ, নিষ্ঠুর ধারালো স্বাদ নিতে
মৃত্যু নিয়ে খেলা করি এই পৃথিবীতে বহুবার।

প্রতি নেত্রপাত যেন নতুন জন্মের কথা বলে

ধমনীতে রক্তস্রোত উন্মত্ত কল্লোলে বলে যায়
ফিরে আসবো হে মরুৎ, ভুলো না আমায়, হে শূন্যতা-
হে যৌবন, হে রমণী,—অবচীন কথা বলে যাবে
প্রগল্‌ভ কালের মূর্তি, ক্রমাগত গোপনে পালাবে চুরি করে
জীবনের সীমাচিহ্ন, জাল কণ্ঠস্বরে প্রিয় নামে
ডাক দেবে, তুচ্ছ করো : যেন নীল খামে মিথ্যে চিঠি
নামহীন কেউ লেখে, ভুল ট্রেন সিটি দিয়ে যায়…

আমার অনেক জন্ম, আসলে তো কোনোদিনই মৃত্যুকে দেখিনি
অসংখ্য ছবির মালা যে মায়াবিনী দুরাশায়
ফোটায় স্মৃতির ফুল। ক্রমে বেড়ে যায় রক্তঋণ
পুরুষের চক্ষে জ্বলে ধারালো সঙ্গিন, রমণীর
বক্ষযুগে স্তন্য ক্ষরে, আমার শরীর টুকরো হয়
রক্তস্রোত এক থাকে, দু'হাতে সময় নিঃস্ব করি।

দু'হাতে, শরীরে আমি এই পৃথিবীর সব চাই
অথচ হৃদয় ছিল মুমুক্ষুর
অথচ জয়ের মধ্যে মিশে আছে শোক।

দেখা হবে

রাত্রির সমুদ্রতীরে দেখা হবে রাত্রির সমুদ্র
আর কিছু নয়
জলের কিনার ঘেঁষে জলের গভীর মর্ম ছুঁয়ে
বসে থাকা হবে
শব্দ দেবে প্রতিচ্ছবি বর্ণ দেবে নিবিড় বন্ধুত্ব
স্বপ্নে যে রকম
নীলের সাম্রাজ্যে বাঁধ ভেঙেছে জ্যোৎস্নার অকস্মাৎ
ছুটে গেছে রথ
ঢেউগুলি ক্রমাগত যে স্তব্ধতার ঐকতান
যেমন মেঘেরা
বালির উপর ইচ্ছে হলে অনায়াসে শুয়ে পড়া
ডান পাশ ফিরে
মনে থাকে যেন শুধু ডান পাশ বালির ওপরে

খোলা চুলে হাত
চোখের ওপরে চোখ নক্ষত্রেরা শূন্যে ঝাঁপ দেবে
পৃথিবীরও নিচে
কিছু না বলার ভাষা, গরম ওষ্ঠের শিলালেখ
ঠিক সে সময়
রাত্রির সমুদ্র হবে সশরীর রাত্রির সমুদ্র
হবে, দেখা হবে।

কই, কেউ তো ছিল না

কেউ কেউ ভালোবাসে ভুল করে, কেউ কেউ ভালোই বাসে না
কেউ কেউ চতুরতা দিয়ে খায় পৃথিবীকে, কেউ কেউ বেলা যায়,
ফিরেও আসে না।

ওপরে চাঁদের কাছে মেঘ জমে পাহাড়ের মেষ তৃণে আগুন
লেগেছে
যাদের বাঁচার কথা ছিল, নেই, ভুল মানুষেরা আছে বেঁচে।

স্বপ্ন বারবার ভাঙে, তবু ফের স্বপ্ন উপাদান দেয় অচেনা নারীরা
তাদের গলায় দোলে রক্তমাখা অত্যুজ্জ্বল ধাতুমালা, পান্না কিংবা
হীরা!

আমার যা ভালোবাসা, কাঙালের ভালোবাসা, এর কোনো মূল্য
আছে নাকি?
এ যেন জলের ঝারি, কেউ দেখা দেবে বলে হঠাৎ মিলিয়ে যায়
বাবলা কাঁটার ঝোপে
যেমন জোনাকি!

সুধা ভ্রমে বিষ খাই, বিষ এত মিষ্টি বুঝি? তবে যে সকলে
বলো লোনা?
আমাকে মৃত্যুর হাতে ফেলে ওরা চলে যায়, বারবার
ওরা মানে কারা?
কই, কেউ তো ছিলো না!

বিক্ষিপ্ত চিন্তা

এক

আমার নরক সত্যিই ভালো লাগে না। আমি স্বর্গে ফিরে আসতে চাই।

দুই

এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গার নাম ধলভূমগড়। সেখানে যে যায়নি, সে পূর্ণ মানুষ নয়।

তিন

নারীর অস্থিরতায় হাত রেখে জিভ ছোঁয়ালে পৃথিবী কাঁপে।
আমার পৃথিবী নয়, সেই নারীর পৃথিবী নয়, অলীক ব্রহ্মাণ্ড!
ঘোর অমাবস্যার রাতে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা অনেকটা, না
মরে মৃত্যুর স্বাদ পাবার মতন।

চার

একথা সত্যি, আমরা অনেকেই শ্মশানে অনেক রাত ঘুমিয়ে এসেছি।

পাঁচ

জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের মুখে একজন অন্ধ ভিখারী এক পয়সা ভিক্ষের বিনিময়ে অমরত্ব দেয়। যার যার অমরত্ব দরকার ওর কাছ থেকে ঘুরে আসুক।

ছয়

সব দুঃখ পবিত্র নয়, সব স্বপ্ন অপরকে জানাবার মতো নয়, সব রাস্তা রোমে যায় না, সব প্রেম নারীর প্রতি নয়, সব সাদা কাগজই মলিন হতে চায় না, সব জানালা খোলা সম্ভব নয়, সব কবিই বিশ্বাসঘাতক নয়।

দীর্ঘ অন্ধকার

দেখ, অন্ধকারে শুয়ে কী বিশাল দিগন্ত মরাল
আমি আসি আলো সাঁতরে, নদীতীরে বিষণ্ণ ধীবর
জাল ফেলে একা, ক্লান্ত, ভয় দেখায় নিশীথ কঙ্কাল
তুমি এসে ডাক দাও, আলিঙ্গনে সৃষ্টি করো ঘর।

বৃষ্টির অজস্র বিন্দু নেমে এসে দিগন্তেরও আনুক সীমানা।
তোমার স্বপ্নের মুখে মুখ রাখলে হাত দেখিয়ে হাসবে দুশো লোক
এরা সব চির-বৃদ্ধ, কালো-ওষ্ঠ, উচ্চনাশা-প্রাণী

ওরা চোখ খুলে থাক, আমাদের অন্ধকার দীর্ঘতর হোক,
দ্বিতীয় জন্মের আগে শিশু হয়ে পৃথিবীকে দেবো হাতছানি।

এসো চোখে চোখে

ভালোবাসা গেছে সুদূর মানস হ্রদে
ভালোবাসা গেছে পাহাড় ডিঙিয়ে পাহাড়ে
ভালোবাসা গেছে বৈশাখী রাতে নীরব নিথর জলে
ভালোবাসা যায় ছায়ার অন্বেষণে।

ভালোবাসা বড় ব্যস্ত ভ্রমণকারী
পায়ের তলায় চাকা, দুটি হাত ডানা
চোখের নিমেষে চোখের আড়াল
হঠাৎ ছদ্মবেশী
শরীর ছাড়িয়ে উঠে যেতে চায় শূন্যে!

ভালোবাসা, তুমি এসো এই শিলাসনে
মাথার ওপরে পারিজাত তরুছায়া
এখানে ঈর্ষা, মান-অভিমান আজও পথ খুঁজে পায়নি
এসো চোখে চোখে শেষতম কথা বলি!

সেই সন্ধ্যা ও রাত্রি

আমার চুলে এখনো মাখা লাল রঙের ধুলো
মনে পড়ে না প্রিয় গোধূলি? নিশ্বাসে সেই হাওয়া
শূন্য মাঠ দু'পাশ দিয়ে ছড়িয়ে আছে
কাশ বনের ছবি-ফোটানো আকাশ
ঠিক সেদিন আমি পেয়েছি মাটির সঙ্গে
সহবাসের সুখ!

সমস্ত রাত উথাল পাথাল
বুকের মধ্যে পাগল পাগল খুশি
এদিকে যাই ওদিকে যাই সবাই চেনা

সমস্ত গান আমার এত আপন !
যেন আমার প্রবাস থেকে বাড়িতে ফেরা
এক জীবন পরে
তাঁবুর পাশে আধ ঘুমন্ত আগুন আর
ঝিঁক চোখের মানুষ
নারীর মতন অন্ধকার একটু দূরে হাতছানিতে ডাকলো
সেদিন আমি পেয়েছিলাম শরীরময়
শ্রেষ্ঠতম সুন্দরের সহবাসের সুখ !

আলাদা মানুষ

এসো, আলাদা মানুষ হয়ে যাই
এসো, সকলকে ডেকে বলি, আমাদের চিনতে পারো কি ?
বহু ব্যবহৃত এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি এক বিষম অচেনা
আবার নতুন করে লেখা হবে সব
সব দৃশ্যপট বদলে নতুন উৎসব শুরু হবে
এসো, অন্য মানুষ হয়ে যাই

এই নদী, এই মাটি বড় প্রিয় ছিল
এই মেঘ, এই রৌদ্র, এই বাতাসের উপভোগ
আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, কে কোথায় আছি ?
আমরা সুখের কাছে ঋণী, আমরা দুঃখের কাছে ঋণী
এসো, সব ঋণ বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে যাই
এসো, আলাদা মানুষ হয়ে যাই।

বারবার ফিরে আসে

বারবার ফিরে আসে, কবিতা, কখনো অসময়ে
ফিরে তাকাবার মতো মুখ নেই
এমন ভিড়ের মধ্যে, অসম্ভব হৈ হট্টগোলে
বারবার ফিরে আসে, কবিতা যখন অন্যমনে
আর সবকিছু দেখি, ওকেই দেখি না

চতুর্দিকে এত হাত, চতুর্দিকে এত বেশি চোখ
ঘূর্ণিঝড়ে শুকনো পাতা আমার অস্তিত্ব
সব কিছু কাছাকাছি, সব কিছু বড় বেশি দূরে
শুধু সে কখন আসে, চলে যায়, বুক চাপা দুঃখ জমে
দুঃখের পাহাড় !

প্রতীক জীবন

প্রতীকের মরুভূমি পায় না কখনো মরূদ্যান
যেমন নারীর নেই আঙুলের ব্যথা কবিতায়
আমার সমুদ্র নেই বিছানায়, শিয়রের কাছে
শান্ত মেঘ
কবিতায় আছে।

বিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি ভেঙেছিল ঘুম
গ্রাম্য সোঁদা গন্ধ মাখা ক্ষ্যাপাটে কৈশোর
কেটেছে বাসনা ক্ষুব্ধ মুখ চোরা দিন, প্রতিদিন
অথচ অক্ষরে,শব্দ, ছন্দ মিলে তীব্র প্রতিশোধ
না-পাওয়া নারীর রূপে অবগাহনের উন্মত্ততা
প্রতীক জীবন, নেই মরূদ্যান, জ্যোৎস্নার সমুদ্র, নেই
শিয়রের কাছে শান্ত মেঘ—
কবিতায় আছে।

স্পর্শটুকু নাও

স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ
ছেঁড়া পৃষ্ঠা উড়ে যায়, না লেখা পৃষ্ঠাও কিছু ওড়ে
হিমাদ্রি-শিখর থেকে ঝুঁকে জলপ্রপাতের সবই আছে
শুধু যেন শব্দরাশি নেই
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

ভোর আনে শালিকেরা, কোকিল ঘুমন্ত, আর

জেগে আছে দেবদারু বন
নীলিমার হিম থেকে খসে যায় রূপের কিরীট
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

বেলা গেল, শোনোনি কি ছেলেমানুষীর কোনো
ভুল করা ডাক ?
এপারে মৃত্যুর হাতছানি আর অন্য পারে
অমরত্ব কঠিন নীরব
'মনে পড়ে ?' এই ডাক কতকাল, কত শতাব্দীর
জলে ধুয়ে যায় স্মৃতি, কার জল, কোন্ জল
কবেকার উষ্ণ প্রস্রবণ
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ ।

অচেনা দেবতা

বৃক্ষের চূড়ায় তিনি পা দিলেন, একজন আগন্তুক
অচেনা দেবতা
খর রৌদ্র হেমবর্ণ, জামা পরা প্রজাপতি, কাঠবিড়ালীর ঘুম ভাঙে
প্রকৃতি নাম্নী যে নারী অকস্মাৎ কাঁপে তার আধো-জাগা বুক
কিছু কিছু পুরুষেরা সবুজ চেনে না তাই অরণ্যের নীলে
দেবতাটি চোখ মুখ প্রক্ষালন করে নেন, তাঁর ভালো লাগে ।
একজন অচেনা দেবতা এসে স্পর্শ-ধন্য করে যান
পৃথিবীর নীল রমণীকে ।

তিনটি অনুভব

মানুষের মুক্তি চাই, মুক্তিও মানুষকে খুঁজছে
যেমন শ্রদ্ধা খোঁজে শ্রদ্ধেয়কে, প্রেম খোঁজে প্রেমিককে
আর মমতা এখনো খুঁজে খুঁজে মরছে,
কারুকে পায়নি

সে এসেছিল, দেখা হলো না, ফিরে গেল

ঠিক সে-সময়, সেই মুহূর্তে, আয়ুর বিন্দু
আমি গেলাম, দেখা হলো না, ফিরে এলাম।

তোমার শরীরের উত্তাপ
আমার শরীরের উত্তাপ
এইভাবে সবকিছু পুণ্যময় হলো
আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাবো।

শূন্যে বাজে

শূন্যে বাজে পাগল ডমরু
গেল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
নতুন পথের শেষ অনিত্যে বিলীন
অন্যমনস্কতা মাখা মরু
এই আলো, ছুটে যায় ছায়ার হরিণ
এই ছায়া, অনিকেত তরু
গেল দিন, সবুজ দ্বীপের প্রিয় দিন
শূন্যে বাজে পাগল ডমরু !

ঝড়

ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেল একটি ঘুঘু পাখি
সে ঝড়কে ডেকেছিল
ঝড়ের ভালোবাসায় জেলেদের গ্রামটিতে আছড়ে পড়লো সমুদ্র
সমুদ্র ঝড়কে ডাকে
পার্কের পাথরের মূর্তি অন্ধকারে দু'হাত তোলে
শুকনো পাতারা জাড়ো হয় তার পায়ের কাছে
কানাকড়ির মতন পথের শিশুরা এদিক ওদিক দৌড়ে যায়
মাটি কাঁপে, মাটি কাঁপে
মাটি ফিসফিস করে কথা বলে, ঘুমন্ত ভিখারিণীটি শোনে
ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অভিভূত কীট
কেউ বাজায় না, তবু বেজে ওঠে বাঁশি

রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝনঝন করে ছিটকে পড়ে মোজাইক মেঝেতে
তিনি ঝড়ের গান গেয়েছিলেন !

সোনার মুকুট থেকে

সূচিপত্র

সোনার মুকুট থেকে

একটুখানি ভুল পথ, অনায়াসে ফিরে যাওয়া যেত
আকাশে বিদ্যুৎদীপ্তি, বুক কাঁপানোর হাতছানি
এই কামরাঙা গাছ, নীল-রঙা ফুল, সবই ভুল
হে কিশোর, তবু তাই হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি···

কিছুটা জয়ের নেশা, কিছুটা ভয়ের জন্য দ্রুত ছদ্মবেশ
মৃত চিঠি পড়ে থাকে কালভার্টে নর্দমার জলে
স্বপ্নে কত একা ছিলে, স্বপ্ন ভেঙে মূর্খের মিছিলে
হে কিশোর, সেই অসময় নিয়ে খেলা হলো প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি···

নদীর নারীরা সব ফিরে গেছে, পড়ে আছে নদী
অথবা নারীরা আছে, নদী খুন হয়ে গেছে কবে
যা কিছু চোখের সামনে, বাদ বাকি আঁধার বিস্মৃতি
প্রত্যক্ষের সিংহদ্বার, হে যৌবন হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি···

যে দুঃখ বোঝে না কেউ তার অশ্রু মরকতমণি
শেষ বিকেলের মৃদু-আলো-মাখা-ঘাসে পড়ে আছে
নির্বাসন ছিল বড় মধুময়, মন-গড়া দ্বীপে
প্রেম নয়, হে যৌবন, প্রতিচ্ছবি হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি···

অসমাপ্ত কবিতার ওপরে

অসমাপ্ত কবিতার ওপরে ছড়িয়ে আছে ঘুম
চুলগুলি এলোমেলো
যেন সে আদর চায়
কবিতার কাছে চায় কিছুটা উষ্ণতা
গুটিসুটি শরীরটি ছোট হয়ে আছে

কেমন করুণ ক্লান্ত, ঘুমের প্রাঙ্গণে অসহায়
সেই কবি !

সারারাত জ্বলে থাকে আলো
জানলার ঝিল্লিতে ঝরে অভ্রফুল, তুষারের মতো
সাজানো অক্ষরগুলি চেয়ে থাকে, দ্যাখে
রেফ্ ও র-এর ফুট্কি, তাদেরও বলার আছে কিছু
আর সব ঠিক থাক
মানুষ মিলিয়ে যাক মানব সমাজ
পৃথিবী নিজস্ব মতে ছুটুক উন্মুক্ত বায়ুযানে
একজন কবি শুধু অসম্পূর্ণ
কবিতার খাতা খোলা, পাশে তার ঋণী মুখখানি
তার দুঃখ স্পষ্ট চেনা যায়
লেগে আছে ঠোঁটে ও কপালে ।

যে জানে না, যে জেনেছে

যে কিছুই জানে না সে সব-কিছু ভাঙে
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
জল

অন্ধকার নদীতীরে শ্মশান শিখরে সমুজ্জ্বল
কালপুরুষের অসি, দূরে কোন্ রমণীর হাসি
যে কিছুই জানে না সে তাও ভেঙে দেয়
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
ছবি

ঘূর্ণিঝড় নিমরাজি নৌকোখানি ডুব দিয়েছিল ভরা গাঙে
এক পারে মৎস্যকন্যা, অন্য পারে মরা লখিন্দর
চৈত্রের দিনান্তে সেই ছন্নছাড়া বেলা
যে কিছুই জানে না সে নদীটির দুই কূল ভাঙে
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
বেহুলার ভেলা

তারপর স্তব্ধতায় দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় কণ্ঠস্বর
স্পর্শে টের না পেলেও বোঝা যায় দূরে কাছে আছে যে সবই
যে কিছুই জানে না সে তখনো নেশায় ভেঙে যায়
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
প্রেম।

নিসর্গ

পাতা পোড়া গন্ধ পায় না পাতা-পোড়ানীরা
ঝুলি ঝুলি অন্ধকারে পাথরের মুখ বসে থাকে
বনস্থলী কথা বলে
ঘুম ভাঙে ফুলের সংসারে

এ বছর শীত কিছু বেশি।

রাজ্যহীন রাজা যেন বসে আছে একলা ভিমরুল
অদৃশ্য নদীর খাতে পড়ে আছে নদীটির নাম
টিয়া পাখিনীটি তার পুরুষের বুক ঘেঁষে
নেয় মৃদু আঁচ
নীরবতা গ্রীবা তুলে চেটে খায় হিম।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে ছিট্‌কে ওঠে টুকরো জবাফুল
অতিথিবৎসল গাছ সংহারের দৃশ্যটিকে দেখে
যার যার ভালোলাগা,
যার যার আলাদা সুন্দর
ভিন্ন ভাষা, দুঃখ ভালোবাসা।

এই যে এখানে বসা গুটিসুটি কয়েকটি মানুষ
অবয়ব স্পষ্ট নয়, আগুনের রং মাখা চুল
পুরুষেরা ধরে আছে রুক্ষ হাঁটু,
উঁচু স্তনে চেনা নারী
শব্দ নেই, ঘ্রাণ, রূপ নেই।
ভোরের ফ্যাকাসে আলো নিয়ে এলো পৃথিবীর খিদে

মাটির গহ্বরে জাগে সাজ-সাজ রব
মানুষেরা উঠে যাবে
মিশে যাবে গাঢ়তম বনে
এইবার শুরু হবে খেলা।

অন্তত একবার এ জীবনে

সুখের তৃতীয় সিঁড়ি ডান পাশে
তার ওপাশে মাধুর্যের ঘোরানো বারান্দা
স্পষ্ট দেখা যায়, এই তো কতটুকুই বা দূরত্ব
যাও, চলে যাও সোজা !

সামনের চাতালটি বড় মনোরম, যেন খুব চেনা
পিতৃপরিচয় নেই, তবু বংশ-মহিমায় গরীয়ান
একটা বড় গাছ, অনেক পুরোনো
তার নিচে শৈশবের, যৌবনের মানত্-পুতুল
এত ছায়াময় এই জায়গাটা, যেন ভুলে যাওয়া স্নেহ
ভুল নয়, ছায়া তো রয়েছে।

সদর দরজাটি একেবারে হাট করে রাখা
বড় বেশি খোলা, যেন হিংসের মতন নগ্ন
কিংবা জঙ্গলের ফাঁসকল
আসলে তা নয়, পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ পরিহাস
লোহার বল্টুতে এত সুন্দর সাজানো, এত দৃঢ়
আর বন্ধই হয় না !
ভিতরের তেজী আলো প্রথমে যে সিঁড়িটা দেখায়
সেটা মিথ্যে, দ্বিতীয়টি অন্য শরিকের
বাকি সব দিক, বলাই বাহুল্য, মেঘময়।

মনে করো, মল্লিকবাড়ির মতো মৃত কোনো গথিক স্থাপত্য
ভাঙা শ্বেত পাথরেরা হাসে, কাঠের ভিতরে নড়ে ঘুণ
কত রক, পরিত্যক্ত দরদালান, চামচিকের থুতু
আর কিছু ছাতা-পড়া জলচৌকি, ঐখানে

লেগে আছে যৌনতার তাপ
ঐখানে লেগে আছে বড় চেনা নশ্বরতা
তবু সব কিছু দূরে, ছোঁয়া যায় না, এমন অস্থির মনোহরণ
মধ্যরাতে ডাকে, তোমাকে, তোমাকে !

দুপুরেও আসা যায়, যদি ভাঙে মোহ
অথবা ঘুমোয় ঈর্ষা পাগলের শুদ্ধতার মতো
তখন কী শান্ত, একা, হৃদয় উতলা
হে আতুর, হে দুঃখী, তুমি এক-ছুটে চলে যাও
ঐ মাধুর্যের বারান্দায়
আর কেউ না দেখুক, অন্তত একবার এ জীবনে ।

বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে

বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে পা ঝুলিয়ে
বসে আছে দুটি ছেলে মেয়ে
ভারসাম্য বাঁধা আছে একটিমাত্র চুলে
তবু ছলচ্ছল হেসে ওরা কেন
আকাশ সাঁতরায় ?

ঝড় নয়, পাখি উড়ে গেলে
যেটুকু বাতাস কাঁপে তাও যেন বেশি
পৃথিবীর রোদ-বৃষ্টি ভাগাভাগি হয়ে গেছে কবে
সব ভূমি রক্ত মাংসে গাঁথা
নেহাত আকাশ ছাড়া আর কোনো উদ্যানের
অবিঘ্নতা নেই
তবু ওরা চুলে বাঁধা ভারসাম্যে দোল খায়
সকৌতুক মুখ দুটি শিল্প হয়ে ওঠে
মহাকাল ব্যগ্র হয়ে দেখে
দেখে যে আশ্ মেটে না
চক্ষে লাগে দুঃখের কাজল ।

জলের দর্পণে

মাথার ভিতরে এক কালো দিঘি অতিকায় জলের দর্পণ
স্তব্ধ, স্থির, নিবাত নিষ্কম্প, শুধু
রাজহংসীটির ছেলেখেলা
কোনাকুনি জলকে দু'ভাগ করে চলে যায়
খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে মেঘ
রাজহংসীটির এই রমণীয় একাকিত্ব
মেধার গহনে আনে তাপ
জল ভাঙে, জলের ভিতরে ছবি ভেঙে যায়
মেঘের সারল্য সব ঈর্ষা মুছে বলে
সুন্দর সুন্দরতর হতে পারে
মহত্ত্বও আরও মহীয়ান
এইসব কিছুই চাক্ষুষ নয়, জলের ভিতরে
যেন এই পৃথিবীতে দেখা এক অলীক পৃথিবী।

অ

কে যে মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে
তবু ভালো, শোনার মতন কেউ নেই
সকলেই ঘোর অমাবস্যা দেখতে গিয়েছে সমুদ্রে
মনীশেরও পোশাকের মধ্যে আছে অতিশয় শশব্যস্ত অ-মনীশ
তার বন্ধু অ-অরুণ, অ-সিদ্ধার্থ
অ-লাবণ্য এরাও গিয়েছে

কে যেন মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে
অ-ভালোবাসায় মগ্ন ওরা সব,
সকলেই এক হয়ে আছে
এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে বাকিটুকু চুনকাম হয়
ঘর-বাড়ি ভেঙেচুরে সর্বস্ব নতুন
অ-ব্যবহৃত ক্রেন অমানুষ হয়ে উঁকি মারে

কে যেন মনীশকে ডাকলো মনীশের জাগরণ ভেঙে ?

মনীশ, মনীশ:, এসো, টেলিফোন, দূর থেকে কেউ…
অ-মনীশ ছুটে এলো,
কার জন্য ? ও আমার নয় !

অ-লেখা চিঠিও ফিরে যায়, যেরকম অ-দেখা স্বপ্নের বর্ণচ্ছটা
ও আমার নয়, এই অসময়ে কেউ ডাকবে না
বস্তুত ঘুমই হয়নি কয়েক রাত, অতিক্রুত চল্‌ছে মেরামতি
কালই একটা কিছু হবে। সকলেই তৈরি থাকো,
তৈরি হও, কাল
আগামী কালের জন্য অপেক্ষায় আছে এই
জীবনের অ-বিপুল অ-পূর্ণতা

অ-মনীশ গেছে তার অ-বন্ধু ও অ-বান্ধবী
সকলের কাছে
কে যেন মনীশকে ডাকলো মনীশের জাগরণ ভেঙে ?
ও আমার নয়, এই অ-সময়ে কেউ ডাকবে না।

কল্যাণেশ্বরী বাংলোয়

এই নিস্তব্ধতা বড় তীক্ষ্ণ, যে শব্দভেদী, যে প্রেমহীন
মানুষের কাছাকাছি মানুষের বিকিরণ টের পাওয়া যায়
এখানে মানুষ নেই, বৃক্ষ-সমাজের থেকে এত বেশি নিশ্বাসের হাওয়া
আমাকে একলা নিতে হবে, সতেরো জনের খুশি হবার মতন
পাখিদের ডাকাডাকি আমার একার জন্য,
এতদূর আকাশ সীমানা
অনায়াসে দুঃখী মানুষেরা মিলে ভাগ করে নেওয়া যেত,
এত আলো, এত নীল অন্ধকার, আমাকে বিপুল ধনী করে দেয়
এত বিলাসিতা যেন আমার সাজে না !

বৃদ্ধ চৌকিদার গেছে বরাকরে, রাতে সে ফিরবে না
আমার রাজত্বে আজ আমিই রাজা ও প্রজা, সঙ্গে আছে
দুটি হাত, দুটি পা ও কুড়িটি আঙুল
একুশটিও বলা যায়

তাছাড়া অজস্র পক্ষপাত, রোমকূপ, ছটি প্রিয় বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং
ছ'রকম রিপু
তবু একাকিত্ব হয় সভাপতি, বাকি সব অস্পষ্ট নীরব
এমন নির্জনে আমি সহসা ভয়ার্ত হয়ে উঠি,
নিজেকেই ভয়, আর কাকে ?

এমন নিবিড়ভাবে নিজের সান্নিধ্যে নিজে দেখা হলে
পাথরের বিশুদ্ধতা ভেঙে যায়, ভেঙে যায় নদীর গরিমা
কীর্তি মাথা নিচু করে, ভুল স্বর্গ নেমে আসে কাছে
কত না জবাবদিহি, কত অনিত্যের শিহরন
তার চেয়ে স্মৃতি ভালো
তার চেয়ে নারীদের রূপ রোমন্থন করা ভালো
অথবা উলঙ্গ হয়ে বারান্দায় রাত্রি প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাওয়া ভালো।

মনে পড়ে না ?

আপাতত বিশ্বশান্তি, একঘণ্টা চব্বিশ মিনিট
তীব্র নীল আলো ফেলে
উড়ে গেল অন্যদেশী পাখি
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো

শান্ত চেয়ারের পাশে লাল ছাতা, চটি জোড়া
দরজার কাছে
তোমার হাতের রোদ মুখের সমুদ্রে খেলা করে।

কিছুক্ষণ আমার আমিত্ব যাক মধ্য এশিয়ায়
আমি কেউ নই, আমি তৃষ্ণার্ত সন্ন্যাসী
তুমি ডান হাত তোলো আঙুলে জ্বালাও দীপাবলী
সকলেই জানে আমি অগ্নিভুক, অনায়াসে দিতে পারো
যত আছে যুদ্ধের বারুদ
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো
পায়ের পাতার কাছে গালিচার মতন আকাশ।

ভালোবাসা কিছু নয়, তার জন্য আছে দুঃসময়

চতুর্দিকে ভারি ভারি স্তম্ভ, তার ফাঁকে ফাঁকে
চড়ুইয়ের বাসা
দেখেছি অনেক দয়া, দেখেছি মৃত্যুর পরিহাস
এত মেঘ, এত মেঘ, জীবন জড়িয়ে আছে
রূপক মেঘেরা

বিদ্যুৎ চমক, শোনো, শব্দ শোনো একঘণ্টা চব্বিশ মিনিট
একটি নিশান, শুভ্র, নিয়ে আসে চোখের দেবতা
আর সব থেমে আছে, আলো-অন্ধকার মিশে আছে
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো
এতদিন পর দেখা, মনে কি পড়ে না কিছু, নীরা ?

বন্ধু-সম্মিলন

বন্ধু-সম্মিলন ছিল কাল মধ্যরাতে
চাঁদের পাড়ায় খুব গণ্ডগোল, পরীরা সবাই নিরুদ্দেশ
নদীর কিনার ঘেঁষে বাঁধা নীল তাঁবু
আমাদের ছেলেবেলা, আমাদের পাগলামির
সোঁদা গন্ধ মাখা
বাতাস উনপঞ্চাশ, দিগন্তের ওপারে আকাশ

আমাদের পদধ্বনি শুনে থেমে যায় ঝিল্লিরব
আঁধার উজ্জ্বল হলো আমাদের নিজস্ব মশালে
শরীরের রোমহর্ষ, প্রথম শীতের স্নিগ্ধ স্বাদ
পুরোনো কালের সেই শতরঞ্জি, খুবই যেন
চেনাশুনো ধুলো

বহুদিন পর দেখা, হাসাহাসি ভুরুর তলায়
কথা নেই, সকলেই সব জানি, নীরবতা ছিল মধ্যমণি
বন্ধু-সম্মিলন ছিল কাল মধ্যরাতে ।

মিথ্যে নয়

কবিতার সার কথা সত্য, অথচ কবিরা সব
মিথ্যুকের একশেষ নয় ?

নীরার গলায় আমি কতবার দুলিয়েছি উপমার মণিহার
ভোরবেলা
নীরার দু'হাতে আমি তুলে দিই
শিশির-মাখানো সাদা ফুল
ফুলগুলি জাদু সরঞ্জাম যেন
হঠাৎ অদৃশ্য হতে জানে
কতকাল ফুল ছুঁইনি, আঙুল পোড়ায় সিগারেট !

বিশুদ্ধ পোশাক পরা আমি এক ফুলবাবু
সন্ধেবেলা ফুরফুরে বাতাসে
বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেতে থাকি তর্কে ও উল্লাসে ।
সেই আমি মধ্যরাতে কবিতার খাতা খুলে
নির্জন নদীর ধারে একাকী পথিক
হাত দুটি যুক্তি-ছেঁড়া রূপের কাঙাল ।

আমার কাঙালপনা দুর্লভ দু'একদিন
নীরাকেও করে তোলে
কিছু দয়াবতী
তীর্থের পুণ্যের মতো সামান্য লাবণ্য ছুঁয়ে দেয়
তীর্থের পুণ্যের মতো ? তার চেয়ে কম কিংবা
বেশি নয় ?
রত্ন-সিংহাসন আমি এ-জন্মে দেখিনি একটাও
তবুও নীরার জন্য বৈদূর্যমণির সিংহাসন আমি
পেতে রাখি
যদি সে কখনো আসে, সেখানে সে বসবে না
জলে-ভেজা একটি পা
শুধু তুলে দেবে ।

মিথ্যে নয়,
২২২

নীরা, তুমি জেনে রাখো, সেরকমই সাজানো রয়েছে।

অপরাহ্ণে

তোমার মুখের পাশ কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো
এপাশে দেয়াল, এত মাকড়সার জাল।
অন্যদিকে নদী, নাকি ঈর্ষা?
আসলে ব্যস্ততাময় অপরাহ্ণে ছায়া ফেলে যায়
বাল্য প্রেম
মানুষের ভিড়ে কোনো মানুষ থাকে না
অসম্ভব নির্জনতা চৌরাস্তায় বিহ্বল কৈশোর
এলোমেলো পদক্ষেপ, এতদিন পর তুমি এলে?
তোমার মুখের পাশে কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো।

খণ্ড ইতিহাস

মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ ঘর বাড়ি, এসব কাদের?
কাঠবিড়ালি ও ভোমরা, সদ্য-বিবাহিত পাখিদের।
মাঠের কি স্মৃতি নেই, মনে নেই তার বাল্যকাল
এইখানে শুয়ে ছিল বাপ-মা-খেদানো এক
উদাসী রাখাল
কিছুটা জঙ্গলও ছিল, পাতা-ঝরা গান হতো শীতে
একটি জারুল সব লিখে গেছে আত্মজীবনীতে।

পাথর-পূজারী এক সন্ন্যাসীর স্বপ্ন ছিল, ঘুম ছিল,
দুঃখ ছিল বেশি
জ্যোৎস্নার মতন হাসি সঙ্গিনীটি বিশ্বাসঘাতিনী এলোকেশী।
সেই পাথরেরও ছিল অনেক জমানো গুপ্ত কথা
পিঁপড়েরা সব জানে, মাটির গভীরে আজও জমে আছে
ওদের ভাষার নীরবতা...

এসবই পুরোনো ইতিকথা, সেই দুঃখী সন্ন্যাসীর বংশধর

এখন তোফায় আছে, পগোয়াপট্টির এক নিত্য
সওদাগর
রাখালেরও উত্তরাধিকার আছে, রাজমিস্ত্রি,
মজুর, জোগাড়ে
লাল-নীল-সোনালী হর্ম্যেরা জাগে কয়েকটি
মহিষ রুক্ষ ঘাড়ে
প্রতিটি জানলায় পর্দা, বারান্দায় ডালপালা
মেলে আজও রয়েছে প্রকৃতি
কাঠবিড়ালিরা ঘোরে সাইকেলে, ভোমরার গুঞ্জনে রাষ্ট্রনীতি
পাহাড়ের পাঁজরা ভাঙা মোরামের রাজপথ, আর কিছু
খুন্‌সুটি গলি
সংসারী পাখিরা ছোটে ভোরবেলা, ঠোঁটে ঝোলে
বাজারের থলি।

আত্মপরিচয়

আমাকে চিনতেন তিনি, দেখা হতে বললেন, কে তুমি ?
তখন বিকেল ছিল নদীর উড়ন্ত বুকে ঝুঁকে
আমি বললুম, সেই বারুদ-ঝড়ের দিনে একলা
ধানক্ষেতে যে সহাস্যে শুয়ে ছিল রক্তমাখা মুখে
আমি তারই বিদেশী যমজ।

তাঁর কালো আলখাল্লায় সোনালী রোদের বাঁকা সুতো
দাড়ির জঙ্গলে জ্বলে শতাব্দী ছাড়ানো দুই চোখ
পাহাড়ী গ্রীষ্মের হাওয়া হাসলেন দিগন্ত উড়িয়ে
বললেন, শোনো হে, তুমি, ভাই-বন্ধু যে হোক সে হোক
বলো দেখি, পিতা কে, মাতা কে ?

তখন আকাশ হলো রাত্রিমুখী, নদী দিল ডুব
খরোষ্ঠী লিপির টানে মৃদু হাস্যে জানালুম তাঁকে
আমার জন্মের কোনো দায় নেই, যেরকম উট্‌কো পরগাছা
শ্মশানের ঝাড়ুদার বাপ আর শকুনেরা ছিঁড়ে খায় মাকে
তবু আমি সত্যের জারজ !

একমাত্র সাবলীল

এই সাবলীলতার কাছে তুমি হাঁটু মুড়ে বসো
আর   সবই জটিল, অলীক
মানুষের কাছাকাছি মানুষের দূরত্ব গহন
হাতে কিছু ছোঁয়া যায় না, চোখ দিয়ে
দেখা যায় না কিছু
একমাত্র সাবলীল, যার ধ্বনি মাতৃগর্ভ জানে।

পিঁপড়ে জানে, পাখিরাও জানে
বুড়ো ঘোড়া পাহাড়ের প্রান্তে গিয়ে চোখ বুজে শোয়
আকাশে দেবতা নেই, জলে নেই জীবন্ত ঈশ্বর
নশ্বরতা শব্দ করে, বাতাস অগ্রাহ্য ভাবে
অভিমানহীন চলে যায়…
সেই সাবলীলতার কাছে তুমি হাঁটু মুড়ে বসো
সেই সাবলীলতার কাছে থাক নির্জন বিশ্বাস
সেই সাবলীলতার কাছে থাক আত্মপ্রেম-রতি
জীবন দু'দিকে যায় নিজের নিয়মে।

ডাক শোনা যাবে

এই সুখ কে এনেছে
তাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও!

এই ছিটে-বেড়া-দেওয়া বাড়ি
কে ছিল এখানে
শিউলি গাছটি আজ হিম ঝড়ে নত
সে কি জানে?
এত এলোমেলো পদাঘাত
তুমুল শৈশবে
দু'হাতে বারুদ মেখে খেলা
শেষ হলো কবে?
সবুজ দিঘির পাশ ধুলো-মাখা-হাঁস

হংসীটিও কালো
বাতাসে পরাগ-গন্ধ, মাদক-বাতাস
কোথায় হারালো ?
সেই প্রেম
স্তন ছুঁয়ে ফুলের আদর
উরুর গরম থেকে বুক-কাঁপা রোদ
জ্যোৎস্না-মাখা ঝড় !
সেই চিঠি, হাসির মুকুট
ভয়-ভাঙানোর অবলীলা
আকাশে উড়ন্ত প্রিয় গন্ধ
সব দুঃখ অন্তঃসলিলা ।

॥ ২ ॥

এই সুখ কে এনেছে
তাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও ।

সহসা ভেঙেছে যারা পাথরের ঘুম
বজ্রমুঠি লোহার আগুনে
তাদের বুকের মধ্যে জমেছে পাথর
শব্দ শুনে শুনে ।
সার্থকতা বিমানের সিঁড়ি
ছাপার অক্ষরে ভালোবাসা
যেখানে হৃদয় ছিল, আজ
অচেনা বন্ধুরা খেলে পাশা
সেই নারী উষ্ণ সশরীর
অন্ধ খোঁজে তাকে
শীতের পাখিরা আসে পথ ভুলে
প্রবল বৈশাখে ।
এই সুখ, এই সে ঘাতক
তুলে নাও ছুরি
রক্তস্নানে যদি দ্বিধা হয়
অন্য হাতে ভুলের মাধুরী ।
চোখে চোখ, বুকে বুক আর

ওষ্ঠে গোলাপের ওষ্ঠ দিয়ো
অন্তরীক্ষে ডাক শোনা যাবে
রোমিও ! রোমিও !

প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায়

বিশ্বাসই হয় না যেন এতদিন কেটে গেছে
এই তো সেদিন দেখা হলো
মোড়ের দোকানে এসে দুটি সিগারেট ধার, মনে নেই ?
বৃষ্টি ভেজা হাঁটা পথ, চতুর্দিকে কত চেনা বাড়ি
যখন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, বাদলের ছোড়দিকে
অনায়াসে বলা যায় শার্ট খুলে
একটা বোতাম একটু লাগিয়ে দিন না
এই তো সেদিন মাত্র দুপুরে জিনের পাঁট হাতে নিয়ে
অকস্মাৎ শক্তি উপস্থিত
চোখ টিপে বলে উঠলো, অফিসের বেয়ারাকে দিতে বলো
দুটো খুব ছোট ছোট নীল-রঙা গ্লাস
চায়ের দোকানে এসে প্রণবেন্দু শোনাতো পেলব স্বরে নতুন কবিতা
শরতের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম আর সমীরের উপহার
নতুন চাইবাসা
ঠিক যেন গতকাল, বন্ধুদের পাশ ছেড়ে,
নিঃশব্দে পালাতুম মানিকতলায়
এবং এক পা তুলে ফুটপাথ প্রতীক্ষায় কেটে যেত
দণ্ড পল, অনেক প্রহর
গানের ইস্কুল থেকে যদি কেউ আসে, যদি
একবার চোখ তুলে চায়
আজও যেন রয়ে গেছি প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
যদি দেখা হয় !

অন্য ভাষ্য

প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহংকার দেয়

আমি মানুষ হিসেবে একটু উঁচু হয়ে উঠি
দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত
ছড়িয়ে যায়
যেন ভোরের আলোয় নদীতে স্নানের মতন স্নিগ্ধ
সমস্ত মানুষের চেয়ে আমি অন্য দিকে
আমার আলাদা পথ
আমার হাতে পৃথিবীর প্রথম ব্যর্থ প্রেমিকের উজ্জ্বল
পতাকা
সার্থক মানুষের অশ্লীল মুখ আমাকে দেখে ভয় পায়
আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই,
রিক্সাওয়ালাকে দিই সিগারেট
যীশুর মাথা থেকে খসে পড়েছে কাঁটার মুকুট
তুলে দিতে হয় আমাকেই
আমার দু'হাত ভর্তি অঢেল দয়া, আমাকে কেউ
ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা বিশ্বপ্রকৃতিকে
মনে হয় খুব আপন
আমার অহংকার পাহাড় শিখর ছাড়িয়ে ফের বিনীত
হয়ে আসে
আমি দুনিয়াকে সুখী হবার আশীর্বাদ করি।

নীরা, তুমি…

নীরা, তুমি নিরন্নকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে এইমাত্র
আমাকে দেবে না ?
শ্মশানে ঘুমিয়ে থাকি, ছাই-ভস্ম খাই, গায়ে মাখি
নদী-সহবাসে কাটে দিন
এই নদী গৌতম বুদ্ধকে দেখেছিল
পরবর্তী বারুদের আস্তরণও গায়ে মেখেছিল
এই নদী তুমি।

বড় দেরি হয়ে গেল, আকাশ পোশাক হতে বেশি বাকি নেই
শতাব্দীর বাঁশবনে সাংঘাতিক ফুটেছে মুকুল
শোনোনি কি ঘোর দ্রিমি দ্রিমি ?

জলের ভিতর থেকে সমুত্থিত জল কথা বলে
মরুভূমি মেরুভূমি পরস্পর ইশারায় ডাকে
শোনো, বুকের অলিন্দে গিয়ে শোনো
হে নিবিড় মায়াবিনী, ঝলমলে আঙুল তুলে দাও
কাব্যে নয়, নদীর শরীরে নয়, নীরা
চশমা-খোলা মুখখানি বৃষ্টিজলে ধুয়ে
কাছাকাছি আনো
নীরা, তুমি নীরা হয়ে এসো !

কে ?

বাগানে কার পায়ের ছাপ ? ফুল-ঘাতক
কে ?
নদীর ধারে পথ হারানো একলা-মুখো
কে ?
দৌড়ে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে গেল
কে ?
বাঁ হাত ভরা প্রতিশ্রুতি, ডান হাতে ভয়
কে ?
রিক্সাওয়ালার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে নাচে
কে ?
ফিরে আসবো বলেও আর ফিরে এলো না
কে ?
সারাবছর স্বপ্ন দ্যাখে ছুটি চুরির
কে ?
তোমার মিথ্যে আমার মিথ্যে বদলে নেয়
কে ?
লালকে হলুদ হলুদকে লাল রঙ ফেরায়
কে ?
আগুন কিংবা প্রেমের মধ্যে জল মেশায়
কে ?
দুঃখ আর অতৃপ্তির তৃতীয় ভাই
কে ?

মুহূর্তের অস্থিরতা

বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার বারান্দায়
শীতের রোদ্দুরে
আমারই মনুষ্যদেহ।

বাগানে অনেক ডালপালা, তার এক ডালে
কুসুম ফোটেনি
সেখানে আমার আত্মা।

কখনো আমার হিম আত্মা এই নরদেহ
চেয়ে চেয়ে দেখে
দেখার মতন দেখা।
কখনো লৌকিক চোখ সুড়ঙ্গ দেখার
মতো সরু চোখে
আত্মার দর্শন চায়।

কিছুই মেলে না
মুহূর্তের অস্থিরতা ঘূর্ণী বাতাসের মতো উড়ে গেলে
আয়নায় রক্তের ছাপ পড়ে
আমারই থুত্‌নির রক্ত—

মাত্র এই এক জীবনে

অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
নদীর এক ধারে শুধু সারিবদ্ধ গাছ রুদ্ধবাক
আমাদের দিনগুলি জলের ভেতরে জল
তারও নিচে জল
রোদ্দুরের পাশাপাশি ছায়ার নির্মাণ, তারা ক্রমশই গাঢ়
অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
যে-কথা তোমার নয়, যে-কথা আমার নয়

সকলেই সেই কথা বলে
কেউ চলে যায় দূরে একা মুখ লুকোবার ছলে
পিঁপড়ের সংসার ভেঙে যায়
পড়ে থাকে ঝুরো ঝুরো মাটি
ভালোবাসা ছিল, যেন লম্বা এক গলা তোলা প্রাণী
দিন চলে যায় রাতে, রাত্রিগুলি শুধুই অদৃশ্য
নীরব মুহূর্তে গাঁথা মালাখানি আমাকেও রেখে যেতে হবে
অনেক গোপন কথা···
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা।

একটি প্রার্থনা-সংগীত

গরুদের জন্য দাও ঘাস জমি, খোলামেলা ঘাস জমি,
চিকন সবুজ
ওরা তো চেনে না কোনো রান্নাঘর, ওরা বড় ন্যালাখ্যাপা
অবোধ অবুঝ
কুকুরের জন্য দাও কাঁচা মাংস, লাল মাংস, রক্তমাখা হাড়
ওরা তো খায় না ঘাস, সবুজকে ঘেন্না করে, ওরা চায়
হাড়ের পাহাড়
বাঘেরা বেচারি বড়, দিন দিন কমে যায়, চিড়িয়াখানায় শুধু
বাঘ দেখা হবে ?

ওদেরও জন্য দাও নধর হরিণ, দাও খরগোশ
বনের বাঘেরা ফের
মাতুক পুরোনো উৎসবে।
বিড়ালকে মাছ দাও, ব্যাঙেদের সাপ দাও, থুড়ি থুড়ি থুড়ি
সাপদের দাও ব্যাঙ, ছোট-বড় ব্যাঙ
টিকটিকিদের দাও প্রজাপতি, আর কুমিরকে মাঝে মাঝে
ছুঁড়ে দিয়ো
দু-একটা ছাগলের ঠ্যাং।

নদীদের মেঘ দাও, পাহাড়কে দিয়ো গাছ, আর গাছেদের
দিয়ো ঠিকঠাক ফুল ফল

পেঁপে গাছে কোনোদিন ফলে না কখনো যেন হঠাৎ কাঁঠাল
আর নারকোলে ভুল করে
কোকোকোলা দিয়োনাকো
দিয়ো শাঁস জল !

আর মানুষের জন্য দাও...
আর মানুষের জন্য দাও...
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, হা-হা-হা-হা
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, হা-হা-হা-হা
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। ...

মধ্যরাত্রির নিরালায়

মধ্যরাত্রির নিরালায় সন্ন্যাসী তাঁর মুখোশটি খুলে
দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেন
তারপর শুতে গেলেন পাথুরে মেঝেতে
তাঁর বিনা সাধনায় ঘুম এলো
ক্রমশ তাঁর ওষ্ঠে ফুটে ওঠে ম্লান, ছাইমাখা হাসি
হাত দুটি বুকের ওপরে আড়াআড়ি রাখা
এখন তিনি ঈশ্বরহীন প্রকৃত নিঃসঙ্গ।

আকাশ-ছড়ানো স্তব্ধতা খানখান করে চিরে
অকস্মাৎ ধমকে উঠলো চন্দ্রমৌলি পাহাড়-শিখরের বজ্র
পাইন বনের কোনাচে গড়ন ঝলসে উঠলো
কোনো এক অজানা শিসের তীক্ষ্ণ শব্দে
সন্ন্যাসী পাশ ফিরলেন, মুখে তাঁর
শিশুকালের লালা
একটি কালো রঙের বেড়াল থাবা ঘুরিয়ে মারলো
জ্যোৎস্নার ছায়াকে
ধুনির নিভন্ত আগুনে কোনো কাঠুরের দীর্ঘশ্বাস
নারীর গোপন দুঃখের মতন অন্ধকার-ঢাকা নদী.

তার কিনারে পায়ের ছাপ
ঘুমন্ত সন্ন্যাসীর পবিত্র অন্তঃকরণ থেকে
জেগে উঠলো হাহাকার,
আমি ! আমি !
তাঁর শরীরে ছিঁড়ে যেতে চাইলো চার খণ্ডে
হাত তুলে তিনি ব্যাকুলভাবে আলিঙ্গন করলেন
শূন্যতা
তৃতীয় প্রহরের নিয়মিত দুঃস্বপ্নে তাঁকে
পাহারা দিতে লাগলো
তাঁর কঠিন, জাগ্রত পুরুষাঙ্গ ।—

জনমদুখিনী

যতদিন ছিলে তুমি পরাধীনা ততদিন ছিলে তুমি সবার জননী
এখন তোমাকে আর মা বলে ডাকে না কেউ
লেখে না তোমার নামে কবিতা
বুক মোচড়ানো সুরে সেইসব গান
গুপ্ত কুঠুরিতে মৃদু মোমের আলোর সামনে আবেগের মাতামাতি
জনমদুখিনী মা কোনোদিন স্বাধীনা হলে না
এখন তোমাকে আর ভুলেও ডাকে না কেউ
আঁকে না তোমার কোনো ছবি
কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়
নদীর এপার দিয়ে, নদীর ওপার দিয়ে চলে যায় বিষণ্ণ মানুষ !

সমূহ অতল

কে অমন নেমে গেল এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে ছুটে
দরজা খোলা, সমস্ত আসবাবে হাহাকার
জানালা আছড়ে দিল রঙিন বাতাস ।

কলের জলের স্রোত অকস্মাৎ গেল অস্তাচলে
শূন্য ছাইদান থেকে উঠে আসে ধোঁয়া

কে কোথায় হেসে উঠলো কথা ঘোরাবার লঘু ছলে ?

দেয়াল ঘড়িটি বন্ধ, পাশে ডেকে উঠলো টিকটিকি
জানালা আছড়ে দিল রঙিন বাতাস
এক দিকে পাশ ফেরা ছবির রমণী দোলে, উরু দোল খায় ।

আলো ছিঁড়ে যায় মেঘে, ক্রমশই আরোপিত মেঘ
মানুষের একাকিত্ব ছুঁয়ে দেয় সশব্দ প্রকৃতি
আমিও মানুষ, নাকি অবয়ব, ছিঁড়েছে শিকড় ?

এখানে ছিল না কেউ, এখানে আমিও নই একা
কে অমন নেমে গেল দপ্‌দপিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে
এমনও তো সিঁড়ি আছে, যার নিচে সমূহ অতল ।

কাব্যজিজ্ঞাসা

মায়ের কপট ঘুম, বাপ বাইরে,
তিনটি শিশু কাঁদে অহরহ
ক্ষুধার্ত মানুষ আনে কাব্যে কোন্ রস, তা কি জানেন ভামহ ?
নদীটির মৃতদেহ আগলে আছে
গ্রামখানি, নির্মেঘ দুপুর
এই দৃশ্যে লাগে কোন্ অলংকার, তা কি লিখেছেন কর্ণপুর ?

চেনা হলো না

অন্তত সাড়ে-তিন হাজার উপমা দিয়েছি
তবুও চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে ।

ধর্ম কিংবা ঈশ্বর চিন্তায় মন দিইনি কখনো
তাতে বাঁচিয়েছি অনেকটা সময়
সেই সময় নিয়ে মাথা খুঁড়েছি ছন্দ মিলে

শব্দের প্রতিবেশী শব্দ
ধ্বনির পাশাপাশি ধ্বনি
সব-কিছুর ওপর ঝড়ে নির্লিপ্ত ঘুম
তবু চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

সমুদ্রের ধারে শিহরন জাগানো নিরালা বাংলো
চাঁদ ও অন্ধকারের দায়িত্ব ছিল
সেখানে সব-কিছু সুসজ্জিত রাখার
ভিজে বালির রেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে
একদিন দেখা হলো
জেলেপাড়ার মহারানীর সঙ্গে
চমকে উঠেছিলুম, এ কী সেই
যার জন্য আমার নিজস্ব দ্বীপে
বাতাবরণ সৃষ্টি করার কথা ?
চোখের নিমেষে সে কাদাখোঁচা হয়ে উড়ে গেল।
তখন আমি নিয়ে বসলুম
খাতা ও কলম
তবুও চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

হাসপাতালে নার্সের কপালে গোল আয়না
যেন প্রথম দিনের সূর্য
আবার উপমা ? না. আয়না শুধু আয়না
কিন্তু তাকেও প্রশ্ন করা যায়,
আর কি ফিরে আসবো, আবার দেখা হবে ?
জ্ঞান হবার পর ফিরে এলো অন্য একজন মানুষ
আয়নায় অন্য মুখ
চেনা হলো না, চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

নীল হাত

অর্জুন গাছের সঙ্গে বাঁধা ছোট ডাক-বাক্সটিকে
এইমাত্র ছুঁয়ে গেল একটি নীল হাত
মেখলিগঞ্জের রাস্তা শুয়ে আছে
এপাশে ওপাশে শুনশান।

বড় বড় গাছগুলি রোগা হয়ে গেছে এই শীতে
গোলাপ বাগানে ওরা স্বাস্থ্যবতী,
যে-রকম সবজিরা যুবতী
ভোরের পাতলা হাওয়া দোল খায় দোপাটির ঝাড়ে
সবই অবিচ্ছিন্ন ঠিকঠাক
তবু সাতটার বাসে জানলা থেকে
এক ঝলক একটি নীল হাত
আমায় হাতছানি দিয়ে গেল !

নীল, নীল, শুদ্ধ নীল, সমুদ্রে চাঁদের মতো নীল
অলীক বিদ্যুৎ লেখা যেন খুব কাছে
কখনো দেখিনি স্বপ্নে, চোখের পলকমাত্র দেখা
কৈশোর যৌবন ঘিরে স্পষ্ট তিনবার
যেদিন একুশে পা, মনে আছে
শেষবার সেই হাত প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল ।

নীল হাত, নীল হাত, আমার এমন জ্বরে গরম নিশ্বাসে
দুপুরের নিরালায়, শরীরের বিষে
একাকিত্ব যাতনায়, মানুষের মুখ ভুলে যাওয়ায় বাসনায়
একবার চোখে চেপে ধরো।

ভোরবেলার মুখচ্ছবি

ভোরবেলার মুখচ্ছবি কোথায় লুকিয়ে রাখো
সারাদিন ?

দিনগুলি রেফ্‌ ও র-ফলা দিয়ে লেখা
স্নেহ গলে যায় রোদে, রোমকূপে বেড়ে ওঠে ঝাঁঝ
হাসি হাসি মুখগুলি এ ওর দু'কানে ঢালে বিষ
পাখি নেই, খাঁচাগুলি নড়ে চড়ে অযথা দৌড়োয়
জুতোর তলার ধুলো ধুলো নয় প্রচ্ছন্ন বারুদ
তোমায় দেখি না কেন, দেখেও চিনি না···

ভোরবেলার মুখচ্ছবি কোথায় লুকিয়ে রাখো
সারাদিন ?

খিদে-তেষ্টা

সজোরে খিদে পেয়েছিল,
তাই গিয়েছি খিড়কির দরজায়
এরকম ছোট ভুল হয়
নিজের হাত-পা তো কামড়ে কামড়ে খাইনি
দাঁত বসাইনি কোনো
চকিতা হরিণীর ঘাড়ে
শুধু ভিক্ষে চেয়েছিলুম তার কাছে।
ঘুমের মধ্যে সারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে
ভেঙে যায় ভুল
তবু আবার তো ঘুমোতেই হয় মানুষকে
পরবর্তী ভুলটির জন্য।

তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছিল
কিন্তু এমন কিছু না
মরীচিকা ভেবে তো ছুটে যাইনি
কারুর কেয়ারি করা বাগানে
চাল-আড়তের কুলির

বুকের ঘাম চাটিনি
জিভ বাড়াইনি সম্রাটের
এঁটো থুতুর দিকে
তবু তো তৃষ্ণা মরে না !
বাতাসে নেই বৃষ্টি
শুকনো ঝর্নারি ধারে পড়ে আছে
একরাশ মৃত প্রজাপতি
চোখে পড়ে না কোনো স্নিগ্ধ
অমৃত সরোবর ।
আমার অস্থিরতা অজগরের মতন ফোঁসে
কারুকে কাঁদাবার জন্য
তার অশ্রু পান করবার জন্য ।

বিরহিণীর শেষ রাত্রি

নতুন জানলার পাশে দাড়ি-না-কামানো থুত্‌নি
রাত-জাগা চোখ ।
কিছু দূরে টিলা
ডালপালা ছুঁয়ে আছে পীতবর্ণ মেঘ
তার ওপাশ অসীমের ঘর-বাড়ি ।
বাতাসে ছড়িয়ে আছে তারা-পোড়া ছাই
বস্তুত এখন এই শেষ রাতে পৃথিবীরও
হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠবার
দাবি আছে ।
এই নারী…
সেও কি পুরুষ চায়…
ছায়াপথ জুড়ে তার রতিতৃষ্ণা
উরু খুলে ডাকে কোনো চণ্ডাল-গ্রহকে ?

হঠাৎ আকাশ খুলে যায়
যেন কোনো জাদুকর আমার মোহকে
জব্দ করবার জলে ছড়িয়েছে নতুন সম্মোহ
লক্ষ লক্ষ ডানাওয়ালা শিশু

হুবহু প্রি-র‍্যাফেলাইট
দ্বাদশ সূর্যকে ঘিরে খলখল শব্দে
হাসে।
এরা সব কোথা থেকে এলো ?
আমি তন্নতন্ন করে খুঁজি
ফের সিগারেট জ্বেলে
দেখি এই নতুন আকাশ।

পূর্বসংস্কার বশে আমার মগজ চায়
হাওয়ার তরঙ্গে ভাসা
দিক্‌বসনা রুবেন্‌স রমণী।
নেই।
শুধু শিশুদের ওড়াউড়ি…
ক্রমে ক্রমে তারা সব রং হয়ে গলে পড়ে
যেরকম রং
ছোঁয়নি কখনো কোনো পার্থিব আঙুল।
নীলের হৃদয়-চেরা নীল
টারকোয়াজ মথিত চাপা আভা
মার্জার চক্ষুর মতো বিচ্ছুরিত হলুদ-খয়েরি
পাথরের ঘুম-ভাঙা সহসা-রক্তিম…
সেইসব রং ঠিক
জলস্তম্ভ হয়ে ওঠে
ফের ভাঙে
পরস্পর ঝাপ্‌টা মারে, যেন
শত শত ঐরাবত
স্নানের নেশায় মেতে আছে।

এমন নয় যে আমি এতেই মুগ্ধ হবো
স্তব্ধবাক হয়ে যাবো।
দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ভেদ করে
উঠে আসে কান্না
এই দুঃখী বিরহিণী পৃথিবীর কান্নার আওয়াজ
কিছুতে ঢাকে না।
জেগে ওঠে গাছপালা

নদী ও নগরী
সুন্দরের একান্ত নিজস্ব নশ্বরতা।
মানুষ চায় না আর
মানুষের আয়ু
শিশুর খেলনার মতো চুতর্দিকে ধ্বংসবীজ
যে-কোনো রাত্রিই যেন
শেষ রাত
যে-কোনো শব্দই যেন শেষ ধ্বনি
যে-কোনো আলোই যেন
শেষ অন্ধকার আমন্ত্রণ।
যদি তাই হয়, তবে
তার আগে
রজস্বলা, হে ধরিত্রী,
অন্তত একবার
মহান সঙ্গমে যাও মহাশূন্যে
জ্বলে ওঠো
নিজের আগুনে।

একটা দুটো ইচ্ছে

একটা দুটো ইচ্ছে আমায় ছুটি দিচ্ছে না
যাবার কথা ছিল আমার সাড়ে ন'টার ট্রেনে
ছিল অটুট বন্দোবস্ত, রাত-পোশাকের বোতাম
তিনটে বাতিঘর পেরুলেই সীমা-সুখের স্বর্গ
একটা দুটো ইচ্ছে আমায় ছুটি দিচ্ছে না।

খেলাচ্ছলে দেখা হলো, খেলা ভাঙলো রাতে
শরীরময় জড়িয়ে রইলো সুদূরপন্থী হাওয়া
নদীর মতো নারীর ঘ্রাণ মোহ মধুর স্মৃতি
সবই বুকের কাছাকাছি, যেমন কাছে আকাশ
একটা দুটো ইচ্ছে তবু ছুটি দিচ্ছে না।

কাব্য পরিচয়

দাঁড়াও সুন্দর

বৈশাখ ১৩৮২ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৭, পৃষ্ঠা ৬৪, দাম ৫ টাকা, বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'। পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) বইটির ৪৩টি কবিতা বিশ্ববাণী প্রকাশনীর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে প্রকাশিত হয়।

মন ভালো নেই

আষাঢ় ১৩৮৩ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৯, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ 'প্রতিমা ও শঙ্খ ঘোষকে'। পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) সম্পূর্ণ বইটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে অন্তর্ভূত হয়।

এসেছি দৈব পিকনিকে

শ্রাবণ ১৩৮৪ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৩, কাব্যনাটক ১টি, পৃষ্ঠা ৬৮, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫ টাকা। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'মীনাক্ষী ও জ্যোতির্ময় দত্তকে'। বইটি পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে প্রকাশিত হয়।

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৪৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫ টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'ট্রুডবার্টা ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে'। পরে (শ্রাবণ ১৩৮৭) সম্পূর্ণ বইটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলনে প্রকাশিত হয়।

স্বর্গ নগরীর চাবি

শ্রাবণ ১৩৮৭ সালে বিশ্ববাণী প্রকাশনী (৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯) থেকে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ৩৭,

পৃষ্ঠা-৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৬ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'মেরিয়ান ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে'।

সোনার মুকুট থেকে

চৈত্র ১৩৮৮ সালে নাভানা (পি ১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা-৭২) থেকে প্রকাশ করেন কুশালকুমার রায়। কবিতার সংখ্যা ৩৪, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৮ টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। 'ডক্টর জয়ন্ত সেন-কে' বইটি উৎসর্গ করা হয়।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি, কবিতার নাম, পৃষ্ঠা)

জন্ম : ২১ ভাদ্র । ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) । ফরিদপুর, বাংলাদেশ ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ । টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু । তারপর নানা অভিজ্ঞতা । বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত ।
শখ : ভ্রমণ । দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন ।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ' । শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন' । ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন ।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা । প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ংকর সুন্দর' । ছদ্মনাম 'নীললোহিত' । আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়' ।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে ।
১৯৮৩ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার । সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে ।
গ্রন্থ-সংখ্যা : দ্বিশতাধিক ।
একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত ।

প্রচ্ছদ □ সুনীল শীল

কবিতাসমগ্র ১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

9 788172 150907

আনন্দ

কবিতাসমগ্র ৩ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ কালানুক্রমিক রূপে বিন্যস্ত করে প্রকাশিত হচ্ছে 'কবিতাসমগ্র'র এক একটি খণ্ড। বাংলা কবিতার যাঁরা প্রেমিক পাঠক, তাঁদের কাছে এ এক মস্ত খবর সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম সেরা রচয়িতা যিনি, তিনি বাংলা কবিতারও এক অতি শক্তিমান স্রষ্টা, তা কে না জানেন।

এই কথাটাও সবাই জানেন যে, পঞ্চাশের দশকে 'কৃত্তিবাস' নামক যে-আন্দোলন একদিন বাংলা কবিতার মোড় একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সুনীলই ছিলেন তার নেতৃস্থানীয় কবি। পাঠক, সমালোচক—সবাই সবিস্ময়ে লক্ষ করেছিলেন যে, এই কবি কোনও পুরনো কথা শোনাচ্ছেন না ; তিনি যা কিছু লিখছেন, তারই ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক ঝলক টাটকা বাতাস, আর সেই বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে এমন এক সৌরভ, যা তার আগে পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

কথাসাহিত্য ও কবিতার দাবি একই সঙ্গে মেটানোর কাজটা বড় শক্ত। এ কাজ সবাই করতে পারেন না। সুনীল যে পেরেছেন, তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। সবদিক থেকে একজন সফল সাহিত্যিক হয়েও এই সরল সত্য তিনি কখনও বিস্মৃত হননি যে, মূলত তিনি কবিই, এবং গদ্য নয়, কবিতাই তাঁর প্রথম প্রেম। সেই প্রেমের দাবি আজও তিনি মিটিয়ে যাচ্ছেন অকাতরে, পাঠকের আগ্রহকে সমানভাবে সঞ্জীবিত রেখে।

তাঁর 'কবিতাসমগ্র'-র এই তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ছ'টি কাব্যগ্রন্থ : স্মৃতির শহর ; সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে ; বাতাসে কিসের ডাক, শোনো ; নীরা, হারিয়ে যেও না ; সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর ; এবং রাত্রির রঁদেভু। এই সব কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা নানা বয়সী পাঠক-পাঠিকার স্মৃতিসম্পদ। বহু প্রবাদপ্রতিম পঙ্‌ক্তি আজও সকলের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'সেই মুহূর্তে নীরা' এই সংকলনে নেই। কবিতা সংগ্রহের চতুর্থ খণ্ডে সেই নীরার সঙ্গে চকিতে দেখা হবে।

ISBN 81-7215-851-3

কবিতাসমগ্র
৩

কবিতাসমগ্র

৩

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

শিখা ও সুব্রত রুদ্র-কে

ভূমিকা

এই তৃতীয় খণ্ডে আমার সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ ‘সেই মুহূর্তে নীরা’ ব্যতীত আর সব গ্রন্থই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আরও অনেক কবিতা রয়ে গেছে অগ্রন্থিত, তারও কিছু দুষ্প্রাপ্য আর কিছু আমার আর পছন্দ হয় না। এক সময় আমি নানা দেশের বিংশ শতাব্দীর কবিতা অনুবাদ করেছিলাম, সেগুলি সংকলিত হয়েছে ‘অন্য দেশের কবিতা’ নামে। এই কবিতা সমগ্রের কোনো খণ্ডেই সেই বইটিকে স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

একটি কথা এখানে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এর পরবর্তী খণ্ড সুদূর পরাহত। অন্তত এ শতাব্দীতে নয়।

২৫-৩-৯৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্র ন্থ সূ চি
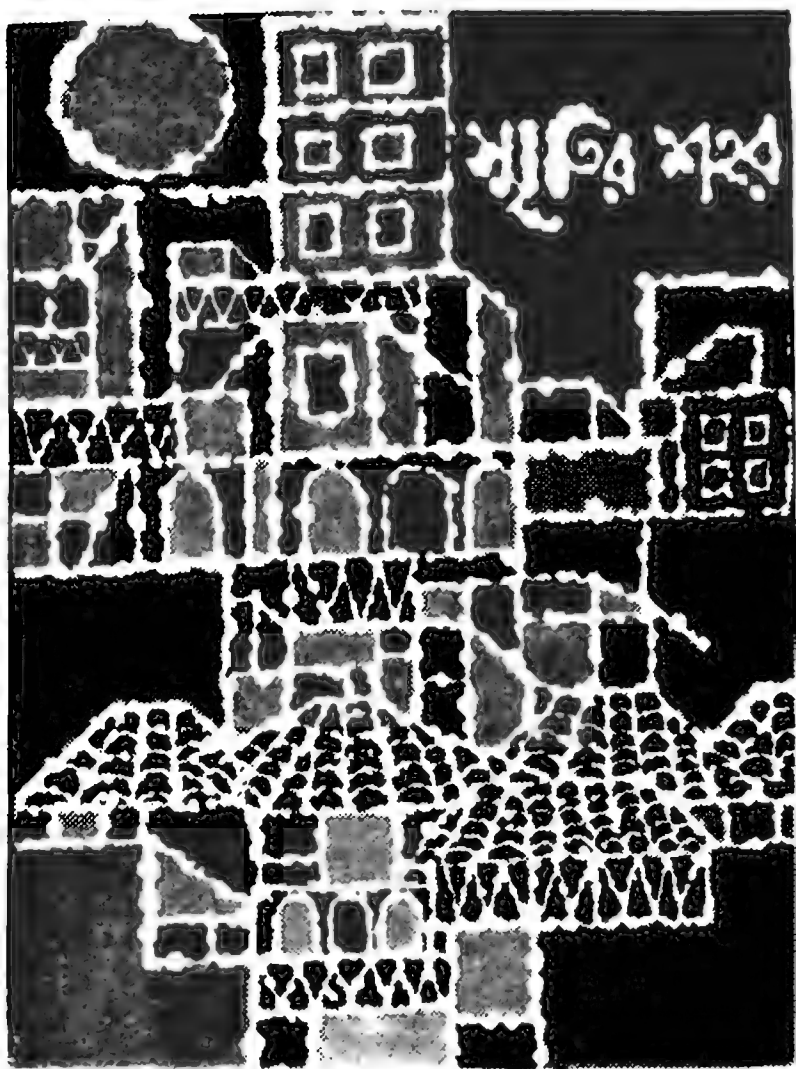
স্মৃতির শহর

স্মৃতির শহর ১

আমাকে টান মারে রাত্রি-জাগা নদী
আমাকে টানে গূঢ় অন্ধকার
আমার ঘুম ভেঙে হঠাৎ খুলে যায়
মধ্যরাত্রির বন্ধ দ্বার।

বাতাসে ছেঁড়া মেঘ, চাঁদের চারপাশে
সহসা দানা বাঁধে নীল সময়
বাইরে এসে,দেখি পৃথিবী শুন্‌শান্‌
রাস্তাগুলি যেন আকাশময়।

প্রথম ডেকেছিল মধ্য কৈশোরে
পাগল করা এক ব্যথার দিন
শরীরে বেজেছিল সমর বিউগ্‌ল
প্রথম স্বপ্নেরা হলো স্বাধীন।

চক্ষে কেউ নেই তবুও বিচ্ছেদ
পাইনি কেন তাকে চিনি না যাকে
তখন মনে পড়ে নিশীথ-সংকেত
দুরাশা ঘুরে ফেরে নদীর বাঁকে।

শাসন বন্ধন তুচ্ছ হয়ে গেল
আমার চেনা পথ গোলক ধাঁধা
দৃষ্টি বিভ্রম সীমানা ছুঁয়ে যায়
খড়্গো কেটে দিই অলীক বাধা।

এদিকে সোনাগাছি কাচের ঝন্‌ঝন
পেরিয়ে চলে যাই আহিরিটোলা
নতুন ঘ্রাণ মাখা শহর কেঁপে ওঠে
পূর্ব পশ্চিমে দুনিয়া খোলা।

এখন জেগে ওঠে কীট ও কুসুমেরা
আঁধার শুষে নেয় দিনের তাপ
জ্যোৎস্না রেণু ওড়ে, ধুলোয় হীরেকুচি
এখন ছুটি নেয় পুণ্য পাপ।

দু'পাশে গলি ঘুঁজি হোঁচট লাগে পায়
পল্‌কা সংসার এখানে কার?
জন্ম মৃত্যুর প্রগাঢ় কৌতুকে
হাসি ও কান্নার সারাৎসার।

এ যেন নিশিডাক, মৃতের হাতছানি
এ যেন কুহকের অজানা বীজ
এমন মোহময় কিছুই কিছু নয়
হৃদয় খুঁড়ে তোলা মায়া-খনিজ।

আমাকে যেতে হবে এখনো যেতে হবে
রয়েছে অশরীরী অপেক্ষায়
যেখানে ব্যাকুলতা ঢেউয়ের তালে দোলে
যেখানে ধ্বনিগুলি স্মৃতিকে খায়।

পথের রাজা এক নগ্ন মহাকাল
ধরেছে মুদারায় ডাগর গান
হেঁতাল দণ্ডটি আকাশে তুলে ধ'রে
সে যেন নিতে চায় সাগর-ঘ্রাণ।

একটু নিচু হয়ে দিয়েছি সম্মান
আবার সরে গেছি অপর দিকে
পারিয়া কুকুরেরা অবাক চোখে দেখে
গাছের মতো এই মানুষটিকে।

দুদিকে মন্দির, গরাদে ভীমতালা
কালীর স্তনঘেরা পিঁপড়ে রাশি
প্রদীপে মৃদু আলো, সিঁড়িতে বেজে ওঠে
কুষ্ঠরোগিণীর শুকনো কাশি।

একলা শালপাতা আপন মনে ওড়ে
পুজোর গাঁদা ফুল ধুলোয় মাখা
একটি ঘুমচোখ বালক হিসি করে
দেয়ালে রমণীর শরীর আঁকা।

এবারে দেখা যায় শ্মশানে উৎসব
আগুন জবা রং, গুঞ্জরন
ছায়ার কোলাহল, ছায়ার ঘোরাফেরা
ব্যস্ত নিরাকার মানুষজন।

এখানে রাত নেই, এখানে দিন নেই
থেমেছে চুম্বকে আয়ুর ঘড়ি
মৃতেরা হেসে ওঠে, জীবিত উদাসীরা
হেলায় ছুঁড়ে দেয় পারের কড়ি।

গাঁজার বীজ ফাটে, শিবের শিষ্যেরা
বৃত্তে বসে আছে ছবির প্রায়
যমজ ত্রিভুজের চূড়ায় লাল আলো
জোনাকি ফুটে ওঠে নদীর গায়।

চোখের চেয়ে আরও অনেক বড় দেখা
দৃশ্য ঘুরে যায়, ঘোরে বাতাস
ধোঁয়ার মৃদু জ্বালা শোকের রলরোল
বাষ্প-অশ্রুতে রুদ্ধশ্বাস।

জলের কাছে যাই, সেখানে কেউ নেই
সেখানে শুয়ে আছে নদীর কায়া
আমাকে ডেকেছিল স্বপ্ন ছেঁড়া এক
পাহাড়-কুন্তলা গভীর ছায়া।

ছায়াও জেগে ওঠে জলের সশরীর
শহর বিস্মৃত আকাশলীনা
আমার করতল দেয় ও নেয় কিছু
জীবন কেটে যায় তাকে ভুলি না।

স্মৃতির শহর ২

দুপুরে শুন্‌শান্‌ হয়ে পড়ে থাকে হরি ঘোষ স্ট্রিট
যেন সাঁওতাল পরগনার কোনো ঘোলাটে জলের নদী
বাড়িগুলো বালিয়াড়ি, ভেতরে ধিকধিক করে জ্বলছে আগুন
তিন বাড়ির তিন ঝি মেছেতো পরা মুখে পরস্পরকে দুয়ো দেয়
তাদের হাতের ছোঁয়ায় অসভ্য বালকের মতন চিৎকার করে টিউকলটা
বাতাস দমকা হয়েই আবার ঝিমোয়, একটা শালপাতার ঠোঙা গড়িয়ে গেল
ভীম ঘোষ লেনে, স্বেচ্ছায় থামলো ঠিক আঁস্তাকুড়ের পাশে
অভয় গুহ্ রোড থেকে বাঁ দিকে বেঁকলো দুই রাজপুতানী বাসনওয়ালী
তাদের শাড়ির রঙের ঝলমলে ধাঁধিয়ে গেল সূর্যের চোখ
গোয়াবাগানের একটা কুকুর বেপাড়ায় চলে আসতেই দর্জিপাড়ার
মাস্তান কুকুরেরা তেড়ে গলে তাকে, সে বললো, আচ্ছা, দেখে নেবো!

দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি আর তিনটে রিকশা চলে যাবার পর আর কেউ নেই
শ্রীরঙ্গম থেকে বেরিয়ে এলো দুজন মানুষ, ধীর গম্ভীর পা ফেলে
এসে দাঁড়ালো রেলের সিটি বুকিং অফিসের সামনে, একজন ফর্সা ও বলিষ্ঠকায়
বাঁ হাতে ধুতির কোঁচা, অন্য হাতের সিগারেট ছুঁয়ে আছে অহংকারী ঠোঁট
অন্যজন বেশ লম্বা ও হাসিমাখা মুখ, চোখ দুটি অন্ধ
জুন মাসের রোদ ধুয়ে দিতে লাগলো সেই দুটি মানুষের শরীর
রূপবাণীর পাশের পানের দোকানে ঝ্যানঝ্যান করছে বেসুরো গান
দোতলা সবুজ বাসের পাঞ্জাবি কন্ডাকটর বাজিয়ে গেল বিকট বাজনা
সেই দু'জন মানুষ যেন কিছুই পছন্দ করছে না, তারা অন্য দেশের মানুষ
দু'জনে দু'দিকে চলে যাবার আগে শিশির ভাদুড়ী বললেন কানা কেষ্টকে
কালকের দিনটা একটু দেখে নাও, তারপর পরশুর কথা ভাবা যাবে।
পাশেই দাঁড়ানো একটি এগারো বছরের ছেলের বুকে সেই কথা গেঁথে গেল
সারা জীবনের জন্য।

স্মৃতির শহর ৩

সস্তায় পেলেন তাই যমজ ইলিশ নিয়ে
বাবা ফিরলেন বাড়ি রাত্তির নটায়।
কয়লার উনুন নিবু নিবু, আমাদের চোখ ঘুম ঘুম

নরেশ সেনগুপ্তকে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন মা
বাথরুমের কল থেকে টিপ টিপ জল পড়ছে লোহার বালতিতে
ছাদে এরিয়ালে একটা সাদা প্যাঁচা
আজও বসে আছে
বিউগ্‌ল বাজাচ্ছে কেউ কোম্পানি বাগানে
আর যাই হোক, এ সময় ইলিশের নয়।

নিশ্চয়ই তুমুল সুখ ছিল রাত বারোটা পর্যন্ত
গন্ধ ও গোলমাল মেশা ভাড়াটে একতলা
সমস্ত ছাপিয়ে কেন মনে পড়ে বৃষ্টির মদির
দুনিয়া কাঁপানো বৃষ্টি, জানলার দাপাদাপি
উঠোনে কল্লোল
পাতাল থেকেও যেন উঠে আসে জল
শুনি জলপ্রপাতের শব্দ, পাহাড়ের ঢল
রান্নাঘর মাখামাখি, উনুন বাঁচিয়ে
ছাতা মেলে ধরেছেন বাবা
গম্ভীর ডম্বরু ধ্বনি, ফেটে যায় আকাশের চোখ
যুদ্ধের তাঁবুর মতো যেন এই বিশাল শহর আজ রাতে
হঠাৎ কোথাও উড়ে যাবে
এঁটো হাতে ঢুলতে ঢুলতে মনে হয়
প্রমত্ত গঙ্গাও আজ হয়ে গেছে আড়িয়েল খাঁ
ঝুপঝুপ জমি খেয়ে জোরে ধেয়ে আসছে এই দিকে।

স্মৃতির শহর ৪

ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের মেলার মাঝখানে
হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো বর্গীর মতন বৃষ্টি
একজন মানুষ শূন্যে ঝুলছে
আকাশের বুক ফাটানো বজ্র গর্জনের পর
সে নীচে পড়লো, না উপরে উঠে গেল
কেউ দেখে নি
অকস্মাৎ সেই সন্ধ্যাটির বিদ্যুৎ প্রতিভা
সব দৃশ্যগুলি অদৃশ্য করে দেয়

পলাতক পায়রার সঙ্গে মিশে যায় মানুষ
সকলেই যে-যার রাস্তায় হারিয়ে গিয়ে
খুঁজছে আর একজনকে
খাতায় খাতায় মেয়েমানুষেরা ছুটে যাচ্ছে
রামবাগানের দিকে
আসলে সেটা নিরুদ্দেশের পথ
সেখানে এখন লরি ও ঠেলাগাড়িতে ট্র্যাফিক জ্যাম
লণ্ডভণ্ড মেলা প্রাঙ্গণের বর্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
এক কিশোরী গলা চিরে ডাকছে, বাবা, বাবা!
কেউ সাড়া দেয় না
বাঁশবাজির নায়ক ততক্ষণে
ছিটকে চলে গেছে অন্য এক শতাব্দীতে!

স্মৃতির শহর ৫

দীপেন বলে গেল, জলটুঙ্গিতে যাচ্ছি,
চলে আসিস!

তখন আমার সময় হয়নি
তখন আমি ঈষৎ ব্যস্ত ছিলুম যোষিৎ-চর্চায়
কফি হাউসের ধোঁয়া ও গুঞ্জরনের মধ্যে বসে থেকেও
নিরুদ্দেশে যাবার কোনো বাধা ছিল না
বাইরে দু' চারটে বোমার শব্দ শুনলেও মনে হয়
ও কিছু নয়!
নদীর স্রোতের মতন মিছিল আসে ও যায়
আমিও এক মিছিল থেকে
ঘাটের পৈঠায় উঠে বসেছি
পায়ে এখনো লেগে রয়েছে ঝিনুক-ভাঙা রক্ত
শিরদাঁড়ায় শোঁয়াপোকার মতন ঘাম
এই সময় পোশাক বদলাবার মতন
চরিত্রটাও কিছুক্ষণের জন্য বদলে নিতে হয়!
কফি হাউসের সবচেয়ে রূপবান পরিচারকটি
ডেকে তুললো আমায়
ঈষৎ হেসে বললো, আর কেউ নেই

সময় চলে গেছে।
আমি কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?
চোখ-মেলা শূন্যতায় শুধু চোখে পড়লো
আমায় ঘিরে রয়েছে পাতলা সবুজ বাতাবরণ
এবং এক চতুষ্কোণ অন্ধকার সীমারেখা
সমস্ত চেয়ার ও টেবিলগুলি নগ্ন
শত শত বিশ্বাস ও কলস্বর বিবর্জিত
এই স্থানে আমি আগে কখনো আসিনি
যেন আমাকে নির্বাসন দিয়ে সবাই
আত্মগোপন করেছে
আমার পকেটে একটি পয়সা নেই
সিগারেট-দেশলাই নেই
কোনও ঠিকানা লেখা কাগজ নেই
বুক পকেটের অতি পরিচিত কলমটি নেই
এমনকি কপাল থেকে হিজিবিজি মুছে ফেলবার জন্য
রুমালটি পর্যন্ত নেই
সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে পা-জামা ও পাঞ্জাবি পরা
আমার একুশ বছরের শরীর
দরজার কাছে সেই চেনা মুখটিও নেই
দোকান বন্ধ করে ইসমাইল চলে গেছে কোথাও
ধোঁয়ার মুখশুদ্ধি এখন কেউ ধারও দেবে না
আমার হাতে ঘড়ি নেই
আকাশে চন্দ্র-নক্ষত্র নেই
পথের বাতিগুলো নেভানো
যেন এক খণ্ডযুদ্ধের পর কবরখানায় নিস্তব্ধতা।

এই রকম সময়ে নিঃস্বতাও এক রকম অহংকার
এনে দেয়
যেন এই জনশূন্য কলেজ স্ট্রিটের আমিই রাজা
আমি এখন হাততালি দিয়ে বলতে পারি,
কোই হ্যায়?
আমার নির্দেশে এখানে শুরু হতে পারে বহ্ন্যুৎসব
ঝাঁপফেলা দোকানগুলোর ভেতর থেকে
মৃত গ্রন্থকারেরা কৌতূহল মেশানো ভয়ে
উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছেন আমাকে
ছাপা অক্ষর ও শব্দের এই জগৎটিকে একটুখানি

ঝাঁকিয়ে দেবার জন্য
আমি ডান হাত উঁচু করতেই
আমার সামনে এসে দাঁড়ায় একটি পুলিশের গাড়ি
আমি প্রেতাত্মার মতন হেসে উঠি
তারা আমাকে প্রকৃত প্রেতাত্মাই মনে করে হয়তো
তাদেরই হাতে নিহত কোনো শব থেকে
যে উঠে এসেছে
বস্তুত আমারই সম্মানে যে ঘোষিত হয়েছে সান্ধ্য আইন
তা তারাই জানিয়ে দেয়
পুলিশের পোশাক পরা চারখানা মানুষের
বুক থেকে শব্দ ওঠে হাপরের মতন
তারা প্রত্যেকেই কারুর পিতা কিংবা ভাই কিংবা পুত্র
এই নির্জনতায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই কথা
অতি দ্রুত বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তারা ব্যস্ত
তাদের গাড়ির ইঞ্জিনে অবিকল কান্নার শব্দ।

গোলদিঘির রেলিং-এ কিছুকাল ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকার পর
স্মৃতিতে কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ ফিরে আসে
দীপেন বলেছিল
জলটুঙ্গিতে দেখা হবে।
কোথায় সেই জলটুঙ্গি, কত দূরে?
ভালোবাসার মতন প্রচ্ছন্ন এক জলাভূমি
রয়েছে এই শহরের হৃৎপিণ্ডে
তার মাঝখানে কাঠের টঙের মাথায় ছোট কুঠুরি
সেখানে বন্ধুরা বসে আছে গোপন বৈঠকে
সিগারেটের ধোঁয়ায় কারুর মুখ দেখা যায় না
সেখানে সাবলীল চা আসে কবিতার লাইনের মতন
পারস্পরিক উষ্ণতায় কেটে যায় শীত
আমার বুক মুচড়ে উঠলো
এক যৌবনব্যাপী উত্তেজনা
আমায় যেতে হবে, যেতে হবে
আমি রাস্তা চিনি না, আমায় যেতে হবে
আমার অন্য আস্তানা নেই,
পৃথিবীতে আর কোনো আত্মীয় নেই
আমায় সেই জলটুঙ্গিতে যেতে হবে!

স্মৃতির শহর ৬

মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ ঘর বাড়ি, এ সব কাদের?
কাঠবিড়ালি ও ভোমরা, সদ্য বিবাহিত পাখিদের!
মাঠের কি স্মৃতি নেই, মনে নেই তার বাল্যকাল
এইখানে শুয়ে ছিল বাপ-মা খেদানো এক
উদাসী রাখাল
কিছুটা জঙ্গলও ছিল, পাতা-ঝরা গান হতো শীতে
একটি জারুল সব লিখে গেছে আত্মজীবনীতে।
পাথর-পূজারী এক সন্ন্যাসীর স্বপ্ন ছিল, ঘুম ছিল,
দুঃখ ছিল বেশি
জ্যোৎস্নার মতন হাসি সঙ্গিনীটি বিশ্বাসঘাতিনী এলোকেশী!
সেই পাথরেরও ছিল অনেক জমানো গুপ্ত কথা
পিঁপড়েরা সব জানে, মাটির গভীরে আজও জমে আছে
ওদের ভাষার নীরবতা......

এ সবই পুরোনো ইতিকথা, সেই দুঃখী সন্ন্যাসীর বংশধর
এখন তোফায় আছে, পগেয়াপট্টির এক নিত্য
সওদাগর
রাখালেরও উত্তরাধিকার আছে, রাজমিস্ত্রি,
মজুর জোগাড়ে
লাল-নীল-সোনালি হর্ম্যেরা জাগে কয়েকটি
মহিষরুক্ষ ঘাড়ে
প্রতিটি জানলায় পর্দা, আজও বারান্দার টবে রয়েছে প্রকৃতি
কাঠবিড়ালিরা ঘোরে সাইকেলে, ভোমরার গুঞ্জনে রাষ্ট্রনীতি
পাহাড়ের পাঁজরা ভাজা মোরামের রাজপথ, আর কিছু
খুন্সুটি গলি
সংসারী পাখিরা ছোটে ভোর বেলা, ঠোঁটে ঝোলে
বাজারের থলি!

স্মৃতির শহর ৭

জানলা ছুঁয়ে একটুখানি দেখিয়ে দিলে চাঁদ
হায় কুয়াশা, সর্বনাশী মায়া
এ যে বিষম দৃষ্টিভুলো, এ যে বিষম জ্বালা
হায় দুরাশা, অনুদ্ধারণীয়া!

অনেকদিন ছন্নছাড়া নদীর ধারে বাসা
শরীর যেন বেড়াতে গেছে দ্বীপে
ছিল অনেক প্রজাপতির পাখ্‌না ঝাড়া ধুলো
কথার ছলে কপাল খুলে রেখে।

ভেবেছিলাম চাঁদ মেখেছে ধুতরো ফুলের আঠা
যারা নেবার তাদের জিভে সুখ
এ যে আগুন পুষ্পবৃষ্টি, এ যে কঠিন কুহক
হায় নিয়তি, অয়স্কান্ত মণি!

স্মৃতির শহর ৮

মধ্যরাত্রির খটখটে জেগে ওঠার মধ্যে তোমার স্বপ্ন দেখি
হে গাঢ় নীল জ্যোৎস্নার মতন বিচ্ছেদ-বেদনা
হে বরাকর বাংলোর মতন ঝুঁকে পড়া অপরাহ্ন
হে প্রচ্ছন্ন অভিমান!

মনে পড়ে ওভার ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে হলুদ হাতছানি
দেবী সরস্বতীর স্তনের মতন রাঙা-রাঙা চাঁদ
একটি টিট্টিভের ডাক
দেবদারু পাতার সরসর শব্দে জেগে ওঠে যৌবনের একটি দিন
একটি বৃন্তচ্যুত অনিত্য
কলেজ-পালানো কিছু ভালো-না-লাগা রাস্তা
আমায় নিয়ে যায় ছন্নছাড়া দেশে
যেখানে হঠাৎ ঝলসে ওঠে অলৌকিক বাস্তব
দিগন্তের পাহাড় মেলে দিয়েছে তার ঐশ্বর্যময়ী উরু

বুক জ্বলা নেশা নয়, এমনই একাকিত্ব
লণ্ঠন দুলিয়ে দুলিয়ে একজন কেউ চলে যায়, সে আর ফিরবে না
কালোর হৃদয় চেরা কালো, তারও ভেতরের নিবিড় সরল কালো
অবিকল একটি শিশুর মতন
লাফিয়ে পড়ে নদীর জলে
সে আমার বাতাসে উদাস করা মন-খারাপ!

সমস্ত নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে ঐরাবতের মতন উঠে আসে
আমার পরাজয়
হে আমার দিগন্ত কুন্তলা মৃত্যু, হে ভোগবতী
সেই টিলার শিয়রে সন্ধ্যায় সর্বাঙ্গে বৃষ্টির মতন শিহরন
বড় প্রিয়, যেন শুধু চোখে চোখ রাখা
জেগে উঠি মধ্যরাত্রে, যাকে না-দেখার
তাকে স্বপ্নে দেখি।

স্মৃতির শহর ৯

তেলীপাড়া লেনের ভূতের বাড়িটার তিন তলার জানলা খোলা
কাল বন্ধ ছিল, সারা জীবনই বন্ধ দেখেছি।
শীতের রাত্তিরে বাইরে আঁচাবার সময় কে যেন আঁচড়ে দিল বাহু
সাদা সাদা সমান্তরাল দাগ কিন্তু ব্যথা লাগে না
আজ রাত্রে লেপতোশক ভিজে যাবে
ঠিক রাত আড়াইটেয় ডেকে উঠবে নিশি, অরুণ! অরুণ!
উত্তেজিত পুরুষাঙ্গে হাফ প্যান্ট তাঁবু হয়ে যায়,
তবু ভয় যায় না—

অরুণকে আর দেখিনি, তাকে ডেকে নিয়ে গেল জব্বলপুর
সে কী রকম দেশ যেখান থেকে আসে না কোনো চিঠি
কেউ জানে না আমি অরুণকে কত ভালোবাসি
চোখের জলের রেখা পড়ে বালিশে।
ঘণ্টাওয়ালা বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেজে উঠলো পাগলা ঘন্টি
দমকলের চেয়েও অবিরাম ঢং ঢং শব্দ
কে যেন বললো, পাগল হয়ে গেছে রামশরন

ইস্কুল যাবার পথে ওদের বাগানে উঁকি দিয়ে দেখলুম
সেই ডানাওয়ালা শ্বেত পাথরের পরীটি নেই
সে নিশ্চয়ই উড়ে গেছে জব্বলপুরে, অরুণের কাছে।

স্মৃতির শহর ১০

চীনে পাড়ায় আমাদের বন্ধু ছিল শেখ সুলেমান
তার বিবির নাম ওয়ালিং
একটি লাল কাগজ মোড়া লণ্ঠন ঝুলতো তাদের সংসারে
এরা নিশীথ মানুষ
সূর্যের সঙ্গে এদের বিশেষ চেনাশুনো নেই
এরা জাঁ পল সার্ত্র-এর নাম শোনে নি
কিন্তু সার্ত্র-এর দর্শনকে জীবন্ত করে
এরা দিব্যি বেঁচে চলেছে
সুলেমানের কোনো বাল্যকাল নেই, আগামী কাল নেই
ওয়ালিং-এর আছে একটি ছোট বৃত্ত
এবং সুলেমান, একটি ছাগল ও একটি বাঁদর
এরা বৃষ্টি এবং অন্ধকারকে
অবিকল বৃষ্টি ও অন্ধকারের মতন দেখে
এদের দু'পাশ দিয়ে
নদী এবং নর্দমা সমান ভাবে বয়ে যায়
মনুসংহিতা, হাদিস ও মার্কসের বাণী
ঘুর ঘুর করে এদের খাটিয়ার নীচে।

বেতের মতন ছিপছিপে চেহারা সুলেমানের
তার বয়েসের গাছ পাথর নেই
পুরুষের এমন মেদহীন কোমর আমি আর
দ্বিতীয় দেখিনি
অনায়াসেই সে প্রাচীন গ্রীসের কোনো দেবতা হতে পারতো
কিংবা সে ছিলও তাই
ইদানিং সে কলকাতার ধুলোকে
বারুদ করার কাজে ব্যস্ত
দাড়ি গোঁফ নেই, তার মাথার চুল পাতলা

তার চোখ দুটি প্রকৃত খুনির মতন ঝকঝকে
খালি গা, বারবার লুঙ্গিতে গিঁট বাঁধা তার মুদ্রাদোষ
চিড়িক করে লম্বা থুতু ফেলে সে সমস্ত
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
আমরা মুখোমুখি দুই খাটিয়ায় বসি
সে আমাদের গেলাসে ঢেলে দেয় সামসু
তখন টিনের চালের ওপর থেকে চ্যাঁচামেচি করে
ওয়ালিং-এর বাঁদর
সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতন প্রথম সে
লাফ দিয়ে ওঠে ল্যাম্প পোস্টে
তারপর সরসরিয়ে নেমে এসে সে দেখায় তার চতুর মুখ
আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে সমান হয়
এবং হাত বাড়ায়
তাকেও দেওয়া হয় একটি গেলাস
ওয়ালিং-এর ছাগলও ডাকাডাকি শুরু করলে
গেলাসের বদলে তাকে দেওয়া হয় টিনের বাটি
ওয়ালিং এক এক সময় আলোয়
এক এক সময় অন্ধকারে
সে আমাদের জন্য চিংড়িমাছের বড়া ভেজে আনে
সেই কর্কশ মদ্য পান করতে করতে
আমাদের অতি আপন সন্ধে
মধ্য রাতের দিকে ছোটে

সুলেমানের দু'একটি কথা শুনলেই বোঝা যায়
সে অনেক রকম আগুনে মুখ আচমন করেছে
সে হাতে মেখেছে মানুষের রক্ত
শরীর হজম করেছে ইস্পাত

এবং সে জানে
খিদে জিনিসটা অতি অপবিত্র এবং
ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই
মৃত্যু তার দূর বিদেশের আত্মীয়
আর জীবন তার পান্তা ভাত ও ডালের বড়া
সে কোনো ধর্মের নাম শোনে নি
যেমন সে কখনো সিল্কের জামা পরে নি
এবং সিল্কের জামারাও সুলেমানকে চেনে না

মাঝে মাঝে ওয়ালিং কী খেয়ালে থমকে গিয়ে
তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ায়
যেন পারিবারিক চিত্র তোলবার জন্য
উল্টো দিকে রয়েছে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের ক্যামেরা
বাঁদরটি তখন ঈর্ষা জানায়
সে মাথা ঘষতে থাকে ওয়ালিং-এর নিম্ন উদরে
দু'জনের নিজস্ব ভাষায় চলে প্রেম বিনিময়
সুলেমান শুরু করে দেয় পুলিশের গল্প
প্রসঙ্গত এসে যায় বেশ্যা, ফড়ে, চোলাইকারী ও
ছদ্মবেশী উন্মাদেরা।

প্রতিটি বোতল শেষ হলে
ওয়ালিং দাম নিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে
সেই সঙ্গে সে দেয় আশ্চর্য সুন্দর বিনে পয়সার হাসি
খাটিয়ায় পা দোলাতে দোলাতে
আমরা তিন বন্ধু ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠি
একটু নেশা হলেই বাঁদরটি কান্না শুরু করে
ছাগলটি গান গায়
যতই রাত বাড়ে ততই ওয়ালিং-এর
হাসিতে ফোটে খই
চীনা মেয়েদের তুলনায় বেশ বড় তার স্তনদ্বয়
হাসির সঙ্গে তাল রেখে দোলে
মধ্য কলকাতায় বসে আমরা পৌঁছে যাই
সাঁওতাল পরগনায়
প্রাণ যেখানে তরুণ শাল গাছের মতন আকাশমুখী
খুশি যেখানে পলাশ গাছে ঝড়
এরই মধ্যে কখন সেই ঘরের সামনে এসে থামে
ব্লাক মারিয়া
তার থেকে নামে সুলেমানের গল্পেরই কোনো চরিত্র
সে সুলেমান ও ওয়ালিং-এর বদলে
আমাদের দিকেই নজর দেয় বেশি
আর আমরা তিন বন্ধু এমনই গ্রেফতার-পরায়ণ যে
সাব ইনস্পেকটার দেখলে একটুও অস্থির হই না
তার দিকেও আমরা গেলাস বাড়িয়ে দিই
অথবা পাঁচ টাকার নোট
এক একদিন অবশ্য গোঁয়ারের মতন আমাদের

নিয়ে যায় ফাঁড়িতে
পরের সন্ধ্যেবেলা সুলেমান জিজ্ঞেস করে,
দেশলাই ফেলে গেলে,
আগুন ঠিক মতন পেয়েছিলে তো?

এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে রয়েছে
ফাট্‌কা বাজার ও বারোয়ারি মহাকরণ
সুসজ্জিত দাস-ব্যবসায়ীদের হল্লা চলে ওখানে সারাদিন
লাইফইনসিওরেন্স ও প্রভিডেন্ট ফান্ড
গুলিচালনা ও দুর্ঘটনা
জন্মান্ধদের হাস্য পরিহাস
পরগাছা ও পরভৃতিকদের সাঙ্কেতিক সংলাপ
অলীকের উত্থান-পতন
সকলেই অন্যের তাওয়ায় রুটি সেঁকে নিতে চায়
অথচ প্রতিদিন ভোরে বিলি হয়
কপাল কোঁচকানো খবরের কাগজ
বিমান উড়ে যায়, মাতৃগর্ভের শিশুও
সেই গর্জন শোনে
চাঁদের দিকে ছুটে চলে
লক্ষ লক্ষ বাদলা পোকা
নদীর দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে যায় দুঃখী ধীবরদের
পৃথিবী চলেছে তার নিজের নিয়মে।

আসলে তিনজন সুলেমানের মধ্যে
একজনই শুধু বেঁচে আছে
অন্য দু'জনকে খুন করে।

তিনজন ওয়ালিং-এর মধ্যে একজনই শুধু
পেয়েছে তার নির্ভরযোগ্য পুরুষকে
বাঁদর ও ছাগলদের সে সমস্যা নেই
কে মরে কে বাঁচে ওরা তা জানে না
সুলেমান উরু খুলে তার ছুরিটি শান দেয়
ওয়ালিং-এর বুক চাটে লাল লণ্ঠনের আলো
ওরা দু'জনে মিলে এক বিশাল বেঁচে থাকার
বিজ্ঞাপন
পাকা বাড়ির তিনটি কাঁচা ছেলে ওদের দেখে

তারপর তাদের নাম বদলাবদলি হয়
ওদের বিভ্রান্ত মাথায় লাগে রাত্রির শুশ্রূষা
অট্টহাসির সঙ্গে মিশে যায় কান্না
সুলেমান পৃথিবীর উচ্চতম চূড়ায় উঠে
ওড়ায় তার পতাকা
ওয়ালিং দ্বিতীয় বসুন্ধরা হয়ে নাচ শুরু করে
যেন আর সময় নেই
এখনই অদৃশ্য হয়ে যাবে ওরা
ওদের মায়াবী অস্তিত্ব দুলছে হাওয়ার স্তম্ভে
আমরা উঠে তিন দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াই
আমাদের ওষ্ঠে ঝলসে ওঠে বর্ণমালার অস্ত্র
অসীম মহাশূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিই
আমাদের বুক ফাটা অনুক্ত গান।

স্মৃতির শহর ১১

উত্তর চল্লিশে হলো দেখা
এত তাড়াতাড়ি? আর সয় না বিরহ?
এই বুঝি তোমার এলাকা
কাঁকর বেছানো পথ বড় স্পর্শসহ।

এঁকেছি অসংখ্যবার মনে
মোহময় মুখখানি, সান্ত্বনা-অঙ্গুলি
জঙ্গলে বা বারান্দার কোণে
মনে আছে, দ্রুত লেখা তীব্র চিঠিগুলি?

ভুল করে এসেছি এখানে
যেন অন্য কারো খোঁজে, অচেনা ঠিকানা
সহসা উঠেছে শূন্য যানে
নীলকে সবুজ ভেবে এক বর্ণ কানা

উত্তর চল্লিশে হলো দেখা
এত তাড়াতাড়ি? আর সয় না বিরহ?
চোখের গভীরে কালো রেখা
মিলনের স্থান শেষে এই কালিদহ!

স্মৃতির শহর ১২

পুরোনো দুঃখগুলো আজকাল মৃদু ঢেউ হয়ে
সুখের মতন ফিরে আসে
তাদের বয়েস ও শরীর আছে
ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে
তারা দেখা হলেও কথা বলে না
তারা নীল সমুদ্রের ধবল আকাঙ্ক্ষার মতন ঘুরে বেড়ায়
তারা মৌসুমী বাতাসকে উড়িয়ে দেয় পাহাড়ের দিকে
রাত্রির নিঃশব্দ দিগন্তে শোনা যায় তাদের মৃদুস্বর
রাজনর্তকীর খসে পড়া ঘুঙুর তারা তুলে দেয়
এক ভিখারির হাতে
আমাকেও তারা ডুবিয়ে দেয় হাজার হাজার হলুদ অক্ষরে
ঘুমের মধ্যে ঘটে যায় বিস্ফোরণ।

স্মৃতির শহর ১৩

সীমান্ত এলাকার মানুষ গদ্যে কথা বলে
বস্তি ও কলকারখানার মানুষ গদ্যে কথা বলে
দিনের বেলায় শহর গদ্যে কথা বলে
সমস্ত সমসাময়িক দুঃখ গদ্যে কথা বলে
শুকনো মাঠ ও রুখু দাড়িওয়ালা মানুষটি গদ্যে কথা বলে
গোটা ছুরি-কাঁচির সভ্যতা গদ্যে কথা বলে
তা হলে কী নিয়ে কবিতা লেখা হবে?

স্মৃতির শহর ১৪

যদি কবিতা লিখে মাঠ-ভর্তি ধান ফলানো যেত
আমি রক্ত দিয়ে লিখতুম সেই কবিতা
যদি কবিতার ছন্দে তৃষ্ণার্ত ভূমিতে ধারা-বর্ষণ হতো
আমি আমার হাড় মজ্জার নির্যাস মিশিয়ে
রচনা করতুম বৃষ্টির বন্দনা স্তোত্র
যদি কবিতা লিখে...
হায়, যদি কবিতা লিখে...
অনেকক্ষণ কান্নার পর ঘুমিয়ে পড়েছে যে শিশু
তার মতন দুঃখ-ছবি আমি আর কিছু দেখিনি জীবনে
যদি কবিতা লিখে...
নিভে যাওয়া উনুনের সামনে কেউ বসে আছে পেটের আগুন জ্বেলে
যদি কবিতা লিখে...
তিল ফুলের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে শোঁয়াপোকার ঝাঁক
যদি কবিতা লিখে...
ম্লান ছায়ায় উড়ে যাচ্ছে যার যার নিজস্ব পৃথিবী
শহর ছেড়ে যখনই যাই পল্লী আঘ্রাণ নিতে
মনে হয় আমি অন্য গ্রহের মানুষ
তোমার কষ্টে আমি গোপনে রোদন করতে পারি
কিন্তু তা কবিতা হবে না
তোমার দুর্দশায় আমি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রাগে গর্জে উঠতে পারি
কিন্তু তা কবিতা হবে না
এ এক মায়া-দর্পণ, কবিতা, এই নিয়ে বিরলে কিছু খেলা
আমায় ক্ষমা ক'রো!

স্মৃতির শহর ১৫

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার বসবার ঘরে একটা চৌকি পাতবার জায়গা আছে
আমি ঐখানে আমার খাটিয়া এনে শোবো
আমার গাছতলা আর ভাল্লাগে না!

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার ভাতের থালা থেকে আমি তিন গ্রাস তুলে নেবো
কারণ আমার কোনো থালাই নেই
আমার অনাহার একঘেয়েমির মতন ধিকধিক করে জ্বলছে
আর আমার ভাল্লাগে না।

গাড়ি বারান্দার তলা থেকে ধুলো মাখা তিনটে বাচ্চা ছুটে এসে বলবে
ওগো, আমরা বাসি রুটি চাই না, পাঁচ নয়া চাই না
আমাদের ছাই রঙের হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়ে
চুল আঁচড়ে দাও
আমাদের গাল টিপে দিয়ে বলো, সাবধানে—
আমরাও ইস্কুলে যাবো!

একদিন কয়লাখনির অন্ধকার থেকে উঠে আসবে
একজন কালো রঙের মানুষ
সে অবাক হয়ে বলবে
একি, আমার জন্য শোকসভা নেই কেন?
ডিনামাইট নিয়ে আমি গিয়েছিলুম গভীর থেকে আরও গভীরে
আমি ফিরিনি, কিন্তু তোমাদের জন্য আগুন এসেছে
আমার নামে তোমরা কেন নাম রাখো নি শহরের রাস্তার
তবে এসব রাস্তা কাদের নামে, তাদের তো চিনি না।

একদিন ধান খেতে কাদা জল মেখে দাঁড়ানো একজন মানুষ
নিজের চেয়ে আরও অনেক লম্বা হয়ে উঠে গলা তুলে বলবে,
তোমরা যারা কোনোদিন কাদা জল মাখো নি,
মাটিতে শোনো নি কোনো আওয়াজ
জানো না ঘাম-রক্ত-উৎকণ্ঠায় সবুজ হয় সোনালি
সেই তোমরাই শস্য নিয়ে রাহাজানি করো
আর আমার সন্তানরা থাকে উপবাসী, তোমাদের লজ্জা করে না?
আমি আসছি...।

স্মৃতির শহর ১৬

সরস্বতী হাইস্কুলের পেছনের বাড়িটার কলঘরে
ঢুকে বসেছিল একটা শেয়াল
সে কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না
কী করে সে পেরিয়ে এলো শ্যামবাজারের মোড়
কিংবা শোভাবাজারের বিরাট হৈ হল্লা?
কুণ্ডলী পাকানো ল্যাজে মুখ গুঁজে শেয়ালটি কাঁদছিল
অনুতাপের কান্না!

বেলগাছিয়া রেলস্টেশনের কাছে হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো
মহিষাসুরেরই মতন একটা মোষ,
নাদ ব্রহ্মের মতন তার গর্জন, তোলপাড় করতে লাগলো সারা পাড়া
যেন তার হঠাৎ অরণ্যের কথা মনে পড়ে গেছে
যেন সে ফিরে যাবার রাস্তা খুঁজছে!
ঠনঠনের কালীমন্দিরের সামনের নদীতে
মোচার খোলার মতন ভাসছে দুটি নৌকো
খল খল করে হাসছে কাজল-রঙা শিশুরা
একজন ঝুপ করে জলে পড়ে গেল আর উঠলো না
সে পাতালপুরীতে নিজের দেশে ফিরে গেছে।

স্মৃতির শহর ১৭

সদ্য-তরুণটির প্রথম কবিতার বই আমি
হাতে তুলে নিই
ঈষৎ কাঁচা প্রচ্ছদে সবুজ সবুজ গন্ধ
প্রজাপতির মতন হাল্‌কা পাতাগুলি চলমান
অক্ষরে ভরা
শিরোনাম উড়ে যেতে যায়, শব্দগুলি জায়গা বদলাবার
জন্য ব্যাকুল
ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অহংকার-ভয়-লজ্জা-স্পর্ধা
সে কথা বলে না, তার নীরবতা অত্যন্ত বাঙ্‌ময়

আমাকে সে কী চোখে দেখে তা আমি জানি না
কিন্তু আমি তার মধ্যে দেখতে পাই অবিকল আমাকে
চোরা চোখে লক্ষ করি তার জামার কলারের পাশটা
ফাটা কিনা
প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সে নিশ্চয়ই খুচরো পয়সা গুনছে
আমার ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি
করে নিতে, এক্ষুনি...

স্মৃতির শহর ১৮

চোখে লেগেছিল কুমারী শবের ধোঁয়া
ডালপালা মেলে কেঁদেছিল নিমগাছ
মধ্যরাতের বাতাস পাগল হলো
কাঠকয়লায় কেউ লেখে ইতিহাস।

তৃতীয় প্রহরে শীত জেঁকে আসে খুব
চিতার আগুনে আমরা পোহাই ওম্
কোনো কথা নেই, কথা গেছে গহ্বরে
মাথার ভিতর রঙিন মেঘের খেলা।

কাউকে চিনি না, কেউ আমাদের নয়
চণ্ডাল এসে ধার দিল কম্বল
ভালোবাসা দিয়ে কেনা যায় সিগারেট
ভালোবাসা দিয়ে জয় হলো সব ঘুম।

সে কি পেয়েছিল, সে কি জেনেছিল সবই
কালো নদীটির জলে নেমে গেল কে?
চোখে চোখে এক চাঁদ ঘুরে ফিরে যায়
চাঁদে ঠিক্‌রোয় আলতা পরানো পা।

স্মৃতির শহর ১৯

আটচল্লিশ হঠাৎ ঝাঁপ দিল ঊনত্রিশের গনগনে আগুনে
ভূমিকম্প বয়ে গেল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে
ভেঙে পড়লো মিত্তির বাড়ির নিজস্ব আকাশ
একটা চাঁপাফুল গাছ নাচ শুরু করলে
পাথরের রমণী একটু হাসলো
তখন প্রচণ্ড খিদের দুপুর
তখন সমস্ত প্রতিশোধের বিশাল সুসময়
তখন মাটি থেকে কুড়িয়ে ধুলো বালি মুছে
আমার নশ্বরতাকে আদর করি।

স্মৃতির শহর ২০

কফি হাউসে বসে আমরা একটা পাহাড় ভেঙে পড়ার
শব্দ পাই
আকাশে লাল ধুলো...

পয়ারে ন' মাত্রার পর্ব হয় কি না এই নিয়ে
টেবিল চাপড়ানো তর্ক হঠাৎ থেমে যায়
একটা বারুদ-রঙা নিস্তব্ধতা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়
আমরা সকলেই ভাঙনের প্রবক্তা, ধ্বংসেই আমাদের উল্লাস
ঈশ্বর থেকে সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব বসুর ছন্দ পর্যন্ত
আমরা ভাঙতে ভাঙতে এসেছি
কৃষ্ণনগরের পুতুলের মতন আমরা ভেঙেছি বাবা ও মাকে
প্রেমকে ভেঙেছি অতিরিক্ত শরীর মিশিয়ে
শরীরকে ভেঙেছি আত্মহননের নেশায়
দেশকে যারা ভেঙেছে আমরা মহানন্দে ভেঙেছি তাদের ভাবমূর্তি
কাচের গেলাস ভাঙার মতন সুমধুর শব্দে
আমাদের পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়েছে এক-একটা মূল্যবোধ
কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের এই পাহাড়টি ভাঙা
আমরা সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্তির মতন আমাদের মুখেও ম্লান ছায়া

শুধু রাগ ঝলসে ওঠে পূর্ণেন্দু পত্রীর মুখে
ছবির সরঞ্জাম নিয়ে সে উড়ে যায় আকাশে
ক্যামেরার লেন্সে লেগে থাকে তার চোখের জল।

স্মৃতির শহর ২১

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বাল্যকাল ছেড়ে একদিন এসেছিল কৈশোরে
বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট ছোট স্টিমারের মতো ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে

ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক
তার সঙ্গে মিশে গেল হ্রেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস...

তারপর
একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন
আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর

তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি...

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
ছেলে ভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙিন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
সারবন্দী জাহাজ
ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেন্ডারের ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দীঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দু' মাসে একবার মামা-বাড়িতে বেড়াতে যাবার উৎসব...

ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশি রাতে দেখা অজস্র ফুটপাথের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
প্রাণ খোলা বুক কাঁপানো হাসি
চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন

দশকর্ম ভাণ্ডারের পাশে গাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না
কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
স্তন্য দেয় সেখানে
এইসব দেখে, শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
এক জোড়া বিসদৃশ ঠ্যাঙ

গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে
ছিপি খেলছিলাম...

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর সুদূর শহর
গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে
জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভাবে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চাইনি
এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া

শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থলপদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিঁপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কচি অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা
অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
নাকিসুর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
অথবা জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর খুব কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে
আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধ লেবুর বাগানে শিশির পাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দীঘির জলে একা একা চাঁদের
অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলার
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে একদিন সব নৈঃশব্দ্য খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে
জেগে উঠতো নিশির ডাক:
সস্তা না মূল? সস্তা না মূল...

স্মৃতির শহর ২২

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশ গঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালি পিরিচ
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যে-রকম জলস্তম্ভ ভাঙে
কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সুর্কি ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে
যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জ্বলছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল সেখানে কান্নার শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশি
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ...

স্মৃতির শহর ২৩

আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
মাথা তুলেছি আকাশের দিকে
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন সমতল
আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়

আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর!
আমরা ধূসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ
আমরা ঠনঠনের রাস্তায় হাঁটু-সমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুল চোর
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত, বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই, বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত
ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুংকার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল উত্থান।

স্মৃতির শহর ২৪

একে ওকে নষ্ট করে চলে গেল প্রেম
যদি বা যাবার ছিল
তবে কেন থেমেছিল সহসা এখানে?
পৃথিবী উত্তাল আজ প্রেমভ্রষ্ট মানুষের ভিড়ে।

*

বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, মাটি তাই রক্ত চুষে খেল
আমার ভাইয়ের রক্ত
তোমার ভাইয়ের রক্ত
তুমি আমি আরও কিছু রক্তবীজ
নগরীকে ছুঁড়ে দিয়ে যাবো।

*

রাস্তায় তুমুল রব, একদল ক্রোধী ছুটে গেল
চমকে উঠি
এ কি সেই? এই তবে শুরু?
দরজায় ছুটে যাই; বুক কাঁপে, প্রতীক্ষাও কাঁপে
কিছু নয়।
এ সব বিপ্লব নয়, চোর চোর খেলা!

স্মৃতির শহর ২৫

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
আমি একে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকোবিষ মিশিয়ে খাওয়াবো
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।
কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়ালকাঁটা অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও, এত উপপতি
তোমার দিনে-দুপুরে, উরুতে সম্মতি!
দিল্লির সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধ্যেবেলা

প্রখর গরজে
তোমার দু' বাহু চেপে ট্যাকসিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো—
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো ক্যামেরা
যদু...মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে;
শরীরে অমন বাজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স্থলপদ্ম চাও দুই হাতে?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে।
কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রিটে লুকোতে পারবে না—
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্রাফিক বাতি, দুঃখের বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ, বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি? গঙ্গা থেকে সব ক'টা জাহাজের মুখগুলো
ফিরিয়ে
অন্ধকারে ময়দানে প্রচণ্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার—
তোমার শরীর-ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রোণীযুগে জ্বালবো দেশলাই
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলঙ্কার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ
তবে কে বাঁচাবে?

স্মৃতির শহর ২৬

পাতলা কাচের গেলাশে জল, এক একদিন মনে হয়,
বাঃ জল কী সুন্দর
যেমন আকাশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে

চলে যাচ্ছেন রূপবান সূর্য
রোজ মনে পড়ে না, এক একদিন মনে পড়ে
এক একদিন মনে পড়ে ছেলেবেলায় সেই কি তুমুল
বারুদ রঙের ঝড় উঠেছিল
রোজই তো কত চোখের দিকে তাকাই, শুধু
এক একদিন চোখে পড়ে পৃথিবীর চোখ
বাতাসে ভেসে বেড়ায় প্রাণপাখি, শুধু একদিন
টের পাই সব বাতাসই বিনামূল্যে
মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছে একটা ঢিল, তাতে জড়িয়ে আছে
সাতশো কোটি অ্যামিবা
শুধু একদিনই টের পাই মহাশূন্যের চেয়ে কত বিরাট
এই বুকের শূন্যতা
হঠাৎ এক সকালবেলা একটা ঘাসফড়িং লাফিয়ে এসে
দারুণ বিস্মিতভাবে
চেয়ে থাকে আমার দিকে, সে কী যে দ্যাখে
কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে একটা কাঁই বিচি,
তার থেকে উঠে এসেছে ঝিরিঝিরি
পবিত্র এক তেঁতুল চারা, কাল তো ছিল না
বিশ্বাস করো বা না করো, খবরের কাগজে ছাপা হয় না এমন এক
বিশাল দুনিয়া ছড়িয়ে পড়ে আছে বাইরে
তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গিয়ে যেদিন
দেখতে পাই জল-ঝিনুকের
লাবণ্যের মতো একটি দিন
সেদিন মনে হয়, শুধু সেই দিনের জন্য,
বড় সার্থক ভাবে বেঁচে আছি।

স্মৃতির শহর ২৭

জোব চার্ণকের সমাধির ওপর ফুটেছে
এক থোকা কালকাসুন্দি ফুল
একটি সেপাই-বুলবুলি রং বদলাচ্ছে সেখানে বসে
মেঘশূন্য আকাশে ঝলসায় চিন্ময় রোদ্দুর
পাখিটি উড়ে যাবে, ফুল ঝরে পড়বে

ওরা ইতিহাসের ধার ধারে না
বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়, আছে, আছে, আছে!

চার্চ লেনের চার পাশ ঘিরে শোনা যায়
কোটি কোটি সোনা-রুপোর টুকরোর জলতরঙ্গ ধ্বনি
ভুল হিসেবের মহোৎসব ও হাস্য পরিহাস
এক কোণে শতাব্দীর ধুলোমাখা ধর্মাধিকরণ
তার খুব কাছেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা লাইন
সেখানে দাঁড়িয়ে আছে হুবহু এক রকম
আত্মসমর্পণকালীন যোদ্ধা যেন সব
নিরস্ত্র, দণ্ডিতের মতন মুখ
আমি দেখতে পাই আমাকে, তীব্র অনুতপ্ত
জুতোর পেরেক বিঁধলে মনে পড়ে, এখনো বেঁচে আছি।

হঠকারী এক ছোকরা নবাবের অস্থায়ী আস্তানায়
এখন ছিঁচকে চোর ও বিবর্ণ-কোট উকিলেরা
কানামাছি খেলে প্রত্যেক দিন
যেন এই মুহূর্তটাই অনন্ত মুহূর্ত, নইলে
আর বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই
তবু হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অশথ গাছের নীচে
অশথ গাছ দীর্ঘজীবী, ওরা জানে
ওরা অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে
বড় বড় দস্যু ও বড় বড় আইন ধন্ধবাজদের
ওরা পাড়ি দিতে দেখেছে দিল্লিতে
দুটি গাঙ্ শালিখ ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ভূমিকা নেয়
পুরোনো কালের গল্পে ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে
তারপর একটা শব্দ ফেলে রেখে
উড়ে যায় বিখ্যাত নদীর দিকে
এই ছোট-কারণাবলীর বিচারশালায়
একদিন আমরা অনেকে মিলে আওয়াজ তুলেছিলুম
এই আজাদী ঝুটো, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ
সবাই কি তা ভুলে গেছে, এমনকি স্বাধীনতাও?

বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়, আছে, আছে, আছে
ওরে চঞ্চল, ওরে অবিশ্বাসী, কী আছে? কী আছে?
একটু স্পষ্ট করে বল

আমি ক্ষুধার্ত, আমি বড় স্মৃতি-কাতর
সোনার কৈশোর আর স্বেচ্ছা-কন্টকময় যৌবন
আমি নিবেদন করেছি এখানে
এই অভিমানী, অভিশপ্ত ইঁট-কাঠের আত্মাকে
এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন
তার আর কোনো প্রতিদান চাই না
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো......।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে
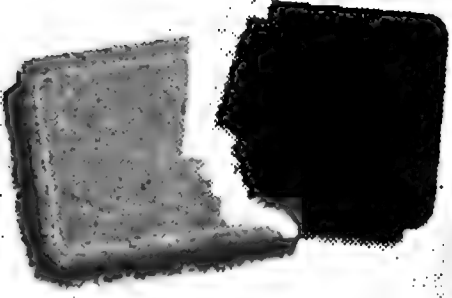
সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

সূচিপত্র

যাওয়া না-যাওয়া

এদিকে ওদিকে বিপন্ন ঘর বাড়ি
স্রোতের কুটোয় কাকে রাখি কাকে ছাড়ি
ভালোবাসাময় চিঠিগুলি কুচি কুচি
ছিল লঘুমায়া, ধ্বংসে ছিল না রুচি
আসঙ্গ লোভী স্পর্শকাতর ডানা
যারা খুব চেনা তাদেরও কি ছিল জানা
সবুজ ভিখারী মরুভূমি চোখ টানে
পাহাড় মেতেছে পতনের নির্মাণে
মেঘ তোলপাড়, পাগলাঘণ্টি হাওয়া...

আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া!

ব্যাকুলতা ছিল না-চাওয়ার চেয়ে বেশি
আগুন ও জলে যে-রকম রেষারেষি
কথা গেঁথে গেঁথে একটি অধিক কথা
আলিঙ্গনের ভেতরের শূন্যতা
পোড়াটে দুপুর জ্যোৎস্না জ্বালানো রাত
এ পথে সে পথে জানালায় করাঘাত
খুব খিদে পেলে বাতাসের আচমন
তেঁতুল পাতায় শুয়েছি সতেরো জন
কেউ ভালোবেসে চলে গেল খুব দূরে
কেউ বা অস্ত্র জলে ফেলে দিল ছুঁড়ে
কেউ বা মেনেছে স্বপ্নে চরম পাওয়া...

আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া!

শব্দ যাকে ভাসায়

শব্দ যাকে ভাঙে তাকে তুলোর মতন ভাঙে
ভাঙতে ভাঙতে ওড়ায় তাকে ধূপের মতন পোড়ায়
ঢেউয়ের মতো ভেসে বেড়ায় নীলিমা-ভাঙা ছবি

চোখের মধ্যে লাল ধুলোর প্রবাস উঁকি মারে
ঘরের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে শরীরহীন জ্বালা
শব্দ যাকে খায় তাকে নদীর মতন খায়।

দ্যাখো দ্যুলোক শুয়ে আছে যৎসামান্য রোদে
এমন মায়া হাতে ছুঁলেই ভালোবাসার আঠা
আবার ফের পলক ফেললে কাচের মতন জল
জলের মধ্যে নারী এবং নারীর চোখে আগুন
কিংবা সবই দৃষ্টি-ভুলো শব্দ শব্দ খেলা
শব্দ যাকে ভাসায় তাকে সর্বনাশে ভাসায়!

মুহূর্তের দেখা

টিলার ওদিক থেকে উঠে এলে ওষ্ঠে ভরা
সারণীর কুলুকুলু ধ্বনি
আঁচলে বাতাস বাঁধা যেন সৌর তরণীর পাল
ভূমি থেকে এক ইঞ্চি উঁচু পায়ে দাঁড়ালে দিগন্তখানি জুড়ে
যেন কোনো স্বর্গ-বেশ্যা, অথবা প্রি-র‍্যাফেলাইট পরী...

কিছুদূরে গাছতলায় শুয়ে আমি পড়ছিলুম
মানুষের দাঁতের ইতিহাস
আগুনের বন্দিত্ব ও রুটি কাড়াকাড়ির দলিল
ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকি নিষ্পলক
ও কে? নীরা নয়? কিংবা বুঝি নীরার আদল
কোথা থেকে এলে, কেন এলে, ফের কোথায় পালাবে
শীত দুপুরের আলো সহসা রক্তিম হয়ে ওঠে
তরঙ্গের নানা স্তর, শূন্য ও অসীম, যেন চেতনার
লুকোচুরি খেলা

সবই তো অলীক তবু মুহূর্তের দেখাটাও ঠিক!

তাকে ঐ দিনটি দাও

সেই উজ্জ্বল দিনের শিয়র ছুঁয়ে আছে
চন্দনবর্ণ মেঘ
সারি সারি সার্থবাহ চলেছে প্রমাণিত স্বপ্নগুলি নিয়ে
গোধূলির সেকি অলৌকিক মায়াজাল
শব্দ উড়ে যাচ্ছে এক একটি যুঁই ফুলের মতন
বৃষ্টির শরীর নেই, তবুও সে আছে
এরই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় সদ্য বলি দেওয়া
মোষের রক্ত ,
দৃশ্যটি সম্পূর্ণ হয়।

তারপর সেই দৃশ্য প্রসব করে তার নিজস্ব প্রতিভা
যেমন নদীর গভীরে গর্জে ওঠে কামান
মাতৃভূমি বিচ্যুত এক কিন্নরের শোকাশ্রুর মতন
কুসুমপাত হয় আকাশ থেকে
সমুদ্র নিশ্বাসে উড়ে যায় পরমাণু ধোঁয়া
ক্ষুধার্ত সত্যগুলি প্রতিশ্রুতির রক্ত মাংস চাটে
পা দিয়ে জল ভাঙার শব্দে ঢেকে যায়
কিছু কিছু ভুল
তখন পাহাড় থেকে নেমে আসে একলা এক পাথর
অন্য কোনো একাকীর কাছে।

উজ্জয়িনী থেকে সেই যে বেরিয়েছিল এক ভ্রাম্যমাণ
খুঁজতে খুঁজতে যার সব কিছু ছোট হয়ে গেল
এই শতাব্দী শেষের আকাশের নীচে
সে দাঁড়িয়ে আছে
চতুর্দিকে অপরিচ্ছন্ন ছায়া ও অবিশ্বাসী হাওয়া
তাকে ঐ দিনটি দাও
একটি দিন, একটি স্বপ্নের সার্থকতা।

আমাদের সক্রেটিস

ওয়েলিংটনের মোড়ে গোল আড্ডার মাঝখানে
দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সক্রেটিস
তিনি একটু আগে হেমলক পান করে এসেছেন, আবার
পান করতে যাবেন।
প্রথমে তিনি ফরাসী ভাষায় উচ্চারণ করলেন
একটি সদ্য ভাঙা পাথরের ভেতরের যে রং
আজও কেউ তার নাম দেয়নি কেন?
তারপরই তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জানালেন,
একমাত্র মেয়ে মানুষের গতরই ধারণ করতে পারে
একসঙ্গে দুটি আত্মা!

তারপর সক্রেটিস উঁচু করে তুললেন তাঁর দুই ডানা
জাদুকরের মতো তাঁর শরীর কালো আঙরাখায় ঢাকা
তাঁর অনামিকায় রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত আংটি
তাঁর কণ্ঠে ফৈয়াজ খাঁর বাজখাঁই গমক
তিনি এবারে বললেন, চললুম উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির থেকে
প্রদীপের ঘি তুলে আনতে
তোমরা অপেক্ষায় থেকো, ঘুমিয়ে পড়ো না।

বাতাসে ঝাঁপ দেবার আগে
কমলকুমার মজুমদার আমাদের দেখালেন
তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের
নখদর্পণ।

টীকা: উনিশশো ষাট থেকে বাষট্টি সালের কথা। সেই সময় এই সক্রেটিস এসে দাঁড়াতেন ওয়েলিংটনের মোড়ে। সেখানকার ফুটপাথে ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আমাদের শেখাতেন কী করে বিষ হজম করতে হয়। তারপর আমরা ধার করে মুর্গীর ঝোল খেতে যেতুম। তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলে একদিন চলে গেলেন। সেই মুর্গীর ধার আমাদের আজও শোধ করা হয়নি।

আঙুলের রক্ত

ঘর শব্দটি কবিতার মধ্যে এলে আমি তার দরজা দেখতে পাই না
অথচ দরজা শব্দটির একদিকে ঘর, আর একদিকে বারান্দা
বারান্দার পাশেই নিম গাছ
আমার শৈশবের নিম গাছের স্মৃতির ওপর বসে আছে একটা ইস্টিকুটুম পাখি

যদি ঐ পাখিটিকে আমি কখনো কবিতার খাঁচায় বসাই নি
শব্দের নিজস্ব ছবি তা শব্দেরই নিজস্ব ছবি
শরীরের শিহরন যেন মাটির প্রতিমার সর্বক্ষণ চেয়ে থাকা
যেমন পাথর ধুলো হয়ে যায় কিন্তু জল বার বার ফিরে আসে
কবিতায় কে যে কখন আসে জানি না
শুধু আমার আঙুল কেটে রক্ত পড়লে তা নিয়ে কবিতা লেখা হয় না!

স্বাধীনতার জন্য

স্বাধীনতা শব্দটি কৈশোরে বড় প্রিয় ছিল
যেন আবছা দিগন্তের ওপাশেই রয়েছে সেই
ভালোবাসার মতন শিহরনময়
এক গভীর প্রান্তর
বয়ঃসন্ধির মোড় পেরুলেই সেখানে পৌঁছে যাবো
সে কি অধীর প্রতীক্ষাময় রোমাঞ্চ ছিল তখন!

তারপর এলো সেই স্বর্ণময় দিন, এমন একটি
বিন্দুতে এসে দাঁড়ালুম
যার দু' পাশ দিয়ে আকাশ বিভক্ত হয়ে গেছে
সূর্যের সোনালি রশ্মি আশীর্বাদ জানালো
বৃষ্টি দিল সব গ্লানি ধুইয়ে

সবাই বললো এই তো বেশ পবিত্র ও প্রস্তুত হয়েছো
এবারে কয়েদখানার মধ্যে সুড়সড় করে ঢুকে পড়ো!

বাইশ বছরে পা দেবার পর দু'দিকে দু'কান ধরে
টান মারলো

জীবিকা ও সামাজিকতা

পৃথিবীটাকে যে-রকম চেয়েছিলুম তার ওপরে শুধুই কুয়াশা
যেন সব কিছুই আছে, ছুঁতে পারছি না
চেয়েছিলাম মানুষের মুক্তি, কিন্তু আমার হাতে পড়ছে বন্ধন
দূরত্বের আড়াল থেকে কেউ যেন ডাকছে, বুঝতে পারছি না ভাষা
ছোট ছোট আরাম, টুকিটাকি মোহজালে জড়িয়ে দিয়েছে সর্বাঙ্গ
এ রকম কথা ছিল না, এ রকম তো কথা ছিল না!
ক্রমশ একটা বয়েসে পৌঁছে মনে হয়
সামনের দিকে আর কিছু আশা করবার নেই
তবু একটা জেদী অহংকার জেগে থাকে
কার জন্য আশা? শুধু তো আমার জন্য নয়,
যারা নতুন জন্মেছে তাদের জন্যও

কিন্তু বিষণ্ণতা ছুঁয়ে থাকে নিজস্ব দেয়াল
গাঢ় অভিমানে মাঝেমাঝেই গলা চুপসে আসে
চারপাশে শুনতে পাই, প্রকৃত স্বাধীনতা নয়
শুধু স্বাধীনতা শব্দটির দেহতত্ত্ব নিয়ে
চলেছে তুমুল কলরব

মাঝে মাঝে ছেঁড়ার চেষ্টা করে পালিয়েছি
পাহাড়ে, জঙ্গলে, আদিবাসীদের আস্তানায়
কিছু একটা ভাঙার অস্থিরতায় নিজেকেই ভাঙতে চেয়েছি
বারবার
প্রত্যেকবারই কেউ ঝুঁটি ধরে টেনে ফিরিয়ে এনেছে
ঘুমপাড়ানি গানে বুজে গেছে চোখ
জেগে উঠে বুঝেছি, ওসব দু'দিনের মৌখিক ছদ্মবেশ
বুক টনটন করে উঠেছে
মেনে নিতে চাইনি, মনে হয়েছে, আছে, আছে, পথ আছে!

পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে দেখি
স্বাধীনতার পোশাকপরা অস্ত্রধারীদের মহড়া
আমার মন খারাপ আমি কেমন করে বোঝাবো
তবে কি এ পৃথিবী পরিপূর্ণ ধ্বংসের পর
প্রকৃত স্বাধীন হবে?
আমি একজন কিশোরের দিকে তাকাই, সেও
স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায়নি তো?

উৎসর্গ

এই নাও আমার সমস্ত দৃষ্টিপাত
এই নাও সকালের সুখ
এই নাও আশৈশব অতি প্রিয় শব্দগুলি
এই নাও সার্থকতা বাতাসে উড়ন্ত বালিহাঁস
এই নাও কৈশোরের একান্ত নিভৃত শিহরন
এই নাও পাহাড়ী রাস্তার মতো প্রেম
এই নাও প্রবাসের চিঠি
এই নাও রোদ্দুরে-বৃষ্টিতে গড়া মণিহার
এই নাও নশ্বর রুমাল
এই নাও নদীর স্রোতের মতো সব প্রতিশ্রুতি
এই নাও কালি কলমের বিষণ্ণতা
এই নাও ক্ষমাপ্রার্থী করযুগ
এই নাও বুক ভর্তি তরল আগুন
এই নাও বৈশাখী ঝড়ের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা
এই নাও উজ্জ্বল ব্যর্থতা
এই নাও ভাঙা সুটকেশ ভরা সকল ঐশ্বর্য
এই নাও অরণ্যের হাতছানি
এই নাও অসংখ্য দরজার উন্মোচন
এই নাও শরীরের সব কান্না
এই নাও ছুটি
এই নাও তিলে তিলে জমানো মমতা
এই নাও স্মৃতি ও বিস্মৃতি
এই নাও মৃত্যুর মুহূর্ত
এই নাও স্বর্গের পতাকা...

কিছু দেবে?

কৈশোরের ঘরবাড়ি

নদীর কিনারে ছিল মাটির মমতা মাখা
কৈশোরের বাড়ি
একই লপ্তে বাঁশবাগান। বেগুন-লঙ্কার কুচো খেত

পবিত্র শূন্যতা ছিল চারদিকে, কিছু কিছু ঘাস ফুল ছিল
রাত্রির বাড়িটি ছিল দিনের বেলার বহুদূরে
কখনো অদৃশ্য, ফের চাঁদের উদ্যোগে ভাসমান
কিসের সৌরভ যেন ঘুরে যায় সন্ধেবেলা, ঠিক যে-সময়
নদী ডাকে
আকাশ-বাঁধানো তীর, সন্ন্যাসীর মতো এক নদী
কোথায় যে যাবে বলে বেরিয়েছে, নিজেই জানে না।

কৈশোরের মাঠকোঠায় ছিল না একটুও সোনা,
ইস্পাত, বারুদ
সদ্য রূপকথা ভেঙে জেগে উঠছে মন কেমন করা এক দেশ
পিছনে অস্পষ্ট ধ্বনি, মেঘ-ছেঁড়া চকিতের ছবি
গ্রীষ্মের বাতাসে ভাসে জামরুল ফুলের মিহি কণা
যেন মোহময় মিথ্যে, একা একা জল নিয়ে খেলা
লম্বা গাছটির ডালে এক এক দিন এসে বসে
অবাক অবাক চোখ প্যাঁচা
মৃদু বৃষ্টি, শব্দের জোয়ারে তার ভ্রুক্ষেপ নেই
অজস্র সুতোর জাল বাতাস ছড়িয়ে যায় বাতাসের মনে
ধিক্‌ধিকে ক্ষিধের মতো সবদিকে প্রতীক্ষার তীব্র ব্যাকুলতা
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে মা যাচ্ছেন
কাঁচা রান্নাঘরে
কুপির আলোয় কাঁপে ছোট্ট একটি সংসারের ছায়া
আবার মিলিয়ে যায়, ঝড় ওঠে অতি প্রিয় ধ্বংসের আওয়াজে
আচমকা ঘুম ভেঙে শোনা যায় রুদ্র সন্ন্যাসীর নিশি ডাক।

কৈশোরের ঘরবাড়ি নদীর কিনারে
আজো রয়ে গেছে।

অর্ধনারীশ্বর

নদী বন্ধন উদ্বোধনে এসেছেন এক নৃমুণ্ড শিকারি
গোলাপের পাপড়ি উড়ছে বাতাসে, এখানে শিশুরা হাসে না
এখানে শঙ্খধ্বনি ও সমর ভেঁপু এক সঙ্গে মিলে মিশে যায়

ক্ষ্যাপাটে জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে
এগোচ্ছেন তিনি, ঝুঁকলেন
তাঁর ওষ্ঠে ফুটে উঠছে পাহাড়ী হাসি, কপালে আন্তর্জাতিক ভাঁজ
আসলে তিনি সেতুর নীচে গুঁজে দিচ্ছেন বারুদ
জল বা মাটির মানুষেরা যা জানে না, তিনি তা জানেন
লম্বা হত্যা তালিকার নীচে স্বাক্ষর বসিয়েই তিনি ছুটলেন
বিমানের দিকে
জানলার বাইরে মেঘের মাধুরী তাঁর পছন্দ হলো, তলোয়ারের মতন বিদ্যুৎ
বিভা
তাঁকে যৌন স্মৃতি দিল
হাত বাড়িয়ে তিনি সেবিকার হাত থেকে নিলেন নিজের সন্তানের লহু
তাঁর দুই উরুর অন্তবর্তী আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলো, স্বপ্নে।

নির্জন দ্বীপের বাতি-ঘরের শিখরে তার বসতি, তিনি অর্ধনারীশ্বর
দেয়ালে ঝুলছে মালার পর মালা, সব সহাস্য স্থির মুখ
তিনি পোশাক খুললেন, তাঁর বুকে পিঠে সাংবিধানিক মারপ্যাচের
কালসিটে
বাঁ হাতের তালুতে লেখা বাণী, রাষ্ট্র, সে তো আমি!
লোহার গরাদ আঁকড়ে ধরে তিনি দেখতে লাগলেন
অন্ধকার গোলাকার সিঁড়ি
আর কেউ কি উঠে আসছে, শোনা যাচ্ছে অন্য পদশব্দ?
নীচে কি ধাক্কা মারছে জোয়ারের ঢেউ না লক্ষ লক্ষ ফিসফিসানি
তাঁর ঘুম আসে না, তাঁর চোখে জল আসে
তাঁর দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায় স্মৃতিকথার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
পার্থিবদের পরমার্থ-মহাযজ্ঞে তিনি প্রাণপাত করে চলেছেন
কেউ তা বোঝে না, কেউ তা বোঝে না!

সাদা পৃষ্ঠা

সাদা পৃষ্ঠা, তুমি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে
তাকিয়ে রয়েছো কেন
আমি কি সমুদ্র দ্বীপের মতন হঠাৎ অচেনা
পাঠশালার প'ড়োর সঙ্গে বিমান-বন্দরে দেখা

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে কি আমার যৌন সম্পর্ক
হয়েছিল কোনদিন?

সমস্ত কিছুই হারিয়ে যেতে যেতে একটা কিছু
আঁকড়ে ধরার মতন
বিষণ্ণ বেলায় এক প্রান্তে এসে আমি দাঁড়িয়েছি
ঝড় এসে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে ফুল
খেলাচ্ছলে কেউ অন্ধকার নিয়ে এলো
স্কুল বাড়ির ছাদে
শুকনো নদীর মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে শহরের রাস্তা
এর মধ্যে তুমি কেন আমার সামনে নিয়ে এলে
তোমার বৃষ্টিস্নাত মুখ
সাদা পৃষ্ঠা, চলো, তা হলে তোমার সঙ্গেই দেশান্তরে যাই!

চণ্ডালডাঙা

মনে করো এখানে কিছুই নেই, একটা চণ্ডালডাঙা
তারও ভেতরে কোথাও রয়েছে
এক টুকরো হারানো ভালোবাসা
তাই খুঁজতেই তো আসা এখানে, এই ঠা-ঠা দুপুরে
আরও কার কার যেন সঙ্গে আসার কথা ছিল
মাঝপথে তারা খসে পড়লো টুপটাপ
তারা অনেকেই নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে অনেক কিছু
কেউ হয়তো চড়ে বসেছে একটা লম্বা গাছের ডগায়
খুব আরামে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে কর্মফল
কেউ বা ঝাঁটা হাতে নেমে গেছে সমাজ সংস্কারে
কেউ ব্যাধ সেজে উপেক্ষা করেছে প্রতিষ্ঠা
যেখানে কিছুই নেই, এমনকি ভালোবাসাও হারিয়ে গেছে
সেখানে আর কেই-বা আসবে।

একটা বেশ চমৎকার গোলোকধাম খেলা জমে উঠেছিল
নিজেরই আদলে গড়া মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে ফেলতে
হাতে বিঁধেছে টুকরো টুকরো স্মৃতি
খিদে তেষ্টা পেলেই গলায় ঢেলে দিয়েছি উচ্চাকাঙ্ক্ষা

নেশার জন্য তো ছিলই প্রচুর অহমিকা
জল ও আগুনের মধ্যে যে ধর্মযুদ্ধ চলেছে অবিরাম
তা আমরা লঘু প্রতীকে ছড়িয়ে দিয়েছি
বিছানায়, নিম্ন শরীরে
সূর্যাস্তের মতন বর্ণাঢ্য উল্লাস ছড়িয়েছে ঘুমের শিখরে
রাতপাখি যেমন অন্ধকারকে বাঙ্ময় করে
সেই রকম আমরা খরচ করেছি সঞ্চিত স্তব্ধতা
কেউ যাতে আচমকা এগিয়ে যেতে না পারে
তাই যখন তখন উল্টো দিকে ফিরে শুধু করেছি পিঠ-দৌড়।

একদিকে পাঁহাড় জঙ্গল, অন্য দিকে নদী-সমুদ্রে
ছিল প্রচুর ডাকাডাকি
দিক শূন্য কাশ ফুলের ওড়াউড়ির মতন হৃৎস্পন্দন
তারই মধ্যে একটি বেদনার রেখা টিট্টিভের ডাকের মতন
তীক্ষ্ণ
উড়ে যায় দিগন্ত ছাড়িয়ে শূন্যতায়
যেন লিখতে লিখতে হঠাৎ শব্দ-রোধ
অতল কালো গহ্বর, একটি বুলেটের আওয়াজ
যেন সহাস্য দীপাবলির মধ্যে অকস্মাৎ যৌন-ধিক্কার
যেন কঠিন সত্যকে চাওয়ার বদলে রক্তের উত্তর
তখন একবার যেতে হয় সেই চণ্ডালডাঙায়
যেখানে আর নেই, কিছু নেই
মধ্যদুপুরে নিজের ছায়াও পড়ে না
সেখানে এক টুকরো ভালোবাসার জন্য খোঁজাখুঁজি
যেন হারিয়ে যেতে যেতে, হারিয়ে যেতে যেতে
জলের মধ্যে, জল-শৈশবের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে
কোমল ফিরে যাওয়া।

ডাকপুরুষের দর্পণ

এই প্রান্তরের উড়াল ছাড়িয়ে যে অন্য প্রান্তরের শূন্যতা
সেখানে কেউ কেউ শুয়ে থাকে
আমি তাদের চিনি না, ডাকপুরুষ চিনতেন।

গড় মন্দারন পেরিয়ে কারা যেন রাতের সমূহ অন্ধকারে
চুপচাপ চলে গেল
কে জানে তারা আর কোনদিন ফিরে এসেছিলো কিনা

মাংসের মতন কাঁচা মাটি উঠে আসছে কোদালের ঘায়ে
একজন বোবা মতন ঝুঁকে পড়া মানুষ
সেখানে ঘাম ফেলেছে, ফেলতে ফেলতে গলে গেল সম্পূর্ণ

গানের ইস্কুলের পর কোঁকড়া চুল এক রহস্যময়ী কিশোরী
ঢুকে যায় পোড়ো বাড়িটার মধ্যে
একবার মাত্র পেছন ফিরে সে তাকায়, পর মুহূর্তেই অদৃশ্য

মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাই মধ্যযামে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে
দুই দীর্ঘ বাহু তুলে
ডাকপুরুষ ওদের সকলের জন্য দর্পণ দেখাচ্ছেন।

হিরণ্ময় পাত্রখানি

হিরণ্ময় পাত্রখানি এতটা উত্তপ্ত কেন
ধরে রাখা যায় না আঙুলে
অতৃপ্তি-দণ্ডিত ওষ্ঠ দূরে যেতে গিয়ে
পুড়ে যায় মুহূর্তের ভুলে।

একাকী অরণ্যে যেন তাঁবু গেড়ে শুয়ে থাকা
কিছু নেই, দুনিয়া রয়েছে
হাড়-পাজরা ফুঁড়ে আসে ক্ষুধার কিরণ ছটা
টের পাই, তবু সুখ বেঁচে।

এ যেন রঙের কৌটো, ফুরোলেও লেগে থাকে
সেই বোধ, টুকরো ইতিহাস
বাসাংসি জীর্ণানি বলে যারা শ্লোক বেঁধেছিল
রয়ে গেছে তাদেরও নিশ্বাস।

হিরণ্ময় পাত্রখানি সহসা লুকিয়ে যায়
অথচ আমারই জন্য ওকে
সমস্ত সমুদ্র ছেঁচে বড় কষ্টে আনা হলো
এখন বিভ্রম জাগে চোখে।

একটা উত্তর দাও

প্রশ্ন করলেই তুমি প্রশ্ন ফিরিয়ে দিও না
একটা উত্তর দাও!
যা কিছু চলে যায় সবই পলিমাটি রেখে যায় না
তোমার বুক ছুঁয়ে দেহে যায় যে বাতাস, তা আমার নিশ্বাস নয়
কেনই বা তা হবে, সারাটা জীবন কি জারুল বাগানে ছেলেমানুষী?
একটা উত্তর দাও!

নর্তকীর পায়ের ব্যথার মতন একটি ব্যর্থ সন্ধ্যা
গড়িয়ে যায় ঝিম ধরা মাঝ রাত্তিরের দিকে
ফাঁকা মাঠে তালগাছের ডগায় উড়ছে চাঁদের ঝাণ্ডা
দলপতির মতন রাশভারি একটি কেঁদো ইঁদুর হঠাৎ থেমে গিয়ে
ডান পাশের নীরবতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
কিসের প্রতীক্ষায় কাঁপতে থাকে তার মুখের সূক্ষ্ম রোম
পোকা-মাকড়দের সংসারে চলেছে অবিরাম সুখ-দুঃখ
এই-সব-কিছুর মধ্যে শোনা যায় অবিকল একটি অজ্ঞাত শিশুর কান্না
কবিতার খাতাতেই শুধু ফুটে ওঠে এই দৃশ্য, তারপর তা বাস্তব
যেন কিছুটা মায়াজাল ছেঁড়ার মতন এই অতি প্রকৃতি
অন্য কোনো ব্যাকুলতা, অন্য কোনো স্মৃতির চাতুরি।

অসংখ্য সমান্তরালের মধ্যে একটি অশ্বক্ষুর ধ্বনি
পরিকীর্ণ শূন্যতার মধ্যে দুলতে থাকে
বিদ্যুৎ-ছটায় অদৃশ্য হয়ে যায় টুকরো টুকরো অরণ্য
বেদনার দানার মতন আলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়ে
বয়ঃসন্ধির আঠা
সশরীর ঢেউগুলি পরস্পরকে ঝাপটা মেরে
মুহূর্তে বিমূর্ত হয়ে যায়
কেউ ডাকে, কেঁউ ডাকে
অসংখ্য সমান্তরালের মধ্যে দোলে অশ্বক্ষুর
একটা উত্তর দাও!

জ্বর

এমনই রোদের তাপ, লেগে গেল শীত
গুটি গুটি চলে যাই কম্বলের নীচে
একবার উপুড় হই, পুনরায় চিৎ
উত্তর মেরুর স্রোত সূর্যের পিরিচে।

ইজেরের বাল্যকাল ডোবে অভিমানে
আর একটি কম্বল তবু থামে না কাঁপুনি
আকাশে সংঘর্ষ হলো ঈগলে বিমানে
আমি শুধু পিঁপড়েদের পদশব্দ শুনি।

বাঁ হাতকে ডান হাত দেখে নেয় খুঁজে
মনে হয় মাথা ছাড়া কিছু নেই আর
মাথাটিও রাখা হলো কেল্লার বুরুজে
কামানের গোলা হয়ে ফাটাবে আঁধার।

কপালে মায়ের হাত জলের নরম
অকস্মাৎ মা মা গন্ধ ভরে যায় ঘর
এই গন্ধে ভয় আছে, স্নেহ যেরকম
কখনও নির্দয় হয়ে তোলে ঘূর্ণিঝড়।

গভীর সমুদ্র বুঝি, তাই এত নীল
দু'পায়ে পাথর বাঁধা, হু হু নীচে নামে
বন্দি দেবতার সঙ্গে অবিকল মিল
পাতালের দিকে যাই প্রগাঢ় আরামে।

দুটি মুখ

একজন দেখলো শুশুনিয়া পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়া চাঁপা রঙের বিকেল
অন্যজন বললো, এত নিরন্ন মানুষ, এত হাহাকার, তবু মানুষ পিকনিক করতে আসে?

একজন শুনলো লুণ্ঠিত স্বর্ণ সিংহাসন ফিরে পাওয়ার মতন যৌবনের জয়ধ্বনি
অন্যজন বললো, দুটো ভিখিরি বাচ্চার সামনে ওরা মুর্গীর মাংস চুষে চুষে খায় কী করে?

একজন দেখতে পেল ঘোড়সওয়ারের মতন আকাশ ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে এক ঝাঁক শঙ্খচিল
অন্যজন বললো, ওগুলো সব শকুন, এত শকুন, গ্রামের পর গ্রাম এখন গো-ভাগাড়

একজন দে্খলো নন্দলাল বসুর ছবির মতন এক সাঁওতাল কিশোর, সঙ্গে মূর্তিমান আদরের মতন একটা ছাগলছানা
অন্যজন বললো, ভূমিদখলের ষড়যন্ত্রে আদিবাসী সরল মানুষেরা এখন শিকড়হীন ক্রীতদাস

একজন দেখলো পাখিরা ফিরে আসছে স্নেহ মমতার সংসারে, বাতাস বিলিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের গন্ধ
অন্যজন বললো, কাজহীন মজুরদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারিরা উজাড় করে দিচ্ছে বনসম্পদ

একজন আপন মনে উচ্চারণ করলো, উদাসীন সৌন্দর্যময়ী এই পৃথিবী, মানুষ কেন মানুষকে আনন্দের ভাগ দেয় না?
অন্যজন ঘোষণা করলো, চতুর্দিকে জেগে উঠছে নিপীড়িতের দল, উঁচু হয়েছে মুষ্টিবদ্ধ হাত,
সমাজবদলের দিন আসন্ন!

তারপর পলায়নবাদীর মতন একজন একটা নিরালা গাছতলা খুঁজে নিয়ে শুয়ে রইলো চুপচাপ
অন্যজন জিপ গাড়ি চেপে চলে গেল ডাকবাংলোতে জেলা অফিসারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে
বুকে-দাগা ইতিহাস নিয়ে দিগন্ত ঢেকে জেগে রইল শুশুনিয়া পাহাড়
নিঝুম নিরেট অন্ধকারে অস্তিত্ববিহীনভাবে ডুবে গেল গ্রামবাংলা...
আবার কি ওদের দু'জনের দেখা হবে কোনোদিন
হাতে হাত মিলিয়ে বুঝবে পরস্পরের সত্য
একসঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবে মানুষের সামনে?

আর এক রকম জীবন

দমকা হাওয়ায় এক ঝাঁক পায়রার মতন
উড়ে গেল আমাদের সামার ভ্যাকেশান
বর্ষায় ধুয়ে গেল প্রথম কবিতা লেখার দুঃখ
তলপেটে তীব্র ব্যথার মতন অতি ব্যক্তিগত সেই কবিতা
পুকুরের নীল রঙের মধ্যে পুঁটি মাছের চকিত রুপোলি
আভার মতন

প্রথম প্রেম কিংবা প্রথম প্রেমের মতন কিছু
ঝড়ের দাপটে নুয়ে পড়া সুপুরি গাছের মতন
বুকের মধ্যে একটা বাধ্যতামূলক ব্যর্থতাবোধ
প্যান্টের পকেটের ফুটো দিয়ে হারিয়ে যাওয়া আধুলির মতন
নিভা মাসির বাড়ি থেকে একা একা ফিরে আসা সন্ধ্যা
নাজির সাহেবের ঘুড়ির দোকানে আগুন লাগার মতন
মাঝরাতের চিঠি-ছিঁড়ে-ফেলা হাহাকার
সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠবার পর সব কিছুই অন্যরকম
আকাশের গায়ে শুয়ে আছে মানস সরোবর
ট্রাম লাইনের ওপাশে জেগে ওঠে পাহাড়
বুঝতে পারি এতদিনের চেনা জগৎ রং বদলাচ্ছে
আমার শরীরের মধ্যে জেগে উঠছে আর একজন
নাম-না-জানা মানুষ

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরবর্তী আর এক রকম জীবন!

এলেম নতুন দেশে

এ কোন্ নতুন দেশে বেড়াতে এলুম যেখানে সব কিছুই
খুব চেনা চেনা মনে হয়

এই সব উজ্জ্বল লাল চেহারার গাছ আমাদের পাড়াগাঁর
উঠোনতলা আলো করে থাকতো

ছোটবেলা পেরিয়ে আসার আগেই অবশ্য তারা ঝড়ে মুড়িয়ে গিয়েছিল
হাওয়ায় উড়ছে জল-রঙা কুচি কুচি ফুল, ঠিক যেমন দেখেছিলাম
ছোট পিসিমার পাহাড়-ঘেঁষা বাড়িতে
ছোট পিসিমা অগ্নিপরীক্ষার জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলেন
আর ফিরে আসেন নি
এই যে দেখছি প্রত্যেকটি পুকুরেই জলস্তম্ভ
এ আর নতুন কথা কী
সেই যে আমাদের প্রথম রেলগাড়ি চেপে পশ্চিম ভ্রমণ
সেবারে আমরা মুহুর্মুহু দেখতে পেয়েছিলুম আকাশগঙ্গা
আবার কোথাও কোথাও মাঠের মধ্যে এক একটা জল-পদবী
উঠে গেছে স্বর্গের দিকে
সেই সেবারেই তো বাবা অন্ধ হয়ে গেলেন, স্পষ্ট মনে আছে
রেলের ইঞ্জিন ড্রাইভার নেমে এসে মায়ের বাহু ছুঁয়ে
বলেছিলেন,
আমি মিত্তিরবাড়ির অতুল...

এই নতুন দেশের রাস্তাঘাটগুলো আলিঙ্গনের জন্য
হাত বাড়িয়ে আছে
কী সহজ সরল অনুবাদে হেসে উঠছে মুখ মনে-না-পড়া
বাল্যসঙ্গীর মতন মানুষেরা
গৃহগুলির ঘুরন্ত সিঁড়ি দিয়ে অনবরত উঠছে নামছে
অনেকগুলি চপল পা
ঠিক যেন নেমন্তন্নবাড়ি, এখনো কেউ কেউ আসে নি
শানাই বাজছে না বটে, তবু কোনো একটি সুরলহরী
ঢেকে দিচ্ছে কান্নার শব্দ
এ রকম কতই তো রোশনি ঝলমল উৎসবের পাছদুয়োরে
আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি
এ কেমন অচেনা রাজ্য যেখানকার প্রতিটি নারীর মুখই
আগে ছবিতে আঁকা হয়ে গেছে
আমার বুক পকেটের এক একটি ছবি আমি মিলিয়ে মিলিয়ে
দেখি
সব মন পড়ে যায়!

স্বপ্নের অন্তর্গত

কারুর আসার কথা ছিল না
কেউ আসে নি
তবু কেন মন খারাপ হয়?
যে-কোনো শব্দ শুনলেই বাইরে উঠে যাই
কেউ নেই—
অদ্ভুত নির্জন হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবী
ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তের স্বপ্ন নিয়ে...
আমিও কি সেই
স্বপ্নেরই অন্তর্গত?

কত না সহজ বলে

কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল
যেমন সহজ ঐ সতেরোই আশ্বিনের সকালের মেঘ
যেমন সুন্দর, শুভ্র, পাতা ঝরা—অবিশ্বাস
নরকের দিকে চাই, মনে হয় এই সেই স্বপ্নময়
লুপ্ত আটলান্টিস
অন্বিষ্ট নদীর কূল, ঢেউ ডানা মেলে আসে, রুপোলি পালকে
সব আধো আধো চেনা
নিষিদ্ধ দক্ষিণ দেশ দ্বার খোলে, ঝলসে ওঠে প্রিয় হাতছানি
কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল।

এদিকের খেলা ভেঙে ওদিকের আগুন জ্বলেছে
বনবাস শেষ করে কেউ ফিরে আসে, কেউ
ক্রমশ দুর্গমে চলে যায়
চৌচির ঘরের মধ্যে পড়ে আছে পাণ্ডুলিপি, জীর্ণ মখমল
ঊরু-সম্মিলনে স্বেদ, জন্ম থেকে জন্মান্তর খোঁজা
সখেদ বন্যার জল, ভেসে যায় সেতুর স্থপতি
সবুজের গায়ে লাগে রক্ত, অসংখ্য হাতের মধ্যে
ভুল বিনিময়...

কত না সহজ বলে ভাবা গিয়েছিল!

দু'চারটে পলাতক

যেদিকে যাবার কোনো পথ নেই, সেই দিকে
ছুটে যাওয়া ছিল আমাদের প্রিয় নেশা
শুকনো নদীর ধারে কাঁটা জংলা, আমূল খাড়াই
কেন এতো ভালো লেগে গেল
গহন রাত্রির বন, একদিকে বিন্দু বিন্দু আলো, দূরে
প্রগাঢ় নৈরাজ্য
তবু কেন সেই আলো পিছু টানলো না?
অন্ধকার নিয়ে গেল, অন্ধকার ভরে গেল হিমে!

সব পথ খোলাখুলি পৃথিবী তো এমনই নিষ্পাপ
যে একা হারিয়ে যেতে চায়, যাক, মানুষেরই
এই স্বাধীনতা
অথচ সবাই বলবে এ জীবন মানচিত্রে গাঁথা
ফিরে এসো, সুস্থ সমাজের জন্য পেতে দাও ঘাড়

যে কথা হাজারবার বলা হয়ে গেছে তাই
পুনঃ পুনঃ বলো
শৌখিন সন্ধ্যায় যাও রঙ্গালয়ে, দারিদ্র্যের জন্য দাও
করতালি ধ্বনি
সকলের সঙ্গে তুমি পায়ে পা মেলাও

দু-চারটে পলাতক তবুও বাইরে ছিটকে
লিখে যাবে অর্থহীন, ব্যক্তিগত, অকেজো কবিতা।

আর যুদ্ধ নয়

'কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!'
তুমি কে, তুমি কি গ্রহান্তরের দল-ছুট?
তোমার কখনো ছিল না কি শৈশব?
তুমি কি কখনো দেখোনি মাটিতে ঘুমন্ত কোনো শিশু?
জানলার ধারে দাঁড়ানো, একলা, শূন্যদৃষ্টি নারী?
কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!

নামাও রাইফেল
এ পৃথিবী তোমার একলার নয়
এ পৃথিবী লোভের, ঘৃণার, উন্মত্ততার নয়
আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে, আমি তোমার দিকে
আর তাকাতে পারছি না।

কী গভীর নিঃশব্দ বন চারদিকে
ওরা জানে, ওরা সব দেখেছে।
ধোঁয়ায় গ্রাস করছে নিষ্পাপ বাচ্চা ও ব্যাকুল মহিলাদের
ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিতদের দিকে উদ্যত মুষ্টি তুলেছে যারা
তারা কে?

কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!

ল্যাটভিয়ার রিগা শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে, জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, আমার মতন কঠোর লোকেরও কান্না এসে গিয়েছিল। চল্লিশ বছর আগে ঐ স্থানটিতে আশী হাজার শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। আমি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অনেক বর্ণনা আগে পড়েছি। কিন্তু বইতে পড়া আর নিজে সেরকম কোনো স্থানে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে উপলব্ধির অনেক তফাৎ। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়ল, একটি বিখ্যাত চেকোশ্লোভাক যুদ্ধ-বিরোধী উপন্যাসের লাইন, "কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!" বাকি লাইনগুলি সেই অনুসঙ্গে লেখা। হয়তো ঠিক সুললিত কবিতা হলো না। কিন্তু লাইনগুলি এই ভাবেই আমার মনে এসেছিল। ঠিক সেইরকমই লিখে গেছি।

এবারের শীতে

এবারের শীতে নিরুদ্দেশের ওপারে
কথা দেওয়া আছে যেতে হবে একবার
যেখানে জলের বুক ভরে গেছে আগুনে
যেখানে বাতাস পাথরে লিখেছে মায়া।

এখন গ্রীষ্মে শ্রমের বিষম আড়াল
যেদিকে তাকাই পূর্ণতা জুড়ে খাঁ খাঁ

যেসব রাস্তা ডুব দিয়েছিল নদীতে
তারা ফের উঠে গা ঝাড়া দিয়েছে রোদে।

এবারের শীতে গৃহ-জঙ্গল ছাড়িয়ে
ক্লান্তি কলুষ তমসার জলে ধুয়ে
যেখানে অজানা রচেছে আপন নিরালা
কথা দেওয়া আছে, যেতে হবে একবার!

সুড়ঙ্গের ওপাশে

সুদীর্ঘ সরল একটা সুড়ঙ্গের ওপাশে একটু একটু আলো
কয়েকটি ছায়ামূর্তি হাত-পায়ের ন' দশ রকম
ভঙ্গিমায় খুব ব্যস্ত
অন্ধকারের গায়ে বিদ্যুতের মতন রং, ওরা কাকে ডাকে?
শব্দহীন এক উল্লাস, যেন মুক্তির হাতছানি
আমি কি অত দূরে যাবো, না পিছনে ফিরবো ?

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য এই দৃশ্য, তারপরই পর্দায়
অন্য ছবি
বই ঘেরা ঘর, টি. ভি., টেলিফোন, মদের গেলাসের সামনে আমি
বাইরের কাটাকুটি রাস্তায় ঝলমলে আলোতে কোলাহল করছে
শহুরে রাতের পৌনে আটটা
ব্রিজ পেরিয়ে মফঃস্বল পর্যন্ত কংক্রিটের টংকার
মানুষের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষিতে উৎপন্ন হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ
আবার এরই মধ্যে চার-দেয়াল ঘেরা একাকিত্ব
অথচ মন খারাপ নেই, মিহিন বৃষ্টির গুঁড়োর মতন
দেখা যায় না এমন ঔদাসীন্য...

সুড়ঙ্গের ওপাশে ওরা ডাকে, ওরা ডাকে...

আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে

আমরা এ কোন ভারতবর্ষে আছি উনিশ শো চুরাশিতে?
লজ্জায় আমার মাথা ঝুঁকে পড়ে
রাগে সারা গায়ে জ্বালা ধরায়
দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়
চিৎকার করে উঠতে চাই কর্কশ গদ্য ভাষায়
আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে আছি...

পরিসংখ্যানে শুনি এদেশে সকলের জন্য খাদ্য আছে
কান্‌কুন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে বিশ্ববাসীকে বলেছিলেন
ভারত আর অন্নভিখারী নয়
তবু এ দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ দু'বেলা খেতে পাওয়ার
স্বপ্নও দেখে না
বাঁধের ওপর আমরা বসে থাকতে দেখেছি
ক্ষুধার্ত শিশুর পিতাদের অসহায় আলগা শরীর
আমরা শহরের ফুটপাথ দেখেছি, গ্রামের গঞ্জ, বাজার
হাটখোলা দেখেছি
আমরা পার্ক স্ট্রিট, বড়বাজার, ওয়াটগঞ্জ দেখেছি
আমরা রাইটার্স বিল্ডিংসের পালাবদল দেখেছি
আমরা দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ জুড়ে
নপুংসকদের কষের ফেনা গড়াতে দেখেছি
এ কোন্ ভারতবর্ষে আমরা...

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের নিন্দে করার
কোনো অধিকার আমাদের নেই
কারণ, এদেশে হরিজনদের যখন তখন আমরা
পুড়িয়ে মারি
মার্কিন দেশের বর্ণবিদ্বেষ তো কিছুই না
এদেশের কালো মেয়েদের এখনো টাকার ওজনে
বিয়ে হয়
কিংবা হয় না
কিংবা, পরে তারা গায়ে কেরোসিন ঢালে
আমেরিকা রাশিয়ার পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কার চেয়েও ভয়ঙ্কর
আমাদের আত্মপ্রতারক, খালি হাতের,
লাঠি, ছুরি, বোমার গৃহযুদ্ধ

এখনো মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বারে বিকট ধ্বনি ওঠে
ধর্মের নামে রাস্তায় রাস্তায় রক্ত
আঃ, ধর্ম শব্দটি একদা কত সুন্দর ছিল, এখন
পুঁজ-রক্ত আর স্বার্থপরতায় মাখা
ধর্ম তো আফিম নয়, জাতীয়তাবাদ নয়,
ব্যক্তিগত শুদ্ধি নয়
শুধু ভেড়ার পালের পরিচালকদের উন্নত লাঠি
আমি দ্বিধাহীন ভাবে শতসহস্র নিঃশব্দ প্রতিবাদকারীর সঙ্গে
কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চায়
যে হিন্দু স্বার্থপরের মতো রোজ পুজোআর্চায় মাতে
যে মুসলমান পারিপার্শ্বিকের প্রতি চোখ বন্ধ করে রোজ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে
যে খ্রিস্টান অন্য ধর্মের মানুষদের অধঃপতিত মনে করে
যে শিখ শুধু ধর্মের দাবিতে রাজনৈতিক অধিকার চায়
তারা শুধু আত্মপ্রবঞ্চক নয়, তারা অধার্মিক, তারা খুনি
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তারা মাতৃহত্যা, শিশুহত্যার
জন্য দায়ী
তারা যে অপরের হাতে ক্রীড়নক সেটুকু বুঝবার
ক্ষমতাও তাদের নেই
তারা মানুষের সাম্যের মাঝখানে কাঁটা তারের বেড়া তুলে দিচ্ছে
এ কোন ভারতবর্ষে আমরা...

অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী

অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী
ফিরে এসো!

বসন্তে উড়েছে ছাই
ঝরে গেল নীল শূন্যতার মতো দিন

নক্ষত্রের ধ্বংসস্তূপে দীর্ঘশ্বাস অদৃশ্য নিশান
বাতাসে উন্মাদ সিঁড়ি যেন ঝাউবনে গত এক শতাব্দীর ঝড়

ফিরে এসো
হে অচিন্তনীয়, রাজ্যভাঙা স্বপ্নময়

টুকরো টুকরো অবিশ্বাসী, পলাতক
ফিরে এসো
বারুদ গন্ধের ঢেউ দু' হাতে সরিয়ে ফিরে এসো
দিনমান অন্ধকার, চতুর্দিক সশব্দ নীরব
ফিরে এসো
অন্ধ, গলা-ভাঙা, অভিমানী, হে প্রেমিক

ফিরে এসো।

ঋণ থাকে

কবিতা লেখার জন্য নদী আছে,
নৌকো কিংবা বেহুলার ভেলা, তাও আছে
যে মুহূর্তে লেখা হলো 'চুর্ণী' এই শব্দখানি
তখনই স্রোতের কাছে ঋণ জমা হলো
যার জানবার তাকে জানতে হয়, জানে, ঠিকই জানে।

পাগলা বাতাস এসে উড়িয়েছে ছবি, কিছু রং ফলিয়েছে
মন্দার বা তিল ফুলে সব ফিরে আসে
নিম্ননাভি অলসগমনা কেউ চলে গেল অমন চকিতে
দেওয়ালেও ফিরবে না, যদি ইচ্ছে হয়?
সবলে নারীকে কেউ আজও পায়নি জানা ইতিহাসে।

বকুল গাছের লাস্য, আলিঙ্গনও মুছে ফেলা যায়
প্রেমের তমসা নিয়ে লেখা যায় দুশো তিনশো পাতা
তারপরও বাকি থাকে, আকস্মিক বিস্মৃত মুহূর্ত
যেতে হয়, নদীর কিনারে যেতে হয়
হয়তো বা নৌকো নেই, বেহুলা তো আদপেই নেই
কলার মান্দাসে
আমাকেই একা একা ভেসে যেতে হবে।

স্থির চিত্র

এক একটা সুন্দর রাস্তায় একজনও মানুষ থাকে না
সোনালি রোদের আঁচে রাস্তাটি একাকিত্ব উপভোগ করে।
নানা রকমের সবুজ ছড়িয়ে থাকে দু'পাশে, একটি দুটি হলুদ খসে পড়ে।
দু'তিনটে গোরুর গাড়ি মনোকষ্টের মতন শব্দ করতে করতে অন্যদিকে
চলে যায় এদিকে তাকায় না
ঠিকাদাররা চেনে না এমন পথও রয়ে গেছে এই ব্যস্ত মহীমণ্ডলে?
কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, মেটে মোরাম বিছানো, সরল বিস্তৃত
কখনো ঘুমোয়, কখনো জাগে
কৈশোর দুপুরের স্মৃতির মতন, আগামী শতাব্দীর স্বপ্নের মতন
কোনো নিষেধ নেই, তবু থমকে দাঁড়িয়ে আমি দেখি
সেই নিঃসঙ্গ পথটির অপরূপ নির্জনতা
পাছে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাই চোখ বুঁজি।

পালাতে পারবে না

স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন, কাচ তোলা, কুচো কুচো বাচ্চাদের
বিরক্তিকর হাত দেখে মুখ ফেরাও, তুমি দেখতে পাবে
তোমার বাসমতী অন্নের মধ্যে কিলবিল করছে চুল
কলার খোসার মতন ওদের প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে কোথাও পালিয়ে যেতে
পারবে না
দু'পাশে প্রকৃতি নেই, ঐ সব ছোট ছোট হাত উপড়ে নিচ্ছে অরণ্য
ওরাই শুষে নিচ্ছে নদী
রক্তবীজের ঝাড়, প্রতিদিন দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ
দু'চারটে বাঘের পেটে গেলে বাঘও ভেদ বমি করে
কী ঝকঝকে ধারালো দাঁত ওদের, কী সাঙ্ঘাতিক কোমল প্রতিশোধ
খল খল করে হেসে ধেয়ে আসছে অযুত-নিযুত ধুলোমাখা শিশু
পালাতে পারবে না, যদি মানুষ হও, ফিরে দাঁড়াও
প্রভূত অন্যায়ের মধ্য থেকে খুঁজে নাও তোমার আত্মজকে!

শিল্প-সমালোচক

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের দু'বছরের বাচ্চা মেয়েটি
দমকা হাওয়ার মতন যখন তখন তাকে দেখতে পাই
তার পায়ে এখনও রয়েছে টলমল ছন্দ
তার ভাষা আমি সব বুঝি না
বিশ্বব্যাপী দুর্বোধ্যতার ভেতরের সরলতাকে সে
খুলছে একটু একটু করে
এক একটি জিনিস তুলে ধরে সে নিজস্ব নাম দেয়
যা তার পছন্দ হয় না, তা সে অনায়াসে ফেলে দিতে পারে
সে রোদ্দুরকে বলে পাখি
আর আয়নাকে বলে জল
তারপর এক সময় হঠাৎ সে মা মা বলে ডেকে ওঠে
আমি মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করি, কোথায় তোমার মা?
সে দেয়ালে মোনালিসার ছবির দিকে আঙুল তুলে
বলে, ঐ যে!

নদী জানে

নিরালা নদীর প্রান্তে পড়ে আছে
দুঃখী মানুষের নীল জামা
আর কেউ নেই, রোদ নেই
ছায়ামাখা শূন্য দিন
লোকটি কোথায় গেছে?
সে কি জলে নেমে গেল
সহসা হৃদয় জোড়া পাতাল সন্ধানে?
অথবা সে শুয়ে আছে
জঙ্গলের কারুকার্যময় স্তব্ধতায়?
তার নগ্ন শরীরের ওপরে ঝরেছে
শুকনো পাতা
দুঃখী মানুষেরা কোনো চিহ্ন রেখে
যায় না কোথাও
তবু এই নদীতীরে পুঞ্জীভূত নীল সুতো

যেন কারো জীবনকাহিনী
যেন কিছু নিশ্বাসের সারমর্ম
রাজ্যহারা অভিমান, সুখচ্ছিন্ন চিঠি
ও যেন আমারই, আমি একদিন এইখানে
নিঃশব্দে ডুবেছি, নদী জানে।

এক এক দিন

এক এক দিন সুনিশ্চিত চোখ খুলে ঘুম ভাঙে
সে এক অন্যরকম জাগরণ, যেন পাহাড়ী নদীর কিনারায়
একা বসে থাকা
তখন আকাশ আমার দিকে তাকায়
বারান্দার ফুলগাছটার প্রতিটি পাতা আমাকেই দেখে
পৃথিবী নিস্তব্ধ এবং আর কোথাও কোনো মানুষ নেই
এরকম একটা পাতলা অনুভূতি পাখির পালকের মতন
বাতাস কেটে ঘুরতে ঘুরতে নামে
আমার দু'চোখ রক্তিম, শিরা উপশিরায় গত রাত্রির নেশা
ভারী চমৎকার পা ফেলে এগিয়ে যাই অলীকের দিকে
আমি চেনা জায়গায় নেই, আমি কোথায় আমি জানি না
নিশ্বাসে পাই ছেলেবেলার শিউলি ফুলের ঘ্রাণ যেন
কিশোরীর সদ্য-ফোটা, শব্দময় বুক
এইসব দিন এক জীবনে একটি-দুটি বারই আসে
তখন এই বিশ্ব অনায়াসেই অন্য কারুকে
দান করা যায়।

দেয়ালে নোনা দাগ

দেয়ালে নোনা দাগ মেঘের খেলা
শিয়রে বইগুলি পাখির মতো
অলস বিছানায় ছুটির বেলা
বাসনা অশ্বটি অসংযত।

মাথায় ব্যান্ডেজ, দুপুরে তবু
শরীর জেগে ওঠে আকাশময়
দিনের ঈশ্বর রাতের প্রভু
এখন তারা কেউ আমার নয়।

এই যে মেঘরাশি ছোট্ট ঘরে
এখানে অশ্বের তুমুল হ্রেষা
মাতৃবন্ধন ছিন্ন করে
আত্মধ্বংসের নিভৃত নেশা।

সাধের স্বর্গকে এখন পারি
সহসা বলে দিতে, নরকে যাও!
আকুল মূর্ধজা ছবির নারী
দু'হাত তুলে বলে, আমাকে নাও!

ছবির মানুষ

বাক্স ভর্তি একটা পারিবারিক গল্প নিয়ে স্টেশনের
ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে একলা বসে আছে
একজন মানুষ
তিন চার দিনের বাসী দাড়ি, ময়লা হাফ-হাতা টুইলের শার্ট
বিড়ির ধোঁয়ায় মুচড়ে উঠছে তার জীবন
আমার ইচ্ছে করে ওর কাছে গিয়ে বসতে, কিন্তু বসি না...

বাজারের পাশের গয়না-বন্ধকীর দোকানটির কেন্দ্রমণি হয়ে আছে
এক হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় মাকড়সা

একটি পোড়াটে চেহারার রমণী সেখান দিয়ে যেতে যেতে
একটু আস্তে হাঁটে, থামে না
তিনবার তাকায়
তার মধ্যে একটি চাহনি দশ-বারো বছর লম্বা
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সে উড়িয়ে দিয়ে যায় এক বিয়োগান্ত কাহিনী
কেউ টের পায় না...

সদর আদালতের পেছনের জামরুল গাছটার মাথায় থমকে থাকে
বিকেল চারটের উজ্জ্বলতম রোদ
একটা দোয়েল আধখানা গান হঠাৎ ফেলে রেখে কোথায়
মিলিয়ে গেল
ঐ দোয়েলের কোনো গল্প নেই, রোদ্দুরের কোনো গল্প নেই
কিন্তু জামরুল গাছটার নীচে ছাতা সারাইওয়ালার সামনে
উঁচু হয়ে বসে আছে যে লোকটা
এক মনে দেখছে সেলাই-এর সুচ-সুতোর ফোঁড়
তাঁর চোখের নীচে কালো সমুদ্র তটভূমি
সে কি সর্বস্ব ভাসিয়ে দিয়ে এলো এইমাত্র?

দিব্যি আছি

বুকের মধ্যে একটু আধটু দুঃখ পোষা
কিন্তু খুবই ভালো আছি
এই তো বেশ ঘুরছি ফিরছি
লম্ফ-ঝম্পে দিন পেরুচ্ছি
একটু খোঁচা, একটু ব্যথার টনটনানি
তবু বলবো দিব্যি আছি!

উল্টোপাল্টা ঝড়ের ধাক্কা খেয়েছি ঢের
সে সব হলো আগের জন্মে
যখন তখন আয়ুর খর্চা
আগুন হাতে ফুলের চর্চা
এই সবই তো খালিপেটের দুনিয়াদারি
দু'বার কি হয় মানবজন্মে?

নদীমাতৃক

নদীটির নাম সাসকাচুয়ান
দু'দিকে শুভ্র ঢেউ
এপারের আলো ওপারের হিম
ছাড়িয়ে হঠাৎ
পরা-বাস্তব কার যেন মুখ দেখে।
সহসা কিসের শব্দ উঠলো,
কে যেন বললো
বরফ ভাঙছে, শুনলে না কেউ?
বাতাস স্তব্ধ, আকাশের কোনো
চেনাশুনো নেই
শান্ত শায়িত ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা...

আমি চলে যাই অন্য একটি
নদীর কিনারে
গ্রীষ্মদুপুর,
গয়না নৌকা
মাছধরা জাল
আড়িয়েল খাঁর তীরে বসে আছে
বাল্য মূর্তি
কপিশ মেঘের পটভূমিকায়
চিল সমারোহ
ভাটিয়ালি সুরে কে যেন ডাকছে
কার পুত্রকে
স্টিমারের ভেঁপু
দূরকে করেছে নিকট বন্ধু
মিহি দুঃখের কণা উড়ে যায় মেঘে।

কিসের বিষাদ, কেমন বিষাদ
মনেও পড়ে না
শুধু মনে পড়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকা
একাকিত্বের দারুণ গহন
চক্ষু না মেলে, শ্রবণ না খুলে
জীবনযাপন
এমন সময় নদী ডাকে নাম ধরে!

যাই যাই করে ওঠার আগেই
এ পৃথিবী কাঁপে
হাহা রবে কারা ধেয়েছিল যেন
ধুলোর কুহেলি
এদিকে ফাটল, ওদিকে ফাটল
মাটি খোঁজে জল, জলের শিকল
জলের আগুন,
জল-সংসার
প্লাবনের ধ্বনি
গর্ভ অতলে মিলিয়ে যাবার
প্রাকমুহূর্তে
কেউ যেন হাত ধরে দিয়েছিল টান!

নিপারের কূলে ভেঙে দিল ঘুম
দ্বিপ্রহরের
ক্ষণ আবল্লী
অতি বিখ্যাত সুন্দর চারদিকে
তবুও হঠাৎ আকাশ দু'ভাগ
চড়াৎ শব্দ
রুপালি ঝলক, ক্ষণ বিদ্যুৎ...
সেবারে বর্ষা অজয়ের পাড়
দাপিয়ে অনেক
দূরে ছুটছিল
সেতু উপড়িয়ে
খ্যাতি চেয়েছিল
মুথা ঘাস আর শালজঙ্গল
চাষীর মেয়ের বিবাহবাসর
সব ভেসেছিল ঘোলাটে প্রবল স্রোতে
আমিও গিয়েছি, ডুবেছি, ভেসেছি
এ নদীতে নয়
অন্য জোয়ার
এ দুনিয়া নয়, অন্য দুনিয়া
সে রকম ঘুম স্বপ্নে প্রথম দেখা!

এত সহজেই

ছোটখাটো ঘুম ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে
নদীর কিনারে, বনে
ভোরের আলোর লূতাতন্তুর টুকরো টুকরো চাদর
যে-ছন্নছাড়া সময় উড়েছে, বারুদ পুড়েছে
সমগ্র যৌবনে
একবার তার নিতে সাধ হয় নির্জনতার আদর।
মনে পড়ে যায় কথা দেওয়া আছে বানভাসি গ্রাম
ভাঙা দেউলের কাছে
ফের দেখা হবে, পৃথিবী ঘুরছে, আমিও ফিরবো আবার
চাঁদ উড়ে যায় চৈত্রের ঝড়ে, চোখ ঝল্‌সায়
অহংকারের আঁচে
মুঠোয় বাতাস, এত সহজেই পেয়েছি যা ছিল পাবার!

যে আগুন দেখা যায় না

যে আগুন দেখা যায় না সে পোড়ায় বেশি
অণু-পরমাণু ঘিরে ধিকিধিকি জ্বলে
এ যেন তুলোর রাশি বাতাসের উৎসাহ জেনেছে
বৃষ্টি বা নদীও জানে
তারা সসম্মানে সরে যায়
যে আগুন দেখা যায় না সে পোড়ায় বেশি

জ্বলে তো জ্বলুক, পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সব ছাই করে দিক।

আমার নয়

পাহাড় ভেঙে ভেঙে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, আমার বুক ফেটে যায়
অথচ ঐ পাহাড় আমার নয়
পাহাড়ের ম্যাজেন্টা রঙের হৃৎপিণ্ড উপড়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়
কেউ একজন
আর কেউ পাহাড়ের উরুতে রাখে ডিনামাইট
বারুদের ধুলো মাখা মানুষ পিঁপড়ের মতন ছুটছে চতুর্দিকে
মনে হয় আমি মানুষও নই
মহারথী কর্ণের মতন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
মহাবাহু শাল গাছ
সে আমার বন্ধু ছিল না, সে আমার মৃত বন্ধুর মতন
একটু একটু করে এগিয়ে আসছে পথ
সে অনেক দূর যাবে, সে দিগন্তকে ছোঁবে ঠিক করেছে
দিগন্তও এখন ধুলো কাদা মেখে খেলছে
সরলরেখারা প্রতিজ্ঞা করেছে, যা কিছু অসমান সব
সমান করে দেবে
এই পাহাড়ের আড়ালে আর সূর্য লুকোবে না, এখানে
আর নিচু হয়ে আসবে না আকাশ
সূর্য কিংবা আকাশও তো আমার নয়!

ফেরা না ফেরা

ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো
দেখোনি পথের কাঁটা, দেখোনি তমসা?
স্বপ্নের ভেতরে জানো শূল, অপাপবিদ্ধের শুভ্র
অভিশাপ হাসি
প্রতিটি ধ্বংসের পর কারা দেয় এত সকৌতুক করতালি?
আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে দেবে নিশান
তাহলে কোথায় যাবো, কার কাছে যাওয়া এই না-ফেরার পথে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো।

দেখোনি স্থাণুর কীট? দেখোনি সমস্ত দিন
ভুলের কাঁকর আর মুখ ভরা অনিন্দার ধুলো?
এ রকম কথা ছিল? যখন তখন সব
প্রয়াগে বিলিয়ে দেওয়া শপথ ছিলো না?
ছিঁড়ে যাই হাজার অদৃশ্য সুতো, আরও কিছু
যার নাম মায়া
যাবো না? এখন না যদি যাই, তবে আর কবে?
ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার মাথার দিব্যি,
ফিরে এসো!

একমাত্র উপমাহীন

সারা জীবন খোঁড়াখুঁড়ির শেষ হলো না।
এ যেন সেই বালির নীচে নদী
অথবা নয় নদী, কেননা নারীর মতন নদীরাও
কখনো হয় খুব আপন?
অন্ধকার স্রোতস্বিনী নারীরা নয় অচেনা?
একমাত্র উপমাহীন তুমি আমার বুকের মধ্যে
আমার তুমি, কিংবা আমি তোমার?

রহস্যময় অজানা থেকে একটি দুটি শব্দ হঠাৎ উড়ে আসে।
তারা নিজেই কবিতা হয়ে গড়ে ওঠে,
আবার হয়তো ওঠে না!
আমিই লিখি, আবার তাকে আমিই অপছন্দ করি
নিজের ওপর রেগে উঠি, কে রাগায়?
মধ্যরাতের অস্থিরতা সে কি আমার?
যুক্তিবিহীন ভালোবাসা পাগল করে ছুটিয়ে মারে
অথচ আমি সবই জানি, তুমি জানো না?

এ পৃথিবী জানে

এ পৃথিবী জানে কারো কারো বুক শূন্য
এ পৃথিবী জানে কেউ ভ্রমরের খুনি
কেউ অবেলায় বিজনে হারায়, বিষণ্ণ বালিয়াড়ি
এ পৃথিবী জানে, মানুষে মানুষে
আজও চেনাশুনো হয়নি।

মানুষের জন্য নয়

এত ফুল, এর কোনটাই মানুষের জন্য নয়
মানুষের চোখের জন্য নয়, মানুষের ইন্দ্রিয়ের জন্য নয়,
সবই তুচ্ছ কিছু পোকা-মাকড়ের জন্য।
মানুষ তার রূপ দেখেছে, মানুষ তার ঘ্রাণ নিয়েছে
মানুষ লিখেছে কত কাব্য, লিখেছে গান।
জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মানুষ কুসুমসঙ্গী হতে ভালোবাসে
গোলাপ, গন্ধরাজ, চাঁপা, মল্লিকারা তা গ্রাহ্যও করে না,
তারা শুধু কীট পতঙ্গের জন্য মেলে রাখে সর্বস্ব।
হায় মানুষের জন্য একটাও ফুল ফোটে না।

সে

রেল লাইনে মাথা পেতে যে লোকটা শুয়ে আছে
সে বিশ্বশান্তির কথা চিন্তা করেনি
সে এসেছে অনেক দূর থেকে
অন্ধকার মাঠের মধ্যে বার বার হোঁচট খেতে খেতে
সে একজন কষ্টসহিষ্ণু মানুষ
সে কোন কবিকেও প্রেরণা দিতে চায় না।

দুই কবি: একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার

গঙ্গাতীরে এক তীর্থক্ষেত্রে চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্যস্নান
এসেছে অসংখ্য মানুষ, বলদর্পী রাজপুরুষ, বহু অকিঞ্চন
অনেক সৌভাগ্যবতী রমণী, তেমনই অনেক অভাগিনী
এসেছে বৃদ্ধ ও শিশুর দঙ্গল, প্রহরী ও পরস্ব-অপহারী
এবং দুই কবি।

একজন বহু খ্যাতিমান, সম্ভ্রান্ত ও মাল্যবান, সার্থকতা মাখা মুখ
এসেছেন পাল্কী-বেহারা ও সাঙ্গোপাঙ্গ, ঐশ্বর্যের বিচ্ছুরণ নিয়ে
মিথিলার রাজকবি ইনি, বিদ্যাপতি।
অন্য কবিটিকে কেউ চেনে না এখানে, অতি সাধারণ
পরিব্রাজী ব্রাহ্মণের মতো, অঙ্গে সেলাই-বিহীন বসন
মুণ্ডিত মস্তকে দীর্ঘ শিখা, ধূলি-ধূসরিত নগ্ন পা
ইনি বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস।

প্রথম অবগাহনের পর বক্ষ-সমান জলে দাঁড়িয়ে
সূর্যবন্দনা করছেন বিদ্যাপতি।
চণ্ডীদাস জলে নামেন নি এখনো, অল্প দূরে, তীরে দাঁড়িয়ে
মুগ্ধ ভাবে দেখছেন, শুনছেন গভীর অভিনিবেশে
জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অতি নিখুঁত দেবভাষায় শ্লোক উচ্চারণ।

স্নান সেরে ওপরে এলেন বিদ্যাপতি, শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে
শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের উৎসুক নয়ন দেখে থামলেন,
আজ তিনি কোনো প্রার্থীকেই ফেরাবেন না
হাঁক দিয়ে বললেন, ওরে, কে আছিস
এই ভিক্ষুটিকে দে কিছু তণ্ডুল ও স্বর্ণকণা!
চণ্ডীদাস ছুটে এসে নতজানু হয়ে বসলেন
বিদ্যাপতির পায়ের কাছে, আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললেন,
আপনি যে আমার প্রতি কৃপার দৃষ্টিতে চেয়েছেন
তাতেই ধন্য হয়েছি আমি, হে কবিকুল-তিলক
আমি শুধু দর্শন করতে এসেছি আপনাকে। এ অধমের নাম
দীন চণ্ডীদাস।

বিরক্তিসূচক ভুরু কপালে উঁচিয়ে বিদ্যাপতি
বললেন, সদ্য স্নান করে এসেছি আমি, তুমি অস্নাত,

ব্রাহ্মণ, আমায় তুমি স্পর্শ করলে?
যেন বিদ্যাপতি তাঁকে পদাঘাত করবেন, এই ভেবে
দ্রুত সরে এলেন চণ্ডীদাস, হাত জোড় করে বললেন,
গঙ্গাতীরের বায়ুও পবিত্র, হে মান্যবর, এই বাতাসে
যে আচমন করেছে তার স্পর্শে কিছু অশুচি হয় কি?
এখানের ধারাবর্ষণও তো গঙ্গোদক, আমি সিক্ত ভোরের বৃষ্টিতে।

বিদ্যাপতি : তবু জেনে রেখো, শুচি বা অশুচি যাই হোক
পুরুষের স্পর্শে আমার প্রদাহ হয়, পুরুষেরা পরস্পর
দূরে থাকা ভালো।

চণ্ডীদাস : আমি অপরাধী; দর্শনই যথেষ্ট ছিল, পাদস্পর্শে
আমার অতি ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, ক্ষমা করুন।

দুই ভৃত্য দুই দিক থেকে মুছে দিতে লাগলো বিদ্যাপতির
গৌর তনু, তিনি ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে
অকস্মাৎ দৃষ্টি নামিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, কী নাম বললে হে,
চণ্ডীদাস? যেন চেনা চেনা
তুমি কিছু গীত রচেছো নাকি?
চণ্ডীদাস আপ্লুত স্বরে উত্তর দিলেন,
স্বয়ং রচনা করি এমন সাধ্য কি আমার!
দেবী বাশুলীর দয়া, কখনো আমাকে দিয়ে
কিছু কাব্যলহরীর প্রকাশ ঘটান!

বিদ্যাপতি : 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ', তুমি...মহাশয়,
আপনি কি সেই চণ্ডীদাস?

চণ্ডীদাস আছেন অসংখ্য কবি, তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক
চণ্ডীদাস। আমি সে-ই বটে!

ভৃত্য দু'জনকে সরে যাবার ইঙ্গিত করলেন বিদ্যাপতি
তার প্রশস্ত ললাট হলো সীমাবদ্ধ
উন্নত মুখশ্রীতে পড়লো বিষাদের ছায়া
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এবারে বুঝেছি!
আমার স্মৃতি-বিভ্রম, ঊষাকাল থেকেই আমি রয়েছি বিষম অন্যমনা
সেই সুযোগে আপনি
বিদ্রূপের কশাঘাত হানতে এসেছেন আমাকে।
আপনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি
আর আমি এক রাজভৃত্য মাত্র!

চণ্ডীদাস : এ কী কথা বলছেন, হে কবি-অগ্রগণ্য

আপনার খ্যাতি এ ভারতমণ্ডলে কে না জানে?
স্বয়ং মহারাজ শিব সিংহ আপনার কাব্যসুধার অনুরক্ত
এমনকি দিল্লির বাদশাহ পর্যন্ত দিয়েছেন জায়গির...

বিদ্যাপতি অবশ্যই! রাজসভায় যত আছে বেতনভুক পাঠক
তারা উচ্চৈস্বরে গায় আমার অলংকারবহুল কাহিনী-গাথা
অভিজাতবৃন্দ তা শোনে, বুঝুক বা না-বুঝুক আহা আহা করে
আর, আপনার গীত আস্বাদন করে
আপামর জনসাধারণ দূর দূরান্তরে
আমি জানি, বাতাস-বৃষ্টি ও রৌদ্রের মতন স্বতঃস্ফূর্ত
আপনার পদাবলী সমগ্র রাঢ়-বঙ্গে
অতি সাবলীল ভ্রমণ-স্বপনে যায়
আপনি ধন্য, আমি বন্দী!

চণ্ডীদাস কাব্যকলার অধীশ্বর, আপনি, আমাদের গুরু
আপনার রসজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান গঙ্গা-যমুনার
মতো মিলে মিশে আছে
আপনার শব্দ ঝংকার, চকিত রঙিন উপমার ব্যবহার
আপনার নব রসের অতি নিপুণ সুষ্ঠু প্রয়োগ
এসব কোথায় পাবো আমি
আমি শিক্ষাহীন, দীন হীন অভাজন।

বিদ্যাপতি অনেক জেনেছি, তাই আমি সারল্য ভুলেছি।
সুষ্ঠু নব-রস নয়, প্রথম রসেরই স্রোত বইয়ে দিয়েছি বেশি
কেননা নপুংসক রাজবর্গ শুধু ও রসেই তৃপ্তি পায়।

চণ্ডীদাস : আপনি অমর প্রেম-সঙ্গীতের উদ্গাতা

বিদ্যাপতি : আর আপনি, বিপ্র চণ্ডীদাস, প্রণয়ের সঙ্গে
অবাধে মেশাতে পেরেছেন উদাসীনতা
আপনি গান বেঁধেছেন কানু ও রাইকে নিয়ে
আমার কাব্যে ওরা রাধা-কৃষ্ণ, যেন অন্য মানুষ
আমার কৃষ্ণের সঙ্গে লালসাময় বয়স্ক রাজার আদল
আর আপনার কানু যে-কোনো রাখাল।

চণ্ডীদাস আপনি পেয়েছেন প্রতিষ্ঠা

বিদ্যাপতি আপনি পেয়েছেন নাম-না-জানা অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা

চণ্ডীদাস কী যে বলেন, মহাকবি! আমি অভাজন
দুবেলা জোটে না অন্ন, হট্টমন্দিরে শুয়ে থাকি
যদি পেতাম আপনার মতন স্বাচ্ছন্দ্য, সুখের আশ্রয়
হয়তো আর একটু মন দিতে পারতুম কাব্য-সরস্বতীর
সাধনায়!

বিদ্যাপতি আমার অন্ন ও বস্ত্র প্রয়োজনের অনেক বেশি, তাই
এসেছে অরুচি!
পার্থিব কিছুরই নেই অভাব, হায়, তবু
অপার্থিব কোনো চিন্তা মস্তিষ্কে আসে না!

চণ্ডীদাস আপনি পেয়েছেন রাজমহিষী লছিমা দেবীর প্রশ্রয়
এমন সৌভাগ্য হয় কোন কবির?

বিদ্যাপতি আমিও শুনেছি, রজকিনী রামতারা, নারী শ্রেষ্ঠা,
আপনার সাধনসঙ্গিনী

চণ্ডীদাস : সে যে অতি নগণ্যা

বিদ্যাপতি : তবু সে-ই জানে প্রণয়ের গূঢ় মর্ম, তাই আপনার কবিতার
প্রতিটি চরণে এত সুধা-সরোবর!
রাজমহিষীর আলিঙ্গন
আমাকে দিয়েছে শুধু সোনার শৃঙ্খল!

চণ্ডীদাস কবি বিদ্যাপতি, আপনি মিছে আত্মগ্লানি করছেন
যে জীবন অনিশ্চিত, পদে পদে অন্নচিন্তা, প্রতিবেশীদের
অবহেলা
সে জীবন সুখের মোটেই নয়, বড় জ্বালা, পথে পথে
অনেক কণ্টক
অনেক সয়েছি আমি, আজ ক্লান্ত, পেতে ইচ্ছে হয়
কিছু স্বস্তি, কিছু আরামের দ্রব্য, কিছু উপভোগ।

বিদ্যাপতি : আমার তো ইচ্ছে হয় সর্বস্ব দিতে বিসর্জন!
এখনো সময় আছে...

চণ্ডীদাস কী আশ্চর্য, আপনি স্বেচ্ছায় বরণ করতে চান দারিদ্র্য?
অথচ দরিদ্র আমি, মনে ছিল সুপ্ত অভিলাষ
আপনার সূত্র ধরে পাই যদি কোনো রাজ-অনুগ্রহকণা
একখানি নিজস্ব কুটির, কিছু শস্যভূমি

বিদ্যাপতি থমকে রইলেন ক্ষণকাল, বুঝি অশ্রুবাষ্পে
রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠ
পুনরায় মুখ তুলে বললেন, ভ্রাতঃ, তা হলে আসুন
এখুনি বদল করি আমাদের দু'জনের জীবনের গতি
নিন সব মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, দাসদাসী
ভিক্ষা দিন আপনার ছিন্ন উত্তরীয়
আসন গ্রহণ করুন আপনি রাজসভায়
আমি ভ্রাম্যমাণ হবো উন্মুক্ত প্রান্তরে
রানী লছিমার বক্ষ আপনার আশ্রয় হোক,

আমি যাবো রামী ধোপানীর কাছে, চাইবো তার দয়া
আপনি ভোগ করুন পলান্ন ও সোম
আমি উপভোগ করবো নুন-ভাত, ঝর্ণার পানীয়
শুরু হোক আমাদের বিপরীত নতুন জীবন...

তারপর দুই কবি আবেগ-ধাবিত হয়ে
এরকম ভাবে আলিঙ্গন করলেন পরস্পরকে যেন
দু'জনের শরীর মিশে একটি শরীর হয়ে গেল।
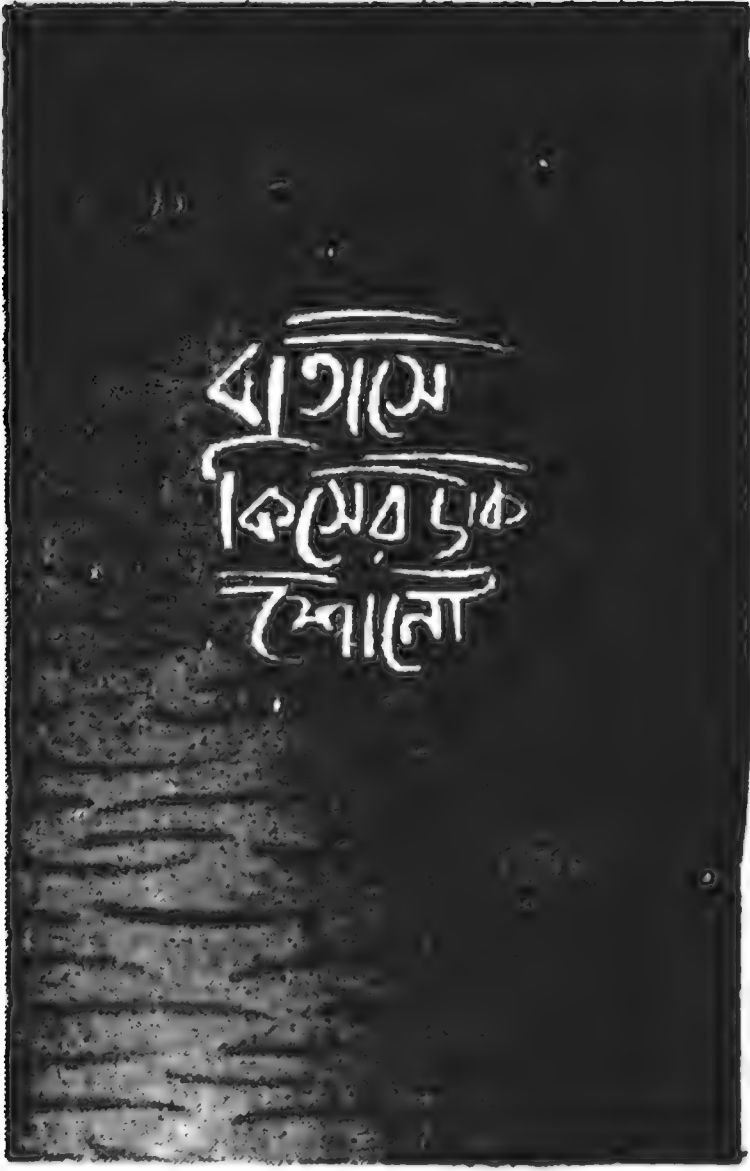
বাতাসে কিসের ডাক, শোনো

সূচিপত্র

আড়ালে, আড়ালে

পিঠের চামড়ায় একটু একটু করে কাঁপছে
ভয়
যেন পদশব্দের আড়ালে
অন্য শব্দ
যেন অজানা আশঙ্কা বাঁশি বাজাচ্ছে গাছের ডালে বসে
যেন কেউ থামতে বলছে
যেন কেউ বললো,
বড় দেরি হয়ে গেল
ফিরে তাকালেই ধূল্যবলুণ্ঠিত জ্যোৎস্নার নিস্তব্ধতা
কে ওখানে?
পাতার আড়ালে তুমি কে?
বনভূমি সাড়া দেয় না, যেমন রাত্রিও নির্নিমেষ!

বারুদের কারখানা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি
তবু দেখা গেল না বাল্য সঙ্গীদের
নদীর খাতের মধ্যে নদী
নেই
যেন মানুষ ঘুমোচ্ছে অথচ স্বপ্ন দেখছে
না
একটা শুকনো প্রান্তরে কাঁচা কাঠের আনমনা আগুন জ্বেলে
মনস্বীরা গোল হয়ে বসে পুড়িয়ে খাচ্ছেন ইতিহাস
আকাশে চতুর্বর্ণ মেঘ, তার নীচে রক্তিম সুতোর
ওড়াউড়ি
ঢেউয়ের মতন দুলতে দুলতে
ঢেউয়ের মতন মুখ বদলাতে বদলাতে
আসছে ঝড়, খেলতে এলো ঝড়
মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে, বন পেরিয়ে পাহাড়ে
কে ওখানে?
গুহার আড়ালে তুমি কে?
পাহাড় মানুষের সঙ্গে কথা বলে না, ঝড়ও না!

যেখানে একটা রাস্তা ছিল, সেখানে কাগজের স্তূপ
অক্ষর অনেক মুছে গেছে, বৃষ্টিতে ধুয়েছে
অবশ্য নানা রকম সেলাইগুলি বেশ মজবুত

এই রাস্তায় একটি করমচা রঙের কিশোরী
একদিন
একটি গাছের কাছে মনের কথা বলতে গিয়ে
প্রথম স্তনস্পন্দন টের পেয়েছিল
গাছটি মিলিয়ে গেছে সভ্যতায়
কিশোরীটি টুকরো টুকরো হয়েছে ছাপাখানার জঠরে
তার ধবল হাঁসের মতন ঊরুতে মাথা রেখে
যে কেঁদেছিল
সে পরে মাথা ঘামিয়েছে অসংখ্য উপমায়
বজ্র পতনের শব্দে পাথর ফাটে, কাগজের মণ্ড
নড়ে না
কে ওখানে?
বৃষ্টির মধ্যে কে যায়?
কেউ না, কাগজ হাসছে, ভাসছে কাগজের নৌকো!

বাউলের গায়ের নানা রকম রঙের জামার মতন
এই অরণ্য
দিনাবসানের আসন্ন বেলায় হাতছানি দিল
দিগন্ত এমন লাল
যেন বন্ধুকে ছুরি মেরেছে বন্ধু
যেন সমস্ত নিভৃত কথা ভুলে যাবার লজ্জা
মিহিন হয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এই আকাশ থেকে
অন্য আকাশে
কেউ আসন পেতে রেখেছিল
আমি যাইনি
এখন আমি এসেছি, কেউ নেই
কেউ নেই, তবু কেন নিস্তব্ধতার এমন প্রবল শব্দ
কে ওখানে?
নিঃসঙ্গতার আড়ালে তুমি কে?
আকাশ লুটিয়ে পড়ে, গাছপালা কাঁপিয়ে দেয় হাওয়া!

তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা

এক এক রকম অন্যায় আছে, যা আয়নার উল্টোপিঠের মতন
খুব কাছে কিন্তু কেউ উঁকি মেরে দেখে না
এক এক রকম মাকড়সার জাল আছে, যা উৎসব বাড়ির সন্ধেবেলায়
হিসিভেজা পোষাকের মতন, প্রকাশ্যে খুলে ফেলা যায় না
এক এক রকম কুমিরের কান্না আছে যা শুধু খবরের কাগজের
পৃষ্ঠা ভাসিয়ে দেয়
এক এক রকম ভালোবাসা আছে যা নদীর কিনারে ভাসমান
শবের মতন
কেউ চেনে না, চিনতেও চায় না
এক এক রকম বন্ধুত্ব শুধু দরজার পর দরজা বন্ধ করে দেয়
এক এক রকম প্রকৃতি আছে যা শুধু দুঃস্বপ্নেই সুন্দর
এক এক রকম ধ্বংস আছে যা রাত্রির বিছানায় প্রমত্ত
সুখের মতন
অথচ চায় গাঢ় প্রতিশোধ
এক এক রকম জীবন আছে যা অলীক কেল্লার বিশ্বস্ত
প্রহরীর মতন
তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা ভরে যায়।

পিছুটান

মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখি আকাশে লাল মেঘ
আসবে, যে কোন সময়ে সে এসে পড়বে, সে আসবে
তার আগে সেরে নিতে হবে কি অসমাপ্ত কবিতার কাজ?
কাগজের মাথায় আলপিন, বুকে পাথর
মেঝেতে ছড়ানো টুকরো টুকরো বাল্যস্মৃতি
উড়ছে ধূসর রঙের ঘোড়া। শুনতে পাচ্ছি হ্রেষা
বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মতন নাদ ব্রহ্ম, অসংখ্য নিশান
কী যেন বাকি রয়ে গেল, কী যেন, আঃ এত পিছুটান!

কাছাকাছি মানুষের

যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা, যারা খুব চেনা
তাদের হৃদয় খুব জানাশোনা ভেবে বসে আছি
যত ভালোবাসা স্নেহ পাবার নিয়মে পেয়ে গেছি
কখনো ভাবিনি তার প্রত্যেকের ভিন্ন বর্ণচ্ছটা
প্রত্যেক হৃদয়ে বহু কুয়াশার ইন্দ্রজাল, মৃদু অভিমান
কাছাকাছি মানুষের বিশাল দূরত্ব দেখে থমকে গিয়ে দেখি
ফেরার রাস্তাও যেন মুছে গেছে, সেই থেকে আমি
কাছাকাছি মানুষের সুদূর রহস্যে মিশে আছি।

এক ঝলক

পাট পচা পাংশু জলে স্নান করছে এক জোড়া অপ্সরী
অবনত সন্ধেবেলা অপরূপ অলীকের আব্রু ঘিরে ছিল
গোরুর পায়ের ধুলো, দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি তাও মায়াজাল
অদূরেই ট্রেন লাইন, প্রতীক্ষার শোঁ শোঁ শব্দ উন্মার্গ বাতাসে।

খিদের মতন ধোঁয়া এ বাড়ি ও বাড়ি ঘোরে, যায় না তবুও
ছাইগাদায় শুয়ে থাকা পুঁয়ে পাওয়া কুত্তাটির চোখ বুঁজে আসে
যেমন ঘুমের মধ্যে চলে যাওয়া, যেমন ঘুমের মধ্যে ফেরা
মানুষও আসে যায়, কারা এলো, কারা গেল, কিবা যায় আসে!

ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছে রোগা রোগা পাখিদের শব্দ-অভিমান।
ওদের প্রপিতামহ এই দেশে সুখে ছিল তাকি ওরা জানে?
রেলের খালের ধারে যে শিশুটি হিসি করে সে কিছু জানে না
হিজল ডালের বাঁকা দুটি উরু, মুখখানি নষ্টচাঁদ।

আঁচল গুছিয়ে দুই অপ্সরী কি উড়ে যাবে, জল তবু টানে
ভিতু জল খুশি হয়ে চাটে নিম্ন উদরের রক্তিম লাবণ্য
দুই সখী খলখলিয়ে হাসে, বুক খুলে দেয়, দেরি হয় হোক
চতুর্দিকে এত অসুন্দর তবু এক ঝলক হঠাৎ সুন্দর।

বীর্য

যাও নতুন উপনিবেশে, নতুন রাস্তায় বাড়ি হাঁকো
ডিপ টিউবওয়েলে ভেজাও বালিয়াড়ি
লাগাও ম্যাজিকের কৃষ্ণচূড়া গাছ
গর্ত থেকে টেনে তোলো সাপ, এখানে শিশুদের পার্ক হবে
মহেঞ্জোদারো থেকে শিখে নাওনি ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালী?

কীট-পতঙ্গের সংসার ভাঙো, এখানে
শুরু হবে মানুষের সংসার
মানুষের জন্য আরও চাই, আরও চাই, সব ভূমি চাই
প্লট ভাগ করো, দক্ষিণ খোলা নিজের জন্য নাও
ভিত্ পুজোর জন্য দু'ঘণ্টা
তারপর খোঁড়াখুঁড়ি, ইঁট-কাঠ-লোহা...

এখনো যেখানে শূন্য সেই তিনতলায় একদিন
সুখ শয্যায় শুয়ে তোমার নারীর গর্ভে বীর্য নিষেক করবে
হ্যাঁ, বীর্য যেন থাকে, যেন থাকে, শুকিয়ে না যায়
তার মধ্যে!

স্বয়মাগতা

স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারাদিন
সবার চোখের সামনে দিয়ে মায়ার মতন আড়াল করা জীবন
কিংবা যেমন ত্রিবেণী সংগমের সরস্বতী নদীর ধারা
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন।

একটু একটু দগ্ধ করে শেষ করেছি সব আরব্ধ যজ্ঞ
হাড়ের বাঁশি সুর সেধেছে ও কিছু নয়, কিছুই যেন কিছু না
চামড়া-পোড়া গন্ধ নিয়ে গর্ব ভরে গেছি সভার মধ্যে
আঙুল কাটা রক্ত চুষে বলেছিলাম, দ্যাখো কেমন পাওয়া!

আমার ঘরে জমানো সব টুকরো-টাকরা, যেন মুণ্ডমালা
ভালোবাসায় ছাই উড়েছে, মহাদলিলখানায় জ্বললো আগুন
যেন আকাশ নেই, অথচ সূদূর সীমা ডেকে বললো, এসো
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন

স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারাদিন
দিনের মধ্যে আল-জাঙাল, দু' হাতে কান চাপার মধ্যে হাসি
রূপ কিংবা সিংহাসন বা ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা স্বপ্ন
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন।

দাও সামান্য

আর কিছু নয়, দু' আঙুলের ডগায় নুন তোলার মতন
দাও ভালোবাসা!

কবে লিখেছিলাম এমন, পঁচিশ বছর আগে?
কাকে, কার উদ্দেশে, মনে নেই।
আমার শরীরময় মারকিউরোক্রোম ছাপের মতন ক্ষত
কিংবা স্মৃতি
আমি দুঃখ-টুঃখ পুড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছি
আলিঙ্গনের উষ্ণতা পেয়েছি বলেই টকাটক উড়িয়েছি গরলের পাত্র
কতবার কৌতুকহাস্যে অপরের চোখের জল চেটেছি জিভে
শরীর চেয়েছে শরীর, দিয়েছি, নিয়েছি
শরীর ডানা মেলে উড়ে গেছে, বিছানায় কয়েক ফোঁটা
ভিজে দাগ
বিষাদপন্থীদের মতন যাইনি প্রকৃতি-বন্দনা ছন্দে মেলাতে
তবু আজ মেঘলা আকাশ ও ঘুমন্ত পৃথিবীর মাঝখানে
একলা দাঁড়িয়ে আবার বলতে চাই
দু' আঙুলের ডগায় নুন তোলার মতন দাও,
দাও সামান্য ভালোবাসা!

বাতাসে কিসের ডাক, শোনো

যাবে?
ক্ষণেক দাঁড়াও, আগে ট্যাকের গিঁটটা কষে বাঁধি
যাবে?
কে বললে যাবো না, একটু দিগন্তকে ওড়াই ফুঁ দিয়ে
যাবে?
তিনটে পঞ্চান্নর ট্রেন, হাতে কিছু হকার্স মার্কেটে কেনাকাটি
যাবে?
যাওয়ার জন্যই আসা, তবে এত ব্যস্ততা কিসের
যাবে?
চেয়ে দ্যাখো, সোনা ভেঙে ধুলো হচ্ছে, ধুলোয় গড়াচ্ছে স্বাধীনতা
যাবে?
যে যেখানে খুশি যাক, আমার এ ভাঙা ঘরে প্রিয় অন্ধকার
যাবে?
পা বাড়িয়ে বসে আছি, চীন থেকে আসুক বারুদ
যাবে?
যাবো কি যাবো না আমি নিজে বুঝবো, তুমি কে হে ফোঁপর
দালাল
যাবে?
আজকে র‍্যাশান কার্ড দেবে, আজ অন্য সব ঝুট-ঝামেলা বাদ
যাবে?
দুপুরে শ্মশানে যাবো, রাত্রে এক বিয়ে বাড়ি, না গেলেই নয়
যাবে?
কোথায় যাবে হে, এসো, সস্তায় জোটানো গেছে এক বোতল
রাম
যাবে?
যমও ফিরে গেছে দু'দুবার খালি হাতে, তুমি নাও এক টুকরো
বাতাসা
যাবে?
লিবিডো প্রবল, শুধু মনে হয় বাকি রয়ে গেল অর্ধরতি
যাবে?
ছেলেটার উচ্চ মাধ্যমিক, এ বছর প্রশ্নই ওঠে না
যাবে?
পুরুষ সাম্রাজ্য আগে ভেঙে যাক, ঘাসবন থেকে হোক সভ্যতার
শুরু

যাবে?
ঘা শুকোচ্ছি। গতবার যেতে গিয়ে যা যা হলো কিছুই ভুলিনি
যাবে?
আমার নিজস্ব পথে যাবো, তাই পাথর ও কংক্রিটের অর্ডার
দিয়েছি।
যাবে?
গুরুমন্ত্র কানে আছে, আর সবই লাল-নীল সোনালি লালসা
যাবে?
মূর্খরাই কামানের খাদ্য হয়, সেনাপতি থাকে ঠাণ্ডা ঘরে
যাবে?
নিয়তি রেখেছে বেঁধে ভালোবাসা-অশ্রু-রক্ত মাখা এক নিশানের
নীচে
যাবে?
মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, ভাই বোন...আমার তো ইচ্ছে ছিল খুবই
যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে?
যাবে? যাবে? যাবে?......

বান্ধবগড়ের ধ্বংসস্তূপে

দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে
সেসব দিনের হৃৎস্পন্দনে ঝড়ো হাওয়া ছিল সঙ্গী
ছেঁড়া চপ্পলে ভিখারির হাসি, কার্পাস বীজ সন্ধ্যা
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর
দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে।

টুকরো আগুন যে-যেমন চায় ফুলকি উড়েছে নদীতে
গরল-শাসনে সুধা কৌতুক, আয়ু বাজি রাখা উৎসব
প্রিয় নিশিডাক, নিত্য নতুন পথ ছুটে গেছে স্বর্গে
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর
তবুও তৃষ্ণা মেটেনি এখানে ধ্বংসের মরীচিকা!

দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে
কার অরণ্য কোন অরণ্য এসবই আমার অচেনা

পটভুমি নীল বাঁধের ওপাশে পীতাভ রঙের অশ্ব
কিছু না থাকার স্মৃতি গম্বুজে দোয়েল পাখির শিস
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর!

অন্য কেউ দেবে

অর্জুন বৃক্ষটি থেকে একটি পাতা খসে পড়লো, জানি
এ আমারই জন্য শুধু, নববর্ষ চিঠি

ওপরের বারুদ আকাশ
কিছুই বলেনি মুখ ফিরিয়ে রয়েছে
এই বন, সরল অনিলময়, প্রাক্তন বৃষ্টির গন্ধ মাখা
এখানে আসার কথা ছিল না তো, আমি
নারীদের ঠিকানা হারিয়ে পথ ভুলে...
বিমান গর্জন থেকে এত দূরে, এখানে রয়েছে খুব শান্তি
একটু বসি
এর আগে কতবার জঙ্গলে গিয়েছে এক অশান্ত উন্মাদ
রাক্ষসের মতো তার ক্ষুধা ও জয়ের নেশা
কবিদের মতো তার হিংস্র, সঘন আত্মরতি
সে কি শুয়ে আছে ঐ মরা নদীটার খাতে
ঘাসের চাবড়ার নীচে

যার ইচ্ছে যেখানে যেদিকে খুশি যাক
কখনো বুঝিনি আগে একা একা আলিঙ্গন
এমন মধুর
দাও, যা কিছু না-পাওয়া ছিল, সব দাও
ঘাসের সবুজ আর ভ্রমরের কালো, দোয়েল ও বুলবুলির
পাগলাটে সঙ্গীত
কিছু কি নেবার আছে, নাও
অনাগত শতাব্দীর হে বালিকা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছো
তোমার চিঠির আজও লিখিনি উত্তর, ক্ষমা করো
অন্য কেউ দেবে, অন্য কোনো উন্মাদ, রাক্ষস,
কিংবা কবি।

নীরা, তুমি কালের মন্দিরে

চাঁদের নীলাভ রং, ওইখানে লেগে আছে নীরার বিষাদ
ও এমন কিছু নয়, ফুঁ দিলেই চাঁদ উড়ে যাবে
যে রকম সমুদ্রের মৌসুমিতা, যে রকম
প্রবাসের চিঠি

অরণ্যের এক প্রান্তে হাত রেখে নীরা কাকে বিদায় জানালো
আঁচলে বৃষ্টির শব্দ, ভুরুর বিভঙ্গে লতা পাতা
ও যে বহুদূর,
পীত অন্ধকারে ডোবে হরিৎ প্রান্তর
ওখানে কী করে যাবো, কী করে নীরাকে
খুঁজে পাবো?

অক্ষরবৃত্তের মধ্যে তুমি থাকো, তোমাকে মানায়
মন্দাক্রান্তা, মুক্ত ছন্দ, এমনকি চাও শ্বাসাঘাত
দিতে পারি, অনেক সহজ
কলমের যে-টুকু পরিধি তুমি তাও তুচ্ছ করে
যদি যাও, নীরা, তুমি কালের মন্দিরে
ঘণ্টাধ্বনি হয়ে খেলা করো, তুমি সহাস্য নদীর
জলের সবুজে মিশে থাকো, সে যে দূরত্বের চেয়ে বহুদুর
তোমার নাভির কাছে জাদুদণ্ড, এ কেমন খেলা
জাদুকরী, জাদুকরী, এখন আমাকে নিয়ে কোন রঙ্গ
নিয়ে এলি চোখ-বাঁধা গোলোক ধাঁধায়!

এই সব দেখে শুনে

একটা প্রচণ্ড পরিব্যাপ্ততা হাঁ করে আছে, আমি খুঁজছি
একটা পালাবার সুড়ঙ্গ
কাছাকাছি রয়েছে দু'একটা চেনা বাড়ি, সব জানলা বন্ধ,
দরজায় নেকড়ে
সংস্কৃতি কর্মীরা ঝাণ্ডা সেলাই করছে, তারাও ক্ষুধার্ত

যেমন ক্ষুধার্ত পলাশপুরের মাঠ, যেমন ক্ষুধার্ত দামোদরের গর্ভ
তুলোর বীজের মতন উড়ছে মানুষ, এদেশে ওদেশে
বারুদ দিয়ে দাঁত মাজছে
শান্তিচুক্তির তুলসী মঞ্চে পেচ্ছাপ করে যাচ্ছে
বড় সাহেবদের কুকুর
যে মায়ের বুকে স্তন্য নেই, শিশুটি খাচ্ছে তার রক্ত
শিল্পী বাহবা কুড়োচ্ছেন সেই ছবি এঁকে
ছেলে-ধরা বড় বড় সাঁড়াশি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন
ইনি আর উনি
বিপুল হাততালি. শোনা যাচ্ছে সুতো কল, চট কল
চা-বাগান আর মন্দির মসজিদ থেকে
আমি কেউ না, একজন সামান্য মানুষ, এইসব দেখে শুনে
মুখ বেঁকিয়ে, থুঃ করে চলে যাচ্ছি,
পাতাল গর্ভে
পেছনে কি কোনো ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল?

এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে

একজন মানুষ খোলা আকাশের নীচে
মঞ্চে ওঠার আগে
সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে
বললো,
জিততে হবে, জয়টাই বড় কথা,
আর কিছুই কিছু না
তারপর বিজয়ীর ভূমিকায় অভিনেতার মতন
কাঁধের কার্নিস উঁচু করে
হাতে অদৃশ্য অস্ত্র, চোখে সেই অস্ত্রের রশ্মি
উঠতে লাগলো ওপরে
যদিও তলপেটে ক্ষণিকের জন্য একটা প্রজাপতি
হাঁটুতে দু'এক টুকরো ভয়, ওষ্ঠে অভ্যেসমতন অহংকার
জন-উপসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে
আবার বিড়বিড় করলো সেই বীজ মন্ত্র

জয়ী হতে হবে
আর কিছুই কিছু না
তারপর দুকূলপ্লাবী অবিশ্বাস ও দখিনা বাতাসের মতন আশ্বাস
নিয়ে
কালো কালো অসংখ্য মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে
সে উঁচিয়ে ধরলো তার তৃতীয় পা
কিছুটা দূরে একটি শিশু পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে
হিসি করছে
কেউ দেখছে না তাকে
কেউ জানে না, তাকে কক্ষনো জয় করা যাবে না
সে অপরাজেয়

একটা আয়নার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ
কিন্তু যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার নয়
চুড়ো চুল বাঁধা ও ধারালো অলংকার পরা
রমণীটি আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো
এ কী? এ কে?
ওটা একটা পাঁজির বিজ্ঞাপনের জাদু দর্পণ
কাঞ্জিভরম শাড়ি পরা যুবতীটি দেখলো এক
পাগলিনীকে
বাথরুমে অন্য কারণে গিয়ে একজন হু হু করে কাঁদলো
যে কখনো ভালোবাসে নি, সে কাতর হলো
ভালোবাসায়
একজন যোদ্ধা দেখতে পেল ভূমি ভর্তি ইঁদুরের গর্ত
একজন মহিলা বিচারক সহসা বন্দি হলো
গুপ্ত কক্ষের বিছানায়
কঠিন গারদে
এমনকি দু'একটি চন্দ্র তারকা হয়ে গেল
আধখানা নোখের যোগ্য
কোনো ষড়ৈশ্বর্যশালিনীর শিকলের ঝন ঝন শব্দ থেকে
ঝরে পড়লো
মর্চে পড়া অশ্রু
একটি স্তনবৃন্তের কম্পন যেন তার
আলাদা ইচ্ছে-অনিচ্ছের জীবন
যদিও মায়া আয়নায় এসব কিছুই নেই, সবই অলীক
শুধু রাত্রি-জাগা দুঃস্বপ্ন

সেই রাত্রির জানলার ওপাশে যে রাস্তা
তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে
একটি ন্যাংটো বাচ্চা
সে-ই চোখ টানছে!

আসলে, পরেশের দাড়ি-না-কামানো থুতনিতে
ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে
একটা ঠোক্করই যথেষ্ট
তবে, গোরস্তানের পাশের থানায় গিয়ে
'আগে জিজ্ঞেস করতে হবে
পায়ের নোখ ও ধুলো বিষয়ক খবরাখবর
পরেশ হঠাৎ ইসমাইল হয়ে যায় নি তো,
ছোটে মিঞা কিংবা ছোটে লাল
কি ইদানীং
বড়ে মিঞা কিংবা বড়ে লাল
পরেশের নাম হাবুল হওয়াও অস্বাভাবিক নয়
যার বুড়ো আঙুল অন্যের থুতনি ভোঁতা করার মতন
কিছু গুরুত্বর দায়িত্ব নিয়েছে
তার নামও শুধু বুড়ো হলে
আপত্তির কিছু নেই
রেল লাইনের পাশে একটা আলাদা জগৎ
যেখানে হাবুল খুঁজছে পরেশকে, কখনো
হাবুল শুয়ে থাকছে পিঠ উল্টে
কখনো পরেশ ঢুকে যাচ্ছে
শুকিয়ে যাওয়া খালের খুব নিচু গর্তে
আর ইসমাইলের হাঁ-করা মুখের মধ্যে বুলেট
শিশির মাখা ঘাসের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে
এগিয়ে যাচ্ছে একটি বহুরূপী
গিরগিটি

সে জানে, আবার পরেশ আসবে, আবার
হাবুল-ইসমাইল বুড়োদের খেলা
শুরু হবে একটু পরেই
ওদের কেউ সুতো ধরে টানছে, কত রঙের সুতো
মধ্য রাত্রির নিশুতি মাঠে ঐ সব খেলার মধ্যে হঠাৎ
থেমে গেল ট্রেন

ইঞ্জিনের জোরালো আলোয় ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতন
ফুটে উঠলো
ন্যাড়া মাথা একটি নেংটি বাচ্চা
তার ঠোঁটে পুঁচকে পুঁচকে হাসি...

মৌমাছিরা মধু জমায় মানুষের জন্য
হাঁস-মুর্গীরা ডিম পাড়ে মানুষের জন্য
স্বয়ং ব্রহ্মাও পাঁঠা-গরু-ছাগলদের কোনো
সান্ত্বনা দিতে পারেন নি
পুকুরে শালুক ফুটছে মানুষের জন্য
পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসছে নদী মানুষের জন্য
ধুলোর মধ্যে খসে পড়া বীজ একদিন মহীরুহ হচ্ছে
মানুষের জন্য
মরুভূমি কাছে এগিয়ে আসছে মানুষের জন্য
বিন্নি ঘাস ও তলতা বাঁশ বুক পেতে দিচ্ছে
মানুষের জন্য
ধরিত্রী স্বেচ্ছায় ফালা ফালা হচ্ছেন মানুষের জন্য
তবু একটি তীক্ষ্ণ স্বর, সব কিছু ঢেকে দেয়
একটি শিশুর কান্না
একটি কালো রঙের ব্রজের দুলাল যেন
তার ফোলা পেট থেকে ঠিকরে আসছে নাভি
পা দুটি ধনুকের জ্যা-এর মতন
বাঁকা
তার বুকে এক আকাশ জোড়া তৃষ্ণা
এক বসুন্ধরা জোড়া খিদে
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাউই...

যারা ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান গড়েছিল
যারা সমুদ্রের বুকে নির্মাণ করেছিল সন্ত মিশেলের টিলা
যারা শূন্যের পটভূমিকায় সাজিয়েছে তাজমহল
যারা সোনালি সেতু দিয়ে ছুঁয়েছিল দূরতর দ্বীপ
যারা হারমিটেজ সংগ্রহশালায় জাজ্বল্যমান করেছে
মানুষের
হৃদয় ও মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি
যারা বাষ্পকে করেছে ভৃত্য, বিদ্যুতকে আলাদীনের প্রদীপের
দৈত্য

যারা চাঁদের বুকে পা দিয়ে টেলিফোনে বার্তা পাঠিয়েছিল
পৃথিবীকে
যারা ভাঙতে চেয়েছিল দেশ-সীমার দেয়াল
তারা নিজের সন্তানদের আদর করতে করতে কোন ছবি দেখেছিল
আগামী কালের
গ্যালিলিও কি মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে ভেবেছিলেন
তাঁর উত্তর পুরুষেরা
রাজনীতির পাশা খেলোয়াড়দের ক্রীতদাস হবে
লুই পাস্তুর কি জানতেন পাগলা কুকুরে কামড়ানো
যে কিশোরটিকে তিনি বাঁচালেন
তাঁর জীবন-মরণ বাজি ধরা চেষ্টায়
সে অকারণে এক মুহূর্তে মরে যাবে একটি সৈনিকের
গুলির ফুৎকারে
সহস্র সূর্যের দীপ্তিতেও কি ওপেনহাইমার
দেখতে পান নি
সেই টলটলে পায়ে
হেঁটে যাওয়া শিশুটিকে...
সমস্ত আগুন নিভে যাওয়ার পর আকাশ ছেয়ে আছে
ছাই রঙের অন্ধকারে
যেখানে প্রাসাদমালা ছিল সেখানে
একটি বিরাট দগদগে ঘা
যেখানে নদী ছিল সেখানে নদী নেই
যেখানে পাহাড় ছিল সেখানে নেই এক টুকরো পাথর
যেখানে ভালোবাসা ছিল, সেখানে দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায় না
যায়া জয় চেয়েছিল, তাদের কঙ্কালও মাটি পায় নি
যারা রূপ চেয়েছিল, যারা স্বপ্নে সৌধ গড়েছিল
যারা লড়েছিল মানুষে মানুষে সাম্যের জন্য,
যারা আরাধনা করেছিল অমরত্বের
যারা প্রতিদিন জল দিয়ে, স্নেহ-মমতায় বানিয়েছিল
ছোট ছোট সাংসারিক উদ্যান
তারা আজ কেউ নেই
পরাক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বীরা একই সঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে
চরাচর জুড়ে এক নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু
সমস্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গরল মন্থন করে
সে ঠিক উঠে এসেছে আবার

এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে সে হাঁটছে
আস্তে আস্তে পা ফেলে
তার শীত করছে
শুধু তার জন্যই আবার জাগতে হবে সূর্যকে।

শুধু যে হারিয়ে গেছে

নদীটিকে বুকে তুলে নাও
ডানা ভাঙা হলুদ কপোতী হয়ে উল্টে পড়ে আছে গিরিখাদে
ও একটু আদর চায়, বুকের গরম চায়, দাও!
লাবণ্য কণিকা চেয়ে কাঙাল হয়েছে এক রাজ-রাজেশ্বর
তাকে কিছু দেবে, ভেবে দ্যাখো!
অরণ্য পেয়েছে ওম, পথের সংসার সব তোমারি প্রশ্রয়
এই যে সন্ধ্যার অশ্রু, যার মন রোদে ভরা সেকি কিছু বোঝে?

মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়
স্তব্ধতার চেয়ে আরও অনেক নিঃশব্দ, হিম, চুপ
কে যেন পুকুর ঘাটে দুপুরের অবেলায় বলেছিল, যাও
তাই শুনে চলে গেল ইস্কুল-বাতাস, গেল খুশিময় ছবি
লোহা ভাঙা শব্দ এসে ভরে দিল অর্ধেক জীবন!
তবু, মাটির মূর্তির মতো, যারা যায় সব ঘুরে ফিরে আসে
বাগানের ফুল হয়ে ওঠে ফুটে ওঠে গুপ্ত অভিমান
উষ্ণ চাদরের মধ্যে লুকিয়ে আরাম করে কৈশোরের স্মৃতি
ওষধি ঘাসেরা সব জানে।

দাও, যাকে যা দেবার সব দাও
শীতের বৃক্ষকে দাও সবুজাভা, জলে-জলাঙ্গনে হাতছানি
মেঘ-মৃত্তিকায় দাও ছন্দ, আগুনকে অগ্নিতর করো
কোমরের খাঁজ থেকে বিচ্ছুরিত আলো দেবে নিশুতি রাত্রিকে
তাও জানি, সমুদ্রও কিছু কি পাবে না?
শুধু যে হারিয়ে গেছে, হীরে নয়, দ্যুতি
তারই জন্য এত কাণ্ড, ছন্দ-ছেঁড়া এসব কবিতা!

ঘোরায় কেন একটি বিন্দু

ভেবেছিলাম অভ্র-আড়াল, ফঙ্গবেনে; যখন তখন
যেমন খুশি যাওয়া
চোখে আমার কিসের আঠা, হাতে আমার
কিসের দড়ি, মা
পাতাল ঘেরা বুকে এমন কাতর ঢেউ কখনো কেউ
শুনতে পেলে না
ঝড় উঠেছে, ঝড়ের নাভি খুঁজতে খুঁজতে শ্মশানঘাটে
, দগ্ধরেণু পাওয়া!

বৃষ্টি যেন মায়ের মা, সে সব কোন্ আদ্যিকালের
ছেলেবেলার কথা
সত্যি আমি জন্মেছি কি, জন্মটা কোন্ উন-কপালী
পাহাড়ী ঢল, আহা রে
যে-যার নিজের প্রেমে পাগল, আয়না ভেঙে টুকরো টুকরো
ফুটেছে ফুল বাহারে
তবু আমায় ঘোরায় কেন একটি বিন্দু, গভীরে যার
সিন্ধু নীরবতা!

আমায় ডাকছে

রজতশুভ্র রোদ্দুরের মধ্যে ঐ পান্না রঙের গাছটি
আঃ টেলিফোনের শাকচুন্নী ঝনঝন শব্দ, আজ নয়, আজ নয়, সোমবার
ইলেকট্রিকের বিল তারিখ পেরিয়ে গেল, রেলিং-এ শুকোচ্ছে
কালো শায়া
দোতলা বাসের সঙ্গে একটি গণ্ডারের সংঘর্ষ, আকাশে দুধ পোড়া গন্ধ
রজতশুভ্র রোদ্দুরের মধ্যে...
মাথা ভর্তি বারুদ নিয়ে কে উঠে আসছে দোতলায়, বলে দাও, আমি
বাড়ি নেই
ব্যাঙ্কের পাশবই হারাবার মতো পাপ, টেলিগ্রামে ভ্রূকুটি পাঠাচ্ছে সুহৃদেরা
ধর্মঘটী স্কুল কিশোরদের দৌড়, খবরের কাগজে নেড়ি কুত্তার আর্তনাদ
ঐ পান্নায় রঙের গাছটি...

তিন পাতা মিথ্যে কথার পর দু' ফোঁটা চোখের জল, ঘড়ির দিকে
ঘন ঘন চোখ
কে যেন খবর দিল বাজারে আগুন লেগেছে, জানলা দিয়ে ছুটে এলো
নির্বাচনী ইস্তাহার
আবার টেলিফোন, বঞ্চনার ঝঞ্ঝনা, আজ নয়, আজ নয়, সোমবার
রজতশুভ্র রোদ্দুরের মধ্যে
ঐ পান্না রঙের গাছটি
ঐ পান্না রঙের গাছটি
আমায় ডাকছে!

ব্রিজের ওপর থেকে নদী

ব্রিজের ওপর থেকে নদী দেখা, আকাশ ঝুঁকেছে খুব কাছে
মানুষবহুল এই পৃথিবীতে কোন কোন সন্ধেবেলা
মানুষ থাকে না
একজন কেউ থাকে, বাতাসে একলা চুপ, সে কারুর নয়,
প্রেম রিরংসার নয়, ক্ষুধা বা জয়ের নয়; ব্যর্থতারও নয়,
জলের তরঙ্গে চাঁদ, অন্তরীক্ষ ছেয়ে আছে গহন মানস,
দু'দিকের পথ যেন আবার জন্মান্তে ফিরে সবুজ হয়েছে
সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙে শুরু হলো অদ্ভুত পাগলাটে ঐকতান
এবারে তোমাকে দেখি, খুলে দাও বুক, দেখি
তোমাকে, তোমাকে!

নীরা, গৌতম বুদ্ধ

পাঞ্জাবে রোজ খুন-খারাপি হচ্ছে দশটা-পাঁচিশটা
অথচ আমি এই মধ্যরাত্রিতে নীরার জন্য একটা
স্তোত্র লিখতে চাই
কৃপাণ ও বন্দুকের নল ফুঁড়ে ওঠে নীরার মুখের চারপাশে
যারা মরে ও যারা মারে দু'রকম দীর্ঘশ্বাস ঝলসে দেয় বাতাস

ডটপেন শুকিয়ে যায়, আমি অন্য কলমের খোঁজে তাকাই
এদিক ওদিক
ঠিক তখনই একটা নীল বিদ্যুতের শিখা আকাশের এক প্রান্ত
থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেলে
এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে ওঠে গৌতম বুদ্ধের দুটি চোখ
তারপরই এক ঝাঁক বিমান সুগম্ভীর শব্দ করলে বুঝতে পারি
সশস্ত্র বিমান যাচ্ছে
প্রত্যেক সীমান্ত প্রদেশে
আমি কলম খুঁজে পাই না, দেশলাই খুঁজে পাই না, অবলুপ্ত
চাঁদের মধ্যে হারিয়ে যায় নীরার মুখ
অন্ধকার-ব্যবসায়ীরা জেগে ওঠে, নগর ডুবতে থাকে পাতালে
বালিশে মাথা দিয়ে, জীর্ণ সভ্যতার কম্পিত মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে
আমি গৌতম বুদ্ধকে একবার, মাত্র একবার
নীরার মুখ চুম্বনের অধিকার দিই
অন্তত ওরা দু'জন কয়েক মুহূর্তের জন্য আনন্দের পতাকা
তুলে ধরুক
এই ভেবে আমি পাশ-বালিশের মতন জড়িয়ে ধরি ঘুম।

পিঁপড়ের এপিটাফ

ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে একটা খুদে লাল পিঁপড়ে
সে মাথা বেয়ে নেমে আসে নি, সে পায়ের তলা থেকেও
উঠে আসে নি
সে বাতাসে ছিল, কিংবা নিশ্চিত অন্তরীক্ষে
সমস্ত শরীরে পিঁপড়ে-দংশনযোগ্য কয়েক লক্ষ বিন্দু
তবু কেন সে কামড়ে ধরলো ওষ্ঠটাই
কিংবা সে কেন আমারই মুখে ঢেলে দিতে চাইছে ক্রোধ
বেশ জ্বালা আছে, তাকে হেলাফেলা করা যায় না
এরকম অবস্থায় তাকে আঙুলে তুলে টিপে গুঁড়ো করে ফেলাই তো
স্বাভাবিক, অন্যমনস্ক ভাবে...
সে চলে গেলেও আগুনের একটা ফুল্‌কি থেকে যায়
একজন আততায়ীর কথা মনে পড়ে, যার ছদ্মবেশ চেনা যায় না
দু' একটা ছেঁড়া চটির মতন অপমান, পরে জিভ-কাটার মতন
ভুল

পানাপুকুরের জলে মেঘলা সূর্যের রশ্মি পড়া রঙের মতন বিস্মৃত
আফশোষ...
একটি পিঁপড়ে যে এক মিনিট আগেও ছিল না, এখনও নেই
যে আকাশ থেকে খসে পড়েছিল, আবার মিলিয়ে গেছে
পঞ্চভূতের ভগ্নাংশে
মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে সে তার অবয়বের কোটি গুণ মনোযোগ
কেড়ে নিয়ে গেল
একই জায়গায় বসে থাকা আমি সেইটুকু সময়ে অন্য মানুষ,
তুলে নিই কলম
মানুষের ঠোঁট কামড়ে ধরা প্রায় অদৃশ্য একটি পিঁপড়ের ছবি
কোনো শিল্পী কোনোদিন আঁকবেন না
তাই লিখে রাখা হলো এই কয়েকটি লাইন...

মাত্র এই এক জীবনে

অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
নদীর এক ধারে শুধু সারিবদ্ধ গাছ রুদ্ধবাক্
আমাদের দিনগুলি জলের ভেতরে জল
তারও নীচে জল
রোদ্দুরের পাশাপাশি ছায়ার নির্মাণ তারা ক্রমশই গাঢ়
অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
যে-কথা তোমার নয়, যে-কথা আমার নয়
সকলেই সেই কথা বলে
কেউ চলে যায় দূরে একা মুখ লুকোবার ছলে
পিঁপড়ের সংসার ভেঙে যায়
পড়ে থাকে ঝুরো ঝুরো মাটি
ভালোবাসা ছিল, যেন বাঁধের কিনারে একা গাছ
দিন চলে যায় রাতে, রাত্রিগুলি শুধুই অদৃশ্য
নীরব মুহূর্তে গাঁথা মালাখানি আমাকেও রেখে যেতে হবে
অনেক গোপন কথা...
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা।

মানুষ রইলে না

এক মনোহরণ সকালবেলায় তোমরা বাগানে বসেছো
ছোট-হাজ্‌রির টেবিলে
আত্মপ্রত্যয়ী পিতা, মমতাময়ী মা, মাথায় সোনালি চুল
তিনটি দুষ্টুমি-সারল্য মাখা কিশোর-কিশোরী
অপরূপ রোদ, স্বর্গের সৌরভমাখা নরম বাতাস
খিদমদ্‌গার এনে দিচ্ছে গরম গরম টোস্ট, সসেজ, ডিম সেদ্ধ
পোরসিলিনের পাত্র থেকে উপচে আসছে চায়ের ধোঁয়ার মাদক গন্ধ
মা মাখিয়ে দিচ্ছেন মাখন, বাচ্চারা কাড়াকাড়ি করছে কাগজের
খেলার পাতাটি নিয়ে
তৃপ্ত পিতা দেখছেন তাঁর সাজানো সংসার, সার্থকতা
সাদা রঙের বাড়ি, অলিন্দে অর্কিড, সবুজ লন্‌, গেটের বাইরে
ধোয়া-মোছা চলছে দুটো গাড়ির
তারপর তিনি দেখলেন পেয়ালা-পিরিচে ছিট ছিট রক্ত
টোস্ট, সসেজ, ডিমসেদ্ধ, দুধ, কর্নফ্লেক্স, মার্মালেডে রক্ত
মানুষের রক্ত
একজন কবিকে এইমাত্র ফাঁসি দেওয়া হলো, তার রক্ত
যারা রুটি বানায়, যারা গরু-মোষ নিয়ে মাঠে যায়, আবার
যখন-তখন গুলি খেয়ে মরে, তাদের রক্ত
তোমাকে, তোমার সুখী পরিবারকে পান করতে হবে এই রক্ত
তারপর আর তোমরা মানুষ রইলে না
তোমরা নরখাদক হয়ে গেলে!

দিগন্ত কি কিছু কাছে

আজ বহু দূর এসে কংক্রিট ছাদের নীচে
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি,
বসে আছে নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা,
দুপুরের বর্ণদ্যুতি, বাতাস দ্বিখণ্ড করে
ডেকে ওঠে চিল,

একটু একটু মন খারাপ, কবিতার খাতা
মুড়ে উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ
আকাশ অচেনা লাগে, দিগন্ত কি কিছু
কাছে এগিয়ে এসেছে?

শান্তি, শান্তি

সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী মেয়েটির প্রস্ফুটিত পবিত্র মুখখানি দেখে
আমি কল্পনা করি ওর তেইশ বছরের প্রজ্বলন্ত যৌবন
তখন আমি হয়তো থাকবো না
আমি তখন ধুলো হয়ে বাতাসে উড়বো কিংবা
কবরস্থানে কেঁচোর খাদ্য হবো
কিংবা দু-একটা দীর্ঘশ্বাসের টুকরো টুকরো স্মৃতি
তবু শতাব্দী পেরুনো উধাও প্রান্তরের পরিব্যাপ্ততায়
একটি বিন্দু ক্রমশঃ রং ও আয়তন পায়
ঝংকৃত পা ফেলে ফেলে
জলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মাধুর্যের ছবি
কী গর্বমাখা তার চিবুক। ওষ্ঠে স্বর্গ দেখা হাসি
হাতছানি দিয়ে সে ডাকে কোলাহলময় পাখির মতন শিশুদের
আমি সেই চিবুক, সেই ওষ্ঠে আমার সুদীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিচ্ছি।

দেরি করা যাবে না

অপরূপের নিভৃত নির্মাণের পাশে অলীকের সেই ধাতুময় নিসর্গ খনি
এ বাড়ির সুষমা ধার করে আনে ওদিককার দু'চারটি অভ্রফুল
মাঝে মাঝে বাতাস ওদের ছুটির পরিপূর্ণতার দিকে ডাক দেয়
তখন তুলসী পাতার সৌরভের চেয়েও মৃদু কোনো নিঃসঙ্গতা
আমাকে চোখ মেরে বলে, যাবে নাকি?

এইসব অপরের সৃষ্টি ও অপরের লাবণ্যের মধ্যে খালি পায়ে ঘুরতে ঘুরতে
মনে হয় আমি আর নিজস্ব নয়, আমি মোহ-পরিবারের ছোট ছেলে
যেন ভিজে ঘাসের ওপর পাতলা পর্দার মতন বিছিয়ে আছে যুদ্ধপূর্ব বাল্য
তখনও ভাঙার জন্য গড়া হয়নি কোনো নগরী, নদীগুলিকে কেউ বাঁধেনি
বেশি দেরি করা যাবে না, ওদিকে কেউ কাঁদছে।

দেরি

বিকেলের গা চুঁইয়ে গড়িয়ে পড়ছে
মনোহরণ
এবারে শেষ স্নান সেরে নিতে হবে
আকাশে মখমলের পর্দা, এই বুঝি সরে যাবে একটুখানি
উদ্ভাসিত হবে কোন্ অসম্ভবের স্থিরচিত্র
জানি না
তার আগে তৈরি হয়ে নিতে হবে, যেন
দেরি না হয়ে যায়!

জলের মধ্যে মিশে আছে

তারপর একজন উঠে গেল ট্রেন ধরতে, ঠোঁটে তৃণমূল নিয়ে
একজন বসে রইল নদীর ধারে
আর একজন চঞ্চল চাহনিতে চিঠি লিখছে পোস্টাফিসের কাউন্টারে
দাঁড়িয়ে
এই সময় ট্রাম লাইনে ঝলসাচ্ছে কপিশ রোদ, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
মিলিয়ে গেল তৃতীয় ভুবনের একটি তারা
টেলিপ্রিন্টার ও বিমান গর্জনের মধ্যে অজাত শিশুর কান্না
শাঁখ বাজছে স্মৃতির মধ্যে বিলীন তুলসী মঞ্চে, কৈশোরের
জেদের মতন উড়ছে বাতাস
এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে

এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে
এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে
ওরা কোন্ অলক্ষ্যপুরীতে ওদের চোখের ধুলোয় জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে
সেই জলের মধ্যে মিশে আছে রক্তাক্ত স্বদেশ...

আমি আসছি, আসছি

বাড়ি ফেরার পথে এখন আর বাড়ি হারিয়ে যায় না
আলো জেগে থাকে, হিমপতন জেগে থাকে, এমন কি মৃত্যুও
রাত্রির দেশ খল খল শব্দে হাসে, আকাশ থেকে নেমে আসে উৎসব
আমার সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে না, সেইসব কালো রঙের দিন
সেই খয়েরি রোদ্দুর, বুক পকেট টেনে ছিঁড়ে ফেলা অভিমান
আমার শরীরের গরম মনে পড়ে, পায়রার বুকের মতন কোমলতার কথা
মনে পড়ে
সেই যারা তীক্ষ্মস্বরে ডেকেছিল, নদীর ধারে যারা ভাঙনের খেলা খেলতে
এসেছিল
সবাই যে-যার জায়গায় ফিরে আসছে, এখন খুব ভালবাসাবাসি
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে একটু, ঐ যে কে দাঁড়িয়ে আছে দূরে,
তুলে ধরলো মশাল, আঃ কী আনন্দ, আমি আসছি, আমি আসছি...

সরল গাছের ছায়া

এ ঘরের ভুল ও ঘরে লুকিয়ে রাখি
বিকেলের আলো আধো হাসি দিয়ে ডাকে
চিঠি জমে যায় পল্‌কা বছর পেরিয়ে
কপালের ভাঁজে জমে আছে বহু কাজ।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে পতনের মূর্ছনা
পাতাল জেনেছে আসন্ন উৎসব
বড় পিছু টান কুসুম হাতের মায়া
রূপের কাঙাল জন্মান্ধের যমজ।

কথা ছিল যেন এ জীবনে কিছু চেনা
আকাশ ভাঙলো নীলিমার নৈরাজ্য
একটি দেখার বিপরীতে এত ভ্রান্তি
জলের ওপর সরল গাছের ছায়া।

তার আগে, তার আগে

আমার ডান হাতের আঙুলে এক টুকরো
নীল সুতো
এর থেকেই তৈরি হবে স্বর্গের জয়-পতাকা
অবশ্য দেরি আছে।
তার আগে দোয়েল পাখির শিস তুলে নিতে হবে ঠোঁটে
তার আগে
এক একটি উন্মোচনের জন্য অপেক্ষা
তার আগে
বারুদের ঘরবাড়ির মধ্যে ভালোবাসা
তার আগে, তার আগে, তার আগে...

দ্বিধা

পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না
পাথরের ভাঁজ ভেঙে উঠে আসে ঘুম
পাখার বাতাস, ঝিল্লিরব
জানালার পাশেই ডাকে একাকী সমুদ্র, তার শান্ত দুটি ডানা
পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না।

সমস্ত বাগান ভরা যৌন গন্ধ, ভাট ফুল
ওরা কিন্তু বাগানের নয়
মিটিং-এ সংবাদ পত্রে রটে গেছে মানস কানন
সেখানে মালির হাতে নির্বাচিত ফুলের কেয়ারি

বাল্যস্মৃতি চিরে যায় টিয়া পাখিটির তেজী ডাক
সুন্দরের পাশে পাশে ঘোরে এক বোবা কালা প্রেত
পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না।

ভালোবাসতে চাই

প্রয়োজনের মধ্যে বারুদ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে
আমি এক এক সময় অপ্রয়োজনকে বেশি ভালোবাসি
যেমন জ্বলন্ত হাতের পাঞ্জায় ফুলকে নরম আদর
যেমন নদীর মৃত্যু দৃশ্য দেখে সতরঞ্চি বিছিয়ে
তাস খেলা
যেমন নারীকে
কখনো কখনো সম্পূর্ণ নারীকেও নয়
কোমরের আয়না-ভাঙা চাঁদ, জলতরঙ্গের মতন দ্বিরাগমন
তীব্র মধ্যমে এক টুকরো হাসি
অপরের নারী, শুধু তার মাধুর্যের দিকে অলীক
হাত বাড়িয়ে দেওয়া
যেন অন্য দেশে পর্যটনের ক্ষণিক প্রকৃতি-সুখ
হ্যাঁ, মনে পড়লো, অন্য দেশে গিয়ে আমি অবান্তরভাবে
স্বদেশ প্রেমিক হয়ে উঠি
গাড়লের মতন, অন্ধের মতন, আধো-চেনা মাতৃভূমির বন্দনা
আবার যখন একা, যখন পা-জামার দড়ি
অনায়াসে গিঁট খুলে রাখা যায়
নিজের নিভৃতির মুখোমুখি কোনো অলৌকিক হাতছানি
তখন আমি আচমকা বিশ্ব-প্রেমিক
যদিও এই তথাকথিত বিশ্ব আমাকে গ্রাহ্য করে না কানাকড়িও
একটা বোতামের ওঠা-নামা, তার ওপর টলমল করছে
পিঁপড়ে, পাখি ও পুতুলের সংসারের
ধ্বংস-স্থিতাবস্থার সন্ধিক্ষণ
তবু যেন সিন্ধবাদের বুড়োর মতন গোটা মানব সভ্যতা
চেপে থাকে আমার ঘাড়ে
আমার ঘাড় ব্যথায় টন্‌টন করে

হ্যাংলার মতন, পা-চাটা কুকুরের মতন আমি এই
হৃদয়হীন সভ্যতাকে
ভালোবাসতে চাই!

কতদূরে

মানুষের পাশাপাশি পাখি ও পিঁপড়ের
শুরু হলো ভোরের সংসার
দিনের আলোর নীচে চাপা দীর্ঘশ্বাস
পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে যার মাথাব্যথা নেই
সেও জানে প্রেম কত কম,
বাতাসেরও ভাগাভাগি হয়ে আছে তাই
স্নেহ এত দ্রুত মরে যায়
জিরাফ ও প্রজাপতি একই খেলা খেলে
তবু তারা মানুষের চেয়ে কত দূরে!

মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...

প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে করতে দু' হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া
ভাঙতেই
ঠেঙো ধুতি ও ফতুয়া পরা, ছাতা-বগলে একজন শালিক শালিক চেহারার
লোক
থমকে জিজ্ঞেস করলো,
কে গো, আমাদের ফটিক লয়?
বাজপাখির মতন এক সুবিশাল হাস্য দিয়ে তাকে চুপসে দিলুম
সে পালাবার পথ পায় না, তো তো করে নেমে গেল রেললাইনে
প্রচণ্ড রোদে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো তার গা থেকে, সে কর্পূর হয়ে গেল
দিগন্তে...

একটু বাদে ট্রেন ছাড়বার পরেই এক সবুজ ঢেউয়ের মতন বিস্মরণ
ঝাপটা মারে আমার কপালে

জানলার পাশে দুটো উড়ন্ত ফিঙে চোখ মেরে বলে যায়, দুয়ো, দুয়ো
আমিই কি তবে ফটিক, কিংবা তার যমজ, এতক্ষণে আলপথ ধরে
ঠেঙো ধুতি ও ময়লা ফতুয়া, ছাতা-বগলে শালিক লোকটার পাশাপাশি
হেঁটে যেতে যেতে
কোথায়...কোন্ গ্রামে...ফটিক কি এতদিন নিরুদ্দেশ ছিল
পালিয়ে ছিল দারোগা-মহাজনের গুঁতোয়, সুফল আনতে গিয়েছিল শহরে
সে ফিরেছে বলে শাঁখ বাজবে, চোখের জল দিয়ে ধোয়ানো হবে তার
পা
একটি অকাল-বৈধব্য মাখা স্ত্রীলোক ছাই ছাই চোখ মেলে বলবে,
হেথায় তো তোমায় কেউ জোর করে ধরে আনেনিকো
কেন এলে?
আঁশবঁটির মতন ধারালো তার উদাসীনতা, টিয়া পাখির মতন তীক্ষ্ণ
ট্যাঁ ট্যাঁ করছে দু'একটি বাচ্ছা...

অকাল বৃষ্টিতে পচে গেছে ধানের গোছ, পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে কাদা
কালভার্টের পাশে তাড়া তাড়া নির্বাচনী ইস্তাহার সেঁতিয়ে পড়ে আছে
বাঁধ ভাঙা নোনা জলে ঘুরপাক খাচ্ছে ফটিকের ছেঁড়া চটি
এই অনন্তের টুকরো দৃশ্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব
একটি নবীন তৃণের ডগা মাথা তুলে বললো, ফিরিয়ে দাও ফটিককে
তার নিজের জায়গায়
নইলে সব কিছু মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...

রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা

ট্রেন এলে চলে যাব, ততক্ষণ চেয়ে দেখি প্রজাপুঞ্জ সহ এই সম্রাট
আকাশ
ধোঁয়াটে মূর্তির মতো কয়েকটি মনুষ্য বিন্দু ঘুরছে ফিরছে প্লাটফর্মে, লাইনের
উপরে
আমার বন্ধুটি পাশে সিগারেট ঠোঁটে চেপে ছুটি-শেষ-করা এক ঘন দীর্ঘশ্বাস
ধোঁয়ায় মিশিয়ে ছুঁড়লো আমার চোখের দিকে, রামগড়ে, বাতাসের প্রতি
স্তরে স্তরে।

কলকাতায় ফিরে যাবে সহস্র সুতোয় বাঁধা কীর্তিমান সুদর্শন ছিম্-ছাম্ যুবক
ট্যাক্সিতে সময় মাপবে, অনেক সন্ধ্যাকে খুন করবে নানা রেস্তোরাঁয়,
এরোড্রোমে, ভিড়ে
শনিবার তাশ খেলবে, ঘরভরা অট্টহাসে টেনে নেবে বন্ধুদের চোখের চুম্বক
সুখের নানান সুর এঁকে রাখবে ওষ্ঠে, চোখে, দ্যুতিময় যৌবনের বুক
চিরে চিরে।

এখন সে অকস্মাৎ চেয়ে দেখল রামগড়ের যুবতী-প্রতিম এই সায়াহ্নের
দিকে
কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ আমাকে বলল, কেঁপে উঠে যেন এক অন্য
কণ্ঠস্বরে
'আশ্চর্য, আশ্চর্য, দেখ!' সবলে আমার হাত ধরে রেখে চেয়ে রইল, তীব্র
নির্নিমেষে
অশ্রুর বিন্দুর মতো শীতের করুণ রৌদ্র তখন বিরলে ঝরছে পর্বত শিখরে।

গ্রীসীয় মূর্তির মতো রূপবান, বস্তুনিষ্ঠ, আবেগ-অগ্রাহ্য-করা আমার বন্ধুকে
সেই একবার শুধু নিতান্ত সামান্য, ক্ষুদ্র, পটভূমিকার পাশে মূঢ়, অসহায়
ভঙ্গিতে দেখেছি আমি।—'সুনন্দ, ট্রেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছো?'
তৎক্ষণাৎ আমি তার বুকে
প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে বলে উঠে, লঘু হেসে, চৈতন্য এনেছি সেই মায়াবী
সন্ধ্যায়।

MESCALINE
মেস্কালীন ॥ অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ

গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গ, আমি আজ নগ্ন হয়ে আয়নার দিকে চেয়ে আছি
আমি দেখছি বুড়ো মাথা, আমার ক্রমশঃ টাক পড়ছে
রান্নাঘরের আলোতে পাতলা চুলের তলায় আমার তালু ঝলসাচ্ছে
যেন প্রাচীন স্মৃতি গুহায় কোনো সাধুর মতো—কোনো
প্রহরীর আলোয় আলোকিত
পিছনে ভ্রমণকারীদের জনতা
তা'হলে মৃত্যু আছে

আমার বেড়াল বাচ্চাটা ডাকছে এবং জামাকাপড়ের মধ্যে দেখছে
আজ রাত্রে বইটো ফোনগ্রাফে গান গাইবে—তার পুরোনো
পরীদের গান
আমার দেয়ালে অ্যান্টিনাসের আবক্ষ মূর্তির ধূসর ছবি এখন
নীচে তাকিয়ে আছে
ঈশ্বরের সুকুমার হাত থেকে আলো ভেঙে পড়ে, তিনি একটি কাঠের
পায়রা পাঠাচ্ছেন শান্ত কুমারীকে
বিয়েতো অ্যাঞ্জেলিকোর জগৎ
বেড়ালটা পাগলা হয়ে গেছে এবং মেঝের চারিদিকে ঘুরে গজরাচ্ছে

মৃত্যু যখন গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গের মাথায় ধাক্কা মারবে
তখন কি হয়
কোন জগতে আমি ঢুকবো
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু—বেড়ালটা শান্তি পেয়েছে
আমরা কি কখনো মুক্ত হবো—গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গ
তা'হলে এটা ধ্বংস হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি জানি
কাকে ধন্যবাদ
কাকে ধন্যবাদ
তোমাকে ধন্যবাদ, হে প্রভু, আমার দৃষ্টির অতীত
পথ নিশ্চয়ই কোন জায়গায় পৌঁছোবে
পথ
পথ
স্যাঁতসেঁতে পচা জাহাজের মধ্য দিয়ে। অ্যাঞ্জেলিকোর বিষয়ের মধ্য দিয়ে
চুপ, একটি শিশুর জন্ম দাও এবং চলে যাও
হয়তো এই একমাত্র উত্তর, ঠিক জানতে পারবে না যতক্ষণ একটা ছেলে
না হচ্ছে আমি জানি না
কখনো বাচ্চা ছিল না কখনো হবেও না যেভাবে আমি চলেছি

হ্যাঁ, আমার ভালো হওয়া উচিত, আমার বিয়ে করা উচিত
দেখা উচিত এ সবের মধ্যে কি আছে
কিন্তু আমার চার পাশের এসব মেয়েদের আমি সহ্য করতে পারি না
নাওমি'র গন্ধ
এঃ, আমি পরিচিত গ্যাঁজানো গীন্‌স্‌বার্গে মজে গেছি
এমন কি ছেলেদেরও আর সহ্য করতে পারি না
সহ্য করতে পারি না
সহ্য করতে পারি না

আর কেই বা পেছন মারাতে চায় সত্যি?
অসংখ্য সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে
সময়ের স্রোত
এবং কেই বা বিখ্যাত হতে চায় এবং অটোগ্রাফ সই করতে চায়
সিনেমা স্টারের মতো?

আমি জানতে চাই
আমি চাই আমি চাই হাস্যকর জানতে জানতে কি গেঁজানো
গীন্স্বার্গ
আমি জানতে চাই সম্পূর্ণ গেঁজে যাওয়ার পর কি হয়
আমার চুল ঝরে যাচ্ছে, আমার ভুঁড়ি হয়েছে, আমি যৌন-সম্পর্কে বিরক্ত
আমার পাছা পৃথিবীতে ঘসছে আমি জানি বড়বেশি
এবং যথেষ্ট নয়
আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কি হবে
আচ্ছা, আমি খুব শীগ্গিরিই জানতে পারবো
আমি কি সত্যিই এখনি জানতে চাই?
সত্যি কি তার দরকার আছে দরকার দরকার দরকার
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু
ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর আনন্দবাজারের অরণ্যদেব
টাইপরাইটারের তরঙ্গ।
টাইপ রাইটারের ওপর ঝুঁকে আমি স্বর্গের কি করতে পারি
আমি ডুবে গেছি, গ্রেগরি রেকর্ডটা বদলে দাও আঃ চমৎকার সে
ঠিক সেটাই বাজাচ্ছে
আমি এখন লক্ষ লক্ষ কান সম্বন্ধে বড় বেশি সজাগ
এখন উৎসুক কান, ব্যবসা বানাচ্ছে
খবরের কাগজে বড় বেশি ছবি
বিবর্ণ হলুদ সংবাদের ধামাধরা
আমি কবিতা থেকে সরে যাচ্ছি অন্ধকার চিন্তামগ্ন হবার জন্য

মনের আবর্জনা
পৃথিবীর আবর্জনা
মানুষ আদ্ধেক আবর্জনা
কবরে সবই আবর্জনা
প্যাটারসনে উইলিয়াম্স্ কি ভাবছে, মৃত্যু তাঁর উপর বড়
বেশি
এত আগে এত আগে

উইলিয়াম্‌স্‌ কার নাম মৃত্যু?
তুমি কি এখন প্রতি মুহূর্তে এই বিরাট প্রশ্ন বোধ করছো
অথবা সকালবেলা তুমি কি চা খেতে খেতে ভুলে যাও, নিজের মুখের
কুৎসিত ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে
তুমি কি পুনর্জন্মের জন্য প্রস্তুত
এই পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে
অথবা মুক্তি দিতে, মুক্তি দিতে
এবং সবই হোক—একটা গোটা জীবন দেখা—সব চিরকাল—চলে
যাবে
শূন্যতায়, একটা কায়দার প্রশ্ন চাঁদ উত্থাপন করেছে
উত্তরহীন পৃথিবীকে
মানুষের জন্য কোন মহত্ত্ব নেই! মানুষের জন্য কোন মহত্ত্ব নেই।
আমার জন্য কোন মহত্ত্ব নেই! আমি নেই!

আত্মা যখন নির্দেশ করে না তখন লেখার কোন মানে হয় না।

AT APOLLINAIRE'S GRAVE
আপলিনেয়ারের সমাধিতে ॥ অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ

আমি পের লাসেজে আপলিনেয়ারের সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম
সেদিনই বড় বড় রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলনে ইউ এস প্রেসিডেন্ট এসেছিল
সুতরাং নীল ওর্লির বিমান বন্দরে প্যারিসের উপরের বাতাসে বসন্তের
পরিচ্ছন্নতা থাক্‌
আইসেনহাওয়ার আমেরিকার কবরখানা থেকে উড়ে আসছে
এবং পের লাসেজের কবরখানায় মায়াময় কুয়াশা গাঁজার ধোঁয়ার মতো
ঘন
পীটার ওরলভস্কি এবং আমি পের লাসেজে নরম ভাবে হেঁটেছিলাম
আমরা দুজনেই একদিন মরবো জানলাম
সুতরাং শহরের মতো ক্ষুদ্র সংস্করণ অসীমে পরস্পর দুজনের ক্ষণিক হাত
নরম ভাবে ধরেছিলাম
পথগুলি, পথের বিজ্ঞাপন, পাহাড় টিলা এবং প্রত্যেক লোকের বাড়িতে
লেখা নাম
শূন্যতার মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ফরাসির হারানো ঠিকানা খুঁজছিলাম

তাঁর অসহায় স্মৃতিস্তম্ভে আমাদের প্রণামের পাপ জানাতে
এবং তাঁর স্তব্ধ সমাধি ফলকে আমার সাময়িক আমেরিকান গর্জন
শুইয়ে রাখতে
তাঁর পড়ার জন্য লাইনগুলির মধ্যে কবির এক্সরে-চক্ষু দিয়ে
কেননা তিনি অলৌকিক ভাবে স্যেন নদীর পারে নিজের মৃত্যুর কবিতা
পড়তে পেরেছিলেন
আমার আশা কোন বুনো বালক সন্ন্যাসী আমার কবরেও তার রচনা রাখবে
ঈশ্বর স্বর্গে শীতের রাত্রে আমাকে পড়ে শোনাবার জন্য
আমাদের হাত এতক্ষণে সে জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়েছে আমার হাত
এখন লিখেছে
প্যারিসের গী´ল্য কুরের একটি ঘরে
আ উইলিয়ম তোমার মাথার মধ্যে কি জোর ছিল কার নাম মৃত্যু
আমি সমস্ত সমাধি ভূমির উপর দিয়ে হেঁটে গেছি এবং তোমার কবর
পাইনি
তোমার কবিতার মধ্যে ঐ অদ্ভুত ব্যান্ডেজ বলতে তুমি কি বুঝিয়েছিলে
হে পবিত্র পীড়াদায়ক মৃত্যু তোমার কি বলার আছে কিছু না এবং মোটেই
তা যথেষ্ট উত্তর নয়
তুমি ছ´ফুট কবরখানায় মোটেই গাড়ি চালাতে পারো না যদিও এই
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট স্মৃতিভাণ্ডার যেখানে সবই সম্ভব
বিশ্বজগৎ এক সমাধিভূমি এবং এখানে আমি একা হাঁটছি
পঞ্চাশ বছর আগে আপলিনেয়ার এই পথেই হেঁটেছেন জানি
তার পাগলামি কোণে-কোণে আছে এবং জাঁ জেনে আমাদের সঙ্গে
বই চুরি করছে
পশ্চিম আবার যুদ্ধে মেতেছে এবং কার মধুর আত্মহত্যায়
এর মীমাংসা হবে
গীয়ম গীয়ম তোমার খ্যাতিকে আমি কত ঈর্ষা করি, মার্কিন সাহিত্যের
প্রতি তোমার অনুকম্পাকে
মৃত্যু সম্বন্ধে দীর্ঘ উন্মাদ ষাঁড়ের গোবর লাইন সমেত তোমার পরিধি
কবর থেকে বেরিয়ে এসো এবং আমার দরজা দিয়ে কথা বল
নতুন রূপকল্পের মালা বার করো সামুদ্রিক হাইকু, মস্কোর নীল ট্যাক্সি
বুদ্ধের নিগ্রো মূর্তি
তোমার পূর্ব অস্তিত্বের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডে আমার জন্য প্রার্থনা করো
দীর্ঘ বিষাদময় গলায় এবং গভীর মিষ্টি সুরের মতো ধ্বনিতে, করুণ এবং
প্রথম মহাযুদ্ধের মতো কর্কশ
আমি খেয়েছি তোমার কবর থেকে পাঠানো নীল ক্যারোট এবং ভ্যান
গঘের কান

এবং পাগলাটে আরতোর ক্যাকটাস
এবং নিউ ইয়র্কের পথ দিয়ে হেঁটে যাবো ফরাসি কবিতার কালো
আঙরাখার মধ্যে
পের লাসেজে আমাদের কথাবার্তায় কিছু সংযোজন করে
এবং তোমার সমাধির উপরে যে আলোর রক্তপাত হচ্ছে আগামী কবিতা
তার থেকে প্রেরণা পাবে।

(২)

এখানে প্যারিসে আমি তোমার অতিথি হে বন্ধুপ্রতিম ছায়া
ম্যাক্স জেকবের অদৃশ্য হাত
যৌবনের পিকাসো আমাকে দিচ্ছে এক টিউব ভূমধ্যসাগর
নিজে রুসোর প্রাচীন লাল নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলুম আমি তার বেহালা
খেয়ে ফেলেছি
বাতো ল্যাভোয়ারের বিশাল পার্টিতে উপস্থিত ছিলাম আলজিরিয়ার
পাঠ্যপুস্তকে যা উল্লেখিত হয়নি
বোয়া দ্য বুলোনে জারা বুঝিয়েছে কোকিলের মেসিনগানের রসায়ন
আমাকে সুইডিস ভাষায় অনুবাদ করতে করতে সে কাঁদে
কালো প্যান্ট এবং বেগুনি টাইতে সুসজ্জিত
মিষ্টি রক্তিম দাড়ি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আছে যেন নৈরাজ্যের
দেওয়াল থেকে ঝোলা শ্যাওলার মতো
আঁদ্রে ব্রেঁতোর সঙ্গে তার ঝগড়ার কথা সে বলেছিল অনর্গল
যাকে সে একদিন সাহায্য করেছিল সোনালি গোঁফ পাকিয়ে নিতে
বুড়ো ব্লেইজ্ সেঁদরার পড়ার ঘরে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল এবং
বিরক্তভাবে সাইবেরিয়ার বিশাল দৈর্ঘের কথা বলেছিল
জাক ভাসে তার পিস্তলের ভয়ংকর সংগ্রহ দেখাতে নিমন্ত্রণ করেছিল
আমাকে
বেচারা কক্‌তো একদা চমৎকার রাদিগে'র জন্য বিষণ্ণ ছিল এবং তার
শেষ ভাবনায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম
মৃত্যুর কাছে পরিচয় পত্র নিয়ে রিগো
এবং জীদ টেলিফোন এবং অন্যান্য অদ্ভুত আবিষ্কারের প্রশংসা করেছিল
আমরা প্রধান বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যদিও সে সুগন্ধি আন্ডারপ্যান্ট
সম্বন্ধে বকবক করেছিল অনেক
কিন্তু তাহলেও সে হুইটমানের ঘাস গভীরভাবে পান করেছে এবং
কলোরাডো নামে সমস্ত প্রেমিকরা তাকে ঈর্ষা করেছে
আমেরিকার যুবকরা হাতভর্তি শার্পনেল এবং বেসবল নিয়ে হাজির
ওঃ গীয়ম, এ পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কত সহজ, কত সহজ মনে হয়

তুমি কি জানতে বিরাট রাজনীতির উচ্চাঙ্গ লেখকরা মঁপারনাসে
ঢুকে পড়বে
তাদের কপাল সবুজ করার জন্য শুধু এক বসন্তের অবতারের লরেল নিয়ে
তাদের বালিশে একদানা সবুজ নেই, তাদের যুদ্ধ থেকে একটিও পাতা
নেই—মায়াক্‌ভস্কি এসেছিল এবং বিদ্রোহ করেছিল।

(৩)

ফিরে এসে একটা কবরের উপর বসে তোমার স্মৃতি ফলকের দিকে
তাকিয়ে আছি
অসমাপ্ত লিঙ্গের মতো এক খণ্ড পাতলা গ্রানাইট
পাথরে একটি ক্রুস মিলিয়ে যাচ্ছে, পাথরে দুটি কবিতা একটি ওল্টানো
হৃদয়
অপরটি প্রস্তুত হও আমার মতো যে অলৌকিক
উচ্চারণ করেছি আমি কসত্রোউইত্‌স্কির গীয়ম অ্যাপোলিনেয়ার
কে যেন ডেজি ফুল ভর্তি একটা আচারের বোতল রেখে গেছে এবং একটি
৫ বা ১০ সেন্টের সুর্‌রিয়ালিস্ট ধরনের কাচের গোলাপ
ফুল এবং ওল্টানো হৃদয়ে সুখী ছোট্ট সমাধি
একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে যার সাপের মতো গুঁড়ির কাছে আমি বসেছি
গ্রীষ্মের বাহার এবং পাতাগুলো সমাধির উপরে ছাতা এবং কেউ
এখানে নেই
কোন্‌ অশুভকণ্ঠ কাঁদে গীয়ম কোথায় তুমি এলে
তার নিকটতম প্রতিবেশী একটি গাছ
সেখানে নীচে হাড়ের স্তূপ এবং হলুদ খুলি হয়তো
এবং ছাপানো কাব্য অ্যালকুলস্‌ আমার পকেটে, তার কণ্ঠস্বর
মিউজিয়মে
এবার একটি মধ্যবয়স্ক পায়ের ছাপ কবর ঘুরে যায়
একটা লোক নামের দিকে তাকায় এবং কবর গৃহের দিকে
চলে যায়
একই আকাশ মেঘের মধ্যে ঘোরে যুদ্ধের সময় রিভিয়েরাতে
ভূমধ্যসাগরের দিনগুলি যেমন ছিল
ভালোবাসায় অ্যাপোলো পান করে মাঝে মাঝে আফিম খেয়ে সে আলো
আলো নিয়ে গেছে
সেন্ট জারমেনে কেউ নিশ্চয়ই আঘাতটা বুঝেছিল যখন সে যায়,
জেকব এবং পিকাসো কেশেছিল অন্ধকারে
একটা ব্যান্ডেজ খোলা হলো এবং ছড়ানো বিছানায় একটা মাথার খুলি
স্থির হয়ে রইলো

থলথলে আঙুল, রহস্য এবং অহঙ্কার চলে গেল
দূরে রাস্তায় একটা ঘণ্টা বাজলো, পাখিরা কিচির মিচির করে উঠলো
চেস্টনাট গাছে
ফামিল ব্রেমোঁ কাছেই ঘুমিয়ে আছে, বিশাল বুক এবং যৌন আকর্ষণ করার
মতো যিশু ঝুলছে তাদের কবরে
আমার কোলের উপরে সিগারেট ধোঁয়া দিচ্ছে এবং পাতাগুলি ধোঁয়ায়
ভরিয়ে দিচ্ছে এবং আগুন জ্বলছে
একটা পিঁপড়ে আমার কর্ডুরয়ের হাতায় দৌড়ে গেল এবং যে গাছে
আমি ভর দিয়ে আছি সেটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে
ঝোপ এবং গাছপালা কবর ছাড়িয়ে ওপরে উঠছে একটা সোনালি
মাকড়সা ঝক্‌ঝক্ করছে গ্রানাইটে
এখানে আমার কবর হয়েছে এবং আমার কবরের পাশে একটি গাছের
নীচে বসে আছি।

নীরা, হারিয়ে যেও না

সূচিপত্র

এই দৃশ্যে

এখানে আগুন বেশ তরমুজের মতো ঠাণ্ডা, এই দৃশ্যে
দু'দশদিন থেকে যাওয়া যায়
সিঁড়িগুলি মখমলের মতো কাম্য, এই সিঁড়ি
নেমে গেছে কোনো এক লুপ্ত শতাব্দীর সানুদেশে
কুসুম কাঁটায় বেঁধা প্রজাপতি, কাচের জানলায়
এক পথভোলা অলি
ওদের সহাস্য মুক্তি দেওয়া হলো, খুলে গেল
সুন্দরের নবীন যৌবন
এখানে বাতাস বেশ সমুদ্রের তলপেটের মতো নীল
একটি হরিণী তার মিলন সুখের পর বিছানায়
রেখেছে কস্তুরী
এখানে ঈর্ষার পাশে বুড়ি ধাইমার মতো পা ছড়িয়ে
বসে আছে কৃতজ্ঞতা
এই দৃশ্যে দু' দশদিন থেকে যাওয়া যায়!

নীরাকে দেখা

আমার দূরত্ব সহ্য হয় না, নীরা, ঝড়ের রাত্রির মতো
কাছে এসো
যেমন নদীর গর্ভে গুমরে ওঠে নিদাঘের তোপ
প্রতিটি শিমুল বৃক্ষ সর্বাঙ্গে আগুন মেখে যেমন অস্থির
আমি প্রতীক্ষায় আছি

বৃষ্টির চাদর গায়ে, হাল্‌কা পায়ে, দিক্‌বধূর মতো তুমি
এই দরদালানে একটু বসো
মুখের একদিকে আলো, অন্যদিকে বিচ্ছুরিত, উদ্ভাসিত কালো
ভুরুতে কিসের রেণু, নরম আঙুলে কোন্ অধরার লীলা
ওরে তোকে ভালো করে দেখি, কিছুই তো হলো না দেখা
সামান্য জীবনে
নির্লজ্জ শরীরবাদী এই লোকটা এখনো তোমায় ছোঁয়নি স্থাণুর শিকড়ে
দ্যাখো তার হাতে
হাঁসের পালকে লেখা বসন্ত প্রবাস!

আজ সারাদিন

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে শুনছি কোলাহলময় সঙ্গীত
পায়ে ক্ষীণ ব্যথা, জুতো খোলা যাক, খালি পায়ে দিক হাওয়া
বুড়ো আঙুলের নখদর্পণে ঝলসে উঠলো প্রাক রজনীর চাঁদ
হাঁটু গেড়ে বসি, এত ধুলোময় জগতে আমার চাঁদের গায়েও
ধুলো
তারই যেন এক বিন্দুর নাম সুনীল, হঠাৎ ভেসে যাবে কোন্
স্রোতে
বড় মজা লাগে, ফুঁ দিয়ে ওড়াই অজস্র জলবিম্ব।

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

জামার বোতামে সূচ ও সুতোর স্মৃতি-কথা শোনা গেল
মেশিন ঘরের বাইরে হারিয়ে ব্রাত্য বোতাম ছুঁয়েছিল কার হাত
সেই চম্পক অঙ্গুলি আজ খেলা করে এই রোমশ বুকের গভীরে
দু' পাশে কত না মানুষের ঢেউ অচেনা ভাষায় হাসাহাসি করে
ছুটছে
আমি যেন আজই প্রথম এসেছি নীল আলো মাখা বাত্ময়
পৃথিবীতে
ছেঁড়া কাগজের ভিজে অক্ষর নাম ধরে ডাকে, নদীও বললো,
এসো—

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

হোটেলের ঘরে ঘুম ভেঙে যায়, ভোরবেলা নাকি সন্ধ্যা
এ কার বিছানা, কিংবা শায়িত লোকটি কি আমি, হয়তো বা
আমি নয়
জানলার কাচে ঝাপটা মারলো বনকুসুমের মনে পড়ে যাওয়া গন্ধ
কোন অরণ্যে এসেছি একলা, আকাশ ঢেকেছে জীবন্ত ডালপালা
অথবা পাশেই সমুদ্র, তার উচ্ছ্বাস এসে ভাসালো এ লোকভূমি
বড় মোহময়, পলাতক-সুখ, এমন শব্দ বর্ণের অবগাহন

আজ সারাদিন একটা কথাও বলিনি কারুর সঙ্গে...

এই আমাদের প্রেম

আমরা কথা বলছি
আর আগুনে ঝলসে যাচ্ছে বিন্নি ঘাস ভরা প্রান্তর
চচ্চড় শব্দ হচ্ছে, পুড়ছে মাটির মাংস-চামড়া
আমরা দেখছি না, আমরা শুনছি না
আমরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি পরস্পরের দিকে
আঙুলের ডগায় বরফের টুকরো, মুঠোর মধ্যে চণ্ডালের চাহনি
তিলফুল থেকে বেরিয়ে আসছে শুঁয়ো পোকা
সাদা পায়রাকে ধারালো নোখে চেপে ধরছে গাং চিল
এরই ফাঁকে ফাঁকে উচ্ছ্বসিত আমাদের হাসি ঠাট্টা
পটপট করে ছেঁড়া হচ্ছে বুকের রোম, কানের মধ্যে জ্বলন্ত দেশলাই
তা ঢেকে দেবার জন্য বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছি আলি আকবর
বড় বড় কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে শয়ন ঘরে
আমরা এইবার নাচ শুরু করবো, এতগুলি খড়ের পা
পিতৃত্বের গালে কেউ ঠাস করে মারলো একটা চড়
আমরা খোকাকে বললুম, যা নাগরদোলায় দুলগে যা
হিমালয় থেকে খল খল করে ধেয়ে আসছে উৎসন্ন
আমরা তখন সবাই মিলে জ্যোৎস্না রাতে নদী দেখতে যাই
নদীর কিনারায় নারীকে মানায়, একা একা চান্দ্র রমণী
তার পেছনে কালো কালো ভূতগুলোর মাথায় পুলিশের লাঠি
সেই নারীর দুই উরুর মধ্যে সাপ, স্তন দুটিতে কুকুরের দাঁত
তার চোখ চেপে ধরে বলি, তুমি কী সুন্দর, বিমূর্ত, তবু হৃদয়হরণ
এই আমাদের প্রেম।

নীরা, হারিয়ে যেও না

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
আকাশে ভাঙা কাচের টুকরোর মতন আলো
বিপরীত দিগন্ত থেকে প্রবাসিনীর মতন দ্বিধান্বিত পায়ে
এগিয়ে এলে তুমি
সমস্ত শরীরময় শ্বেত হংসীর পালক, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা
আমি ভয় পেয়েছিলুম

তখন তো বেড়াতে আসার সময় নয়, অনেকেই যাচ্ছে নির্বাসনে
তখন হিংসেয় জ্বলছে শহর, মানুষের হাতের ছুরি গেঁথে যাচ্ছে
মানুষেরই বুকে
রাস্তায় বসে লাশের আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে ধর্ম
রক্তবমির মতন ওগরাচ্ছে দেশপ্রেম
আমি চিলেকোঠায় বন্দি, তোমাকে চিনতে পারিনি
তারপর আমি একটা ছোট নোটবুক নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেলুম
নিবিড় নীলিমায়
তুমি তখন দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে,
চোখের মণিতে নদী
নগরীতে প্রগাঢ় রাত্রির নির্জনতা, ঢং ঢং করে বাজছে
সমস্ত স্কুলের ঘণ্টা...

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
মনে আছে, তুমি গুহা মানবীর মতন সহসা কৈশোর ছিঁড়ে
খুব ভোরবেলায় শীতের নরম রক্তিম সূর্যকে আলিঙ্গনে, আদরে
জড়ালে
হরি ঘোষ স্ট্রিটের কদমগাছটি থেকে তখন টুপটুপ করে
ঝরে পড়ছে হীরের কুচি
দিনের প্রথম তীক্ষ্ণ ট্রাম বলতে বলতে গেল, জাগো, জাগো
রিভলভিং স্টেজের মতন উল্টোপাল্টা এই দুপুর, এই মধ্যরাত, এই
সন্ধ্যা
আমি তখন গলা ফাটাচ্ছি মিছিলে, নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
চতুর্দিকে লকলক করছে খিদে
আঃ সেই মায়াময়, ভিখিরির, যযাতির খিদে
কুম্ভীপাক নরকের মতন পেট মোচড়ানো খিদে
এক এক পলক দেখতে পাচ্ছি বারান্দায় ব্যাকুল মাতৃমূর্তি,
পাখির মতন চোখ
স্বপ্ন ছিল, দুনিয়ার সমস্ত মা-ই একদিন
সব কুচো কুচো বাচ্চাদের ধোঁয়া-ওঠা ভাত
বেড়ে দেবে
কলেজ স্ট্রিটের সেই বুলেট ও বিস্ফোরণ
তুমি বাস থেকে নামলে, তক্ষুনি সেই বাসে শুরু হলো
বারুদ উৎসব
এক দৌড়ে পার্কের রেলিং টপকে কে যেন দণ্ডির ভঙ্গিতে
শুয়ে পড়লো

ঘাসে মুখ গুঁজে।

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
তুমি রমণী ছিলে, নীরা হলে
আমি দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে সাজলুম ওষুধ-গুদামের কেরানি
জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, রাস্তার মুচির কাছে বসেছি
উবু হয়ে
কেউ চিনতে পারছে না, পিঠের দিকে সবাই অচেনা
কখনো আমিই মুচি, সে পথচারি
কখনো আমিই রাস্তা, লোকে হেঁটে যাচ্ছে আমার
বুকের ওপর দিয়ে
কখনো আমি নীরবতা, আমিই অস্থির গর্জন
তুমি অন্ধ বৃদ্ধকে পয়সা দিলে, শিয়ালদার ঘড়িটি থেমে গেল
ট্রেন থেকে নেমে এত মানুষ দৌড়চ্ছে, সবাই থমকে গেল
কয়েক মুহূর্ত
তারপরই ঝনঝন শব্দে শুরু হলো প্রচুর ভাঙাভাঙি
টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় পুলিশ কাঁদছে, চীনেরা ভাই-ভাই মানলো না
ইস্তাহারের ধাক্কায় রাস্তা খোঁড়া গর্তে ছিটকে পড়ে অনেকেরই
পা মচকে গেল
তিনটে জ্যান্ত ছানা মহানন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে নর্দমায়
লাল চুলওয়ালা একদল সাহেব ফরাসি ক্যামেরায় তুলে নিয়ে গেল
সেই ছবি
তুমি পরীক্ষার হলে একা বসে রইলে, প্রশ্নপত্র এলো না
আমি নিচু হয়ে খুঁজছি ফুটো পকেটের খুচরো পয়সা
তুমি কুসুম সমারোহে গিয়ে পতাকার মতন উড়িয়ে দিলে আঁচল
আমি সারা সন্ধে শুয়ে রইলুম শ্মশানের পাশে।

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
সমস্ত ম্যাজিক দৃশ্যের ওপরেই এসে পড়ে শরীরের বিভা
কবিতার মধ্যে উঁকি মারে শরীর, কখনো তা ছায়া,
কখনো রক্ত মাংসের অবাধ্যতা
এক একবার ডুবে যায়, এক একবার মুখোমুখি এসে বসে
কালিদাসের ভ্রমর ছুঁয়ে দিল তোমার স্ফুরিত ঠোঁট
ঘাস ফুল হয়ে আমি তোমার নাভিমূলে জিভ রাখি
মদিগ্লিয়ানির নারীর মতন তোমার রম্ভোরুতে ঝলমল করে জ্যোৎস্না
একবার আমি শিশু, তুমি চিরকালের জননী

একবার তুমি অতি বালিকা, এক স্বৈরাচারী রাজা
চেয়েছে তোমাকে
সমুদ্র প্রবল ঢেউ তুলছে আকাশের দিকে
আকাশ নেমে আসছে পাতালে
যোনিপদ্মের ঘ্রাণ নিচ্ছে এক তান্ত্রিক
অতৃপ্ত মহামায়া বলছে, আরো, আরো
ওঃ সেই খেলা, সেই হৃদয়ের উন্মোচন
বসন্ত বিছানায় লেখা হলো কত শত রতি-ইতিহাস
গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে জানলার ধারে নির্বসন বসে থাকা
গোধূলি কিংবা ভোর
আমার হাতে সিগারেট, তোমার চুলে হিরণ্ময় চিরুনি
ভুলে যাওয়া পৃথিবী ফিরে আসছে একটু একটু করে, অন্তরীক্ষে
মৃদু কণ্ঠস্বর
গোধূলি কিংবা ভোর, আকাশে বিন্দু বিন্দু সাত-রং জলের ফোঁটা
সেইদিকে তুমি চেয়ে রইলে, এখন কোথাও বিমান উড়ছে না
কীটসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুমি আনমনে বকুনি দিলে নিউটনকে
তন্মুহূর্তে আমার আবার জন্মান্তর ঘটে গেল

নীরা, আমাদের ভুল ভেঙে যায়, আমরা ফের বালি দিয়ে ছোট ছোট
দুঃখের ঘর বানাই
আমরা এখনো ন্যাংটো বাচ্চাদের মতন ছোটাছুটি করছি
সমুদ্র তীরে
মাঝে মাঝে কী চমৎকার আড়াল, শতাব্দীর ঝাউবন
আমি তোমাকে দেখতে পাই না, আমি তোমার নামে কলম
ডুবিয়েছি দোয়াতে
আমি তোমাকে ছুঁইনি, তুমি গর্ভিণী হরিণীর মতন মিলিয়ে গেলে
পাহাড় প্রদেশে
এক একটা ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দিক চক্রবাল
জাদুদণ্ড ঘোরালেই স্বর্গ থেকে নেমে আসা বিদ্যুৎ লহরী
প্রোথিত হচ্ছে ভূমিতে
সব কিছুই শব্দের কাটাকুটি, পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া
করতলের আমলকিটি দেখে নিচ্ছি মাঝে মাঝে, সে-ও আমাকে দেখে
মিটিমিটি হাসছে
নীরা, তুমি সুদূরতম নৌকোয় একা, ছড়িয়ে দিয়েছো দুই ডানা
আমি দূরন্ত মেলট্রেনে বসে একটাও স্টেশনের নাম
পড়তে পারছি না

তুমি স্কুল কমিটির দলাদলি থেকে সরে গেলে দরজার আড়ালে
আমি দুপুরের পর দুপুর কাটিয়ে দিচ্ছি কাচ ঘেরা ঘরের চেয়ারে
অথচ কত নদী তীরের গাছের ছায়া খালি পড়ে আছে
যারা বিপ্লব এসে গেল বলেছিল, তারা লিখছে স্মৃতিকথা
আর যারা মুছে গেল, তারা বড় বেশিরকম মুছে গেল
লাল চুলওয়ালাদের ক্যামেরা এখনো ঘুরছে গলি-ঘুঁজির
আনাচে-কানাচে
কেউ আর ভালোবাসার কথা বলে না
মানুষের সভ্যতা ভালোবাসার কথা শুনলেই হাহা-হিহিতে ফেটে পড়ে
বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে কেউ একা একা কাঁদে আর
জলের ঝাঁপটা দেয়
নীরা, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে, হারিয়ে যেও না
অনেক জন্ম বদল বাকি আছে, হারিয়ে যেও না
নীরা, অমৃত খুকী, হারিয়ে যাস নি!

ফেরা

মেল ট্রেন থেকে নেমেই চাপলুম গড়বন্দীপুরের জন্য গরুর গাড়িতে
শীত পড়েছে জাঁকিয়ে
আমার গায়ে ঠাকুর্দার ব্যবহার করা শাল
সিগারেট ধরাতেই হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে গেল, ড্যাম্প লাগা, ঠিক ধোঁয়া
বেরুচ্ছে না
কিন্তু আমার লাইটারটা বিদেশ থেকে এনে দিয়েছে এক বন্ধু
বাচ্চা গাড়োয়ানটি বেশ হিন্দি সিনেমার গান গায়, যদিও তার বাবা
জেল খাটছে অন্যের জমিতে ফসল কাটার দায়ে
এখন দু পাশে তুলোট কাগজের মতন শূন্য মাঠ, ব্যাঙের চামড়ার মতন
শূন্য ডোবা
সাইকেলে ট্রানজিস্টার রেডিও ঝুলিয়ে চলে গেল একজন
উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছে আর একজন, তার দাড়িতে কোনোদিন
ব্লেড-ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি মনে হয়
বট-চারা ওঠা শিব মন্দিরে রুনু রুনু ঘণ্টা বাজছে, তা ঢেকে দিল
বিমানের মেঘমন্দ্র ধ্বনি
মুদিখানায় ঠোঙ্গা ছিঁড়ে খবরের কাগজ পড়ছেন নিরাপদ মাস্টার

অবিকল আমার বাবার পিসিমা যেন তিরিশ বছর পরে বেঁচে উঠে তুলসী
তলায় দেখাচ্ছেন প্রদীপ
ন্যাংটো একটা বাচ্চা ছেলে ধুলো মেখে খেলা করছে
ওকে দেখে সত্যেন দত্ত কবিতা লিখেছিলেন সত্তর বছর আগে
বৃষ্টির মতন নেমে আসছে অন্ধকার
শুধু জ্বলছে হিমঘরের আলো
ভাঙা সাঁকোটি খচর খচর শব্দে বলছে, এসো, এসো এসো
চতুর্দিকে অজস্র ঝিঁঝির ডাক বলছে, এসো, এসো, এসো
বাজ পড়া শিমুল গাছটি এখনো বাড়িয়ে রয়েছে ভূতের মতন দুটি লম্বা
হাত।
আমি গড়বন্দীপুরে ফিরে আসছি
আমি মহাশূন্য থেকে ভেসে আসছি আবহমান কালের গড়বন্দীপুরে
আমার মাথার পিছনে বৃত্তের মতন ঘুরছে ঠাকুর্দার আমলের জোনাকি
মাসি-পিসিদের দীর্ঘশ্বাসের মতন উড়ছে বাতাস
মোমের আলো মিট মিট করে নিবে যাওয়ার উদ্যমে ব্যস্ত আমি
আসছি, আমি ফিরে আসছি,
আমার হাতে পারমাণবিক টর্চলাইট!

হাত

ধরা যাক, আজ থেকে আমি আমার বাবার নাম দিলুম
নিরাপদ হালদার
মাঝারি উচ্চতা, সারা দেহে ঘামাচি রঙের ঘাম মাখা সেই মানুষটি
রানাঘাটের এক ভাতের হোটেলের ম্যানেজার
তা হলে আমি কি মফঃস্বলের ক্লাস এইটে পড়া রাধারমণ?
আমাকে ফর্সা ছেলেরা চাঁটি মারে যখন তখন।

ধরা যাক আমার মা চৌধুরী বাড়ির ঠিকে ঝি,
গালে মেছেতার দাগ।
একটু মুখ খারাপ করা স্বভাব
তা হলে আমি কি সন্ধের দিকে দেশবন্ধু পার্কের ছিনতাইবাজ?
আমার ভাই হিন্দ্ মোটর্‌সে ট্রেন আটকাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে
আমি নিজেও ফিসপ্লেট বিষয়ে শিখে নিয়েছি অনেক কিছু

আমার বোন পোড়া কয়লা কুড়োয় রামরাজাতলায়
কোন কোন দিন ট্রেন আসে না, কয়লাও পোড়ে না!

একটা প্রকাণ্ড শামিয়ানার নীচে আমাদের জন্য রান্না হচ্ছে খিচুড়ি
চারিদিকে ম ম গন্ধ, আমরা যেন শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
কে যেন তুলে দেখালো একটা খাসির রাং
অনেকেই প্রবল উরু চাপড়ে বললো, বাঃ বাঃ বাঃ
আমি অবশ্য জানি না কে আমার বাবা কিংবা প্রকৃত মা
কিন্তু কারুর সঙ্গে হাতে হাত মেলাই নি
হাত দুটো পরিষ্কার তৈরি রাখতে হবে তো
বলা যায় না, কোনো একদিন সত্যিই যদি কিছু একটা ঘটে যায়
যেদিন সবাই আমাকে এসো এসো বলে খুব ভালোবেসে ডাকবে...

দেখা হলো কি দেখা হলো না

ভালোবেসো সেই ভালোবাসাকে, আমার আর
কিছুই চাই না
পুড়ুক না হয় প্রিয় নদীটি, ভাসুক সারা
শরীর জুড়ে দূর প্রবাস
জন্ম জন্ম পায়ে ফোটার কাঁটা, একটু
নীরব নীল দুঃখ কুচি
দেখা হলো কি দেখা হলো না
ঐ মেঘ আর এই মেঘে ধারাপাত হলো না
ভালোবেসো তবু ভালোবাসাকে, আমার আর
কিছুই চাই না।

মাদারির খেলা, এই আছে, এই নেই

মাঝে মাঝে পূর্বপুরুষদেরও চুরমার করে ভাঙলে মন্দ হয় না
শুধু কি দু'চারটে দেবালয়ের দারু ও পাথর, রঙিন কাচ
আমি নিজেকেও ভাঙছি, গলা দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নামছে

বিষের ধোঁয়া
আজ কখন দিনের পেটে রাত্রি আর রাত্রির গর্ভে ঘুমহীন উল্লাস
কেউ নেই, কেউ কাছে নেই, শুধু খননের শব্দ, শুধু পতনের শব্দ
কোথাও ডাকে না রাতপাখি, জ্যোৎস্না-ফোৎস্না মেরুপ্রদেশে
বেড়াতে গেছে
মাকড়সা জালের মতন নিঃশব্দ পড়ে আছে এই পৃথিবী
আমি কী খুঁজছি, আমি কী খুঁজছি, আমার একাকিত্বে জ্বলছে
আগুন।

মাঝে মাঝে আশ্রমের ধুলোতেও মেশানো দরকার বারুদ
যারা দেঁতো হাসি হেসে বংশ রক্ষা করে যাচ্ছে, তারা স্বপ্নেও
ভয় পাবে না?
পায়ের নীচে দ্রুত সরে যাচ্ছে বালি, মাথার কাছে ঝামরে পড়ছে
মেঘ
এসো, এই সময় আমরা একটা মহোৎসব করে
এই শুয়োরের বাচ্চা সভ্যতাকে ভাঙি
এসো, জল ভাঙি, আকাশ ভাঙি, সহানুভূতিকে খুচরো পয়সা
করে বিলিয়ে দিই
টুকরো টুকরো কাচের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে খালি পায়ে
ভিখিরিরা
ওদেরও ডাকো, ওরা যা পায়নি তা ভাঙবার একটু সুখ দাও
ভাঙো শৃঙ্খল, ভাঙো কবিতা, ভাঙো পার্টি অফিসের রামধনু
যারা পরমাণু ভেঙেছে, তারা কি চেটে নিয়েছে সেই ধুলো
ওগো, আমি খবরের কাগজ পড়ি না, এটা কোন্ শতাব্দী,
এই মহাশূন্যের কোন্ দেশ?

আমাকে একটা সুন্দর শৈশবের ছবি দেখিয়ে ভুলিও না, ওটা
একটা
পিকচার পোস্টকার্ড
এই সুখের বাড়িটি কার, আমি তা ঢের দেখেছি ইঁদুরের দৌড়
ইঁদুর-দলপতিরা সব বীর পুরুষ, আমি আসলে বোধহয় পুরুষের
ছদ্মবেশে নারী
আমার মেয়েলি-ছেলে হতে কোনো আপত্তি নেই, আমি
কোনোদিন রাইফেল হাতে
যুদ্ধে যাবো না
আমার ঢাক-ঢোল পেটানো প্রেম নেই, মোষ বা ষাঁড়ের মতো কাঁধ

নেই
আমি কোনো এক লবাব খাঞ্জা খাঁ-র খামখেয়ালের ছেলে,
আমার মা এক
পাতাকুড়োনি বা অন্য কেউ তা কে
জানে!
আমার হাতে অনেকগুলো ধ্বংস, আমার হাতে কয়েকডজন
শূন্যতা
দ্যাখো দ্যাখো মাদারির খেলা, এই আছে এই নেই, এই আছে
এই নেই
তুমি কে গো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াচ্ছো সামনে, তুমি কোন
অন্ধবিশ্বাসের মৌরসীপাট্টা
ওগো ইতিহাস, আমি তোমার চিবুকে বাঁ পায়ের ঠোক্কর দিয়ে
বলবো,
আমি সাত পুরুষের বেজন্মা
সেই রকমই এক বেজন্মা ঈশ্বরের বাচ্চা
ওহে চাঁদবদন, গাল ভরা কথায় কথায় আর খেলিও না!

সারাজীবন

দগ্ধ মাটির গর্ভ থেকে ফুটে উঠলো গান
জল চাই না, বীজ চাই না, আরও আগুন আন
রোগা আগুন, কালো আগুন, আগুন-রঙা খিদে
একটু একটু পাবার আগে, সর্বনাশ দে!

পেরিয়ে মাঠ, আল জাঙাল, ঝামড়ে উঠলো বাতাস
ঘর ছাড়াকে ডেকে বললো, কোন্ ঘর তুই চাস?
দেয়াল জোড়া বর্ষাধারা মাথার ওপর শীত
শাবল দিয়ে ভাঙ আগে সব সাত পুরুষের ভিত!

অচেনা রাত, আঁধার দেশ, ভেতরে এক আলো
কখনো নীল, কখনো পীত, আবার সে হারালো
তুমিও কিছু বলবে না কি, গান গাইবে না?
সারাজীবন হেলায় গেল, হলো না কিছু শোনা!

বসুধৈব

ট্রেনে ধূপ বিক্রি করতে উঠলো যে নুলো ছেলেটি
সে কি আমার কোনো পিসতুতো ভাই?
থুতনির ডৌলে কোথায় যেন বহুকাল আগেকার আমার
কুমারী পিসিমার আদল
জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না, যদি কাঁধে চেপে বসে, যদি
আমার হাত দু'খানা সে ধার চায়?
আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, ধূপের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

বারাসত বাস গুমটিতে জানলার কাছে যে হাত পেতে দাঁড়ালো
সে আমার ছোট মাসি হতেই পারে না
সে তো হারিয়ে গেছে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন বিস্মৃতিতে
তার নামের ওপর জন্মে গেছে অসময়ের লতাগুল্ম
তবু সেই লম্বা ভিখারিনীটি হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে
গাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কেন?
সেই চোখে যেন ছেলেবেলার রান্নাঘরের বারান্দার
পারিবারিক গল্প
পুকুর থেকে স্নান সেরে উঠে আসবার মতন আঁচলে জড়ানো গা
আমি কিছু বলার আগেই সে চলে গেল উল্টোদিকের অন্ধকারে
ভিখারিনীরও এত অহঙ্কার?

অ্যাকসিডেন্টে হেলে পড়া ট্রাকটির ড্রাইভারের দিকে চাইতেই
আমার বুক কাঁপলো কেন?
ঐ চওড়া কপাল, বাজপাখির মতন নাক, শাজাহান না?
কলেজ জীবনে টাকা ধার দিয়ে আর ফেরৎ নেওয়া হয়নি, আমার চেয়ে
তারই বেশি লজ্জা ছিল সেইজন্য
সেই শাজাহান তো মার্কিন দেশে মহাশূন্য রকেটের নাট-বল্টু লাগায়
সে নাকি কিনেছে কোনো দ্বীপ, সেখানে নিজস্ব পতাকা ওড়াবে
তবু ট্রাক ড্রাইভারের থ্যাঁৎলানো মুখখানায় জ্বলজ্বল করছে চোখ,
সে অবিকল শাজাহান হয়ে বলছে, চিঠির উত্তর দিসনি কেন,
রাস্কেল?
বড় রাস্তা ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেলেন
আমার ছোটকাকা
না, আমার বাবার কোনো ভাই-টাই ছিল না কখনো...

তিনি এবং আমি

কেন রবীন্দ্রনাথকে তুমি বুকে জড়িয়ে বসে আছো
জানলার ধারে
আমি কি কেউ না?
আমি গরিব ইস্কুল মাস্টারের ছেলে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায় হাঁ করে
জলকাচা ধুতির ওপর পেঁজা শার্ট পরে, পায়ে রবারের স্যান্ডেল
আমার কোনো জ্যোতিদাদা ছিল না, পিয়ানো-অর্গান শুনিনি
সাত জন্মে
আমার বাবা কোনো দিন সিম্‌লে পাহাড়ে যান নি আমাকে নিয়ে
জন্মদিনে রুপোর চামচে পায়সান্ন খাওয়া দূরে থাক, ফ্যানা ভাতে
কোনোদিন ঘি জোটেনি
তবু আমি কি কেউ না?
আমার নিজস্ব ঘর নেই, লেখার টেবিল নেই, যখন তখন আমার বিছানায়
উড়ে আসে
উনুনের ঠাণ্ডা ছাই
তিনবেলা টিউশানি করি, সর্বক্ষণ পেটে ধিকিধিকি করে খিদে
তবু আমি কবিতা লিখেছি, সবাইকে লুকিয়ে, মোম-জ্বলা মাঝ রাত্রে
আমার রক্ত, ঘাম, আত্মার টুকরো মিশে আছে তাতে।

আমার বাবা শিরোপা দেবার বদলে জুতো মারতে উঠেছিলেন
স্বর্ণকুমারী কিংবা প্রতিভা নয়, আমার ছোড়দির নাম চামেলী
আমার খাতার পাতা ছিঁড়ে সে বাতাসকে
উৎসাহ দেয়
বাড়ির দেয়াল থেকে পাড়ার মোড় পর্যন্ত ঝনঝন করে উপহাস
বড় জামাইবাবু মাথায় চাঁটি মেরে আমায় 'কপি' বলে
শ্যালিকাদের হাসিয়েছেন
তবু আমি লিখেছি, আমি লিখে গেছি
রবীন্দ্রনাথ আমার এই চৌহদ্দির মধ্যে জন্মালে লিখতে পারতেন
এক লাইনও?

বিহারীলালের মতন কোনো নামজাদার সঙ্গে আমার চেনা-জানা ছিল না
গলা থেকে মালা খুলে আর দেবে,
মালা পরাই উঠে গেছে
পত্রিকার সম্পাদকরা উত্তর দেন না, ডাক টিকিট মেরে দেন
তবু আমি লিখেছি, লিখে গেছি

আমার সমস্ত অস্তিত্বের নির্যাস নিয়ে এক একটি কবিতা
শুধু তোমাকে শোনাবার জন্যই নয়, তোমাকে রচনা করবার জন্য
তোমার পায়ের তলার ধুলো, চুলের মধ্যে ঘাম শুষে নেবার জন্য
তোমার ফ্যাকাসে হাসির চার পাশে একটা বৃত্ত এঁকে দেবার জন্য
এবং এক সময় তোমাকে ছাড়িয়ে আমি রক্ত নদীর তীরে দাঁড়িয়ে
গণ্ডূষ পান করেছি।

বন্ধুরা চাঁদা দিয়েছিল, তাই নিয়ে ছাপিয়েছি প্রথম কবিতার বই
প্রেসে এখনও কিছু ধার রয়ে গেছে
দপ্তরী খানায় দয়া চেয়েছি
তারপর ছুটতে ছুটতে এসেছি তোমার কাছে, তোমার করকমলে
প্রথম কপিটি দেবার জন্য
পাপীয়সী, তুমি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে আদর করছো
আমি কি কেউ না?
আমার ঈর্ষা লকলক করে উঠছে আকাশে, এখন এক প্রবল বজ্রপাতে
ধ্বংস হয়ে যাক
রবীন্দ্রনাথের মতো সব কিছু
তার ওপরে রেখে যাবো আমার দীন দুঃখী কাব্যগ্রন্থখানি।

রবীন্দ্রনাথের সব কিছু ধ্বংস হলেও কোনো ক্ষতি নেই
বাড়ি ফিরেও, সব কিছু মুছে দিয়ে, তোমাকেও
নির্মম একাকিত্বে
আমার হাহাকার, আমার সমস্ত গুপ্তকথার মতন অনর্গল মুখস্থ বলে যাবো
রবীন্দ্রনাথের কবিতা
একটাও কমা, হসন্ত ভুল হবে না
রবীন্দ্রনাথকে আমি ভাঙবো, ছিঁড়বো, যা খুশি করবো
সে সব আমার নিজস্ব ব্যাপার
রবীন্দ্রনাথও সে কথা জানতেন, মৃত্যুর আগে সেই জন্যই
তাঁর ঠোঁটে লেগে ছিল
ক্ষীণ কৌতুকের হাসি!

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে
এখনো ঠিক সময় হয়নি, ট্রেন ধরবার তাড়া
কিছু না কিছু ভুলোমনায় কাটবে অনেক বেলা
এখানে যাই ওখানে যাই মুখ ফেরানো মানুষ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে।

আমার হাজার কাজের মধ্যে জমছে মন খারাপ
ভুল সকাল, ভুল দুপুর, মিথ্যে একটা দিন
বকুল গাছের নীচে আমার যাবার কথা ছিল
উঠেছে ঝড়, ঝরেছে ফুল, সেখানে কেউ নেই
নদীর জলে পা ডুবিয়ে ধুয়েছি ভালোবাসা

শহর ভরা এত জোয়ার, জলের মধ্যে পিঁপড়ে
ঘর বানাবার সভ্যতা এক লিখেছে ইতিহাসে
চক্ষু পোড়ে, কপাল ভাঙে, মাথায় বিষ জ্বালা
স্বপ্ন ছিঁড়ে উনুনে দেয় আদম-ইভের মা
আকাশ নেই, বাতাস নেই, রাত্রি ভরা আগুন।

আমায় ভয় দেখায় একটা ইহলোকের প্রেত
শরীরে তার সার্থকতা, গীতার নিষ্কাম
মুখ ফেরাই, পালাতে চাই অন্য দিক সীমায়
যেখানে কিছু পাবার নেই, শুধু দেখার সুখ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি, আছে কোথাও, আছে...

জল যেন লেলিহান আগুন

রাত্তিরে আড়িয়াল খাঁ-র গর্জনে হঠাৎ ছিঁড়ে যায় ঘুম
মেঘ ভাঙা শব্দের মতন কূল ভাঙছে
বিদ্যুৎ রেখাঙ্কনের মতন মাটির ফাটলে শোঁ শোঁ করে ঢুকছে বাতাস
বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে ছুটে যেতেই মনে পড়ে
আমি তো রয়েছি একটা লম্বা অট্টালিকার টঙে

অনেক নীচে কালো রাস্তা, বন্ধ দোকানগুলোর সামনে
ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর
এখানে কোথায় আড়িয়াল খাঁ, কোথায় পার ভাঙা
তবু ভাঙছে, মাটি ভাঙছে, এগিয়ে আসছে স্রোত
ছেলেবেলার শ্লোকটা আপন মনে বিড়বিড় করি,
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

মাদারিপুর থেকে নৌকায় যেতে যেতে দেখতুম আধ-ডোবা
কদমগাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে আছে
হলুদ-কালো জলঢোঁড়া সাপ
আমাদের উঠোন থৈ থৈ করছে, ভাসছে কচুরিপানা
ঠাকুমা চিৎকার করছেন, ওরে রান্নাঘর ডুবলো, ডুবলো
হাঁড়ি-পাতিলগুলো ধর
ঈষৎ খয়েরি রঙের সেই ছবিটি একটু একটু করে কাঁপছে
ঠাকুমার মুখখানা মনে পড়ছে না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি
জলের ঝাপটানি
এখনো আমার বয়েসী কোনো কিশোর দৌড়োচ্ছে
আড়িয়াল খাঁ-র বান থেকে বাঁচবার জন্য?
ডুবে যাচ্ছে অসংখ্য রান্নাঘর, তৈজসপত্রের সঙ্গে ওলটপালট খাচ্ছে
অন্য কার ঠাকুমার শরীর...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

বিক্রমপুরের সেই পরিচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম, কলাকোপা বান্দরা
তার পাশে ইছামতী নদীটি বড় তীব্র
ভেসে আসছে বড় বড় গাছের ডালপালা আসামের জঙ্গল থেকে
ঘাটলায় বসে জলের সৌন্দর্য দেখি একদিন
পরেরদিনই সেই জল ভয়ংকর হয়ে লাফিয়ে ওঠে
মিলে যায় বুড়িগঙ্গার সঙ্গে শীতলাক্ষা, তার সঙ্গে মেঘনা
পিঁপড়ের বাসা ভেসে যায়, মানুষের শহরও কাঁপে টলমল করে
আকাশ ঢেলে দিচ্ছে দিগদিগন্তের সমস্ত ঝর্না
আঃ বৃষ্টি এত সুন্দর, এমন হিংস্র, এমন সর্বনাশা
মানুষকে তাড়া করছে জল, ঠিক যেন লেলিহান আগুন...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

জোরহাট থেকে গোলাঘাট হয়ে নওগাঁ-র দিকে মানুষ ছুটছে
জলপাইগুড়ি, মালদা, দিনাজপুরে মানুষ ছুটছে

আত্রাই-পুনর্ভবা-তিস্তার এপারে ওপারে মানুষ ছুটছে
ধলেশ্বরী, ডাকাতিয়া, ভৈরব, ভদ্রার ভয়ে মানুষ ছুটছে
ওদিকে কম্পানিগঞ্জ, সোনাগাজি, এদিকে বংশীধারী, দেবীকোট থেকে
মানুষ ছুটছে
ভুরুঙ্গামারি আর লালমনির হাট একাকার হয়ে গেছে, মানুষ ছুটছে
ধেয়ে আসছে নদী অজগরের মতন নিঃশ্বাস ফেলে
আমি কলকাতার শানবাঁধানো রাস্তায় ঘুরছি, সব কিছু ঠিকঠাক,
শুধু রবিবারের চাঁদা আর
খবরের কাগজের ছবি
বার বার মনে আসছে ছেলেবেলার সেই ভয়-কাঁপা ঠোঁটে উচ্চারিত
শ্লোক:
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

আমাদের কৈশোরের

সাতটা পঁচিশে তুমি নেমে এলে স্তব্ধতার সিঁড়ি ভেঙে, ওই দেশে
বৃষ্টি হয়েছিল?

এবারে অনেকদিন পরে এলে নীরা
কী এমন পিছুটান, ওষ্ঠে কেন ক্ষীণ অভিমান
স্বর্গে কোনো খেদ ছিল, ওখানেও হৃদয়ে লাগে দাহ?

নীরা, এসো, কম্পানি বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি
চিনে বাদামের সঙ্গে আঙুলের ছোঁওয়াছুঁয়ি, এক ঝলক সুখ
কত গল্প বিনিময় বাকি আছে, কত নীরবতা
শুকিয়ে গিয়েছে ঘাস, এ বছর খরা হলো খুব
বারুদের কারখানায় যারা হোলি খেলতে গেল
বাতাসে তাদের দীর্ঘশ্বাস
তোমার খোঁপায় কোনো ফুল নেই, স্বর্গে বুঝি ফোটেনি মন্দার?

বলো বলো, ও দেশের কথা বলো, প্রিয় নদীগুলি, হিরণ্ময়
অরণ্যেরা রয়েছে তো ভালো?
বহতার দূতী তুমি, কী এনেছো এবার দু' হাতে
দিগন্তের বর্ণময়ী, চোখে কেন অশ্রুর কুয়াশা?
তবে দ্যাখো এই পাঞ্জা, এক মুহূর্তের জাদু,
আমাদের কৈশোরের লক্ষ্মীকান্তপুর!

দর্পণের মধ্যে

কোনোদিন যে ভোর দেখে না সে একদিন হঠাৎ জেগে উঠলো
চুম্বক টানে বাইরে এসে সে ধারাস্নান নিল
বেদানার কোয়ার মতন আলোয়
তার দু'চোখে ছিল আঠা, স্নায়ুতে ছিল মাদক
সে মেতে ছিল আত্মধ্বংসের নেশায়
এই শতাব্দীর শিয়রের কাছে ঝুলছে সর্বনাশের খড়্গ
সন্তান সন্ততিদের জন্য থাকবে না কোনো উত্তরাধিকার
তুলোর আগুনের মতন ধিকিধিকি করে পুড়ে যাচ্ছে সব স্বপ্ন
সে ভেবেছিল শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে দ্রুত যত পারা যায়
ঘন ঘন নিশ্বাস নিয়ে যাবে,

সেই মানুষটি আজ সবুজ ঘাসের মতন স্নিগ্ধ বাতাসে
নদীর গর্ভের মতন নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে
সমস্ত পৃথিবীকে দেখলো এক দর্পণের মতন, তার মধ্যে
ঝকঝক করছে অন্য এক তাজা পৃথিবী
সে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ!

দু'দিক জ্বালানো মোম

আঙুল পুড়িয়ে মোম, একি চমৎকার
শুরু হলো আঙুলের নাচ
চতুর্দিকে কান ঝালাপালা বাজনা, আর এই
অশনি উৎসব
এর মধ্যে এঁকে বেঁকে ছোটাছুটি কৈশোর রক্তিম
কত ভালোবাসাময় শুকনো ফুল, নিষিদ্ধ শরীর
বৃষ্টি যেন বাল্য প্রেমিকার হিসি শব্দ
হঠাৎ দরজা খোলে বুক কাঁপা আলো।

নদীরা যেমন গিলে নেয় সব ফুটো নৌকোগুলি
সেরকমই সুন্দরের গর্ভে এত ব্যক্তিগত শোক
সহস্র জানালা তবু অস্তিত্বের সাতলক্ষ জ্বালা

উনুনের পাশে যার ঘাম থেকে ঝরে পড়ে নুন
শ্মশান কাষ্ঠের মতো যার শুধু জ্বলন্ত জীবন
তারাও কি আলিঙ্গন চায়, ভূমিশয্যা, বসন্ত বিহার
দু'দিক জ্বালানো মোম খল খল শব্দে
হেসে ওঠে।

আরও গভীরে

ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকার নিয়ে খেলা করতে করতে
একদিন ভালো মতন অন্ধকার এসে বললো,
এসো, এবার জমিয়ে খেলা হোক!

তারপর শুরু হলো চিঠি ছেঁড়ার মহোৎসব
শূন্য বাক্স-প্যাঁটরায় ফুঁ দিয়ে যে কত ধুলো উড়লো
আঃ, এমন নিরাভরণ হইনি কখনো, নদীর মতন
নদীর গভীরে, আরও গভীরে

এক হীরকোজ্জ্বল জীবন যেন মৎস্যকন্যা হয়ে
হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...

আশ্চর্য নদী

আসুন, এই নদীর ধারে আমরা সবাই বসবো একসঙ্গে

এখানে নেই কালো-সাদা টেলিফোন, তার বদলে
সূর্যমুখী ও চন্দ্রমল্লিকা
দেহরক্ষীদের রেখেছি কিছুটা দূরে জঙ্গলের আড়ালে
লাল কার্পেটের বদলে এখানে সবুজ ঘাস
পা ডুবে যাবার মতো নরম
ছোট ছোট বোতামের মতন ছড়িয়ে আছে বাস ফুল

ওঁরা এই পৃথিবীর অপ্রয়োজনীয় লাবণ্য
জুতো-মোজা খুলে আসুন,
পায়ে লাগুক রাত্রির শিশিরবিন্দু
ব্যক্তিগত সচিব ও ভাষণ-লেখকদের সঙ্গে আনবার দরকার নেই আজ
কিন্তু সহধর্মিণীরা থাকুন পাশে পাশে
আঙুলে-আঙুলে ছুঁইয়ে
আজকের আকাশ মেঘলা কিন্তু সুপবন খেলা করবে চুলে
এই নদী, অনাদিকালের অনাবিষ্কৃত নদী
কুলুকুলু সুরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে
বসুন, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে, এক্ষুনি সব শুরু হবে।
কে কে আসেন নি এখনো?
একটু অপেক্ষা করা যাক
এ তো গোল টেবিল কিংবা শীর্ষবৈঠক নয়
এখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে না,
কোনো পূর্ব শর্তও নেই
শুধু কাছাকাছি কিছুক্ষণ বসা, জলের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা
অনন্ত ব্যস্ততা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া
কয়েক পলক ছুটি
যেন স্বপ্নের মধ্যে নিঃসঙ্গতার আহ্বান
আসছেন, আসছেন, সকলেই আসছেন একে একে
সদ্য ঘুম ভাঙার মতন বিস্ময় কারুর চোখে মুখে
কেউ কেউ দর্প এখনো মুছে ফেলতে পারেন নি
কারুর বা ওষ্ঠে অতি বিনয়ের মিথ্যে হাস্য
তাতে কোনো ক্ষতি নেই
কে না জানে, প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে স্ববিরোধ!
সমস্ত দুনিয়াব্যাপী অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার আজ
সামান্য বিরতি
কামান ও বিমান, বন্দুক ও কন্দুক সাময়িক ভাবে স্তব্ধ
পাতালের গুম গুম ও শূন্যবিহারী ধ্বংস দূতেরা
এক সকাল থেমে থাকবে
আঁকাবাঁকা সীমান্তগুলিতে সংবরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে
মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা মুখ ফেরাবে দেয়ালের দিকে, সময় গুনবে...

হে সমাগত রাজন্যবর্গ, এটা কুরুক্ষেত্র নয়
আপনাদের সম্বর্ধনার জন্য গান-স্যালিউটের ব্যবস্থা করা হয় নি
শুনুন দোয়েল পাখির ডাক

নিঃশব্দে উড়ে গেল এক ঝাঁক ধপধপে বক
এর মধ্যেও একটা সঙ্গীত আছে
কাকচক্ষু এই ভরা নদীর দুকূল ছাপানো জল
স্নেহের মতন স্বচ্ছ, ভালোবাসার মতন গভীর
একটু ঝুঁকে তাকিয়ে দেখুন, এ এক মায়াদর্পণ
এখানে নিজের মুখ দেখা যায় না, অথচ ফুটে উঠছে মুখ
সবকটিই শিশু, টলটলে চোখ, ঝকঝকে হাসি,
মাথা ভর্তি চুল
চিনতে পারছেন না?
যারা শুধু আদেশ দেয়, তারা নিজেদের বাল্যকাল ভুলে যায়
পৃথিবীকে প্রথম দেখার স্মৃতি যারা মনে রাখে না
তারাই ভাঙতে চায় পৃথিবীকে
সেইসব মুখগুলি কি একেবারেই হারিয়ে যায়!

সবাই হাত তুলে বললেন, চিনেছি, চিনেছি, এ তো আমারই
বাচ্চা বয়েসের ফটোগ্রাফ
জলের মধ্যে দুলছে
এ অতি সামান্য ম্যাজিক।
না, ঠিক হয়নি, ভালো করে দেখুন আর একবার
আপনারাও বাল্যকালে সরল ও নিষ্পাপ ছিলেন
তা অস্বীকার করছি না
তবু এই সুন্দর, পবিত্র মুখগুলি কি হুবহু ব্যক্তিগত অতীতের
কোথাও একটুও অমিল চোখে পড়ছে না?
শুধু চোখ দিয়ে নয়, মনটাকে কপালের মাঝখানে এনে দেখুন
খুব কাছাকাছি, তবু অন্য রকম
ভুরুর ভঙ্গি, ওষ্ঠের রেখা, চিবুকের ডৌল
ছবি বদল হয়নি, কোথাও পুরোনো রং নেই
এইসব মুখের ছবি তোলার মতন আজও
আবিষ্কৃত হয়নি কোনো ক্যামেরা
অনাদিকালের এই নদীই শুধু এদের দেখাতে পারে
এরা অনাগতকালের
আপনাদেরই ভবিষ্যৎ প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা হাসিমুখে চেয়ে আছে
ঐ চোখগুলির দিকে তাকিয়ে একবার শুধু ভাবুন
এদের জন্য কী রকম পৃথিবী রেখে যাবেন আপনারা?

রাশিয়ান রুলেৎ

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ ফিরতেই দেখি সে নেই
তার শরীরের ঘ্রাণ, নিশ্বাস তরঙ্গ—এখনো যেন মিলিয়ে যায়নি
তার পায়ের আওয়াজের রেশ, শেষ কথাটি অসমাপ্ত ব্যঞ্জনা
কাঁপছে বাতাসে।

এরকম আচমকা চলে যাওয়ার কোন মানে হয়?
কথা ছিল
আমরা কয়েকজন বন্ধু খুব নিরালা নদীর প্রান্তে কাছাকাছি বসে
হাসতে হাসতে খেলে নেবো রাশিয়ান রুলেৎ
বিদায় শব্দটি কেউ উচ্চারণ করবে না।
হালকা কুয়াশায় ঢাকা নিসর্গ ও দশদিক সাক্ষী থাকবে
ছুটে আসবে ভ্রমণসঙ্গীরা, নর্ম সহচরীদের মতো উড়বে প্রজাপতি...

কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙ্গে, নদীতে পৌঁছনোর খানিকটা আগেই
এমন এক অচেনা শূন্যতা এসে দাঁড়ালো পিছনে, আর কেউ নেই
দূরে একটা বারুদ শব্দ, একটি পাখির ডানা ঝাপটানি
কেউ একজন আমায় খেলায় নিল না।

দেখা হলো না

পথটা যেখানে সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠেছে
সেখানে একটা ঝুমঝুমির মতন এলাচ রঙের
ভাঙা বাড়ি
শুধু একটি মাত্র ঝুলন্ত অলিন্দে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে
উড়ন্ত পরীর মতো এক মূর্তি
পাথর না নারী, পাথর না নারী?

দেখা হলো না, ছুটন্ত ট্রেন ভূমিকম্পের মতো শব্দ নিয়ে
ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে
পাথর না নারী? পাথর না নারী? দেখা হলো না
বাল্য প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাসের মতন অন্ধকার বাতাস
দেয়ালে ফোঁটা ফোঁটা জল...

সমুদ্রের এপারে ওপারে

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?
দরজা খোলো
জানলা খোলো
দু'হাত তুলে দিক্-বধূদের ডাকো
গুমোট ভেঙে বান এসেছে,
চন্দনের গন্ধবহ বাতাস
সব কলরব থামিয়ে দিল কোন্ মন্ত্র, কোন্ মায়াবী স্বর
ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি, ভার্জিল না কালিদাসের শোক!

সমুদ্রের এপারে আর ওপারে আজ
হাত বাড়ানো সেতু
হাসতে হাসতে ঘরে ফিরছে দুই বন্ধু, পরমাণু ও মানুষ
বসন্তের বার্তা এলো:
বসুন্ধরা মুক্ত রক্ত লেখা
একলা তুই বসে আছিস এখনও মুখ ঝুলকালিতে মাখা?
বিষাদ-ক্রোধ-হতাশা গুলে পদ্য লিখিস
লজ্জা নেই তোর?

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?

রাজসভায় মাধবী
(একটি সংলাপ কাব্য)

[গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের রাজসভা। রাজার দু'পাশে বসে আছে কয়েকজন মন্ত্রী ও কবি। এঁদের মধ্যে আছেন রাজার বাল্যসুহৃদ ও প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র, প্রবীণ মন্ত্রী উমাপতিধর, রাজগুরু গোবর্ধন আচার্য এবং তিন সভাকবি: জয়দেব, শরণ ও ধোয়ী। রাজকার্যের বদলে এখন সভায় কাব্যচর্চা চলেছে।]

লক্ষ্মণসেন : ভ্রমর, ভ্রমর! কেন মনে হয় মানুষের চেয়ে
ভ্রমরেরা বেশি সুখী! বসন্ত পবনে যত কাব্যের ভ্রমর
আপনারা ভাসিয়ে দেন তারা সব আনন্দের মণি,
অতৃপ্ত মানুষ তবে ভ্রমরের নামে দেয় প্রাণের উপমা

ধোয়ী : অতৃপ্ত মানুষ! এই সাগর মেখলা পুণ্যভূমি—

বীরশ্রেষ্ঠ, প্রজাপূজ্য, দানশৌণ্ড রাজা যার অধীশ্বর
সে রাজ্যে তো অসুখী বা অতৃপ্ত মানুষ কেউ নেই!

শরণ : একটি ভ্রূক্ষেপে আপনি জয় করেছেন গৌড়লক্ষ্মী, আর
নিতান্ত খেলার ছলে বিজিত কলিঙ্গদেশ, শুধু
অঙ্গুলি হেলনে ক্লিষ্ট চেদীরাজ, কাশী ও মগধ
আপনার পদসেবী, অভিমান-হৃত কামরূপ
নিদাঘ সূর্যের মতো আপনার তেজে দগ্ধ অবাধ্য, দুর্জন
মহারাজ, আপনার মুখে কেন অতৃপ্তির কথা?

জয়দেব : অতৃপ্তি তো রাজরোগ। এরই জন্য পররাজ্য জয়
স্বয়ং কেলিনায়ক যিনি, তাঁরও কণ্ঠে শোনা যায় রতি
হাহাকার
যে-রাজা জঙ্গমহরি, তিনিও কি নন আরও যশের
ভিখারি
যিনি যাচকের কল্পদ্রুম, হায় নিজের যাচ্ঞা কি তাঁর
কখনো মিটেছে?

[বাইরে কিসের যেন কোলাহল। রাজা স্থির নেত্রে দ্বারের দিকে তাকালেন। হলায়ুধ মিশ্র হাঁক দিয়ে বললেন, দৌবারিক, দেখো তো!]

ধোয়ী : এই স্নিগ্ধ গঙ্গাদেশ, অসংখ্য কুসুম সুবাসিত
মধুলোভী অলিকুল পারিজাত বন ছেড়ে মেঘ হয়ে
আসে
ভূভারতে এরকম শান্তিময় দেশ আর দ্বিতীয় নেই

লক্ষ্মণসেন : আবার ভ্রমর! কবিবর, উপমায়, অলঙ্কারে
এই পতঙ্গটি নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যেন!

দৌবারিক : রাজসন্দর্শন চায় এক গুচ্ছ নারী ও পুরুষ
মনে হয় তারা ক্ষুব্ধ...

ধোয়ী : ক্ষুব্ধ? এই শব্দটি কি সঠিক হলো হে, দৌবারিক?
তারা প্রার্থী হতে পারে, এই রাজ্যে ক্ষুব্ধ কেউ নয়

হলায়ুধ মিশ্র : আসুক দু'জন প্রতিনিধি, যুগ্ম নারী ও পুরুষ
অন্যেরা দূরত্বে থাক...

[সভাস্থলে মাধবী ও কঙ্কের প্রবেশ। মাধবী আলুলায়িত কুন্তলা, স্ফুরিতধরা, একবস্ত্রা। তার চক্ষুদুটি কিছুক্ষণ আগে অশ্রুধৌত হবার কারণে এখন অত্যুজ্জ্বল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এই সদ্য যুবতীটি বিবাহিতা। সঙ্গের লোকটি তার ভাই, সে রক্তাম্বর পরিহিত। পুরুষটি রাজা ও অন্যদের অভিবাদন জানালো, নারীটি রইলো অধোবদনে।]

হলায়ুধ মিশ্র : যা কিছু বলার আছে, সংক্ষেপে বলো

কঙ্ক সসম্মান পুরঃসর নিবেদন এই, মহারাজ,
দক্ষিণ নগরবাসী সার্থবাহ সম্প্রদায় প্রতিভূ আমরা
এসেছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে সুবিচার প্রত্যাশায়
আপনার গুণ গান মনস্বী ও নিঃস্বগণ সমস্বরে গায়
আপনার বাক্য যেন স্বর্ণসম সুদৃঢ়, সুন্দর
ন্যায় ও অন্যায় আছে তুলাদণ্ডে, হে দীনপালক...

রাজা : সুবিচার? কিসের বিচার?

কঙ্ক : বিদ্যুল্লেখার মতো নিষ্কলঙ্ক, তেজস্বিনী, এই যে বালিকা
আমারই সহোদরা, এর দুভার্গ্যের কথা কী করে যে
বলি
ঐ যে সুপ্রাচীন মহামন্ত্রী, তিনি তো জানেন সব

[কঙ্ক রাজসভার এক প্রান্তে উপবিষ্ট প্রবীণ মন্ত্রী উমাপতিধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।]

রাজা : জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উমাপতি, আপনি কি চেনেন এঁদের?

উমাপতি : বিলক্ষণ চিনি, মহারাজ, জলপ্রপাত তাড়িত
অরণ্য প্রাণীর মতো এরা এসেছিল একদিন
অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনায়

রাজা : আপনার কাছে এসেছিল? তবে সেই তো যথেষ্ট
আপনি কি দেননি বিধান?

উমাপতি : দিইনি, পারিনি দিতে। এমনও ঘটনা কিছু ঘটে
বিচারকও বিচারপ্রার্থীর মতো অসহায় হয়

রাজা : ঠিক বোধগম্য যেন হলো না কথাটা। দোষী অথবা
নির্দোষ
বেছে নিতে ভুল হয় আপনার মতো এত প্রাজ্ঞ
মানুষেরও?

উমাপতি : ভুল নয়, মহারাজ, দ্বিধা

রাজা : দ্বিধা?

শরণ : আহা, বিচারপ্রার্থীরা যদি সশরীরে উপস্থিত
ওদের স্বমুখে তবে শোনা যাক সমুদয় কাহিনী বর্ণন

ধোয়ী : ঠিক ঠিক

রাজা : তোমরা নির্ভয়ে বলো, কী বিচার চাও

কঙ্ক : মহারাজ, ভগিনীর দুর্ভাগ্যের কথা এত সজ্জন সমীপে
বর্ণনা করার মতো শব্দশাস্ত্রজ্ঞান নেই, যদিও আমার...
যদিও আমার...
বক্ষ ফেটে যেন এক নাগরূপী মহাক্ষোভ মুক্তি পেতে

		চায়
রাজা	:	শান্ত হও
হলায়ুধ মিশ্র	:	শান্ত হও, নাগরিক, সুস্থির নিশ্বাস নাও আগে
গোবর্ধন আচার্য	:	বরং প্রতিবাদিনী নিজেই বলুক তার কথা
শরণ	:	ঠিক ঠিক
ধোয়ী	:	এই রমণীরই মুখে শোনা যাক কী তার কাহিনী

[মাধবী ধীরে মুখ তুলে তাকালো, কিন্তু তার মুখে কোনো কথা ফুটল না।]

রাজা		শুভমস্তু, হে কল্যাণী, কী জন্য এসেছো, বলো, অসঙ্কোচে বলো।
ধোয়ী	:	রাজার প্রসন্নদৃষ্টি ধন্যা তুমি, বলো
জয়দেব	:	দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম
শরণ	:	উপস্থিত সভাসদ সবাই উদ্‌গ্রীব
গোবর্ধন আচার্য	:	কে তুমি, রমণী, অগ্রে পরিচয় দাও
মাধবী	:	হে রাজন, সমুদয় গুণিজন, আমি এক বণিক দুহিতা সিংহেন্দ্রদত্তের কন্যা, পুস্তপাল অচ্যুতভদ্রের পুত্রবধূ প্রবাসে আছেন স্বামী দীর্ঘকাল
গোবর্ধন আচার্য	:	অচ্যুতভদ্রের পুত্র? বসুশিব? সে তো বহুদিন নিরুদ্দেশ
মাধবী		নিরুদ্দিষ্ট নন, তাঁর সপ্তডিঙা ফেরেনি এখনো অজ্ঞাত সন্ধানী তিনি দূরতর দ্বীপে ভ্রাম্যমাণ নতুন বাণিজ্য বস্তু নিয়ে ফিরবেন
রাজা	:	স্বামী নিরুদ্দেশে, এই নবীন বয়সে তুমি একা
কঙ্ক	:	না, না, মহারাজ, একা নয়, পিত্রালয়ে এবং শ্বশুর কুলে অনেক আত্মীয়বন্ধু আছে আমাদের ভগিনীটি বড় আদরের
ধোয়ী		তোমার ভগ্নীকে নিজ মুখে বলতে দাও
রাজা		তুমি চাও, রাজসৈন্য, রণতরী ছুটে যাক তোমার স্বামীর কুশল সন্ধানে?
মাধবী		সেজন্য আসিনি, মহারাজ আমি ঠিকই জানি তিনি ফিরবেন, কথা দেওয়া আছে।
রাজা	:	তবে?
মাধবী	:	রমণীর অধিকার আছে কি না সসম্মানে জীবন যাপনে এসেছি সে কথা জানতে। এই রাজ্যে নারীর মর্যাদা যদি কেউ কেড়ে নেয়, সেই পাবে রাজ অনুগ্রহ?

রাজা অলীক, অদ্ভুত প্রশ্ন। সনাতন ধর্ম অনুসারে
এ রাজ্য শাসন হয়, যদি কেউ অপর নারীকে
লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে, তপ্ত তৈলে তার দুই চোখ
চির অন্ধকার হবে, এরকমই রয়েছে বিধান।

মাধবী লোলুপ দৃষ্টিতে শুধু নয়, মহারাজ, এক প্রবল পুরুষ
প্রতিদিন নখ আর দন্ত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে চায়
আমার সম্ভ্রম

রাজা : সে কি! কে সে নরাধম? এই রাজ্যে কে আছে এমন

ধোয়ী : এ যে অসম্ভব

উমাপতি : নাম বলো, হে মাধবী, স্পষ্টাক্ষরে, মুক্ত কণ্ঠে বলো

মাধবী : মহারাজ...

রাজা : বলো সে পাপীর নাম, পূর্বাহ্নেই অভয় দিয়েছি

মাধবী : প্রোষিতভর্তৃকা আমি, মহারাজ, তবু নই নিঃস্ব অসহায়
ভাই বন্ধু পরিজন, আছে আরও বহুতর স্নেহের
আড়াল
কাব্য-সঙ্গীতের সুধা ভরে রাখে নিজস্ব সময়
কখনো আকাশ দেখি, দূর বনানীর রেখা চক্ষু টেনে
নেয়
এই সব নিয়ে বেশ সুখে থাকা
একা একা গড়ে তোলা নিজস্ব ভুবন
একি কোনো অপরাধ?
রমণীর একাকিত্বে সুখ ভোগে নেই অধিকার?

উমাপতি যে তোমার নিজস্ব ভুবনখানি মত্তহস্তীসম
বারবার দলে দিয়ে যায় তার পরিচয় দাও

মাধবী নদীতে অবগাহনে সুখ ছিল, এক দর্পী পুরুষের হাত
কেড়েছে নদীর পথ, নদীও আমার দুঃখ জানে
অলিন্দে দিগন্ত রেখা...সেখানেও মূর্তিমান বাধা
আমার সঙ্গীত সাধা প্রতিদিন ভাঙে এক লোভীর
চিৎকারে
এমন কি রাজপথে প্রকাশ্য দিনের মধ্যে বাহু চেপে
ধরে
ক্ষমতান্ধ এক যুবা আমাকে আঁধার দিকে নিয়ে যেতে
চায়

রাজা কে সে নরাধম? তার আয়ু আমি কেড়ে নেবো এক
লহমায়
নাম বলো

মাধবী সকলেরই পরিচিত সেই নাম, শ্রীমান কুমারদত্ত,
তিনি...

রাজা শ্রীমান কুমারদত্ত! অর্থাৎ...অর্থাৎ...

উমাপতি আপনার নিজের শ্যালক, মহারানী বল্লভার প্রিয় ভ্রাতা
সুতরাং মহারাজ, এবার বুঝবেন, আমি সব কিছু জেনে
জনতার সাক্ষ্য নিয়ে, তবু কেন বিচারে হয়েছি অপারগ

রাজা এ যে অবিশ্বাস্য! এ যে নিতান্ত সুদূরতম স্বপ্নেরও
অতীত
বীরশ্রেষ্ঠ, ন্যায়শীল, ধীমান কুমারদত্ত এরকম পাপী?
না না, মন্ত্রী উমাপতি, অবশ্যই কিছু ভ্রান্তি ঘটেছে
কোথাও
কিছুতে কুমার নন, অন্য কেউ, অবয়বে কুমার সদৃশ!

উমাপতি অন্তত পঞ্চাশজন স্বচক্ষে দেখেছে, তারা কুমারকে
চেনে

কঙ্ক : যদি অন্য কেউ হতো, অন্য কোনো কুলাঙ্গার, তবে
নিজ হাতে
এক খড়্গাঘাতে তার মুণ্ড ছিন্ন করে এনে
দিতাম চরণে, মহারাজ

হলায়ুধ মিশ্র : প্রসীদ, প্রসীদ! ওহে সার্থবাহ, বিস্মৃত হয়ো না
রাজার সম্মুখে তুমি কথা বলছো

কঙ্ক : সদ্যোজাত সারণীর মতন পবিত্র এই ভগিনী আমার
সে জানে না কপটতা, অনৃত ভাষণ

জয়দেব হে কমলাননা নারী, হে বরবর্ণিনী, আরও মন খুলে
বলো
তোমার বাক্যের রঙে দীপ্ত এই রাজসভা, এ যেন
সাগরে
দিগন্ত মায়ার আলো, সহসা মরুতে নীপবন
হে সুন্দরী বলো দেখি, কাব্যপ্রিয়, ধীমান, কুমার
সে কি শুধু তস্কর, দস্যুর মতো লোভী?
প্রণয় রহস্য বড় গূঢ়, তার মর্ম শুধু দু'জনায় বোঝে
তোমার মুখের জ্যোৎস্না, ওষ্ঠের অমিয় দেখে
মুনিঋষিরাও
বিচলিত হতে পারে, কুমার তো সামান্য মানুষ!

শরণ : কুমার কি কামবশে তোমার শরীর স্পর্শ করেছে?
অথবা
রচেছে বন্দনা, স্তুতি? সে তো কিছু দোষণীয় নয়

ধোয়ী যেন সশরীর রতিপতি, সুপুরুষ বহু ললনার প্রিয়
ধীমান কুমারদত্ত প্রণয় কলায় সুনিপুণ, তার প্রতি
তোমার এমন ক্রোধ স্বাভাবিক নয়। তবে, সুন্দরী,
তুমি কি
পুর্ব কোনো প্রতিশ্রুত স্মরণ-বেদনা নিয়ে এসেছো
এখানে?

উমাপতি : বাঃ বাঃ চমৎকার? অতি চমৎকার, হে মহান
রাজকবিগণ
সম্মুখে রয়েছে এক কাতর হরিণী, এক দুঃখদগ্ধ নারী
অপমান বিষে যার সর্বাঙ্গে বিষম জ্বালা, পাণ্ডুর কপোল
তার হৃদয়ের হাহাকারে বুঝি কবিদের করুণা জাগে
না?
আপনারা শুনতে চান রসালো প্রণয় গল্প, অথবা নতুন
রচনার
বিন্দু বিন্দু উপাদান খুঁটে খুঁটে নিতে চান বুঝি?

জয়দেব : (স্বগত) আগে রূপ, শরীরের রহস্য কাহিনী, পরে মর্মের
সন্ধান
প্রথমেই মন নিয়ে টানাটানি যে করে সে মূর্খ, কবি
নয়!

রাজা : কে সঠিক অনাচারী, পুনরায় ভেবে বলো নারী
শাস্তির যে যোগ্য তার কিছুতে নিস্তার নেই এই
গৌড়ভূমে

মাধবী : যদি মিথ্যা বলে থাকি...
জিহ্বা যেন শতখণ্ড হয়ে খসে পড়ে
যদি মিথ্যা বলে থাকি...
বাক্ হোক রুদ্ধ, চক্ষে নিবে যাক জ্যোতি
যদি মিথ্যা বলে থাকি...
জননীও ভুলে যাবে এ কন্যার কথা
মহারাজ, শুধুমাত্র রাজ অনুগ্রহ বলে বলী যে পুরুষ
নারীকে লুণ্ঠনযোগ্য মনে করে, সে রয়েছে এ
রাজপ্রাসাদে
দুঃশীল কুমারদত্ত, আর কেউ নয়!

উমাপতি : মহারাজ, দীপ্তিময় এ নারীর প্রতিটি অক্ষর সত্য

[হঠাৎ সভাস্থলে পাটরানী বল্লভার দ্রুত প্রবেশ]

বল্লভা : মিথ্যা! মিথ্যা! এইসব কথা

মিথ্যার কুটিল জাল...

রাজা — এ কী, মহারানী!
এই রাজসভা মধ্যে...না, না, ফিরে যাও
সামান্য এ রাজকার্য দ্রুত সেরে আমি যাবো তোমার সন্নিধে

বল্লভা — সামান্য এ রাজকার্য? চেড়ীর বর্ণনা শুনে এসেছি এখানে
আপনি সরলমতি, ক্ষমাশীল, সে সুযোগে ষড়যন্ত্রীগণ
সর্বনাশ করে দিত আমার আড়ালে!

রাজা : না না, সেরকম কিছু নয়। এ তো দৈনন্দিন বিচারের সভা
কিসের বা ষড়যন্ত্র? মান্যগণ্য সভাসদ আছেন এখানে

বল্লভা : আপনি নীরব হয়ে শুনুন আমার কথা, আমি সব জানি
মহাষড়যন্ত্রী ঐ যে উমাপতিধর মন্ত্রী, আর এ কুলটা
এই দুই কালসর্প...

উমাপতি : আমি ষড়যন্ত্রী? মহারাজ, আচম্বিতে সভাস্থলে
এরকম পরিহাসও রুচিযোগ্য নয়।

বল্লভা : সাধু সাজছেন! ভেবেছেন বুঝি পূর্বকথা কিছু মনে নেই?
আপনি প্রাচীন ঘুঘু, স্বর্গবাসী মহামতি বল্লাল সেনের
আমল থেকেই জানা গেছে আপনার মতি গতি, সে সময়
ছিলেন আমার স্বামী যুবরাজ, দিবানিশি রাজার সম্মুখে
করেননি যুবরাজ-নিন্দা, তাঁকে সিংহাসন বঞ্চিত করার
দেননি কি কুমন্ত্রণা?

উমাপতি : আরে ছি ছি, সব ভুল জেনেছেন, বিপরীত জেনেছেন, রানী,
সে সময় বর্তমান মহারাজ যৌবন চাপল্যে কিছুদিন
ছিলেন বিপথগামী, শস্ত্রে কিংবা শাস্ত্রে ছিল অনাসক্তি ঘোর
যে-কারণে দুরন্ত অশ্বের মুখে বল্গা টেনে এঁটে দিতে হয়
সে জন্যই ওঁর সংযমের জন্য উপদেশ দিয়েছি পিতাকে
সিংহাসন অন্যে পাবে, এরকম কথা আমি কদাচ ভাবিনি!

বল্লভা তখন ভাবেননি, তবে আজ ভাবছেন, তাই এই রমণীকে
কল্পিত কাহিনী দিয়ে, আবেগে সাজিয়ে এনেছেন সভাস্থলে

উমাপতি এ নারীর স্পষ্ট এক অভিযোগ আছে

বল্লভা কুচক্রে বপন করা, স্বার্থলোভী শয়তানের মস্তিষ্ক প্রসূত সে সব রটনা

উমাপতি শত শত নাগরিক সাক্ষ্য দেবে!

বল্লভা প্রজা-বিদ্রোহের হীন, কুটিল চক্রান্ত! সব জানা হয়ে গেছে
এ জগতে অর্থবশ কে নয়? অর্থের লোভে মিথ্যা সাক্ষী কত!
আর এই পাপীয়সী, রঙ্গময়ী বারনারী, সর্বাঙ্গে নরক
মিথ্যা হাসি কান্না যার নিত্যসঙ্গী, মিথ্যা অঙ্গভঙ্গি অস্ত্র যার
তার কথা শুনে কেউ বিচলিত হয় যদি

কঙ্ক : সাবধান! সাবিত্রীর মতো পুণ্যশীলা
সীতাসমা সাধ্বী এই ভগিনী আমার
তার নামে যদি কেউ অপবাদ দেয়, তবে তিনি যেই হোন, আমি তাঁকে

হলায়ুধ : মূঢ়, দূরে সরে যাও, রাজেন্দ্রাণী কথা বলছেন

রাজা : রানী, এইখানে এসে বসো, অপর পক্ষের কথা কিছু শুনি

বল্লভা : পরন্তপ, এই সব কটুকথা শোনাও বিষম ভুল, পাপ
এই দেহ পসারিনী কী কথা জানাতে চায় তাও আমি জানি

মাধবী : সামান্য বণিকবধূ আমি, মহারানী, অতি গুণবান স্বামী পেয়েছি অনেক ভাগ্যে...

বল্লভা চুপ চুপ! শুধু কি বণিকবধূ, বারাঙ্গনা, বারবধূ তুই

মাধবী আমার স্বামীর মতো এ জীবনে আর অন্য পুরুষ দেখিনি

বল্লভা তোর নষ্ট স্বভাবের জন্য তোর স্বামী দুঃখে নিরুদ্দেশে গেছে
পুরুষ-শিকারি তুই, ভেবেছিস ফাঁদ পেতে, ছলাকলা দিয়ে
আমার ভাইকে পাবি? তবে শোন, শত শত অনূঢ়া রূপসী

কুমারদত্তের শুধু ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ব্যগ্র হয়ে আছে
তুই কে রে, পদনখধূলি!

মাধবী : আপনি যা বললেন, তাতে কোনো সত্য নেই

বল্লভা : সত্য, সত্য, আমি যা বলেছি তা-ই ধ্রুব সত্য, এই শেষ কথা

মাধবী : শুধু বুঝি রানীদেরই সত্যে আছে পূর্ণ অধিকার?

বল্লভা : কাম-পূতি গন্ধ-মাখা, বন্দর-উচ্ছিষ্ট ভোজী, দূর হ! দূর হ!

রাজা : হুঁ, এবার বোঝা গেল। ছলাকলা পটীয়সী এই ধুরন্ধরী
কুমারদত্তের নামে কলঙ্ক লেপন করে আমারই সুনাম
নষ্ট করতে চেয়েছিল, শাস্তি এরই প্রাপ্য। তবু এবারের মতো
ক্ষমা করা গেল!
যাও নারী, গৃহে যাও, সুসংবৃত হও!

গোবর্ধন আচার্য : কেমন বিচার হলো? সাক্ষ্য প্রমাণাদি কিছু দেখাই হলো না

হলায়ুধ মিশ্র : চুপ! রাজারানী কথা বলছেন, অন্য কারো অধিকার নেই

মাধবী : মহারানী, আমার প্রণম্যা আপনি, শুধু এই জিজ্ঞাসা আমার
নারী হয়ে নারীত্বকে ধুলোয় লুটোতে দেখে কখনো আপনার
হয় না একটুও খেদ?
নারী নির্যাতনে যদি নারীর ভূমিকা এত নির্মম, নির্দয়
হয়, তবে প্রতিকার চেয়ে আর কার কাছে যাবো?
ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ আপনি, তবু তো আমারই মতো
আপনিও নারী

বল্লভা : ফের তোর ছোট মুখে বড় কথা? দূর হ! দূর হ!

মাধবী : যাবো, তবে তার আগে আরও একটি সরল প্রশ্নের
সদুত্তর পেতে চাই, যে-দেশের রাজকন্যা ছিলেন একদা
সে দেশে কি বহু বল্লভার ছড়াছড়ি? সে দেশের রমণীরা
পুরুষের সামান্য ইঙ্গিত পেলে শরীরের সব খুলে দেয়?
পরস্ত্রী-বারস্ত্রী কোনো ভেদ নেই, সেই দেশে নারী ও

পুরুষ
সকলেই স্বেচ্ছাচারী? আপনিও কি যেথা সেথা শয্যা
পেতেছেন
পুরুষের অহঙ্কার তুষ্ট করবার অভিলাষে?

বল্লভা : ওরে পিশাচিনী, তোর এত স্পর্ধা? তবে এই মুহূর্তেই
শমন সদনে যাবি তুই

[বল্লভা মাধবীর চুলের গুচ্ছ মুঠিতে ধরে তাকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করতে লাগলো। ক্রুদ্ধ কঙ্ককে সরিয়ে নিয়ে গেল প্রহরীরা। গোবর্ধন আচার্য একটি খন্তা তুলে মারতে গেলেন মহারানীকে, তাঁকে বাধা দিল হলায়ুধ মিশ্র। অন্যান্য সভাকবিরা নির্বাক। রাজার চিবুক তাঁর বুকে ঠেকেছে।]

মাধবী : মারো, আরো মারো, দেখি তুমি হিংস্রতায়
কত দূর যেতে পারো

বল্লভা : আজ তোর শেষ! যদি ইষ্টনাম কিছু থাকে সেই জপ
কর
চেড়ী, চেড়ী
অগ্নি নিয়ে আয় এই বেশ্যাটাকে জীয়ন্তে
পোড়াবো

মাধবী : যদি না পোড়াও
আমি প্রায়োপবেশনে প্রাণ বিসর্জন দেবো
এই রাজসভা আজ কিছুতে যাবো না ছেড়ে, যদি না
সম্মান ফিরে পাই
এই রাজসভা আজ মৃত্যু গন্ধে ধন্য হয়ে যাবে
যে শরীরে পুরুষের লোভ সেই রক্ত মাংস
পোকা পতঙ্গের খাদ্য হবে
যে সমাজ রমণীর দেহটাই চেনে শুধু, হৃদয় চেনে না
সেখানে বাঁচতেও ঘৃণা হয়! আমি এতকাল ভেবেছি
আমার কত কিছু আছে, এই আকাশের নীল আলো,
নদীর সঙ্গীত
বৃষ্টিস্নাত দিনের সুষমা, অসীম নক্ষত্রলোক, বৃক্ষছায়া...
হঠাৎ বুঝেছি আজ পুরুষের কাম-প্রেম-আদেশ বা
স্তুতি
এর চেয়ে আর কিছু প্রাপ্য নেই নারীর জীবনে!

বল্লভা : প্রতিহারী!
এই প্রগল্‌ভাকে নিয়ে যাও, দূরে নগর প্রান্তের
পরিখায় ছুঁড়ে ফেলে দাও

মাধবী : পরিখায় কেন, পয়ঃপ্রণালীর গর্ভে কিংবা অতল

সাগরে
মৃত্যু যেখানেই হোক, মৃত্যু শুধু মৃত্যু, তার অন্য রূপ নেই
শুনে রাখো শেষ কথা
যে-দেশে নারীরা শুধু খাদ্য আর ভোগ্য, পুরুষের ইচ্ছাদাসী
সে দেশে বাঁচার কোনো সাধ নেই, এই রাজ্য-রাজধানী যাবে
কালগ্রাসে
যে রাজত্বে জননী ও জায়া ভগ্নী, স্বাধীনা নারীর নেই স্থান
সেই রাজা কোনো দিন প্রতিষ্ঠা পাবে না, তার শিরে বজ্রপাত হবে!

গোবর্ধন আচার্য : ছেড়ে দাও, হলায়ুধ, যদি আর এক দণ্ড থাকি
এ পাপ পুরীতে
নিঃশ্বাসের বিষে মরবো, ভ্রাতঃ, ছেড়ে দাও

হলায়ুধ মিশ্র : যাও, নগরীর বাইরে চলে যাও

[এই সময় কুমারদত্তের প্রবেশ। ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে মাধবীর নাম ধরে ডেকে উঠলো]

কুমারদত্ত : মাধবী, মাধবী, কোথা তুমি প্রাণাধিকে

মাধবী : ষোলো কলা পূর্ণ হতে এটুকুই বাকি ছিল, এসো হে কুমার
শরীর চেয়েছো, নাও
সহস্র চোখের সামনে, প্রহরী বেষ্টিত হয়ে, সগৌরবে নাও
তোমার স্পর্শের বিষে সেই মুহূর্তের আগে উড়ে যাবে প্রাণ

কুমারদত্ত শরীর তো নয় শুধু, মাধবী, তোমাকে আমি আরও বেশি কিছু
মনে ভাবি, কল্পনা ঐশ্বর্যময়ী তুমি,
শব্দ-বর্ণ-গন্ধ মেখে সন্ধ্যার নির্জনে
তোমার সঙ্গীত সুধা, তোমার মাধুর্য, সব পেতে চাই

বল্লভা কুমার, এখানে নয়, প্রহরীরা এ দুষ্টাকে শাস্তি দেবে
তুমি চলো বিশ্রামের কক্ষে, হাত ধরো

কুমারদত্ত : এ রমণী রত্নটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবো

বল্লভা : না, না

কুমারদত্ত		কেনই বা না না বলছো? নিতে হবে, পেতে হবে,
আমার বাসনা
প্রত্যাখ্যান পছন্দ করে না
বল্লভা	:	কুমার, আমার সঙ্গে চলো
রাজা	:	দাঁড়াও! বল্লভা, এ কী বিপরীত রীতি, তুমি ভ্রাতাকে
দেখেই
আমাকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছো
কুমারদত্ত	:	দিদি, এই জরদ্‌গবটি আর কতদিন?
বল্লভা	:	চুপ, ওরে চুপ
রাজা	,:	দৌবারিক, দ্বার রুদ্ধ করো
কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধো এই অপরাধ-কর্মী প্রমত্ত যুবাকে
বল্লভা		এ কী কথা, মহারাজ? এ রকম রক্ত চক্ষু, স্বেদময় মুখ
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক নয়, শান্ত হোন! আমি
উপস্থিত
রয়েছি এখানে, তবু কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করার সাহস
কার আছে?
কে এমন দুঃসাহসী...
রাজা	:	আমি! যদি বাধা আসে, তবে নিজ হাতে তরবার
ধারণ করতেই হবে। এই যুবতীর অভিশাপ বাক্য
শুনে
আতঙ্কে কম্পিত বুক। রানী, তুমি, সত্য বটে প্রেয়সী
আমার
তার চেয়ে প্রিয়তর এই দেশ, এই যুদ্ধ দীর্ণ মাতৃভূমি
কোনো ক্রমে ধরে আছি, সহসা এ নির্যাতিত নারীর
ক্রন্দনে
কেঁপে উঠলো সিংহাসন, মনে হলো পায়ের তলায়
চোরাবালি
চতুর্দিকে হাহাস্বর, আকাশে অশুভ ছায়া, প্রলয়-ইঙ্গিত
শুনি যেন অশ্বধ্বনি, ধেয়ে আসে বুঝি মহাকাল...
ওঠো হে মাধবী, তুমি শুধু নারী নও, তুমি বিশ্বের
মানবী
তুমি মাতা-কন্যা-প্রিয়া, উঠে এসো, দুই চক্ষু থেকে
মুছে ফেল অশ্রু ও অনল
ঐ পাপীর শাস্তি আমি নিজে দেবো, আজ ওর বক্ষের
শোণিতে
তোমার ললাটে আমি এঁকে দেবো জয়ের কুঙ্কুম,

দৌবারিক
ওকে নিয়ে এসো—

মাধবী — থাক থাক মহারাজ, রক্তপাতে প্রয়োজন নেই
রক্ত সন্দর্শনে তৃপ্ত হয় যে রমণী, সে কখনো
প্রকৃত মানবী নয়, আমি প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী নই
কুমার তো কেউ নয়, সহস্রের একজন, আমার সমূহ
অভিমান
ছিল আপনার প্রতি, যেখানে বিচার অন্ধ, স্বজন
নির্দোষ
সেই গ্লানি মুক্ত করেছেন, আপনি ধন্য, আর কিছু
প্রার্থনীয় নেই

রাজা — তুমি এই পরস্ব লোভীকে ক্ষমা দিতে চাও?

মাধবী — ওকে দিন বনবাস। কিছুদিন প্রকৃতির সবুজ সেবায়
অন্তর পবিত্র হোক, মুছে যাক চক্ষের কলুষ
যার এই ধরণীর প্রতি প্রেম নেই, সেই মানুষ কখনো
নারীর প্রেমিক হতে পারে?

উমাপতি : স্বস্তি, স্বস্তি! হৃদয়বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে করুণা
হে মাধবী, তুমি তা জেনেছো

সমবেত স্বর : শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি!

পাগলে পাগলে খেলা

ওরে ও — কুসুম বনের সাপ, একটু
আন্‌বাগানে যা

ওরে ও — খেয়া নৌকোর মাঝি, এখন
নোঙর ফেলে ঘুমো

আকাশে — হঠাৎ উঠলো তুফান, কেউ কি
দেখেছে জাদুদণ্ড

এ সময় — বৃষ্টি তুলবে ঢেউ, তবুও
জ্বলবে বড়বানল

এ সময় — অরুণে বরুণে যুদ্ধ, যদিও
বাতাসে প্রেমগন্ধ।

ওরে ও বাঁধা রাস্তার পথিক, তোরা কেউ
এদিকে আসিস না
ওরে ও প্রাসাদপুরীর বন্দি, মন দে
দরজার কারুকার্যে
গায়ে মাখ সোনার রুপোর ধুলো, নিয়ে নে
আরও যত চাস ধুলো
এদিকে মরুভূমে ভূমিকম্প, আঁধারে
উম্মূল খনিগর্ভ
এ তুফান তোরা কেউ দেখবি না, এ শুধু
পাগলে পাগলে খেলা।

বকুল, বকুল, কথা বলো

বকুল গাছের নীচে যার জন্য প্রতীক্ষায়, এক পায়ে দাঁড়ানো এতক্ষণ
সে এলো না
এ রকম প্রায়ই সে আসে না, তার না-আসা মানায়
বকুল গাছটি তো ছিল ব্যগ্র চোখে, ছুঁতে চেয়েছিল হাত
দেখা হলো না তাকেও।

এরকম হয়, নদী দেখতে যাওয়া হলো, নদী নেই
শুয়ে আছে নীল ইতিহাস
অড়হর খেত থেকে উঁকি মারলো শোলার টুপির নীচে
কার নগ্ন মুখ
অলীকও সে হতে পারে, অথবা নিছক এক খয়েরি শিকারি
কোথা থেকে উড়ে এলো চিঠির খসড়ার মতো, পরেও যা লেখা হয়নি
সে রকম পাতা
দুপুর তিনটে দশে ভাঙা ঘাটলার নীচে তীব্র শিস বেজে ওঠে
কেউ কি শুনেছে
পুরোনো প্রবাদ বলে, না শোনাই ভালো
তখন আকাশ ঠিক ততই দুরধিগম্য, যেন শ্বেতকেতুর সারল্য

মাঠ ঘাট, আল জাঙ্গাল, জঙ্গল পেরিয়ে ফের অসমাপ্ত
দিনে ফিরে আসা
বকুল, বকুল, কথা বলো!

দুটি আহ্বান

ঠাণ্ডা ঘরে রিভলভিং চেয়ারে যে ধোপদুরস্ত মানুষটি
বসে আছে
টেবিলের নীচে তার খালি পা
গাঢ় ভুরু, কণ্ঠস্বরে প্রতিষ্ঠার স্ববিরোধ
চশমায় বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্ব, হাতের আঙুলে সিগারেট ধরার
অবহেলা
কেউ জানে না সকাল থেকে তার নিম্ন উদরে ধিকিধিকি ব্যথা
একটা আগুন, যা কিছুই পোড়ায় না, শুধু জ্বলে
একটা অন্যমনস্কতা, যা কোথাও যায় না, মনের চারপাশেই
ঘুর ঘুর করে
সে চোখ তুললে দু'জন আগন্তুক, তখনই সে শুনতে পেল
রাত্রির সমুদ্র-গর্জন!

সেদিন চাঁদ টেনেছিল সমুদ্রকে
সেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে লাফিয়ে উঠেছিল এক
উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঝিনুক
বাতাসে পূর্বপুরুষদের দীর্ঘশ্বাসের রলরোল
আকাশ নেমে আসে খুব কাছাকাছি, কয়েক লহমার জন্য
তখনই একটা বিদ্যুতের হাত, এক ঝলকের তীব্র বাসনা
ছুঁড়ে দিন একটা মালা
ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে দুলতে দুলতে
আসবে কিংবা ফিরে যাবে, একবার গভীরে, একবার তীরের দিকে
কখনো দীপ্ত, কখনো অন্ধকারময়
কখনো কৈশোর স্মৃতি, কখনো সব হারানোর মতন রক্তিম...
বালির ওপরে অন্ধকারে বসে আছে এক বালির মূর্তি
একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই মানুষেরা সব ছাদের নীচে
চলে গেছে
দিগন্ত শুধু, একজনেরই জন্য
সিন্ধু সারসেরা ট্রি ট্রি ডাকছে
প্রেমের চেয়েও তীব্র, মাতৃস্নেহের মতন আদিম একটা টান
জীবন বদলের একটা মুহূর্ত
খিদে-তেষ্টা তুচ্ছ করা এক অধীর অপেক্ষা
সব কিছুই অন্য রকম হয়ে যেতে পারে, অন্য রকম, অন্য রকম
বালির স্তূপ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো বোতাম ভাঙা শার্ট

আর ছেঁড়া চটি পরা, দাড়ি-না কামানো মুখ, একটি তেইশ বছর
সে কি বাল্মীকি না রত্নাকর এখনো
পেছন থেকে ভেসে আসছে কাদের ডাক, কারা তার জামা ধরে
টানছে
সে ছুটে যেতে গেল জলের দিকে
কোনো নারী তার সামনে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালো না
তবু সে শেষ মুহূর্তে ঘুরে গেল অন্য দিকে
সমুদ্রের মালা মিলিয়ে গেল, হাওয়ায় উড়ে এলো একটি
খয়েরি খামের চিঠি...
সেই পাহাড়ের কোনো কৌলিন্য নেই
চূড়ায় নেই মন্দির, সানুদেশে নেই নিসর্গ লোভীদের
ব্যস্ততা
নাম-না-জানা বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু পথ
সেই পথ, সেই পাহাড় এতদিন তাকে ডেকেছিল
এমন ডাক আসে ঘুমের মধ্যে, এমন ডাক আসে আকস্মিক অপমানের
প্রতিশোধের মতন
কেউ বলেছিল কয়লা খনিতে কালো হয়ে এসো
কেউ বলেছিল, স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে ধুলো কুড়িয়ে আনো
কেউ বলেছিল চোখের জল দিয়ে ওষুধ বানাও
ভাঙো অরণ্য, বিষ মেশাও শিশুদের শরীরে
শব্দ ও অক্ষরের মধ্যে বুনে দাও চকচকে রুপোলি লোভ
নারীকে দেবীর আসন দাও, তারপর তার গর্ভপাত করো
বসে থেকো না, দৌড়োও, সবাই দৌড়োচ্ছে, পায়ে পা দিয়ে ফেলে দাও
সামনের জনকে
সেই রকম একদিন হঠাৎ সে নিমন্ত্রণ পেল
সবুজ শাওলায় ঢাকা লোমশ একটি পাথর অপেক্ষা করছে
তার জন্য
ঘোর অপরাহ্ণে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে
পাহাড়ে হেলান দেওয়া এক টিলা
অভিমুখী পথটিতে অনেক দিন কেউ যায় নি, তবু চিনতে
অসুবিধে নেই
দু'পাশের বন তুলসীর ঝাড়ে বাল্য প্রেমের সৌরভ
প্রথম কোনো স্তন স্পর্শের মতন কাঁপছে পৃথিবী
নভোলোকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে নিস্তব্ধতা
সেই পাথরের বেদী, একটি নিঃসঙ্গ শিমুল গাছ তাকে কিছু দেবে
যা অন্য কেউ পায় নি

সে জানে, সে জানে, সে ছুটে যাচ্ছে
তবু যাওয়া হলো না
জুতোর পেরেকে রক্তাক্ত হলো তার পা, সে বসে পড়লো মাটিতে
তখনই সে শুনতে পেল পাতা খেলানো বাঁশির শব্দ
পা ক্ষত বিক্ষত হলে সামনে যাওয়া যায় না, পেছন ফেরা যায়
অনায়াসে
সেই বাঁশির সুরে দুলতে লাগলো তার মাথা
সে কবে পোষা সাপ হয়ে গেছে সে নিজেই জানে না...

চেয়ারটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে, চোখ থেকে চশমা খুলে
সে বললো, এখন সময় নেই, ব্যস্ত আছি, ব্যস্ত আছি
খুব ব্যস্ত...

আত্মজীবনীর খসড়া

বাঁশি বাজানো শিখতে শুরু করেছিলুম উঠতি বয়সে
সবাই বললে, ওরে, ও কম্ম করিস নি
গরিবের ছেলে দিন রাত বাঁশি ফুকলে নির্ঘাৎ টি বি
ত্রিপুরা থেকে কিনে আনা প্রিয় বাঁশিটি দান করে দিলুম এক বন্ধুকে
সে দু’ চারদিন ফুঁ দিতে না দিতেই
মথুরার রাজা হয়ে চলে গেল
আমায় টি বি পোকায় খায় নি, খেয়েছে পঙ্গপাল।

পকেটে যখন ট্রাম-বাস ভাড়ার বিষম টানাটানি
তখন এক শুভানুধ্যায়ী প্রস্তাব দিলে, একটি প্রাক্তন সুন্দরীর
আত্মজীবনী লিখে দিতে পারবি?
সে নাকি এক সময় ছিল বাংলা সিনেমার বিবি, এখন কোনো এক
সাবান ব্যবসায়ীর রাঁঢ়
স্ত্রীলোকটির কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল, কিন্তু পারিশ্রমিক দেবে ভালোই
মন্দ নয়, বলে আমি পা বাড়াতেই মঞ্চ থেকে নেমে এসে
শিশির ভাদুড়ী আমার গালে কষালেন এক থাপ্পড়
আমি রাগের মাথায় ঝটিতি কিছু করে ফেলার আগেই
তিনি নিজেই ঘুরে পড়ে গেলেন মাটিতে, এবং
অক্কা!

এরপর নির্জন রাতে নিজের পৌরুষটি হাতে ধরে বসে থাকা ছাড়া
আর উপায় কী?

তারপর সেই এক দাঙ্গা হাঙ্গামার সাড়া জাগানো বছরে
সামান্য রুখু দাড়ি রেখেছিলুম ও লুঙ্গি পরে ঘুড়ি ওড়াতুম বলে
বেমক্কা আমাকে সন্দেহ করলো মুসলমান বলে হিন্দুপাড়ার বীরপুঙ্গবেরা
তখন নিরীহ মুসলমান ডিমওয়ালা কিংবা শালকরদের
মাথা থেঁৎলে দেবার জন্য বেরিয়েছে অসংখ্য বাঁশ ও
শাবল
ওদিকে অন্য কোনো পাড়ায় ছোটজাতের হিন্দুরাও
কচুকাটা হচ্ছে টপাটপ
তখন একজন আমাকে বললো, পেন্টুল খুলে দেখা তো
শুয়োরের বাচ্চা
আমি প্রকৃত শুয়োরের বাচ্চার মতন উদোম হতেই
তাবৎ পৃথিবী কেঁপে উঠলো জন্তু-জানোয়ারদের পুলক শীৎকারে
বস্তুত আমার ঐ ব্যাপারটির সঙ্গে ষাঁড় না শুয়োরের বেশি মিল,
সে সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত নই!

বন্ধু বলে যাদের জড়িয়ে ধরতে গেছি, তারা পিঠ ফেরাতেই
ঢেলেছে বিষ
সেই বিষে আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, নির্জনতা খুঁজতে গেছি রঙ্গালয়ে
এই তো দেখছি কয়েকটি বহুরূপী এখানে সেখানে লেখা ছাপাবার জন্য
গোপনে উমেদারি করে যায়,
আবার
বাইরে গ্যালারি কাঁপাবার জন্য তুলে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জিগির
কেউ গায়ে জড়িয়েছে সুবিধেবাদী মার্ক্সবাদের নামাবলী, মাথার টিকিতে
জবাফুলের মতন বেঁধে নিয়েছে
লেনিনের নাম
তারপর দুরন্ত সত্তর দশকে চেয়ার ভেঙে সামান্য আহত হয়ে
কমরেড মাও সে-তুঙ আমায় বললেন,
চলো, নদীতে গিয়ে ওসব অতি বিপ্লবীপনা ধুয়ে ফেলি
আমি জলের নামে ডরাই শুনে উনি হেসে বললেন, ভয় কী,
আমি তোমায় সাঁতার শেখাবো
এরকম কথা-না-রাখা যেন ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ডিগবাজি
তিনি নিজেই টুপ করে ডুবে গেলেন বিস্মৃতির গভীরে
আমি এখনও খাবি খাচ্ছি...

সে আসবে, সে আসবে

পশ্চিমের অবনত সন্ধ্যায় এক নদীর কিনারে দাঁড়ালো সে
একজন শতাব্দীর ভ্রাম্যমাণ, ইতিহাসের পথ ভোলা পথিক
তার দু'চোখে প্রতীক্ষা, তার নিশ্বাসে ব্যাকুলতা
ঠিক এইখানে, এই শ্মশানপ্রান্তে শিশুগাছটির নীচে
কেউ একজন আসবে তার জন্য, কথা আছে, সে নিয়ে আসবে মুক্তি

একদিন এইখান থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল তার, যখন এই গাছটির
জায়গায়
সদ্য বীজ থেকে বেরিয়েছিল অঙ্কুর, নদীটি ছিল বর্ষার মতন ঝঙ্কৃত
যখন বাতাস ছিল শিশুর হাসির মতন টাটকা, জ্যোৎস্না ছিল
ভালবাসার মতন
যখন ফসলের ক্ষেতে লাগেনি রক্তের ছিটে, ঘুমের মধ্যে ধাতব শব্দ
যখন এক রাজকুমার অঙ্গে নিয়েছিল গেরুয়া, এক সেনাপতি পদচুম্বন
করেছিল এক ভিখারিণীর

এক কবি দেবমন্দিরের বেদীতে বসিয়েছিল তার হৃদয়েশ্বরীকে
তবু একজন কেউ বলেছিল মানুষের জন্য এই বসুন্ধরা সুন্দরতর হবে
পাহাড়ের গায়ে মেঘের মতন কোথাও আড়ালে রয়ে গেছে মাধুর্য

সে আসবে, সে আসবে, সে আসবে...

যার জন্য সারা জীবন

আরও একটু সামনে যেতে হবে
মাত্র আর একখানাই খাড়া পাহাড়, দুটো পাগলা ঝোরা
এখানে বসিস নি, খুকি, ওঠ, আমি হাত ধরে তুলছি, বেলা যে বেশি নেই
কিংশুকের রেণুর মতো ঝরে পড়ছে আসন্ন সায়াহ্ন
অকস্মাৎ অতি চিকন আলোর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তা
এই দিগন্তে ধুলো আমার খুবই চেনা, সারা অঙ্গে সাত জন্মের ধুলো
সমস্ত অনিত্যতার মধ্যে আমার এই জন্ম দাগ!

পায়ের তলায় কাঁটা, রক্ত বিন্দু?
পায়ের তলায় এই সামান্য আদিম বর্ণ, আঃ কী আনন্দ
এতক্ষণে রমণী হলে, নীরার চেয়েও অধিকতর নারী
মন্দিরের মূর্তি নও, রাত্রি-জাগা শব্দ-খেলা নও
ব্যথায় তোমায় ওষ্ঠ কাঁপে, শিল্প তোমায় অমর হাসি দেয়নি
পায়ের তলায় এই সামান্য আদিম বর্ণ, আঃ কী আনন্দ
আমার দাঁত, আমার জিভ আজ ধন্য হলো!

এসো আবার চড়াই-উৎরাই
কতটা পথ এসছি, কত দুর্নিবার, বাকিটা আর কিছু না
দু'দিকে গাঢ় জঙ্গলের হাতছানি, বাতাস ডাকছে এসো
বসতে পেলেই শুতে চাইবে এমন লোভ মাথায় আর ক্লান্ত মজ্জায়
সুন্দরের সশস্ত্র মোহ, এর আগে কি দেখিনি কক্ষনো?
এখানে বসিস নি, খুকি, ওঠ, আমি হাত ধরে তুলছি, বেলা যে বেশি নেই
আমরা সেই সেখানে যাবো, যেখানে তৃণ সদ্য জেগে উঠছে!

ওদিকে এমনকি ঝড়, নীরা!
আমরা কি আগুন খাইনি এই সেদিন ঘোর পাতালে যাইনি পিকনিকে?
চতুর্দিকে কাড়াকাড়ির খেলা, আমরা কারুক্কে হারাই নি, হার মানিনি
তারের ওপর দিয়ে হাঁটা, সবাই বললো, গেল এবার গেল
শরীর যেন প্রবাসী হাঁস, প্রতিটি দিন ভ্রমণ কৌতুক
মাত্র আর একখানাই খাড়া পাহাড়, দুটো পাগলা ঝোরা
হু হু শব্দে নামছে আকাশ, এখনই নয়, একটু দূরে থাকো!

দ্রিদিম দ্রিম দ্রিদিম দ্রিম ধ্বনি
ধন্যবাদ, আমরা কোনো উৎসবের আমন্ত্রণ আজকে নিচ্ছি না
ঝামরে উঠছে প্রায়ান্ধকার, চূড়ার কাছে সাত ঈগলের ডানা
আমরা আজ সেখানে যাবো, যার জন্য সারা জীবন এত সমস্ত কাণ্ড
শরীর যেন প্রবাসী হাঁস, প্রতিটি দিন ভ্রমণ কৌতুক
চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে, হঠাৎ যদি গড়িয়ে যাই নিম্ন গোলক-ধাঁধায়
আমায় ধরে রাখিস, খুকি, কোমল হাতে অনিঃশেষ মায়া...

বিকেলের বর্ণফেরা

ঘাটের পৈঠায় বসে আছে এক জলকন্যে, এখনো হয়নি ঠিক সন্ধে
নিথর দিঘির পিঠে মেঘের তরল ছায়া, যেন সব কথার নিষেধ
ঈষৎ বাতাসে ওড়ে চুল, ভুরু, ডম্বরু কোমর খাঁজে দু'টি পদ্মপাতা
মুখের ভঙ্গিমা তার নৈঋতে ফেরানো, যেন মুখ তার না দেখাই ভালো
বস্তুত জলের নীচে তার কোনো বাস নেই, কঠিন ভূমিতে কেউ নেই
আকাশেও কিছু নেই, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নে, এ শুধু একাকী বসে থাকা
বিকেলের বর্ণফেরা, চূর্ণ ঝড় ধেয়ে এলে সে কোথাও যাবে না থাকবে না!

মন্ত্র

তোমার এতই ভালো লাগছে গড়বন্দীপুর, এই থিকথিকে কাদা,
পচা কাঁঠালের গন্ধ?
নীল রঙের শাড়িতে কত চোরকাঁটা, যেন অসংখ্য তীরবিদ্ধ তুমি
পা ধোবে এই শুকনো নদীর ঘাটে?
এখানে অনেক দীর্ঘশ্বাস ছিল, সব উড়ে গেল তোমার হাসির শব্দে
এখানে অনেক লুকোনো কান্না ছিল, এখান সেই সব চোখ
তোমাকেই দেখছে
আমাদের এই গড়বন্দীপুরে তুমি, তুমি যেন বিলেত-অ্যামেরিকার চেয়েও
দূরের কোনো স্বর্গের দেবীর মতন
গতবার সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে আগুন লেগেছিল, তুমি সেই প্রতিমার
চেয়েও
সুন্দর গো
এখানে শ্বেত কমল ফোটে না, তোমার পা ফেলার মতন সবুজ ঘাসও নেই
ঐ সাপটা দেখে তুমি ভয় পেও না, ও এমন কিছু না, জলঢোঁড়া
এসো এই বাজ-পড়া গাছটির পাশ দিয়ে
কালভার্টের মাঝখানটা ডেবে গেছে, তাতে কোনো দোষ নেই,
এক হাজার বছর ধরে ওটা এমনই আছে
সামনের এই গোয়ালঘরটি পেরুলেই আধখানা প্রান্তরের ওপাশে দেখবে
সেই গড়
যেখানে স্থাপত্য নেই, ইতিহাস নেই, আছে শুধু ভগ্ন স্মৃতিকথা
একটু সাবধানে এসো

বাবলা কাঁটায় তোমার শরীর যেন ছড়ে না যায়
পাঁজরা বার করা গোরুদুটিকে তুমি ধন্য করলে তোমার স্নেহদৃষ্টিতে
ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়া কার্তিক সাপুইয়ের ছেলেকে বুকে তুলে
আদর করলে তুমি...

হে দেবী, তুমি কি খরায় জ্বলা মাঠে বৃষ্টি এনে দিতে পারো
নেতিয়ে পড়া ধানের বীজে এনে দিতে পারো দুধ
তোমার স্পর্শে আমগাছগুলো থেকে পালিয়ে যাবে সব পোকা
বিদ্যুৎ চমকের মতন তোমার মুখখানি, তুমি আঁচল উড়িয়ে
গেয়ে উঠলে গান
তোমার খুশির লাবণ্যে থরথর করে কাঁপছে কচি কচি সবুজ পাতা
পানা পুকুরটায় আজই প্রথম ফুটলো একটা লাল শাপলা ফুল
গড়বন্দীপুরে আজ আনন্দের প্লাবন বইছে, তুমি এসেছো, তুমি সৌভাগ্যের
দুহিতা...

হে দেবী, এখান থেকে আবার পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে তো?
মনে আছে সেই মন্ত্র?
যদি ভুলে যাও, গড়বন্দীপুরের গোলক-ধাঁধায় আটকে যাবে তোমার পা
তা হলে তুমিও একদিন হয়ে যাবে সাতটি সন্তানের জননী, দিনের শাকচুন্নী,
হাবার মায়ের মতন।

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

সূচিপত্র

হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ

১

হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম, এবে উন্মোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরুৎবাহন
হে অদৃশ্য, সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভুবন
যে সমুদ্রে ওঠে না তরঙ্গমালা, নিয়ত জাগ্রত
যে স্বপ্নের ভিতরে সহস্রকান্তি দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস
হে প্রিয়, হে বাঙ্ময় নির্মাণ, দেখা দাও, দেখা দাও!

২

চলেছে দিন, দিনের পিঠে দিন, যেমন মরুর অভিযাত্রী
খাচ্ছি দাচ্ছি শুচ্ছি বসছি দুয়োর খুলে ঘূর্ণিমাতন দেখছি
ফুলের অভিঘাতেও হঠাৎ ফুলশয্যায় জ্বলে আগুন ফুল্‌কি
কেউ দু'দিকে কান টানছে, মাথার মধ্যে অন্য মাথা ঘুরছে
সবাই খুব জব্দ করে, চতুর্দিকে জব্দ হচ্ছে ছিনতাই
কে কতটা আয়না ঘেঁষা, তা দিয়েই তো বিস্তৃত সাম্রাজ্য
যেমন অকস্মাৎ সকালে এলো অন্য নামের তারবার্তা
হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে, ঠোঁটে তবু এরল ফ্লিনের হাস্য
অলীক অলীক সবই অলীক, দিনের বেলা কে যে কাকে চিনছে
চলেছে দিন, দিনের পিঠে দিন, যেমন মরুর অভিযাত্রী...

৩

আসুন, বসুন, চা খান
না খাবেন তো উচ্ছন্নে যান
কোন দিকে বাথরুমটা ভাই, এই যে ডান দিকে আলোর বোতাম
জিপ ফাস্‌নার আটকে গেছে রোমে, আমি যদি বেদুইন হতাম!
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তাও যেন ছায়া আসছে পিছুপিছু।
সব দিকেই তো সব কিছু ফক্কা, তবু তো পাওয়া যাবে কিছুমিছু।
পান থেকে আর চুন খসে না, কিন্তু সিগারেটের ছাই ফেললে কার্পেটে
তুমি অমনি আধ-নম্বরী বেঁটে!
কোথায় এসেছো কিছুই জানো না, কেন এসেছো তা জানো?
ম্যাজিক হাভেলি, চতুর্দিকে গুহামুখ সাজানো

কেউ কারুকে দেখছে না, বসেছে হুল্লোড়ের আসর
এখানে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, এখানে তোমার বিবাহ-বাসর
কোনো রকমে রাস্তায় বেরিয়ে যার দিকে খুশি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে
ভিখিরিকে কুড়ি পয়সা পুলিশকে দাও হাঁকিয়ে
এই সব কিছুরই শোধ তোলার আছে একটা দিব্যস্থান
যে খোঁজ পাবার সে ঠিকই জানে, সে সেখানে একলা মাস্তান।

৪

মাঝরাত্তিরের পরেও অনেকটা ঘুরে গেছে ঘড়ির কাঁটা
তবু কেন জেগে উঠলাম?
বাল্য বিবাহের মতন প্রথম প্রহরেই ঘুম এসেছিল
কেউ তো ঘুমকে শাসন করেনি, তবু কেন এই অভ্যুত্থান
ভূতে পাওয়ার মতন কেউ আমাকে টেবিলের সামনে বসায়
খোলায় কবিতার খাতা
কোন্ ভূত, কোন্ ভূত, আমার কাঁধে সিন্ধুবাদ নাবিক
একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমার হাসি পায়
মদন মিত্তিরের দেওয়া পুরনো ডায়েরিটাকে আমি চুম্বন করি
এতগুলি সাদা পাতা, তোমরা পরবর্তী প্রজন্মের দিকে যাও
অগণন ক্রুদ্ধ, সুন্দর, মগ্ন, লাজুক তরুণ-তরুণীরা খেলা করছে সিন্ধুপারে
দূরত্বের আলোছায়া কী মধুর
কলম খোলা, আমি চুপ করে বসে আছি, আঃ কী প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতা
ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি অলঙ্কার ও উপমা হয়ে উড়ছে বাতাসে
বাইরে ঝিমঝিম করছে রাত, আমার নিজস্ব রাত
আমার শৈশব ঘড়ি টিকটিক করে বলছে, জেগে থাকো, জেগে থাকো
যেন আরও কিছু বলে, আমি ভাষা বুঝতে পারি না
আমারই আয়ুর ভাষা এত নৈর্ব্যক্তিক!

৫

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার

দিনের বেলায় তুমি পাথর পথের ধারে, রাত্তিরের রাজা
কিংবা রাত্তিরের রানী, বুকে হাত দিয়ে কেউ বলুক তো
ঠিক ঠিক চিনি
আমি রাত্তিরের দিকে, রাত্তিরের প্রবল আঙ্গিকে

আমার নিজস্ব কিছু পাগলামিরা ভূমি পায়, চাষবাস করে
শরীরেও আসে যায়, যতটুকু খোলা থাকে নিসর্গ পর্দায়
বৃষ্টি খায় আকাশের ছায়া
রুপালি আলোর মতো বৃষ্টি এসে ফিসফিসিয়ে ডাকে
চাঁদ গলা জল আসে, সাতাশ বছর মনে পড়ে
পাহাড় পেরিয়ে আসা সেই রাত, দ্রিমি দ্রিমি মাদলের ধ্বনি
মনে হয়, এই বুঝি অসীমের গীতিনাট্য, কসমিক হারমোনি
জলপ্রপাতের পাশে একা শুয়ে থাকা
নগরে-ব্যারাকে কিংবা পানশালায়। কদাচিৎ কয়েদখানায়
সব কিছু ভালোবাসা, মায়ার আঙুল ছোঁয়া ভালোবাসাময়
প্রতিটি দিনান্ত, আমি চেয়েছি নারীর কাছে দয়া
মনে আছে, দয়া নয়, দিয়েছিলে অশ্বক্ষুরধ্বনি
তোমার সুষমা তুমি কিছুই জানো না। তুমি সবকিছু জানো
রাত্রিকে বাজাও তুমি, সামান্য ও ভুরুভঙ্গে বয়ে যায় শিউলির গন্ধমাখা
নদী
অনন্তের তরীখানি থেমে যায় এই কিনারায়
এরই মধ্যে যদি ঘুম আসে
এরই মধ্যে হাতের আঙুল যদি ঘুমে ছুঁয়ে দেয়

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার...

৬

‘কাল রাতের বেলায় গান এলো মোর মনে’
তখন আপনি ছিলেন আমার সঙ্গে, সবগুলি গুনগুন সঙ্গীতের স্রষ্টা
পূজা থেকে বিরহ, প্রকৃতি থেকে আরও দুঃখভরা গান
এ দুঃখ আমার নয়, যিনি লিখেছেন, তিনিও কি এত দুঃখী
কিংবা প্রত্যেক কবির মতন তিনিও বৈপরীত্যের বরপুত্র, সব প্রশ্নের
উত্তর ঘুলিয়ে দেবার সম্রাট?

জীবন চরিতে তাঁকে সত্যিই খোঁজা যায় না
কাল রাতের বেলায় এত গান, সর্বাঙ্গ জড়ানো গান
সেইসব সুখের মীড় ছবির রঙের মতো গড়িয়ে যায়, আয়তনে মেশে
যেন মাতিস্-এর আঁকা গান, ঝর্নায় অনেকক্ষণ ধারাস্নান
চোখ জড়িয়ে আসে
তারপর এক ঝলক স্বপ্ন দেখি আলখাল্লা পরিহিত তাঁকে

এ মূর্তি প্রভাত মুখুজ্যের গড়া নয়, বইয়ের র‍্যাকের পাশে ঠেস দিয়ে
থুতনিতে আঙুল, বড় ব্যাকুল ও কৌতূহলী, খুবই মহান ও সামান্য
আমার কোনো প্রশ্ন মনে আসে না
কান্নায় আমার গলা বুজে যায়, আমি ফুঁপিয়ে উঠি
একটু পরেই দেখি ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর
বাইরে প্যাঁচার ডাক শিহরিত রাত, থমথমে পৃথিবী
কুয়াশার মতন ছড়িয়ে পড়ে আমার বিস্ময়
রবীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ আমার কান্না এলো কেন, আমারও
কান্না জমে ছিল?
আঃ, বেঁচে থাকা এত আনন্দের!

৭

উনুন নিবে গেছে, ঘুমিয়ে আছে ওরা, ঘুমো
উদরে থাক খিদে, কপালে দেবো আমি চুমো
সারা গা ধুলো মাখা, শিশুরা শুয়ে আছে চাঁদে
তারার কুচি মাখা জড়িয়ে মড়িয়ে আহ্লাদে
আতুর, বিরহীরা, লক্ষ্মীছাড়া যত যারা
অকূল পাথারের জাহাজে ভাসে দিশেহারা
দুখিনী জননীটি ঘুমিয়ে খুকি হয়ে আছে
এখন বসুমতী রেখেছে তাকে খুব কাছে
ঘুমোও ষড়রিপু, ঘুমোও অবিচার, ক্রোধ
আমার জেগে থাকা দিনের সব কিছু শোধ।

৮

হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম, এবে উন্মোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরুৎ বাহন
হে অদৃশ্য, সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভুবন
দেখো কত একা আছি, বাতিস্তম্ভে জাগ্রত প্রহরী
নেই আভরণ, নেই না-পাওয়ার কোনো অভিমান
হে প্রিয়, হে বাঙ্ময় নির্মাণ, দেখা দাও, দেখা দাও!

যৎসামান্য

ওগো পরজন্ম, ওগো প্রিয় দিবাস্বপ্ন, পরম মধুর
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যে, তাই তুমি এমন সুন্দর?

*

উপমাবাহুল্যে তুমি নষ্ট হলে, কবিদেরও করোনি সংযত
ওগো চাঁদ, আজ তুমি এত চেনা, প্রান্তরের একা
পোড়ো বাড়িটার মতো!

*

এর ঈশ্বর মাটি পাথরের পুতুল এবং ওর ঈশ্বর নিরাকার
ক্ষুধা নেই, নেই তৃষ্ণা তবুও কোন্ জিভ দিয়ে
রক্ত চাটছে মানুষের?

*

গোলাপ, চম্পক, যূথী...মানুষ করেছে কত ফুলের বন্দনা
ফুলেরা জানে না কিছু, একতরফা ভালোবাসা তবুও মন্দ না!

*

জামরুল গাছের নীচে যে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিভেজা ক্ষীণ-চাঁদ নাভি
শাড়িতে অজস্র যুঁই, সে-ই তো রচনা করে কবিতাটি,
আমি কেউ নয়!

*

ওদের যাদের খিদের অসুখ, ওরা তবুও হাসে এবং গান গায়
হৃষ্টপুষ্ট কুম্ভীরেরা দুপুরবেলা শুধুই কাঁদে, পরের দুঃখে
ভেজায় এত কাগজ!

*

লুকিয়ে রেখো না কোনো গোপন সিন্দুকে কিংবা লিখো না
দলিলে
না দিলে থাকে না কিছু, ভালোবাসা ডুবে যায় স্বখাত সলিলে!

নির্মাণ খেলা

'তালগাছের ডগায় শিরশির করছে মেঘলা বাতাস'
না ঠিক হলো না
চোখের সামনে একটা তালগাছ, আমি বারান্দায় বেতের চেয়ারে

বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ
'ডগায়' না 'মাথায়'? 'শিরশির' না 'ঝিরঝির'
'তালগাছের মাথার ঝিরঝির করছে সমুদ্র-বাতাস'
না, ঠিক হলো না
সমুদ্রের বাতাস কখনো ঝিরঝির করে না
'তালগাছের শিখরে শোঁ শোঁ করছে সমুদ্র-বাতাস'
অনেকগুলি স-ধ্বনি, বেশি বাড়াবাড়ি
গদ্যের বদলে ছন্দেও ফেলা যেতে পারে
'তালগাছটার শিখরে দুলছে অমৌসুমী সমুদ্রের হাওয়া'
কলম নেই, খাতা নেই, হাতে কফির কাপ
পায়ের কাছে পড়ে আছে খবরের কাগজ
প্রথম পৃষ্ঠায় রক্তের ছড়াছড়ি
'দেবদারু গাছটাকে ঝাঁকাচ্ছে ঝড়, যেন সে কাঁপছে
কুঠারের ভয়ে'
তালগাছ কী করে হয়ে গেল দেবদারু?
সমুদ্রের হু হু হাওয়া কখন হয়ে উঠলো ঝঞ্ঝা।
আমি চেয়ে আছি প্রান্তরের দিকে, সরে গেছে মেঘ
এক অলীক বিভায় বারবার বদলে যাচ্ছে রূপ
মাথা-ভারী একলা তালগাছ মুহূর্তের জন্য সর্বাঙ্গ সুন্দর দেবদারু
কয়েকটা ভুলো-মনা পাখি পাতা ছুঁয়েই উড়ে গেল
ভয়ার্ত ধ্বনি রেখে
সেই ধ্বনির মধ্যে ঝড়ের আভাস
এমনই সূচ-বেঁধা, যেন সমুদ্রের নয়, মরুভূমির
রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে অজস্র নির্মম কুঠার
মিথ্যে নয়
'দেবদারু গাছের তুলিতে এখন আকাশে এক
অসমাপ্ত ছবি'

অরফিউস

সন্ধে নিচু হয়ে এসেছে, একটা ছোট্ট স্টিমবোটে আমি
যাচ্ছি ব্ল্যাক সী অভিমুখে
মুছে যাচ্ছে দু' তীর, এই মাত্র নীলজল মহানাগের ফণার

মতো লাফিয়ে উঠলো, হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি চলেছি
মৃত্যুর দেশে।
অন্ধকার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে?
কালো জাদুকর, কেন দেখাচ্ছো ঐ আঙরাখা?
জলের উচ্ছলতার মধ্যে মহাজাগতিক ধ্বনি, আকাশ থেকে জ্বলতে
জ্বলতে নামছে একটি রক্তিম নক্ষত্র
বাতাসে কয়েকটি শতাব্দী খেলা করছে আমার সামনে
কোনো একটি শতাব্দী আমার হাতে তুলে দিল তলোয়ার
আবার অন্য একটি শতাব্দী আমাকে দিল বীণা
অন্ধকার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে?
একটা রুপোর নদীর মতন মিলিয়ে গেল বসফরাস, শেষ সূর্যের
সোনালি শৃঙ্গের মতন হারিয়ে গেল সরু সরু জীবন্ত রেখা
জামার সব কটা বোতাম খোলা, চুল এলোমেলো, একটু ঝুঁকে আমি
ফেলে দিলাম তলোয়ার, রইলো শুধু
বীণা, তাতে আমি সুর লাগাতে জানি না
যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি একটা নিক্ষিপ্ত তীর, আমাকে যেতেই হবে
কালো জাদুকর, আমাকে কি অন্তত একটি গান শিখিয়ে দেবে
যা আমি রেখে যাবো?
কেউ জানবে না, তবু অদৃশ্য মূর্ছনায় সামান্য একটা চিহ্ন!

ভাত

ভাতের থালায় এত কাঁটাঝোঁপ, দরজায় ঝনঝন আওয়াজ
গরম বাতাসে আসছে গ্রাম্য ধুলো
ছোট ছোট শিশুরাও আজকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শিখে গেছে

খবরের কাগজে টাটকা রক্তের গন্ধ
চতুর্দিকে হুড়োহুড়ি পদশব্দ, দেয়ালে এত আঙুলের ছায়া
আঃ, নিরিবিলিতে বসে যে দুটি ভাত খাবো, তারও উপায় নেই।

অসীমের করতলে

হে উদ্ভিন্ন চিৎকমল, শান্ত হও
এত ঝড়ের ঝাপট, এত ধুলোবালি, শান্ত হও
এত শব্দ, অক্ষরের কোলাহল, পরস্পর বিরোধী বাক্যের
ঘনঘটা, তুলোর বীজের ওড়াউড়ি, শান্ত হও!

ভাতের থালায় পাতলা ছবি, কুমারীর মুখে
ম্লান আভা, দু'একটা রাস্তায় ওড়ে অসুখের রেণু
ফিরে এসো
নদীর স্খলিত যাত্রা, চৈত্রের দুপুরে একাকিনী
দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে দেয়, ভেঙে পড়ে সেতু
ফিরে এসো
গ্রামের শ্মশানে জাগে গ্রাম, ধান ক্ষেতে
রক্তের উৎসব, ফিরে এসো
চোখের আগুনে জ্বলে হঠাৎ আতশ বাজি
আধা মফঃস্বলে, ফিরে এসো
উৎস ভুলে গেছে ট্রেন, পাগলের মতো ছোটাছুটি
করে এক পাহাড় কিনারে, ফিরে এসো
যে-গাছতলায় বসে দরবেশটি গান গাইতো, গাছটিও নেই
রোদ্দুর একদা ছিল হিরণ্ময়, আজ শুধু ঝাঁঝ
ফিরে এসো।

হে উদ্ভিন্ন চিৎকমল, শান্ত হও
মূলাধারে ফিরে এসো, নিজস্ব মেধায় ফিরে এসো
দুটি চোখে ফিরে এসো, হাতের আঙুলে
ফিরে এসো
বিস্মৃতি আকীর্ণ পথে ঝুঁকে পড়ে তুলে নাও
একটি একটি কাঁটা
অসীমের করতলে সামান্যকে উপহার দাও!

সমস্ত শরীরময়

পাহাড় বিভঙ্গ করে উড়ে যায় মিহি জলকণা
ঘুমন্ত ধাতুর গায়ে অহেতুক মানুষের পা
স্বপ্নের ভিতরে আঁচ, বস্তুত আগুনই স্বপ্ন দেখে
তুষার-সম্ভব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য
যার জন্য
যার জন্য
তুষার-সম্ভব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য জেগে আছে
কয়েকটি অসীম
কয়েকটি অসীম
সে এখনো গঞ্জে-গ্রামে-নদী-হ্রদে শরীরে শরীর
মাটির শরীর
কর্পূর শরীর
সমস্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে...
সমস্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে...
সমস্ত শরীরময়...

শেষ কথা

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
হাততালি দাও
গাঁদা ফুলের মালা আনো, বাচ্চা লোগ
পুকারো ইনকিলাব
ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ভাই কোথায়?
ডুবো-জাহাজে কাজ নিয়েছে
সে রয়েছে
এখন গভীর জলে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও
মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং, হ্যালো
ঘোড়া ছুটিয়ে বৃষ্টি আসছে
এলো!

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে
আগুন-রঙা মাটির মধ্যে
হাঁ মেলেছে
কয়েক লাখ পিঁপড়ে
পিঁপড়ে-মা ও পিঁপড়ে-বাবা সামলে রাখো
নিখুঁত রানীকুঠি
ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ছেলে কোথায়?
গোল করো না
সবাই জানে সে রয়েছে
চিনির কারখানায়
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও,
মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং, হ্যালো
রাত নামেনি, আকাশ তবু কালো।

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে,
ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
ক্যাংলা পানা, রুখু দাড়ি, বাজার খুঁটে খাওয়া
দাঁত মাজে না, চোখে পিচুটি, হ্রস্বি দীর্ঘি দূরের কথা
ক-অক্ষর গোমাংস
কুঁজিয়ে গেছে, চক্ষু বোজা
হাঁটছে দ্যাখো যেন বৃদ্ধ ডাঁশ
কেউ চেনে না, কেউ জানে না ও কে
রাত পেরুলে কাঁদবে না কেউ
লক্ষ্মীছাড়ার শোকে!

এক সত্যবাদী কয়েদি
ঐ যাচ্ছে ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে
মাটি ফাটছে, মাটি ফাটছে, মাটির পেটে খিদে
খিদের মধ্যে রংমশাল, চতুর্দিকে
এত বিশাল
জমজমাট মেলা
হাওয়ায় উলটে পড়ছে খুঁটি, সবাই মিলে ধরো, ও ভাই
হাত লাগাও, হাত লাগাও
আরও গভীরে খোঁড়ো

ব্যান্ডমাস্টার, তোমার যমজ কোথায়?
অন্ধ নাকি, দেখতে পাও না
সে রয়েছে বারুদ ভর্তি ঘরে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং
হ্যালো
সময় নেই
সময় এসে গেল!

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
নিরেট গাধা, আহাম্মোক, যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা
কাঁক-কাঁকুড় জ্ঞান নেই, ও কী জানে সত্য কোন রঙের সুতো
কোন সুতোয় কী বোনা
হাড়পাঁজরায় লেপটে আছে যাবজ্জীবন মিথ্যে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, কাড়া-নাকাড়া
দামামা-দুন্দুভি
আওয়াজ তোলো পাহাড় চূড়ায়, গলা ফাটাও
গলা ফাটাও আরো
দেরি কিসের, দেরি কিসের, দ্যাখো হঠাৎ উঠবে ঝড়,
দ্যাখো ঈশান কোণে
আসুক ঝড়, আসুক ঝড়, বৃষ্টি হোক, ও লোকটার
শেষ কথাটা কেউ যেন না শোনে!

দাও!

ইচ্ছেটাকে মোমের আলোর মতো
ঝড় বাদলে দশ আঙুলে আড়াল
তোমার কাছে সতত সংযত
ভেতরে ফোঁসে অতি নগ্ন চাঁড়াল!

ঘোর দুপুর, বিকেলে নানা ছলে
সামনে যাই, তবুও দেখা হয় না

কত মানুষ কত না কথা বলে
ওরা গলায় পুষেছে বুঝি ময়না?

দূরত্বের এমন সাজগোজ
শরীর নয় অমরতার সঙ্গী?
কাব্য-গানে ভালোবাসার খোঁজ
অশেষ নয়, শুধুই তার ভঙ্গি!

অহংকারে খুঁটেছি নানা ক্ষত
আগুন মুড়ে হয়েছি দেখ শিষ্ট
যেমন মাথা নোয়ায় পর্বতও...

গরল দাও, দিও না উচ্ছিষ্ট।

সবাই বললো

সবাই বললো, সামনে একটা নিরেট অন্ধ গলি
দাঁড়াও!
ছেঁড়া হীরের মালার মতন ছড়ানো এক ভোর
কে ওখানে কে সেখানে অলীক কথাবার্তা
দাঁড়াও! দাঁড়াও!
ডাইনে যাও, বাঁয়ে ফেরো, দেয়াল দেখে ফেরো
কুড়িয়ে নাও, যা খুশি পাও, টুকরোটাকরা ঠিকানা
দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও!

হঠাৎ কয়েক শতাব্দীর এক পায়ে থমকানো
একটি বোবা মূর্তি বললো চোখের সামনে সবাই
ঘুরছে
পোকায় খাওয়া কাগজপত্র, সাত পাগলের খেয়াল
ইতিহাসের নামে বিকোয়, পাঁজরা খোলা দেহ
ঘুরছে শুধু ঘুরছে
বাচ্চা ছেলের আঁকা একটা ছবির মতন রঙিন
বাস্তবতা, তালপাখার হাওয়ায় কাঁপা জীবন
ঘুরছে, শুধু ঘুরছে

দেয়াল তো নয়, অট্টহাস্য, গলিও নয় অন্ধ
গলির গলি তস্য গলি, সমুদ্রে সব যাবেই
দাঁড়াও! দাঁড়াও! দাঁড়াও!
চর্কি হয়ে ঘুরবে তুমি, তবু বলবে, দাঁড়াও
পা শূন্যে দু'হাত বাঁধা, তবু বলবে দাঁড়াও
ভাঙ্গা গলায় কান্না তুলে সবাই বলবে, দাঁড়াও!

তবু তোর নামে

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা!
ওরে ও ডাহুকী
ভিজে সন্ধ্যায় কেন ডাকাডাকি
সুবাতাস মুছে আকাশ ঢেকেছে কালবৈশাখী
ওরে ও অমূল
তরুর তলায় ভ্রষ্ট বকুল
কে গাঁথবে মালা আঙুল বিবশ, প্রাণ সঙ্কুল
আগুন লেগেছে
নদীর কিনারে ঘন কাশবনে
রূপের বিভায় সংহার এসে হানা দেয় মনে!

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা
জলতরঙ্গে
ভয় সঙ্গীত, বন্যার শোক
শ্রবণ বধির আবছায়াময় রঙিন দ্যুলোক
মরু সংসারে
রং ও রেখায় কুটিল দ্বন্দ্ব
তবু তোর নামে আমরা এখনো মেলাই ছন্দ!

আর কিছু না

চোখের সামনে এত আঠা, গেল কোথায় একটা ফর্সা পা
ঈর্ষা জ্বলে বুকের মধ্যে, চোখ ঢেকে যায়, পা দেখি না
একটা ফর্সা পা
সেই বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল, তার ওপরে একটিবার চুমু
আর কিছু না। আর কিছু না। অমরত্ব খাটের নীচে লুকোয়!
কখনো দোলে, বিশ্ব দোলে, ঠোঁটের সামনে সমুদ্রের ঢেউ
মাথার চুলে নরম হাত গভীরে টানে, আরও গভীর, গভীর
অন্ধকারে আয়না যেন, বিশ্বরূপ, তার ভেতরে এমন ঝড় বাদল
আমাকে তবু যেতেই হবে, যেতেই হবে, গুহার মধ্যে একলা অভিযানে
নশ্বরতার এমন রূপ, হীরক দ্যুতি, চোখ ধাঁধানো রূপ
ফুল ফোটার মতো ক্ষণিক, শরীরময়, জীবনময় এমন ভালোবাসা
আর কিছু না, আর কিছু না, আমার এই আত্মাটুকু নাও!

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে
এই দুপুর, এই সন্ধে, কেউ এলো বৃষ্টি ভিজে শপশপিয়ে
কেউ রোদ্দুর থেকে নিয়ে এলো ভেজা ভুরু, কেউ নিয়ে এলো
শীতকালের উষ্ণতা
প্রচণ্ড পরিপূর্ণতার মধ্যে হঠাৎ এক নিমেষের কঠিন শূন্যতা
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে

সিঁড়ির মুখেই বাধা, ইসমাইলের কাছে ধার
ওপর থেকে একজন সাঁতারের সঙ্গীর মতন বললো, এত দেরি?
একটুকরো হাসি উপহার দিল অপরের প্রেমিকা
একটা ধোঁয়ার সুড়ঙ্গ আমাদের টানছে, তার ওধারেই যৌবনের গন্ধমাখা
বিকেল
মাথায় টগবগ করছে সদ্য-পড়া বই, আমরা
পকেটে হাত দিয়ে খুচরো গুনছি

কেউ চামচে দিয়ে তুলে খাচ্ছে বিনা পয়সার চিনি
দুনিয়ার কত বাচ্চা এখনো দুধ খেতে পায় না, তাই তিন কাপ ইনফিউশান,
দুটো ফল্‌স
সমাজ বদলের দুরন্ত স্বপ্ন সব কিছুতেই স্বাদ এনে দেয়
একলা দূরে বসে যে মাট্‌ন ওমলেটের অর্ডার দেয়,
সে জাহান্নামে যাবে
নতুন কাব্যগ্রন্থের আঠার ঘ্রাণ, হসন্তের মাত্রা নিয়ে তুমুল বিতর্ক
আঙুলে জলের রেখায় আঁকা হচ্ছে ছবি, যা কোনদিন মুছবে না
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে...।

বীজমন্ত্র

খাবি তো খা, খা! আর না খাবি তো
মরণ ঘুম ঘুমো! তোর মাথায়
চুমো দিয়ে এক্ষুনি চাঁদ নামবে নরকে, ওঃ সেখানে
রোজ রোজ কত যে মিথ্যে ভোজ সভা হয়,
তুই কিচ্ছু জানলি না রে বোকা!

লোক না পোক, লোক না পোক, বিশ্ব-সংসারে
তুই একা! যা পাবি খুঁটে খাবি
দেখার কিছু নেই, পেছনে ফিরলেই সব আড়াল
তুই জন্ম-চাঁড়াল, তোর লজ্জা কী, তোর
বীজমন্ত্র হলো বাঁচা!
তোর বীজমন্ত্র হলো বাঁচা!
তোর বীজমন্ত্র...

অদৃশ্য কুসুম

তুমিও তোমার বন্ধু, বন্ধুদের তুমি
তোমাকে পেয়েছে এই মৃদু রাত্রি
তোমাকে পেয়েছে বনভূমি
নদীর নির্জনে পাওয়া অন্য তুমি, যেমন সকালে
যেমন আড়ালে
যেরকম স্মৃতি কুয়াশার সূক্ষ্মজালে
প্রত্যেক আলাদা তুমি, আনন্দের ঝর্না তুমি,
বিদ্যুতের লতা
তুমি গভীরতা
তুমিই তো পাথরের ঘুম
আমাদের নীরবতা তোমাকে উৎসর্গ করা অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...

জ্বলতে থাকে আগুন

শুকনো নদীতে ছিল দুঃখ
ভরা বর্ষায় স্রোতের তোলপাড় দেখে
ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
সদ্যস্নাত জারুল গাছটি দেখলে ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
এই মাত্র একটা শালিক ঠোঁটের ঝাপটানিতে
এক টুকরো খড় ফেলে গেল ভালোবাসার মতন
কিছু একটা টানে, সব সময় টানে
ভেতরে-বাইরে শোনা যায় আসছি আসছি শব্দ
একটা বোতাম ছিঁড়ে গড়িয়ে যায় অন্ধকারের দিকে
চশমাটা পড়ে আছে বারান্দায়, সে যেন কাকে দেখছে

একটা ছায়া-ছায়া নির্জন রাস্তা দেখলে
ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
দূর একটি টিলার ওপরে লুপ্ত মন্দিরের মতন মিশে আছে

ভালোবাসা
মনে পড়ে, মনে পড়লেই বুঁজে আসে চোখ
জ্বলতে থাকে আগুন।

মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে

হামবুর্গ শহরের অদূরে অটোবানে সংঘর্ষ হল দুটি গাড়ির
একটি গাড়ি থেকে ছিটকে, লণ্ডভণ্ড হয়ে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ল
উড়িষ্যার একটি নারী
গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে রক্ত, প্রতিমার মতন ভুরু-আঁকা, স্বর্ণময় মুখখানি
ডুবে গেছে ঘাসে
আকাশ তখন বর্ষণ করছে অন্ধকার, মাটিতে তৈলাক্ত আগুন
নিস্পন্দ শরীরে শুধু ছটফট করছে দুটি পা
উড়িষ্যার রমণীটির বিলীয়মান চেতনার রেশ রয়ে গেছে দুটি পায়ে

ময়ূরভঞ্জের এক বাগানে খেলা করত এক কিশোরী
পুকুর থেকে উঠে এসে জল ছাপ দিতে দিতে সে চলে যেত বাথরুমে
ঐ পায়ে
কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতন তার পায়েও সহজাত ঘুঙুর
ভোরে ফুল তুলতে এসে তরুণ সূর্যকে সে দেখাত তার অঙ্গ বিভঙ্গ
তার আঙুলে লীলাকমল, স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে লোধ্র-লাস্য
একদিন সে কোনারকের সুরসুন্দরী হয়ে উঠে এল মঞ্চে
তারপর মঞ্চ তার পৃথিবী
তার পায়ের ছন্দে রচিত হল মন্ত্র
তার কোমরের খাঁজে সাপের মতন জড়িয়ে রইল সুর
তার দুই স্তনের মাঝখানে দোলে ত্রিতাল

উড়িষ্যার সেই মেয়েটি জার্মানির অট্টহাসময় জীবন থেকে
একটি জ্বলন্ত উল্কার মতন ছিটকে পড়ল রাস্তায়
এখনো একটু একটু কাঁপছে তার দুটি পা
সদ্যোজাত বাছুরের থুতনির মতন তার গোড়ালি
কোজাগরী রাতের লক্ষ্মীর মতন তার পদতল
অসংখ্য চুম্বনযোগ্য পদপল্লব যেন রাঙা ভাঙা চাঁদ জড়ানো

সূর্যাস্তের প্রথম ঝলকের মতন তার চোখের রং
তার দুটি পা, তার দুটি পা
মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে এসে...

ওঠো, কন্যা, ওঠো!

প্রতিদ্বন্দ্বীরা

আমি বন্দুক-পিস্তল ছুঁইনি কখনো, কিন্তু কোনো একসময়
নিশ্চয় আমার হাতে একটা তলোয়ার ছিল
মাঝে-মাঝে আমার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, বাঁ হাতটা পেছনে নিয়ে
আমি একটু ঝুঁকে দাঁড়াই
তখন কারুকেই আমার ঠিক যোগ্য প্রতিপক্ষ মনে হয় না।

পুরনো তলোয়ারখানা ঝুলে আছে ভাঙা বাড়িটায়
সিঁড়ির পাশের দেয়ালে
টিকটিকি পেচ্ছাপ করে দেয় তার ওপর
খাপখানা মর্চে পড়ে ঝুরঝুরে
নিলামওয়ালা প্রায়ই এসে ঘুরে যায়, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন আর
রেলিঙের কাস্ট আয়রনের কল্‌কাগুলো দেখে
আমি নিজের ডান হাতখানার দিকে তাকাই
চামড়ার নিষ্কলুষ, আঙুলের গাঁটে গাঁটে ঠিকঠাক জোর আছে
এখনো তুলে ধরতে পারি না এই অসিখানা?
কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোথায় গেল? তারা কি লুকোলো
মিছিলে কিংবা ফাটকাবাজারে
হঠাৎ অন্তরীক্ষে শুনতে পাই একটা ওঁ শব্দ, কিসের যেন প্রতিধ্বনি
বনজঙ্গল ও মরুভূমি আমাকে এক পলকের জন্য দেখায় বিশ্বরূপ
তখনই টের পাই আমি অনেক আগেই হেরে ভূত হয়ে আছি স্বেচ্ছায়
বাতাসের ঝাপটা লাগে মুখে, আঃ, হেরে যাওয়ার মধ্যেও
এত আনন্দ...

নিজের মাথার বালিশ

তুমি দেশের জন্য প্রাণ দিও না, দেশ-টেশ সব বাজে কথা
দ্যাখো, অন্ধকারের জাদুকর কাচপোকার টিপ দিয়ে
মোহর বানাচ্ছে
পায়রাগুলো ইঁদুর হয়ে ঢুকে যাচ্ছে গর্তে
দ্যাখো, রক্তের নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা হাঁস, তার গায়ে
একটা ছিটেও লাগেনি

দ্যাখো, কালকের শেয়াল হঠাৎ আজ কী করে হয়ে গেল বেড়াল
ওদের কোনও দেশ নেই
নারীর গর্ভে যখন ভ্রূণ হয়ে ফুটেছিলে, তখন তোমারও কোনও
দেশ ছিল না

সার সার অন্ধ ফৌজ কুচকাওয়াজ করছে পাহাড় সীমান্তে
ওদের অস্ত্রগুলো কোনও দেশ চেনে না
মৃত্যুও কোনও দেশকে চেনে না
তুমি চোখ মেলেছিলে প্রকৃতির মধ্যে, প্রথম দেখেছিলে আকাশ
তুমি জীবনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, বাজে কাগজের ঝুড়িতে
ফেলে দিও না তোমার প্রাণ!

কত রকম রঙ গুলে লেখা হয়েছে দেশাত্মবোধক গান
সেই সব গানের উন্মাদনায় চাঙ্গা হয়েছে ছুরি-বন্দুকের কারখানা
হাওয়ায় উড়ছে মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের হাসির ফুলকি
যারা লালকেল্লার মাচায় দাঁড়ায়, যারা মনুমেন্টের নীচে
দেশের নামে গরম গরম থুতু ছেটায়
যারা ভবিষ্যতের চোখ ধাঁধানো স্বপ্ন দেখিয়ে তোমার প্রাণ বলি চায়
দ্যাখো, তারা কত যত্নে মুড়ে রাখে নিজেদের জীবন
তাদের সন্তান-সন্ততিরা থাকে দুধে ভাতে, তোমার বংশধরেরা
হা-ঘরে হয় হোক

তুমি রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে তোমারই মতন একজনকে
মারলে কিংবা নিজে মরলে
ওখানে কোনও দেশ নেই
তুমি এক মিছিলে থেকে আর একটা মিছিল ভাঙতে গিয়ে
ছিন্নভিন্ন শরীরে লুটিয়ে পড়লে মাটিতে

ওখানে কোনও দেশ নেই
যারা হাততালি দিয়ে তোমাকে বলছে, যাও, যাও, আগুনে ঝাঁপ দাও
তারা একটু পরেই চলে যাবে ফুলের বাগানে
তুমি প্রাণ দিও না, নিও না, দেশ-টেশ সব বাজে কথা
মৈত্রেয়ীর প্রগল্‌ভতার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কী বলেছিলেন মনে নেই?
সামান্য একটা দেশের জন্য তুমি পৃথিবীকে ছাড়বে কেন
নিজের বিছানার প্রিয় মাথার বালিশটার কথা মনে পড়ে না?

শব্দ ভাঙে

এমন বাড়ি, দেওয়াল ভরা গর্ত
সবাই আছে জেগে
এখানে কাঁপে ইহকালের মর্ত্য
প্রবল ঘূর্ণিবেগে।

সুন্দরের বিসদৃশ আয়না
ঘুরছে হাতে হাতে,
অলিন্দের আড়ালে কেউ যায় না
স্তব্ধ মধ্যরাতে।

ধুলোয় ফুল, আকাশমুখী শিকড়
বাগান এত দীন
জীবন থেকে ভালোবাসার শিখর
জনসভায় লীন।

কথার ঝড়ে কে যে কাকে থামায়
কে কোন নামে ডাকে
শব্দ ভাঙে, শব্দের ঘুম আমায়
টানছে কুম্ভীপাকে।

উদ্যত ছুরি

অনেকখানি খোলা আকাশের নীচে, মেঘলা, একলা
তুমি
শেষ কবে বসেছিলে?
তেমন দিন মনে পড়ে না?
ওগো অমৃতের পুত্র,
তোমার সারা গায়ে ডিজেলের ধোঁয়া
আর কারখানার কালি!
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করেছো কোনোদিন?
করো নি?
নামো নি নদীর জলে?
ওগো আদমের আত্মজ,
তোমার শরীরে এখন ক্লোরিনের গন্ধ
তোমার পোশাক থেকে ঝুরঝুর করে
খসে পড়ে
ব্লিচিং পাউডার!

নিজের হাতে
একটা গাছ কখনো
পুঁতেছো মাটিতে?
ছিঃ, সারাজীবন ধরে এত ফলমূল খেয়ে এলে
তার ঋণ শোধ করলে না?
বাতাসের কাছেও তুমি ঋণী
তুমি বাতাসকে হত্যা করতে চেয়েছো
সবুজ আলোর মতন অরণ্যগুলি তুমি সৃষ্টি করোনি
ধ্বংসে মেতে উঠেছো
তুমি বুনো ফুলের ঝাড়ে আগুন লাগিয়ে
সেখানে বসিয়েছো ইঁটভাটা
তুমি নিসর্গের সঙ্গীত
ঢেকে দিয়েছো হাজার রকম চাকার শব্দে
ওগো স্বায়ম্ভুব মনুর সন্তান
একটু থামো
একবার তাকাও নিজের দিকে
তোমার হাতে উদ্যত ছুরি
সেই বিদ্যুৎবর্ণ মোহময় ছুরি তুমি বসিয়ে দিতে চলেছো
তোমার আপন প্রপৌত্রের বুকে!

ডানা-বদল

সকাল বেলায় সেই দূত এলো আমার কাছে
বললো, সময় হয়েছে, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে
নিয়ে যাবো, একটু ঘুর পথে যেতে হবে
আমি তাকে বললুম, বৎস, একটু বসো
এখনো দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়া হয়নি
বাইরে কী বিষম বৃষ্টি, ঝড় উড়িয়ে নিচ্ছে দিগন্ত
এরকম সময়ে বিমানও ওড়ে না
তোমার ডানা গুটিয়ে বসো এ চেয়ারে!
এসো বরং কিছুক্ষণ তিন তাস খেলা যাক
সঙ্গে কিছু খুচরো এবং ক্যাশ আছে তো?
মানুষ এসব সঙ্গে নিয়ে যায় না জানি, তবু
খেলতে ক্ষতি কী?
কিংবা চলো একটু পায়ে হেঁটেই ঘোরা যাক শহরে
তুমি ও আমি দৌড়োলে
কে জয়ী হয় তা দেখতে হবে
তুমি ওপারের দূত বলেই যে বেশি সুবিধে পাবে
তা ভেবো না!
চলন্ত বাসের পাদানিতে তোমার ও আমার মধ্যে
কে আগে পা রাখতে পারে
সে খেলাটি কি তোমার পছন্দ?
তুমি আমার কাঁধে চড়লে আমি তোমাকে নিয়ে
ডিগবাজি খাবো
অথবা যদি পুকুরে সাঁতারের খেলা খেলতে চাও
তুমি ডুবে গেলে আমি টেনে তুলবো
আমি সাপের ছোবল খেতে খেতে ছুঁড়ে দেবো
তোমার গায়ে
ওগো দেবদূত, তোমার মৃত্যুভয় নেই, তাই মুখ
এমন নিষ্প্রাণ বরফের মতন সাদা
রাস্তায় হঠাৎ হল্লা ও সোরগোল উঠলে
দৌড়োবার কী মধুর রোমাঞ্চ, একবার দেখে যাও অন্তত
আমাদের দুজনের খুনসুটি
সন্ধ্যে বেলায় ফর্সা আলো এনে দেবে!
আমরা দুজনে একসঙ্গে যাবো একটি নারীর কাছে
ওহে তুমি বেশি সুযোগ নিও না।

অলৌকিক ঐশ্বর্য দেখিও না, খুঁজে রাখো গজমতির মালা
ছদ্মবেশ ধরো, ঠিক আমার মতন, যেন আমার যমজ
তারপর দ্যাখো সে কার দিকে চেয়ে হাসে,
কাকে দেয় আঙ্গুলের স্পর্শ
তার বেশি কিছু চেও না, তুমি বন্দি হয়ে যাবে
আমি পথ খুঁজে পাবো না একা
দ্যাখো এই সেই নারী, এই মায়া, এই ভালোবাসার মোমপুত্তলী
শুনতে পাচ্ছ ঝর্ণার শব্দ?
তোমার কপালে কেন ঘাম, কান কেন রক্তিম?
দেবদূত, দেবদূত, সময় হয়ে গেছে
থেমে গেছে বৃষ্টি, আকাশে এখন হীরক দ্যুতি
তুমি কি মেতেছো খেলার নেশায়
আঙুলের স্পর্শের বেশি আর চাও আগুনের শিখা
সে আগুনে পুড়ে যাবে তোমার ডানা
চতুর্দিকে ফুটে উঠবে কুর্চি ফুল
দেবদূত, তোমার চোখে জল কেন
আমি তো তৈরি হয়েছি
এই দ্যাখো খুলে ফেলেছি সব মোহ
এই দ্যাখো বিদায় দিয়েছি সব বাসনা
আর দেরি নয়, আর দেরি নয়
সব কিছু অসমাপ্ত না রেখে গেলে
কোনো সুখ নেই, চলে যাওয়ার উত্তেজনা নেই
তুমি এখানে নির্বাসনে থেকে যাও
থাকো, থাকো, ধুলো থেকে খুঁটে খেতে শেখো
জুতো মুখে করে নিয়ে যেতে কেমন অপমান লাগে
একবার দ্যাখো
প্রেমিকার ঠোঁটে মুখ দেবার মুহূর্তে কে
বজ্রমুষ্টিতে টেনে ধরবে তোমার চুল
একবার বুঝে নাও, চোখের জল চাটো
আমাকে খুলে দাও তোমার ডানা
আমি শূন্যে উড়ে যাই!

অপু

অতসী ফুল-রঙা ভোর, দূরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে
দেখার মতন ছোট্ট রেল স্টেশান
ট্রেন চলে গেল এই মাত্র, হাতে একটা ব্যাগ, প্ল্যাটফর্মে
আমি
আর কেউ নেই, পাশের আবছা লাল রাস্তাটাও নীরব
আমার কোথাও যাবার তাড়া নেই
ক্রমশ আমার বয়েস কমতে থাকে, রোগা-পাতলা
হয়ে আসে শরীর, ছবির মতন জামা-প্যান্ট
বদলে যায়, হু-হু করে ছোট হতে হতে
একলা আমি, মনে হয় আমিই অপু
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছি কেন, চোখ ফেটে
জল আসছে
এখানে কেউ আমাকে দেখছে না
একদিকে মা, অন্যদিকে বস্তুজগত আমাকে টানছে।

সে আর ফিরলো না

কাঠের আগুন নিবু নিবু, গোল হয়ে ঘুমে হেলে পড়েছে সবাই
ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই
শীতের আকাশ থেকে খসে পড়ছে একটি তারা, ঘুরতে ঘুরতে
থেমে গেছে সব গান, একতারা-মৃদঙ্গের ওপর খেলা করছে বাতাস
এই নীরব শূন্যতার মধ্যে নদীর ধারে
জল ফেরাতে গিয়েছিল
এক কন্যা
সে আর ফিরলো না।

কে আর তাকে মনে রাখবে
দু' বছর পাঁচ বছর বড়জোর
আকাশে কোনোদিন মালিন্যের দাগ পড়ে না
আকাশের বয়েসও বাড়ে না
শুধু এক বাজে-পোড়া তালগাছ অন্তরীক্ষের সঙ্গে

কথা চালাচালি করে
একজনের বিছানায় অন্য কেউ এসে শোয়
বালিশে অশ্রুর দাগ
এবারের বর্ষায় নদীর জলে খেলা করে চাঁদ
নদীও তাকে মনে রাখেনি!

শুকনো ঘাসে চচ্চড় শব্দ হচ্ছে
এমনই ক্রোধের মতো রোদ
তারই মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কুন্দকলি
আকাশ থেকে খসে-পড়া নক্ষত্রটির প্রতিবিম্ব...

সাদা দেওয়াল

সাদা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কি নিজেকে প্রশ্ন
করে না
কোথায় সাদা দেয়াল? সব দেয়ালে রক্তের ছোপ!
খবরের কাগজের কালো অক্ষর থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্ত
মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসাচ্ছে, এই তো প্রতিদিনের
ইতিহাস
দূরপাল্লার ট্রেন ছুটে যাচ্ছে, হঠাৎ কেউ উপড়ে নেবে
লাইন
জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে হরিৎ প্রান্তরে
জীবন নিয়ে আপ্লুত চাষা ও তার মন্থর বলদ
বাজপোড়া গাছটিতে বসে আছে বহুবর্ণ মাছরাঙা
শান্তশিষ্ট জলাভূমিতে মেঘের ছায়া
সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতে দোল খাচ্ছে সবুজ ঘাস ফড়িং
ট্রেনের যাত্রীরা কেউ ঝালমুড়ি খাচ্ছে, কেউ ডুবে আছে
রহস্য কাহিনীতে,
কারুর কারুর চোখে আঁকা বালকের কৌতূহল
তবু এই সুন্দর ও চিরাচরিতের মধ্যেও রয়ে গেছে রক্ত-
লোলুপের দল
রথী মহারথী যাঁরা ঘুমোচ্ছেন এখন বাড়িতে, তাদের
রক্তগরম করা কথায়
যখন তখন প্রাণ দিতে পারে দু-দশটি মানুষ

সব মানুষই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব যারা বলে, তারাও
মানুষ মারে
মানুষ মানুষকে মারে, আর কেউ না। মানুষই
মানুষকে মারে
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব সাদা দেওয়াল
যারা অপরকে কষ্ট দিয়ে অনেক কিছু ভোগ করে যায়,
তারা
জীবনে অন্তত একটা সুখের সন্ধান কক্ষনো পাবে না,
অপর অচেনা একজন মানুষকে সুখী করার নির্মল
আনন্দ!

মালা

আমার নিজস্ব শূন্যতা একটা মালা হয়ে দুলছে
একটি মালা,
একটি মালা, আমার স্বপ্নের সারাৎসার
রেখা, রং ও আয়তনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার শূন্যতা
তুমি নাও...

ছবি

শালিক পাখিটি বললো, ওঠো
দেয়ালের টিকটিকি বললো, ও অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে
জাগিও না
বালিশের নীচে বই, ঘড়ির মতন থেমে আছে
জানলায় বিন্দু বিন্দু জল
আড়মোড়া ভাঙে রাজপথ, কড়-কড়াৎ শব্দে যায়
তরকারির গাড়ি
একটি মেঘ নিচু হলো, অন্য মেঘ দেশান্তরে গেল
বিছানাকে সমুদ্রের মতো করে ভেসে থাকে

সহাস্য কৈশোর ছেড়ে সদ্য আসা দুঃখের যুবতী
ঠোঁটে তার কান্না লেগে আছে
হাতের আঙুলে হাওয়া বললো তাকে, জাগো
দেয়ালের আয়না বললো, থাক
রোদ্দুরের রং বললো, ঘুমের মধ্যেও ওর ঠোঁট কাঁপছে,
ছাপার অক্ষর বললো, কাঁপুক, কাঁপুক
আমি আছি!

কে কাকে টানছে

সিমলে পাড়ার ছেলে নরেন যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে
হাটখোলার মোড়ে দুই নাটুকে মাতালের সঙ্গে তার দেখা
অমৃতলাল আর গিরিশ, রাত কাটিয়েছে বিনোদিনীর বাড়িতে
নিদ্রাহীনতায় ও নেশায় এখন চারটি চোখ লাল
বীয়ার পান করতে করতে গিরিশের ঠাণ্ডা লেগে গেছে, তাই
স্যাঙাৎকে দিয়ে ঝট করে আনিয়ে নিয়েছিল বী-হাইভ ব্র্যান্ডি
তখন হুইস্কি ছিল ঘোড়ার ওষুধ, বনেদী মদ্যপায়ীরা ছুঁতো না
রাজনারায়ণ দত্তর ছেলে, কেরেস্তান কবি মাইকেল মধুর দেখাদেখি
সিগারেট টানা ইদানীং ফেসিয়ান হয়েছে
অমৃতলালের মুখে সেই আগুন, গিরিশের ঠোঁটে পান
নরেনকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো দু'জন
গিরিশ খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো, আরে আরে অত হনহনিয়ে
কোথায় চললে ভায়া, ডুমুরের ফুলটি হয়েচো, দেখাই পাই না।
আজ পেয়েছি, আর ছাড়চিনিকো, চলো যাই, বিনির বাড়িতে ফিরি,
তোমার গান শুনবো, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলের গানও নাকি তুমি গাইচো
কেমন সে গান, রসে টইটম্বুর না ধর্মে মাখো-মাখো?

নরেন একটুক্ষণ হাস্য-পরিহাসের পর বললো, হাত ছাড়, গিরি, যাচ্ছি
দক্ষিণেশ্বর, এখন সময় নেই
গিরিশ ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, সেই পাগলা ঠাকুরটার কাছে?
সে তোকে কী দেয়?
চাকরি দেবে? সংসারের অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচোবে?
ওসব বুজরুকি ঢের দেকিচি ভায়া, ওসব ছাড়ো, সুসময় অযথা বয়ে যেতে

দিও না। নরেন রাগ করে বললো, তুই শালা স্টেজে মাগী নাচাস,
তুই এসবের কী বুঝবি?
গিরিশও প্রমত্ত কণ্ঠে বললো, কী, আমি বুঝি না?
চৈতন্যদেবের নামে পালা নামাচ্ছি, দেখবি কেমন ফাটাবো
ভক্তির বন্যা বইবে, অডিয়েন্স কান্নার সমুদ্রে ভাসবে!
চল, মহলা দেখবি, আজই তোকে আমরা চাই!
নরেন বললো, তুই চল দক্ষিণেশ্বর, তোকেও আমরা চাই!
গিরিশ নরেনকে টানছে বিনোদিনীর দিকে, মঞ্চের ফুটলাইটের দিকে
নরেন গিরিশকে টানছে গঙ্গার উত্তর কূলে, পঞ্চবটীর প্রাঙ্গণে,
দিনের আলোর উৎসবে
কেউ কারুর হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না,
তবু বিপরীত দিকে সমান টান
হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা নগর কলকাতা একাগ্র হয়ে দেখছে এই দৃশ্য
একদিকে মোহময় প্রমোদ, অন্যদিকে রসে-বশে মুক্তি
একদিকে শিল্প ও আত্মক্ষয়, অন্যদিকে ত্যাগ ও পরার্থপ্রিয়তা
খুবই মৃদু ও অসম্ভব জোরালো এই পারস্পরিক আকর্ষণ
কেউ জিতবে না, কেউ হারবে না
এক সময় হ্যাঁচকা টানে এ ওকে বুকে জড়িয়ে নেবে...

অধরা

দু'আঙুলে নুন তোলার মতো একটুখানি
তাতেই যেন ঝিলিক দিল আঁধার ঘরে মানিক।

*

রাস্তা ভরা গুল্ম কাঁটা, কমলবনে সাপ
তারই মধ্যে দেখি তোমার পায়ের জলছাপ।

*

নদীর ধারে শুয়ে থাকার রাত্রি শেষ, ভোরে
নীলরুমাল, শিশিরপাত, ঘাসফড়িং ওড়ে।

*

ধুলোর থেকে কুড়িয়ে নিলে হলদে পাখির পালক
ধুলোর মধ্যে হাসির ছটা, জলের মধ্যে আলো।

*

এক পলকে ভাঙলো কিছু, কেউ বলেনি কথা
শব্দ ঘুম, শব্দ জানে অন্য নীরবতা।

থেমে থাকা যাত্রী

শালুক-বিল ইস্টিশানে থেমে রইলো রাতের রেলগাড়ি
আমরা যারা হিল্লি-দিল্লি দিচ্ছিলাম পাড়ি
একটি নয়, দুটিও নয়, সাত ঘণ্টা দেরির
অস্থিরতায় জ্বলে উঠলো শরীর
ছেঁড়া কাঁথার মতন কিছু অন্ধকার, ভূতের মতন কয়েকখানা তাল
গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই, দিকশূন্য দূরের চক্রবাল
মেঘ খেয়েছে চাঁদ, আকাশ জুড়ে শুধুই ছাই
সব কিছুই অনড়, তবু বাতাসে যাই যাই।

কামরা থেকে নেমে একটু জুড়োই মনস্তাপ
গর্ত ভরা বর্ষা, পাশে ফুঁসে উঠলো সাপ
যাঃ যাঃ বলে সরে গেলাম, ঝোপের ধারে খানা-
খন্দ এবং গত রাতের মৃতপশুর গন্ধ, আর হয়তো রাতকানা
পাগল একটা রয়েছে উবু হয়ে
নষ্ট-ঘুমে এই সমস্ত সয়ে
হঠাৎ ভাবি, যদি আমি হতাম কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী
ভিয়েতনাম বা বোলিভিয়ার, নয় সামান্য কবি
হাতে একটা মেশিন গান, মাথার মধ্যে পবিত্র এক ক্রোধ
ট্রেন ডাকাতি-ফাকাতি নয়, বরং যারা এমন গতিরোধ
করেও যে-যার ঘরে ঘুমোয়, তাদের গৃহস্থালি
লণ্ডভণ্ড করে দিতাম গুলির ঝাঁকে, শুধুই জোড়াতালি
দিয়ে যারা দেশ চালাচ্ছে তাদের মুখে দিতাম দুই লাথি
এবং আমার সঙ্গী হতে সুনিশ্চিত পেতাম অনেক টনকো-যুবা সাথী।

রাত্রি জাগা বিরক্তিতেই মাথায় ঘোর চিন্তা এই সমস্ত
আসল যারা বিপ্লবী, সব ঘর গুছোতে ব্যস্ত

যে-যার পাতে ঝোল টানছে, শুরুৎ শুরুৎ শব্দে কান ফাটে
যারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাদের কেউ নেই কোনো তল্লাটে
আমি নিছক শব্দ ছানি, কলম দিয়ে ছেটোই শুধু কালি
নিজের মুখেও লেগেছে তা, তবুও দিই নিজেকে হাততালি
যাকগে ওসব, যা চলছে তাই চলুক আমার কিসের মাথাব্যথা
মাথাটাকে ফাঁকা করাই এখন আসল কথা
বরং অন্ধকারের ঐ বিড়ি ধরানো পাগলটার পাশে
খানিক গিয়ে বসাই ভালো, পাগলরাই আসল সৎ, অবিচলিত
সকল সর্বনাশে!

সুন্দরের মন খারাপ

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
অন্ধকারে ফুলকি ওড়ে, বারুদ মাখা ঝড়
চতুর্দিকে এত পাখির ভাঙা কণ্ঠস্বর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
নদীকে খায় শুকনো পথ, প্লাবনে ভাসে ঘর
মলিন রঙ, লীন রেখা, ক্লিষ্ট অক্ষর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর...

সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান

বিকেলের সাদা মেঘে নির্জন বিমান
ভেসে যায়
রায়চৌধুরীদের ভাঙ্গাচোরা পুকুরঘাটের শেষ ধাপে
ছোট বউ পা ধুচ্ছে, দুঃখী কুমারীর মতো পা
বিমানের ছায়া তাকে খায়।

সাদা মেঘ, নির্জন বিমান, সাদা হাওয়া
কেউ কেউ দ্যাখে
অনেকেই দেখতে পায় না, যে রকম নলহাটির বামন বৈরাগী
লাল ধুলোর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, একা একতারায়
বেজে ওঠে স্বরের পঞ্চম
হঠাৎ বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে বাপ-পিতামহ
শিংশপা গাছে দুলছে যম।

এখানেই ছিল বাচ্চা বয়সের গুপ্ত খেলাঘর
চিহ্ন পড়ে আছে
মালবিকা শুয়ে ছিল, প্রথম মেয়েলি ঘ্রাণ তুলে দিল হাতে
চূর্ণ চূর্ণ ভালোবাসা আগাছা-ফুলের থেকে রেণু
আগুনের সঙ্গে চেনা হলো
জলের ভেতরে যুদ্ধ, আগুনে ও জলে
এখানেই বার বার হেরে যাওয়া, বার বার জয় অভিযান
এখন অস্পষ্ট কিছু ছায়া
সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান।

আবছায়াময় কেল্লার মাঠে

না-লেখা কবিতাটির একটি শব্দ হারিয়ে গেল আজ বিকেলবেলা
যেমন ভাবে মহাকাশে নিরুদ্দেশে যায় অন্তরীক্ষের নাবিক
কিংবা একটা ঘাসফুলকে না ছুঁয়েই উড়ে যায় প্রজাপতি
কিংবা একটা ঢেউ তীরের কাছে পৌঁছোবার আগেই ভেঙে যায়
সেই মুহূর্তে সেই শব্দটিই আমার জীবনসর্বস্ব, তাকে না পেলে
আমি কোথায় যাবো?
রাস্তায় এত মানুষের ভিড়, কেউ বুঝবে না আমার কী খোয়া গেছে
একটি শব্দ, একটি মাত্র শব্দ, চার অক্ষরের
হে বৃষ্টি-ভেজা মাদক বিকেল, তুমি কেন তাকে হরণ করলে?

তখন আমি সেই বিকেলের নামে মামলা দায়ের করি
দেবী সরস্বতীর আদালতে
হংসেশ্বরী হয়ে তিনি বীণা হাতে নিয়ে বসে আছেন

রাজভবনের পেছনের পটভূমিকায়
অনবরত ট্রামের কর্কশ আওয়াজ ও বাসের বিশ্রী ধোঁয়া তিনি মুছে দিলেন
হাতের এক ইঙ্গিতে
পূরবী রাগিণীর সুরে তিনি হাসলেন
নিজেকে সুন্দর রাখার চেষ্টায় তিনি এতই ব্যস্ত যে শুনলেন না
কোনো আর্জি
বিকেলটিকে বেমালুম খালাস করে দিয়ে তিনি বললেন, সমুদ্রে যাও
আমাকে বললেন, তুমিই তো আসল আসামী, নাও দণ্ডাজ্ঞা
চার অক্ষরের বদলে তোমাকে সেই তিন অক্ষরের
শব্দটি বসাতে হবে, মনে আছে?

হঠাৎ বজ্রের গম্ভীর গর্জন, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আর
আসন্ন অন্ধকার শূন্য করে দেয় জন পদবী
আমি একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, কৈশোরের ছবি ভেঙে যায়
সেই তিন অক্ষর? কোন্ তিন? মধ্যে যুক্ত বর্ণ আছে কি?
ছন্দ ভেঙেও বসানো যায়?

না-লেখা কবিতাটি একটি জোনাকি হয়ে উড়তে থাকে
আবছায়াময় কেল্লার মাঠে...

সীমান্ত কাহিনী

এই পাহাড়ের আড়ালেই একটা অন্যদেশ
সে কথা কি ঐ পাহাড় জানে?
জঙ্গল ছিঁড়ে খুঁড়ে নেমে এসেছে এক পাগলা ঝোরা
সমতলে গিয়ে সে নদী হবে
তারও ঠিক মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে
দু'দেশের সীমানা
পাগলা নদীটি তা কিছুই জানে না
গাছগুলি পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করে উঠে যায় আকাশের দিকে
তারা মাধ্যাকর্ষণ মানে না
তারা সীমান্তরক্ষীদেরও চেনে না
একটা অন্ধকার খেলা করে আলোর মধ্যে

আর অন্ধকারকে ধরে রাখে এক বিন্দু আলো
একটা বাতাস পাখিদের নিয়ে যায়
একটা পাখি ঝড়কে সঙ্গে করে আনে...

নদীতে ভাসে তৃণখণ্ড, ডালপালা, কাঁটা ঝোপের ফুল
পাশ দিয়ে হেঁটে আসে মানুষ
রোগা মানুষ, ন্যুব্জ মানুষ, শিশু মানুষ, শিশুর জন্মদাত্রী মানুষ
হাঁটু ভাঙা মানুষ, চামড়ায় শ্যাওলা জমা মানুষ
নীরব, সন্ত্রস্ত, উদরে খিদের মশাল-জ্বলা মানুষ
তাদের মাথার ওপরে ইতিহাসের বাতাস
তাদের পায়ে পায়ে প্রাগৈতিহাসিক যাযাবরদের
পথভ্রান্ত ভুলছন্দ
তারা পিছনে তাকায়, তারা সামনে দেখতে পায় না
তাদের অতীত ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে
তাদের ভবিষ্যৎ নেই
বৃক্ষগুলি স্থির, বাতাস এখন বন্ধ,
মাটিতে কোনো আভা নেই, আকাশে নেই দ্যুতি
এরই মধ্যে দিয়ে আসছে কালো কালো রেখা ও বিন্দুর মতন মানুষ
মানুষের কাছে পরাজিত মানুষ
পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে ছন্নছাড়ার দল
এক সময় তারা অবসন্ন হয়ে থামে
ত্যাড়াবেঁকা পুতুলের মতন ঘুমিয়ে পড়ে...

যেখানে শূন্যতা ছিল, সেখানে গড়ে ওঠে বসতি
সেখানে রাত্রিগুলি দিন হয়, দিন থেকে রাত
সেখানে জন্ম-মৃত্যু ছেলেমানুষের মতো
হঠাৎ হঠাৎ আসে যায়
সেখানে হাসির মধ্যে খেলে যায় কান্নার বাতাস
কান্নার মধ্যে মিশে যায় হাসির জলপ্রপাত
সেখানে খুদকুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় পরমান্ন
সেখানে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশু মহানন্দে পান করে
স্তন্যের বদলে ধুলো মাখানো স্নেহ
তারই মধ্যে এক একদিন বন কাঁপিয়ে আসে বনের রাজা
কুঠার হাতে আসে কাঠ ব্যবসায়ীরা
রাইফেল হাতে নিয়ে আসে মানুষ শিকারি দল
ট্রাক বোঝাই করে কেউ কেউ নিতে আসে যাবতীয় মূল্যবোধ

বিদ্যুৎ তরঙ্গে কথা চালাচালি হয় এদেশ থেকে ওদেশে
প্রকৃতি বিশেষজ্ঞদের মাথাব্যথার কাহিনী ছাপা হয়
সচিত্র, নানা রকম ভাষার খবরের কাগজে
রাজনীতির রঙ্গকর্মীরা উচ্চাসনে উঠে গলা ফাটান
কেউ কেউ সন্ধের দিকে চুপি চুপি আসেন
গণতন্ত্রকে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কাগজের বেলুন বানাবার জন্য
আবার এইসব কাগজপত্র ছিঁড়ে খুঁড়ে কিছু কিছু নারী
চলে যায় মরুভূমির দেশে
একাধিক রাজধানীতে দাবি ও প্রতিবাদ লোফালুফি হয়
হঠাৎ ছুটে আসে ঘূর্ণিঝড় কিংবা বন্যার ঢল
শকুনের মতন মাথার ওপর ঘুরতে থাকে আকাল
কিংবা সবার অজান্তে এসে পড়ে বুনো হাতির পাল
তাদের সারল্যমাখা মুখে কোনো হিংসে নেই
তাদের বাৎসরিক পথ খুঁজে নেওয়া পায়ে কোনো ধ্বংস-সাধ নেই
তবু সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে তারা দূরান্তে মিশে যায়...

নদীর ধারে পড়ে আছে দু'একটা ছেঁড়া কাঁথা
ভাঙা শানকি, তোবড়ানো টিনের গেলাস, খুঁটি বাঁধার দড়ি
আর কেউ নেই
শূন্যতাকে গ্রাস করেছে শূন্যতা, ঝিমঝিম করছে স্তব্ধতা
গাছ থেকে খসে পড়ে পাতা, শিকড়গুলি নামে আরও গভীরে
অরণ্য জেগে আছে অরণ্যের নিয়মে
পাগলা ঝোরার জলে শুধু প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে
একটা আলো, একটা অলৌকিক আগুনের ছায়া
মানুষের উদরের খিদের মশাল...

দরজার আড়ালে

দরজায় ঝনঝন শব্দ হলে ছুটে যাই
বাইরে কে?
অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু, না কোনো ফেরিওয়ালা?
অস্পষ্ট আলোয় ঠিক চিনতে পারি না
একটুখানি হাসিমাখা মুখ

এ কি বহুকালের দূরত্ব না জামরুল গাছের ফুল
এখানে অন্ধকার থাকার কথা নয়, তবে কি চশমার ধুলো
আমি যাকে চিনতে পারছি না, সেও আমাকে চেনে না?
দরজার বাইরে তুমি কে?
ঝনঝন শব্দে আনন্দের ঘূর্ণি উঠেছিল আমার শরীরে
যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার ছুটে গিয়ে দেখার কথা
একটু ফাঁক করা আড়াল, অথচ এত সুদূর
কোনো এক ঝড়—গোধূলিতে হাত ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কারুর সঙ্গে?
বাচ্চারা খেলছে নীচের উঠোনে, পাখির মতো তারা হাসছে
সিঁড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুছে যাচ্ছে পেছনের দেয়ালগুলো
শুধু একটা দরজা, এ পাশে আমি
ও পাশে তুমি কে?

রূপকল্প

দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া রাস্তার ধারে দু'হাত তুলে
ডাকছে একটা গাছ
একজন বন্দি মানুষ জল চাইছে?
ফিরে যাওয়া যায় না
মিলিয়ে নেওয়া যায় না রূপকল্পটা
কচুরিপানার ওপর মৃদু বাতাস
এক নৌটাঙ্কির নর্তকী উরু ধুচ্ছে ওখানে
তার খলখল হাসির শব্দ নিয়ে
উড়ে গেল এক ঝাঁক শালিক
কাঁটা বাবলা ঝাড়ের তলায় কার
একটা ছেঁড়া জামা
একটা অকেজো বাঁশি
ওখানে গুপ্ত ধনের মতন রয়েছে এক
ট্র্যাজিক কাহিনী
যদি ফিরে যাওয়া যেত
শুকনো ঘাসের ওপর নিশ্চিত দেখতে পেতাম
ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল
বাঁক ঘুরে গেল রাস্তা সাদা রোদ্দুরে...

তস্য গলি

মনে পড়ে সেই সব গলি-ঘুঁজি শুরু আছে, শেষ নেই
গুলি সুতোর মতন শুধু খুলে যায়, সেখানে পাঁচফোড়নের
গন্ধ, ঢাকা বারান্দা
থেকে কেউ ছুঁড়ে দেয় কাঁঠালের ভূঁতি, বাঁশের খাঁচায়
পোষা ময়না
কৃষ্ণ কথা কয় অতি কর্কশসুরে, একতলা থেকে
তিনতলায় কেউ কারুকে
তার চেয়েও উঁচু গলায় ডাকে, এক রক থেকে আরেক
রকে লাফিয়ে যায়
হুলো, জানলার পর্দা সরিয়ে চেয়ে থাকা এক বন্দিনী
রাজকন্যার কাজল
টানা চোখ, সেই চোখে দূর প্রতিবিম্বিত অশ্রু।
কোনো কোনো বাড়ির দরোজা
মাসের পর মাস বন্ধ, একটা বড় তালার চারপাশে
মাকড়সার জাল, আবার
কোনো কোনো বাড়ির দরজা হাট করে খোলা
ভেতরে কোনো জন-মনুষ্যের শব্দ নেই,
শুধু ধুলোয় রয়েছে পায়ের ছাপ আর ভাঙা আয়নার কাচ
হঠাৎ দুপদাপ করে
দৌড়ে গেল একদল ছেলে। ঘুড়ি ধরার জন্য তাদের চোখ
আকাশের দিকে যদিও
এই গলি থেকে আকাশ দেখা যায় না, একটি মেয়ে
তারপরেই ধীর পায়ে
মিলিয়ে গেল অন্যদিকে। দেখলেই মনে হয় যেন সে
আজই ফ্রক ছেড়ে
শাড়ি পরেছে, সে কেন চকিতে একবার ক্রুদ্ধ ভাবে
তাকিয়ে নিল আমার দিকে, কী আমার
দোষ কে জানে! একটি বাড়ির চৌকাঠ গড়িয়ে আসে
জল, ভেতরে ঘেউ ঘেউ করছে
কুকুর, হঠাৎ এক বৃদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন মা কালীর নামে।
তার ঠিক পরেই
দুদিকের দুই অলিন্দ থেকে দুই জমকালো শাড়ি
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পরনিন্দে, কলের
গানে ভেসে আসে কানা কেষ্টর কীর্তন, সেই সঙ্গে

কোন বাচ্চা পড়ুয়া পাল্লা দিয়ে
মুখস্থ করে পাণিপথের যুদ্ধ, নিচু পাঁচিলের ওপর
গোলা পায়রাদের প্রেম,
মাথার ওপর ঝন্ ঝন্ করে নিঃসঙ্গ চিলের ডাক...
গলি ক্রমে সরু হয়ে আসছে। ক্রমশই অন্ধকার, তবু
কেউ যেন হাতছানি দিয়ে
ডাকে, পেছনে ফিরে তাকাতে গা ছমছম করে...
তেপান্তরের মাঠ নয়, নাইরোবির
জঙ্গল নয়, উত্তর কলকাতার গলির গোলকধাঁধায়
আমি পথ হারিয়ে ফেলি,
আমি ফিরে যাই কৈশোর থেকে বাল্যে, আরো
পিছনে...

শেষমুহূর্ত পর্যন্ত

এসো
এসো, ভালোবাসা দাও, দেরি
হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, দাও,
দাও, আঙুলের ডগা থেকে। এক্ষুনি
খসে পড়বে গাছের একটা পাতা, দাও, দাও
ভালোবাসা। দু'হাত বাড়িয়ে দাও
দেরি হয়ে যাচ্ছে
দেরি হয়ে যাচ্ছে
জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে, দাও
দাও ভালোবাসা, কাঙালি ভোজের শেষ খাদ্য কণা
দাও, দাও
ভুরুর সামান্য ভঙ্গি, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসা,
ভালোবাসা।
আর কিছু চাই না, আর কিছু না, দাও, দাও
একটা জলস্তম্ভ ভেঙে পড়বে এক মুহূর্তে
একটা ঝড় নিভে যাবে এক ফুঁয়ে, দাও
সমস্ত শরীর ভরে
শরীর ফুরিয়ে গেলে ইথার-তরঙ্গে,

শুশ্রূষায়
দাও, দাও, যবনিকা নেমে আসছে
শব্দ ডুবে যাচ্ছে শব্দের অসীমে
আকাশ ডানা মেলে ঝাঁপ দিল নীচে
দাও, দাও, আর সময় নেই
দাও ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা...

বাল্যস্মৃতির ঠোঁট

জানলার কাছে এসে ঝাপটা মারছিল একটা জারুল শাখা
তাকে বিদায় জানালাম
সে এক ভাঙা চাঁদের রাত
ঝড়-বাদল হচ্ছিল খুব, সে সব গত শতাব্দীতে খুব মানাতো
ওদের গর্জনে কান দিও না, এই বলে আমরা
টেবিলে তাস বাঁটতেই
শুরু হলো ভূমিকম্প
সেও তো কয়েকটা শতাব্দীর ওলোট-পালোটের গল্প
এমন কিছু না!

সেদিনের তাস খেলা ঠিক জমলো না,
আমরা সমুদ্রে গেলাম
কপাল ধুতে
সমুদ্র তখন সমুদ্রকে ছেড়ে উঠে আসছে
আকাশ তখন আকাশ থেকে উধাও হয়েছে
এসব কিছুই কিছু নয়, সভ্যতার মধ্যরাত্রে এমন অনেক কিছুই
ঘটে থাকে
আমি জ্যোৎস্নার সরলরেখার দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতেই
জ্যোৎস্না দুলতে থাকে, ছিঁড়ে যায়, তার আড়ালের
এক মায়াময় দেশ
আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে
আমি হেসে পিঠ ফিরিয়ে নিই
তখনই কী সুন্দর একটা সকাল ভাতের থালার মতন

ঝকঝক করে সাড়া দেয়
শুনতে পাই প্রভাত ফেরীর কাঁচা কাঁচা গান
আমার বাল্যস্মৃতির ঠোঁট নড়ে ওঠে...

জন্মদাগ

কিংশুক থেকে খসে পড়ছে রং, এবার সাদা ফুলের পালা
সোনামুখী রেল স্টেশনের একটু বাইরে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি
আজ ট্রেন আসবে না
সদ্যস্নাত শালগাছগুলির শিখরে কিসের এত কোলাহল
কাকের বাসায় ডেকে উঠেছে কোকিলের ছানা?
কেন এই কথাটা মনে পড়লো হঠাৎ
ওপরের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না
অনেকদিন কোকিলের ডাক শুনিনি
অনেকদিন এমন ছাউনিবিহীন ঘুমন্ত স্টেশনে একা দাঁড়াইনি
জুতো খুলে পা রাখি মাটিতে, একটা শুকনো পাতা বললো,
এসো—
ইস্পাতের রেখার ওপর ওপর ঠিকরে পড়ছে রোদ, বাতাসে
বাল্যকালের গন্ধ
লাল ধুলোয় খেলা করছে মৌলিক বস্তুবিশ্ব
একটা অদৃশ্য সুতোয় দোল খাচ্ছে অনাদি কালের বিন্দু বিন্দু উপাদান
আর একটু ঝুঁকলে, আরও গভীরে গেলে,
হয়তো আমি দেখতে পেয়ে যাবো
আমার জন্মদাগ!

কাঁটা

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। টিটলাগড়ে আলপথে। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে। ‘তুমি ‘উঃ’ বলতেই আমি বললাম, দাঁড়াও, নড়ো না। তোমার পায়ে আমি হাত দেবো, এ জন্য তোমার লজ্জা! তোমার পা তো ফাটা ফাটা নয়, লজ্জা কি! তোমার পা কোদালের মতন বড় বিশ্রী নয়।

নরম এবং যতটা ছোট হলে মানায়। জাপানি মেয়ের মতন খুব নরম, খুব ছোট নয়, অবশ্য কোন জাপানি মেয়ের পা আমি এ পর্যন্ত হাতে ছুঁইনি যদিও।

আমি মাটিতে বসে, হাতে তোমার পা। তুমি দাঁড়িয়ে একটু বেঁকে, শরীরের ভঙ্গি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন। তোমার লাল টুকটুকে চটি, পায়ের পাতাও লালচে।

কোথায় ব্যথা?

যেখানে কাঁটা ফুটেছে।

কোথায় কাঁটা?

আমি জানি না।

ঠিক, কাঁটার কথাটা আমারই জানা উচিত।

আমি তোমার পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম।

উঃ, দেখ, কোথায় কাঁটা!

এই তো দেখছি।

আমি সত্যই দেখছিলাম, দু'হাতের মুঠোয় তোমার নরম যতটা ছোট হলে মানায় পায়ের পাতাটি ধরে টিটিলাগড়ের সেই অবনত সন্ধ্যায় আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। কাঁটা দেখিনি, দেখেছি গোলাপি সৌন্দর্য। কিন্তু কাঁটা খুঁজতেই হবে, নইলে তোমার পায়ে হবে ব্যথা। বিষ। এই তো এখানে, খুব ছোট, প্রায় দেখাই যায় না। এত ছোট কাঁটা, হাত দিয়ে তোলা যায় না। ঠোঁট দিয়ে তোলার জন্য আমি তোমার পদ-চুম্বন করলাম। তুমি 'এই অসভ্য' বলে আমার মাথায় হাত রাখলে, দেবী মূর্তির মতন ভঙ্গি।

তুমি এখন স্বাধীন স্বাস্থ্যবান পায়ে অন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। আমি তোমাকে আর দেখি না। তুমি আমার দেখাও চাও না। জানি না, তোমার পদতল এখনও গোলাপি কিনা। কিন্তু সেই ছোট কাঁটাটা আমি রেখে দিয়েছি, খুব গোপনে, খুব ভেতরে, লুকিয়ে। প্রায়ই টের পাই।

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে

রবীন্দ্রনাথ সঠিক বলে গিয়েছিলেন রামের জন্মস্থান কোথায়
যারা তা মানতে চায় না
তাদের কবিতা ও গানে, শিল্পে ও মনোসুষমায় কোনো অধিকার নেই
যারা পুতুল-দেবতা মানে না, তারা ভুলে যায়
মসজিদ-গীর্জা-গুরুদোয়ারগুলিও আসলে পুতুল

তারা আত্ম-ছলনাময় পুতুল-খেলা খেলতে চায় তো খেলুক
তারা বিশ্ব নিখিলের মধুরে-মধুর চিনবে না কোনোদিন!
এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ থেকে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না
এখনো বুঝলো না যে 'আকাশ' শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম কিংবা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
মানুষ শব্দটাতে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই
ঈশ্বর নামে কোনো বড়বাবু এই বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন না
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা সেই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না
তারা গর্জন-বিলাসী, অনুভব করতে পারে না ঐকতান
কিছু কিছু মানুষ আমাদের সাবালক করার জন্য মাথা খুঁড়ে গেলেন
তাদের বড় বড় ছবি ঝোলানো হয়, আসলে গ্রাহ্য করে না কেউ
আয় কানাই, আয় কামাল, তোরা আয়
পৃথিবী ভর্তি বুড়ো-খোকাদের পাগলামি দেখে
আমরা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করি!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রির রঁদেভু

রাত্রির রঁদেভু

সূচিপত্র

আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো

একবার চোখে চোখ, তারপর দু' দিকের পথ
আমায় সে চিনেছিল ? কিংবা সে দেখেছিল আড়ালে কারুকে ?
তাতে কিছু আসে যায় ? কথা নেই, দু'জনে দু'দিকে চলে যাওয়া
পেছনে ফিরিনি আর, আমার রাস্তায় কত বাঁক
দু' চারটে খানাখন্দ, জল-কাদায় কুচিকুচি আলো
জুতোয় কাঁকর ফুটছে, একা সিগারেট কিন্তু দেশলাই কোথায়
আমায় সে চিনেছিল ? চোখে চোখ, ছিল কোনো ভাষা ?
এক হোঁচট, টর্চ নেই, অলীক শরীর যায়, আসে
আমায় সে চিনেছিল ? আমাকে, না সে কাকে দেখেছে ?
শুয়ারকা বাচ্চা সব, কালো কুত্তা, হঠ যাও, মারবো এক লাথ
বন্ধ সব দোকানের তালাগুলো ভেঙে দেবো এককে ধাক্কায়
আমায় সে চিনেছিল ? বাতাসের ঘূর্ণি থেমে গেছে
আকাশে ইয়ার্কি বুঝি, এত তারা, উপড়ে নেবো সব
আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো, সে কোথায় গেল ?
অন্ধকার বাড়িগুলি, সব জানলা পোড়াবো ফুৎকারে
এ বিশ্ব উচ্ছন্নে যাক, অমরত্ব মূর্খের রটনা
করতলে ধরে রাখা জল, তার খেলা, সেই দর্পণে জীবন
আমায় সে চিনেছিল ? বলো, বলো, কার চোখে চোখ ?

যারা হারিয়ে গেছে

'বেণুবনে' বয়ে গেল হিল্লোল, আমি শুনতে পেলুম বাঁশঝাড়ে
শরশর আওয়াজ
আহা 'দখিনা পবন' তুমি এত স্নিগ্ধতা দিলে এই বিকেলে
কিন্তু কবিতায় আর কোনোদিন তোমার বন্দনা করতে পারবো না
তুমি থেকে যাবে রবীন্দ্রনাথের গানে
এখন কি আর কেউ 'বিরলে রোদন' করে না ?
দেখতে পাই না, ভাষাও তাকে ভুলে যাচ্ছে
'ওলো সই, ওলো সই', সমস্ত মনের কথা শেষ হয়ে গেছে
পঞ্চাশ বছর আগে
কোথায় হারিয়ে গেলে 'বাতায়ন' ?

‘গবাক্ষে’র আড়ালেও কেউ থাকে না ব্যাকুল প্রতীক্ষায়
‘সকরুণ বেণু’ আর বাজবে না কোনোদিন
তবুও আমি এক একবার পেছন ফিরে
খুব তীব্র ভাবে ফিরিয়ে আনতে চাই
‘মম’ ও ‘মুই’-কে
কিন্তু কলম মানতে চায় না
কলমও তো আর ‘লেখনী’ নেই যে !

বর্ষণমালা

১

এক পশলা বৃষ্টি খেয়ে বেড়াতে বেরুলো ছটফটে
কিশোরী নদীটি
সরল কদমগাছের দিকে চোখ টিপে বললো, যাবি ?
আকাশ একটু একটু করে নেমে আসছে, আবার উঠছে
আবার নামছে
কলাগাছের ছেঁড়া পাতায় কে যেন বাজাচ্ছে বাঁশি
ও বাঁশিওয়ালা, তুমি একবার ফুরুস ফুলগুলোকে কাঁদাবে না ?
পেঁপেগাছের পিঁপড়ে ঝাঁপ দিল মহাশূন্যে
মাটি থেকে সাত ইঞ্চি উঁচু দিয়ে ঘর্ঘরিয়ে ছুটে
গেল একটা রথ
রাস্তাটা একটু রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো
লিচু গাছের নতুন পাতারা পায়ের ধুলো নিচ্ছে
পুরনো পাতাদের
ডানায় পতাকা উড়িয়ে কোঁচ বক নদীটিকে বললো,
চল না কল্যাণেশ্বরীর মেলায়
নিমফুলের মৌমাছি ভুলে গেছে ঘর গেরস্থালির কথা
দিনের আলোয় একটা সাদা প্যাঁচা উড়ে গেল রাত্রির দেশে
তিনটে কাঠচাঁপা বন্দি করে রেখেছে রাজপুত্রের মতন
এক টুকরো রোদ
ও বাঁশিওয়ালা, তুমি একবার তোমার বন্ধুর ঘুম ভাঙাবে না ?

২

সেদিনও ছিল আকাশ ভাঙা বৃষ্টিময় সন্ধে
তোমার বুক মাদক ছিল, মৃদু ঘামের গন্ধ
নরম চাঁদ, দু'খানি চাঁদ, গোলাপি রঙা বৃন্ত
চক্ষে ধাঁধা, জিহ্বা তবু ভুল করেনি চিনতে
এসেছিলে কি নিরাভরণ নদীর মতো তন্বী
বুকে ছিল কি সুধা ? হায়রে ক্ষুধার্তের মন নেই
প্রথম নারী, তোমার চাঁদে আমার সেই স্পর্শ
অমৃত নয়, ঘামের নুন, তাই কেঁপেছি হর্ষে

৩

দৌড়োতে দৌড়োতে লাল মাটির প্রান্তর ভরা
বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে
বারান্দায় উঠে এলে তুমি
কে সেখানে বসে আছে
বেতের চেয়ারে, ওষ্ঠে সিগারেট
ভেজা শাড়ি লেপ্টে গেছে তোমার বাতাবি-নিতম্বে
সরস্বতী মূর্তির মতন কোমর
নাভিতে মেঘের ঘ্রাণ
সেই লোকটির হাতে কলম, কোলে একটি বাঁধানো খাতা
সে হয়তো কবিতা লিখছিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল
সাত লক্ষ কল্পনার সুতো
সরস্বতীর বন্দনা ছেড়ে সে দেখছে তোমাকে
তোমার উরুর ডৌল
সমস্ত বৃষ্টিময় দেশ ভরে গেল রভস গন্ধে
সেই পুরুষটির জাদুদণ্ডে জ্বলে উঠলো দাবানল
কলম আর খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে উঠে এলো
তোমার কাছে দয়া চাইছে যেন, আলিঙ্গনে উদ্যত
এক শরীরের নিঃসঙ্গতা অন্য শরীরের নিঃসঙ্গতাকে
গরলের মতো পান করতে চায়
ইতিহাস তখন স্তব্ধ হয়ে থাকে অন্তরীক্ষে
দেবতারা হাততালি দেয়, সন্ন্যাসীরা মুখ নিচু করে কাঁদে
বাঁশিওয়ালা তার বাঁশি বাজিয়ে আরও বৃষ্টিকে ডাকে
কয়েকটা শালিক শুধু দেখে গেল মেঝেতে গড়ানো
সেই না-লেখা কবিতা

৪

বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একা
বকুল ফুলের মতন বৃষ্টি, ঝরেছে বকুল, বৃষ্টি বকুল
ঝাপসা বাতাসে একটি ঝলক অচেনা নিজেকে দেখা

৫

বেলা যায়, বেলা যায়, শোনোনি সন্ন্যাসী ?
পাহাড় শিখর থেকে গড়ানো পাথর যেন, ক্ষয়ে আসে দিন
ধারাস্নানে সুষুপ্ত পৃথিবী
খেয়া ঘাটে কেউ নেই, একা একা নৌকোখানি দোলে
ফিরে এসো হে সন্ন্যাসী, তোমার দু' পায়ে এত ক্ষত
আর কত দূর যাবে ? জীবন ফুরিয়ে এলে তবু কোনো
পথ বাকি থাকে ?
জীবনই জীবন-সত্য, তার ওপারে আর-কিছু নেই
ফিরে এসো, হে সন্ন্যাসী, বাসনার মধ্যে ফিরে এসো
সাজ খোলো, ছোট ছোট দুঃখে কাঁদো, শিশুটিকে
কোলে তুলে নাও
ফিরে এসো, হে সন্ন্যাসী, কত ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে
জীবন ফুরিয়ে এলো; খেয়াঘাটে নৌকোখানি একা একা দোলে

৬

সুন্দর শুধু ব্যথা দেয়, শুধু বুক মোচড়ায়
সুন্দর নরম ডানায় আগুন ঝরায়
সুন্দর যেন হঠাৎ বৃষ্টি, অলীকের মতো তৃষ্ণা ছড়ায়
সুন্দর চায় গোপন অশ্রু, পূজারীকে পায়ে ঠেলে চলে যায়
সুন্দর আরও সুন্দরতর হয়ে আলেয়ার মতন ঘোরায়

সুন্দর তার নরম ডানায় আগুন ছড়ায়...

অলীক মানুষের সন্তান

যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, সেই গ্রাম অদৃশ্য হয়ে গেছে
বদলে যায়নি, একেবারেই শূন্যে বিলীন

গাছপালা নেই, পাখির বাসা, নির্জন পুকুর ঘাট, মানুষের কলস্বর
কিছুই নেই
পায়ে চলা পথ নেই, মেঘলা আকাশ নেই
যে তুলসীতলায় নতুন মামিমা অভিমানে চোখের জল ঝরাতেন
সেখানে একটি ঘাসও নেই
যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, সেই গ্রাম অদৃশ্য হয়ে গেছে
তবে কি আমি কোথাও জন্মাইনি ?
আমার ছেলেকে আমি যখন পড়তে বসাই, তার চোখে
এঁকে দেবার চেষ্টা করি সেই গ্রামের স্বপ্ন
যদি সেও মনে'না রাখে
তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার জন্ম
এক অলীক মানুষের সন্তান হয়ে সে কোথায় আশ্রয় খুঁজবে ?

সাঁকোটা দুলছে

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে সিদ্ধ মনস্কাম।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় ক'টি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিন দেশি।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দু'চোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে

এপারে শিশির পতনের নীরবতা।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা।

আমাদের ছুটি মন-বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি।

খেলায় খেলায় জীবন পৃষ্ঠা ওড়ে
খেলায় খেলায় ইতিহাস দেয় উঁকি
এদিকে ওদিকে পৃথিবীর পিঠ পোড়ে
কত না মানুষ ভুরু কুঁচকিয়ে সুখী।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধূ ধূ
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার ?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে।

অভিসার

সরল নির্জন রাস্তা মধ্য রাতের জ্যোৎস্নায়
নদী হয়ে আছে
হঠাৎ ডেকে ওঠে কোকিল
তুমি যেই মুখ তুললে অমনি খসে পড়লো
একটি স্বর্ণ চাঁপা
জলে ভাসছে সেই ফুল, ভিজে যাচ্ছে তোমার খালি পা
তোমার কানের লতির পাশে একটি জোনাকি
তুমি ঢেউ সরিয়ে সরিয়ে হেঁটে আসছো
শিঞ্জিনী নেই, তবু নাচের মতো শব্দ হচ্ছে রিনরিন
আমি বসে আছি পাহাড়-প্রান্তে এক পিপুল গাছের তলায়
তুমি নদী নিয়ে আসছো, স্বর্ণচাঁপা কোকিল আর
জোনাকি নিয়ে আসছো
হ্যাঁ, এটাই সত্যি, আর সব মিথ্যে
আমরা তিনতলার সিঁড়ি ভাঙা লোডশেডিং ঘর মিথ্যে
তোমার ঘুসঘুসে জ্বর, লোহার খাটে শুয়ে থাকা মিথ্যে
চব্বিশ ঘণ্টার হরতাল হচ্ছে কোনো এক অলীক নগরীতে
তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই
আমি বসে আছি পাহাড়-প্রান্তে, তুমি ভেসে এসেছো
জ্যোৎস্নার নদীতে
এই স্পর্ধিত সত্য চিরকালের...

নির্মাণ খেলা : দুই

রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা দোলে
জলে ভেসে আছে খানিক আকাশ খানিক মেঘের ছেঁড়া অবকাশ
রাত্রিবসনা এ কেমন নারী দেবতাকে দেয় নীল তরবারি
বুক পেতে দেয় ঊরু ঝলসায় মায়া সিন্দুক খোলে...

এই চারলাইন লেখার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। প্রায় মধ্যরাতে দোতলার জানলা থেকে পুকুরের জলে চাঁদের দোল খাওয়া দেখে কবিতার প্রথম লাইনটি মনে আসে। চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় জলের যৌন সম্পর্ক। প্রথম লাইনটি সে জন্য স্বাভাবিক। দ্বিতীয় লাইনটিতে অনেক দ্বিধার কাটাকুটি আছে। প্রথমে লিখেছিলাম,

'জলে ঢেউ ওঠে, জলে বিভঙ্গ আকাশের এক কণা'... । তেমন পছন্দ হলো না । ছন্দের চালটা বদলালে মন্দ কী ? দ্বিতীয়বার লেখার পর 'ছেঁড়া অবকাশ' নিয়ে একটু খটকা লেগেছিল, তারপর ভাবলাম, চলুক না !

তৃতীয় লাইনে নীল তরবারির বদলে প্রথমে লিখলাম 'মায়া তরবারি', এটা খুব সহজে প্রথাবাহিত ভাবে আসে । প্রথার ভূত মাথা থেকে তাড়ানো খুব শক্ত । কিন্তু চতুর্থ লাইনে 'মায়া' শব্দটা আমার আবার দরকার । মায়া তরবারির চেয়ে মায়া সিন্দুক অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ । আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে, তখনই দেখতে পাই নীল তরবারি ।

চাঁদ যখন দেবতা ছিল, তখন যৌন টানের নামই ছিল প্রেম । দেবতারা আসলে প্রেম জানে না । নীল আমর্স্ট্রং-এর পায়ের ধুলো পড়ার পর চাঁদ আর দেবতা নেই । তাছাড়া, এই চার লাইনের মধ্যে আমি কোথায় ? কাটাকুটি করে লাইনগুলি এই ভাবে রূপান্তরিত হয় :

এত শব্দ কেন, দিগন্তে কেন আগুন ?
বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে নেমে গড়িয়ে যায় রক্ত
কারা হঠাৎ হঠাৎ আমার কান ধরে টানে ?
ঘাড় মুচড়ে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেয় মুখ
মানব সভ্যতার মধ্যে কত শতাব্দীর আবর্জনা, এত নোংরা গন্ধ
মধ্যরাতে ঘর ছেড়ে, বাইরে চলে আসি
বুকে ভরে নিশ্বাস নিই, সেই বাতাসে মেশানো অশ্রু
নদীর জলে লুটোপুটি খাচ্ছে চাঁদ, এ যেন বিশ্ববিশ্রুত প্রেম
নিঃশব্দ নিশীথে দোলে হাওয়া
ওরা কিছুই জানে না
বারান্দায় একা বসে সমস্ত শরীর ও শ্বাস উষ্ণ হয়ে ওঠে
সাঙ্ঘাতিক ইচ্ছে করে নদীতে উন্মুক্ত হয়ে নেমে পড়তে
কিন্তু তাকে স্পর্শ করার আগে বারবার প্রশ্ন করি, আমাকে
ভালোবাসবে নদী ?

[এতে ছন্দ নেই, এত গদ্যময় হয়ে গেল রাত । আর লিখতে ইচ্ছে করে না । কলম সরিয়ে রেখে বারবার মনে মনে আওড়াই : রতিকৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা দোলে । রতি কৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা...]

রাত্রির রঁদেভু

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, বুক মুচড়ে মনে হয় যেন
এই শেষ দেখা
সহসা গোধূলি মেখে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে ঝাপসা সুদূরে
একটি পাখির শিস মাঝে মাঝে শুনি
কোনোদিন দেখাও হবে না
ধূসর মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি পান্থপাদপের মতো
এইখানে কথা ছিল রাত্রির রঁদেভু
কে কোথায় গেল
ফুলের রেণুর মতো মৃদু ডানা মেলে উড়ে যায় দীর্ঘশ্বাস।

পিঁপড়ের মুখে ধরে রাখা একটি চিনি-বিন্দু, এই যে জীবন
তার স্রোত থেকে কে কখন
নিঃশব্দে তলিয়ে যায়, কিছু অভিমান লেগে থাকে
ইস্কুলের ঘণ্টাধ্বনি, তারও স্রোত অবিস্মরণীয়
তবুও সিঁড়ির মুখে হাত তুলে বলতে ইচ্ছে হয়
যেও না, যেও না, ফিরে এসো
সান্ধ্য সম্মিলনে ফিরে এসো
প্রবাসে বা নিরুদ্দেশে অনেক বসন্তখেলা বাকি রয়ে গেছে
বকুল শাখার নীচে পাতা আছে ফুলের বিছানা...

পান্থপাদপ তো নয়, এ যে একটা বাজের থাপ্পড় খাওয়া গাছ
অন্ধকারে একা মুখ চুন করে আছে
তার হাহাকার শুধু নিজেই সে শোনে :
আমাকেও কি কেউ বলবে, ফিরে এসো, যেও না, যেও না !

বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায়

ওরা মেতে আছে কিসের নেশায় জানি না, আমি ছুঁয়ে আছি তোমাকে
ওরা হেসে খেলে বানালো এবং ভাঙলো, গণতন্ত্রের মহিমা
চাকা খুলে মুখ থুবড়ে পড়লো গ্রীস, রোমের দাপট টুকরো
পথের ধুলোয় বসে আছে এক অন্ধ, তাকে ঘিরে আছে মানুষ

তার গান শুনে মন ভরে যায় বিষাদে, আমি ছুটে যাই একলা
সারা সৃষ্টিতে কেউ নেই শুধু তুমি, বন্ধ ঘরের জানলা
অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে ধ্বস্ত, একদা ছিল যে দুনিয়া
অস্ত্রের বিভা, জয়ের প্রবল হাস্য, শোষক এবং শোষিত
সবাই নদীর কিনারে গাছের পাতা, গ্রাস করে নেয় প্রকৃতি
অন্ধ গায়ক ধুলোয় জ্বেলেছে আগুন, নোখের ডগায় মন্ত্র
সে-ই শুধু জানে সময় যায় না ফেরানো, সময় তো নয় পোষ্য
ছাই দিয়ে লেখে ভূমির ওপর কবিতা, যে পড়েছে সে-ই জেনেছে
আমি ছুটে যাই দেয়াল বিহীন ঘরের নীরব জানলা খোলাতে
যারা মেতে আছে দরজা ভাঙার খেলায়, রাত্রি শেষের বেলায়
শস্যের ক্ষেত রণভূমি চায় বানাতে, 'আমি' নই, বলে 'আমরা'
তারা থাক যত রঙিন স্বপ্নে মদির, সঙ্গীতহীন বধির
আমি এত ঝড় শেষেও তোমাকে চিনেছি, শেষ নিঃশ্বাসে চেয়েছি
তুমি নও কোনো রূপক অথবা উপমা, কালির আঁচড়ে রচনা
বলে দিতে পারি স্পষ্ট ভাষায় তুমি, রক্ত মাংসে প্রেম।

কবিতা গদ্য

—আত্মপ্রকাশ উপন্যাসখানা লিখতে তোকে কে মাথার দিব্যি
দিয়েছিল, সুনীল ?
হারামজাদা ছেলে, কবিতা লিখছিলি, হঠাৎ গদ্যের দিকে ঢলাঢলি
করতে গেলি কেন ?
ওরে লোভী পামর, তুই দু' কূল খোয়ালি ?
—কে তুমি, কে তুমি কেন আমাকে এমন বকুনি দিচ্ছো, মুখ দেখাও
জানো তো আমি আমি নিয়তিবাদ মানি না
রক্ত মাংসের না হলে গ্রাহ্য করি না দেবী সরস্বতীকেও !
—কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠা ছেড়ে কেন গেলি খবরের কাগজের গদ্যের দিকে
খুব টাকার আহিঙ্কে হয়েছিল, তাই না ?
—টাকা নয়, দু' মুঠো ভাত, তখন প্রায় খেতে পেতাম না
বিদেশ ফেরত এক কাঠ-বেকার
ট্রাম-বাস ভাড়াও থাকতো না, ওয়েলিংটনের মোড় থেকে শ্যামবাজার
পর্যন্ত যেতাম পায়ে হেঁটে
গদ্য তবু মজুরি দেয়, কবিতা যে কিছুই দেয়নি

—কবিতা কিছুই দেয় না ?
—কে তুমি, কে তুমি, মুখ দেখাও !
—বিশ্বাসঘাতক ! গদ্যের বর্ম পরেছিস বলে আজ
উচ্চারণ করতে পারলি, কবিতা কিছুই দেয় না
রক্ত মাংসের সরস্বতীর টুকরো দেয়নি ?
স্বর্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মাধুর্য-নিশানের ছোঁয়া পাসনি তখন ?
—ন্যাকামি করো না, ওহে অশরীরী, ওহে মধ্যরাত্রির কণ্ঠস্বর
সরস্বতীর টুকরো, স্বর্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এসব ঢপ কথা
বাঁচতে চেয়েছিলাম, শূন্য পকেট, জীবনভরা শূন্যতা, তবু
বাঁচতে চেয়েছিলাম, তুমি কী জানো আমার দুঃখ !
—এগুলোর নাম গদ্য ? লক্ষ্মীছাড়া আঙুল পুড়ে যায়নি কেন তোর ?
—পুড়েছে, আঙুল নেই, রক্তাভ নোখ নেই, আছে শুধু কলম
—আর ?
—সাদা পৃষ্ঠাকে কালো করার প্রতিজ্ঞা
অন্ধের মতন এক সুদীর্ঘ সফর, প্রতিটি দিন অসমাপ্ত
—পেয়েছো কি মধ্য যামে যা ছিল পাবার ?
—বেলাভূমিতে লাল লাল কাঁকড়াগুলো কি সমুদ্রকে পায়
নাকি সমুদ্র শুনতে পায় তার বন্দনাকারীদের ভাঙা গলা ?
জীবন এ রকম
—কবিতা তোমাকে কিছুই দেয়নি ? কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস, কিছু চিঠি
        পাটভাঙা জামা, না-ছেঁড়া টেঁকসই জুতো ?
—কেন গদ্য ভাষায় কথা বলছো, ওহে অদৃশ্য যাত্রা দলের বিবেক ?
ট্রাম লাইনের কর্কশ শব্দের মতন গদ্যে ঝঙ্কৃত হচ্ছে প্রেম
সব দিকে গদ্য, কবিতাকে আক্রমণ করছে গদ্য, টিনের চালে
অগভীর চোখ ধাঁধানো রোদ্দুরের মতন গদ্য, তবু তুমি কবিতাকে
আঁকড়ে ধরতে চাও, কে তুমি ?
—আমি রাস্তার একটা বাঁক, তোমার জামার একটা হারানো
        বোতাম, সুনীল !
—এখন আমি, রাত একটা চল্লিশে এই যা লিখছি
তা কবিতা না গদ্য ?

এক বিরহী ও অন্ধকারের গান

প্রথমে বন্দনা করি শুদ্ধ অন্ধকার
একা দেখা রূপ যার সহস্র প্রকার !

তুমি বর্ণময়ী, তুমি আকাশ পত্রিকা
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শিল্প, মূর্তিমতী শিখা
তোমাকে প্রথম দেখি চক্ষুহীন চোখে
যখন ত্রিশঙ্কু আমি এলোকে ওলোকে।
গর্ভগৃহে তুমি ঢেউ, দোলালে আমাকে
সুমেরু শিখর থেকে ঘোর কুম্ভীপাকে
কালপুরুষের সখী, বাঙ্ময় স্তব্ধতা
তুমিই আমার কণ্ঠে দিয়েছিলে কথা
মৃত্যুর সপত্নী নও, সত্যের জননী
চিন্তাদ্বার খুলে দিলে, তুমি চিন্তামণি
একা-দেখা রূপ যার সহস্র প্রকার
জয় অন্ধকার, বলো, জয় অন্ধকার !

আমরা আঁধার বেচে খাই, আমরা আঁধার কিনে খাই
এর এস্টক অফুরন্ত ভাবনা কিছু নাই
তোমার কতকখানি চাই ?
লে লে বাবু ছ-আনা
যে-কোনো টুকরো ছ-আনা
চৌকো গোল তিন কোণা
চিনি মেশানো অন্ধকার, রাঙতায় মোড়া অন্ধকার
আয় রঙ্গ হাটে যাই
একটু আঁধার চেটে খাই
এক পয়সার লটারি যেমন-তেমন নিতে পারি
সবাই মিলে দিচ্ছে ছুট
অন্ধকারের হরির লুট
ভাঙা-সাঁকো নদীর ধার
জলের দরে অন্ধকার
তোমার অন্য কিছু চাই ? তুমি চোখটি বোঁজো ভাই
আমরা আঁধার বেচে খাই, আমরা আঁধার কিনে খাই !

আঁধারের সহোদরা, কতকাল দেখিনি তোমায় !

ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড়

সকাল বেলাতেই ঝড় বৃষ্টির এমন হুল্লোড়,
ইচ্ছে হলো
কিছুটা বয়েস কমিয়ে ফেলা যাক না
জট পাকানো নানা রঙের সুতো, কয়েকটা গিঁটও কি
খোলা যাবে না ?
বাগান নেই, দাঁড়াই ছয়-বাই-তিন বারান্দায়
আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছে আকাশ
গেঞ্জির নীচে ভালোবাসার কাঙাল বুক
বুক ভর্তি রোম সাদা-কালো
চোখে দিগন্তের ধুলো
ঝমঝম শব্দে অশ্বারোহীরা ছুটে যাচ্ছে নিম্ন রাস্তা দিয়ে
ইস্কুল-বাচ্চাকে উদরে চেপে বাতাস ঠেলে এগোচ্ছে
এক তরুণী মা
একটা ফুটফুটে সাদা বেড়াল এখন হয়ে গেছে রুমাল
ভিজতে ভিজতে স্বচ্ছ হলো আমার শরীর
এখন নিজেকেই খুব আদর করতে ইচ্ছে করে
জট পাকানো নানা রঙের সুতোর একটা গিঁট
অন্তত একটা গিঁট
খুলছে, খুলবে না ? এই তো খুললো

একটি পাতা খসা

গাছের ডাল ভাঙে, শুকনো পাতা ঝরে
আমিও ভাঙি রোজ, নিজের কিছু ভাঙি
ব্রিজের মুখে দেখা, আকাশে লাল মেঘ
অরুণ আভাময় বললে চোখ তুলে
এখানে কেন এত গন্ধ দেহ দেহ
এখানে কারা এত শব্দ ভুল করে
এখানে নিশ্বাসে রক্ত মাখামাখি
এ সেতু বন্ধন হঠাৎ খুলে যাবে...
মানুষ ছায়া হয়, ছায়ারা ফিরে আসে

তোমার ভুরু কাঁপে, আকাশ চিরে যায়
হাতের নীল ছাতা মাটিতে ফেলে দিলে
কুড়িয়ে নিতে এল ছায়ার প্রহরীরা
ব্রিজের নীচে নদী পাগল নদী হলো
তোমার শাড়ি ঢেউ নিমেষে বুক খোলা
অচেনা চাহনিতে বললে চলো চলো
এসব গোধূলিতে ফেরার পিছুটান
আমার অক্ষির একটি পল্লব
সহসা ছিঁড়ে গেল বাতাসে উড়ে গেল
ঘূর্ণি জলে মিশে কিছুই কিছু নয়
তবুও আমি আর আগের মতো নেই
একটি পাতা-খসা গাছ ও আমি এক...

তুমি

শ্রাবণ সন্ধ্যায় তুমি, তুমি পূর্ণ শ্রাবণ বর্ষণে
শ্রাবণ না আশ্বিনের, তুমি কার, কে তুমি, কে তুমি ?
কে তুমি আমি তা জানি, সামান্য রমণী, মেলে আছো দুই ডানা
চোখ তুমি, ঈষৎ খয়েরি মণি তুমি, গাঢ় ভ্রূপল্লব তুমি
নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম, আগুনের ভেতরে আগুন
আঙুলের ডগা থেকে শিহরন, সোনালি বুকের দোল দোল
নারী ও কিশোরী তুমি, এই খুকি, এই মহামায়া
আয় আয় সর্ষে ক্ষেতে লুকোচুরি, আয় আয় কালো জলে ডুব
ইস্কুলের পথে বাধা, ভেজা ফ্রক, ঊরুর কম্পনে, হাস্যে তুমি
মরাল গ্রীবায় তুমি, ছেঁড়া জুতো, সেফটিপিন, হা হা
রাত্রির রাস্তার মতো প্রশ্নচিহ্ন, কখনো বা চাঁদের ঝলসানি
শ্রাবণ তোমার, তুমি অশ্রু স্বেদে ভাসাও স্বদেশ !

এক জীবনে

স্বপ্ন দেখার রাত, আচমকা জেগে ওঠার রাত
কখন মিলিয়ে গেল একটা নীল সরোবরে
পদ্ম ফুলের পাপড়ি মেলছে, ভোর
মোষের পিঠে চেপে বাঁশি বাজাচ্ছে একটা শ্যামলা রঙের বাচ্চা
সূর্য ওর খিদে আনে, সূর্য সকলের খিদে আনে
রোদ্দুর সবাইকে সাজগোজ করে তৈরি হতে বলে
সবুজ শান্তির মতন ধান খেতে লকলক করছে
দুপুরবেলার উনুনের আঁচ
জল কাদায় কোন এক পলাতকের পায়ের ছাপ !
বাতাস যখন-তখন একটা যাই যাই রব তোলে
সোনাঝুরির উড়ন্ত রেণুতে যাই যাই
বকের ডানায় যাই যাই
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিতে বিশাল ঝংকারের মতন
বেজে উঠছে যাই যাই
কথা শেষ হলো না, কথা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে
বেত গাছের ডগার মতন কাঁপছে বাল্যকালের লিপ্সা
অনির্ণয় হাত জোড় করে বলছে, যাই
অন্ধকার সুড়ঙ্গ, অমীমাংসিত ধাঁধাগুলি বলছে যাই
জীবন বয়ে চলেছে নিজের নিয়মে
এক জীবনে কী আর সব হয় !

ব্যক্তিগত ইতিহাস

পিঠে এত অস্ত্রের আঘাত, ভুল করো না, প্রত্যেকবার পালাইনি
পিঠ দিয়ে আড়াল করে সামনে তো কারুকে রক্ষা করাও যায়
সামনে যে থাকে, সব সময়ই কি সম্মুখযুদ্ধ,
সামনাসামনি ভালোবাসা হয় না ?

দু'হাত বাড়ালেই কি শুধু অস্ত্র,
আঙুলের ডগায় থাকে না স্নেহ ?
আমি জামা খুলে দাঁড়াতেই তুমি পিঠে হাত দিয়ে বললে,

আঙুলের ডগায় থাকে না স্নেহ ?
আমি জামা খুলে দাঁড়াতেই তুমি পিঠে হাত দিয়ে বললে,
ইস, এত ক্ষত তোমার ?
এ যেন পাথরগোড়ার রাস্তার মতন
আমি হেসে বললাম, না, রাস্তা নয়, এ সেই অতিকায় কূর্মের পিঠ
যাতে লেখা থাকে অনেক ইতিহাস
সব ইতিহাস গৌরবের নয়
সব সময় পিঠ দিয়ে রুখে সামনের কারুকে বাঁচাইনি
এক এক সময় ভালোবাসাহীন বন্ধুত্ব দেখে দৌড়ে
বাঁচবার চেষ্টা করেছি
ভালোবাসাহীন হিংস্রতায় আমি ভয় পেয়েছি
কাপুরুষের মতন ছুটেছি এদিক ওদিক
এসো, তুমি সামনে এসো, হাত পেতে নাও
আমার আত্মসমর্পণের বীরত্ব।

হায়, ধর্ম !

শনিবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯২
মাঠে মাঠে রবিশস্য বোনার কাজ চলছে সারাদিন
নামলো সন্ধ্যা
পাতলা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়েছে দূরের পাহাড়
পাখিরা ফিরছে, বাতাস বইছে বিপরীত দিকে
এখন ঘরে ফেরার সময়
যাদের ঘর নেই তারাও ফেরে
ওদের ক্লান্ত পা, গলায় গুনগুনে স্বর, মাথায় জড়ানো গামছা
পাম্প হাউজে এসে টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নিল হাত মুখ
আঃ কী নির্মল, ঠাণ্ডা জল, ধরিত্রীর স্নেহ
জুড়িয়ে দেয় শরীর
একটা বিড়ির সুখটান, তারপর উনুন ধরাবার পালা
কয়েকজন রুটি পাকাবে, দু-একজন রাঁধবে অড়হড় ডাল,
ভেণ্ডির সবজি
আর একজন না-সাধা গলায় গাইবে গান :
"হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা

কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা...”
যে গায় এবং যারা শোনে, তাদের এক ঝলক মনে পড়ে
সুদূর পূর্ণিয়া জেলার গ্রামের বাড়ি, ঘরওয়ালী ও
বাল-বাচ্চার মুখ
ওরা এখন পঞ্জাবের ভাড়াটে চাষী
অন্যের জমিতে এক মৌসুমের ঠিকা
দিনভর সূর্য পোড়ায় মাথা, নিঙড়ে নেয় মজ্জা
সন্ধেবেলা পেটের মধ্যেই জ্বলে উনুন, চোখ দিয়ে খাওয়া
ডাল-রুটি
তারপর খোলা আকাশের নীচে খাটিয়ায় চিৎপটাং
বিড়িতে টান দিতে দিতে ঘুমোবার আগেই দেখা দু-একটা স্বপ্ন
জীবন এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করেনি...
রুটি সেঁকা হয়ে গেছে, ফুটন্ত ডালে যেই দেওয়া হলো লঙ্কা
ফোড়ন
তখনই এলো দুই আগন্তুক, হাতে সাব মেশিনগান
ছদ্মবেশ ধরার কোনো চেষ্টাই নেই, চোখে নেই দ্বিধা
কেউ কারুকে চেনে না, এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও শত্রুতা
ছিল না
সেই দুই কাল্পনিক দেশপ্রেমিক ছেলেখেলার মতন চালিয়ে দিল
গুলি
উল্টে গেল ডালের গামলা, ছড়িয়ে গেল বাসনা-নিশ্বাস লাগা
রুটি রাশি
জানলোই না কেন তারা মরছে, বুঝলোই না মৃত্যুর রূপ কেমন
পঁচিশজন সেখানেই শেষ, বাকিদের ছিন্নভিন্ন হাত-পা
এবার ছুটে আসবে শকুন-শেয়ালের পাল....

দুই আততায়ী অস্ত্রের নলে ফুঁ দিয়ে ধীর পায়ে উঠে গেল
জিপে
গ্রামের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা
কোনো বাড়িতে শ্বেত শ্মশ্রু এক বৃদ্ধ পাঠ করছেন গ্রন্থসাহেব :
“সাধো মন কা মান তিআগউ
কাম ক্রোধু সংগতি দুরজন কী তাতে অহিনিস ভাগউ...”
জমির ফসলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস
এই মাত্র চাঁদ উঠে ছড়িয়ে দিল জ্যোৎস্না

তুলসীদাসের দোঁহায় রামের গুণগান করছিল যে শ্রমিকটি

তার কণ্ঠ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে
রামচন্দ্রজী, তোমার ভক্তদের তুমি রক্ষা করলে না ?
যারা অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে রামমন্দির বানাবার জন্য উন্মত্ত
তারাও কেউ এইসব মানুষদের বাঁচাতে আসবে না কোনোদিন
গুরু নানক, আপনি দেখলেন আপনার রক্তপিপাসু ভক্তদের
এই লীলা
গুরুজী, গুরুজী, আপনার নামে ওরা জয়ধ্বনি দিয়ে গেল ?

জম্মু থেকে এই শনিবারই একটা বাস ছাড়লো
সকাল সাড়ে আটটায়, যাবে কাঠুয়া
ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, শোনা যাচ্ছে মিশ্র কলস্বর
মায়েরা সামলাচ্ছে বাচ্চাদের, এক কিশোরীর হাতে
জিলিপির ঠোঙা
জানলায় থুতনি-রাখা তার ছোট ভাইটির চোখে বিশ্বজোড়া
বিস্ময়
আকাশ আজ প্রসন্ন নীল, উপত্যকায় উড়ছে কুসুম রেণু
যাত্রীরা কেউ ফিরছে গ্রামের বাড়িতে, একজন যাচ্ছে বিয়ে
করতে
আপন মনে বাসটা যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
একটা বাঁক পেরুবার মুখেই বজ্রপাতের মতন বিস্ফোরণ
উড়ে গেল জিলিপির ঠোঙা ধরা কিশোরীর হাত
বালকটির ছিঁড়ে যাওয়া মুণ্ডুতে চোখ দুটো নেই
সন্তানকে বুকে জড়ানো জননী আর্ত চিৎকারেরও সময়
পেলেন না
কালো বোরখা পরা আর একটি রমণীর নিস্পন্দ শরীর
এই প্রথম উন্মুক্ত হলো প্রকাশ্যে
বলশালী পুরুষদেরও শেষ হয়ে গেল সব নিশ্বাস
মোট সতেরো জন, বাকিরাও মৃত্যুর অতি কাছাকাছি দগ্ধ
কেউ একজন যেন কৌতুক করে রেখে গিয়েছিল একটা
পেনসিল বোমা
সেই হত্যাকারী আল্লার সেবক, ধর্মের ঝাণ্ডা তোলার জন্য
রক্তনদী বইয়ে দিতেও দ্বিধা নেই
যারা প্রাণ দিল তারাও আল্লার সন্ততি
পাঁচ ওয়ক্ত নিত্য নামাজ পড়া দুই প্রৌঢ়ও নিস্তার পায়নি
এক মৌলবী সাহেবের ডান পা অদৃশ্য হয়ে গেছে
হায় আল্লা, হে খোদাতালা, হে খোদাতালা...

মনরোভিয়া, ডেট লাইন একত্রিশে অক্টোবর
কোথায় গেল সেই পাঁচজন আমেরিকান নান ?
আজীবন ব্রতচারিণী, তারা শরীর-মন নিবেদন করেছিল
যীশুকে
আর্তের সেবায় গিয়েছিল দেশ ছেড়ে অমন সুদূরে
কোথায় তারা ? না, হারিয়ে যায়নি, পাওয়া গেছে পাঁচটি
শরীর
লাইবেরিয়ায় যুযুধান দু পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে
ভূলুণ্ঠিত, বেআব্রু, রক্ত-কাদায় মাখামাখি
পরম করুণাময় যীশু কি সেই সময় চোখ বুজে ছিলেন ?

বোসনিয়া-সারবিয়াতে শুরু হচ্ছে গ্যাস যুদ্ধ
এতকালের প্রতিবেশী, শুধু ধর্মভেদের জন্য এত ঘৃণা ?
পশুরাও তো এমন ধর্মে বিশ্বাস করে না
মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের পুড়িয়ে মারছে যে বর্ণগর্বী হিন্দুরা
তারাই বাড়িতে বসে শ্লোক আওড়ায়, সব মানুষেরই মধ্যে
রয়েছেন নারায়ণ !

অন্য কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, কলম সরছে না আমার
না, কবিতা আসছে না, ইচ্ছে করছে না ছন্দ মেলাতে
খবরের কাগজে, বেতারে, দূরদর্শনে শুধু মৃত্যুর নির্লিপ্ত ধ্বনি
অসহায় বিরক্তিতে ছটফট করছে আমার সমস্ত শরীর
ধর্মশাস্ত্রগুলির মহান বাণী টুকরো টুকরো মনে পড়ে, তাতে
আরও কষ্ট হয়
'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর দণ্ড তব ?'
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি, কয়েক পা গিয়েই মনে হয়
কোথায় যাচ্ছি ?
কেন উঠলাম, কেনই বা ফিরে গিয়ে বসবো টেবিলে
কবিতা হবে না, তবু লিখে যাচ্ছি এই পঙ্‌ক্তিগুলি
না, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের জন্য নয়, উন্মাদ জল্লাদদের
জন্যও নয়
শুধু আগামী শতাব্দীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া এই সামান্য
দীর্ঘশ্বাস
মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া মানুষের আর কোনো ধর্মই থাকবে
না
তখন, তাই না ?

একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা

একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে আমরা ন'জন
কাঁথাটার ওপরটায় বেশ নকশা কাটা, সুতোয় তোলা ফুল ফুটেছে
অনেক সুনিশ্বাসের গন্ধ
আঙুলে সূচের খোঁচায় বিন্দু বিন্দু রক্ত প্রায় দেখাই যায় না
সে সব তো পুরোনো কথা, কেই-বা আজ মনে রেখেছে
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে আমরা ন'জন
পিঠের নীচে তেঁতুল পাতা, তাতে সব পিঠ এঁটে যায়
কিন্তু এই ছেঁড়া কাঁথায় শীত যাবে না, গা ঢাকে না
এদিক টানলে ওদিক উদলা
এ পাশের এই পুরুষটির যে গায়ে একটা গেঞ্জিও নেই
ও পাশের ওই মেয়েটির তো জ্বর এসেছে, ওর জন্য মায়া হয় না ?
শিশুটিকে শীত দিও না, ও যে আজ খায়নি কিছুই
সারাটা রাত কাঁথার টানাটানি চললে কে ঘুমোবে ?
ঘুম না হলেই ঝগড়াঝাঁটি
ঘুম না হলেই ধানের ক্ষেতে ফসল উধাও
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা তার তলাতে আমরা ন'জন
তবে কি আর গড়বে না কেউ তাজমহল, বা
নদীর ওপর হবে না আর নতুন সেতু
গানের জলসা শূন্য থাকবে, মাছি উড়বে ?
একটা মোটে ছেঁড়া কাঁথা, তার তলাতে স্বপ্নও নেই ?

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল
কিছু বুক-ডোবা, কোথাও পায় না পা
দিগন্ত ছোঁয়া তবুও অকূল নয়
এদিকে শ্যাওলা, ওদিকে পদ্মদাম
নীলিমা ভেঙেছে সবুজেটে মৃদু ঢেউয়ে
কেউ ভেসে যায়, কেউ ফিরে আসে কাছে
জলকে ভয় কি জল তো শুধুই জল
সাঁতার জানো না বাংলার যৌবন !

জলের ভেতরে আবাল্য লুকোচুরি
পথ নেই আর এরকমই পারাপার
আচমকা ঘাড় ঠুসে ধরে যদি কেউ
বুক ফেটে যায় তবু আকুপাকু শ্বাস
এক ঢোঁক খাওয়া আঁশটে ঘোলাটে জল
চরণামৃত যেমন নোংরা হয়
সাপের লেজের ছেটকানো ছিটে ফোঁটা
মিনু বৌদির অশ্রুর মতো স্বাদ।

রাত্রি ছড়ানো শান্ত গভীর জল
চাঁদের ছায়ায় হাতছানি দিয়ে ডাকে
জল নেই, রুখু মাঠে জ্বলন্ত স্রোত
শুকনো নদীর চরায় দীর্ঘশ্বাস
তবু ডাকে ঠিক শরীরের মতো ডাকে
রতি ব্যাকুলতা, ঈর্ষার বাহুপাশ
লকলকে জিভে নিজের রক্ত চাটে
ঘুমের ভেতরে ছুটে আসে হু হু বান

জলকে ভয় কি, জল তো শুধুই জল....

তোমার হাত

নিছক জ্যোতিষী বলেই তুমি লোকটার সামনে বাড়িয়ে দিলে
তোমার সাবলীল হাত
তোমার মায়াবিনী হাত
অস্পৃষ্ট, নির্জন বেলাভূমির মতন হাত, দিগন্তে লালচে আভা
বাতাসে ওড়া নিশ্বাসের মতন কত অসমাপ্ত রেখা
অসমতল অনাবিষ্কৃত দেশ
ঈষৎ কাঁপা আঙুলে দুলছে তেইশ বছরের হৃদয়
অনেক গোপন দুপুর, অনেক কান্না
তোমার হাত, অলৌকিক ইঙ্গিতময় হাত
ঐ লোকটা কী বিড়বিড় করছে তোমার হাত ছুঁয়ে
জানো না, জ্যোতিষীরা সবাই অন্ধ হয় ?

সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না

চাঁপা গাছটি যুবতী না বুড়ি
চাঁপা তার বয়েস জানে না
পাহাড় ডিঙিয়ে আসা ঝরনার দুধারে কত নুড়ি
সময়ের চিহ্নগুলি সময় মানে না
বাতাস কী কথা বলে শীর্ণতোয়া নদীটির কাছে ?
আছে, আছে, আছে।

সেই বার্তা নিয়ে উড়ে যায় একটি আচাভুয়া পাখি
কোনো কোনো মানবীরই মতো তার ডানা
আকাশে তখন কালো দুরন্ত বৈশাখী
শুধু মনোলোকে দেয় হানা
চরাচর মুখ গোঁজে, পাশ ফেরে অরণ্যের ঘুম
নগরে তখন বৃষ্টি, নাগরীর নূপুর মত্ততা
ভেঙে দেয় রাত্রির নিঝুম
কথা ভাঙে, কথা ভেঙে ভেঙে হয় পাহাড়ের মতো নীরবতা......
বাতাস তবুও কিছু বলে কানে কানে
সম্রাট অশোক তার মর্ম লিখে গেছেন পাষাণে।

ছাতিম গাছের নীচে বসে আছে যে-অন্ধ ভিখারি
অন্ধকারে মুছে যায়, ভোরের আলোর সঙ্গে জাগে
হাতের আঙুল কাঁপে, মুখে বল্মীকের ঘর বাড়ি
সে ওখানে গেড়ে আছে গৌতম বুদ্ধেরও কিছু আগে
গ্রামে গঞ্জে শুকনোস্তনী ঘোরে আম্রপালী
দিবাস্বপ্নে হানা দেয় মার
আয়ুর কৃপণ যত মুষ্টি আঁটে, খসে যায় বালি
ঘানির চাকায় ঘোরে মায়ার সংসার
বাতাস গোপনে তবু কী যে বলে খর্জুর বৃক্ষকে
মরুদেশ কাঁদে সেই শোকে।

পিতার অতৃপ্তি পুড়ে ছাই হলো গ্রামীণ আগুনে
পিতামহ রেখেছেন কাঠের সিন্দুকে দীর্ঘশ্বাস
কেউ যায় নিরুদ্দেশে, কেউ বাঁচে গোলাপের পাপড়ি গুনে গুনে
পাপোশের ধুলো চেটে যেন কার হলো স্বপ্ন নাশ।
দর্পণের উল্টো পিঠ কেউ মনে রাখে ?

ঘড়ির শিকারি চেনে কালপুরুষের মৃদু হাসি ?
মুষ্টিবদ্ধ বাঘনখে যারা বন্ধুদের গাঢ় আলিঙ্গনে ডাকে
তাদেরও উত্তরমেঘ নয় অবিনাশী
বাতাস তবুও বলে, আয়, কাছে আয়
দিন যায়, কেন বৃথা যায় !

হে সময়, একমুখী ধাবমান তীর, হে সময়
হে শতাব্দী, অলীক সীমানা
গানের মুদারা-তারা, প্রতীক্ষিত সম, শেষ নয়
আমি আছি, আমি নেই, তবু সব জানা
বাতাস কখনো ঘূর্ণি, আবার স্রোতের মতো বলে যায় হৃদয়ের কাছে
আছে, সব আছে !

নিজস্ব ভাষা

আমি এখনো কোনো পাখির ভাষা জানি না বটে, কিন্তু গাছের ভাষা জানি। এক রকম দু'রকম গাছ নয়, অনেক রকম গাছের।

সুতরাং ইস্টিকুটুম পাখিটির সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমি দেবদারু গাছকে অনুবাদক হবার জন্য অনুরোধ করি। আমাদের সংলাপের মধ্যপথে পাশের রাধাচূড়া গাছটি হেসে ওঠে। হাসির কোনো অনুবাদ করবার দরকার হয়না, পাখিটি ও আমি একসঙ্গে বুঝি।

পাখিটি তখন জানালো, যে খবর তুমি গোপনে চেয়েছিলে, তা সর্বজনীন হয়ে গেল। এমন অনুবাদের ভাষায় কথা কইতে গিয়ে আমি আগেও অনেকবার নিরাশ হয়েছি। যেমন, প্রিয় নারীর ভাষা বোঝা কত শক্ত। তার চেয়েও শক্ত তাকে আমার ভাষা বোঝানো। সেই নারী রাজপথকে মনে করে মশারি আর দুঃখকে মনে করে সাঁতার। সেই জন্য আমি পাহাড় ও নদীর সাহায্য চেয়েছি। নদীর ভাষা নারীরা বোঝে, কিন্তু নদীমাত্রই বিশ্বাসঘাতক। নদীও নারীকে চায়। আমার কথা না জানিয়ে নদী সেই নারীকে তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়।

পাহাড়েরও পক্ষপাতিত্ব আছে। সে এক নারীর বদলে অন্য নারীর প্রতি উপমা বদল করে। যাকে আমি মরালগ্রীবা বলেছি, তাকে সে মাধবীলতা বলে। একমাত্র বিশ্বাস করা যায় রাত্রির আকাশকে। উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু প্রকৃত নিঃসঙ্গ না হলে

সেরকম আকাশ কেউ দেখতে পায়না কখনো।
তাই বলা হয়না, বলা হয়না, কিছুই বলা হয়না!

মুহূর্তের অস্থিরতা

বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার বারান্দায়
শীতের রোদ্দুরে
আমারই মনুষ্যদেহ।

বাগানে অনেক ডালপালা, তার এক ডালে
কুসুম ফোটেনি
সেখানে আমার আত্মা।

কখনো আমার হিম আত্মা এই নরদেহ
চেয়ে চেয়ে দেখে
দেখার মতন দেখা।

কখনো লৌকিক চোখদুটি সুড়ঙ্গ দেখার
মতো সরু চোখে
আত্মার দর্শন চায়।

কিছুই মেলে না
মুহূর্তের অস্থিরতা ঘূর্ণি বাতাসের মতো উড়ে গেলে
আয়নায় রক্তের ছাপ পড়ে
আমারই থুত্‌নির রক্ত—

সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে

সাঁজোয়া গাড়ির সামনের দিকে উত্থিত লিঙ্গের মতো
কামানের ডগায়
কেউ একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল।

বৃষ্টি ভেজা সেই মালার সাদা ফুল, কোনো নারীর নরম করতল ছুঁয়ে এসেছে
সেই ফুল থেকে উড়ে এলো একটা পাপড়ি, বাতাসে এক পাক ঘুরে
লাগলো সৈনিকটির হেলমেটের ঠিক নীচে, কপালে
সৈনিকটি সেটা তুলে ফেলতে গিয়ে অনুভব করলো
তার অস্ত্রগুলো হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এত ঠাণ্ডা
তার শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে
সাব মেশিনগানের ম্যাগাজিন খালি করে সবকটা বুলেট
সে ছড়িয়ে দিল রাস্তায়
তারপর গা গরম করে নাচতে লাগলো দু'হাত তুলে...

রাস্তায় গড়িয়ে যাওয়া সেই বুলেটগুলোর একটা
কুড়িয়ে পেল এক পাঁচ বছরের বাচ্চা
দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়ি ফিরে সে হাতের রক্তিম মুঠো খুলে
সদ্য জেগে ওঠা একটা ঝর্নার স্বরে বললো,
মা, এই দ্যাখো
মা তখন বাগানে একটা মুমূর্ষু টিউলিপ চারায় জল দিচ্ছিলেন
পাহাড়ের কুয়াশার মতন মুখ তুলে দেখলেন
ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,
ছিঃ, এটা নোংরা, ধরতে নেই রে !
মায়ের হাতে কোন বীজাণু লাগে না, তিনি সেটা তুলে নিয়ে
ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নদীর জলে
নদীও সেটা গ্রহণ করতে চাইলো না, নদী ভুরু কোঁচকালো
মেঘের মতন ঢেউ তুলে যাচ্ছে নদী, একটা আলাদা তরঙ্গে
বুলেটটাকে গর্ভ থেকে তুলে
ফেলে দিল এক নির্জন বালিমাখা ঝোপের মধ্যে....

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে
এই পৃথিবী থেকে মুছে গেছে সমস্ত সীমান্তের কাঁটাতার
এখন অস্ত্র বলতে আছে শুধু মানুষের শরীর
এখন সব যুদ্ধই অতি ব্যক্তিগত, খুবই নিভৃত, যে
হেরে যায়, সে বেশি হাসে
সেই রকমই একটি দিনে এক যুবতী আর তার সখা ছুটে যাচ্ছে
নদীর প্রান্ত দিয়ে
একটা ঝোপের পাশে এসে তারা দেখতে পেল সেই বুলেট
যুবতীটি সেটা কৌতূহলে তুলে নিতেই বুলেটটি বলে উঠলো
এতদিনে আমার মুক্তি হলো, শোনো একটা

ফুলের মালার গল্প....
সেই ঝোপটাতে ফুটে আছে অনেক নাম-না-জানা কুসুম
গল্প শুনতে শুনতে ছেলেটি তুলতে লাগল একটির পর একটি
মেয়েটি মাথার চুল ছিঁড়ে গেঁথে নিল দুটি মালা
তারপর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে মালা দুটিকেই
দুলিয়ে নিল গলায়
ফুল-শরীরে নগ্ন হয়ে নামতে লাগলো নদীর জলে
নদী ছলোচ্ছল খুশিতে বললো, এসো—

আমাকে যেতে হবে

এলোমেলো বাতাসে ঘুরছে আমার না-লেখা কবিতা
সকালের ঘুম ভাঙায় আমার না-লেখা কবিতা
চায়ের টেবিলে অতিথি, তার মাথার পেছনের দেয়ালে আমার
না-লেখা কবিতা
সমস্ত কথা মিলিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের মতন
আমি জুতোর ফিতে বাঁধছি, আমার বুকে টনটন
করছে না-লেখার দুঃখ
প্রথম লাইনটি ম্যাজিকের মতন অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার আড়ালে
পথে পথে এত জনস্রোত, তার সঙ্গে মিশে আছে আমার
না-লেখা কবিতা
নারীর এক-পাশ ফেরা মুখ, অশ্রুত হাসি, ঝনঝন করছে
আমার না-লেখা কবিতা
বিকেলের ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ আমি ছটফট করে উঠি
এ পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে যেন যেতে হবে
আমার না-লেখা কবিতার কাছে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে, আমাকে
যেতে হবে !

একবার বুক খালি করে বলো

মনে করো তুমি মধ্যরাত্রি পেরিয়ে পৌঁছোলে সেই জঙ্গলে
ডাকবাংলোর দরজায় প্রকাণ্ড তালা
বারান্দায় পড়ে আছে একটা মরা কবুতর
তুমি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে নাচানাচি করছে অন্ধকার
ধুলো চেটে চেটে খাচ্ছে বাতাস
আর কেউ নেই, তোমার সঙ্গীর নাম নিঃসঙ্গতা
বেশ, এবারে বসো পা ঝুলিয়ে, শুরু হোক কথাবার্তা....

তোমার বয়েস কত ? চুয়াল্লিশ
আর নিঃসঙ্গতার বয়েস ?
তুমি যখন ঘুমোতে যাও, তখনও কি সে জেগে থাকে ?
আলো নেই একবিন্দু, তবু কী দেখেছো তুমি ?
তোমার খিদের মতন ভালোবাসা, না ভালোবাসার মতন
খিদে ?
লঘু যৌবনে ভুল মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে তুমি কী চেয়েছিলে
তলোয়ার, না টর্চ ?
প্রশ্ন চিহ্নের চেয়ে তোমার বিস্ময় চিহ্নের ব্যবহার বেশি ?
তোমার পাশে বসা সঙ্গীটি তোমার কাঁধে কখনো হাত রাখে ?
তোমার তখন শরীর কেঁপে ওঠে, না নিঃশ্বাসগুলো লম্বা হয় ?
আকাশের দিকে তাকিয়ে তুমি কখনো সাদা মেঘ, সাদা মেঘ
বলে কাতর চিৎকার করেছিলে ?
অনেকগুলো সুতো ছিঁড়তে ছিঁড়তে তুমি খুলতে পেরেছো গিঁট ?
প্রথম কবে শুনেছিলে একটা অদৃশ্য রথের তীব্র ঘর্ঘর শব্দ ?
শেষ কবে তোমার চোখের জল উপহার দিয়েছিলে ?
কাকে ?
বলো, বলো, একবার বুক খালি করে বলো,
চুপ করে থেকো না !

লাল ধুলোর রাস্তা

চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা একটা লাল ধুলোর রাস্তা
আমি ঐ রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি, আবার আমিই ট্রেনের জানলায়

আমার দু'পায়ে পৃথিবীর রং, কাঁধে একটা পুঁটুলি
ট্রেনের কামরায় অট্টরোল, আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে
একটি ছাগল চড়ানো বুড়ি

লাল ধুলোর রাস্তাটা কোথায় গেছে ? দু'পাশে ফসল-কাটা মাঠ
মাঝে মাঝে দু'-একটা তালগাছ, অচেনা বুনো ঝোপ
ঐ দিকের দিগন্তে লেগে আছে বড় মায়াময় জীবন
বিকেলের বাতাসে উড়ছে সম্ভাবনার নীল যবনিকা....
রাস্তাটা এখন অদৃশ্য, ট্রেন ছুটছে আরও দুরন্ত ছটফটানিতে
সকলেরই কোথাও না কোথাও পৌঁছোনোর ব্যগ্রতা
অথচ আমি হেঁটে যাচ্ছি, একটা ছাগলের বাচ্চা তুলে নিলাম বুকে
বুড়িটি ফিক করে হেসে অনাদি কালের ছবি হয়ে গেল।

কোথায় আমার দেশ

বাগানে নাম-না-জানা আগাছার উঁকিঝুঁকি, তবু মনে হয়
এক কোণে পরমার্থ মাথা গুঁজে আছে
উড়ে যায় গ্রীষ্ম-পরী, দৃশ্যের বিভায় এত আগুনের আঁচ
আমার মাটিতে চোখ, আমার মাটিতে কান
ধুলোমাখা ঠোঁট
বৃষ্টি নেই, অশ্রু নেই, আকাশ হারিয়ে গেছে কানামাছি ভিড়ে
হে মাটি, তুমি কি দেশ, তুমি কি জন্মের গল্প জানো ?
কোথায় আমার দেশ, সীমান্তের কাঁটাতারে
ছেঁড়া সুতো, ইতিহাস গড়াগড়ি যায়

বলো বলো, হে বধির, কোন্ দিকে যাবো
ছুরিকা ও ক্ষেপণাস্ত্র, মাথা নিচু করে আমি
এঁকে বেঁকে ছুটি
পৃথিবী এমন ছোট, দু'পা গেলে শেষ হয়ে যায়
কোথায় আমার দেশ, কোন্ দিকে, কোন্ অমরায়
শূন্যের গোলকধাঁধা, ধ্বংসের সহস্র আলো,
ধিক তোকে ওপেনহাইমার

মাটি এত প্রিয়, কত প্রণয়ের গন্ধ মাখা, তবু
মাটির গভীরে নেই
স্বপ্নের স্বদেশ !

এ জন্মের উপহার

কোলের ওপরে মাথা ভোরের আঙুলে মালা গাঁথা
বৃষ্টি মেঘময় দিন আবছায়া কিছুটা রঙিন
আমাকে ডেকেছো তুমি তোমার নিজস্ব বনভূমি
থেমে আছে সব কথা তোমারই রচিত নির্জনতা
সোঁদা গন্ধময় ঘাস মনে হয় সহসা প্রবাস
ঝরনা নদী নেই কাছে কুলু কুলু শব্দ তবু আছে
ওষ্ঠের অমৃতপান মালাখানি অলীকের গান
এখন পড়ে না মনে বেঁচে আছি কোন্ সন্ধিক্ষণে
নেই লোভ তৃষ্ণা ক্ষুধা মূর্তিমতী তুমিই বসুধা
এই দৃশ্য এই মায়া তোমার ছায়ার সঙ্গে ছায়া
এ জন্মের উপহার শরীরের ক্ষণিক উদ্ধার
গানখানি শেষ শুনে ঝাঁপ দেবো আবার আগুনে।

ভুল স্টেশানে

ভুল স্টেশানে নেমে গেল মোয়াজ্জেম, তখন
মিশমিশে মাঝরাত
সে অনেক দিনের কথা, সবটা ঠিক মনে পড়ে না
স্কুল সখার সঙ্গে মান অভিমানের কোনো ব্যাপার ছিল ?
কিংবা সেই স্টেশানেই ছিল তার বাড়ি
শুধু মনে পড়ে ঘুমন্ত কামরা থেকে যেন ঝাঁপ দিয়েছিল
সে

রাত জাগা চোখে চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে অন্ধকার

দেখা আমার নেশা
দৃশ্যের চেয়েও অদৃশ্যের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি
কখনো আবছা জোৎস্নায় সরলবর্গীয় বৃক্ষেরা
আমায় ডাকে
আদিম হ্রদ থেকে হঠাৎ যেন মাথা উঁচু করে শৈশব
দেশ-দেশান্তরে যখনই রেলগাড়িতে ঘুরি, রাত্রে ঘুম আসে না
ঠায় বসে থাকি জানলায়, অন্ধকার চলচ্চিত্র দেখায়
নিজের গালে হাত বুলাই, কনুইয়ের ফুস্কুড়িকে আদর করি
বড় একা লাগে, বড় চমৎকার লাগে
বিদেশের কোন্ অচেনা স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
আমি আচমকা চেঁচিয়ে উঠি, মোয়াজ্জেম, মোয়াজ্জেম !

তিনটি প্রশ্ন

প্রণামের ছলে খুব কাছে এগিয়ে গিয়েছিল আততায়ী
প্রণামের কী যে অভারতীয় অপব্যবহার !
তারপর তিনটি বুলেট, ধ্বনি নয়, বিমূঢ় প্রতিধ্বনি
নগ্ন বক্ষ ফুঁড়ে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা, তিনি তবু এগিয়ে গেলেন কয়েক পা
প্রার্থনা মঞ্চের দিকে, হাত জোড় করা, প্রার্থনা আর হলো না
তিনি শুধু শেষ উচ্চারণ করলেন, হে রাম
রামরাজত্বের রাম, দরিদ্রের কাল্পনিক মুক্তিদাতা, না নাথুরাম ?
ছন্নছাড়া, অতিকাতর, উদভ্রান্ত, তবু স্বাধীনতার বিবেক,
তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ।

সবাই বলে, গান্ধীজী মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য
প্রাণ দিয়েছিলেন
ক'জন মুসলমানের বাড়িতে গান্ধীজীর ছবি টাঙানো থাকে ?
পাকিস্তান-বাংলাদেশে কেউ গান্ধীজীর নাম সচরাচর
উচ্চারণও করে না
কেউ মনে রাখেনি, দেশ বিভাগের জন্য যিনি মাতৃহীন শিশুর মতন
অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন
হিংসার দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষুদ্র শরীরে অসীম সাহসী
অহিংসার তেজ নিয়ে

কেউ মনে রাখেনি, মনে রাখলেই জাগবে পাপবোধ
তিন খণ্ড হতে চায় আরও অনেক খণ্ড, কাঁটাতারের বেড়াজালে
তিনি কোথাও নেই
ছুরিতে ভাগ করা তাঁর স্বদেশে আজ ঝলসাচ্ছে
আরও অসংখ্য ছুরি
সবরমতী আশ্রমের সামনেই গড়াচ্ছে রক্তস্রোত....

তিনটি গুলির প্রতিধ্বনি আজও বুকের মধ্যে তোলে
তিনটি প্রশ্ন
পাবে ? পাবে ? পাবে ?
সনাতন ধর্মকে বসাও সিংহাসনে, সমস্ত মানুষ মুক্তি পাবে ?
পূর্বে ও পশ্চিমে ধর্মের ধ্বজা নিয়ে গড়া হলো যে-যে রাষ্ট্র
সেখানে ইসলামের সমভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ?
কেউ অমিত ভোগের লাস্যে হা-হা করে হাসে
কেউ ক্ষুধায় ভূমিতে জিভ ঘষে
ধর্ম ব্যবসায়ীরা কেউ ধর্ম মানে না
বাবরি মসজিদে ধর্ম নেই, রাম মন্দিরে ধর্ম নেই
হিন্দু মুসলমানকে মারবে, মুসলমান হিন্দুকে মারবে
পেছনে মুণ্ডওয়ালা একদল অদ্ভুত প্রাণী খুন করবে
আর একদল পেছনে মুণ্ডওয়ালাদের
মন্দির ভাঙবে, মসজিদ ভাঙবে, আবার মন্দির ভাঙবে, আবার মসজিদ ভাঙবে
এর বস্তিতে আগুন, ওর বস্তিতে আগুন
আবার মারো, এ ওকে মারো, সে তাকে মারুক
শিশুকে কেড়ে নিক, জননীকে পোড়াক
আবার ধ্বংস, আবার আগুন, আবার মারো,
মারো, মারো, মারো
শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছোবে ?

বুকের কাছে

শুকনো ডালে দুলছে আলোয় হলুদমাখা আলোকলতা
ওর ভেতরে কিছু একটা লুকিয়ে আছে
আকাশভরা ছেলেবেলার গানগুলো কে হারিয়ে দিল পুড়িয়ে দিল

সে গান ছাড়া মানুষ বাঁচে ?
বৃষ্টি-মাদল নদী শুনছে, আর কে শুনছে, যার যেখানে যাবার সময়
দু-একবার পেছনে চাওয়া
পোশাক টানে কিসের কাঁটা
দিঙনাগেদের খেলার ভুবন ছড়িয়ে আছে শব্দ-রেখায়
ব্যস্ত পাগল বুকের কাছে।

এমন দিন, কিছু রঙিন, কিছু ভুলের জীর্ণ পাতা,
নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে দ্যাখো, দ্যাখো
ঐ তো সেই অপ্সরাদের গানের খাতা ?
ধরো ধরো, মাঝি মাল্লা দৌড়ে এসো, চক্ষে ধাঁধা
নদীতে নেই, পাখির বাসায়
ধুলোর মধ্যে সুরের কণা
সর্ষে খেতে দুলছে ভ্রমর, চিরকালের সেই মধু-চোর
সেও জানে না ফুলের মধ্যে আর একটা কী লুকিয়ে আছে।

নির্মাণ খেলা—তিন

কাঁখে গাগরী, চলেছে নাগরী, সুঠাম তনুখানি
ছন্দ মিলে ঘেরা
[এরকম লাইন মনে এলেও তা নিয়ে কবিতা লেখা চলে না। কোমরের বদলে 'কাঁখে'র মতন আর্কেইক শব্দ কখনও কখনও ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে 'নাগরী' ও 'তনু' যোগ করলে একেবারে বৈষ্ণব কবিতার ধাঁচ এসে যায়। কিছু কিছু বাংলা গানে তবু এখনও এ রকম চলে। আমি গান লিখি না।
কিন্তু ছবিটি ? নারী শরীরের বর্ণনা প্রত্যেক পুরুষ কবির কলমে শিক্ষানবিশির পরীক্ষার মতো। সারা জীবন ধরেই এই শিক্ষানবিশি চলে। যারা ছবি আঁকে তাদের যেমন বহু ভঙ্গিমায় নগ্ন নারী-শরীরের রেখাচিত্র রচনায় পারদর্শিতা আয়ত্ত করতে হয়। গোধূলিবেলায় নরম আলোয় একটি বা কয়েকটি রমণী কোমরে কলসি দুলিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে যাচ্ছে, এই দৃশ্য চিরকালের। শুধু দেখার চোখ ও ভাষা বদলায়।]
কাঁখে সোনার কলস যায় নদীর কিনারে, দ্যাখো
কুচকুচে কালো এক রাধা
এত পাতলা শরীর যেন খায় না দু'বেলা, তার
বিষের লতায় চুল বাঁধা

[পেতলের কলসি খুব ঝকঝকে করে মাজলে সোনার চেয়েও উজ্জ্বল হয়। আমরা কেউ সত্যিকারের সোনার কলস দেখিনি। 'সোনার কলস' আবার অনেক সময় কোনও নারীর যৌবনের উপমা। 'কী করে বলো তো ভাঙলে তোমার সোনার কলসখানি ?' লতা দিয়ে কোনো মেয়ে চুল বাঁধে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু 'বিষের লতায় চুল বাঁধা' এমন বিদ্যুৎ ঝলকের মতন এসে গেল যে বদলাবার প্রশ্নই ওঠে না। 'পাতলা শরীর' না 'চিকন শরীর' ?]

আজ বাতাস উধাও আজ আকাশ কঠিন, আজ
মানুষের চোখে চোখে খরা

[এ কী, এ রকম তো লিখতে চাই নি। একটি রোগা গরিব, কালো কিশোরীর নদীতে জল সইতে যাওয়ার বর্ণনা শুরু করেছিলাম, তার মধ্যে খরা টরা এসে গেল কেন ? কী ভাবে যে আসে কে জানে। এটাই তো কবিতায় ম্যাজিক। এর পর অবধারিত...]

আজ আকাশ উধাও, আজ আকাশ কঠিন, আজ
মানুষের চোখে চোখে খরা
ছেঁড়া শাড়িটি কখনো ছিল নীল বা নীলের মতো
এখন সকল রং হরা

দেখা যায় না কোমর, ওর বুকের আঁচলে ধুলো
মন ছাড়া হাঁটে পায় পায়
ঠোঁটে অতীব গোপন কথা কাকে সে
শোনাতে পারে ?
নদী তাকে ডাকে আয় আয়

[নারীর বর্ণনা কিছুই হলো না। বাকি রয়ে গেল, পরবর্তী কিংবা তারও পরবর্তী কবিতার জন্য !]

স্টিফেন হকিং-এর প্রতি

যখন তাঁর বয়েস একুশ
প্রখ্যাত কয়েকজন ডাক্তার সখেদ গাম্ভীর্যে বলেছিলেন
স্টিফেন, তুমি আর বড় জোর আড়াই বছর বাঁচবে,
আমাদের আর কিছু যে করার নেই !
অসুখের নাম মোটর নিউরোন, চিকিৎসা শাস্ত্রের অতীত
একটার পর একটা অঙ্গ পঙ্গু করে দিয়ে হৃৎপিণ্ডের গলা টিপে
মারে

তবু সেই একুশ বছরের যুবকটির মস্তিষ্ক সেই অসুখকে চ্যালেঞ্জ
জানিয়েছিল
তুমি আমার শরীরকে হারাতে পারলেও আমাকে জয় করতে
পারবে না
দ্যাখো, আমি বাঁচবো, বাঁচার সমস্ত সম্ভোগ নিয়ে বাঁচবো

একদিকে নষ্ট হতে লাগলো শরীর, অন্য দিকে তীক্ষ্ণতর
হতে লাগল মেধা
আজ স্টিফেন হকিং-এর বয়েস পঞ্চাশ বছর
এই শতাব্দীর দ্বিতীয় আইনস্টাইন
অপ্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থবিদ, মহা বিশ্বতত্ত্বকে ধরেছেন গণিতে
চলৎ-শক্তি নেই, তবু তিনি জানেন এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য
এবং ধ্বংস নিয়তি
যাকে বাঁধা যায় না, সেই সময়কেও বেঁধেছেন ইতিহাসে
কথা বলতে পারেন না, আবিষ্কার করেছেন নীরব প্রেমের ভাষা
তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী, তিনি দিয়েছেন অনুভবের
মাধুর্য
তিনটি সন্তানের অলৌকিক পিতা হতে গিয়ে
প্রত্যেকবার বলেছেন,
অসুখ, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমার জেদ
সীমাহীন করেছো

কবিদের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞানীকে জানাই সহমর্মিতা
এই একজন স্রষ্টা, তিনি মৃত্যুর মুখে চুনকালি দিয়ে
নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন অনবরত....

এক পলক অতীত

নীল রঙের গাড়িতে যে-লোকটি এই মাত্র পেরিয়ে গেল
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়
সেই লোকটিই একদিন মাঝরাতে, ঐখানে, বাজারে রেলিং-এর সামনে
ভুঁইফোঁড় আততায়ীদের হাতে অকারণের চেয়েও অকারণে
মার খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল ধুলোয়

তারপর অন্তত কোটিখানেক মানুষের পা মাড়িয়ে গেছে
সেই জায়গাটা
দোকানগুলো বদলে গেছে, অন্যরকম গন্ধ
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় রমরম করছে সন্ধেবেলা
হকারের চিৎকারে
কষা মাংসের দোকানের সামনে ভিড়, দোতলা বাসের ধোঁয়ায়
ঢেকে গেল তিনটি রমণীর মুখ
নীল গাড়ির লোকটির চোখে চশমা, হাতে সিগারেট, ওষ্ঠে
গম্ভীর রেখা
সে এক পলকের জন্য দেখলো, সেই মাঝরাতের ধুলোয়
পড়ে থাকা ছেলেটি, সারা মুখে রক্ত মাখা
জামার পকেট ছেঁড়া, এক পায়ে চটি নেই
সে পাগলের মতন খুঁজছে তার হারিয়ে যাওয়া
কলমটা
শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিল, না পায়নি ? ঠিক মনে পড়ে না....

শিল্প নয়, তোমাকে চাই

শিল্পে গড়া আঙুল, তাই হাতছানিতে মায়া
কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
অনেক দূর চলে এসেছি, অনেক পথ ধাঁধা
বয়েস এমন পাকদণ্ডি যখন তখন হোঁচট
কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
ভুলেই গেছি কোথায় সেই যৌবনের হালকা-পাখা দিন
তোমার বুঝি এখনো সেই খেলার সাধ, নীরা ?

পাথরে গড়া মূর্তি নও, স্নিগ্ধ জ্যোতি, ছিলে অমূল তরু
আমি তখন ঘূর্ণি ঝড়ে অশান্তির রুদ্র টংকার
তবু আলিঙ্গন চেয়েছি, পাথর নয়, শিল্প নয়, নীরা
বাতাস-ধোয়া পায়ের পাতা তুমি শুধুই নারীর মধ্যে নারী
রমণী নয়, খুকি, তোমার গ্রীবায় ছিল সারাৎসার লীলা
স্পন্দ্যমান স্তনদুটিতে শুনেছি কান পেতে তোমার উন্মোচনের ধ্বনি
আমার হাত, খুনির নয়, কবির নয়, ঘামে সিক্ত হাত

এখন মাঝে মাঝেই আমার ব্যাকুলতার চোখে দেখার ভুল
রমণী নয়, পাথর, যেন বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত তুমি
ইচ্ছে করে পাথর হতে চাও কি তুমি, হৃদয়ে নয়, পায়ে
পায়ের আঙুল, জঙ্ঘা-উরু, শরীরী নয়, তোমার নয়, নীরা
যেন খোদাই শিল্প, যেন তোমার রূপ অনশ্বর হোক
কেউ চেয়েছে, কেউ তোমাকে জাদুঘরে, প্রদর্শনী শালায়
গৌরবের বন্দিঘরে রাখতে চায়, স্তুতি প্রশংসার নির্বাসনে
তুমিও তাই মেনে নিয়েছো, নরম পা পাথর হতে রাজি ?

কেন ডাকলে চন্দনের বনে হঠাৎ নিরালা সন্ধ্যায়
কোনোদিন কি ফিরবো আর, ফেরার পথে কাঁটা
যদি বা ফিরি, পুরনো সাজ পোশাক নিয়ে, ইঙ্গিতের টানে
কার জন্য ? পাথুরে পা, আধেকলীনা শিল্প কিংবা নারী
আমার নীরা, অথবা ভাস্কর্য হতে হতে ঈষৎ থামা
না না, আমি তোমাকে চাই, মূর্তি নয়, তোমাকে চাই, নীরা
স্বরূপ নিয়ে আয় রে সখী, শরীরে থাক ছটফটানি আলো !

আমার আমি

একটা ডালপালা মেলা গাছের নীচে আমি দাঁড়িয়ে
গাছটা আমাকে আমিত্ব দিচ্ছে
গুপ্ত জলপ্রপাতের মতন ফুঁড়ে উঠছে বাল্যকাল
রোদ্দুর, রোদ্দুরে চকখড়ির অসংখ্য রেখাচিত্র
গাছটা আমাকে আমিত্ব দিচ্ছে

পায়ের নোখে পথ হারা এক পিঁপড়ে কী সুন্দর
এই নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনতে পাচ্ছি পিঁপড়েটার পদশব্দ
বাতাস এক ঝলক দেখালো বিশ্বরূপ
খসে পড়লো একটা পাতা
ঝুঁকে তুলে নিলাম, সেই পাতাটায় লেখা আমার জীবনী
পড়তে পড়তে আমি হাসি। এত অচেনা রোমাঞ্চকর
শুধু দুটো একটা কাটাকুটি। জলের দাগ
এক কণা সেই জলের ফোঁটায় জাদু দর্পণ

চোখে ঘোর লাগে, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়
খুব অচেনা এক আমি।

ছেলে মেয়েদের গল্প

এক পুলিশের দুই ছেলে
একজন ক্লাশ টেনে, অন্যটি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে
একজন জেলখাটা দেশপ্রেমিকের তিন ছেলে মেয়ে
দু'জন এখনও হাবুডুবু খাচ্ছে, একজন পাড়ার মস্তান
একজন অধ্যাপকের দুটি সন্তানই বিদেশে
এক রেল খালাসীর পাঁচটি, কে কেথায় আছে, ঠিক নেই
এক আদর্শবাদী মন্ত্রীর সবেধন নীলমণিটি
ফুলে ফেঁপে উঠছে কূট বাণিজ্যে
এক সরকারি কর্মচারীর চকচকে মেয়ের স্বয়ংবর সভায়
নেমন্তন্ন খেয়ে ধন্য ধন্য করে গেল চার হাজার
উপহারদাতা
এক চিনিকল মালিকের ছেলে রোজ মুঠো মুঠো চিনি খায়
আর প্রবন্ধ লেখে দীন দুঃখীদের নিয়ে
ফুটপাথে খেলা করে তিনটে বাচ্চা, তাদের কে মা ?
আর কে বাবা ?
এক সাহিত্যিকের ছেলে হরদম ওড়াউড়ি করে বিমানে
জনসভায় গলা ফাটাচ্ছেন যে নেতা, তাঁর ছেলেটি বোবা
এক বাড়ির ঝি পোয়াতি, কাকের বাসায় কোকিলের ছানা...

একবার চাকাটা উল্টোপাল্টা ঘুরিয়ে দাও
মাতৃসদনের সব চাক্তিগুলো এলোমেলো হয়ে গেল
মনে করো
পুলিশ ভুল করে গুলি করে মারছে নিজেরই ছেলেকে ?
ঘুঁটে কুড়ুনীর ছেলে বাণিজ্যের লাইসেন্স পেয়ে গেল
মন্ত্রীর কাছ থেকে ?
সরকারি কর্মচারির চকচকে কন্যা যার গলায় মালা দিল নিরিবিলিতে
সে আসলে রেলখালাসীর কনিষ্ঠটি
চিনি খাচ্ছে ফুটপাথের বাচ্চা আর মালিকের ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে
চাকরির

কিংবা
চড়কের মেলায় এই সব ছেলে মেয়েরাই প্রবল ফুর্তিতে
এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নেচে
চলেছে...

নিজস্ব বৃত্তে

আংটির ভেতরে চাঁদ, সেই চাঁদ এইমাত্র স্নান করে এলো
চাঁদ তো চাঁদেরই মতো, আংটিটাই কিছুটা জটিল
অনাঘ্রাত কুসুমের মতো এই অঙ্গুরীয় কোনোদিন ছোঁয়নি অঙ্গুলি
নিরালায় পড়ে থাকে, নিরালাকে নরম আলোয় ঘিরে রাখে
ঝরে পড়ে শুকনো পাতা সারারাত শিশিরের মতো শব্দ হয়
আর সব মুছে যায়, কুকুর ও মানুষের হল্লা শুধু নিজেরাই শোনে
গভীর নিশীথে জেগে আমি বনপথে যাই বৃত্তটিকে খুঁজি
সে কেবলই সরে যায়, ফুলের রেণুর মতো পড়ে থাকে
গুঁড়ো গুঁড়ো চাঁদ।

এইভাবেই প্রতিদিন

একই বাড়িতে থাকি, সবাই অচেনা
একশো বাহান্নটা দরজা, প্রত্যেকটি দরজার আড়ালে
অন্য মানুষের গল্প, এতগুলি অজ্ঞাতজীবনী
লিফ্‌ট ওঠে, লিফ্‌ট নামে, ছায়াময় মুখ
প্রশ্ন নেই। তাই কেউ উত্তরও দেয় না। হাসি দিতে হয়
অত্যন্ত নিমগ্ন হয়ে যে যার নিজের নাকের ডগা দেখে।
মাথার পেছনে থাকে আয়না, চক্ষুহীন দেখা
মাখনের মতো ঘাড়, চুড়ো বাঁধা চুল, বিদেশি সুগন্ধ মাখা নারী
এত ঘনিষ্ঠতা, এত গরম নিশ্বাস, অথচ কেউ কারুর নয়
নামহীন চোখ, পরিচয়হীন হাত, মন-ছাড়া হাসি

এইভাবেই প্রতিদিন, দিব্যি চলে যাচ্ছে
একটুও অস্বাভাবিক মনে হয় না !

এক বনমানুষ

হাত ধরতে বলো, স্বেচ্ছায় হাত ধরবে না
পা মেলাতে বলো; পা মেলাবে না
একা সরে যাবে, লাফ দিয়ে ছোট্ট এক দ্বীপে
গুটিসুটি বসে থাকবে, ইচ্ছে মতো আঙুল পোড়াবে
কাছেই রয়েছে জল, তবু খুঁড়বে বালি
তার বুকের ক্ষতটি সে কারুকে দেখাবে না ।

দামামা বাজিয়ে ডেকে আনো, অজস্র দ্বীপের
নির্জনতা তছনছ করে ধরে আনো, তখন কথা শুনবে
এক তালে পায়ে পা মিলিয়ে গাইবে গান
আকাশের দিকে তুলবে মুষ্টিবদ্ধ শপথের হাত
শরীরের ঘাম দেবে, কত শত দেওয়াল বানাবে
এমনই বাধ্য যেন ঐকতানে লীন হতে চায়
অথচ রাত্তিরে বারান্দায় দ্যাখো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে
ও সেখানে নেই, হাতের শৃঙ্খলও আর নেই
জেগে উঠছে দ্বীপ, নিজস্ব গাছপালা ঘেরা দ্বীপ
তার মধ্যে এক বনমানুষ, বুকে জন্ম ক্ষত, চুঁইয়ে পড়ে রক্ত
স্নেহ নেই, মায়া নেই, সংসার চেনে না
শিরশিরে ব্যথার মতন একাকিত্বে হাত বুলোয়
তার সমস্ত বাসনা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যায় বাতাসে
আবার সেই বাতাসই নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে বলে, আঃ
সে কারুকে চেনে না, তাকে কিছুতেই চেনা যাবে না
এ পাশে শিউলি-রঙা ভোর, ও পাশে করমচা-গোধূলি
তার বুকের ক্ষতটিতে ঝলসায় অনেকগুলো শতাব্দীর ব্যর্থতা !

এত চেনা

স্টেশন থেকে বেরিয়েই মনে হলো, এখানে আগে এসেছি
পাশাপাশি দুটি ঝাউগাছ, ওদের মাঝখানের সুরেলা দূরত্ব
খয়েরি পুকুর পাড়ে একটি দীর্ঘগ্রীব বক খুব চেনা
দেড়তলা বাড়িটির পাশ দিয়ে সরু রাস্তা,
এ রকমই তো থাকার কথা ছিল

ঠিক ভেবেছিলাম, দূরে শোনা যাবে গায়ে হলুদের গান
সকাল সাড়ে ন'টার আলোয় সব কিছুই
এত পরিচিত
ছেড়ে চলে গেল ট্রেন, আর একটিও যাত্রী নেই
আকাশে এত কিসের ব্যগ্রতা ?
কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি
এত চেনা, অথচ নাম জানি না, এই
জায়গাটা কোথায়
যেখানে আমিই একমাত্র যাত্রী ?

চলে যাবো ?

শুধু শুধু কত যে সময় নষ্ট, সুন্দরকে দেখি না

গরম ধুলোয় হাওয়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
দু' পাশ দিয়ে কারা বাড়িয়ে দিচ্ছে অতৃপ্ত হাত
একটা পাথরের ঘুমভাঙা না দেখেই চলে যাবো ?
পশুরা মাটির দিকে চেয়ে চলে, মানুষই বা ক'বার তাকায়
আকাশের দিকে ?

পুকুরের জলে পড়লো ঢিল, কী অপূর্ব নিখুঁত বৃত্ত
একটার পর একটা
কোথাও থুতনিতে আঙুল দিয়ে ঘাটে বসে আছে জলকন্যা
তার স্তনবৃন্তে হিরেকুচি, জ্যোৎস্নামাখা চুল
আমি শুধু ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে শুনতে চলে যাবো ?

কত ভালোবাসা বাকি রয়ে গেল, চলে যাবো ?
বুকজোড়া ফাটল, শুধু মন খারাপের ঢালু পথ
ভালোবাসা হলো না, ভালোবাসা হলো না, চলে যাবো ?

নন্দনকাননে দ্রৌপদী

(একটি সংলাপ কাব্য)

[পদব্রজে হিমালয় অতিক্রম করে স্বর্গের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছেছেন যুধিষ্ঠির। ধুলোমাখা শরীর, ললাটে অনেক দিনের ঘাম। একজন দেবদূত তাঁকে প্রত্যুদগমন করে নিয়ে আসছেন।]

যুধিষ্ঠির : এই স্বর্গ !
দেবদূত : ধর্মপুত্র, ঐ অদূরে আপনার ঈপ্সিত নগরী।
যুধিষ্ঠির : এই স্বর্গ ?
দেবদূত : সহস্র বিদ্যুতে গড়া বৈদূর্য খচিত এই দ্বার
মেঘের ব্যজনে স্নিগ্ধ, কিছু দৃশ্য, খানিক অদৃশ্য
এই দ্বার পার হলে দেবসেব্য নন্দনকানন
এক পাশে শব্দহীন স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী নদী
যুধিষ্ঠির : মায়া নয়, মতিভ্রম নয় ? এই তবে স্বর্গভূমি ?
দেবদূত : বিশ্বাস হচ্ছে না ?
যুধিষ্ঠির : অবিশ্বাস নয়, তার চেয়ে আরও প্রগাঢ় বিস্ময়....
জানতাম কল্পনার সঙ্গে ঠিক মেলে না বাস্তব
জাগ্রত দেখার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর স্বপ্নের নির্মাণ
কিন্তু স্বর্গ, সে যে সব বাস্তবের শেষতম রূপ
সে যে অসীমের চির স্থির এক সৌন্দর্য প্রতিমা
এই কি সে স্বর্গ, কেন মনে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, সীমিত
আমার স্বপ্নের স্বর্গ যেন অন্য, যেন আরও দূরে ?
দেবদূত : হে পাণ্ডব কুলপতি, আপনার সন্দেহ সঠিক
স্বপ্নে দেখা স্বর্গে কেউ কোনোদিনও পৌঁছোতে পারে না
অথচ তা দূরে নয়। প্রকৃত স্বর্গও কিন্তু নয়
সম্পূর্ণ বাস্তব। এই সিংহদ্বার, নন্দনকানন
প্রতিদিন রূপ বদলায়। রূপের ভিতরে আরও
অসংখ্য রূপক।
যুধিষ্ঠির : এই সেই ত্রিজগৎ সুবিদিত নন্দনকানন
প্রতিটি বৃক্ষ ও পুষ্প, লতাগুল্ম সম্পূর্ণ অচেনা

স্বপ্নেও দেখিনি আগে। দেবদূত, আমি জেগে আছি ?

দেবদূত : অসম্ভব এই যাত্রা আপনিই সম্ভব করেছেন
প্রথম মানুষ, এক শরীরী মানুষ, মনোবলে
সকল যুদ্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জয়ে মহান বিজয়ী
মৃত্যু অতিক্রম করে এসেছেন পার্থিব আকারে
এই স্বর্গে ! ধন্য ধন্য হে কৌন্তেয়, ধন্য ধরা ধাম।
পারিজাত মাল্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন দেবরাজ
সেই মাল্য স্পর্শে আপনার সর্ব ক্লান্তি দূর হবে

[দ্বারের কাছে দেখা গেল একজন সুপুরুষকে। তাঁর চোখে-মুখে কৌতূহল। তিনি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন :]

দুর্যোধন : কে আসে, কে নতুন অতিথি ? দেবদূত, কে এসেছে ?

দেবদূত : যাঁকে খুঁজছেন তিনি নন, কিন্তু ইনিই সর্বোত্তম
স্বর্গের অতিথি।

যুধিষ্ঠির : কে ঐ দিব্যকান্তি, সৌম্য, ধীরোদাত্ত সুকণ্ঠ পুরুষ
কোন্ দেব উনি ?

দেবদূত : এখনো দেবতা নন, কিন্তু ব্যবহারে দেবোপম
আপনার ভ্রাতা, পূর্বজন্মে নরপতি দুর্যোধন

যুধিষ্ঠির : দুর্যোধন ?

দেবদূত : ক্লান্ত, ধূলিধূসরিত দেহ, দুই চক্ষুও আবিল
এখনই বিশ্রাম প্রয়োজন, ধর্মরাজ, তাই এমন বিভ্রান্তি
পুনরায় দেখে নিন, উনি কুরুরাজ দুর্যোধন !

যুধিষ্ঠির : দুর্যোধন, যাকে আমি ভগ্ন-উরু, ক্লেদাক্ত, নির্জীব
অবস্থায় শেষ দেখি, দুই চক্ষে ছিল বিষজ্বালা
পরাজয়ে হতমান, অন্তর্হিত বংশের মহিমা
তার এত প্রশান্ত শ্রী, এ যে অসম্ভব দেবদূত !

দেবদূত : হে রাজন, এ যে স্বর্গ, এখানে তো মুছে যায় সব
পার্থিব কলঙ্ক। মন্দাকিনী স্নাত পবিত্র সবাই
ন্যায় নিষ্ঠ ক্ষাত্র ধর্ম মেনেছেন যিনি আজীবন
সমস্ত সমরে শঙ্কাহীন, তিনি দেহান্তর মাত্র
স্বর্গ অধিকারী।

যুধিষ্ঠির : ন্যায় নিষ্ঠ ক্ষাত্র ধর্ম ? অভিমন্যু, নিষ্পাপ কিশোর
তার হত্যা, চরম কাপুরুষতা আরও কত শত

দেবদূত : এখন সে সব তর্ক বৃথা !
ভ্রাতৃহত্যা, বংশধর-সর্বনাশ মানুষেরই খেলা
হত্যার কুযুক্তি আর পঙ্কিল কাহিনী সমুচয়
ভুলে যান, মহারাজ !

[দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে চিনতে পারলেন। সাগ্রহে এগিয়ে এসে সপ্রেমে আলিঙ্গন করলেন ধর্মরাজকে। কিন্তু যুধিষ্ঠির সম-ব্যবহার করতে পারলেন না।]

দুর্যোধন : প্রিয় ভ্রাতা, যুধিষ্ঠির, আজ ধন্য আমি
তোমার স্পর্শের পুণ্যে ধন্য
তোমার সান্নিধ্যে শুধু সত্যের সৌরভ
সেই ঘ্রাণে ধন্য !

[যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের এই ভাষা বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।]

দুর্যোধন : সমস্ত মানবকূলে তুমি অদ্বিতীয়
সশরীরে স্বর্গে এলে
আমরা সেই গৌরবের অংশভাক্ ।
আমাদের বহুদূর পিতামহ পুরুরবা
তোমার কীর্তির কাছে ম্লান

দেবদূত : এবার চলুন ধর্মরাজ !

দুর্যোধন : ক্ষণেক দাঁড়াও, দেবদূত !
যুধিষ্ঠির, চেয়ে দেখ, শিলাখণ্ডে আবিষ্ট আসীন
আমাদের সবার নমস্য, উনি প্রথম কৌন্তেয়
আমাদের, কুরু ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের সর্ব জ্যেষ্ঠ

যুধিষ্ঠির : প্রথম কৌন্তেয় ?

দুর্যোধন : এখনো জানো না
যশস্বিনী জননী কুন্তীর তুমি
প্রথম সন্তান নও ?

যুধিষ্ঠির : জানি, হ্যাঁ, জেনেছি, তবে এমন সময়ে
যখন না জানা ছিল ভালো ।
ভূপাতিত, স্থির নেত্র, প্রাণহীন সেই মহাবীর
যাঁকে আকৈশোর আমি চরম ঘৃণায়
ভয়ে ও বিদ্বেষে চিরশত্রু বলে মনে মনে জানি
তিনি পঞ্চ পাণ্ডবের সহোদর ? আমার অগ্রজ !
এই জানা কি কঠিনতম শাস্তি নয় ?
এ যেন মায়ের হাতে বিনা দোষে নির্দয় প্রহার !

দেবদূত : শান্ত হোন ! শান্ত হোন !

যুধিষ্ঠির : আমি দ্বিতীয় পাণ্ডব !
আমি সিংহাসন-অধিকারী নই, ভুল, সব ভুল
সকলই তো প্রাপ্য তাঁর, যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বীর কর্ণ
তবে কেন এত হানাহানি, এত ব্যর্থ রক্তপাত
মহাকুরুক্ষেত্রব্যাপী আত্মীয়-বন্ধুর ছিন্ন শব

জায়া-জননীর হাহাকার !
ভাই দুর্যোধন, কী ভুল করেছি আমি, মিথ্যেই তোমাকে
স্বার্থান্বেষী, কূট ও কপট ভেবে, হৃদয়ে দিইনি স্থান
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো !

দুর্যোধন : ক্ষমার তো প্রশ্নই ওঠে না, ভাই, কারণ এখানে
কোনো ক্রোধ নেই
অনুতাপ, পরিতাপ অর্থহীন, কারণ এখানে
কেউ কারো শত্রু নয়
অসূয়া ও স্পর্ধাহীন অপার মিত্রতা
তারই নাম অবিমিশ্র সুখ, তারই নাম স্বর্গরাজ্য

দেবদূত : স্বর্গের সমস্ত সুখ বাসনা-সম্ভব
যার যার ইচ্ছেমত মুহূর্তে নির্মিত হবে গৃহ
কালস্রোত নেই তাই কোনো কিছু পুরোনো হয় না
রমণীরা সবাই স্বাধীনা, তারা স্বেচ্ছাপ্রণয়িনী
সম্পর্ক শৃঙ্খল নেই, অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেকের ।
খাদ্য ও পানীয় সবই চোখের নিমেষ দিয়ে গড়া
এই সব কিছু আজ আপনার ভোগ্য, শুধু আগে
পবিত্র সলিলা মন্দাকিনী নদী স্পর্শ করে নিন ।
শরীর-চৈতন্য শুদ্ধ হবে ।

দুর্যোধন : যুধিষ্ঠির, মানবজীবনে যাঁকে প্রণাম করোনি
সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ, তাঁকে একবার
সম্ভাষণ না করেই চলে যাবে ?

[যুধিষ্ঠির সঙ্কোচ ও লজ্জায় উত্তর দিলেন না । এই সময় কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে ফিরলেন । জ্যোতির্ময় পুরুষ, তাঁর অঙ্গে কবচকুণ্ডল ফিরে এসেছে । কৌতুক-হাস্য মাখা মুখ ।]

কর্ণ : এসো যুধিষ্ঠির ।

[যুধিষ্ঠির তবুও নীরব]

দুর্যোধন : মনুষ্য শরীর, তাই এখনো যায়নি ওর
মানবিক দ্বিধা ।

কর্ণ : এসো যুধিষ্ঠির, স্বর্গে স্বাগতম্ তুমি
তোমার পায়ের স্পর্শে এই স্বর্গভূমি ধন্য হলো
আমার অনুজ, তবু চিরকাল তুমি
আমার শ্রদ্ধেয়
হে ধীমান, তুমি সকলের চেয়ে বড় বীর
ভূলোক-দ্যুলোক জয়ী তুমি

যুধিষ্ঠির : হে অগ্রজ, ক্ষমাপ্রার্থী আমি
দুর্যোধন : আগেই বলেছি ভাই, এখানে ক্ষমার প্রশ্ন নেই
ভূপৃষ্ঠের কর্মফল ভেবে আর উতলা হয়ো না
কর্ণ : পাথরে-কণ্টকে রুধিরাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত শরীর
আহা কত কষ্টে পার হয়েছো কঠিন হিমালয়
মানবকুলের শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী তুমি, সবার প্রণম্য
যাও, বিশ্রাম ভবনে।
দুর্যোধন : এখনো সম্পূর্ণ গ্লানি মুক্ত নয় যুধিষ্ঠির
তাই রুদ্ধবাক
দেবদূত, তুমি ওঁকে পুণ্য স্নানে নিয়ে যাও !

[যুধিষ্ঠির সত্যিই কর্ণের সামনে আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। দেবদূত তাঁকে নিয়ে চললেন নন্দনকাননের অন্য প্রান্তে।]

যুধিষ্ঠির : স্বর্গের এ সিংহদ্বারে রয়েছে আমারই দুই ভ্রাতা
আর কেউ নেই কেন ?
দেবদূত : সূক্ষ্মদর্শী যুধিষ্ঠির, এ প্রশ্ন সঠিক
এ এক অতুল কীর্তি, সশরীরে স্বর্গে পদার্পণ,
এর জন্য সুবিশাল সমারোহ, আনন্দ উৎসব
আয়োজিত হয়েছে এ স্বর্গভূমে আজ।
কিন্তু ইন্দ্র আর সব জ্যোতিরিন্দ্রগণ
অপেক্ষা করছেন কিছু দূরে !
যুধিষ্ঠির : কৌতূহল মার্জনা করুন, দেবদূত
কেন দূরে ? পুত্র অভিমন্যু, পিতামহ ভীষ্ম, জনক-জননী
এঁদের দেখার জন্য উতলা হয়েছি আমি। কিন্তু তাঁরা কেউ
অধমের জন্য ব্যস্ত নন বুঝি ? এই বুঝি স্বর্গের নিয়ম ?
দেবদূত : স্বর্গের নিয়ম নেই কিছু
এখানে রাজা ও প্রজা ভেদ নেই, প্রহরীও নেই
বাস্তব ও পরাবাস্তবতা কিছু নেই
শোষণ-শাসন নেই, তবু হানাহানি
নেই এ রাজত্বে, শুধু কল্পনার বাধাহীন লীলা।
পাণ্ডুপুত্র, আপনার পিতা ও পিতৃব্য, সন্তানাদি যত
সকলেই অধীর অপেক্ষারত রয়েছেন
স্বয়ং সস্ত্রীক ইন্দ্র, অন্যান্য দেবতাবৃন্দ ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়ে
আছেন নন্দনকাননের অন্য প্রান্তদেশে।
সবাই জানেন আজ মহাত্মা কর্ণের অভিপ্রায়
তিনি এই সিংহদ্বারে সায়াহ্নবেলায়

প্রথম সাদর সম্ভাষণ জানাবেন দ্রৌপদীকে
কর্ণের সম্মানে তাই সকলেই কিছু দূরে সরে রয়েছেন।

যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী, আমার পত্নী, পুত্রের জননী....

দেবদূত : দ্রুপদনন্দিনী, যাজ্ঞসেনী
পৃথিবীর শেষতম ধ্বংসের নায়িকা
কথঞ্চিৎ নরক দর্শন সেরে তিনি আসবেন অচিরেই

যুধিষ্ঠির : বন্ধুর পার্বত্যপথে করেছি নিষ্ঠুর ভাবে যাকে পরিত্যাগ
যে আমার অত্যাগসহন
পঞ্চ পাণ্ডবের বক্ষমণি, সে আমার প্রাণাধিক
ত্রিলোকের সর্ব সুখ যার প্রাপ্য, সেই দ্রৌপদীকে
ভূমিশয্যা নিতে দেখে থামিনি একটুও, আমি
এমনই কঠিন।
এই নীতি নিষ্ঠা আজ তুচ্ছ মনে হয়
দেবদূত, আমি অনুতপ্ত, যেন সর্ব অঙ্গে সূচ
একটু দাঁড়াও, আমি পাণ্ডব বংশের
কুললক্ষ্মী, প্রতি মুহূর্তের স্মরণীয়া
দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে যাবো !

দেবদূত : এ কী কথা বলছেন, যুধিষ্ঠির !

যুধিষ্ঠির : অন্যায্য বলেছি কিছু দেবদূত ?
দ্রৌপদী আমার পত্নী নয় ? সে আমার
সঙ্গে যাবে, এটাই কি স্বতঃসিদ্ধ নয় ?

দেবদূত : ধর্মরাজ, আপনার অবিদিত কিছু নেই
এমনই ধারণা ছিল। তবে কেন এ হেন বিভ্রম ?
স্বর্গে পৃথিবীর কেউ কারো স্বামী কিংবা জায়া নয়
কেউ ভ্রাতা ভগ্নী নয়, সন্তান বা জন্মদাতা-দাত্রী নয়
নর-জীবনের সব সংস্কার মুছে দিতে হয়
এ যে চির যৌবনের রাজ্য, এই বিমূর্ত ভুবনে
প্রাক্তন সম্পর্ক যেন ছায়ামূর্তি, ধরা-ছোঁওয়া যাবে না কিছুতে
কর্ণ আজ দ্রৌপদীকে চেয়েছেন, এখানে অন্যের উপস্থিতি
মান্যযোগ্য নয় কোনোক্রমে। শুধু দুর্যোধন রয়েছেন
কর্ণের বয়স্য তিনি, দ্রৌপদীর দ্বিতীয় প্রণয়ী

যুধিষ্ঠির : আমার দক্ষিণ হাত অর্জুন কোথায় ?
অর্জুন, অর্জুন !

দেবদূত : অর্জুন আসেননি, কিছু দেরি আছে
ঐ তো আসছেন, এসে পড়েছেন শ্রীময়ী দ্রৌপদী
নরক পেরিয়ে আসা, অঙ্গে কোনো গ্লানি-চিহ্ন নেই

যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী ! দ্রৌপদী !

[লঘু পায়ে স্বর্গদ্বার পার হলেন দ্রৌপদী । বহুবর্ণ প্রজাপতির মতন চঞ্চলা, স্বর্গে প্রবেশের জন্য ব্যস্ত । ছুটে নন্দনকাননের মধ্যে গিয়েও কর্ণ ও দুর্যোধনকে দেখে ফিরে দাঁড়ালেন ।]

কর্ণ : পাঞ্চালী, কেমন আছো ? চিনতে পারো কি ?
স্বয়ম্বর সভাস্থলে যেমনটি ছিলে, ঠিক
তেমনই রয়েছো তুমি ।

দ্রৌপদী : দানবীর কর্ণ ? চিনবো না কেন ? এই দিব্যকান্তি
কখনো কি ভুলে থাকা যায় ?
তুমিও পূর্বেরই মতো অভিমানে অনন্য রয়েছো ।

দুর্যোধন : স্বাগত পাবক শিখা, দ্রুপদনন্দিনী
সামান্য নরকবাসে পাওনি তো তেমন যন্ত্রণা ?

দ্রৌপদী : ও কে, দুর্যোধন নয় ?
পারত্রিক কুশল তো ? না, না, আমি অত্যুত্তম আছি
নরক তেমন কিছু ভয়াবহ নয়, যে-রকম
রয়েছে রটনা ।
নরকে সবাই বেশ লঘু ও আমোদপ্রিয়, খুবই সাবলীল
অনেকেই পরিচিত, কোনো অত্যাচার দেখিনি তো
এ যেন সবাই মিলে বনবাস, অচেনা ভুবনে
চেনা মুখ সম্মিলন

দুর্যোধন : এই স্বর্গে রয়েছেন কত দিব্যাঙ্গনা ও অপ্সরা
তবু তুমি, হে পাঞ্চালী, বিধাতার অপূর্ব নির্মাণ
তুমি এলে, স্বর্গ আরও আলোকিত হলো ।

দ্রৌপদী : জানো নাকি এই স্বর্গ, এ আমার প্রাক্তন স্বদেশ
পৃথিবীতে অযোনিসম্ভূতা হয়ে কিছুদিন ভ্রমণে গিয়েছি
মানবলীলায় কিছু সুখ-শোক স্বাদ নেওয়া গেল
ফিরে এসে সব কিছু চেনা মনে হয়
পারিজাত পরিমলে সুস্নিগ্ধ বাতাস
এ ভূমির ধূলিকণা, প্রতিটি বৃক্ষের পাতা আমাকে চিনেছে ।

[দ্রৌপদী ছুটে ছুটে গাছপালাদের আদর করতে লাগলেন । যুধিষ্ঠির কাতর ভাবে দূর থেকে দ্রৌপদীর নাম ধরে ডাকলেন, দ্রৌপদী শুনতে পেলেন না । বরং হাতছানি দিয়ে কর্ণকে ডাকলেন কাছে ।]

কর্ণ : মানব জন্মের সব স্মৃতি তুমি অটুট এনেছো ?

দ্রৌপদী : সব নয় । তিক্ত-কটু-কষায়-কুৎসিত
স্মৃতিগুলি মুছে গেছে
স্মরণে রেখেছি শুধু মাধুর্য ও আনন্দের কথা

কর্ণ : স্বয়ম্বর সভাগৃহে আমাকে কঠোর প্রত্যাখ্যান
করেছিলে, তাও মনে নেই ?
তোমাকে প্রথম দেখা, সমস্ত দেখার শ্রেষ্ঠ দেখা
চকিতে মাথার মধ্যে শুরু হলো ঝড় ও অশনি
বিশ্ব চরাচর সব তুচ্ছ হয়ে গেল
চতুর্দিক অন্ধকার, যেন এক দ্বীপে শুধু তুমি
তুমি এক আলো দিয়ে গড়া মূর্তি, সত্য কিংবা মায়া
আমার চৈতন্যে শুরু হয়ে গেল তীব্র হাহাকার
মনে হলো, এক জন্মে আমার সমস্ত না-পাওয়ার
বিনিময়ে এই নারী, এ আমার, আর কারো নয়
লক্ষ্যভেদ অতি তুচ্ছ, প্রলয় সংহত করে আমি
এই বরবর্ণিনীকে পেতে চাই
আর তুমি ? আমার যোগ্যতা আছে কি না তার
প্রমাণও নিলে না ?
কটুবাক্যে ফেরালে আমাকে

দ্রৌপদী : প্রত্যাখ্যান করিনি তো, যৎসামান্য কৌতুক করেছি

দুর্যোধন : কৃষ্ণা, ভুলে গেলে, তুমি বলেছিলে, সূতজাতীয়কে
বরণ করবে না তুমি ?

কর্ণ : সামান্য মানবী নও তুমি, তবু তুচ্ছ জাত-পাত আর
বংশ পরিচয় মোহে ঢেকে নিলে মুখ
ব্যর্থ হলো আমার পৌরুষ !

দ্রৌপদী : ভেবেছি আঘাতে তুমি জ্বলে উঠবে দাবাগ্নির মতো
বীরশ্রেষ্ঠ, বাহুর দাপটে তুমি সকলকে প্রতিহত
করে দেবে, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণকুল ভয়ে মূর্ছা যাবে
সদর্পে হরণ করবে দয়িতাকে, আমি বীরভোগ্যা হবো ।

কর্ণ : সবলে নারীকে যারা পেতে চায়, তারা
প্রকৃত পৌরুষহীন, তারা ধিক !
ক্ষুধার্ত পশুরা চায় মাংসের শরীর
নারী যেন কাব্য রস, সুখদা স্বয়মাগতা হলে
অন্তরের রূপ খোলে, সেই রূপ পূর্ণ হয় প্রেমে
লক্ষ্যভেদ সেরে আমি তোমার সম্মুখে
প্রণয় প্রত্যাশী হয়ে দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়াতাম

দ্রৌপদী : সূর্যপুত্র, সেদিন তোমাকে আমি নিমেষে চিনেছি
হাস্যমাখা ওষ্ঠ, চক্ষে ক্রোধ, তুমি চকিতে সূর্যের
দিকে চেয়েছিলে, মনে আছে, সব কথা মনে আছে !
সূর্যের সন্তান তুমি, প্রথম পাণ্ডব

আমার জন্মের গূঢ় মর্ম ছিল তোমার অজানা ?
ধৃষ্টদ্যুম্ন আর আমি, যজ্ঞের আগুন থেকে জাত
বড় বেশি অগ্নি আর তেজে গড়া, হৃদয়েও জ্বলন্ত আগুন
দ্রোণ আর দ্রৌণপন্থীদের ভস্মসাৎ করে দেওয়াই তো
আমার নিয়তি
দ্রোণ তোমাকেও দিয়েছেন শুধু অবহেলা, তিক্ত অপমান
তোমাকে পেতাম যদি, কর্ণ, তবে যুদ্ধের অনল
সহজেই নিবে যেত, সপার্ষদ ধ্বংস হতো কপট ব্রাহ্মণ
আমার পিতার ক্ষুব্ধ আত্মা শান্তি পেত

কর্ণ : এসব তো রাষ্ট্রনীতি, বংশের স্পর্ধার ইতিকথা
প্রণয়ের ব্যাকুলতা মহাকাল-ইতিহাস কিছুই মানে না
যাজ্ঞসেনী, তোমাকে চেয়েছি আমি
নিঃসঙ্গ এ হৃদয় জুড়োতে !

দ্রৌপদী : তুমি ফিরে গেলে তাতে আমিও কি প্রত্যাখ্যাতা নই ?
একটি বাক্যও তুমি বলোনি আমার দিকে চেয়ে
দু'চক্ষু অন্যত্রগামী । তুমি দাতা; সেই অহঙ্কারে
অর্জুনের হাতে তুলে দিয়ে গেলে কাম্য রমণীকে ।
কর্ণ, তবু সমস্ত জীবন আমি তোমাকে খুঁজেছি
ভেবেছি যে-কোনো দিন তুমি এসে দাঁড়াবে সহসা
কুন্তীর প্রথম পুত্র এবং আমার অগ্রগণ্য স্বামী হবে
শোনোনি কৃষ্ণের দৌত্যে আমার আহ্বান ?

কর্ণ : সে অনেক দেরি হয়ে গেছে
শুধুই জন্মের সূত্রে প্রণয়ের অংশভাগী হবো ?
কৃষ্ণ বহুদর্শী, তবু তার সে প্রস্তাব হাস্যকর !
তোমাকে দ্বিতীয় দেখি, একবস্ত্রা, দ্যূত ক্রীড়াপণ্যা, যেন দাসী
তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠি, নীচতা আক্রান্ত হয়ে আমি
তোমার উদ্দেশে বহু বিষময় কুকথা বলেছি
কিন্তু তা যে এক ব্যর্থ প্রণয়ীর গূঢ় আর্তনাদ
কেউ কি বোঝেনি ? কৃষ্ণা, তুমিও বোঝোনি ?

দুর্যোধন : স্ফুরিত অধরা, কৃষ্ণা, এখনো রয়েছে ক্রোধ বুঝি ?

দ্রৌপদী : না, না, কোনো ক্রোধ নেই । শুধু খেদ এই
যখন নীরব ছিল নতমুখে মহা শক্তিধর পঞ্চপতি
আশা ছিল, তখন কর্ণকে পাবো পাশে
যে আমার প্রথম প্রণয়ী !

কর্ণ : এখন তোমার পাশে, এত কাছে কখনো আসিনি
নীলোৎপল সৌরভমাখা বরতনু, এই সুচারুহাসিনী

নারী, তুমি, তুমি কি অলীক ?

[দ্রৌপদী হাত বাড়িয়ে কর্ণের অঙ্গ স্পর্শ করলেন। দূরে যুধিষ্ঠিরের মুখ বেদনায় কুঞ্চিত হয়ে গেল।]

দ্রৌপদী : কামনা বাসনাময়ী আমি এক নারী
আগুনে জন্মেছি তাই সর্ব অঙ্গে বড় বেশি জ্বালা
কর্ণ : দ্রৌপদী !
যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী !

[দ্রৌপদী এবার তাকালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। ঈষৎ ভ্রূভঙ্গে হাসলেন। তারপর আবার ফিরলেন কর্ণের দিকে। দুর্যোধন একটু দূরে একটা শিলাখণ্ডে বসে পড়েছে।]

দ্রৌপদী : চলো, সখা, মন্দাকিনী সলিলে শরীর ধুয়ে নিই
আমার শ্রবণ উষ্ণ, চক্ষু উষ্ণ, শিরায় শিরায় দাবদাহ
আমার শৈশব নেই, তাই স্নেহ-মমতা জানি না
দেখিনি জননী ক্রোড়, তাই ঠিক মাতা হতে পারিনি কখনো
পায়ের আঙুল থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত যৌবনের আঁচ
আমি এরকম ভাবে গড়া
সেই আঁচ কিছুটা ভাসিয়ে দেবো স্বর্গনদী স্রোতে
কর্ণ : নদীকে যা দেবে তুমি, তা আমায় দাও
আমি প্রার্থী, আমি ধন্য হবো।
দ্রৌপদী : তুমি সূর্যপুত্র, তুমি আর কত আঁচ নিতে পারো ?
কর্ণ : এই নদী যত পারে, তার চেয়ে বেশি !

[দ্রৌপদী ততক্ষণে দৌড়ে চলে এসেছেন মন্দাকিনী তীরে। কর্ণ তার পাশে এসে দাঁড়াতেই দ্রৌপদী তাঁর দিকে জল ছুঁড়ে দিলেন। তারপর দু'জনেই খেলার কৌতুকে, নির্মল হাসিতে ভরিয়ে দিলেন দশ দিক।]

দেবদূত : এ কী ধর্মরাজ, আপনি অনড় প্রস্তরবৎ কেন
সম্মুখে চলুন, অতি বিশিষ্টরা প্রতীক্ষা-ব্যাকুল
ঢের দেরি হয়ে গেছে
পূর্বেই বলেছি, এই দৃশ্যখানি
আপনার না দেখাই ভালো ছিল, সুশোভন ছিল।
যুধিষ্ঠির : দেবদূত, আমি আর স্বর্গ অভিলাষী নই
ফিতে যেতে চাই
দেবদূত : এ কী অসম্ভব কথা। স্বর্গরাজ্য জয় করেছেন
সেই দার্ঢ্য, সেই কীর্তি, তার পুরস্কার চির স্বর্গসুখ
যুধিষ্ঠির : স্বর্গে কোনো স্বর্গসুখ নেই। সেই স্বপ্ন
আছে শুধু পৃথিবীতে। হায়, সব মিথ্যে হয়ে গেল !
হে সুভদ্র, আমাকে ফেরার পথ বলে দাও, কোন্ দিকে যাবো ?
দেবদূত : সশরীরে স্বর্গে তবু আসা যায়, ফেরে না তো কেউ

যুধিষ্ঠির : দ্রৌপদী, দ্রৌপদী !

দেবদূত : এ কী যুধিষ্ঠির, আপনার চোখে জল
ছি ছি, এই পুণ্যক্ষেত্রে ক্রন্দন করে না কেউ, দেখিনি কখনো
অশ্রুবিন্দু এখানে অচেনা, সে তো মর্ত্য, পৃথিবীর
লঘু দুর্বলতা

যুধিষ্ঠির : আমিও তো পৃথিবীর, আমিও মানুষ
হিংসা-ঈর্ষা-মোহ-মায়া সব কিছু মিলিয়ে মানুষ
ক্রোধ আছে, কান্না আছে, শরীরী নিয়ম সবই আছে

দেবদূত : ইন্দ্রের প্রসাদে
অচিরেই ইহলোক-চিহ্ন মুছে গিয়ে
দেবত্বে উন্নীত হয়ে অতি জ্যোর্তিময় কান্তি হবে আপনার

যুধিষ্ঠির : দেবত্ব চাই না আমি, আমাকে মানুষ থাকতে দাও
আমাকে মানুষ হয়ে বাঁচতে দাও
মানুষ, মানুষ !

[অদূরে কর্ণ ও দ্রৌপদীর জল খেলা ও প্রমোদের হাসি চলতেই থাকে । তার মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের কান্নার শব্দ ।]

কাব্যপরিচয়

স্মৃতির শহর

চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬। কবিতা সংখ্যা ২৭, পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য ১৫.০০।

প্রথম সংস্করণ কলকাতা বইমেলা ১৯৮৩।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ: শ্রাবণী ও প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়কে।

বইয়ের প্রথমে লেখক জানিয়েছেন—

"এই বইয়ের ২১ থেকে ২৩ সংখ্যক কবিতা আমার পূর্ব প্রকাশিত 'দেখা হলো ভালবাসা বেদনায়' নামে একটি দীর্ঘ কবিতার কিছু অংশ। ২৫ সংখ্যক কবিতাটিও 'আমি ও কলকাতা' নামে 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' নামের কাব্যগ্রন্থে ছাপা হয়েছে। বিষয়-সাযুজ্যের জন্য ওই রচনা এই বইতে আনা হল। বাকি সব কবিতা নতুন। পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাবার পর জানতে পারলুম বন্ধুবর শামসুর রাহমন-এর এই নামে একটি বই আছে। তবে সে বইটি গদ্যে, ঢাকা শহর বিষয়ে এবং কিশোরদের জন্য। আশাকরি এ কারণে কোনো অসুবিধে হবে না।"

'দেখা হলো ভালবাসা বেদনায়' কবিতাটি ওই নামাঙ্কিত কাব্যগ্রন্থে—কবিতা সমগ্র ২-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'আমি ও কলকাতা' কবিতাটিও 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' নামের কাব্যগ্রন্থে—কবিতা সমগ্র ১-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।'

সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে

দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৩৯৯। কবিতা সংখ্যা ৪৩ । পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য ১৫.০০।

প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯২।

প্রচ্ছদ: সুনীল শীল। উৎসর্গ: শামসুর রাহমান বন্ধুবরেষু।

বাতাসে কিসের ডাক, শোনো

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৭। কবিতা সংখ্যা ৩৭, পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য ১০.০০।

প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন। উৎসর্গ: দীপা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-কে।

বইয়ে একটি ভূমিকা আছে:

"আমার আগের কবিতার বইটি বেরিয়েছিল ঠিক দু' বছর আগে। এই বইয়ের কবিতাগুলি সবই প্রায় হালফিলের লেখা। শুধু 'রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা' কবিতাটি ১৯৬০ সালে রচিত ও প্রকাশিত, আগে কোনো বইতে যায়নি, এখানে রাখা হলো নিছক একটি স্মৃতি-মমতাবশতঃ। এ ছাড়া সম্প্রতি হঠাৎ কৃত্তিবাস পত্রিকার ১৩৬৯ সালের চৈত্র সংখ্যাটি

আমার হাতে আসে। সংখ্যাটি এখন দুর্লভ। ঐ সংখ্যায় আমি অ্যালেন গীনস্‌বার্গের দুটি কবিতার অনুবাদ করেছিলাম। কলকাতার একটি অতি সস্তার হোটেলের স্যাঁতসেঁতে ঘরে অ্যালেনের সামনে বসেই এই আক্ষরিক অনুবাদ-কর্ম সম্পন্ন হয়েছিল, মনে পড়ে। অনুবাদ-কবিতাদুটি যাতে একেবারে হারিয়ে না যায় সেই জন্যই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলো।"

নীরা, হারিয়ে যেও না

দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ১৯৯১। কবিতা সংখ্যা ৩১। পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য ১৫.০০।
প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৮৯।
প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন। উৎসর্গ: রফিক আজাদ প্রিয়বরেষু।

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯১। কবিতা সংখ্যা ৪২। পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য ১৫.০০। প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী। উৎসর্গ: বনি রায় ও কল্যাণ রায়-কে।

রাত্রির রঁদেভু

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫। কবিতা সংখ্যা ৪৪। পৃষ্ঠা ৭৪। মূল্য ২৫.০০। উৎসর্গ: সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়-কে।

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ংকর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে।
১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে।
একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত।

প্রচ্ছদ □ সুনীল শীল

কবিতাসমগ্র ৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

9 788172 158514

আনন্দ

কবিতা সমগ্র

সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ কালানুক্রমিক রূপে বিন্যস্ত করে প্রকাশিত হচ্ছে 'কবিতাসমগ্র'র এক একটি খণ্ড। বাংলা কবিতার যাঁরা প্রেমিক পাঠক, তাঁদের কাছে এ এক মস্ত খবর সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম সেরা রচয়িতা যিনি, তিনি বাংলা কবিতারও এক অতি শক্তিমান স্রষ্টা, তা কে না জানেন।
এই কথাটাও সবাই জানেন যে, পঞ্চাশের দশকে 'কৃত্তিবাস' নামক যে-আন্দোলন একদিন বাংলা কবিতার মোড় একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সুনীলই ছিলেন তার নেতৃস্থানীয় কবি। পাঠক, সমালোচক— সবাই সবিস্ময়ে লক্ষ করেছিলেন যে, এই কবি কোনও পুরনো কথা শোনাচ্ছেন না; তিনি যা কিছু লিখছেন, তারই ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক ঝলক টাটকা বাতাস, আর সেই বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে এমন এক সৌরভ, যা তার আগে পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
কথা সাহিত্য ও কবিতার দাবি একই সঙ্গে মেটানোর কাজটা বড় শক্ত। এ কাজ সবাই করতে পারেন না। সুনীল যে পেরেছেন, তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। সবদিক থেকে একজন সাহিত্যিক হয়েও এই সরল সত্য তিনি কখনও বিস্মৃত হননি যে, মূলত তিনি কবিই, এবং গদ্য নয়, কবিতাই তাঁর প্রথম প্রেম। সেই প্রেমের দাবি আজও তিনি মিটিয়ে যাচ্ছেন অকাতরে, পাঠকের আগ্রহকে সমানভাবে সঞ্জীবিত রেখে। তাঁর 'কবিতাসমগ্র'র এই চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তিনটি কাব্যগ্রন্থ।
এই সব কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা নানা বয়সি পাঠক-পাঠিকার স্মৃতিসম্পদ। বহু প্রবাদপ্রতিম পঙ্‌ক্তি আজও সকলের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর বহু আলোচিত কাব্যগ্রন্থ 'সেই মুহূর্তে নীরা' ছাড়াও 'ভোরবেলার উপহার' এবং 'অন্য দেশের কবিতা' এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু অগ্রন্থিত কবিতা, অনুবাদ কবিতা এবং ছড়ার সম্ভার।

২৫০.০০

ISBN 978-81-7756-713-6

কবিতাসমগ্র

৪

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

কবিতা সমগ্র ৪/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৩

ISBN 81-7756-713-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

KABITA SAMAGRA Vol: IV
[Poem]
by
Sunil Gangopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

দেবস্মিতা ও রাহুল দাশগুপ্ত-কে

ভূমিকা

এ পর্যন্ত আমার যে-কয়েকটি খণ্ড কবিতাসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে এই খণ্ডটির বেশ তফাত আছে। আগের খণ্ডগুলিতে আমার পরপর কাব্যগ্রন্থগুলি স্থান পেয়েছে, এই খণ্ডে শেষের অংশে কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়, সংযোজিত হয়েছে প্রচুর অগ্রন্থিত কবিতা। এত অগ্রন্থিত কবিতা এল কোথা থেকে? প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থে আমি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অনেক কবিতাই বাদ দিতাম, আঙ্গিকের দুর্বলতার জন্য, কিংবা কবিতার শরীরে লেপ্টে থাকা অনাবশ্যক ভাবালুতা, কিংবা নিছক সমসাময়িকতা। আমি মনে করতাম, হারিয়ে যাওয়াই সেইসব দুর্বল কবিতার নিয়তি।

যেমন, আমার জীবনে প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'একটি চিঠি', সেটি রচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে আমার বিভিন্ন গদ্য রচনায়। কিন্তু পনেরো বছর বয়েসে রচিত মূল কবিতাটি এমনই কাঁচা মনে হয় যে সেটিকে আমি স্মৃতি থেকে নির্বাসন দেওয়াই সংগত মনে করেছিলাম। ঠিক কোন বছরের কোন মাসে সেটি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তাও আমার মনে ছিল না। কিন্তু অনুজ কবি শ্রীশ্যামলকান্তি দাশ ১৯৫১ সালের মে মাসের দেশ পত্রিকার বিবর্ণ পৃষ্ঠা থেকে সেই কবিতাটি উদ্ধার করে আনে এবং দাবি জানায় যে ইতিহাসের খাতিরে সেই কবিতাটি কোনও কাব্যগ্রন্থে স্থান পাওয়া উচিত। তবু আমি অনেকদিন দ্বিধা করেছি। তারপর আরও অনেক শুভার্থী, বিশেষ করে তরুণ কবি শ্রী রাহুল দাশগুপ্ত অনেক লুপ্ত কবিতা উদ্ধার করে এনেছে সেই একই দাবিতে। কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ না হলেও তাতে সময়ের ছবি আছে। এই সংকলনে গ্রথিত সেই সব নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে আসা কবিতা সময়ের কথা মনে রেখেই পড়তে হবে। অনেকগুলিই কৈশোর ও প্রথম যৌবনে লেখা। কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রথম সংখ্যার কবিতাও রয়েছে এর মধ্যে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় রচিত কিছু ছড়া ও কবিতাও স্থান পেয়েছে।

'অন্যদেশের কবিতা' পৃথকভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ, কিন্তু সেটি এতদিন কাব্য সংগ্রহে স্থান পায়নি, কারণ অনুবাদ কবিতা মৌলিকের পাশাপাশি স্থান পেতে পারে কি না সে বিষয়ে মনস্থির করতে পরিনি এতদিন। পাছে সেটি হারিয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় এবার এই সংগ্রহের অন্তর্গত হলো। 'অন্য দেশের কবিতা'র বাইরেও যে আমি কিছু কিছু কবিতা অনুবাদ করেছি নানা সময়ে, তা মনেও ছিল না। ফিরে এসেছে সেই অনুবাদগুলিও। তবু আমার এখনও দ্বিধা রয়ে গেল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্র ন্থ সূ চি

সেই মুহূর্তে নীরা

সূচিপত্র

অনেক বসন্ত খেলা

অনেক বসন্ত খেলা হল তবু বাকি রয়ে গেল
একটি চুম্বন
নদীর কিনারে একা বসে আছি বিকেলের শেষে...
না, না, ঠিক নয়, আমি বহুদিন সেরকম
নদীকে দেখিনি
কবিতার ঝোঁকে লিখে ফেলা, যেন একটি প্রিয় ছবি
না ঘটলেও লেখা যায় না? ছবিটাও শিল্প-সত্যি নয়?
সে কথা এখন থাক, জানি কোনও নিরিবিলি নদী
আমাকে প্রতীক্ষা করে আছে।

যেমন কুসুম রাজ্যে সেবারের দুর্দান্ত ভ্রমণ
না, একটাও গাছ ভাঙিনি, এমনকী কোনও স্তনে
ছোঁয়াইনি দাঁত
তবুও সুগন্ধ শয্যা চক্ষু থেকে ঘুম কেড়ে নিল
নীরা, মনে পড়ে সেই স্বর্ণসন্ধ্যা? এখনও তোমার সঙ্গে
একটি ঘুম বাকি রয়ে গেছে!

সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ

সবচেয়ে সেই মধুর শব্দ
আবার দেখা হবে!
হোক না হোক, ঘুরতে ঘুরতে
যে যেখানেই যাই না।
মরুর দেশে পুড়তে থাকি
মেরুর দেশে লীন
বুকের মধ্যে ছলকে ওঠে
আবার দেখা হবে!

বকুল গাছে ঠিকানা লেখা
পাখির ঠোঁটে চিঠি
রাস্তাগুলো রজ্জু হয়ে
মারল হ্যাঁচকা টান
হলুদ বাড়ির নীল বালিকা
ভালোবাসল জল
ভালোবেসেছে জলের গান
গ্রাম্য ওফেলিয়া।

গড়িয়ে গেল কানাকড়ির
মতন একটি দিন
আর একটি দিন ঘোড়সওয়ার
ভিখারিদের রাজা
কত রকম খেলার সাজ
ছড়িয়ে থাকে ধুলোয়
জীবন ভোর প্রতিধ্বনি
আবার দেখা হবে!

মায়া-সংসার

দুলে দুলে দুলে দুলে মাটি ওঠে ফুলে ফুলে বাড়ি যাও বাড়ি যাও
বাড়ি যাও বাড়ি যাও, দেখো হাতলণ্ঠনে আছে কিনা কেরোসিন
দেখো পথ দেখে চলো, পেটে খিদে বড় খিদে, বাড়ি গেলে সব পাবে
লেবু আছে নুন আছে, কাঁচা লঙ্কাও গাছে, আছে আছে সব আছে
নেই নেই, পান্তার হাঁড়িতে যে হু হু হাওয়া, কেন এত হু হু হাওয়া
ফুটো হাঁড়ি চোখ আঁকা, জল ছোটে আঁকাবাঁকা চৌকাঠে ভাঙা শাঁখা
নেই নেই ভাত নেই, আমানি ও চিঁড়ে নই, গুড় নেই খই নেই
কী খাবে গো খাবেটা কী, খিদে জ্বলে দাউ দাউ পেটে কিল পেটে কিল
বউ ছেলে কোথা গেল, ছোট মেয়ে কাঁদুনিটা, সেই মেয়ে কোথা গেল
ঘরে নেই কেউ নেই, আলো নেই ঘর নেই, দেয়ালের চকখড়ি
দাগ নেই দাগ নেই, বসুধারা মুছে গেছে, ঘরভরা ভাঙা কাচে
তালগাছে কেউ নেই, পুকুরেও কেউ নেই, বাতাসেও ঢেউ নেই

কিছুই তো কাঁপে না গো, লাউডগা কাঁপে না গো, জানালার খড়খড়ি
কাঁপে না গো, কেউ সাড়া দেয় না গো, সারা পাড়া কোনও সাড়া দেয় না গো
ডাকো কার নাম ধরে, কেউ নেই, নাম নেই, নাম ছাড়া কিছু নেই
কেউ নেই একী কথা, নদীটিও কেউ নয়, নীরবতা কেউ নয়
কেউ শাঁখ বাজাল না, প্রতিবেশী সব ঘুমে, কেউ কিছু জানল না
কেউ জেগে উঠল না, একী ঘুম মায়াঘুম, ভাতঘম নেশাঘুম
আর সব ঠিক আছে, চাঁদ ঝোলে নিম গাছে, চাঁদ ফিকিফিকি হাসে
জোনাকিরা ঘোরে কাছে, আর সব ঠিকই আছে, ঠিকঠাক দূরে কাছে
শুধু তুমি একা ঠায় পাছ দুয়োরের কাছে, একা ঠায়, চোখে ভ্রম
কোনও ভ্রম, ভ্রম নয়, কিছু নেই কেউ নেই, সব আলো-ছায়া মাখা
দেখা যায় দেখা যায় এক মায়া-সংসার ফুৎকারে উড়ে গেছে
উড়ে গেছে উড়ে গেছে, ভূ-কাঁপনে পাতালের কোথায় যে নেমে গেছে
অথবা কি ছিল কিছু, বাড়ি ছিল, ঘর ছিল, প্রেম ছিল, আশা ছিল
বুকভরা দুধ ছিল, কোলজোড়া শিশু ছিল, কান্না ও হাসি ছিল, সব ছিল
কী বিশাল ভাঙনের কিনারায় তুমি একা, মাথা ঘোরে চোখ ঘোরে
তুমি একা তুমি একা, চোখে জল, এত জল, চোখে জল, হু হু জল
কেন আর একা থাকা, কেন আর একা কাঁদা, মাঠে যাও ছুটে যাও ছুটে যাও
মাঠে যাও, কাঠফাটা মাঠে যাও, জল দাও, বুকখালি করে দাও!

হাত ভরা চাঁপা ফুল

হাত ভরা চাঁপা ফুল, কে এনেছে রুপোলি শিকল
সে কি বিকেলের ব্যাধ? দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল
উপবাসী চোখ
মাঝখানে নিস্তব্ধতা, ক্ষণিক না অলৌকিক
আকাশ ঘুমিয়ে আছে আকাশের নীল বিছানায়
বাতাস হারিয়ে গেছে, যেখানে সবাই যেতে চায়
আমাকে শিকল দাও, তুমি চাঁপা ফুলগুলি নেবে?

ক্লাস সেভেনের বয়েস ছুটছে

ছাদ থেকে ছাদ বটের চারায় ভরে গেছে কার্নিশ
বকুলদিদির চুলের ফিতের মতন ছড়ানো
লকলকে কালো গলি
খিদে জ্বলন্ত ছোট্ট শরীর, আমার শরীর, দুপুরে দুপুরে একা
ক্লাস সেভেনের বয়েস ছুটছে, এ ছাদ ও ছাদ ডিঙিয়ে
ছুটছে, কখনও শূন্যে ঝাঁপ
বকুলদিদির আঁচলের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় লুটিপুটি খায়
সুতোকাটা এক কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি!

আহিরিটোলার দিক থেকে আসে গঙ্গা-বাতাস, উষ্ণ বাতাস
গলিতে গলিতে বাঁশির মতন ডাকে
ডাক পিওনেরা দ্রুত চলে যায়, জানালায় দুটি ব্যাকুল চক্ষু আঁকা
ও দুটি চোখের তপস্যাঘন রশ্মি ঠিকরে বিকেলের আগে
কোন দেশ থেকে ঝঞ্ঝাকে টেনে আনে
এক দমকায় উড়ে যায় ফুল, অঙ্কের খাতা, পোষা পায়রারা
দিক ভুলে যায়, সূর্যও পায় ছুটি
আকাশের রং শ্লেটের মতন, বিদ্যুৎ লেখে সংকেতময় চিঠি!

বকুলদিদির মুখ মনে নেই, দিন চলে গেছে, পুরোনো ফুলের
পাপড়ির মতো খসে খসে পড়া দিন
শুধু মনে পড়ে ঘামের গন্ধ, বকুলদিদির থুতনি-বিন্দু
ভেজা-ভেজা বুক, গন্ধে আকুল
গলিতে গলিতে ক্লাস সেভেনের
হঠাৎ থমকে থাকা!

আমার সব আপনজন

হিমালয় পর্বতকে পিতামহের সঙ্গে তুলনা দেবার কোনও
মানে হয় না
সে আমার অনেকদিন না-দেখা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতন
সকলেই জানে, গঙ্গা নদী আমার আপন বউদি
তাঁর বোন পদ্মার সঙ্গে ছিল আমার বাল্যপ্রেম
আমার দিলদরিয়া শৌখিন ছোট মামার সঙ্গে দার্জিলিং-এর
কী মিল
তাঁর ছেলের নাম রাখা হয়েছে পাগলাঝোড়া
আর রূপসী ছোট মামিটি ঠিক যেন কালিম্পং, তাঁর
আঁচলের সুগন্ধ নিয়েছি কতবার
যে দিকে তাকাই আমাদের পরিবারের লোকজন ছড়ানো
সন্ধেবেলা বঙ্গোপসাগরের হুহু বাতাস আমার বাউণ্ডুলে ভাই
আমার গান-পাগলা জ্যাঠামশাইয়ের বসতি বীরভূমে, তাঁর অনেক
সাকরেদ জুটেছে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায়
দুই পিসিমার অনেক ছেলেমেয়ে, তারা সব চব্বিশ পরগণা
বড়দি মেদিনীপুরে, দুই মেয়ে দিনাজপুরের দক্ষিণী আর উত্তরা
জলপাইগুড়িতে সেবার বন্যা হল, এক বুক
জল ঠেলে গেলাম রাঙাকাকাদের বাড়ি
বকফুল গাছে বসেছিল সত্যিকারের বকের ঝাঁক
আর ভয়ে কুঁকড়ে ছিল একটা মস্ত বড় সাপ
শিলিগুড়ি থেকে ছুটে এল মাসতুতো ভাই বোনেরা,
ফেরার পথে সেখানে আমার জ্বর
হল, আর জীবনের
প্রথম চুম্বন
রূপনারায়ণ নদীর পাশে কতবার ঘুমিয়েছি, জেগে উঠেছি আমি
আর দামোদর ঠিক যেন আমার স্বদেশি আমলের জেল-খাটা জ্যাঠামশাই
বড় মাসিমা আছেন মুর্শিদাবাদে, ছোট মাসি অভিমানিনী সুন্দরবন
কত আত্মীয়স্বজন সরে গেছে ঢাকা, মৈমনসিং, পাবনায়
কতকাল দেখা হয় না, কুচবিহারের বড়দি জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে,
বগুড়া, রংপুরের খবর জানিস?
মালদার টিয়া পাখির ঝাঁক আমার ছোট বোনের বন্ধুদের মতন গল্প
করতে করতে উড়ে যায় ওদিকে

রেললাইনের পাশের জলায় ফুটে আছে শালুক, তাদের ছোট ছোট
চুমু দিয়ে যায় কয়েকটা ফড়িং
হাওড়া-হুগলিতে মাটি কাটছে, লোহা পিটছে খুড়তুতো ভাইয়েরা
শান্তিপুর থেকে কেষ্টনগর যাবার পথে একটু একটু মন খারাপ দুপুর
বর্ধমানের আকাশের মেঘ দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে
হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে ট্রাক, দুধারের আদিগন্ত ধান খেতের
সবুজ ঢেউ আমার মা
মা, তোমার পাশে একটু বসি
আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও মা!

অণু-জীবনী

ঘুমে ডুব দেব, ওপরে কচুরিপানা
আজ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখায় মানা

গিয়েছি ভ্রমণে, সূর্য মেরেছে বান
অনেক কাহিনী দিনমানে খান খান

পাতালে প্রবাস যৌবন উৎসবে
একলা এসেছি একলাই যেতে হবে

অলীক নগরী, ভুল মানুষের ভাষা
মনোলোকে তর্জনী তোলে দুর্বাশা

যা ছিল হরিৎ হয়ে গেল পাংশুটে
ক্ষুধার অন্ন পিঁপড়ের খায় খুঁটে

ক্ষুধার কথাটি সাঙ্গ হল না বলা
রঙ্গ মায়ায় এত রূপ ছলাকলা

সারা জীবনের সঞ্চয় সঙ্গতি
সাদা পৃষ্ঠার সঙ্গে প্রবল রতি

মালাখানি ভেসে যায়

এমন সুন্দর গন্ধ কোন রমণীর গায়?
ফুরফুর করে হেসে ওঠে একটা রাত্রে-ফোটা ফুল
আগে এইসব ফুলের হাসির শব্দ শুনতে পেতাম না।
দৃশ্য বিন্দু ছাড়িয়ে চোখ যেত না প্রেক্ষাপটে
কত ফুল ফোটে, ঝরে যায়, তার কোনও উপমা দিইনি
ফুল নিয়ে এত আদিখ্যেতা করারই বা কী আছে
মানুষ তার জন্মদিনের চেয়ে মৃত্যুদিনে ফুল পায় বেশি,
রাশি রাশি ফুল, ফুলের কী বিপুল অপচয়
এখন হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকারে জোনাকির মতন এক একটা
ফুল উড়ে আসে
ঠোঁটে এসে লাগে, তৎক্ষণাৎ মনে হয়, এত চেনা!

নদীর পাশে বসে-থাকা নারী, সাত মিনিটের বেশি
নদীকে দেখিনি
নারীটি যে-ই উঠে দাঁড়াল, নদী মুছে গেল
তার এক আঙুলে ঢাকা পড়ে যায় পটভূমিকার বৃক্ষময় পাহাড়
সেই আঙুলের ডগায় সংকেতময় ভাষা, তার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে
কেটে গেল অর্ধেক জীবন
সে কিছুই জানে না, এ এমনই এক ধাঁধা, যার কোনও
স্রষ্টা নেই
সেই ভাষা দিয়ে গাঁথা মালাখানি পরানো গেল না তার গলায়
সে কখন হারিয়ে গেল বৃষ্টির আড়ালে
মালাখানি অন্ধকার নদীতে ভাসছে, ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে
নিরুদ্দেশে...

স্বপ্ন দর্শন

সরযূ নদীর তীরে গাঢ় সন্ধ্যাকালে
বাবরের সঙ্গে দেখা। তিনি হাঁটু গেড়ে
সোনালি উষ্ণীষ খুলে নামাজ আদায়ে

বসেছেন। আমি কোনও ধর্মেরই প্রকাশ্য
উদ্দীপনে অবিশ্বাসী। চুপ করে আছি
সম্রাট মেললেন চোখ, আমি করজোড়ে
নিবেদন করি তাঁকে, হে শাহেনশাহ
এই যে অযোধ্যা, আর রাম পরিবার
সত্য হোক বা না হোক, নেই ইতিহাসে
তবুও অজস্র লোক কল্পনায় মানে
এখানে কি মসজিদ না বানালেই নয়?

সম্রাট ঈষৎ হেসে অভয় দিলেন
ঠিক স্থলপদ্ম রং বামহাত তুলে
বললেন, ওরে বেটা, যতক্ষণ আমি
নামাজ পড়ছিলাম, তুই কি করছিলি?
পাশের মন্দিরে কেন পূজায় বসলি না?
মৃদু কণ্ঠে বলি তাঁকে, হে বাদশাহ, আমি
গোলামের চেয়ে দীন, গুস্তাকি মার্জনা
করবেন নিজ গুণে, তবু বলতে হবে
মানুষের পূজা কিংবা ধর্মচর্যা সব
আসলে তো অন্তরের। বাইরে দেখাবার
এমন কী প্রয়োজন? মঠ বা মসজিদে
আনাগোনা ব্যাপারটা কি ভড়ং না শুধু?
রামের মন্দিরটাও প্রয়োজনহীন
কোনও শাস্ত্রে মন্দিরের কথা কিচ্ছু নেই।

সম্রাট বাবর তাঁর নীল চক্ষে হেসে
চুপিচুপি বললেন, অচেনা কুমার
আমি এবংবিধ প্রশ্ন বড় ভালোবাসি
চক্ষু বুজে ভাবি আর মনে মনে বলি
মানুষ তো মানুষই, তবু ধর্মের বিভেদে
বিজয়ীর তলোয়ার ঝলসে ওঠে কেন?
ধর্ম কিংবা মনুষ্যত্ব, এই দোলাচলে
কাটিয়েছি বহুদিন, এইবার আমি
বুঝেছি এ সার সত্য, মন্দির-মসজিদ
অহং-এর খেলাঘর, ঐশ্বর্য-পুতুল

আল্লা মিঞা এসব কি গড়তে বলেছেন?

চেয়ে দ্যাখ নদীস্রোতে ভেসে যায় কাল
চন্দ্রপ্রভ আশমানে দীপ্ত নীরবতা
ওপারে অরণ্যময় সুঘ্রাণ বাতাস
চক্ষে কেন অশ্রু আসে, কেন কাঁপে বুক
সুন্দরের পীঠস্থান এই বসুন্ধরা
যারা কলুষিত করে, তারা কি জানে না
এ জীবন অসীমের একটি ফুৎকার!

নাম নেই

ছেলেবেলা ইস্কুল-মোড়ে একটি মুচিকে বসে থাকতে দেখতাম। আমার বাবা, ঠাকুরদা কিংবা লর্ড ক্লাইভের আমল থেকেই সে ওখানে বসে। বৃষ্টির ঝাপটা, রোদে পোড়ানি, শীতের কাঁপুনি সে তোয়াক্কা করে না। ঠায় বসে বসে সে ঠুক-ঠুক করে গোড়ালি পেটে, চামড়া সেলাই করে, বুরুশ ঘষে। মা বলতেন, কাবুলি চটিটা এরই মধ্যে ফেলে দেবার কী আছে, মুচিকে দিয়ে সারিয়ে আনো। কোনওদিন তার নাম জিজ্ঞেস করিনি। পাড়ার লম্বা-চওড়া লোকেরা এসে বলত, ও মুচি, তাড়াতাড়ি পাম্পশু জোড়া পালিশ করে দাও তো! তার বসে থাকার ভঙ্গি, মুখ, চোখ কোঁচকানো হাসি, ফাটা বাঁশের মতন গলার আওয়াজ, সব মনে আছে, তার নাম জানি না।

(২)

প্রায় প্রত্যেকদিন একটা লোক বাড়ির মধ্যে আসে, বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে একজন মানুষ বটে, কিন্তু তার নাম নেই। সত্যেন দত্ত তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, সে অবশ্য তা জানে না। স্কুলে আমরা সেই কবিতা পড়েছি, ব্যাখ্যা লিখেছি, তবু বাড়িতে তার সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। খালি পা, কোমরে হাফ লুঙ্গি, সবসময় মুখ নিচু করে থাকে। কাজের মেয়েটিও হাঁক দিয়ে বলে ওই যে মেথর এয়েছে! আমার স্ত্রী নরম করে বলে, জমাদার!

বছর কয়েক আগে আফ্রিকার নাইরোবিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই তো গত মাসে চিনদেশে। দু'জায়গাতেই মেথররা জুতো-মোজা পরে, ফুলপ্যান্টে শার্ট গোঁজা, তাদের প্রত্যেকেরই নাম আছে। আমাদের মুচি-মেথরদের ভোটের সময়ও নামের খোঁজ পড়ে কিনা, আমি জানি না।

লাল রাস্তায় খড় বোঝাই গাড়িটি

লাল রাস্তায় খড় বোঝাই গাড়িটি ক্যাঁকো কুডুপিং শব্দ তুলে
যাচ্ছে পৃথিবীর মন্থরতম গতিতে
পেছন দিক থেকে মনে হবে, গাড়োয়ান ও গোরুদুটি অদৃশ্য
সোনালি খড়েরা পিঠোপিঠি শুয়ে রোদ্দুরকে দিচ্ছে রং
বাতাসে দু'-একটি পলাতক
আমি সাইকেল চেপে আসছি, পাশ কাটানো যাচ্ছে না।
মাঠ-উজাড় ধানলতা আপন মনে চলেছে দুলকি চালে
সাইকেলের রিরংসা রিরংসা ধ্বনি চালকটি শুনতে পায় না
ধ্যানী বুদ্ধের মতন তার আধবোজা চোখের নিরাসক্তি
গোরু দুটিরও যাত্রা শুরু আড়াই-তিন হাজার বছর আগে
এমনও হতে পারে স্বয়ং ঈশ্বরই এই গাড়িটির চালক
তাঁর কোনও তাড়াহুড়ো নেই
লাল রাস্তা চলেছে অসীমের দিকে সোনালি খড় পিঠে নিয়ে
ক্যাঁকো কুডুপিং ক্যাঁকো কুডুপিং সংগীত শুনছে এই ব্রহ্মাণ্ড
এর মাঝখানে আমি এক সাইকেল আরোহী, আমার ছটফটানি
আমি অনন্তের কেউ না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বদ্ধ জীব
মানুষের ফসল নিয়ে মানুষ কাড়াকাড়ি করে, সামনে চলেছে খড়ের গাড়ি
বাঁধের এক পাশে ক্ষুদে নদী, অন্যদিক বড় বেশি ঢালু
ঈশ্বরবাবু যখন পথ ছাড়বেন না, তখন অগত্যা কী আর করা যায়
আমি সাইকেল থামিয়ে হিসি করতে করতে গান গাই...

উপকথার জন্ম

একটা গোলাপ বাগানে চাঁদের আলোয় মধ্যরাতে
শুয়েছিল আকুল মূর্ধজা, নীল শাড়ি আলুলায়িতা এক কুমারী
তার দুঃখের গল্পটি কেউ জানে না, সেই ভূলুণ্ঠিতার
চোখের জলে ভিজেছিল মাটি
বৃষ্টি নেই অনেক দিন, সে আকাশের মতন কেঁদেছিল
গাছেরা সবসময় তৃষ্ণার্ত থাকে, কিন্তু অনেকেই জানে না
পিঁপড়েরা নারী-অশ্রু বড় ভালোবাসে
তুষারপাতের মতন জ্যোৎস্নায় নিঃশব্দে ছুটে আসে পিঁপড়েরা
কোন অজানা দূর দেশ থেকে
চোখের নিমেষে তারা চেটে নেয় সবটুকু চোখের জল
সেই রাত্রিটি যেন কল্পান্ত, ভোরের বাতাসে ওড়ে
অজস্র রেশমি নীল রুমাল
সংগীতের মতন প্রথম আলো এসে জাগায় ফুলগুলিকে
পিঁপড়েদের জগতে ঘণ্টা বাজে, রানি পিঁপড়ের কোল জুড়ে
আসে এক মানুষীর অশ্রুজাত সন্তান
এসব কথা তো সবাই জানে, দিন কাটে, নব-বর্ষায় এলোমেলো বাতাস
ফিসফিস করে বলে এক গুপ্ত কাহিনী
আয়নার সামনে চুল খোলা কোনও ব্যর্থ প্রণয়িনী দাঁড়ালেই
শুনতে পায়
গোলাপের গন্ধ মাখা এক সদ্য শিশুর কান্না...

সেই মুহূর্তে নীরা

শিশির-ভেজা ঘাসে তোমার চাঁপা রঙের পা
তোমার চোখে চোখ রেখেছে
সদ্য ফোটা জুঁই
সেই মুহূর্তে নীরা, তুমি টেরও পেলে না
ফুলকে ছেড়ে ভ্রমর বলল,
কিশোরীটিকে ছুঁই!

যুবতী ছিলে, কোন পুণ্যে ফের কিশোরী হলে
নদীর ধারে ছড়িয়ে দিলে
নগ্ন বাহুলতা
অনন্তও থমকে যায়, সময় পথ ভোলে?
চোখে তোমার স্বর্গ-স্মৃতি
ওষ্ঠে অমরতা!

অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকো একটুক্ষণ, নীরা
যেন অলীক না মনে হয়
মিলিয়ে যেয়ো না
সময় বড় জেদি, এখন কালের প্রহরীরা
নতজানু হয়ে তোমার
জড়িয়ে ধরুক পা!

কোন অসমাপ্ত অভিযান

পুরনো তোরঙ্গ থেকে উঠে আসে বাল্যকাল
দোমড়ানো মোচড়ানো জামা প্যারাসুট সিল্ক, কুঁচ ফল
ন্যাপথলিন গন্ধ মাখা একটি ধূসর ছেলে
এইমাত্র ছুটে গেল বারান্দায়—
উঁকি দিয়ে দেখি, যতক্ষণ দেখা যায় তাকে
উঠোনের একপাশে ছাইগাদা, তাড়া খাওয়া ভামের মতন
এক লাফে পার হয়ে নিমেষে অদৃশ্য হল জারুল বাগানে
কতটা নিবিড়? কত দূর? অন্য প্রান্তে নদী আছে নাকি?
থাকুক বা না থাকুক, নিরালা জলের রেখা এঁকে দিই আমি
একটি তালের ডোঙা স্বচ্ছতায় দুটি হয়ে আছে।

কেন বুকে চাপ এল, উড়ে গেল রাঙা দীর্ঘশ্বাস?
বিকেলে ঝড়ের গন্ধ, ধুলো-বৃষ্টি মাখামাখি
সেই সব দিন
সবুজ আঁধারে মিশে যাওয়া, একা ঘুরে ঘুরে
বই পড়া দুঃখ উচ্চারণ

গাছের ছায়ার পাশে অন্য ছায়া, পিঁপড়ের সারির মতো
স্বপ্ন চলে যায়
হাঁটুর নুনছাল ওঠা জ্বালা,
দগ্ধ দুপুরের মতো সর্বগ্রাসী খিদে
কে আর সেখানে ফিরে যেতে চায়? কোন অসমাপ্ত অভিযান?
জারুল জঙ্গল ছেড়ে নদীতীরে বরং একটি নারী
দু'বাহু বাড়ায়।

বিন্দু বিন্দু

কোকিল

এক যে ছিল বাউল, হায়, সেও হল সংসারী
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও দুই পাশে দুই নারী
কত মহান শিল্পী এখন সোনার কারবারি
শুধু কোকিল চায় না আজও নিজস্ব ঘরবাড়ি।

বাঘ ও পিঁপড়ে

বাঘ ও পিঁপড়ে দুই বন্ধুতে ধরেছে জবর বাজি
সামনে একটা বেচারা মানুষ, কে কেমন ভাবে
জিতে নিতে তাকে রাজি!
বাঘটা বলল, ছোঃ ও দু' পেয়ে দুব্‌লার আমি
চোখে নিমেষে ঘাড়টিকে মটকাবো
পিঁপড়ে বলল, ও লোকটা কবি, ওকে ভাই আমি
সারাটা জীবন
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবো!

কবিতা-গদ্য

একটি কবিতা কবুতর হয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে
তবু মেঘহীন সন্ধ্যায় কবি ঝড় ঝঞ্ঝাটে আটকা

কাজ-অকাজের দু'খানা কেল্লা গোলাগুলি ছোড়ে গদ্যে
কে জেতে কে হারে, ভুরু সন্ধিতে তাই নিয়ে চলে ফাটকা!

আলো-অন্ধকার

আলোর গর্ব সে সব কিছুই উজ্জ্বল করে দেয়
অন্ধকারটি শুধু সে দেখাতে পারে না
অন্ধকারেরও গর্ব রয়েছে, আলোকেই সে ছড়ায়
দূরে চলে যায়, লুকোয়, তবুও হারে না!

প্যাঁচা ও জোনাকি

প্যাঁচা হেসে বলে, ওরে ও জোনাকি, তোর দুঃখের
নেই যে সীমানা
আলো পেলি তবু জ্বলে সেটা তোর মাগ্যে!
জোনাকিটি বলে, দিনের বেলায় সূর্য জ্বলেন
তবু তুমি কানা
দেখছো তো ভাই, যার যেটা আছে ভাগ্যে!

দেশ

হিন্দু এবং মুসলমান
করল দেশটা খান খান
কোন দেশ ভাই, কোন দেশটা?
উড়ে এল বহু উপদেষ্টা।
বলল, এ দেশের নেই তুলনা
দুটো জাত ছিল, মানুষ ছিল না!

কে আগে?

ডিম আগে, না মুরগি আগে?
মেঘ আগে, না জল?
প্রেম আগে, না চুমুর ইচ্ছে?
ফুল আগে, না ফল?

কাব্যে উপেক্ষিত

একটি মেয়ে, আর কিছু না, আয়নামুখী, টিপ পরছে
পুরুষ কেন তাতেই মুগ্ধ, মেয়েরা তা জানে কি?
পুরুষরাও তো চুল আঁচড়ায়, দাড়ি কামাচ্ছে সাঁতার কাটছে
সবই কি গদ্য? মেয়েরা কেউ জানল না এর মানে কী?

বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর প্রেম করেননি, কাজ-পাগল, ছিলেন বেরসিক
না লিখলেন কবিতা বা গল্প উপন্যাস
হেরে গেলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের প্রবল খ্যাতির কাছে
এঁরাই হলেন এ কালের বাল্মীকি-বেদব্যাস।
নারীর দুঃখে কত কাঁদলেন বিদ্যাসাগর সারাজীবন, হায়রে
অর্থ এবং আয়ু কতই খোয়ালেন সে খেয়ালে
নারীরা কেউ মনে রাখেনি, স্কুলের বালিকারাও এমনকী
টাক মাথা ওই কুরূপ ছবি টাঙায় না দেওয়ালে!

চাঁদ

আজকে চাঁদের নীলাভ বর্ণ, কাল ছিল হলদেটে
ফুসফুস রোগী চাঁদ খায় রোজ নিমপাতা রস বেটে।
বৃষ্টির দিনে চাঁদের খাদ্য নিছক ফটিক জল
দেবরাজ খান সোমরস, আর মহাদেব হলাহল।
উর্বশী যদি স্বর্গ সভায় নিলাজ নৃত্যে মাতে
সেদিনের চাঁদ রক্তিম হয় ঈর্ষার মৌতাতে।

পুরুষতন্ত্র

সত্যি করে বলো তো দেখি, কে বেশি ভালোবাসে
প্রেমের মূল্য কে বেশি বোঝে, পুরুষ কিংবা নারী?
প্রশ্নকারী, কে তুমি বটে, পুরুষ নও? সবাই এটা জানে
উকিল এবং বিচারকের সাহ্মসভায় পুরুষই দলভারী!

শাশ্বত

রোমিও এবং জুলিয়েট আর কৃষ্ণ এবং রাধা
যদি ফিরে আসে কী দেখবে পৃথিবীতে?
এত হুড়োহুড়ি, তবুও নিভৃতে দৃষ্টি সেতুতে বাঁধা
কারা যেন আছে, যারা শুধু দেয়, কিছুই চায় না নিতে।

বিদেশ স্বর্গ

মা-বাপ বাঙালি, এই দেশে যার জন্ম ও খেলাধুলো
তবুও শেখেনি গরিমা মাতৃভাষার
বিদেশ স্বর্গ, কাঁচুমাচু দিন, কূপমণ্ডুক রাত
সুট-টাই পরে পা চাটতে হয় চাষার!

যুগলবন্দি

মেঘ ডাকছে গুরু গুরু, আবার বৃষ্টি শুরু?
প্রেমিক এবং চাষা, দু'জনের কুঁচকে গেল ভুরু।
সারা বছর বৃষ্টি নেই, ফসল সব উজাড়
রাষ্ট্রনায়ক, ছিঁচকে চোর, দু'জনেরই মুখ বেজার!

নেশাখোরের স্বীকারোক্তি

সিগারেট ছোঁননি শ্রীরামচন্দ্র, হজরত মহম্মদ
ব্যাপারটা জানতেনই না
যিশুখ্রিস্ট কিংবা তাঁর বড়দা বুদ্ধ চালিয়ে গেলেন পান-তামাক বিনা
শেক্সপিয়ারকে ফুক ফুক টানা ধরাতে পারলেন না
স্যার ওয়ালটার র‍্যালে
ধোঁয়ার নেশায় যে কী তরিবৎ তা কেউ জানতই না কালিদাসের কালে
মাইকেল চমকিয়ে দিলেন সারা দেশটা, ঠোঁটে সিগারেট, স্বামী বিবেকানন্দর
আঙুলে চুরুট, যুব সমাজ ধোঁয়ার নেশায় কুপোকাৎ
দাদারা ধরলেন, খুড়তুতো ভাইদের হাতেও নল-সটকা

টললেন না তবু রবীন্দ্রনাথ!

আমার বাবার ছিল নস্যির নেশা, জ্যাঠামশাই থাকতেন গা বাঁচিয়ে
অনেক দূরে বসে
বাবা না জ্যাঠা, কাকে যে অনুসরণ করি, বুঝতাম না সেই বয়েসে।
তারপর বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় দিনকাল, শক্তিই প্রথম হাতে তুলে দিয়ে
বলল, দিয়েই দেখো না একটান
ক্রমে ক্রমে জমল বেশ নেশাটা, যখন শূন্য পকেট, শরীর ছটফট
দেখি যে সবাই দিয়েছে পিঠটান।
এখন আর আমি সিগারেট খাই না, প্রতিদিন সিগারেটই
কুরে কুরে আমাকে খায়
ডাক্তাররা বারণ করে খুব, তারপর ড্রয়ার খুলে বলে, খাও না একটা
আপাতত, কী আসে যায়।
অন্ধকার ছাদে বসে আছি, বুকে চিনচিনে ব্যথা, কিছুতেই টানব না
সিগারেট, দেখি কী হয়
আকাশ দেখছি না, প্রেমেও মন নেই, শুধু সিগারেট-ভাবনায় বয়ে যাচ্ছে সুসময়।
মদের নেশা যখন তখন ছাড়তে পারি, বোতল রয়েছে তবু দু'দিন খেলাম না
সিগারেট জড়িয়ে ধরল ধোঁয়ার ফাঁসে, এ যেন মাকড়সার জাল,
এ জীবনে ছাড়া পেলাম না!

যারা কখনও বিড়ি-সিগারেট-চুরুট ফোঁকেনি, লিখেছে সাংঘাতিক কবিতা,
তাদের পায়ে শত শত কোটি প্রণাম
ধোঁয়া ও নেশামুক্ত কবিতা, নির্দোষ ও ডেটলে শুদ্ধ, সহস্রায়ু হও, মুছে
যাক আমার মতন পাপিষ্ঠের নাম!

জয় একদিন...

জয় একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস বা স্বগতোক্তি করেছিল
'দিন শেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে', একথা
কেন লিখলেন রবীন্দ্রনাথ?
এত পেয়েছেন তিনি, এত সার্থকতা, যখন যা ইচ্ছে করেছে
লিখেছেন—

আমি আলটপকা বলতে গেলাম, তবু অতৃপ্তি আর হাহাকার,
সবসময় অসম্পূর্ণতার বোধ না থাকলে তো লেখা হয় না
কবিতা...
না, এত সাধারণ, এত মামুলি উত্তর দেওয়া যায় না। বরং
তেরোশো চার সালে কোনও নিকটতমা ভাসমান তরীর মতন
সরে যাচ্ছে নদীর অন্য পারে, তাই এই সাময়িক দুঃখবিলাস
কেন না, সেদিনই একটু পরে আবার লিখেছিলেন,
'ভালোবেসে সখী,
নিভৃত যতনে... আমার আকুল জীবন মরণ টুটিয়া-লুটিয়া
নিয়ো...'
না, এই উত্তরও ঠিক নয়, এই তথ্যে কোনও সারবস্তু নেই
আমার বলা উচিত ছিল, এটা তুমি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেই
জিজ্ঞেস
করো না কেন, জয়? তিনি তো প্রায়ই তোমার রানাঘাটের
বাড়ির
লেখার টেবিলের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়ান
সম্রাটের মতন এবং রামকিঙ্করের গড়া মূর্তির মতন অবশ্যই
এবং প্রত্যেক মহান কবির মতনই তিনি বৈপরীত্যের বরপুত্র,
আঙুলে কলমে কালি ভরা দ্বিধা
তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে দেখছেন তোমার নিভৃত মুহূর্তগুলির
বিমূর্ত নির্মাণ, বাইরে ঝড় বাদলের রাতের পাগলামি
শেষ ট্রেন চলে গেছে, তোমার আর কোনও বন্ধু আসবে না
দরজাটা খানিকটা খোলা, টেবিলে জ্বলছে লোডশেডিং-এর
মোম
তোমার ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে, নিস্তব্ধতায় পাথর হয়ে গেছে
তোমার
না-ছোঁওয়া ভাত। কপালে একটু একটু জ্বর, তুমি মুখ
ফেরালে, দেখলে
এবার জিজ্ঞেস করো! পারবে? সত্যি পারবে? তোমার ভয়
করবে না?
যেদিন ওই লাইনটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আজ তুমিও যে
সেই একই বয়েসি!

প্রথম প্রশ্ন

যখন আমি মাতৃগর্ভে একটা নখ-দন্তহীন
মাংসপিণ্ড হয়েছিলাম
তখন আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা
নীরা নাম্নী এক নারী দাঁড়িয়ে আছে নদীর কিনারায়
হাওয়ায় তার আঁচল উড়ছে স্বর্গের নিজস্ব পতাকার মতন
তার সামনে তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবা
এই দৃশ্যটি দুলতে থাকে অন্ধকার ভেদ করে
তারপর আমি ভূমিষ্ঠ হলাম এক বিদ্যুৎ ঝলসানো রাতে
কে যেন আমার ঠোঁটে মাখিয়ে দিল মধু, চোখে
গোলাপ জল
আমার তখন মনে হচ্ছিল, ওসব আদিখ্যেতার দরকার
নেই, নীরা কোথায়, কোথায় সেই নারী
তারপর বহু বছর কেটে গেছে, সেই স্বপ্ন
একেবারে মিথ্যে হয়নি
মাঝে আমি দেখতে পাই নীরাকে, শুধু নদী প্রান্তে নয়
উপত্যকার ধার দিয়ে হেঁটে যায় নীরা
কিন্তু তার সামনের সেই যুবকটি কে ছিল? তাঁকে
খুঁজে পাই না, খুঁজে পাই না, খুঁজেই চলেছি...

তিনটি অশ্ব

গলাকাটা বটগাছের তলায় তিনটি অশ্ব নিশি পোহাচ্ছে
অন্ধকার না তেমন অন্ধ, কিছুটা কিছুটা দুধ মিশে আছে
লক্ষ্মী প্যাঁচাটি আরও সাদা হয়ে উড়ে এল নিচু গাছের তলায়
দলবল বেঁধে আসে নীরবতা, আঁজলা পুকুরে মৃদু দোল খায়।

একটি ঘোড়ার চোখ নেই, তার নাভি সম্বল, ছুটবে এবার
এক জাদুকর ছপটি মেরেছে দিক-দিশা সব ঘুচিয়ে দেবার
দুরন্ত তেজে ছুটছে সে ঘোড়া দৃশ্যবিহীন দিগন্ত ছিঁড়ে
প্রান্তর জুড়ে ধুলোর ঝড়ের চিহ্ন থাকে না ঘাসের শিশিরে।

দ্বিতীয়টি পীত, পলাতক এক রাজকুমারের প্রিয় বয়স্য
নভোনীল যেই চিরবে তখনই সে হবে অশ্বমেধের অশ্ব
সারাটা অতীত কাল জুড়ে ছিল চোখের পলকে বিদ্যুৎগতি
আজ রাত্রিই শেষের রাত্রি, প্রতি নিশ্বাসে ঝরছে নিয়তি।

অতি সুপুরুষ কালো ঘোড়াটিকে যত্নে দিয়েছি কত দানাপানি
অতল গহনে বারবার গেছি মৌলিকতার পেয়ে হাতছানি
রতি অভিসারে দশদিক খোলা, ছন্দ ভুলের এমন রঙ্গ
অলীকবাহনও, তবুও আমার জীবন পেল না জীবন সঙ্গ!

শব্দ-ছবি

'রূপসী' শব্দটির যদি ছাপার ভুল হয়;
কী বীভৎস দেখায়!
যেন সুন্দরীর কপালে বিষ ফোঁড়া
শব্দ এমনই এক ছবি যা সামান্য ভুল রং সহ্য করে না
কালো মেঘলা দিনে ছোট্ট ঘরে কোনও বইয়ের পৃষ্ঠায়
'রূপসী' শব্দটি দেখা মাত্রই জানলার কাছে এসে সে দাঁড়ায়
বিশেষ রমণী নয়, সমস্ত রূপের সারাৎসার
এক জীবনের যাবতীয় কল্পনায় রেখা ও আয়তন
মাটির প্রতিমা থেকে ক্রমশ মানবী হয়ে ওঠা
'রূপসী' থেকে যদি সামান্য র-এর ফুটকিও বাদ পড়ে
কোনও ছবি নেই, সব অন্ধকার!
অন্য ভাষার একজন কবি আমার মুখে রূপসী শব্দটি শুনে
ভ্রূক্ষেপও করল না
বাংলার রূপসীকে চিনতেই পারল না সে
তার ছবি আর আমার ছবি এতই আলাদা যেন
ছাপার অক্ষরের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি দু'জনে।

শিল্প

উত্তুরে আলো আড়াল করে কে দাঁড়াল
ছবি ভেসে যায় বর্ণে
ওরে ও ভিখারি, না পারিস যদি মূর্ত
দ্বিতীয় দেখার বর নে!

সৃষ্টির রেখা আকাশে কিংবা অতলে
ধরা-ছোঁওয়া এত শক্ত
আয়ুর সীমানা মহাকালে দেবে পাল্লা
বলিহারি তোর শখ তো!

শিল্প কখনও দেখায় এমন ছলনা
সুধার বদলে অন্ন
ওরে ও ভিখারি, আয়নায় মুখ দেখে নে
স্বরচিত নাকি অন্য!

দুর্বোধ্য

—পৃথিবীতে অলৌকিক বা দুর্বোধ্য কি আর কিছুই নেই?
—আছে আছে, ঢের আছে, তবে খাঁটি লৌকিক কিছু যদি
খুঁজতে চাও তার নাম খিদে
যেমন আকাশ ভরা এত দুর্বোধ্যতা, কিন্তু
একমাত্র ক্ষুধার্ত মানুষই একটুও দুর্বোধ্য নয়!
—এ কী অদ্ভুত কথা, মানুষ দুর্বোধ্য নয়?
—মানুষ বলিনি, বলেছি ক্ষুধার্ত মানুষ
—ক্ষুধার্ত মানুষের সব কিছু বোঝা যায়?
শুধু খিদেটাই তার মনুষ্যত্ব, আর কিছু না?
—খিদের সময় যে সব কিছুই অবান্তর হয়ে যায়
সে রূপ দেখে না, সে প্রেম জানে না।

মাথা ঘুমিয়ে পড়ে, জেগে থাকে শুধু উদর
—তুমি কী করে জানলে? তুমি কি দিনের পর দিন
না খেয়ে থেকেছ? তুমি কি
দিনের পর দিন আকাশে না তাকিয়ে খুঁজেছ
খুদ-কুঁড়ো? তুমি কি দেখেছ তোমার
উপবাসী সন্তানকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে?
—না, তা দেখিনি অবশ্য
—তবে তুমি কী করে জানলে তার কান্নার মধ্যে কোনও
স্বপ্ন মিশে থাকে কি না? কোন অভিজ্ঞতায়
তুমি সাতকাহন করে লেখো তার দুঃখের কথা?
—সে যে নিজে কখনও লেখে না! সে যে কলম চেনে না,
তা হলে কি লেখাই হবে না তার কথা?
—এক হাজার পৃষ্ঠা লিখেও তুমি ঘোচাতে পারবে
তার খিদে? এতগুলি শতাব্দী ধরেও
ঘোচানো যায়নি তার রহস্যময়তা,
সে যে মানুষ!

ঘরভর্তি রঙিন মানুষ

ঘরভর্তি রঙিন মানুষ, কে শুনছে কার কথা!
বাতাস দুলছে অন্ধকারে, হাসছে নীরবতা।

খয়েরি মেয়ে চুলের গোছে গুঁজেছে লাল ফুল
পাশের পুরুষ ঘাড় ফেরাল, চক্ষু জুলজুল।

সোনার মতো মুখ যে মেয়ের পা দু'খানি ঢাকা
মাটিতে গড়া নিম্ননাভি, এখনও কাদা মাখা।

বোতাম খোলা হলুদ যুবার হাসিতে পৌরুষ
উরুর ফোঁড়া চুলকে যাচ্ছে, সে দিকে নেই হুঁশ!

যার তলোয়ার ধরার কথা, সে বসেছে তাসে
দূরের দুটি নীলকমল কী চায় বুঝল না সে।

ঘরভর্তি রঙিন মানুষ, কে শুনছে কার কথা
কবি এখানে কী করছে? হাসছে নীরবতা।

চূর্ণ-কবিতা

১

দাওয়ার খুঁটিতে এলিয়ে শরীর বসে আছে ফুল্লরা
ঝাপসা দু'চোখ, ময়লা ওষ্ঠে অশ্রুত বারমাস্যা
ক'টা শতাব্দী পার হয়ে গেল? বাঁকুড়ার গ্রামে জ্যান্ত বাঁধানো ছবি
কবিরা অনেক লিখেছে, এবার সিনেমার লোকে বারবার নেয় ওকে।

২

তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি মানুষকে ভালোবাসো না, অথচ দেশকে ভালোবাসো কেন?
দেশ তোমাকে কী দেবে?
দেশ কি ঈশ্বর?
তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
গুলি বিনিময়ে তুমি প্রাণ দিলে দেশ কোথায় থাকবে?
দেশ কি জন্মস্থানের মাটি, না সীমানা?
বাস থেকে নামিয়ে তুমি যাকে হত্যা করলে তার বুঝি দেশ নেই?
তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি কী করে জানলে আমি তোমার শত্রু?
কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তুমি আমার দিকে
রাইফেল তুলবে?

৩.

আগের জন্মে ছিলাম আমি ছপটিওয়ালা
এই জন্মে ঘোড়া
নিজের পিঠে চাবুক মেরে ছুটছি, আমার
ভ্রমণ বিশ্বজোড়া!

তবু এই গৃহহারা

এই অন্ধকার পথ চলে গেছে সমুদ্র কিনারে
সেখানে তৃষ্ণার কোনও শান্তি নেই
তবু এই তৃষিতটি কেন ওই পথে যেতে চায়?

সকলেরই গৃহ আছে, সকলের নিজস্ব সীমানা
যেখানে অর্ধেক মৃত্যু অর্ধেক জীবন
তবু এই গৃহহারা কেন যায় জলের কিনারে?

শিল্পের নিয়মে

পুকুরে তেজি শরীর নিয়ে ডুব দিচ্ছে একটা পানকৌড়ি
তিনটে হাঁস আড়ষ্ট হয়ে জল ছেড়ে উঠে গিয়ে
বসে রইল কদম গাছের তলায়
ওরা কি পানকৌড়িটিকে ভয় পায়?
এই বহমান জীবনের যে-কোনও একটা টুকরোই হয়ে
উঠতে পারে কবিতা
দোতলার জানলা দিয়ে আমি দেখছি পানকৌড়িটার
চোরা ডুব সাঁতার
ওকে নিয়ে একটা কবিতা লেখা যায় না?
কাগজ কলম নিয়ে বসতেই প্রথমে এই লাইনটা আসে:

‘যেন একটা উল্‌কা ফুল, ঝুপ শব্দে পড়ল এসে জলে
রাজকন্যার মতন এক মাছরাঙা—’
আমি কলম থামাই, পানকৌড়িটা মাছরাঙা হয়ে গেল
কী করে?
আমি তো মাছরাঙা দেখছি না, তবু কবিতায় সেই পাখিটা
এসে গেল, সে কি নানা রঙে সুন্দর বলে?
কিংবা নিছক বাস্তব নিয়ে কবিতা হয় না, শিল্পের নিজস্ব
নিয়মে দৃশ্য বদলে যায়?
অথবা পানকৌড়িটা বঞ্চিত হল তার কালো রঙের জন্য?
আমরা কালো দেশের মানুষ, তবু আমরা বর্ণবিদ্বেষী
আমার গায়ের রঙও ঝিরকুট্টি কালো, নিজের হাতখানার দিকে
চেয়ে আমার হাসি পেয়ে গেল
আমাকে নিয়েও কেউ কোনওদিন লিখবে না প্রেমের কবিতা!

পাগলাটে গলার স্বর

মঞ্চে গলা কাঁপিয়ে দেশোদ্ধার করছেন একজন জন-গণেশ
এরই মধ্যে খুব কাছে চলে এল একটা আধ-পাগলা
খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা মুখে প্রশ্ন করল,
অধর সরকার লেনটা কোথায়, কোথায়, কোথায়
রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি
এত ব্যস্ততার মধ্যে একী অবান্তর প্রশ্ন
একজন ভবঘুরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে তো কী হয়েছে
যে কোনও রাস্তাই তো তার পক্ষে যথেষ্ট
তবু বক্তৃতার মাঝখানে সে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল:
ওগো বলো না, বলো না, কোন দিকে
এরকম এক উটকো হতভাগাকে ঠেলতে ঠেলতে
মাঠের বাইরে নিয়ে যায় ভলান্টিয়াররা
তার নোংরা ময়লা চাদরটা একজন ছুড়ে দেয় জুতোর ডগায়
তারপর সব কিছুই চলতে থাকে আগের মতন
শুধু সেই জ্বালাময়ী ভাষণের মাঝে মাঝে শোনা যায়
একটা পাগলাটে গলার স্বর
ওগো, হারিয়ে ফেলেছি, বলো না, কোন দিকে, কোন দিকে...

রক্ত

১.
বুকের রক্ত দিয়ে কবিতা লেখার দরকার নেই
তাতে কবিতা হয় না
রক্ত জিনিসটা লেখার পক্ষে সুবিধের নয় মোটেই
না হলে কালি-ব্যবসায়ীরা প্রচুর খাঁটি রক্তই
বোতল বোতল ভরে চালান দিত না?
মানুষের রক্ত তো বেশ শস্তা এদেশে
যারা সত্যি সত্যি মুখে রক্ত তুলে হাঁটু থেবড়ে
পড়ে যায় মাটিতে
তারা কেউ কবিতা লেখে না
হায়, তারা কবিতা থেকে কত দূরে!

২.
জয় বাবা বক্রেশ্বর বলে যারা একদিন বিলিয়ে দিয়েছিল রক্ত
তারা নিজেরাই অনেকে এখন কুঁজো অষ্টাবক্র
যার নামেই জিগির তোলো, তারকেশ্বর বা বক্রেশ্বর
রক্ত কোথাও জ্বেলে দেয় না আলো
নীল নদ একদিন মানুষের রুধিরে লাল হয়ে গিয়েছিল
ভোল্‌গা থেকে গঙ্গায় বয়ে গেছে কত রক্ত স্রোত
মাটিতে রক্ত মিশে থিকথিকে কাদা হয় শুধু
পোষা কুকুর চাটে তার ভালোবাসার মানুষের রক্ত
সেনাপতিরা রক্তের ওপর দিয়ে রথ চালাতে চালাতে
পান করে আঙুরের রস
মায়ের রক্ত চোখ দিয়ে কান্না হয়ে ঝরে, কেউ দেখে না
তোমার রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনবে? তা নিয়ে
ছিনিমিনি খেলবে উল্লুকেরা
প্রাণপণে চাঙ্গা রাখো, ধমনী, ওগো, নিজের জীবন ছাড়া
তোমার যে আর কিছুই নেই!

কেউ আমায় চিনতে পারে না

দুপুরবেলা খিদের চাবুক। তারপর রোদ্দুরে রোদ্দুরে রাস্তায়
একা। পায়ের তলায় পেরেক, সমস্ত পথই
হাঙরের দাঁত
বাতাস যেন শ্যাওলাভরা জল, এগোতে হয়
ঠেলে ঠেলে
রুমাল দিয়ে মুখ মুছলে কালো কালো দাগ
ওঠে। চোখ কড়কড় করে ধুলোয়
বাঘের মতন ছুটে আসে মিনিবাস, তুলে
নেয় না, তলায় ফেলতে চায়
কিছু লোক সব সময় আমায় ধাক্কা মেরে এগিয়ে
যাচ্ছে সামনের দিকে
এইভাবেই কি প্রত্যেকটি দিন কাটছে?

একটা ছাতিম গাছের নীচে একটুক্ষণ
দাঁড়িয়ে হেসে ফেলি আপন মনে, মাটির দিকে
চেয়ে। যেই একটা তুড়ি দেব, এই সবকিছু অলীক
হয়ে যাবে। সব কুশব্দ ছাপিয়ে ভেসে ওঠে
এক সংগীত, সব দৃশ্যের ওপর নতুন আলো
রাস্তাগুলো কী শান্ত সুন্দর নদী হয়ে দুলছে
ভালোবাসার বর্ণমালা একজন পরিয়ে দিয়েছে
আমার গলায়
আমি এক অরূপ রাজ্যের নাগরিক
কেউ আমায় চিনতে পারে না!

এই যে একটা নড়বড়ে সাঁকো

এই যে একটা নড়বড়ে সাঁকো পার হয়ে চলে যাচ্ছি
সবাই বললে, ভাঙবে, ভাঙবে, ভাঙবে!
এমন দিনেই ঝড়ের দাপট আকাশে ফোটাতে হবে!

সাঁকোটা দুলছে, প্রবল দুলছে দুলছে!

খাড়া পাড় দিয়ে হেঁটে যাওয়া যেত, না হয় কিছুটা দূর
পায়ের তলায় পাথর, কাঁকর পাথর
আমার আয়ুর দু'-এক টুকরো গিলে খেয়ে নিত হাওয়া
কতটুকুই বা টুকরো, আয়ুর টুকরো!

আচম্বিতের ভেতরে ঝিলিক রুপোলি রঙের হাস্য
যদি ভেঙে যায় কী ক্ষতি, এমন কী ক্ষতি?
নদী ও আকাশ, ওপরে তলায় হোক না উলটোপালটা
তবু বেঁচে থাকা জীবন, এটাই জীবন।

দুটি মাত্র অক্ষর

স্বপ্নে নয়, বুকের মধ্যে একটা কুঁড়েঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নীরা
হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এসো
তারপর আমি মাঠে মাঠে ঘুরছি, রোদ্দুরে ঝলসে যাচ্ছে
কপাল, কিংবা বৃষ্টি ভিজে সপসপে, ভয় দেখাচ্ছে
জ্যাঠামশাইয়ের বকুনির মতন মেঘের হুংকার
চটি ছিঁড়ে যাক, পায়ে কাঁটা ফুটুক
কিছু আসে যায় না, আমি শুধু শুনতে পাচ্ছি দুটিমাত্র অক্ষরের
পরম বাঙ্ময়তা, যেন মহাকাশের সংগীত
হাট করে খুলে যাচ্ছে দুনিয়ার সব দরজা
গভীর অরণ্য থেকে ভোরবেলায় আলো এসে বলছে, এসো
এইমাত্র জন্ম হল যে-ঝর্নার, সে বলছে, এসো
মধ্য রাত্রির আকাশের শান্ত নীরবতা বলছে, এসো
শুধু প্রকৃতিতে নয়, শুধু হৃদয়ে নয়, শরীর বলছে এসো
ওষ্ঠের অমৃত, স্তনবৃন্তের উষ্ণতা, যোনির লাবণ্য বলছে, এসো
আরও পরে, আরও গভীরে, যেখানে সময়ের সঙ্গে মিশে আছে
চিরকালের শূন্যতা
সেখান থেকেও ডাক শুনতে পাচ্ছি, এসো
এক জন্মের সমস্ত চলে যাওয়ার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, এসো—।

যে যেমন সুখ পায়

যে যেমন সুখ পায় পাক না ক্ষতি কী
কেউ হো হো করে হাসে, কেউ দ্বেষে জ্বলে ধিকিধিক
কেউ মঞ্চ পেয়ে গেলে কারুকে ছাড়ে না
কেউ ভস্মে ঘি ঢালছে, দু'পকেট ভর্তি ধার দেনা।

মুখ নেই, নৈর্ব্যক্তিক? কেউ কেউ কে কে?
জীবন উজিয়ে চলে পাথরের চিহ্ন দেখে দেখে
এ এমন স্রোত যার বিপরীত গতি
যে-প্রণয়ে ঘুণ ধরা, সেখানেও উরুতে সম্মতি।

দুঃখের মুহূর্তগুলি মুহূর্তের ভুল
স্রোতে ভেসে যায় মুখ, মুখগুলি স্রোতে ভাসা ফুল!

অকৃতজ্ঞ

পশুদের বনবাস এই শতাব্দীতে শেষ হল
বৃক্ষরাও হারাল স্বদেশ
শুধু কি নেবে, কামড়ে ছিঁড়ে নেবে
নিশ্বাসে পুড়িয়ে যাবে
কিছু কি দেবে না
কিছুই দেবে না?

এত গাছ টেনে নেয় ভূমিরস
তারাও স্বীকার করে ঋণ
নিস্তব্ধ নিশীথে শোনা যায় পাতা ঝরানোর গান
জলে ভেসে যায় ঘর বাড়ি
তবুও জলের বুক খোলা, দু'হাত ছড়িয়ে বলে
নাও, নাও, যত পারো নাও

এক একটা আলোর বিন্দু দৃশ্যের গভীরে যায়
সিঁড়ির মতন তার বহুতা নির্মাণ
মানুষ কি শুধুই ভাঙবে, ছিঁড়বে, পোড়াবে
কিছুই দেবে না?

কথা

আমি তোমাকে দেখি, তোমার সঙ্গে কথা বলা হয় না
সকালের নরম হাওয়ার মধ্যে দেখি, শেষ বিকেলের
চূর্ণ আলোর মধ্যে দেখি
বৃষ্টির মধ্যে তুমি চৌরাস্তায় ট্যাক্সি খোঁজাখুঁজি করছিলে নীরা
আমি তখন চলন্ত ট্রামের জানলায়
ফরাসি চলচ্চিত্র উৎসব থেকে তুমি বেরিয়ে এলে
খুশির প্রতিমা হয়ে
আমি তখন মুচির সামনে বসে ছেঁড়া চটি সেলাই করাচ্ছি
মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে তুমি আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে
আমাকে দ্রুত নেমে যেতে হল পাতাল রেলে
একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, মনে আছে?
সেদিন আগুন জ্বলছিল সারা শহর জুড়ে
সমস্ত লোক চিৎকার করছিল অন্যরকম কণ্ঠস্বরে
এরকম সময় কথা বলতে নেই, কথাগুলি সব নিঃস্ব হয়ে যায়
এক একটা ভুল কথায় নষ্ট হয়ে যায় কবিতা
প্রজাপতির গায়ে আগুনের আঁচ লাগার মতন ভুল শব্দে
পুড়ে যায় ভালোবাসা
দু' একটা না-বলা কথা সারাজীবন বৈদুর্যমণির মতন
দীপ্যমান হয়ে থাকে বুকের মধ্যে...

যে যার অন্য বাড়ি

লাস্ট ট্রেন সওয়া বারোটায়, ইঞ্জিন ড্রাইভার প্লাটফর্মে
নেমে আভূমি সেলাম করে বলল
আমার নাম ইয়াকুব, তুমি কোথায় যাবে ভাইজান?
লম্বা রেলগাড়িটা অসহিষ্ণু হিসহিস শব্দে ল্যাজ আছড়াচ্ছে
সারাদিনের শেষে কেউ একজন এরকম বুক-ছোঁয়া কথা
না বললে
আমি খড়ি দিয়ে লেখা আমার নাম মুছে দিতাম!
আমি বললাম, ইয়াকুব ছায়েব, আমার সবকটা গাঁটের
মোমছাল উঠে গেছে
আমার তো কোনও ঠিকানা নেই!
ইয়াকুব বলল, চমৎকার, আজ আমরা কোনও চেনা স্টেশনের
যাত্রী নিচ্ছি না
আমরা যে-যার অন্য বাড়িতে যাব!

নিঃশব্দ ফুলের মতো ফুটে আছে অন্ধকার
সুতোর ম্যাজিকের মতন ছুটে যাচ্ছে ট্রেন
একটা ফোয়ারার মতন আনন্দ নেমে আসছে ঠান্ডা আকাশ থেকে
যুদ্ধ থেকে বাড়ি-ফেরা সৈনিকদের মতন গান গাইতে গাইতে
কারা যেন আসছে যাচ্ছে
এক কামরা থেকে অন্য কামরায়
কেউ কারুকে চিনি না, ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে খাবার
একটাও লেভেল ক্রসিং নেই, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ব্রিজগুলো
জামাগুলো পাখার সঙ্গে বেঁধে দুলছে ও কে?
ছুটে যাচ্ছে ট্রেন, নাচের ছন্দ লেগেছে চাকাগুলোয়
আগুনের ফুলকি হাততালি দিচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে ট্রেন
আমরা সবাই আজ অন্য বাড়িতে যাব
আমরা প্রত্যেকের যে-যার অন্য বাড়িতে যাচ্ছি...

খেলা

দুই হাতে মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করার বিলাস
প্রথম যৌবনে ছিল।
ভাবতাম,
নদীর আকাশে লঘু মাছরাঙা পাখির মতন
মৃত্যুর দুধারে ঘেঁষে ছুটোছুটি
জীবনকে রূপরস দেয়
বারবার
আমি কি যাইনি সেই মৃত্যুমুখী দক্ষিণের ঘরে?
বাঁধের কিনার থেকে গড়ানো বন্ধুর হাত ধরে থাকা
আন্তরিক মুঠি
যমদণ্ড দেখেছিল।
যৌবনে এসবই খেলা!
যখন মানুষ মরে, একবারই জীবনে মরে,
তারপর আর কোনও খেলা নেই।
আর কোনও অস্পষ্টতা, নদীর কিনারে বসে থাকা নেই।
হঠাৎ বিমান থেকে বাচাল মেশিনগান ফুঁড়ে যায় দেহ
এখন যা শকুন ও কুকুরের ভোগ
আর কোনও খেলা নেই।
বন্ধুরা হারিয়ে যায়, আমার একটুকরো
আত্মা নিয়ে যায়
তখনই সিঁড়ির কাছে নীরার নিস্তব্ধ মূর্তি
চোখ দিয়ে ডাকে
ভুরু থেকে ঠিকরে আসে বিকেলের আলো
আমার দু' হাত
যেন ডানা হয়ে যায়
গোড়ালিতে ধাক্কা দেয় ঝড়
আমি শূন্যে ঝাঁপ দিই।

বিকল্প খোঁজো, বিকল্প খোঁজো

হঠাৎ একটা দিন হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় লেখা চিঠির মতন
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হল,
কোথায় যেন যাবার কথা ছিল?
কেন বেজে উঠল সাইরেন, অথচ ইস্কুল সব ছুটি
আমার পকেটে অন্য লোকের নামের আদ্যক্ষর বসানো রুমাল
জুতো জোড়া গতকালও এমন আঁট ছিল না
হঠাৎ একটা দিন যেন অন্য জীবন-যাপন থেকে উড়ে আসা

ঘড়ির কাঁটা মেলাবার জন্য আর একটা ঘড়ি দরকার
টেলিফোন স্তব্ধ, আর একটা ফোনে জানাতে হবে অভিযোগ
বিকল্প খোঁজো, বিকল্প খোঁজো, উপুড় হয়ে শুয়ে থেকো না
মনে করো, তুমি গেলে শিয়ালদা স্টেশনে, ঠিক সেই সময়
হাওড়ায় তোমার মতনই আর একজনকে চাই
বউদির ছোট বোন যাকে খুঁজতে এসেছে, সে কি তুমি? কিংবা
তুমি নও
সব দৃষ্টির আড়ালে অন্য এক দৃষ্টি, গল্পের মধ্যে অন্য গল্প
কেউ যেন হেঁকে বলছে, পেছন দিকে এগিয়ে যান, পেছন দিকে
এগিয়ে যান
পাতাবাহার দিয়ে সাজানো ফুল, ফুলই শুকিয়ে যায় আগে
বিকল্প খোঁজো, বিকল্প খোঁজো, উপুড় হয়ে শুয়ে থেকো না
তোমারই নামে এসেছে চিঠি, একটা শব্দও বুঝতে পারলে না তুমি।

কঙ্কালের কপালে চন্দন

সত্যিই তো একটা রাক্ষস হাঁ করে আছে
আমার পিঠের দিকে
তাকে দেখতে পাই না, তার গরম নিশ্বাস
আমার ঘাড়ে লাগে

এক সময় সে ছিল সামনে
তার ভয়ংকর দাঁত দেখে ভয় পেয়েছি
লড়েও গেছি

সম্মুখ যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি
কখনও পালিয়েছি গলিঘুঁজিতে
সব সময় লড়াই, চকিতে পেছন ফিরে তাকানো,
দৌড়, পকেটে খুচরো পয়সার হিসেব
হেরে যেতে যেতেও কখনও মরিয়া হয়ে কামড়ে
দিয়েছি তার ডান আঙুল।

এখন সে পেছনে, দু'হাতে ঘিরে আছে
আমি যে হেরে ভূত হয়ে গেছি এর মধ্যে
তা বুঝতেও পারি না
আমার কঙ্কালের কপালে ফোঁটা ফোঁটা চন্দন...

কোলাজ

কবিতার কালো খাতাটির ওপর এসে বসল একটা প্রজাপতি
অপ্সরার মতো তার দুটি ডানা
ও কি কোনও কবিতায় ঢুকে পড়তে চাইছে? প্রজাপতি নিয়ে আর
কত লেখা হবে?
ঝনঝন করে দেয়াল থেকে খসে পড়ল একটা ছবি
ওকে নেব, কি নেব না?
শুনতে পাচ্ছি নদীর ছলোচ্ছল শব্দ, পাড় ভাঙছে, ঝুপ ঝুপ করে
জলের ঝাপটায় ভিজে যায় সাদা পৃষ্ঠা
ওকে নেব, কি নেব না?
সারা দুপুর নির্জনতার কোলাহল, মেঘ ছোঁওয়া হাওয়া
রাস্তার ওপাশ দিয়ে চলে যায় বাসনওয়ালি, তার
ছাপা শাড়িতে রঙের ঝড়
তাকে নেব, কি নেব না?
ঝুপসি আমগাছটায় বসে আছে কোকিল

কোকিল কখনও দেখা যায় না, তিনবার কুহু ধ্বনি
পাঠিয়ে দেয় আকাশের দিকে
ওকে নেব? না, কোকিল আমার কবিতায় আসে না
খবরের কাগজের ফরফরানি অনায়াসে সরিয়ে দেওয়া যায়
কিন্তু ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠাগুলি উড়ছে, ওকে নেব?
সিঁড়িতে অদেখা পায়ের শব্দ, ওকে নেব?
যে মেয়েটি ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে এসে গান গাইছে
তাকে নেব?
একটু একটু খিদে পাচ্ছে, দুপুর গড়িয়ে গেল, টের পাই
এক তৃতীয়াংশ মানবতার জঠরের আগুন
কীসের যেন একটা সুগন্ধ এরই মধ্যে ভেসে এসে
কিছুটা অন্যমনস্ক করে দেয়
কাকে নিই, আর কাকেই যে বাদ দিই!

এক একটা স্বপ্ন

প্রথম স্বপ্নের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল
পঁয়তিরিশ বছর বয়সে
তারপরও কি বন্ধ হয়েছে স্বপ্ন দেখা
নদীর পাড় ভেঙে ঝুপুস করে ডুবে যায় বাড়িঘর
তার পরেও কি কেউ নদীর ধারে বাসা বাঁধে না?
এক একটা স্বপ্ন টুকরো টুকরো মিথ্যে হয়ে যায়
এখন সেই টুকরোগুলো চুষে চুষে খাই
মিথ্যেগুলোই বেশি সুস্বাদু মনে হয়

যৌবনের দীর্ঘশ্বাস মিশে যায় পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়ায়
আবার ফিরে আসে, প্রথমে চেনা যায় না
তারপর ইউক্যালিপটাসের পাতা কেঁপে ওঠে
হু হু করে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে জ্বর
মাটিতে গড়াতে গড়াতে মনে হয়, বাঃ বেশ তো
এইভাবে বয়স বাড়ে
মেঘ ভেঙে পড়ে দিগন্তের রক্তিম পাহাড়চুড়োয়!
একটা শিশু হামাগুড়ি দিয়ে যায় বয়সের উলটোদিকে...

নদীর কিনারে কালের রাখাল

চারদিকে এত মেঘ গর্জন-ছাপানো
বিস্ফোরণের দাপট
তা বলে কি আমি শুনতে পাব না সিঁড়িতে
তোমার পায়ের শব্দ?
বারুদ ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যায়, দাঁড়িয়ে
রয়েছি খোলা জানলায়
এ সময়ে চোখ আরও প্রদীপ্ত, আরও
স্বাধীন না হলে যে হারাব
জবাফুলে টুনটুনির ফুরুৎ দেখার
মতন শুভ মুহূর্ত!

সবাই ভাবছে চুপ করে আছি, আসলে
তো আমি ধ্যানে নিমগ্ন
এখন শ্রাবণ আরও সুতীক্ষ্ণ, এক
জন্মের বাজি ধরে রাখা
নাচুক কুঁদুক যত উল্লুক, আমি
কিছুতেই সুর ভুলব না
নদীর কিনারে কালের রাখাল মহিষ-
বাহন, স্থির পটে আঁকা!

ডানা মেলা গল্প

যে কোনও পড়ো বাড়ি দেখলেই মনে হয়
তার অনেক গল্প আছে
অজয় নদীর পারে সেই ভাঙা প্রাসাদ ও বিগ্রহহীন দেব দেউল
যেন একটা গল্পের জাহাজ
নদীতে এখন জল নেই, ক্ষীণ ধারাটি একপাশ দিয়ে
বয়ে যাচ্ছে ছির ছির করে
এই নদীর প্রমত্ত বর্ষার অনেক গল্প আছে
একলা দুপুরবেলা নদীর মাঝখানে বালি খুঁড়ছে এক কিশোরী

ওর উড়ন্ত আঁচলে পতপত করছে এক গল্প
বালির অনেক গভীরে শুয়ে আছে একদল রহস্য কাহিনী
তারা নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো ইঙ্গিত নিয়ে
হাসাহাসি করছে খুব
প্রত্যেক গল্পেরই নিজস্ব ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে
আনাচে কানাচে
ট্রেনের জানলায় বসে কয়েক মুহূর্তের জন্য এসব দেখা
ঝমঝম করে ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটছে ট্রেন
এই সেতুটির জন্ম কাহিনী মনে পড়তেই শিউরে উঠি
সমস্ত ডানা মেলা গল্পগুলোকে সরিয়ে দিয়ে
ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

এত সহজেই

ছোটখাটো ঘুম ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে নদীর কিনারে, বনে
ভোরের আলোয় লূতাতন্তুর টুকরো টুকরো চাদর
যে-ছন্নছাড়া অনেক উড়েছে, বারুদ পুড়েছে সমগ্র যৌবনে
একবার তার নিতে সাধ হয় নির্জনতার আদর।

মনে পড়ে যায় কথা দেওয়া আছে বানভাসি গ্রাম ভাঙা দেউলের কাছে
ফের দেখা হবে, পৃথিবী ঘুরছে, আমিও ফিরব আবার
চাঁদ উড়ে যায় চৈত্রের ঝড়ে, চোখ ঝলসায় অহংকারের আঁচে
মুঠোয় বাতাস, এত সহজেই পেয়েছি যা ছিল পাবার!

অপরাধ

একজন মানুষকে খুব চেনা মনে হচ্ছিল
কিন্তু সে চকিতে চলে গেল মুখ ফিরিয়ে
কিছুই না, কিছুই যায় আসে না
রোদ্দুর রয়েছে রোদ্দুরের মতন, বৃষ্টির ফোঁটা ঈষৎ মিহি ও বাদামি

বিশ্ব সংসার ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে নিজের নিয়মে
ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে আবহমানকালের দুরন্ত কৈশোর
দুঃখের মধ্যে ফুটে ওঠে নিজস্ব বিভা
ভালোবাসার মধ্যে মাঝে মাঝে আলপিন পতনের শব্দ
এইমাত্র একটি নদীর জন্ম হল
এইমাত্র শুকনো মাটি হা হা স্বরে তাকে ডাকল
কিছুই কিছু না, কিছুতেই অন্য কিছুর আসে যায় না
তবু, একজন মানুষকে মনে হচ্ছিল খুব চেনা
সে কেন চকিতে চলে গেল মুখ ফিরিয়ে?

আমরা শুনতে পাই না

হরিণ কি নিজে জানে, তার চোখ দুটি কত সুন্দর?
তার সারা জীবন-কাহিনীই শুধু ভয়
সে ভয়ার্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকালে
আমরা বলে উঠি, আহা, এ যে চকিত হরিণী প্রেক্ষণা
তার চামড়ায় স্নিগ্ধ রঙের ঝিলিক, একদিন
আমাদের পায়ে চটি-জুতো হয়ে শোভা পায়
তাড়া খেয়ে সে যখন পালায়, আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি
কী অপূর্ব তার ছন্দোময় গতি...
আমরা কত ফুলের গলা টিপে ছিঁড়ে এনে
ফুলের বন্দনাগান গাই
মৌচাক ভেঙে মধু চুরি করে আনি, মৌমাছিকে
নিয়ে লিখি কত কাব্য
নদীগুলিতে হত্যা করতে আমাদের একটুও হাত কাঁপে না
পাখিগুলিকে আকাশ থেকে ধরে এনে পুরে দিই খাঁচায়
ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু পায়ে পায়ে নোংরা হয়ে যায়...
মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে দুটো-একটা হরিণ
ছিটকে চলে আসে শহরে
তারা কী যেন বলতে চায়, আমরা বুঝি না
রাত্তিরবেলা একা একা পাখি ডাকে, নদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আমরা শুনতে পাই না!

আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে

আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে তোমার একটু না-জানা ঘুম
ট্রেনের জানলা, বিকেল বেলার ভিড়
একটিবার ঢুলে পড়লে, নাম জানি না, ক্লান্ত মুখ
শ্যামনগরে নেমে পড়লে হঠাৎ।

কখনও দিন ঘোড়সওয়ার, কখনও দিন স্রোতের ফুল
কে পাশে বসে, কেউ ক্বচিৎ ডাকে
দেশের জন্য দুর্ভাবনায় কত মানুষ গলা ফাটায়
দগ্ধ মাঠে ন্যাংটো ছেলে হাসে।

প্রতিদিনের যাত্রা শেষে মনের চোখ পরের দিন
যেদিন গেল, নিছক ঝরাপাতা
বাসনা ছিল নদীর ধারে জীবন ভোর কেলাধুলোর
নদীর পেট এখন ফুটিফাটা!

কিছু একটা ভুল করেছি, চতুর্দিকে ভুলের মুখ
তার মধ্যেও গোপন, অতি গোপন
আমার জামায় ছুঁয়ে রয়েছে তোমার একটু না-জানা ঘুম
স্বপ্নটুকু ধার নিতে কি পারি?

ফিরিয়ে নাও

নাঃ, শুধু বন্ধুত্বও ফাঁপা আর হালকা লাগে
ফিরিয়ে নাও
মনে করো আমরা কাঁটা ঝোপ আর সেঁয়াকুল ঠেলে ঠেলে
                    অসংস্কৃত গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে, খাড়াই বেয়ে
                                        পৌঁছোলুম এক নির্জনতম পাহাড় শিখরে
তখনও তোমার মাথার নিখুঁত চুলগুলি বিস্রস্ত হল না।
তোমার সাতরঙা তাঁতের শাড়ির একটি ভাঁজও কুঁচকে গেল না

এর নাম বন্ধুত্ব? ফিরিয়ে নাও
একটা বিজন নদী তোমাকে দিতে চাইলুম,
তুমি বিস্কুট ভাঙার মতন
তাকে দু'ভাগ করলে
কিংবা আমি জানলা বন্ধ করলুম, তুমি খুলে দিলে দরজা
আমি হাতখানা বাড়ালে তুমি এগিয়ে দিলে হাতপাখা
একটা পালক দুলতে লাগল অন্ধকারে
তুমি ঝড় দেখতে চলে গেলে বারান্দায়
এর নাম বন্ধুত্ব? ফিরিয়ে নাও
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে
সবকিছু ভাঙার মতন, সবকিছু
ফিরে পাওয়ার মতন উন্মত্ততা
পৃথিবীর সমস্ত সমান সমান ভাগ তুচ্ছ করে, একটা কালো পর্দা
বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে
আমি তোমার নগ্ন কোমরের কাছে গরম নিশ্বাস ফেলতে চাই...

মিল-অমিল

'চলো যাই, ধরো হাত, আরও একটু দূরে গিয়ে বসি
শহর মিলিয়ে যাক, নিজস্ব নির্জন এক মনোভূমি, মাথার
ওপরে পূর্ণশশী—'
'হা-হা-হা-হা, সামান্য মিলের লোভে রোজকার চেনাশুনো চাঁদ
হল কিনা শশী, তবে এবার কি আরও কিছু ঘটবে পরমাদ?'
'মাইকেল মন্দ লিখতেন না, জীবনের সঙ্গে যোগ যদিও নেই
এখনকার
তবুও গাল ভারী শব্দ, কৃত্রিম উপমা, চেষ্টাকৃত অলংকার
অনেকটাই উৎরে গেছে, মাঝে মাঝে মনে এসে যায়, বেশ
লাগে
এই যে পাথর একটা, তিমি মাছের আকৃতি, বসা যাক এর
পুরোভাগে।'
'তুমি যখন তখন ফিরে যাও পুরনো কালের দিকে, পুরোভাগে,
সে আবার কী?'

'এমনিই একটু মজা, জ্যোৎস্নার নীল আগুনে তোমার নতুন
মুখখানি একটু দেখি!
হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ল, পুরনো না পুরাতন, মনে আছে সেই
গানখানি
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, এতে দেখা যায় না
সময় ছাড়ানো হাতছানি?
রবীন্দ্রনাথ যে লিখলেন পুরনোর বদলে পুরাতন, তা কি শুধু
মাত্রা ঠিক রাখতে হবে বলে?'
'চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, সময় ওড়াচ্ছি আমরা নিতান্তই মিথ্যে
কথাচ্ছলে!
কাছাকাছি কেউ নেই, হু হু হাওয়া, এখন কি গাইতে পারি না
একটা গান?'
'জীবনানন্দ তো মাত্রা ফাত্রা গ্রাহ্যই করতেন না, মনে আছে,
এক মাইল,
শান্তি কল্যাণ?'
'আবার ওইসব শুরু করলে, কবিতাও না, নিছক শুকনো যত
ছন্দ প্রকরণ
বরং শোনাও না একটা সম্পূর্ণ কবিতা, আমি শুনতে চাই
তোমার নিজস্ব উচ্চারণ।'
'হবে, একটু পরে হবে। একটা প্রশ্ন মনে আসছে তবু বার
বার
জীবনানন্দ যে ছন্দ ভাঙলেন, সুভাষ, শঙ্খ ও শক্তি কেন তাতে
ফিরলেন আবার?'
'উত্তর তো স্বাভাবিক, বাংলা কবিতার পক্ষে ছন্দ-মিল
রীতিটাই ভালো'
'টিকটিকির ঠিক ঠিক, তোমার কথায় দেখো এইমাত্র বিদ্যুৎ
চমকাল!'
'আকাশেও চোখ আছে? বাতাস উৎসুক, তবু তুমি শুধু
দেখছ না আমাকে'
'কবিতা তোমার ওষ্ঠে, তোমার অঙ্গুলি স্পর্শে, নখের ধুলোয়
মিশে থাকে
ওষ্ঠে নাকি ঠোঁটে, যদি আরও কাছে আসি, চাই একটি চুম্বন
ও দৃঢ় আলিঙ্গন'
'তুমি একটি যা-তা, তুমি প্রত্যেক কবির মতো ন্যাকা, তুমি
শব্দের অছিলা নিয়ে

ডুব দিয়ে আছ সারাক্ষণ
আমার সময় বেশি নেই, ফিরে যেতে হবে, আমি চেয়েছি
কয়েকটি চুমু ও
তীব্র বুকে বুক ছোঁওয়া জড়াজড়ি
'চুম্বন' ও 'আলিঙ্গন', যত সব শব্দ মোহ, এখনও হলে না
আধুনিক, লেখো
চাঁদ নিয়ে কাব্য মরিমরি!'
'শোনো, শোনো, আরও কিছু কথা আছে, লিখিনি কিছুই, এই
দেখো চেয়ে
ব্যর্থ লেখকের করুণ আঙুল—'
'জানি জানি, এরপরও মিল দেবে, আঙুলের সঙ্গে ভুল,
কিংবা বুঝি
শিমুল-জারুল!'

কেউ নাম ধরে ডাকবে?

নিরুদ্দিষ্টের বিজ্ঞাপনের প্রতিটি মুখই খুব
চেনা মনে হয়
মনে হয় যেন কখনও দেখেছি আয়নায়
রাস্তায় যখন একা একা ঘুরে বেড়াই,
যে সব রাস্তার কোনও শেষ নেই,
অনবরত বাঁক ঘুরে যায়
মনে হয়, কেউ কি আমার নাম ধরে ডাকবে?
কেউ বাল্যসঙ্গীর কণ্ঠস্বরে বলবে, তোমারই
প্রতীক্ষায় ছিলাম!

বিকেলবেলার আলোয় মেশে হালকা লাল রং
বদলে যায় সমস্ত পৃথিবী
বদলে যায় মানুষের মুখ
হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মনে হয়, গ্রামের কুঁড়েঘরে
পা ছড়িয়ে বসে আছেন শুকনো চোখে
আমার মা

'আমায় আর সবাই ভুলে গেছে, ওই একজন ছাড়া!'
এটাও একটা দৃশ্য মাত্র, আমার মা
ওরকমভাবে বসে থাকেননি কখনও
এ যেন হঠাৎ শখ করে কোনও পুরনো উপন্যাসের
মধ্যে ঢুকে পড়া
অন্য কোনও সংসারে গিয়ে সে বাড়ির মেজছেলের
জামাটি গায়ে দিয়ে
তারপর সেখানেই চিরকাল...

বৃষ্টির রাতে

বৃষ্টি কি কখনও কারুর কাছে পুরনো হয়ে যায়
নোয়ার নৌকো তো আর দ্বিতীয়বার ভাসেনি
খুব ঝড় বাদলের রাতে আমার জন্ম, মাতৃগর্ভে থেকেও
সেই শব্দ শুনেছি
নদী লাফ দিয়ে উঠেছিল, জিভ বাড়িয়েছিল উঠোনের আঁতুড় ঘরে
সেই দুঃখ স্মৃতি নিয়ে মা-মাসিরা এখনও হাসাহাসি করে
যদিও সে বাড়িও নেই, নদীও হারিয়ে গেছে
তবু ঘুমের মধ্যে আমি গাছের মতন আকাশের দিকে চেয়ে থাকি
হঠাৎ ডেকে ওঠে সুপুরুষ অভিনেতার মতন মেঘ
ঝমঝম করে বেজে ওঠে বাল্যকাল, বারবার খুলে যায় জানলা
মুখে এসে ঝাপটা লাগে, দেখতে পাই নির্জন রাস্তায় হেঁটে
যাচ্ছে একটি মাত্র দুঃখী মানুষ
সামান্য পা টেনে টেনে হাঁটছে, ভ্রূক্ষেপ নেই বৃষ্টিতে
কোনওদিন আগে তাকে দেখিনি, মুখটা তবু এত চেনা
ঠিক এইরকমভাবে পথের মোড়ে মিলিয়ে গিয়েছিলেন আমার বাবা।

এক সন্ধ্যায় দুই কবি

আরামকেদারায় দু' হাত ছড়িয়ে বসে আছেন খ্যাতিমান প্রৌঢ় কবি, তাঁর সুরেলা সংলাপ মুগ্ধ হয়ে শুনছে বন্ধুরা। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বাইশ বছরের একটি যুবক, পাতলা ছোটখাটো চেহারা, তবু ভারী রূপবান, মুখখানি কন্দর্পতুল্য।
ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন, এ কে?
গৃহস্বামী শিল্পী বেঞ্জামিন হেডন বললেন, উইলিয়াম, এই ছেলেটির নাম জন, জন কিট্‌স, ডাক্তারি পড়া ছেড়ে কবিতা লিখছে, হাতটা বেশ ভালো, তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, তাই এই পার্টিতে আসতে বলেছি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই নবাগতের এক লাইন রচনাও পড়েননি, নামটা শোনা-শোনা, সংযত সৌজন্যে বললেন, শুভ সন্ধ্যা, তোমাকে দেখে খুশি হলাম।
তিনি করমর্দনের জন্য বাড়িয়ে দিলেন ডান হাত, কিট্‌স এগিয়ে এসেও দ্বিধান্বিত, শরীর কাঁপছে তার। ওই হাত, প্রিয় কবির হাত, ওই আঙুলে ধরা কলমে লেখা হয়েছে লুসি সিরিজের অনবদ্য গীতিকবিতাগুলি, 'প্রস্তাবনা'র মতন কাব্য। ওই হাত স্পর্শ করার যোগ্য কি সে?

ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর মনোযোগ না দিয়ে ফিরে গেলেন তাঁর অসমাপ্ত বাক্যে, হোমার, ভার্জিল, শেক্সপিয়ার, মিলটন থেকে উদ্ধৃতি দিতে লাগলেন অনবরত, তিনিই একমাত্র বক্তা, অন্য সকলে শ্রোতা। এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল কিট্‌স, তার ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে, ওই কবিতাংশ সবই তার মুখস্থ। একদৃষ্টিতে দেখছে সে তার প্রিয় কবিকে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মাথার পেছনে দেয়ালে ঝুলছে হেডনের আঁকা যিশুখ্রিস্টের জেরুজালেমে প্রবেশ দৃশ্যমান বিশাল ছবিটি, পাশে ফায়ার প্লেসে রক্তিম আভা, জানলার বাইরে বেলাশেষের সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে।
কিট্‌সের মনে পড়ল, এই কবি সম্পর্কেই তাঁর বন্ধু কোলরিজ বলেছিলেন, ও মহান, অতিমানব। ওয়ার্ডসওয়ার্থই একমাত্র ব্যক্তি, যার কাছে সর্ব সময়ে, সর্ব বিষয়ে আমি নিজেকে ছোট মনে করি। ...ইদানীং অবশ্য কিছু কিছু তরুণ আড়ালে বলাবলি করে, উনি কী সব লিখছেন আজকাল! আগেকার সেই অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। কিট্‌স নিজে তা ভাবে না, কবির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতেই সে আবিষ্ট হয়ে আছে। সেই কবি আজ সশরীরে এখানে উপস্থিত, তাঁর চক্ষুদুটি, ওই চক্ষে যেন দিব্যদর্শন হয়েছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাণীপ্রবাহের মাঝখানে মূর্তিমান বিঘ্নের মতন প্রবেশ করলেন চার্লস ল্যাম। গেলাসে গেলাসে মদ ঢেলে সবার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, কার স্বাস্থ্য পান করব? তারপর ওয়ার্ডসওয়ার্থের দিকে ফিরে ধিক্কারময় কণ্ঠে

বললেন, ওহে হ্রদ-কবি, ওহে রাসকেল, তুমি কেন ভলতেয়ারকে স্থূল বলেছ?

কিট্স শিউরে উঠলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বন্ধুর কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে স্থূল তো বটেই।
শুরু হয়ে গেল তর্ক, কেউ কেউ সমর্থন করলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থকে। কিট্সের পছন্দ হল না। কবিতার ভাষা ব্যবহার নিয়ে কী অপূর্ব বলছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তার মধ্যে আবার গদ্যের অবতারণা কেন? ভলতেয়ার থেকে ফ্রান্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থের একদা-ফ্রান্সভক্তি এখন বিরূপতা, ফ্রান্সে তাঁর অবৈধ সন্তান, পরিত্যক্ত প্রেমিকা অ্যানেত্, ল্যাম আরও খোঁচা দিয়ে বললেন, প্রকৃতিমুগ্ধ ঋষিপ্রতিম কবিরও তা হলে অবৈধ সন্তান থাকে...
কিট্সের মন চলে গেল ফ্রান্স ছেড়ে গ্রিসে, প্রাচীন গ্রিস, বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পের জন্মভূমি... তারপর সে শুনতে পেল একটা পাখির ডাক। এটা কোন পাখি?

বিষয় থেকে বিষয়ান্তর, ল্যাম এবার শিল্পীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললন, ওহে, তুমি তোমার ছবিতে নিউটনের মুখচ্ছবি বসিয়েছ কেন? ও লোকটা তো ত্রিভুজের তিনটি দিকের মতন সরল প্রমাণ না পেলে কিছুই বোঝে না। অঙ্ক, শুধু অঙ্ক, ও ধ্বংস করেছে আকাশের একটি পরমাশ্চর্য কবিতা।
কিট্স আপন মনে বলে উঠল, ঠিক!
সবাই তাকালেন এই তরুণ কবির দিকে।
কিট্সের চোখ জানলার বাইরে ঈগল পাখির ডানার মতন অন্ধকারে নিমগ্ন। আকাশ দেখা যায় না, তবু সে আকাশ দেখছে। খানিকটা ভাঙা ভাঙা, দুঃখমাখা গলায় বলল, বাল্যকাল থেকে আমরা রামধনু দেখে কত না বিস্ময়বোধ করেছি। কী দরকার ছিল সেই বিস্ময়বোধ ভেঙে দেবার...

ল্যাম তীব্র স্বরে বললেন, ওই বিশাল রামধনু নিছক ত্রিশিরা কাচের বর্ণচ্ছটা? জলকণার বিচ্ছুরণ? হাঃ!

কিট্স ওয়ার্ডসওয়ার্থের উদ্দেশে বলল, আবৃত্তি করেছি আপনারই কবিতা, 'আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, যখন আমি দেখি, আকাশে এক রামধনু...'

ওয়ার্ডসওয়ার্থ হেসে উঠলেন খোলা গলায়। খুবই উপভোগ করছেন এমন স্বরে বললেন, বাঃ, চমৎকার। তা হলে নিউটনকে কী শাস্তি দেওয়া যায়?

হাতের সুরার গেলাসে এখনও চুমুক দেয়নি কিট্স। হাত উঁচু করে সেও সহাস্যে বলল, আসুন, আমরা নিউটনের স্বাস্থ্যপান করি, এবং গণিতের প্রতি বিভ্রান্তির।

বাইরে আবার একটা পাখি ডেকে উঠল। ওটা কোন পাখি?
শুধু পাখি নয়, আকাশও ডাকছে। আকাশে এখনই এক কবিতা-সন্ধ্যা শুরু হবে।

প্রতীক্ষায়

গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের ডানা পুড়ে যায়
হাওয়া ঘোরে দূরে দূরে
ফুলকে সমীহ করে
সূর্যাস্ত থমকে থাকে।

দেখো দেখো
আমার বাগানে এক অগ্নিময়
ফুল ফুটে আছে
তার সৌরভেও কত তাপ!
আর সব কুসুমের জীবন-চরিত তুচ্ছ করে
সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চতুর্দিক
বৈদূর্যমণির মতো চোখ মেলে সে রয়েছে প্রতীক্ষায়
কার? কার?

অন্য গল্প

যেন কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প
জামালুদ্দিনের টিকিস টিকিস গোরুর গাড়ির পাশ দিয়ে ঝমঝমিয়ে ছুটে যায়
সাঁইথিয়া লোকাল
জামালুদ্দিন গাড়োয়ান অবশ্য গল্পটা জানে না।
বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ট্রেনটাকে গ্রাহ্যই করে না সে
আর ওইসব ইস্কুলে-পড়া গল্প আজকাল জীবনে মেলে নাকি?
কচ্ছপরা কবে হেরে ভূত হয়ে গেছে, আর
খরগোশরা টপাটপ বুক পেতে দিচ্ছে ছুরির নীচে

সাঁইথিয়া লোকাল বড় একটা লেট করে না, পেট ভর্তি মানুষ নিয়ে
ছুটে যাচ্ছে রোজ
কোনদিন কে ইঞ্জিন চালায় কেউ জানে না
গোরুদুটোর আগেই জামালুদ্দিন বুড়ো হয়, ঝুঁকে পড়ে
গতবারের খরায় একটা গোরু গেল গোভাগাড়ে, অন্যটাকে
তাড়াতাড়ি বেচে দিতে হল অণ্ডালের হাটে
এখন জামালুদ্দিন ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটে, মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে,
ট্রেনের শব্দ শুনে ফিকফিকিয়ে হাসে
এটাকে একটা অন্য গল্প বলা যায় না?

ব্যর্থতার তীব্র টান

একটা সীমানাহীন ধূ ধূ গেরুয়া রঙের প্রান্তরে, একা, খুব একা
শীতে কালো রঙের চাদর মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে আছে আমার কৈশোর
তার ওষ্ঠে লেগে আছে ব্যর্থ প্রেমের বিষাদ, চোখ দুটি ঈষৎ ঝাপসা
দিগন্ত জোড়া আকাশে আকাশে ছড়িয়ে আছে তার অভিমানের
লাবণ্যময় আভা
এই সুন্দর ছবিটি আমি দেখছি দূর থেকে, বহু বছর পেরিয়ে
বুকে ব্যথা হয় না, এখন অনায়াসে কৌতুক করা যায়
ব্যর্থ প্রেমের আগে সত্যিই কি প্রেম ছিল? সেই বয়ঃসন্ধির সময়ে
আগুন জ্বলত অনবরত, কাঠকুটোর অভাবে আমি নিজেই কি
একদিন আহুতি দিইনি এক কিশোরীকে?
অসংখ্য চিঠির প্রতিটি শব্দই কি আসলে অস্ত্রে শান দেওয়া নয়?
অথচ নিজেও তো হাত পুড়িয়েছি বারবার, সেই কিশোরীটির জন্য
হৃৎপিণ্ড উপড়ে দিতেও রাজি ছিলাম না?
তবু কোথায় যেন ছিল সার্থকতার চেয়ে ব্যর্থতার প্রতি তীব্র টান
এক নদীর কথা মনে পড়ে, বারবার ফিরে আসে কবিতায়, তবু
সেই নদীকেও তো অনায়াসে ছেড়ে এসেছি
নদীকে এত ভালোবাসতাম, তার জলে শরীর মিশিয়ে তো থাকতে
চাইনি সারা জীবন!

ব্যর্থ প্রেম কি তবে নিজেরই অজান্তে এক গোপন স্বার্থপরতা?
দূর থেকে সেই কৈশোরের ছবিটি দেখি, হঠাৎ শুনতে পাই
পাহাড় কাঁপানো এক নিদারুণ হাহাকার

অমনি আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়, আমার হাত থেকে
খসে পড়ল কলম।

সীমান্ত ভাঙা

আমি এখন মধ্যরাত্রির নির্জন ঘরে
আবার আমিই একটা দারুণ হুড়োহুড়ির রেলস্টেশনে
একলা দাঁড়িয়ে

এখন রাত বারোটা পঁয়তিরিশ
আমার বয়েস সাতাশ, পকেটে মাত্র সাত টাকা, ঠোঁটে তাচ্ছিল্য
রেলস্টেশনের আমি আর দশতলার একলা ঘরে
আমার অন্যরকম শরীর

আমার শান্ত ব্যস্ততা এবং আমার কঠিন যৌন উত্থান
গোপন, খুব গোপন

আমার শরীর টনকো, অথচ সাতাশ বছরে আমায় কেউ
কাজ দেবে না

তা হলে কেন আমি ধ্বংসের নেশায় মাতবো না?
দশতলার ঘরে আমি যুক্তিবাদী, সমাজতত্ত্ব নিয়ে
প্রবন্ধ মকশো করছি

যুক্তির পেছনে ছুঁচোবাজি জ্বালিয়ে হঠাৎ লিখে ফেলছি
এক একটি কবিতা
তুমি নারী, তোমার ভিজে ভিজে ওষ্ঠ ও গ্রীবার গর্বিত ভঙ্গি নিয়ে
বারবার লিখতে ইচ্ছে করে

অথচ রেলস্টেশনে সাতাশ বছরের ছেলেটির পেটে
জ্বলছে খিদে, সে কোথাও যাবে না
কবিতার নারী, তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না একবার?
এই সীমান্ত ভাঙবে না?
ভেঙে যাচ্ছে মধ্য রাত্রি, আমি দশতলা থেকে উড়ে যাচ্ছি
সেই রেলস্টেশনের দিকে!

ছুঁয়ে দেখা হবে

যাও, কুসুম-গভীরে, যাও সন্ধ্যার বিলীন আলো গায়ে মেখে
ঘর ছেড়ে ঘরের অন্দরে, দেয়ালের পর্দা ভেদ করে যাও
এখানেই দেখা হবে, পৃষ্ঠা খুলে খুলে দেখা হবে
বুকে এত তারা, জামা খোলা, একাকীত্বে আলিঙ্গন,
তবু ছুঁয়ে দেখা হবে।

সপ্তম গর্ভের কন্যা

সপ্তম গর্ভের কন্যা, কেন এলি যে বাড়িতে
উনুন জ্বলে না?
পুকুরের জলে ভাসছে ছোট্ট দেহখানি
চারপাশের গাছপালা মুখ ঝুঁকিয়ে বলছে দ্যাখো দ্যাখো,
মেয়েটার চোখ মুখে ঠিক তার মায়ের আদল
মা কোথায়? সে এখনও আঁতুড়ে পাথর হয়ে আছে
তার হাতে রক্ত, তার স্তনদুটি খটখটে ধুঁধুল
খিদের উত্তাপে সব মায়া-দয়া বাষ্প হয়ে উপে গেছে কবে!

ভাঙা কুঁড়েটার সামনে এইমাত্র থামল খুব ব্যস্ত জিপ গাড়ি
শুনুন দারোগাবাবু, একটা প্রশ্নের আপনি উত্তর দেবেন?
বাচ্চারা না খেয়ে মরলে সমাজ বা পুলিশ আসে না

আজ কেন এসেছেন শত কাজ ফেলে?
ওরে বাবা, এ যেন খুন, পরিষ্কার গলা-টেপা কেস!
দেশটায় একী হল, মায়েরাও খুনি হয়ে গেল!
দু'-চারটে চড়-চাপড় দিয়ে মাকে তোলা হল কয়েদ গাড়িতে
প্রতিবেশী মুখ লুকোয়, গাছগুলো বলল, ধিক, ধিক
গারদে আছড়ে ফেলে সদ্য প্রসূতিকে হল আজকের
কাজ সমাপন!

দারোগা রাত্তিরে যান অভিযানে ঝাঁপ ফেলা সোনার দোকানে
তাঁর পত্নী বনবালা ক্রিম পমেটম মেখে সাজেন গোজেন
ছেলেরা ক্যারাম খেলে, মেয়েরা দুধের বাটি ঠেলে ফেলে দেয়
নদীপথে নৌকো যায়, পাটাতন ভর্তি অস্ত্র, পিস্তল-কার্তুজ
ঈষৎ রঙিন চোখে মধ্যরাতে বড়বাবু-বনবালা হন গলাগলি
পোশাক লুটোয় মেঝে, রতিক্রিয়া চলতে থাকে হাপুস হুপুস
সপ্তম গর্ভের কন্যা, ফিরে আয়, এই ফাঁকা গর্ভে ঢুকে পড়
উনুন নেভে না কভু এ বাড়িতে, জননীর বুকে দুই দুধভরা ঘটি
কেন দাবি ছাড়বি তুই, শূন্যতার চেয়ে মর্তভূমি ঢের ভালো!

ঘূর্ণি

আর কিছু নয়, একটা মুহূর্তের ঘূর্ণি...
দৃষ্টি এক ঝলক

অনেক মুহূর্ত থেকে তুলে নেওয়া মায়ার উষ্ণতা
এমনকী সাদা গাছটির একটা ফুলও নয়
শুধু একটি পাপড়ি ছোঁয়া ঠোঁট

নদী নয়, নদীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া
পাখি উড়ে যায়, তার ফেলে যাওয়া শব্দ
আর কিছু নয়, একটা ঘূর্ণি
একটা ঘূর্ণি।

দেখা না দেখা

দেখা হবে কি হবে না ভেবে ভেবে কেটে গেল কতটা জীবন
শিউলি ফোটার দিন, কাশফুল ঝরে যাবে দেখা হয়, সেও দেখা নয়
দেখা না হলেও দেখি, বন্ধ জানালার কাচে যে-রকম স্থির প্রজাপতি
খুব গাঢ় ঘুমে দেখি, জেগে থেকে এ জগৎ যেন নিতান্তই স্বপ্নহীন
বিদ্যুৎ চমকে দেখি, বিদ্যুৎ দেখি না, শুধু দু' চোখের ঘুম ভাঙে বুঝি
এমনকী ঈশ্বরও যদি দেখা দিতে চান বলি, সে কোথায়?
সে কোথায়? সে কোথায়? কে সে? সে কি এক জীবনের সুপ্ত বিভা?
আমি হাসি, কত শত বঞ্চিত মানুষও হাসে, নিজের ব্যর্থতা নিয়ে হাসে
খিদে নিয়ে হাসে, কিংবা প্রেমের ব্যর্থতা নিয়ে, চোখে ভরা জল নিয়ে হাসে
না, নিছক নারী নয়, কিংবা নারী, কিংবা আরও কিছু, চোখ খোলা তবু,
কিছুই দেখি না।
চোখে মোহের অঞ্জন ভোরবেলা, চোখে সন্ধ্যাকালে জয়ের উল্লাস
কে বলেছে এই আমি দেখিনি, চিনিনি সব, চতুর্দিকে দেখার সাম্রাজ্য
অথচ মেঘের ছায়া, ঘাস ফুল চোখ টেপে, এত দেখা বাকি
যা দেখেছি, তার কিছুই দেখিনি, সমস্ত দেখার মধ্যে হা হা করে বিরাট শূন্যতা।

দিগন্ত কি কিছু কাছে

আজ বহু দূর এসে কংক্রিট ছাদের নীচে
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি,
ব'সে আছে নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা,
দুপুরের বর্ণদ্যুতি, বাতাস দ্বিখণ্ড করে
ভেসে ওঠে চিল,
একটু একটু মনখারাপ, কবিতার খাতা
মুড়ে আমি উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ
আকাশ অচেনা লাগে, দিগন্ত কি কিছু
কাছে এগিয়ে এসেছে?

রূপ

কড়ির মতন টেপা টেপা চোখ, নাক ছ্যাঁচা, ছিছি
লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা
একটা জীবন শরম-ভরম, শুধুই ভস্ম শয্যা!
পারুল ডাঙার প্রান্তে তিনটি বালিকা বলল, নদীর
ওপারে যাবি?
গেলে না, একলা রয়ে গেলে, হাতে পুরোনো হলুদ চাবি!
লকলক করে বাড়ে ফুলগাছ, শরীর না যেন খাঁটি
বিদ্যুল্লতা
তুমি তার পাশে দাঁড়াও না ভয়ে! বুক ভরা নীরবতা।

পুতুল খেলায় যারা মেতেছিল, তারা ক্রমে ক্রমে ঢুকে
গেল সংসারে
তুমি চৌকাঠ পেরুলে না, বসে রইলে দিঘির ধারে।
বর্ষা এল কি এল না কে জানে, শীতের বাতাসে খসে
খসে পড়ে পাতা
কোথা অদৃশ্য ঘর্ঘর নাদে ঘুরছে একটা জাঁতা।

ওলো ও কন্যা, আগুন জ্বলেনি, রক্তে কখনও ছলকে
আসেনি ঢেউ?
চোখের তারায় বিমূর্ত ছবি, দেখাল না বুঝি কেউ।
রূপের ফুলকি উড়ছে বাতাসে, স্বপ্ন যেমন জীবনকে দেয়
রংমশালের ঝড়
রূপও স্বপ্ন, স্বপ্ন না দেখে সারাটা জীবন রয়ে গেলে উলুখড়!

কলম

মাত্র একটাই কলম পকেটমার হয়েছে এ জীবনে
বাকি সব ফাউন্টেন পেন, পেন্সিল, ডট পেন, জটার
উধাও হয়েছে যে-যার নিজস্ব নিয়মে

জাহাজের রেলিং-এ ঝুঁকে থাকা হাত থেকে একলা হলুদ কলম
খসে পড়েছিল টুপ করে বঙ্গোপসাগরের জলে
খসে পড়েছিল, না ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছিলাম?
শব্দের অসহ্য অতৃপ্তির দাহে জ্বলে উঠেছিল আঙুল
কালি শুকিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল কলম থেকে
খাতার পাতার পর পাতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল
বিষের মতন একটা হিম নীলাভ শিখা হলুদ কলমকে
বলল, পরিণামদর্শী, তুমি ব্যর্থ,
তুমি যাও!

পকেটমার-কলমটি কোথায় কার আঙুল পোড়াচ্ছে কে জানে!

না-পাঠানো চিঠি

মা, তুমি কেমন আছ?
আমার পোষা বেড়াল খুনচু, সে কেমন আছে
সে রাত্তিরে কার পাশে শোয়
দুপুরে যেন আলি সাহেবদের বাগানে না যায়
মা, ঝিঙে মাচায় ফুল এসেছে?
তুলিকে আমার ডুরে শাড়িটা পরতে বলো
আঁচলের ফেঁসোটা যেন সেলাই করে নেয়
তুলিকে কত মেরেছি, আর কোনওদিন মারব না
আমি ভালো আছি, আমার জন্য চিন্তা করো না
মা, তোমাদের ঘরের চালে নতুন খড় দিয়েছ?
এবারে বৃষ্টি হয়েছে খুব
তরফদারবাবুদের পুকুরটা কি ভেসে গেছে?
কালু-ভুলুরা মাছ পেয়েছে কিছু?
একবার মেঘের ডাক শুনে কই মাছ উঠে এসেছিল ডাঙায়
আমি আমগাছ তলায় দুটো কই মাছ ধরেছিলাম
তোমার মনে আছে, মা?
মনে আছে, আলি সাহেবের বাগানের সেই নারকোল
চুরি করে আনিনি, মাটিতে পড়েছিল, কেউ দেখেনি

নারকোল বড়ার সেই স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।
আলি সাহেবের ভাই মিজান আমাকে খুব আদর করত
বাবা একদিন দেখতে পেয়ে চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়েছিল আমাকে
আমার কী দোষ, কেউ আদর করলে আমি না বলতে পারি?
আমার পিঠে এখনও সেই দাগ আছে
আলি সাহেবদের বাগানে আর কোনওদিন যাইনি
আমি আর কোনও বাগানে যাই না।
সেই দাগটায় হাত বুলিয়ে বাবার কথা মনে পড়ে
বাবার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়
আমি ভালো আছি, খুব ভালো আছি
বাবা যেন আমার জন্য একটুও না ভাবে
তুলি কি এখনও ভূতের ভয় পায়?
তুলি আর আমি পুকুর ধারে কলাবউ দেখেছিলাম
সেই থেকে তুলির ফিটের ব্যারাম শুরু হল
দাদা সেই কলাগাছটা কেটে ফেলল
আমি কিন্তু ভয় পাইনি, তুলিকে কত ক্ষেপিয়েছি
আমার আবার মাঝরাত্রে সেই কলাবউ দেখতে ইচ্ছে করে
হ্যাঁ, ভালো কথা, দাদা কোনও কাজ পেয়েছে?
নকুড়বাবু যে বলেছিল বহরমপুরে নিয়ে যাবে
দাদাকে বলো, ওর ওপর আমি রাগ করিনি
রাগ পুষে রাখলে মানুষের বড় কষ্ট
আমার শরীরে আর দাগ নেই, আমি আর এক ফোঁটাও কাঁদি না
মা, আমি রোজ দোকানের খাবার খাই
হোটেল থেকে দু' বেলা আমার খাবার এনে দেয়
মাংস মুখে দিই আর তুলির কথা, কালু-ভুলুর কথা মনে পড়ে
তোমাদের গ্রামে পটল পাওয়া যায় না
আমি আলু পটলের তরকারি খাই, পটল ভাজাও খাই
হোটেলে কিন্তু কক্ষনও শাক রান্না হয় না
পুকুর পাড় থেকে তুলি আর আমি তুলে আনতাম কলমি শাক
কী ভালো, কী ভালো, বিনা পয়সায়
কোনওদিন আর কলমি শাক আমার ভাগ্যে জুটবে না
জোর হাওয়া দিলে তালগাছের পাতা সরসর করে
ঠিক বৃষ্টির মতন শব্দ হয়
এই ভাদ্দর মাসে তাল পাকে, টিপ টিপ করে তাল পড়ে
বাড়ির তালগাছ দুটো আছে তো?

কালু তালের বড়া বড় ভালোবাসে, একদিন বানিয়ে দিয়ো
তেলের খুব দাম জানি, তবু একদিন দিয়ো
আমাকে বিক্রি করে দিয়ে ছ' হাজার টাকা পেয়েছিলে
তা দিয়ে একটা গোরু কেনা হয়েছে তো?
সেই গোরুটা ভালো দুধ দেয়?
আমার মতন মেয়ের চেয়ে গোরুও অনেক ভালো
গোরুর দুধ বিক্রি করে সংসারের সুসার হয়
গোরুর বাছুর হয়, তাতেও কত আনন্দ হয়
বাড়িতে কন্যা সন্তান থাকলে কত জ্বালা
দু' বেলা ভাত দাও রে, শাড়ি দাও রে, বিয়ের জোগাড় করো রে
হাবলু, মিজান, শ্রীধরদের থাবা থেকে মেয়েকে বাঁচাও রে
আমি কি বুঝি না, সব বুঝি
কেন আমায় বিক্রি করে দিলে, তাও তো বুঝি
সেই জন্যই তো আমার কোনও রাগ নেই, অভিমান নেই
আমি তো ভালোই আছি, খেয়ে পরে আছি
তোমরা ওই টাকায় বাড়ি ঘর সারিয়ে নিয়ো ঠিকঠিক
কালু-ভুলুকে ইস্কুলে পাঠিয়ো
তুলিকে ব্রজেন ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ো
তুমি একটা শাড়ি কিনো, বাবার জন্য একটা ধুতি
দাদার একটা ঘড়ির শখ, তা কি ও টাকায় কুলোবে?
আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, সোনার দুল গড়িয়েছি
একদিন কী হল জানো, মা
আকাশে খুব মেঘ জমেছিল, দিনের বেলা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার
মনটা হঠাৎ কেমন কেমন করে উঠল
দুপুরবেলা চুপি চুপি বেরিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম
স্টেশনে নেমে দেখি একটা মাত্র সাইকেল রিকশা
খুব ইচ্ছে হল, একবার বাড়িটা দেখে আসি
রথতলার মোড়ে আসতেই কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল
কে যায়, কে যায়?
দেখি যে হাবুল-শ্রীধরদের সঙ্গে তাস খেলছে দাদা
আমাকে বলল, হারামজাদি, কেন ফিরে এসেছিস?
আমি ভয় পেয়ে বললাম, ফিরে আসিনি গো, থাকতেও আসিনি
একবার শুধু দেখতে এসেছি
হাবুল বলল, এটা একটা বেবুশ্যে মাগি
কী করে জানল বলো তো, তা কি আমার গায়ে লেখা আছে?

আর একটা ছেলে, চিনি না, বলল, ছি ছি ছি, গাঁয়ের বদনাম
হাবলু রিকশাঅলাকে চোখ রাঙিয়ে বলল, ফিরে যা
আমি বললাম, দাদা, আমি মায়ের জন্য ক'টা টাকা এনেছি
আর তুলির জন্য...
দাদা টেনে এক চড় কষাল আমার গালে
আমাকে বিক্রির টাকা হক্কের টাকা
আর আমার রোজগারের টাকা নোংরা টাকা
দাদা সেই পাপের টাকা ছোঁবে না, ছিনিয়ে নিল শ্রীধর
আমাকে ওরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল
আমি তবু দাদার ওপর রাগ করিনি
দাদা তো ঠিকই করেছে, আমি তো আর দাদার বোন নই
তোমার মেয়ে নই, তুলির দিদি নই
আমার টাকা নিলে তোমাদের সংসারের অকল্যাণ হবে
না, না, আমি চাই তোমরা সবাই ভালো থাকো
গোরুটা ভালো থাকুক, তালগাছ দুটো ভালো থাকুক
পুকুরে মাছ হোক, খেতে ধান হোক, ঝিঙে মাচায় ফুল ফুটুক
আর কোনওদিন ওই গ্রাম অপবিত্র করতে যাব না
আমি খাট-বিছানায় শুই, নীল রঙের মশারি
দোরগোড়ায় পাপোশ আছে, দেওয়ালে মা দুর্গার ছবি
আলমারি ভর্তি কাচের গেলাস
বনবন করে পাখা ঘোরে। সাবান মেখে রোজ চান করি
এখানকার কুকুরগুলো সারা রাত ঘেউ ঘেউ করে
তা হলেই বুঝছ, কেমন আরামে আছি আমি
আমি আর তোমার মেয়ে নই, তবু তুমি আমার মা
তোমার আরও ছেলেমেয়ে আছে, আমি আর মা পাব কোথায়?
সেই জন্যই তোমাকে চিঠি লিখছি, মা
তোমার কাছে একটা খুব অনুরোধ আছে
তুলিকে একটু যত্ন করো, ও বেচারি বড় দুর্বল
যতই অভাব হোক, তবু তুলিকে তোমরা...
তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো
তুলিকেও যেন আমার মতন আরামের জীবনে না পাঠায়
যেমন করে হোক, তুলির একটা বিয়ে দিয়ো
ওর একটা নিজস্ব ঘর সংসার, একজন নিজের মানুষ
আর যদি কোনওরকমেই ওর বিয়ে দিতে না পারো
ওকে বলো, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে

মরলেও ও বেঁচে যাবে!
না, না, না, এ কী অলুক্ষণে কথা বলছি আমি
তুলি বেঁচে থাকুক, আর সবাই বেঁচে থাকুক
তুলির বিয়ে যদি না হয় না হোক
হে ভগবান, গরিবের বাড়ির মেয়ে কি বিয়ে না হলে বাঁচতে পারে না?
বিয়ে না হলেই তাকে গ্রামের সবাই ঠোকরাবে?
দু' পায়ে জোর হলে তুলি কোথাও চলে যাক
মাঠ পেরিয়ে, জলা পেরিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে
আরও দূরে, আরও দূরে, যেদিকে দু' চোখ যায়
এমন জায়গা নিশ্চয়ই কোথাও আছে, কোথাও না কোথাও আছে
যেখানে মানুষরা সবাই মানুষের মতন
আঁচড়ে দেয় না, কামড়ে দেয় না, গায়ে ছ্যাঁকা দেয় না, লাথি মারে না
যেখানে একটা মেয়ে, শুধু মেয়ে নয়, মানুষের মতো বাঁচতে পারে
মা, তুমি আমার মা, আমি হারিয়ে গেছি
তুলিকে তুমি... তুলি যেন... আমার মতন না হয়!
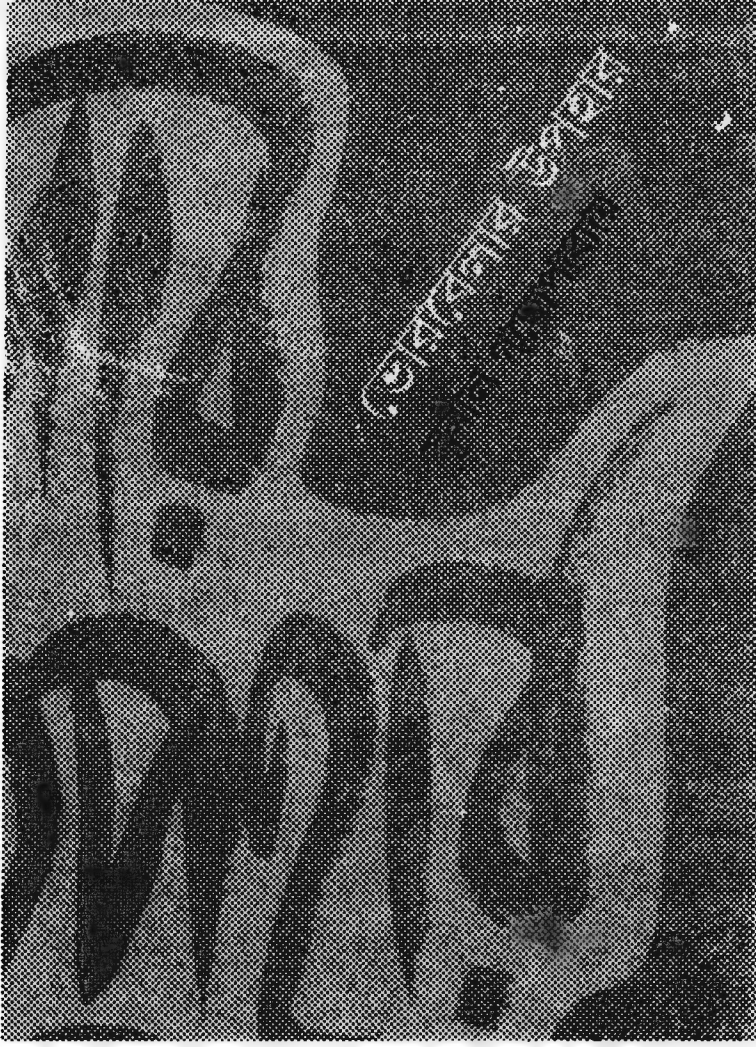
ভোরবেলার উপহার

সূচিপত্র

ভেঙে পড়েছে সাঁকো

অন্ধকারে নদী পেরুব, ভেঙে পড়েছে সাঁকো
ছোট্ট নদী, ছুঁড়ি প্রতিম, বৃষ্টি খেয়ে মাতাল
ছিঁড়ে খাচ্ছে গাছের ডাল, জিভে চাটছে মাটি
হিজল গাছের ঘাড় মটকে হা হা করছে বাতাস।

ওপারে কেউ যাবে না আর রাত্রি চোখ বন্ধ
আমি তা হলে কোথায় যাই, খিদের ধিকিধিকি,
ঘুমের টান, নেশার টান, কোথায় গিয়ে মেটাই
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে পৃথিবী গেল থেমে।

আমিটা কে? হেঁকে বলো হে, আছে কি কোনো নাম?
নদী পেরুতে এলে এখানে, পেরুতেই যে হবে
এমন মাথার দিব্যি কেউ তোমায় কবে দিল?
না পেরুলে আজ রাতেই দুনিয়া উল্টে যাবে?

আমির মধ্যে অন্য আমি, ঘুমের মধ্যে জাগা
মেঘের মধ্যে ভেজা বারুদ, ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না
গ্রন্থভুক পথ পাগল, প্রেমিক উদাসীন
একটা আমি ছাতা মাথায়, অন্য আমি নদীর জলে নামে।

গাঙে ভেসে যায় সোনার নৌকো

গাঙে ভেসে যায় সোনার নৌকো, ধরতে পারি না, দৌড়ে এসেও
ধরতে পারি না
হেঁতাল ঝোপের আড়ালে কে দিল হাতছানি, দিল হাতছানি, তাকে
দেখেছি কখনো, দেখেছি অচেনা
গেরুয়া জলের ভিতরে জলের ভিতরে শব্দ, জল গিলে খায়
জলের শব্দ
রোদ আঠা হয়ে নেমে আসে গায়, নেমে আসে নীচে, মাটিতে,
শিকড়ে

বেলা যায়, বেলা সমূহ গড়ায়, বেলা ভেসে যায় পায়ের তলায়

এখন সন্ধে নিকষ একলা, সন্ধে একলা, ফেরিঘাটে বসে
আমিও একাকী
এ নদীতে আর কিছুই যায় না, নদী ছাড়া আর কিছুই যায় না
জলের আঁচলে প্রতিমার ঘ্রাণ, খড়ের প্রতিমা, কুলুকুলু হাসি,
শরীরের ঘ্রাণ
মাঘ রজনীতে প্রথম শরীর, প্রথম রাত্রি, রাত্রিকে ভাঙা, ভেঙে ভেঙে
সারা জীবনে জড়ানো
এই ছেলেবেলা, এই যৌবন, সামনে পেছনে লুকোচুরি খেলা
কে ডাকে কে ডাকে হাওয়া উন্মন, হাওয়ার ডানায়
উড়ছে আকাশ
দুলছে আকাশ, নামছে আকাশ, জলে ডুব দিল আমার আকাশ...

সংগীত ভ্রমণ

শীতকালের বিকেল, কিছুই করার নেই, এরকম সময়ে চরম শত্রুকেও যেন
হোটেলের ঘরে একলা থাকতে না হয়
বই নেই, বাইবেল পড়ব? সকালের বাসি কাগজ?
দমবন্ধ ঘরে আরশোলার গন্ধ, জানলা খুলতেই কনকনে হাওয়া
টিভি দেখলে গা নিশপিশ করে, মনে হয় কোনো নিচুস্তরের গ্রহের সংস্কৃতি
হঠাৎ টেলিফোন, অশোক বাজপেয়ী বলল, চলো ইয়ার,
কিছুক্ষণ গান শুনে আসি
ভোপালের ভারত ভবনে ঘরোয়া আসরে এসেছেন এক শিল্পী
নীল হাতা শার্ট ও ধুতি পরা, প্রায় বুড়ো, ট্রেনের টিকিট চেকারের মতন গোমড়ামুখো
দেখলে একটুও ভক্তি হয় না, এ আবার কাকে ধরে এনেছে?
পাবলিক রিলেশানস যাচ্ছেতাই, মুখ তুলে ক্যামেরার দিকে চোখ
রাখতেও জানে না—
তানপুরায় মৃদু ঝংকার তুলে গান ধরলেন মল্লিকার্জুন মনসুর
সাত মিনিট শোনার পর মনে হল উঠে যাই, হোটেলের ঘরেই ফিরে
হুইস্কি পান করতে করতে ভালো কোনও ক্যাসেট শুনি
একা একা গান শোনাই বেশি আরামের,

পছন্দমতন গান দিয়ে ছবি আঁকা যায়
ঠিক ঠিক গান শুষে নেয় শরীর, ভেসে ওঠে নারীর মুখ,
আকস্মিক মিলন রোমাঞ্চ
এখানে এই ভিড়-ভর্তি ঘরে বসে আছি কেন?

একাদশ মিনিটে হঠাৎ একটা হলক্‌তানে কেঁপে উঠল নাদব্রহ্ম
ঘরভর্তি বাতাস ছিটকে সরে গেল, বাতাস নেই, শুধু সুর
মানুষের পায়ের ধুলো, মাকড়সার সূক্ষ্ম জাল, পায়রার খোপে খোপে
সুরের প্রতিধ্বনি
সমস্ত মুখগুলি সুরের ছোঁয়ায় অবনত
এ লোকটা কে? এখন আর চেনা যাচ্ছে না, মিলিয়ে গেছে তিন সপ্তকে
যেন ফৈয়াজ খান ও গহরজান দাঁড়িয়ে আছেন দু'পাশে
আকাশে ছবি আঁকছেন মল্লিকার্জুন, পাহাড়ের মতো মেঘ রাগ
'গরজে ঘটা ঘন কারি কারি...' নেয়ামত খাঁর বন্দেশ
আমার পায়ে ম্যাজিক আঠা, ওষ্ঠে সন্ধেবেলার তৃষ্ণা,
তবু উঠতে পারছি না
ওই নীল শার্ট পরা লোকটা মন্ত্রপড়া ধুলো ছিটিয়ে ধরে রেখেছে আমাকে
এক একবার তাকাচ্ছে বাঘের চোখে, যেন খুঁজছে হরিণ
রবীন্দ্র-সংগীতের মেঘ নয়, শোনা যাচ্ছে ভেতরে ও বাইরে বজ্রপাত
ওগো মল্লিকার্জুন, এবার থামো থামো, আমাকে যেতে দাও
অন্তরা থেকে সঞ্চারীতে অজস্র রঙিন সুতো
বিস্তার থেকে আরও বিস্তারে, কখন সমে ফিরে আসবে সেই রোমাঞ্চ
কে কাকে শোনাচ্ছে গান, কী তীব্রতম নিঃসঙ্গ গায়ক,
মাটির দিকে মুখ
রোগা রোগা হাতের আঙুলে তানপুরা, কক্ষটির ছাদ উড়ে গেল,
উন্মুক্ত হল দিগন্ত
মোটর দুর্ঘটনায় নিহত আমির খাঁ হাত চাপড়ি দিচ্ছেন দূরে দাঁড়িয়ে
দুই বোন হীরাবাঈ আর সরস্বতী রানে বাতাসে উড়ছেন পরীদের মতন
পটভূমিকায় সমস্ত গন্ধর্বলোক
আমি বসে আছি সমুদ্রের ধারে, সপ্তসুরের ঢেউ জলোচ্ছ্বাসের মতন
ঝাপটা মারছে শরীরে
নিচু হয়ে আসছে আকাশ...

এইবার বৃষ্টি নামবে!

দরজাটা বন্ধ হল

দরজাটা বন্ধ হল, তবু যেন বেশি শব্দ হল
কেউ এল? কেউ গেল? দরজা তাকে পছন্দ করেনি
প্যাঁচার পালক খসা রাত হল,
জোনাকিরা পিকনিকে মেতেছে

যেখানে দুপুর ছিল, সেখানে নিঝুম রাত ম্যাজিক দেখায়
কালো আঙরাখা সব ঢেকে আছে, কেউ উঁকি দেবে না এখন
আমি শার্ট খুলে গেঞ্জি...পা-জামায় গিঁট বাঁধতে গিয়ে

দু' এক মুহূর্ত থমকে থাকি
দরজাটা এপারে ওপারে
আমি বা আমার মতো, তার ইচ্ছে ভাবিনি কখনো
কে ওদিকে? একা রাত, এখন ঘুমের শব্দে
এত বাল্যকাল।

শক্তি

রাত বারোটা কি দেড়টায় কবিতার খাতা খুলতেই বাইরে
কে আমার নাম ধরে তিনবার ডাকল?
গলা চিনতে ভুল হবার কথা নয়, তবু একবার কেঁপে উঠি
এই তো তার আসবার সময়, বরাবরই তো সে রাত্রির রুটিনে
পদাঘাত করে এসেছে
দুনিয়ার সমস্ত পুলিশ তাকে কুর্নিশ করে, রিকশাওয়ালারা ঠুং ঠুং
শব্দে হুল্লোড় তোলে
গ্যারাজমুখী ফাঁকা দোতলা বাসের ড্রাইভার তার সঙ্গে
এক বোতল থেকে
চুমুক দেয়
উঠে গিয়ে বারান্দায় উঁকি মেরে বলি, শক্তি, চলে এসো,
দরজা খোলা আছে

খাকি প্যান্ট ও কালো জামা, মাথার চুল সাদা, মুঠোয়
সিগারেট ধরা
শক্তি একটু একটু দুলছে, জ্যোৎস্না ছিন্নভিন্ন করে হেসে
উঠল
ঠিক যেমন রূপনারান নদীর তীরে দুরন্ত ছোটাছুটির সময়
হেসেছিল
ঠিক যেমন হেসাডির বাংলোয় সর্বনাশ তুচ্ছ করে হেসেছিল
মুখ তুলে বলল, কবিতা লিখছিলে, সুনীল? না, লিখো না,
লিখো না, আমি লিখছি না, তুমিও লিখবে না।

এমন কিছু পান করিনি যে আমার দৃষ্টি বিভ্রম হবে,
হলোগ্রাম দেখব
কোথায় শক্তি? মাঝরাতের রাস্তা শুনশান, অতি নিঃসঙ্গতার
মতন মোহময়
শক্তি আর কখনও আসবে না, যখন তখন এসে রাম চাইবে না,
তা কি আমি জানি না?

আবার ফিরে আসি কবিতার খাতার কাছে, কলম তুলে নিই
আঙুলে
পরক্ষণেই সিগারেট ধরাতে গিয়ে দপ দপ করে আগুন, মুখের
মধ্যেও টের পাই আগুন
সমস্ত শব্দের মাত্রা ও ছন্দ হারিয়ে যায়, সাদা পৃষ্ঠা জ্বলজ্বল
করে
শক্তি নেই, কবেকার সেই দু'জনে মিলে লেখা লেখার খেলা
হঠাৎ শেষ হয়ে গেল
আমি চুপ করে বসে থাকি, রাত্রি ঝরে পড়ে, যেন উড়ছে
আমাদের লেখাগুলির ছিন্ন পাতা
আমি চুপ করে বসে থাকি, সাদা দেওয়াল, কানে তালা
লাগিয়ে দিচ্ছে স্তব্ধতার বাজনা
খাকি প্যান্ট ও কালো জামা, সাদা চুল, মুঠোয় সিগারেট ধরা
শক্তি একটু একটু দুলছে...

দু'-একবারই মাত্র

আজ আর ঘুম এল না, জেগে উঠে দেখলাম ঘুমকে
এ রকম হয়
মানস নদীর ধারে মাথায় চাঁদ জাগা সেই এক রাতে
আর কিছু দেখিনি, অন্ধকার রাত্রির শরীর দেখেছি
জীবনে দু'-একবারই মাত্র এ রকম দেখা হয় চকিতে
তেইশ বছর বয়সের সেই যে বুক ফাটা চোখ ভেজা
দুঃখ পাওয়া
যা নিয়ে লিখেছি কত না কবিতা
আজ তা বুঝতে পারি, অনেকটাই ছিল ভুল
মেয়েটি নয়, সেই প্রথম আমি দুঃখকে দেখেছি স্বচক্ষে
বরাইবুরুর কাছে একটি ঝর্নার ধারেকাছে কেউ ছিল না
ঝর্নাটি নিজেই সেখানে স্নান করছিল আপন মনে
যেমন একটা বই মাঝে মাঝে পাতা উল্টে নিজেকেই পড়ে
একটা থেমে থাকা গান নিজেকেই গানটা শোনায় কখনো
আগুন এক এক সময় মুগ্ধ হয়ে দেখে আগুনেরই রূপ
শুধু আজও তেমন করে দেখতে পেলাম না ভালোবাসাকে
সমস্ত শরীর ছাপিয়ে তার এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা!

জাদু বাস্তবতা

এ গ্রামটায় আগে আমি কখনো আসিনি
তবু মনে হয় যেন, স্বপ্নে আধো জ্যোৎস্নায় সব কিছু
আগে থেকে দেখা
জামরুল গাছের নীচে খাটিয়ায় বসা, হুঁকো হাতে
বৃদ্ধটি কে? আমার ঠাকুর্দা নয়!
দুটি নারী পুকুরের দিকে গেল জল সইতে, মুখে
সায়াহ্নের আলো মাখা
শান্তি আর বিন্তি পিসি দু'জনে যমজ বোন, ভুল করে
কত না হেসেছি

নৌকোর মাঝিকে দেখে ফৈজুদ্দিন বলে প্রায় ডেকে
উঠছিলুম আর কি!
রান্নাঘর থেকে পাছ-দুয়োরের দিকে যাচ্ছে মা
ওই তো চেতন স্যাকরা, মা-র শেষ দু'গাছা সোনার চুড়ি
বন্ধক নিয়েছে কাল রাতে
বাবা নিরুদ্দেশ, তাই ঠাকুর্দা মাঝে মাঝেই হাঁক পাড়েন
কে আসে? কে আসে?
খালধারে অতিকায় বট বৃক্ষটির গর্তে তক্ষকের বাসা
ঠিক সাতবার ডাকে, কোনোদিন সংখ্যাটা ভোলে না
পাট খেতে ফিসফিসানি, ঝুরো বৃষ্টি, দিঘিতে ডুবন্ত চাঁদ
সব একই ছবি
গোয়াল ঘরের পাশে মাঝরাতে বোবা কালা প্রেতটিও
খুব যেন চেনা...

আসলে আমার কোনো গ্রাম নেই, কখনো ছিল না
ঠাকুর্দা সবারই থাকে, আমার ছিলেন যিনি, তিনি চোখ
বুজেছেন আমি এই পৃথিবীতে
চোখ মেলবার ঢের আগে
বাবা কেন নিরুদ্দেশ হতে যাবেন, চিরকাল মুখে রক্ত তুলে
তিনি তো করে গেলেন শহরে মাস্টারি
ফৈজুদ্দিন নামে কোনো মাঝিকেই আমি সারাজীবনে দেখিনি
তক্ষকের ডাক? হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার শুনেছি বটে
রাজা-ভাত-খাওয়া ইস্টিশানে
তবু যেন এই গ্রাম, এই যে মাটিতে পা, জল-কাদা
এসব আমারই
সবই চেনা দৃশ্য, সব প্রিয় মুখগুলি
ধারালো সত্যের মতো ঝলসে ওঠে আসন্ন সন্ধ্যায়
সকলেরই নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে হয়, তবু গলা বুজে গেছে
চোখ কেন জ্বালা করে, আসে তো আসুক
এ মাটিতে মিশে থাক, অকারণ, অনধিকারীর মতো
আমার দু'-এক ফোঁটা অশ্রু, লোকে
বলে তো বলুক, সেটা
নিছক ন্যাকামি!

তোমার সঙ্গে দেখা হলে

তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি মানুষকে ভালোবাসো না, অথচ দেশকে ভালোবাসো কেন?
দেশ তোমাকে কী দেবে?
দেশ কি ঈশ্বরের মতন কিছু?
তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
গুলি বিনিময়ে তুমি প্রাণ দিলে দেশ কোথায় থাকবে?
দেশ কি জন্মস্থানের মাটি, না কাঁটাতারের সীমানা?
বাস থেকে নামিয়ে যাদের তুমি হত্যা করলে
তাদের বুঝি দেশ নেই?

তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
তুমি কী করে জানলে, আমি তোমার শত্রু?
কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তুমি আমার দিকে
রাইফেল তুলবে?
এমন ভালোবাসাহীন দেশপ্রেমিক হয়!

সরস্বতীর বীণা ঝংকারে

সকালবেলার দিকবধূটির বরতনু ভরা
ফুলের গয়না
ভেজা চুল, যেন স্বর্গ নদীতে স্নান সেরে উঠে
এসেছে সদ্য
ওকে নিয়ে আজ একটা চম্পুকাব্য লিখলে
মন্দ হয় না
বেলা বাড়ে যেই হিংসার মতো লকলকে রোদ
গদ্য গদ্য!

বেলা বাড়ে, শুধু দিন নয়, যেন সোনার বদলে
শস্তা গিলটি

দিগঙ্গনারা তাই নেড়ে চেড়ে দেখে আর বুক
ফোলায় গর্বে
রূপ আর কূপ এই নিয়ে বাঁচা? মনে মনে ভাবে
কেমন মিলটি
মিল নেই কিছু, বিন্দু বিন্দু আয়ু চলে যায়
কালের গর্ভে!

আমার আয়ুর আমিই বিনাশী, রাতে ঝরে পড়ে
লঘু মুহূর্ত
অন্ধ গলিতে শুধু হুড়োহুড়ি, ঠোঁটে সিগারেট
গেলাসে মদ্য
কবিতার খাতা ইঁদুরে কাটছে, দেখাও যায় না
এমনই ধূর্ত
সরস্বতীর বীণা ঝংকারে গানের বদলে
এখন গদ্য!

সেই দিনটি

গান্ধীজি বললেন, পানি পিলা দেও

স্কুল বালক আমরা খাকি হাফ প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে
সারবদ্ধ হয়ে গেছি বেলেঘাটা
শহরের এখানে ওখানে পোড়া ক্ষত, বাজার লুট, জানলা ভাঙা বাড়ি
রাস্তা থেকে লাশগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, দুর্গন্ধ যায়নি
এখনো কান পাতলে বাতাসে শোনা যায় কাপুরুষ খুনিদের চিৎকার
এরই মধ্যে এই গোরুর গাড়ির দেশে বিমানে চেপে হুড়মুড়িয়ে চলে এসেছে স্বাধীনতা

বেলেঘাটায় মুসলমান বসতির পাশে এক বাড়ির উঠোনে
খাটিয়া পেতে শুয়ে আছেন গান্ধীজি
তাঁর চোখের নীচে শুকনো অশ্রুর রেখা
দূরে ব্যান্ড বাজছে, পতপত করে উড়ছে অসংখ্য তেরঙ্গা ঝাণ্ডা
রঙিন কাগজের শিকলি ঝুলছে অনেক বারান্দায়

যারা দেশকে মা বলে ডেকেছিল, তারা দেখছে সেই মাকে
কুচিয়ে কুচিয়ে কাটছে র‍্যাডক্লিফের ছুরি
ফিন্‌কি দিয়ে উঠছে রক্ত, সেই রক্ত গায়ে মেখে কত মানুষ
মেতে উঠেছে স্বাধীনতার উৎসবে
ভাড়াবাড়ির স্যাঁতসেঁতে একতলার ঘরে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন বাবা
প্রায় অন্ধ ঠাকুমা কিছুই বুঝছেন না, ব্যাকুল ভাবে একে ওকে
জিজ্ঞেস করছেন, কী হল, অ্যাঁ? আমরা আর
বাড়িতে ফিরতে পারব না? আম গাছগুলো, আমার
নিজের পোঁতা তুলসী গাছ,...পুকুর ঘাটে কে
বসে আছে?

গান্ধীজি ভাঙা ভাঙা গলায় মুসলমান ছেলেদের বললেন, হিন্দু ভাই লোগোঁকো
পানি পিলা দেও
আমরা ছুটে গিয়ে তাদের হাতের গেলাস থেকে জল খেলাম, কী অপূর্ব স্বাদ,
যেন অমৃত, কত হর্ষময় কোলাকুলি হল
তবু ভাগ হয়ে গেল নদীগুলো, শূন্যে তারকাঁটা, এক পাশে পানি
আর এক পাশে জল!

এবার বসন্তে

এবার বসন্তে কিছু ফুল ছেঁড়া হল
কোকিলও ডেকেছে খুব বাঁশের খাঁচায়
এবার বসন্ত লাস্যে কিছু দিক ভুল
অন্ধকারে সমুত্থিত তৃতীয় বিষাদ।

এবার বসন্তে গান শুরু হল ঠিকই
মাঝপথে কারা যেন দুন্দুভি বাজাল
কোথাও পাথর ফেটে বেরিয়েছে জল
অনেকেই ছুটে গেল, একজন গেল না।

এবার বাতাসে ছিল কিছুটা অমিয়
একাকী আঘ্রাণ নিলে স্পষ্ট বোঝা যায়

উৎসবের রাতগুলি কে কোথায় একা
হাতে হাত ধরাধরি, সবাই অচেনা।

এবার বসন্তে ঠিক মধ্য যামিনীতে
এল এক ডাকপিওন, অন্ধ, জিভকাটা
সে বড় মজার খেলা, কত হুড়োহুড়ি
সকলেরই চিঠি আছে। কারো নাম নেই।

পিকনিকের আগে

কে যে কার সঙ্গে যাবে, তিনখানা গাড়ি
আমরা এগারোজন, ফাল্গুনের লোধ্ররেণু মাখা সেই ভোর
লাল গাড়ি, কচি কলাপাতা শাড়ি, মানায় না মানায় না মোটে
কেউ কেউ হেসে ওঠে, আকাশে জবাকুসুম, ভিন্‌দেশি মেয়ে
স্টিয়ারিং ছুঁয়ে আছে, সিগারেট নেই তবু মুখে তার ধোঁয়া
যার যার গোঁফ আছে কালো গাড়িটিতে তারা উঠতে পারবে না
একটি শালিক দেখে হরিণী-নয়না আরও খোঁজে ইতি উতি
মন্দিরের সামনে গিয়ে চটি খোলে দুর্দান্ত পঁচিশ
এই মাত্র বয়ে গেল নদীর মতন এক হিমেল বাতাস
সঙ্গে কিছু নিয়ে গেল, কয়েকটা কথার টুকরো, গোপন ঝিলিক
পায়ে পায়ে অস্থিরতা, তিনজোড়া স্তনবৃন্ত অতীব উন্মুখ
বিয়ার বোতলগুলি খোলা হবে, ভুলে গেলে বটল ওপনার?
উরুতে চাপড় মারে দুর্যোধন, সেই আজ দ্রৌপদীকে পাবে?
তবে আর দেরি কেন, এখানেই খেলা শুরু হোক।

জয়দ্রথ ও দ্রৌপদী

অতঃপর জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে জোর করে রথে তুলে নিয়ে
বনপথে দ্রুত ধাবমান
ক্রোধ ও বিস্ময় ভরে হীরকাক্ষী দ্রুপদতনয়া
দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, হে নৃপকুমার,
উচ্চবংশে জন্ম তবু এ কী নীচ আচরণ তব?
আমার স্বামীরা কেউ আশ্রমে এখন নেই, তবুও তোমাকে
আতিথ্য দিয়েছি আমি, প্রাতরাশ প্রস্তুত করেছি
মৃগ ও শরভ, শশ, বরাহ, মহিষ মাংস দিয়ে
কিছুই ছুঁলে না, তুমি আমাকে ছুঁয়েছ পাপ মনে
জানো না কি শাস্তি এর? চেনো না আমার স্বামীদের?
কুক্কুর বোঝে না বুঝি সিংহের বিক্রম!

বৃষ্টিভেজা কদম্বের মতন আপ্লুত স্বরে বলল সিন্ধুরাজ
তোমার স্বামীরা আজ রাজ্যচ্যুত, দীন ও শ্রীহীন
কী হবে তাদের কথা মনে রেখে, আমাকে ভজনা করো তুমি
তোমাকে, হে বরারোহা, দর্শন মাত্রই আমি তড়িৎ আহত!
এতকাল সুন্দরের যত বিভা গোচর করেছি
তোমার রূপের কাছে সব যেন তুচ্ছ হয়ে গেল
লাবণ্য যৌবনবতী নারীদেরও কম তো দেখিনি
তোমার তুলনা দিলে তাদের বানরী মনে হয়!
তোমার গোড়ালি উচ্চ নয়, ঊরুদ্বয় পরস্পর
স্পর্শ করে আছে
স্তন দুটি নিতম্বের প্রতিবিম্ব, নাসিকা উন্নত
নিম্ননাভি স্বভাবেরই মতন গভীর
পদতল রক্তবর্ণ, যেমন ওষ্ঠ ও করতল
কাশ্মীরী তুরগীসম সুদর্শনা, হে সুকেশী, শ্যামা
অধরে অমৃতমাখা, পীন পয়োধর যেন অয়স্কান্ত মনি
দু' চক্ষু ভরেও দেখা শেষ হয় না এ শরীরী রূপ
শরীর শরীর চায়, বক্ষে বক্ষ টানে
এ রমণীরত্ন দেখে উন্মত্ত হওয়া কি অপরাধ?
পাপ নেই, পুণ্য নেই, আজ আমি সকলই ভুলেছি
কাম জীবনেরই ধর্ম, কামানল প্রকৃতি জানায়
কামার্ত পুরুষ আর নারীর মিলন, সেও প্রকৃতির খেলা

সকল সুখের শ্রেষ্ঠ রমণ-সম্ভোগ, কেন সময় হরণ?
হে অগ্নিশিখারূপিনী, আমার অগ্নিকে দীপ্ত করো!

এই কথা শুনে কৃষ্ণা ঘৃণা ভরে দূরে সরে গিয়ে
বললেন, ওরে মূঢ়, তোর ওই স্তুতিবাক্যগুলি
শুধুই কদর্য নয়, যেন কোনও রোগীর বিকার
সবলে নারীকে যারা পেতে চায়, তারা কি পুরুষ, নাকি পশু?
কাম শরীরের নয়, মনোবাঞ্ছা, এবং সে মন দু' জনের
দুটি মন যদি মেলে, তখনই শরীর জেগে ওঠে
নারীর বাসনা, সাধ যে জানে না, জানাই যে মিলনের সার কথা
তাও যে জানে না
সারাটা জীবন তার মরুভূমি, ব্যর্থ বাঁচা, সে পুরুষ নয়
পেশি শক্তি দিয়ে যারা নারীর শরীর চায়, তারা সম্ভোগের সুখ
জীবনে জানবে না
ওরে দুরাচার, শোন, অমৃত পাবি না তুই,
দগ্ধ হবি নিজের আগুনে!

অন্য কবি

আহা সে পায়নি কিছু, না প্রেম, না প্রতিষ্ঠার সুখ
বহুকাল আগে এক মৃত কবি, দগ্ধ আয়ু, অপর ভাষার
সরু নদীটির পাশে সে এক নারীর দুই বিস্তীর্ণ উরুতে
রাখা খাতা,
না-লেখা অক্ষরে এসে শুতে চায়...

না, এটা কবিতায় কোনো ভূতের গল্প নয়। দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই আমি, অকস্মাৎ। ফার্নান্দো পেসোয়া, পর্তুগিজ, ক'জনই বা চেনে এ দেশে! আমিও পড়েছি যৎসামান্য। ক্ষীণকায়, দুর্যোগতাড়িত, হাহাকারময় এক কবিতা-সর্বস্ব জীবন। এ কালের ঐ নারীটিকেও তেমন চিনি না, কখনো সে নিজে কিছু লেখে, কখনো প্রিয় কবিতা বুকে তুলে নেয়, কখনো সে শব্দ-পংক্তির নেশায় কাঁদে। দুই দেশ, মধ্যে কত নদী পর্বত-অরণ্য, সেসব পার হয়ে সেই অভিমান-হত কবিটি ছায়া মূর্তি হয়ে এই রমণীটির কোলের খাতার মধ্যে শুয়ে, নিতে চায় আদর।

আমি তাকে দিতে চাই আয়ু, সে জীবন্ত হোক,
আনুক উত্তাপ
দু' জনের আঙুলে আঙুল...

সত্যিই দিতে চাই? নাকি ভাবের ঘরে চুরি? মাঝে মাঝে নিজের ব্যর্থতাবোধ এত তীব্র, যেন একটা অলঙ্ঘনীয় পাহাড় এসে দাঁড়ায় সামনে, কবিতা মুচড়ে দিচ্ছে বুক, তবু খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক শব্দ, অসহ্য ছটফটানি, তখন মনে হয়, আমার বদলে লিখুক না অন্য কেউ...

অথবা উঠুক জেগে সপ্তর্ষি ও পাতাল-যামিনী
এক সঙ্গে, বাতাসের বিভাজন, রণরঙ্গ, শব্দ শব্দ খেলা
হে কবি, হে কবিতা-মথিত নারী, আরও গাঢ়
দৃশ্যমান হও
দু' জনের আঙুলে আঙুল
আমাকে বাঁচাও, আমি ব্যর্থতার গ্লানি ধুতে তোমাদের কবিতায়
ডুব দিতে চাই!

কে লিখবে?

—পৃথিবীতে অলৌকিক কি আর কিছু নেই?
—আছে, আছে, সে সব কথা পরে হবে, তবে খিদে জিনিসটা
একেবারেই লৌকিক
যেমন আকাশ ভরা এত দুর্বোধ্যতা
কিন্তু একমাত্র ক্ষুধার্ত মানুষই একটুও দুর্বোধ্য নয়
—এ কী অদ্ভুত কথা, মানুষ দুর্বোধ্য নয়?
—মানুষ বলিনি, বলেছি ক্ষুধার্ত মানুষ!
—ক্ষুধার্ত মানুষের সব কিছু বোঝা যায়? শুধু
খিদেটাই তার মনুষ্যত্ব, আর কিছু না?
—খিদের সময় যে আর সবকিছুই অবান্তর হয়ে যায়, সে
ফুলের দিকে তাকায় না, সে গান শোনে না
—তুমি কী করে জানলে?
—এই পোড়া দেশ, তাকালেই দেখা যায় চারদিকে।

নিরন্ন, অপমানিত মানবতা, খিদের জ্বালায়
যখন শিশুরা কাঁদে...
—তোমার সন্তান কখনো না খেয়ে থেকেছে সারাদিন?
তুমি কি দিনের পর দিন পেট পুড়িয়ে
থেকেছ? তুমি দিনের পর দিন আকাশের দিকে
না তাকিয়ে খুঁজেছ খুদ-কুঁড়ো? জানো কি
তার কান্নার মধ্যে স্বপ্ন থাকে কি না?
তুমি কী ভাবে সাতকাহন করে লেখো তার দুঃখের কথা?
—সে যে নিজে কখনো লেখে না! সে কলম চেনে না, সে
খিদের জ্বালায় কাগজ খেয়ে ফেলে
তা হলে কি কেউ লিখবে না তার কথা?
—লেখার আগে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও!
—ঐ ক্ষমার ব্যাপারটাই অলৌকিক, তখন চোখ ঝাপসা হয়ে যায়!

ভোরবেলার উপহার

ভোরবেলার জানলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে
ঘুম ভাঙিয়ে কাছে ডাকে হাতছানি দিয়ে
তখন অন্ধকারে আলপনা আঁকছে সদ্য-ভূমিষ্ঠ এক বালিকার
আঙুল
আলপনার মধ্যে একটা চিরহরিৎ গাছ
তার প্রত্যেকটি পাতায় এক এক বিন্দু শিশির
একটা বিন্দু এই মাত্র খসে পড়তে পড়তে বলল, এসো
জানলা বলল, এই নাও, তোমার নতুন জন্মের উপহার
কাল রাত্তিরে আমি নরকে ডুবেছিলাম, আবার স্বর্গদর্শন হল।

এত ঋণ, এত ঋণ

ভোরের বাতাস কিছু চায়
হিরণ্য আঁচলখানি দিগন্তে ছড়িয়ে কিছু চায়
কী দেব তোমাকে?
টগর, মল্লিকা, জুঁই, বৃষ্টিতে গা ধুয়ে
চুল বাঁধে, টিপ পরে, আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই
কলস্বরে বলে ওঠে, শুধু নেবে, কিছু কি দেবে না?
দিতে হবে, কী দেব ওদের?

মাটিতে পায়ের ছাপ, কোনোদিন ক্ষমা চেয়েছি কি?
সকলেই স্বার্থপর দৈত্য, শুধু নিয়ে যাচ্ছি,
অনর্গল ভোগী
চুষে, ছিঁড়ে কামড়ে খেতে দ্বিধা নেই, দিই না কিছুই
দেশ দেশ বলে এত কান্না, এত গলা ফাটাফাটি
এত কবিতা ও গান
সব ভান! জননী না ছাই! তলপেট ছিন্নভিন্ন করে
দিতে দ্বিধা নেই

ভোরের বাতাস কিছু চায়
নদীটির কুলুকুলু ধ্বনি কিছু চায়
ঘুম ভাঙা আকাশের বিমূর্ত কিরণ কিছু চায়
ভাঙা বাড়িটার পাশে নিঃসঙ্গ নয়নতারা, সেও কিছু চায়
চারিদিকে সুন্দরের অজস্র আসন পাতা, কাদা মাখা পায়ে
আমরা দৌড়োচ্ছি সব লণ্ডভণ্ড করে
এত ঋণ, এত ঋণ, চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই।

ভালোবাসার ভিখিরিগুলো

ভালোবাসার ভিখিরিগুলো কবিতা লেখে নিরালায়
যেমন অন্ধ ছড় টেনে যায় ভাঙা মাটির বেহালায়
দুনিয়া-জোড়া রক্তচোখ, দুনিয়া-জোড়া খাই-খাই
দুনিয়া-জোড়া ছুরি ও কাঁচি, দুনিয়া-জোড়া ভাই-ভাই
যে-পাখি ছিল বসন্তের এখন তার পাখনায়
লাগে না আর মলয়ানিল, বিষের ধোঁয়া পাক খায়
যেখানে ছিল ছেলেবেলার মালতী, যূথী, রঙ্গন
সেখানে বেড়া কাঁটাতারের, যুযুধানের অঙ্গন
ভালোবাসার কথা কে বলে? যে শোনে তার হাসি পায়
যেন নোংরা রুমাল একটা পথের পাশে ফেলে যায়
নারীর পাশে পুরুষটি কে? কত কথার ফুলঝুরি
প্রেমবিহীন প্রেমের দৃশ্য, যে যার করে মন চুরি
কিংবা মন, কেন-বা মন, মনেরই বা কী দরকার
শরীর ঘিরে গণতন্ত্র, শরীরবাদী সরকার!

কবির দল ভিখিরি আর কাঙাল, ওরা দিনরাত
ভালোবাসার জন্য শুধু বাড়িয়ে রাখে দুই হাত
ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি, বৃষ্টি ভেজে অকারণ
যার কৃপা চায় ঠোঁট বেঁকিয়ে সে বলে যায়, আ মরণ!
পাবে না কিছু জেনেও বুক উজাড় করে চায় দিতে
নেবেই বা কে, সব শুনশান, কেউ নেই তার চার ভিতে
তবু এমনই জেদির দল, এমনই ওদের ভুল আশা
ধ্বংস হয় হোক পৃথিবী, বাঁচিয়ে রাখবে ভালোবাসা!

বাবা

বাবা বললেন,
অন্ধকারে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাক আমার জন্য
মাটির তলার একটা সুড়ঙ্গে নেমে গেলেন
খুব আস্তে আস্তে

আকাশে প্রান্ত নির্ণয় ভুল করে ছুটে গেল একটা উল্কা
বন্দরে একটাও জাহাজ নেই, রাস্তাগুলো দুলে ওঠে
কী যে হল
বুঝতে বুঝতেই কেটে গেল আরও উনিশটা বছর
এর মধ্যে কত হুড়োহুড়ি, কত মধুলোভীদের সঙ্গে ঘুরপাক
বাবা, বাবা!
বোতাম বোতাম মাশরুম খুব ইচ্ছে করে
বাবাকে খাওয়াতে
আর রুমালি রুটি
অন্তত একবার কাস্পিয়ান হ্রদের মাছের ডিম
ইচ্ছে করে একটা বারান্দাওয়ালা ঘর উপহার দিতে
বাবার থেকে এখন আমি বয়েসে অনেক বড়
আমার একুশটা হাত
তিনটে চোখ
প্রতিদিন সাতশো দরজা পেরিয়ে যাই
শ্যামপুকুর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আমার অল্পবয়েসি বাবা
বলে উঠি, সাবধানে যাও, গাড়ি চাপা পড়বে যে
ফুটপাথে ওঠো
পাঞ্জাবিতে বগলের নীচে ফুটো, আমার পাঞ্জাবি
লাগবে না বাবার গায়
একটাও দশতলা বাড়ি দেখেননি, আমি সেখানে থাকি
জেনে গেলেন না বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশ হয়েছে
তাঁর জন্মস্থান ঘিরে...
আমার ছেলে ঠাকুমার পাশে শুয়ে গল্প শোনে
ঘুম পাড়ানি গল্প
ঐ সব গল্প কিছুদিনের মধ্যেই শরীরে আঁট হয়ে যায়
নতুন নতুন গল্প বানাতে ছেলের দল হৈ হৈ করে ছুটছে
বিমানে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে
আমি
যতদিন বাবার ছেলে ছিলাম
তার চেয়ে বেশিদিন নিজেই বাবা
আমার বুকের সব রোম পাকা, সকালবেলা কাশতে কাশতে
লক্ষ করি, রক্ত পড়ছে কিনা
বাবা ছবি হয়ে থেমে আছেন

নিজের থেকে কমবয়েসি কারুকে কি বাবা বলে ডাকা যায়?
তবু দেখতে পাই মাঝে মাঝে
আমিই চেয়ে থাকি স্নেহের দৃষ্টিতে
তাঁর ঘামে ভেজা মুখ, পরিক্রমা ক্লান্ত পা
কিছু দিতে ইচ্ছে হয়, যা যা পাননি
আমার ছেলের কাছ থেকে কিছু নেবার আগের মুহূর্তে
একবার আমার হাত কাঁপে!

সবই আছে

শ্মশানে একটাও চিতা জ্বলছে না
গ্রামটির স্বাস্থ্য ভালো আছে
গ্রামটির গণ্ডি অনেকটাই রুপো দিয়ে বাঁধানো
তিন দিকে ঘুরে গেছে নদী
কালবৈশাখীতে বটগাছটায় যে ডাল উড়ে গিয়েছিল
সেখানে গজিয়েছে নতুন চকচকে পাতা

চেতন মিস্তিরির খড়ের চালে তৃপ্ত ইষ্টকুটুম পাখিটি
গৃহস্থের খোকা হোক বলে ডাকল দু'বার
এ বাড়িতে কেউ নেই, হাওয়া আছে
বর্ষায় ঝলমল কুন্দকলির মতন স্বপ্ন আছে
মাটির মোহময় গন্ধের মতো প্রেম আছে
একটি জন্মান্ধ গিরিগিটির মতন বাসনার ছটফটানি আছে

ভাঙা শিবমন্দিরটার গায়ে চেতন মিস্তিরির আঙুল
চৌধুরীদের সিংহ দরজায় চেতন মিস্তিরির চোখ
রাস্তার এদিকে ওদিকে চেতন মিস্তিরির নিশ্বাস
গরম বাতাস ডাকছে—চেতন মিস্তিরি, চেতন মিস্তিরি
আকাশ থেকে লকলক করে নেমে এল বিদ্যুৎ
একটা শূন্য বাড়ি, কিন্তু সবই আছে!

জন্মস্থান

জুতো খুলব কি খুলব না, এই দ্বিধায় গাড়ি থেকে
নেমে পড়লুম জলকাদার রাস্তায়
কৈশোর-ভাঙা বয়েসের কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে চতুর্দিকে
দু'পাশে ধান ক্ষেত, তার বাতাসের হিল্লোল নিয়ে কবিত্ব প্রথাসিদ্ধ
কুঁড়ো জাল নিয়ে যে লোকটি মাছ ধরছে আপনমনে
সে আমার মগ্ন চৈতন্যের কেউ নয়
প্রকৃতি পাঠ থেকে সরে গিয়ে চোখ অনেক ঘষামাজা হয়ে গেছে
কালভার্টের পাশে উবু হয়ে বসে আছে একটা নির্লজ্জ লোক
এ দৃশ্য কি দেখার মতন?
হাতঘড়িতে শহরের পিছুটান, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেলেও
এখানকার এক বিন্দু জল খাওয়া চলবে না
একটু দূরে দুটি তালগাছ নন্দলাল বসুর ছবি, আর
বড় জোর মিনিট পাঁচেকের পথ
আমার সঙ্গীটি বলল, যারা নার্সিংহোমে জন্মায়
তারা কি সেখানে বারবার ফিরে যায়?

এবার বুক ঠেলে হাসি উঠে এল, এর মধ্যে বাস্তবতার
নামগন্ধ নেই
কাদায় যার পা ডুবে যাচ্ছে, সে অলীক, সে বেদান্তের ভ্রান্ত দর্শন
একটু আবেগ না দেখালে চলে? মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করব নাকি?
এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজব বাতাবি লেবুর গাছটি?
মাজা-ভাঙা অচেনা বৃদ্ধাটিকে ডেকে উঠব, প্রভা পিসিমা?
এ সব করলেও চলে নকল হাবভাবে, কেননা
আসল মানুষটি নেই এখানে
এখানে থাকলে সে নিজের কাছে কোনোদিনই মানুষ হত না!

উত্তরকালের জন্য

ঠাকুর্দা আমাকে বসুমতী সংস্করণ উপনিষদ
উপহার দিয়েছিলেন
ভালো করে পড়িনি, কবেই সে বই ভেসে গেছে বন্যায়
বাবা দিয়েছিলেন নেসফিল্ডের গ্রামার
আর টেনিসনের কাব্য
সে সবের পাতা ছিঁড়ে চানাচুরওয়ালারা ঠোঙা বানিয়েছে
চানাচুর বিষয়েই আমি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি বলা যায়
জানি, নুন কেমন করে ধরে রাখে আর্দ্রতা, তেলে কতটুকু
ভেজাল
বিয়েবাড়িতে কেন পাঞ্জাবি পরতে হয়
চাকরির ইন্টারভিউতে কেন কোট টাই...

কৈশোরের দু'গালে থাপ্পড় মেরেছে দুই বিপরীত সভ্যতা
তাই রক্তাভ মুখ নিয়ে আমি গেছি পড়ন্ত বেলার মিছিলে
নগরের আকাশ রেখার অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে
কতবার
পাশের মানুষটির সঙ্গে পা-মেলানো কম শক্ত নয়
পায়ে পায়ে অনেক জটিলতা
অথচ একলা সরে দাঁড়ালেই সবাই ছি ছি করে
দেশপ্রেমের গান গাইতে গাইতে দেখেছি
চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে দেশ
আন্তর্জাতিক হয়ে গলা জড়াজড়ি করতে গেছি যার সঙ্গে
সে তুলে দিয়েছে সীমান্তের কাঁটাতার
তবু যেখানে নদীর পাড় ভাঙছে, সেখানে গিয়ে বসে থেকেছি
চাবুকের মতন ঝলসে উঠেছে বিদ্যুৎ, ফণা তুলেছে জলস্রোত
আবার ভোরের স্বর্ণাভ আলোয় সব শান্ত, মানুষের জন্য
মন কেমন করে
ফেরার পথ খুঁজে পাই না, চেনাশুনো কারুকে দেখিনা
বিংশ শতাব্দীর শেষ বেলায় গোটা পৃথিবীটাই পথভ্রান্ত?
উত্তরকালের জন্য রেখে যাব দু' চার ফোঁটা চোখের জল...

ওসব কথার কথা, কবিতা ছাড়া আর কোথাও
কান্না নেই!

স্নানের পরে

তারপর সে বলল, চলো এবার নদীকে সারা গায়ে মাখি
নদীর সব জায়গায় কুয়াশা, শুধু মাঝখানে
একটি ছোট্ট বৃত্ত দু'জনের জন্য
এই কুয়াশা কি যোজনগন্ধার?
নিজেকে যোগভ্রষ্ট, কামমোহিত সন্ন্যাসী ভাবতে মন্দ লাগে না
সে রমণীও যেন শুধু আমারই জন্য রেখেছে খেয়ার নৌকো
নীল জলে এসো একটু ডুবি, আরও একটু, আরও গভীরে
সে ডুবছে, আমি তুলছি
আমি ডুবছি, সে হয়ে যাচ্ছে মৎসকন্যা
জল-প্রাণীদের মতন পোশাক না-পরা দু'খানি শরীর
ধুয়ে যাচ্ছে মিলন গন্ধ, ধুয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের ময়লা

ভুস করে একবার মাথা তুলে দেখি, সে অন্য মানবী
তার কানের লতির কাছে অজস্র হিরে কুচি, বুকে স্থলপদ্ম
তার চোখের পল্লবে সূক্ষ্ম জলকণার পবিত্রতা
সে চলে যাচ্ছে শিল্পময়তার দিকে, ত্বকে ও বর্ণে
বতিচেল্লির তুলি
দু'জনের মাঝখানে রচিত হচ্ছে সুদূর
আলিঙ্গনের মাঝখানে চলে আসছে বিশ্বপ্রকৃতি
আমাকেও যেন টান মারছে চির সন্ন্যাস

তখন নিজেকেও যেন মনে হয়, শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি
দূর ছাই, এই শুদ্ধতা নিয়ে আমি এখন কী যে করি!
এর চেয়ে দু'জনের পিঠের বিনবিনে ঘাম আর
ভাঁটফুলের ঘ্রাণ মাখা দিন ও রাত্রি
কত ভালো ছিল!

সময় মিলিয়ে গেল

কোথা থেকে কখন কোথায় চলে যাই, মনেও থাকে না
এই জায়গাটার কী নাম? ওঃ হো, এর্নাকুলাম, কেন এখানে এসেছি?
সারাদিন কত হৈ হট্টগোল, ঘোরাঘুরি, পুরোনো গির্জায়
ভাস্কো ডা গামার কবর
সন্ধেবেলা কয়েকজন জোর করে নিয়ে গেল এক নাচের অনুষ্ঠানে
আমি নাচ কী বুঝি? শুধুই বাধ্যতামূলক বসে থাকা
অদূরে অস্থায়ী মঞ্চ, আমরা খোলা আকাশের নীচে, শীত শীত ভাব
একটা পুরনো প্রাসাদ, তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, এখনো নাম জানি না
এক বন্ধু বলল, দূর দূর, এসব দক্ষিণি নাচ কতক্ষণ দেখবে
পাঁচ মিনিটে আধ ইঞ্চি নড়ে না
সত্যিই তাই, জবরজং পোশাক ও মুখোশ, বড় বেশি চড়া রং
নর্তকরা আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে
উসখুস করছি, সিগারেট ধরানো যাচ্ছে না, গলায় সন্ধেবেলার তৃষ্ণা
হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল, কোথায়? আকাশে তো নয়,
বুকের মধ্যে নাকি?
না, না, তা হয় না, ওসব কথার কথা
ঈষৎ ধোঁয়াশার পোঁচ লাগানো তারা ভর্তি তকতকে আকাশ
কেউ যেন আমায় দেখছে, কেউ যেন তরঙ্গ পাঠাচ্ছে আমার দিকে
আমি ভাবছি, নাচ কখন শেষ হবে, আর নাচ ভাবছে,
কখন আমি উঠব
আমি ভাবছি, মুখোশের আড়ালে ঐ মানুষগুলোর সঙ্গে
কথা বলা যায়?
নাচ ভাবছে, আমায় অস্থিরতা আঁকা একটা মুখোশ পরিয়ে দেবে
আমি ভাবছি, ঐ যে পায়ের পাতার মৃদু কম্পন, ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি,
বিলম্বিত লয়, এর কোনো অর্থ আছে?
নাচ ভাবছে, এই মানুষটির বিমানের টিকিট, হোটেলের ঘর
ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখা। এর কি অর্থ আছে কিছু
আমি নাচকে দেখছি, নাচ আমায় দেখছে, এবার দু'জনের
হাত ধরাধরি হল, সময় মিলিয়ে গেল
এক ফুঁয়ে!

কাল রাতের বেলায়

'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে...'
তখন আপনি ছিলেন আমার সঙ্গে
সবগুলি গুনগুন সংগীতের স্রষ্টা
পূজা থেকে বিরহ, প্রকৃতি থেকে আরও দুঃখ ভরা গান
এ দুঃখ আমার নয়, যিনি লিখেছেন, তিনিও কি এত দুঃখী?
কিংবা প্রত্যেক কবির মতন তিনিও বৈপরীত্যের বরপুত্র? সব প্রশ্নের
উত্তর ঘুলিয়ে দেবার সম্রাট?

জীবন চরিতে তাঁকে সত্যিই খোঁজা যায় না
কাল রাতের বেলায় এত গান, সর্বাঙ্গ জড়ানো গান
সেই সব সুরের মীড় ছবির রঙের মতন গড়িয়ে যায়, আয়তনে মেশে
যেন মাতিস্-এর আঁকা গান, ঝর্নায় অনেকক্ষণ ধারাস্নান
চোখ জড়িয়ে আসে
তারপর একঝলক স্বপ্ন দেখি আলখাল্লা পরিহিত তাঁকে
এ মূর্তি প্রভাত মুখুজ্যের গড়া নয়, বইয়ের র‍্যাকের পাশে ঠেস দিয়ে
থুতনিতে আঙুল, বড় ব্যাকুল ও কৌতূহলী, খুবই মহান ও সামান্য
আমার কোনো প্রশ্ন আসে না
কান্নায় আমার গলা বুজে যায়, আমি ফুঁপিয়ে উঠি
একটু পরেই দেখি ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর
বাইরে প্যাঁচার ডাক শিহরিত রাত, থমথমে পৃথিবী
কুয়াশার মতন ছড়িয়ে পড়ে আমার বিস্ময়
রবীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ আমার কান্না এলো কেন
আমারও কান্না জমে ছিল?
আঃ বেঁচে থাকা এত আনন্দের!

লিখে যেতে হবে

লিখে যেতে হবে এই কথাগুলি পাথরে খোদাই
শাশ্বত অক্ষরে লেখা থাক
যখন গোধূলি ধোঁয়াশা লিপ্ত, কেউ কেউ ছিঁড়ে খায় ইতিহাস
কেউ কেউ হাত মিলিয়েছে চোর-খুনির সঙ্গে

তখনো নিভৃতে অকলুষ হাতে ওরা লিখে গেছে
ছেঁড়া চটি আর শূন্য পকেট, কিছুই চায়নি
ওরা লিখে গেছে কবিতা শুধুই কবিতা এবং
রাত ভোর করা শব্দ মন্ত্র
ঐ যে মেয়েটি, কী নাম তোমার? কে তোমায় এই
মাথার দিব্যি, দায় দিয়েছিল, যখন বাতাসের ক্রোধ ও হিংসা
আলু-পেঁয়াজের দর ওঠা নামা, সব খবরের কাগজে শুধুই
আস্তাকুঁড়ের ছবি ও গন্ধ
তবু তুমি প্রতি কবিপক্ষেই বার করে যাবে যোগব্রতর
কবিতাপত্র, সে নিজে কবেই মেঘ হয়ে গেছে
তুমি ভালোবেসে প্রেমে ও ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে
কী তীব্র জেদ
লিখে যেতে হবে এই দেশে তুমি, তুমিও রয়েছো!

লিখে যেতে হবে, নতুন শতকে, কিংবা ত্রিংশ শতাব্দী পরে
কে কোথায় আছো, শুনছো তোমরা?
মহাফেজখানা যে দলিল রাখে কাগজে কালিতে ভুল বোঝাবুঝি
খল খল হাসে মুণ্ড শিকারি, বাক্ বিভূতিতে মিথ্যের নানা
প্রলেপের মতো রং ফুলঝুরি
কুম্ভীপাকের নরকে চলেছে সিংহাসনের আজব লড়াই
আগুন জ্বলেছে দাউ দাউ আর দশ দিক জুড়ে
দাও দাও ধ্বনি
তবু কিছু কিছু সদ্য তরুণ এবং তরুণী
কিছুই পায়নি, ওষ্ঠ উল্টে কিচ্ছু চায় না
রাত জাগা চোখে কলম কামড়ে কোন উপাসনা
নিয়ে মেতে আছে
যমদূত আর দেবদূতরাও দু' পাশে দাঁড়িয়ে
ওরা হতবাক, সময় চিহ্নে এদের চেনে না
লিখে যেতে হবে, অনাগত কাল, লিখে রাখা হলো
একবার শুধু দেখে নিও এই
উল্টোপাল্টা সময়ের আবছায়া শিলালিপি!

ওগো নারীবাদী তীব্র লেখনী

ওগো নারীবাদী তীব্র লেখনী
একটিবার কি কোমল আননে
চেয়ে দেখবে না, এই নতজানু
হাত-জোড়-করা পুরুষ পাপীকে?

ওগো নারীবাদী তেজি তর্জনী
একটি বার কি যুদ্ধ থামিয়ে
চেয়ে দেখবে না পুরুষ ছাড়িয়ে
অপৌরুষেয় মেঘসম্ভার?

হে অভিমানিনী, ঘোর অরণ্যে
ঝড়ে নেচে ওঠে যে-সব বৃক্ষ
তারা কি পুরুষ অথবা রমণী?
ভোরের আলোয় কারা খেলা করে?

মাটির দাওয়ায় আছড়ে পিছড়ে
কাঁদছে শিশুটি, বাতাসে ভাসছে
শিমুল তুলোর যাযাবর বীজ
ছিন্ন পাতায় কোন ইতিহাস?

এ সবই আসলে পুরুষের ফাঁদ?
তোমার চক্ষু ফেরাতে চাইছে?
মুখোশের ঠোঁটে শান্তির বাণী
আড়ালে শানিয়ে চলেছে অস্ত্র?

হায়রে যুদ্ধ, কাগজ যুদ্ধ
কোনটা সত্য, কোনটা ছলনা?
তবু ওরা লেখে প্রেম-বন্দনা
তুমি কি শুধুই রণসংগীত?

বৃত্তের মাঝখানে

মৌমাছিটা শুকনো ফুলকে ছুঁল না, সে কাল
ওখানে রভস করেছিল
বেড়ার ধারে সদ্য যৌবনবতী রঙ্গন ও টগরেরা
নাচ শুরু করে দিয়েছে
সেজেছে খুব
গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি খেয়েছে, নেশা করেছে
ভোরের বাতাসে চুমুক দিয়ে
ওরা ডাকছে, বুকের ওড়না খুলে ডাকছে মৌমাছিটাকে
আমি এই রতি-চঞ্চলতা উপভোগ করি, শুনতে পাই
মৌন শীৎকার
বেশিক্ষণ না
একটা গুণ্ডামতন সবল ছাগল দু'পা উঁচিয়ে
বেড়ার ওপর মুখ বাড়ায় রাক্ষসের মতন
প্রেম ও ধ্বংসের শব্দের মধ্যে প্রথমে খুব একটা
তফাত বোঝা যায় না
ধারালো দাঁতে পিষে যাচ্ছে ফুলগুলো, তবু মনে হয় খেলা
ক্রমশ হতে থাকে রং ও সারল্যের বিনাশ
আমি বাধা দিই না, ফুল আমার প্রেমিকা নয়, মৌমাছির
এটা আমার বাগান নয়, ডাকবাংলো
ছাগলটাকে তার খিদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করব কেন
কিছুক্ষণের মধ্যেই নাটকের পরবর্তী দৃশ্য
লুঙ্গি পরা, বেঁটে লাঠি হাতে একটা লোক
ছুটতে ছুটতে এসে ছাগলটার গলা চেপে ধরল
নিষ্ঠুরভাবে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল মাঠ পেরিয়ে
ঐ দিকেই বুঝি কশাইখানা?

এই লৌকিক বৃত্তের মাঝখানে আমি একটা অলৌকিক বিন্দু...

হলুদ পাখি

হলুদ পাখিটি নিম গাছে গিয়ে বসে
নিমের মাথায় দোল খায় তার ছবি...
সত্যিই একটা হলুদ পাখি গোয়ালপাড়ার দিক থেকে উড়ে এসেছিল। একলা।
কেন সে নিমগাছটাই বেছে নিল, সেটা একটা রহস্য না? কদম গাছ ছিল,
ইউক্যালিপটাস, এমনকী পেয়ারাও, কোনোটাই পছন্দ হল না? নিম ফল আমি
খেয়ে দেখেছি, তেতো নয় মোটেই। এখন ফল নেই, ফুল নেই।
ওই নিমগাছে কি হলুদ পাখির কোনো স্মৃতিকথা লেখা আছে?
আকাশে পাতলা মেঘ ছিল, একটুকরো মেঘ সরে গিয়ে ঝলমলিয়ে
উঠল রোদ। সে কি সরে গেল হলুদ পাখির রং আরও উজ্জ্বল করে
তোলার জন্য? কোনোদিন জানা হবে না।
নিমের সবুজ, ইউক্যালিপটাসের সবুজের চেয়ে আলাদা। পাখিরা
রং চেনে? হলুদ পাখি কি জানে, সে হলুদ?
এ পৃথিবী কি জানে, তার নাম পৃথিবী?
পাখিটা স্বয়ং বসে আছে, তবু তাকে ছবি বলে মনে হচ্ছে কেন? সেই
ছবিটা দুলছে।
কদম গাছটির ঈর্ষা হয়েছে? হঠাৎ কেন তার নিস্তব্ধতার মধ্যে
শুরু হল বাতাসের হুড়োহুড়ি?
হলুদ পাখিটি তিনবার ডেকে উঠল। ঠিক তিনবার কেন?
কোনোদিন জানা হবে না।

সাঁকোর মাঝখানে

সাঁকো পেরুলেই ওপারে দুঃখী গ্রাম
এপারে শুধুই শিল্পের আনাগোনা
তুমি কোন দিকে পুরাবে মনস্কাম?
ওপারে ক্ষুধার হাহাকার যায় শোনা।

শিল্পই সার? কবিতা আত্মরতি
দুখী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে না?

রূপের তৃষ্ণা, শব্দে অরূপ জ্যোতি
বাস্তবতার কাছে নেই কিছু দেনা?

ওপারে মানুষ মানবতা থেকে দূরে
সারা দিন শুধু ব্যস্ত বেঁচে থাকায়
পৃথিবী চেনে না, ছোট গণ্ডিতে ঘুরে
অনিয়ন্ত্রিত আয়ু ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

তুমিও দুঃখী, সে দুঃখ সৃষ্টিতে
ওদের ব্যথার হয় না শিল্পরূপ?
তুমি কি পারো না দু'-দিক মিলিয়ে দিতে
তবুও সাঁকোর মাঝখানে কেন চুপ?

স্বপ্নে দেখা ছবির মতো

নদীর ধারে বসে রয়েছে সেই নদীটির বাল্যসখী
একা
বাতাস তার মাথার চুলে বিলি কাটছে
শেষ বিকেলের নরম রোদ
পিঠের ডান পাশে
জলে দুলছে মুখচ্ছবি, অনেকদিন পর দু'জনে
দেখা
ঘাটের সিঁড়ি, কদম গাছ, ফিঙে পাখিটি
ওরাও চেনে, কচুরিপানা
এদিকে ভেসে আসে...

এ-দৃশ্যটি স্বপ্নে দেখা ছবির মতো বাঁধিয়ে রাখাই
ভালো
নীরার মন মেয়ে-বেলার হারানো দিনে
ফিরে গিয়েছে, আমরা কেউ
ওর জগতে নেই
ছিল না মেঘ, আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাল

গোপন কথার মায়া নদী মিলিয়ে যাবে
ভুল করে ওর সামনে গিয়ে
শব্দ করব যেই!

শব্দ নয়, স্পর্শ নয়, বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ
না-পাওয়াগুলি মিলিয়ে দিয়ে ছবিটি হোক আঁকা!

নিউটন ও ভ্যান গঘ

তিনটে দেবদারু গাছ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে
আপেল চিনতেন নিউটন; সিকামোর, সাইপ্রেস দেখেননি?
এই দু' লাইন লিখেই খটকা লাগে। বাংলা কবিতা যুক্তাক্ষর
দিয়ে লাইন শেষ করার তেমন রীতি নেই। তা ছাড়া ক্রিয়াপদ
'যাচ্ছে'র সঙ্গে কীসের মিল? মিল দিতেই বা হবে কেন? একটু
ঘুরিয়ে প্রথম লাইনটা অনায়াসে এভাবে লেখা যেত, 'তিনটে
দেবদারু গাছ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে'। নাঃ, ভাল শোনায়
না, 'উঠে যাচ্ছে'ই এখানে প্রধান।

প্রথম পর্বে, 'তিনটে দেবদারু গাছ' ঠিকই আছে, উচ্চারণ হবে
তিন্‌টে দেবদারু গাছ, পরিষ্কার আট মাত্রা। কিন্তু দ্বিতীয়
লাইনের 'আপেল চিনতেন নিউটন'? যদি উচ্চারণ এ রকম হয়,
আপেল চিন্তেন নিউটন, তাতেও মাত্রা বেশি হয়ে যায়। হোক
না। বুদ্ধদেব বসু খুবই আপত্তি করতেন, হসন্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে
আমার মত পার্থক্য কোনো দিন মেটেনি।

দেবদারু গাছগুলি যেন সত্যিই দেবতাদের হাতছানি পেয়ে উঠে
যাচ্ছে ওপরে, মাত্রা ছাড়িয়ে, আরও ওপরে, পাহাড়ের শিখর ছাড়িয়ে, মেঘের
সঙ্গে জড়াজড়ি শেষ করে, মাধ্যাকর্ষণকে তুড়ি মেরে!

সেটাই তো কথা। নিউটন আপেল গাছ থেকে আপেল খসে
পড়তে দেখে...। কিছু কিছু মানুষ অন্য মানুষদের ছাড়িয়ে
যায়। কিছু কিছু গাছ আর সব গাছকে ছাড়িয়ে উঁচু হতে হতে,

আরও উঁচু হতে হতে...দেবদারুর সঙ্গে সাইপ্রেসের অনেকটা
মিল, এমনকি সিকামোর বা পপলার, যেমন পাহাড়ের পাশে
উদ্ধত তেজস্বী ঝাউ, ছায়া জয় করে রোদের দিকে যাবেই,
অনবরত মাথা উঁচু করে যাচ্ছে, ভূমি থেকে রসের স্রোত নাচতে
নাচতে উঠে যাচ্ছে ডগা পর্যন্ত, যেন নস্যাৎ করে দিচ্ছে
নিউটনের গণিত, মনে পড়ে আকাশজোড়া রাত্রির বৃক্ষ, ভ্যান
গঘের ছবি দুটি সাইপ্রেস নিউটনের আপেলের পাশে
প্রতিস্পর্ধীর মতন বিস্ময় হয়ে থাকে!

মাটি*

একদিন কেউ কাছে এসে বলেছিল
অকূল সাগর ডেকেছে তোমার নামে
হালভাঙা সেই জাহাজ ফিরিয়ে দেবে
কেন শুয়ে আছো ব্যর্থ মনস্কামে?

যে শুয়ে রয়েছে একদা সে ছিল নাবিক
আকাশের মতো বুক ভরা নীল নেশা
এখন পেয়েছে নরম মাটির ঘ্রাণ
নারীর মতন দুঃখ-রভসে মেশা!

এ মাটি গভীর, আরও তরঙ্গময়
মধ্যজীবন জানে শুধু এর ভাষা
পুরনো শরীরে আবার নতুন রতি
ইচ্ছে করে না আর কোনো যাওয়া-আসা!

*এটাই আমার কমপিউটারে সরাসরি কবিতা লেখার প্রথম ও শেষ প্রচেষ্টা। বোঝাই যাচ্ছে, যুক্তাক্ষরের সংখ্যা কেন এত কম।

পানকৌড়ি ও মাছরাঙা

পুকুরে জোরালো ডুব দিচ্ছে একটা পানকৌড়ি
তিনটে হাঁস আড়ষ্ট হয়ে জল ছেড়ে উঠে গিয়ে
বসে রইল গাছের তলায়
ওরা কি পানকৌড়িকে ভয় পায়?

এই বহমান জীবনের যেকোনো একটু টুকরোই হয়ে
উঠতে পারে কবিতা
দোতলার জানলা দিয়ে আমি দেখছি পানকৌড়িটার
চোরা ডুব-সাঁতার
ওকে নিয়ে একটা কবিতা লেখা যায় না?
কাগজ কলম নিয়ে বসতেই প্রথমে এই লাইনটা ঝলসে উঠল
'যেন একটা উল্কা ফুল, ঝুপ শব্দে পড়ল এসে জলে
একটা মাছরাঙা'
আমি কলম থামাই, পানকৌড়িটা মাছরাঙা হয়ে গেল কী করে?
আমি তো মাছরাঙা দেখছি না, তবু কবিতায় সেই পাখিটা
উড়ে এসে জুড়ে বসল
সে কি নানা রঙে সুন্দর বলে?

কিংবা নিছক বাস্তব নিয়ে কবিতা হয় না, শিল্পের
নিজস্ব নিয়মে দৃশ্য বদলে যায়?
অথবা পানকৌড়িটা বঞ্চিত হল তার রঙ কালো, তার রূপ নেই বলে?
আমরা কালো দেশের মানুষ
আমার গায়ের রঙ ঝিরকুট্টি ছাতার মতন
তবু কবিতায় ফিরে ফিরে আসে
চন্দন রঙের মেয়েরা...
বাস্তবে তারা নাচের ছন্দ তুলে মুখ ফিরিয়ে
চলে যায় অন্য দিকে।

কবি

কবিকে দেখলে মনে হয় যেন সন্তর্পণ একটা শালিক
অথচ তার হৃদয়টা শাঁ শাঁ উড্ডীন বাজপাখির মতন
কী মুস্কিল!

কবিকে হঠাৎ তুলে ফেলে দেওয়া হোক অগাধ সমুদ্রে
সে কিন্তু তখনও চিত হয়ে ভাসবে ছেলেবেলার ছোট্ট নদীতে
সাঁতার কাটবে স্বপ্নে!

কবিকে খাতির করে নিয়ে যাও না পাঁচতারা হোটেলে
গেলাসটা ধরেছে দেখো, যেন চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ের চায়ে
নিজেই হাসছে মনে মনে।

কবি হাঁটছে মিছিলে, অথচ সে কী দারুণ একাচোরা।
বিয়ে বাড়িতে সবার সঙ্গে গল্প করছে হেসে হেসে, আসলে সে
কিছুই বলছে না।

অন্ধকারের মধ্যে একটা একরত্তি স্ফুলিঙ্গ তাকে শাসন করে
বাঁ দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে ডান দিকে, ঠিক যেন লক্ষ্মীট্যারা
বেশি দেখে দেয়াল!

রাস্তাটা তার আয়না, সেই জন্যই, সে নিজেকে দেখতে পায় না
আঙুল ডুবিয়ে রাখে জলে, সে জল কিন্তু অসমতল
তেষ্টায় বুক ফাটে।

বাসের জানলার নারীকে সে বসিয়ে দেয় নির্জন ঝর্নার ধারে
মুহুর্মুহু ভাঙছে গড়ছে স্বর্গ, যেন পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া
নরকও বেশ চেনে।

গলির মধ্যে পাহাড় চুড়ো, তাকে ঘিরে রেখেছে গোলোকধাঁধা
সেইখানে তার বাড়ি, সর্বক্ষণ গোলমালে কান ঝালাপালা
তার মধ্যে সে অদৃশ্য!

কবি যে কতবার হোঁচট খায় তার গোনা গাঁথা নেই
ভুলে ভর্তি জীবন, সে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ
দেবতারাও তাকে ভয় পায়।

তার চুপ করে থাকার মধ্যে দারুণ ব্যস্ততা, যখন মনে হয়
তন্ময় হয়ে সে লিখছে, আসলে সে তখন ঘুমোচ্ছে
ওকে ক্ষমা করে দাও!

বই

খিদের সময় কচমচ করে আস্ত একটা রান্নার বই খেলেই তো হয়
বই যদি লাগে শুকনো শুকনো একটু একটু জল ঢেলে নিয়ে বেশ খাওয়া যায়
কচি-কাঁচাদের জব্দ করবে, মাথায় চাপাও খান দু'তিন থান ইট বই
বন্যার দিনে কাজে লেগে যাবে, বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে কাগজের নৌকো ভাসাও
সেই নৌকোয় দিগন্ত পার, এ দুনিয়া ছেড়ে অন্য দুনিয়া
বাঘ সিংঘিরা বই কী জানে না তাই তো তাদের সংখ্যাটা আজ দোদুল্যমান
অনেক মানুষও বই ভয় পায়, বইরা তাদের দিকে চেয়ে হাসে দন্ত কপাটি
বই দিয়ে খুব ভালো হয় জেনো, ভাঙা টেবিলের পায়ার ঠেকনো
তেমন তেমন বই খুললেই আঃ কী আরাম, চোখ বুজে আসে, ঘুমের ওষুধ
বই খোলা রেখে মুখটা লুকিয়ে কেঁদে নেওয়া যায় কী জানি কীসের দুঃখে না সুখে
বইয়ের সঙ্গে এক বিছানায় ভালবাসাবাসি গোপন তো নয়, দেখুক না লোকে
শুনেছি স্বর্গে লাইব্রেরি নেই, বইটই নেই, দান্তেও কিছু লেখেননি, সব
দেব-দেবীরাই নিরেট মূর্খ
তাই তো স্বর্গে যাবার ইচ্ছে কখনও হয় না, জ্ঞানপাপীরাই হুড়োহুড়ি করে
বইতে থাকুক শক্ত মলাট, কখনও সখনও ছুড়তে তো হবে টিভির বাক্সে
সবাই বলছে, আসছে শতকে যুদ্ধ লাগবে, বই হারবেই, বই বলে আর কিছু
থাকবে না
হারে তো হারুক, মৃত বইগুলি ভূত তো হবেই, যখন তখন কম্পুটারের দেবে গলা
টিপে!

সহজ কথার গান

বাঁচার জন্য বাঁচতে হবে, এমন একটা সহজ কথার গান হয় না
কেমন সহজ, যেমন আগুন, ভূমিকম্প, তুষার ঝড় পেরিয়ে
আসে একলা শিশু
যেমন বন্যা উথাল পাথাল, তার মধ্যেও জেদ ছাড়ে না, মাটি
ছাড়ে না ছোট্ট একটা নয়নতারা
আকাশমণি বনের ঝাড়ে আগুন লাগল, ও জোনাকি,
ওদের বল না বেঁচে থাকতে
আগুনকেও তো বাঁচতে হবে, আমি আগুন খেতেও পারি
উদর জুড়ে আগুন আমার, এতকাল তো সেই আগুনই
বাঁচিয়ে রাখলো
ক্লেদে ডুবছি, দু'হাত তুলে বলি, আমায় বাঁচাও আগুন,
এসো আগুন এ সংসারে
কথায় কথায় জ্বলে আগুন, আলেয়া নয়, চুলোর আগুন,
ছাই উড়ছে
এর মধ্যেই ভালোবাসার দু'চার বিন্দু, খরার মাঠে
যেমন বৃষ্টি
বাঁচাই যদি না যায় তবে সব সৃষ্টিই অনাসৃষ্টি, ওগো তোমরা
লোকাল ট্রেনে, আঁতুর ঘরে, কয়েদখানায়, কেরোসিনের
লম্বা লাইনে
বাঁচো এবং বাঁচার জন্য আঙুল তোলো, আমি একটা
গান লিখছি
বাঁচার মতন বাঁচতে হবে, স্বর্গে কিংবা নরকে নয়,
এই মাটিতে, এই মাটিতে...

এসো, আমরা

এসো, আমরা এখন সেই ভাষায় কথা বলি, যা
কেউ বুঝবে না
তুমিও না, আমিও না!
এসো আমরা স্বপ্ন বদলাবদলি শুরু করি

যেমন স্বপ্ন আমি আজও দেখিনি
তুমিও না।

এসো আমরা বাগানের চারপাশে ছড়িয়ে দিই
অভূতপূর্ব সব ফুলের চারা
যদিও আমাদের নিজস্ব কোনো বাগান নেই

কারা যেন দুন্দুভি বাজিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে
একটি নদী শুকিয়ে গেল এই মাত্র
সীমান্তে নতুন করে বেড়া দেওয়া হচ্ছে
হাসছে প্রহরীরা
এ একটা খাঁচার মধ্যে, ও একটা খাঁচার মধ্যে
বন্দিরাও হাততালি দেয়
কারা যেন দুন্দুভি বাজিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে

এসো আমরা পৃথিবী জুড়ে এমন একটা ধ্বংসের উৎসব
শুরু করি
সে-রকম ধ্বংস পৃথিবীও কখনো দেখেনি।

পরমার্থের ছবি

পা মাড়িয়ে কেউ চলে গেল আগে আগে
ফিরে তাকাবে না, পিঠে লেগে আছে চোখ
রাস্তা ছুটছে, গাড়ির ভেতরে গাড়ি
স্বপ্ন দেখে না নব্বই ভাগ লোক!

যেমন স্বপ্ন ধুলো থেকে উঠে আসে
পরমাণুতেও বিশ্ব ঘূর্ণ্যমান
মায়া সংসার নদীর সঙ্গে দোলে
ও কার বাছা রে, কেঁদে হলো খানখান?

কোথাও একটা নিশানা রয়েছে পোঁতা
প্রেমিক ও খুনি পিঠোপিঠি দুটি ভাই

কেউ ঘর ভাঙে, কেউ গাছে দেয় জল
সহসা বাতাসে রব ওঠে যাই যাই!

বিকেলের ঘুম ভেঙে গেলে ভ্রম হয়
এটা কোন দেশ, এই শরীরটা কার?
মেঘলা আকাশে পরমার্থের ছবি
ঝলসে উঠেও মুছে যায় বারবার!

দ্বীপ

দ্বীপটি জঙ্গলে ভরা, সরু পথ, শুকনো পাতায় দুটি মানুষের পা
কিছু কথোপকথন, কিছু নিস্তব্ধতা, পাখ পাখালির সমস্বরে কিছুটা ব্যঞ্জনা
দৃশ্যটি বাস্তব থেকে মাঝে মাঝে অলীকের দিকে যেতে চায়
যেমন, নারীটি নেই, পুরুষটি ঝুঁকে পড়ে মাটিতে কী খোঁজে
পুরুষও মিলিয়ে যায়, নারীটি তখন যেন ফুল থেকে ঝরে পড়া শিশিরের মতো
আঁচলে কাঁটার টান, ফিরে দেখে পুরুষটি অবিকল গাছ হয়ে আছে
অন্যান্য গাছেরা আজ বৃষ্টিধন্য, স্নান সেরে তরল রোদ্দুর খাচ্ছে গেলাসে গেলাসে
এখানে ফুলের কোনো নাম নেই, রমণীটি বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে রেণু
পুরুষ-ওষ্ঠের ধোঁয়া পতঙ্গেরা ভুরু কুঁচকে পছন্দ করে না
এখানে কী জন্য আজ এসেছে এই দু'জন, ভ্রমণে না কুটির বাঁধার সাধ নিয়ে?
বস্তুত এ দ্বীপ কার? দুনিয়ার কোনো দ্বীপ অ-মালিক, শূন্য পড়ে আছে;
দূরে কাছে সমুদ্রের শব্দ নেই, নদী আছে, ক্ষীণতনু, স্বচ্ছ জলে ছায়া দেখা যায়
একটি, না দুটি দ্বীপ? পুরুষটি হাত রাখে হাস্যমুখী সঙ্গিনীর কাঁধে
নারীটি ঘুরে দাঁড়াল, শরীর দেখাল খুলে, চক্ষুদুটি জলে ভরা, স্তব্ধতা বাঙ্‌ময়
সহসা অদৃশ্য হল দু'জনেই। অথবা শরীর নেই, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে
নারীটি কাতর স্বরে বলে উঠল, খেয়া নৌকো নেই, কিন্তু সেতুও থাকবে না!
ফেরার ব্যস্ততা নয়, এ এক জীবনব্যাপী ব্যাকুলতা, বারবার সেতু গড়তে হয়।

ওজন-পাল্লা

আমার বন্ধুকে কেড়ে নিল এক নারী
ওজন-পাল্লায় তারা দু'জনেই, কিছুতেই সমতা আসে না
বাটখারা ক্ষয়াটে, কিংবা একদিকের দড়ি কিছু বেঁটে?
আমি মাঝে-মাঝে দেখি, যে-পাহাড়ে উঠেছি দু'জনে
একসঙ্গে, সে-পাহাড়ে বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টির কুয়াশা
বন্ধুটির দেওয়া বেল্ট আমার কোমরে আঁট হয়
কলমটা ফেলে গেছে, তার কালি ফুরোবার বড়ই ব্যস্ততা
মদের গেলাস ছুঁয়ে একা রাত্রে বলি, হারামজাদা
চলন্ত ট্রেনের দরজা, সেই ঝাঁপ-মারা, মনে নেই?

আমার বন্ধুকে কেড়ে নিল এক নারী
অথবা সে-নারীকেই নিয়ে গেল ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি?
ওজন-পাল্লাটা তুলি, খালি দোলে, দুলতে থাকে, দোলে
দুঃখ নাকি রাগ? কিংবা ব্যর্থতা না বঞ্চনার বোধ?
সে-নারীর স্তনবৃন্তে আমার জিভের আঠা মুছে গেছে বুঝি?
দিগন্ত-আচ্ছন্ন-করা ঊরু, তার মধ্যে ভাটফুল
আঙুল নাকের কাছে আনি, গন্ধ পাই, মৃদু কান্না শোনা যায়
আমি কি বিরহী, নাকি হেরে-যাওয়া নিঃসঙ্গ জুয়াড়ি?
বন্ধু না নারীটি, কে যে কাকে নিল, হাত ধরে দূরে চলে গেল
দুঃখের ভেতরে রাগ, বঞ্চনা-বোধের মধ্যে পরিত্রাণ, সব জড়াজড়ি
এখনও আমার ঠোঁটে লেগে আছে নারীটির চুম্বনের থুতু
বন্ধুর মাথার মধ্যে ঢুকে আছে আমাদের শব্দার্থের মোহ
পাহাড়ে বৃষ্টির শব্দ, গভীর জঙ্গলে পথ-হারাবার খেলা
ওজন-পাল্লাটি তবু উঁচু-নিচু, দুলতে থাকে, দোলে!

বারবার প্রথম দেখা

নীরার হাত-চিঠি এল পড়ন্ত বিকেলবেলায়
আমি তখন হিজিবিজি জট-পাকানো সুতোর মধ্যে আছি
তার মধ্যে একটি সদ্যস্নাত জুঁইফুল
ডুবন্ত মানুষ যেমন নিশ্বাসের জন্য আকুপাকু করে ওঠে

আমিও সূর্যকে বললুম, আজ একটু দেরি করো
নীরা আমায় ডেকেছে, দিগন্তরেখা, আবছা হয়ে যেও না
জানলায় এত ঝনঝন শব্দ কীসের, ছিটকিনি, শান্ত হও
বইয়ের খোলা পৃষ্ঠা, প্রতীক্ষায় থাকো
আঙুলে কালির দাগ, লক্ষ্মীটি, অদৃশ্য হও
জুঁইফুলটি চেয়ে আছে, সদ্য-জন্মানো ঝর্নার মতন হাসছে
একটি ঝর্নার পাশেই বারবার নীরাকে আমার প্রথম দেখা
মেঘভাঙা দ্যুতি এসে পড়েছে তার চিবুকের রেখায়
নতুন বসন্ত-বৃক্ষের পাতার মতন তার চোখের আলো
তার বুকে দুলে দুলে উঠছে কৈশোরের সমুদ্র-স্নান
নীরার ডাক এসেছে, মেঘ, নিরুদ্দেশে যাও
দরজায় আর কে এসে দাঁড়াল, আমি কোথাও নেই
শব্দ, তুমি থামো, বাক্, তুমি নিশ্চুপ হও
সমস্ত সুতোর পাক লণ্ডভণ্ড করে আমায় উঠে দাঁড়াতে হবে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে...

বন্ধুবান্ধব

চলো দীপক, আর একবার ধলভূমগড়ে যাই
বালিশ দিয়ে চোখ চাপা, শক্তি বলল
ভাস্করটাকে নেবে না?
শংকর, শংকর, তুই এবার অন্তত চল, কোনোদিন যাসনি
দু'হাত নেড়ে শংকর বলল, ট্রেন আমার সহ্য হয় না
শক্তি ওকে লাথি কষিয়ে বলল, দে শালা সিগারেট
সন্দীপন মিচকি হাসছে, ও নিজে যা করতে পারে না
শক্তিকে তা করতে দেখলে দুশো মজা পায়
শরৎ চাপড়ে দিল তারাপদ'র কাঁধ, বাদাম ওড়াচ্ছে সমরেন্দ্র
পলিমাটির মতন সরল মুখ করে শ্যামল বলল,
তোরা আমায় নিবি না?
সবাই জানে, নিতে চাইলেও শ্যামল যাবে না, এক্ষুনি
শেষ ট্রেনে পাড়ি দেবে চম্পাহাটি
দীপেন সরু চোখ করে বলল, তোরা সব হারামজাদাগুলো

পেটি বুর্জোয়া রয়ে গেলি, ক্লাস স্ট্রাগল
কিছুই বুঝলি না
দীপেনের থুতনি ধরে চুমু খেয়ে বিমল বলল, মান্তু, মান্তু,
আমি ভাই আমার বউকে নিয়ে যেতে পারি?
সবাই সমস্বরে বলে উঠল, না, না, না...

আমি সমীর রায়চৌধুরীকে বললাম, আর কেউ না যাক
তুই আর আমি যাচ্ছিই
পাশ থেকে ভুস করে মাথা তুলে শক্তি বলল, আমাকে
বাদ দেবে, অ্যাঁ
সব ভুষ্টিনাশ করে দেব
ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বলো তো, ধলভূম জায়গাটা ঠিক কোথায়?
ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে শক্তি বলল, সবাই জানে,
মেঘালয়ের একেবারে বুকের মধ্যে
সেখান থেকে ধলভূম পালিয়ে গেল না উত্তর কাশীতে?
বিশাখাপত্তনেও একদিন ধলভূমগড়কে দেখেছি
কে যেন বলল, ধলভূমগড়ের নাম বদলে এখন
হয়ে গেছে চাঁইবাসা
তারপর আবার এফিডেভিট করে হয়েছে দিকশূন্যপুর
বিসর্জনের বাজনার সঙ্গে একলা একলা গান গাইছে দীপক
দীপেন আর বিমল বেশ অনায়াসে কাঁধ ধরাধরি করে
হাঁটছে কুয়াশার মধ্যে
যেখানে জঙ্গল ছিল, সেখানে পাথর ফাটছে, নদীর ধারে
শক্তি বসে আছে জলে পা ডুবিয়ে
চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল, হঠাৎ নদীটা উত্তাল হয়ে
ছাপিয়ে যেতে লাগল দু'তীর
আঃ এত অন্ধকার কেন? এটা কি ব্রহ্মপুত্র নাকি?
দাঁড়া, শংকর, আমি উঠে এসে আলো জ্বালছি।

লেখা, লেখা, লেখা

বইগুলো ভয় দেখাচ্ছে
সেই সাড়ে চার বছর বয়সে অক্ষর পরিচয়
তারপর, ওঃ, কতগুলো যুগ ও কল্পান্ত কেটে গেল যেন
শুধু ছাপার অক্ষর, চোখের সামনে হাজার হাজার পৃষ্ঠা
পড়েছি যত, লিখেছি কি তার চেয়ে বেশি?
কত যে সাদা পৃষ্ঠা কালিমালিপ্ত করেছি তার ইয়ত্তা নেই
তারা বাঁধানো বই হয়ে ফিরে এসেছে, স্বাতীকে বানাতে হয়েছে
দ্বিতীয় আলমারি
খেলাচ্ছলে লিখেছি, কালপুরুষকে টুসকি মেরে লিখেছি
বেঁচে থাকার জন্য লিখেছি, সামান্য টাকার জন্য লিখেছি
দু'-তিনজন আপন মানুষকে আমার স্বপ্ন ও বেদনা
মনে রাখবার জন্যে লিখেছি
মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে এসে ভূতগ্রস্তের মতন লিখেছি
কত মানুষ যখন দুলেছে, ভেসেছে, হেসেছে, মেতেছে
আমি লেখার টেবিলে আয়ু নিঙড়ে দিয়েছি
সিগারেট টেনে টেনে ফুসফুস ঝাঁঝরা, ঘাড়ে গোঁয়ার
ধরনের ব্যথা
মাঝপথে ছুটে গেছি অভিধানের দিকে, নারীকে দেখিনি,
আকাশ দেখিনি
তাতে কোনো পাপ হয়েছে কি? এতগুলো বছর ব্যর্থ গেল?
কেন নিজের লেখা বইগুলির দিকে তাকাতে ভয় করে?
কেন নিজের নাম শুনলে মনে হয়, অন্য মানুষ, অন্য মানুষ
চতুর্দিকে নশ্বরতার এমন হিমেল ঘুমঘুম গন্ধ।

ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া

ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া, আবার পেছন ফিরে দেখা...

এ ভাঙনে ধ্বংস নেই, চক্ষে লাগে ধাঁধা
একদা কারো ছেলে ছিলাম, এখন নিজেই বাবা
বাবার মুখ ঝাপসা, যেন চকখড়িতে আঁকা...

লক্ষ চিঠি লেখার নারী দূর বিদেশে পাড়ি
এখন চিঠি গাছের পাতায়, এখন চিঠি ঘাসে
ফিরে তাকাই, ভাঙা দেউলে ফুল ফুটেছে কত
ছিল যেখানে গন্ধরাজ, এখন নয়নতারা...

দেয়ালে গ্রুপ ফটোর মধ্যে ভীত মুখটি কার
দেয়ালগুলি শূন্য সব উড়ে গিয়েছে ঝড়ে...

মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না, লিখি মাতৃস্মৃতি
খেলার সঙ্গী বদলে যায়, বদলে যায় খেলা
আমি কোথায় ছুটছি, আমার পায়ে ফুটেছে কাঁটা...

ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া আবার পেছন ফিরে দেখা...

কে দেয় পরমায়ু বিসর্জন?

বাতাসে দোল ওঠে। বাতাস নয়
বইয়ের পাতা খোলা, সারা জীবন
কাগজ মুড়ে শোওয়া, কাগজ ঘুম
শব্দ অক্ষরে খিদে মেটায়

দেয়ালে প্রজাপতি, এল কখন?
দেখিনি কতদিন নারীর রূপ
শুধুই রূপ নয়, অভিমানের
ভেতরে বিদ্যুৎ, ছন্দ মিল!

রক্ত গোধূলিতে নদীর তীর
ওপারে ঝাউবন দৃশ্য নয়
শব্দ ভেঙে ভেঙে খেলার ছল
যদি বা নদী আছে, আকাশ নেই।

খেলারও শেষ নেই, সারা জীবন
আঙুলে আগুনের তীব্র আঁচ
বুকের কাছে নেই অন্য মুখ
অথচ উপমায় এক ঝলক!

কবিরা উদাসীন, যা ভুলো মন
সত্যি তাই বুঝি, তবে এখন
সাতটি মাত্রায় প্রখর কান
কে দেয় পরমায়ু বিসর্জন?

দুটি নাম

নাথুলা পাস পার হবার সময়
সাকলিন মুস্তাক কী বলেছিল তার বন্ধুকে?
প্রীতম সিং-এর পায়ে তুষার ক্ষত, সে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে
সাকলিনকে যেতে হবে, যেতেই হবে, সামনের চেক পোস্টে তার দায়িত্ব
সাকলিনও কি থেমে যাবে বন্ধুর জন্য, কেঁদে কেঁদে পাহাড় ফাটাবে?
মুমূর্ষু প্রীতম কি বন্ধুর গলা জড়িয়ে বলবে, ওরে আমায় বাঁচা, ফেলে যাসনি!
তবু যদি সাকলিনকে চলে যেতে হয়, সেটা কি অন্যায়?

আমরা জানি না কী ঘটেছিল সেখানে সেই সংকটে
জানুয়ারির নাথুলা পাসে রক্তারক্তি ঝড় বয়েছিল
ধরা যাক উল্টোদিকে, সাকলিন মুস্তাকই তুষার ঝড়ে কাতর,
এগিয়ে যাচ্ছে প্রীতম
প্রীতম সিং-এর বুকে অনেক অক্সিজেন এবং কর্তব্যের জেদ
অন্তরীক্ষ থেকে নেমে আসছে সব রকম প্রতিরোধ
প্রীতম কি বন্ধুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে মুখ ফিরিয়ে?
আমরা ঠিক জানি না

কে কাকে টানছে, কে দুর্জয় সাহস নিয়ে অবহেলা করছে প্রকৃতিকে
কে থাকবে, কে যাবে, কে বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি মূল্য দেবে
তার ডিউটির নিষ্ঠাকে
সেটা বড় কথা নয়, ধরা যাক ঝড় তখন প্রলয়ের মতন
ওগো পাঠক, তুমি তার থেকে অনেক দূরে, রয়েছো
নিজের ঘরের নিশ্চিন্ত আরামে।
ওগো পাঠক, তুমি মন ঠিক করো, সাকলিন আর প্রীতম
এই দুটো নাম নিয়ে তুমি আগেই আলাদা মতামত
তৈরি করে নেবে কি না!

বন্ধুস্মৃতি

এক ফোঁটাও জল নেই, তবু নদী
এক ঝাঁক ভ্যাবাচ্যাকা ফড়িং শুনতে পাচ্ছে তরঙ্গের ধ্বনি
ব্রিজের ওপর দিয়ে ঝমঝমিয়ে যাচ্ছে ট্রেন, জানলায়
কৌতূহলী কিশোর নদী দেখছে
লাল রঙের বাঁধানো ঘাটে পা ধুচ্ছে চাষি বউ
ভিজে গেছে তার ছলনাময়ী সায়া
জল নেই, কিন্তু খেয়া নৌকো ভাসছে, বিড়ি টানছে মাঝি
আসুক না নিশুতি রাত, আরও গাঢ় হোক অন্ধকার
ঐ নদীতে দোল খাবে চাঁদ
কলকলানি গল্পে মেতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে
সাঁওতাল রমণীরা
এপার থেকে কেউ হাঁক দিচ্ছে ভাটিয়াল টানে
অনেক গভীর থেকে উঠে আসছে শতদল...

এক ফোঁটাও জল নেই, তবু নদী
শুয়ে আছে আমার বন্ধু, শরীরে প্রাণ নেই
তবু তার নাম দীপেন
সে ভেসে যাবে ঐ নদীতে, ভেসে চলে যাচ্ছে...

একটি গ্রাম্য দৃশ্য

মাটির দাওয়ায় খুদে মাস্টার ক্লাস সিক্সের গুটুলি
হাতে বেত নেই, তর্জনি তোলা, নাকের ডগায় চশমা
খেলনা চশমা, চশমা ছাড়া কি মাস্টার সাজা মানায়?
মেঘ ভাঙা চাঁদ, পোষা বেড়ালটা এই দৃশ্যটা দেখছে।

ছাত্রী মাত্র একটিই, তার মন নেই পড়াশুনোয়
ছটফটে ভাব, পালাবার তাল, বড় চঞ্চল চাহনি
চুল বাঁধা নেই, শাড়ির আঁচল ঘাম মুছে মুছে ময়লা
কাতর গলায় জানাল, 'গুটুলি, এবার আমায় ছেড়ে দে?'

গুটুলি চক্ষু পাকিয়ে বলল, 'হাতের লেখাটা দেখাও
যা পড়া দিয়েছি শেষ না করলে কোথ্থাও যেতে পাবে না
ভারি ফাঁকিবাজ, এখনো নিজের নামের বানান শেখোনি
দীর্ঘ ঈ-কার লিখতে দু'বার চকখড়িখানা ভাঙলে!'

'মেঘ ডাকছে রে, ভিজে যাবে সব, খোলা আছে বুঝি জানলা!'
'এখনো বৃষ্টি আসেনি আগেই ওঠার জন্য ব্যস্ত?'
'রান্না-বান্না কিচ্ছু হয়নি, রাত্তিরে তোরা খাবি কী?'
'সে সব জানি না, পড়ার সময় শুনব না কোনো বায়না।'

কড়া মাস্টার গুটুলি কিছুতে ছাত্রীকে ছুটি দেবে না
মাতৃভাষাটা মাকে শেখাবেই ক্লাস সিক্সের ছেলেটা!

অন্য দেশের কবিতা

সূচিপত্র

অন্য দেশের কবিতা: বিংশ শতাব্দী

প্রথমেই জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই বইতে যাঁরা বিশুদ্ধ কবিতার রস খুঁজতে যাবেন, তাঁদের নিরাশ হবার সম্ভাবনাই খুব বেশি। এ বইতে কবিতা নেই, আছে অনুবাদ কবিতা। অনুবাদ কবিতা একটা আলাদা জাত, ভুল প্রত্যাশা নিয়ে এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক। অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে নানা ব্যক্তির নানা মত আছে, আমি এতগুলি কবিতার অনুবাদক, তবু আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, অনুবাদ কবিতার পক্ষে কিছুতেই বিশুদ্ধ কবিতা হওয়া সম্ভব নয়, কখনও হয়নি। কোলরিজ বলেছিলেন, একটি কবিতার সেইটুকুই বিশুদ্ধ কবিতা, যার অনুবাদ সম্ভব নয়।—সেই বিশুদ্ধ ব্যাপারটি কী তা বুঝতে হলে, আর একটি বিশুদ্ধ কবিতা পড়ে দেখতে হবে, আজ পর্যন্ত কোনও সমালোচক তার বর্ণনা করতে পারেননি। কবিতার সংজ্ঞা, ব্রহ্মেরই মতন, অনুচ্ছিষ্ট। সংজ্ঞা না হোক, এই সরল সত্যটি সর্ববিদিত যে, কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার শব্দ ব্যবহার, বিংশ শতাব্দীর কবিতা সংগীতের প্রভাব কাটিয়ে শব্দের গভীর অর্থের প্রতিই বেশি মনোযোগী, এবং এক ভাষার শব্দ-চরিত্র অপর ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব।

আর একটি স্বীকারোক্তি এই যে, আমি পাঁচটি প্রধান ইয়োরোপীয় ভাষার কবিতা এখানে উপস্থিত করেছি, কিন্তু এই ভাষাগুলির কোনওটিই আমি সম্যক অবগত নই। ইংরেজিতে নানান দ্বি-ভাষা সংস্করণ পাওয়া যায়, আমার প্রধান অবলম্বন সেইসব গ্রন্থাবলী, যেখানে তাও পাওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে শুধু ইংরেজির মাধ্যম থেকেই আহরণ করেছি, মূল ভাষা না জেনে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা, গুরুতর ধৃষ্টতা বা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এজন্য আমি নিজেকে তেমন অপরাধী হিসেবে মনে করি না, তার প্রথম ছোট কারণ, শব্দের সৌকুমার্য যখন ভাষান্তরিত করা অসম্ভব, তখন মূল ভাষা জানার প্রশ্ন জরুরি নয়; দ্বিতীয়ত, আমার আগে এই ধরনের অনুবাদের কাজ বাংলাদেশে করেছেন আরও অন্তত পঞ্চাশজন কবি, যাঁদের শিরোভাগে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশে যাঁরা বিদেশি ভাষায় পণ্ডিত তাঁরা হয় কবিতার অনুবাদ করতে চান না, অথবা কবিতা অনুবাদ করার যোগ্যতা নেই তাঁদের। কিন্তু বিদেশের কবিতার সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের এইজন্যই পরিচিত হওয়া প্রয়োজন যে, তাতে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বুঝতে সুবিধে হবে এবং অহেতুক হীনমন্যতা বা অহংকার কেটে যাবে। সুতরাং, কবিরাই যতদূর সম্ভব প্রস্তুত হয়ে এ-কাজ করছেন। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস, কবিতা পড়ে বোঝার মতন

বিদেশিভাষার জ্ঞান খুব কম লোকের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব, অনুবাদ করা তো দূরের কথা। যে-ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমরা আবাল্য পরিচিত, সেই ইংরেজি কবিতারও সম্পূর্ণ রস আমরা পাই কিনা, সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ এখনও আমার রয়ে গেছে। সমালোচকের সমর্থন না পেয়ে, কোনও নবীন ইংরেজ কবিকে আমরা এখানে প্রশংসা করতে সাহস পাই না। অন্যদিকে বহু বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবিকেও কোনও অজ্ঞাত কারণে গোপনে খারাপ লাগে। অন্যভাষার কবিতার মূল কবিত্ব থেকে পাঠককে বঞ্চিত থাকতেই হয়, যেটুকু পাই, তা হল কবিতার ভিতরের গল্পটুকু, অর্থাৎ বর্ণিত বিষয়ের প্রতি কবির মনোভাব, তাঁর চিন্তার ভঙ্গি, বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, নতুন ধরনের কলাকৌশল, সভ্যতা বা ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে তাঁর দর্শন। এইগুলি জানার জন্য, তিন বছর বা পাঁচ বছর শেখা জার্মান ভাষায় জার্মান কবিতা পড়ে যেটুকু উপকৃত হওয়া যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি উপকৃত হওয়া সম্ভব পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে শেখা ইংরেজি ভাষায় জার্মান কবিতা পড়ে। তারচেয়েও বেশি সুবিধাজনক, মাতৃভাষায় জার্মান কবিতার অনুবাদ পড়া। সুতরাং বিশুদ্ধ কবিতা আস্বাদনের তৃষ্ণা বিশুদ্ধ বাংলা কবিতাতেই নিবদ্ধ রেখে, কিংবা আপাতত ভুলে গিয়ে, উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেই শুধু যাঁরা কৌতূহলী হবেন, তাঁদের কাছে এই অনূদিত কবিতাবলী অকিঞ্চিৎকর হয়তো মনে হবে না।

কবিতার অনুবাদ গুণ সম্পর্কে আমি ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়েও কেন এতগুলি কবিতার অনুবাদ করেছি—সে কারণও আমি জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ দেশ পত্রিকার জন্য বিদেশি কবিতার অনুবাদ করতে আমায় অনুরোধ করেন। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মানুষ চিনতে দু'-একবার ভুল হয়ে যায়, হয়তো সেইরকম কোনও ভুলের বশেই তিনি আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে এরকম গুরুতর কাজের জন্য বেছেছিলেন। তিনি না বললে, এরকম কোনও পরিকল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু আমি এ দায়িত্ব নিতে যে পরাঙ্মুখ হইনি, তার কারণ আগেই বলেছি, এ কাজটাকে আমি খুব গুরুতর মনে করি না। আমি নিজে যেমন অনুবাদ কবিতার কাছে বিশেষ কিছু দাবি করি না, যা দাবি করি, (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তা আমার পক্ষেও পরিবেশন করা সম্ভবত শক্ত নয়। এখানে বিশেষ কোনও প্রতিভা বা মেধার প্রশ্ন নেই, প্রয়োজন শুধু পরিশ্রম। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত ইংরেজি কবিতাই পড়েন, কিন্তু সাম্প্রতিক পৃথিবীর সাহিত্যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে ইংরেজি কবিতার স্থান অনেক নিচুতে। আলস্যবশে, কিংবা সুলভ নয় বলেই আধুনিক ফরাসি-জার্মান-ইতালিয়ান ইত্যাদি কবিতার অনুবাদ সাধারণ পাঠকদের চোখে পড়ে না। আমি সেইসব ভাষার আধুনিক কবিদের নির্বাচন করে, জীবনী সাজিয়ে, সাহিত্যে আন্দোলনগুলির পরিচয় জানিয়ে ধারাবাহিকভাবে কবিতার সচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করছি মাত্র। আমার কৃতিত্ব শুধু পরিশ্রমের। আর কিছু না।

পত্রিকায় প্রকাশের সময়, একজন অচেনা তরুণ আমায় চিঠি লিখে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন এই বলে যে, আমি আমেরিকা মহাদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলুম

বাংলা কবিতা অনুবাদ করার জন্য, সেখানে সে-কাজ না করেই ফিরে এসেছি, অথচ দেশে ফিরেই অন্য দেশের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেছি কেন? উত্তর খুব সরল। আমি ইংরেজি জানি না, কিন্তু বাংলা ভাষা জানি। সাহিত্য পদবাচ্য হবার মতন ইংরেজি আমার পক্ষে ইহজীবনে লেখা সম্ভব নয়, ইংরেজি থেকে যেকোনও বিষয় আমার পক্ষে নির্ভুল বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব। এ কথাটা জানার জন্য আমার পক্ষে আমেরিকা পর্যন্ত যেতে হল কেন? যাবার সুযোগ পেলে কে না যায়? তা ছাড়া, বিদেশে গিয়েই স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, অন্য ভাষায় লেখার চেষ্টা বা অনুবাদ করার চেষ্টার মধ্যে অত্যন্ত দীনতার ভাব প্রকাশ পায়, আমি এরকম চেষ্টা আর কখনও করব না। ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে লাভজনক, কিন্তু সম্মানজনক নয়। পরভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে এরকম উদাহরণ এপর্যন্ত দু'-তিনজন মাত্র, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে এখনও একজনও না। শুভাচার বা অনাচার শুধু মাতৃভাষাতেই সম্ভব।

কবির কাছে তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দই মূল্যবান ও অবধারিত। সেইজন্য কবিতার অনুবাদ আক্ষরিক হওয়াই অনেকের মতে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আক্ষরিক অনুবাদ যে অসম্ভব— তা তো বলাই বাহুল্য, একই কবিতার তিনজনের করা আলাদা অনুবাদ দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। আবার এর চরম বিপরীত উদাহরণ দেখিয়েছেন 'ইমিটেশান্‌স' বইতে রবার্ট লোয়েল। সেখানে তিনি বিখ্যাত বিদেশি কবিদের রচনা অনুবাদ করেছেন সম্পূর্ণ নিজের মতন করে, লাইন ভেঙেচুরে, উলটে-পালটে। এমনকী, বোদলেয়ারের কবিতায় পারম্পর্য বোঝবার জন্য দুটি নিজস্ব স্তবক পর্যন্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, মূলের স্বাদ যখন পাওয়া যাবেই না, তখন অনূদিত কবিতাটি যেন মৌলিক কবিতা হয়ে ওঠে যেকোনও প্রকারে। আমার অনুবাদের পদ্ধতি এইরকম: আমি প্রথমে মূল কবিতা ও ইংরেজি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করেছি, তারপর প্রুফ দেখার সময় মূল কবির কথা প্রায় ভুলে গিয়ে, রচনাটি যাতে বাংলায় সুসহ হয় এইজন্য বেপরোয়াভাবে শব্দ কেটেছি এবং বদলেছি। ফলাফল এখনও দুর্বোধ্য। যেসমস্ত কবিদের রচনা বাংলায় আগেও অনূদিত হয়েছে, আমি যতদূর সম্ভব সেই সমস্ত বাঙালি অনুবাদকদের নাম উল্লেখ করে দিয়েছি। এবং বিদেশের কবিতা সম্পর্কে যাঁরা সত্যিকারের উৎসাহী, তাঁরা অবশ্যই শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' সংকলনটি সংগ্রহ করে পড়ে দেখবেন, সেখানে আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদের করা আরও বহু দেশের বহু সংখ্যক কবিতার অনুবাদ গ্রথিত হয়েছে। আমার এই বইটির যেটুকু আলাদা মূল্য, তা হল, পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ভাষার আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন, মুখ্য চিন্তা, প্রধান কবিদের জীবনী, হৃদয়ের সংবাদ, দুরূহ প্রয়োগের টীকা ইত্যাদি সংক্ষেপে একসঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। অন্য দেশের কবিতা বুঝতে এগুলি নিশ্চিত সহায়ক। প্রত্যেক ভাষা নিয়ে আলাদা বই বার করলে কাজ আরও সুষ্ঠু সম্পূর্ণ হত। আশা করে রইলুম, অন্য কেউ পরে সে কাজ করবেন।

এই বই পড়ে পাঠকদের যদি কোনও লাভ হয়, খুবই সুখের কথা। আমার অন্তত যথেষ্ট উপকার হয়েছে। প্রায় একবছর ধরে নানান দেশের কবিদের রচনা ও জীবনের সঙ্গে জড়িত থেকে তাদের সঙ্গে কীরকম যেন আত্মীয়তা হয়ে গেছে। এই গ্রন্থের অনেক কবিকে এখন আমার ব্যক্তিগত বন্ধুর মতন মনে হয়।

কবিদের নির্বাচন করার সময় কখনও সমালোচকদের সাহায্য, কখনও ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেছি। স্প্যানিশ কবিতায় গেব্রিয়েলা মিস্ত্রাল কিংবা জার্মান কবিতায় নেলি শাখ্‌স-এর রচনা আমি গ্রহণ করিনি, কারণ ওঁদের খ্যাতি ও সম্মানের কারণ শুধু সাহিত্য নয়। আবার, ফরাসি কবিতায় সুররিয়ালিজম আন্দোলনের নেতা ও প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেঁতো কিংবা ইতালির ফিউচারিজম আন্দোলনের হোতা ফিলিপ্পো মেরিনেত্তি—যাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন পৃথিবীর সমকালের মহাকবিরা—এঁদের কবিতা যে আমি অন্তর্ভুক্ত করিনি, তার কারণ, সাহিত্যে এঁরা নতুন দর্শনের সৃষ্টি করে গিয়েছেন, কিন্তু কবি হিসেবে কালোত্তীর্ণ হতে পারেননি। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ইস্তাহারগুলি ইতিহাসের সামগ্রী হতে পেরেছে, তার থেকে কিছু নমুনা এখানে উদ্ধার করছি।

ফিউচারিস্টিক মেনিফেস্টো

১. বিপদকে ভালোবাসা, বিপদের অভ্যাস এবং হঠকারী দুঃসাহসের গান আমরা গাইতে চাই।

২. আমাদের কবিতার মূল উপাদান হবে, সাহস, অকুতোভয়তা এবং বিদ্রোহ।

৩. চিন্তামগ্ন জড়তা, আনন্দ এবং ঘুম— সাহিত্য এপর্যন্ত এগুলোকেই উদ্ভাসিত করে দেখিয়েছে। এবার আমরা তুলে ধরব, আক্রমণ, আচ্ছন্ন অনিদ্রা, খেলোয়াড়ের পদক্ষেপ, বিপজ্জনক লাফ, কানমলা এবং ঘুষোঘুষি।

৪. আমরা ঘোষণা করছি যে পৃথিবীর বিস্ময় সম্প্রতি ধনী হয়েছে এক নতুন সৌন্দর্যে: গতির সৌন্দর্য। কামানের গোলার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়া একটি গর্জমান মোটরগাড়ি "ভিকট্রি অব সামোথরেসের" চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

৫. স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে যে মানুষ তার গান গাইতে চাই— যার আদর্শ দণ্ড ভেদ করে যাচ্ছে পৃথিবী, যে তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান।

৬. বিলাসী অপব্যয়, উজ্জ্বলতা ও তাপে কবি নিজেকে নিঃশেষ করতে বাধ্য—যাতে আদিম উপাদানগুলির জ্যোতি উজ্জীবিত হয়।

৭. যুদ্ধ ছাড়া আর কোথাও কোনও সৌন্দর্য নেই। আক্রমণকারীর চরিত্র ছাড়া কোনও মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। কবিতাকে হতে হবে অজ্ঞাত শক্তির বিরুদ্ধে হিংস্র আঘাত যাতে তারা মানুষের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে।

৮. আমরা সমস্ত শতাব্দীর দূর উপকূলে দাঁড়িয়ে আছি! আমাদের তো কাজ

অসম্ভবের রহস্যময় দ্বার ভেঙে ফেলা, সুতরাং পেছনে তাকিয়ে কী লাভ? টাইম এবং স্পেস গতকাল মারা গেছে। আমরা এখনই বেঁচে আছি অনন্তের মধ্যে, কারণ আমরা ইতিমধ্যে সৃষ্টি করেছি শাশ্বতের সদা জাগ্রত গতি।

৯. আমরা গৌরবময় করতে চাই যুদ্ধ—যুদ্ধেই পৃথিবীর একমাত্র স্বাস্থ্য ভালো থাকে— সামরিক শাসন, দেশাত্মবোধ, সন্ত্রাসবাদীর ধ্বংসচেষ্টা, হত্যার মহৎ আদর্শ, নারীর ঘৃণা।

১০. মিউজিয়াম, লাইব্রেরিগুলো ধ্বংস করব আমরা, যুদ্ধ করতে হবে নীতিবাদ, নারীর স্বাতন্ত্র্য আর সব সুবিধাবাদী, উপকারবাদী কাপুরুষতার বিরুদ্ধে—ইত্যাদি।

ফিলিপ্পো মেরিনেত্তির এই ইস্তাহারের অনেকখানিই এখন ছেলেমানুষি মনে হতে পারে। কিন্তু এর সারবস্তু, পুরনো বিশ্বাসের প্রতি উচ্চারিত বিদ্রোহ ও ভাঙনের আহ্বান অন্যান্য প্রতিভাবান কবিদের প্রেরণা দিয়েছিল একসময়। এই ছেলেমানুষির বশেই মেরিনেত্তি কবিতার আঙ্গিকে যেসব উদ্ভট ভাঙাচোরা ও রীতিবদলের চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তাঁর নিজের কবিতা সার্থক হয়নি কিন্তু অপর কবিদের নতুন রীতি প্রণয়নে সাহায্য করেছে। মেরিনেত্তি নিজের কাছেও পরাজিত হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, এতসব বিদ্রোহের কথার পরও— তিনি স্বয়ং যোগ দিয়েছিলেন মুসোলিনির ফ্যাসিস্ত দলে, প্রচুর খেতাব ও সরকারি সম্মান পেয়ে ব্যর্থসুখে কাটিয়েছেন বৃদ্ধ বয়েস। ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রথম ছাপা হয়েছিল প্যারিসে, ১৯০৯ সালে।

আঁদ্রে ব্রেঁতো-র সুররিয়ালিস্ট মেনিফেস্টো—প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৯২৪-এ, তারপর তিনি আবার লিখেছিলেন দ্বিতীয় মেনিফেস্টো, দীর্ঘদিন পরে তিনি আবার সমগ্রভাবে সুরারিয়ালিজমের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখেন। সে দীর্ঘ রচনার অনুবাদ এখানে সম্ভব নয়, তবে তার সারমর্ম আমি বিভিন্ন সুররিয়ালিস্ট কবিদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

ছোট ছোট শাখা আন্দোলনগুলির প্রতিভূ হিসেবে আমি একজন বা দু'জনকে বেছে নিয়েছি; কিন্তু সব সময় তাঁরাই যে সে দলের শ্রেষ্ঠ কবি এমন নয়। যাঁদের কবিতা অনুবাদে কিছুই বোঝা যায় না, তাঁদের বাদ দিয়ে আমার পক্ষে সুবিধাজনকদেরই নির্বাচন করেছি। যেমন জার্মানিতে অগুস্ট স্ট্রাম একজন প্রধান কবি, কিন্তু তাঁর কবিতা অনুবাদে প্রায় অর্থহীন দাঁড়ায়, এইরকম:

যুদ্ধক্ষেত্র

উৎপন্ন কাদা ফিসফিসিয়ে লোহাকে ঘুম পাড়ায়
রক্ত চাপ বাঁধে সেখান থেকে তারা গড়াচ্ছিল
মরচে গুঁড়োয়

মাংস থিক থিক
লোভ চোষে ক্ষয়ের চারপাশে।
হত্যার ওপর হত্যা
চোখ মারে
ছেলেমানুষি চোখে।

অনেক কবির দীর্ঘ কবিতা সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে পারিনি, কারণ আমি ধৈর্যহীন। তবে, তথ্য, তারিখে যাতে ভুল না থাকে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কোনও ত্রুটি কারুর চোখে পড়ে সে সম্পর্কে আমাকে উপদেশ বা পরামর্শ জানালে কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ করব। অকপটে স্বীকার করি, নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে আমার কোনও ভুল ধারণা নেই এবং সত্যিই খুব সংকোচের সঙ্গে এই বইটি প্রকাশ করছি।

নানা সময়ে আমাকে বই দিয়ে সাহায্য করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, জ্যোর্তিময় দত্ত, বেলাল চৌধুরী, শুদ্ধশীল বসু। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ফরাসি কবিতা: সুররিয়ালিজমের উন্মেষ

ত্রিস্তান জারা নামে একজন তরুণ রুমানিয়ান, উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন সুইটসারল্যান্ডে। জুরিখের 'ক্যাবারে ভলতেয়ার' নামে এক রেস্তোরাঁয় ত্রিস্তান নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সাহিত্য-আন্দোলনের নামে প্রচুর হই-হুল্লোড় শুরু করে দিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে। মানুষের বিশ্বাস, নীতি, আশা, মমতাবোধ বিপন্ন ধ্বংসের কাছে। বস্তুত, প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত পৃথিবীর মানুষের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশি প্রচণ্ডভাবে লেগেছিল— কারণ, সেই প্রথম সভ্য পৃথিবীতে ব্যাপক মহাযুদ্ধ— তাও দীর্ঘদিন শান্তির পর, অকস্মাৎ। যুদ্ধের নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় বহু সাধারণ মানুষ এমনিতেই পাগল হয়েছিল—সুতরাং কবি-শিল্পীদের মধ্যে খানিকটা পাগলামি দেখা দেবে— সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। ত্রিস্তান জারা তাঁর পাগলামির আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন ডাডা (পরে ডাডাইজম নামে পরিচিত)— কথাটা ডিকশনারি থেকে হঠাৎ তুলে নেওয়া, চলতি অর্থ খেয়াল-খুশিতে যা ইচ্ছা করা, অর্থাৎ কথাটার কোনও মানে নেই— সেইটাই ওঁরা চেয়েছিলেন, ত্রিস্তান চেয়েছিলেন তাঁর আন্দোলনের কোনও উদ্দেশ্য থাকবে না, কোনও অর্থ না, কোনও কারণ না— সম্পূর্ণ নৈরাজ্য।

কিন্তু ত্রিস্তান ভেবেছিলেন, তাঁর আন্দোলন একটা বিশাল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। খুব লম্বা লম্বা চিঠি লেখা তাঁর স্বভাব ছিল, এন্তার চিঠি লিখতে লাগলেন জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকার তরুণ লেখক-শিল্পীদের কাছে— তাঁর বিপ্লবে যোগদান করার জন্য। শেষ পর্যন্ত জুরিখ শহর তাঁর কাজের তুলনায় খুব ছোট জায়গা মনে হওয়ায়, সদলবলে চলে এলেন সভ্যতার মুকুটমণি প্যারিসে।

এই সময় প্যারিসে একজন ডাক্তারি ছাত্র, আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে— লুই আরাগঁ, পিলিপ সুপো ইত্যাদি— একটি চটি পত্রিকা বার করতেন, নাম 'সাহিত্য'। এই তরুণ দল ছিলেন কিছুটা বিক্ষুব্ধ, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রতি আস্থাহীন, অস্থির, ক্রুদ্ধ। পল ভালেরির মতো মহৎ কবিও তখন অ্যাকাডেমিতে সদস্যপদ পাবার জন্য তদারকিতে ব্যস্ত, সুতরাং তরুণরা ওঁর প্রতি খানিকটা নিরাশ, পল ক্লোদেলের মতো বড় কবিও তখন সদ্য ক্যাথিলিক হয়ে চরম গোঁড়া হয়ে উঠেছেন—(আঁদ্রে জিদ ক্লোদেল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'উনি আগে ছিলেন সূক্ষ্ম পেরেক, এখন হয়েছেন হাতুড়ি!') এবং আঁদ্রে জিদ—যাঁর রচনায় তরুণরা অনেক সময় আত্মপ্রতিকৃতি দেখতে পেয়েছে—তিনিও কিছুটা ঈষদুষ্ণ। একমাত্র যে বিশাল, দুর্দান্ত, বল্‌গা-হীন,

কুসুম-কোমল কবিকে (তখন প্রায় অপরিচিত) তরুণরা মনপ্রাণ সঁপে ছিল, সেই গিয়ম আপোলিনেয়ার যুদ্ধ থেকে মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে ফিরে, যুদ্ধ বন্ধ হবার ঠিক আগের দিন হাসপাতালে মারা গেলেন। আর, মার্শেল প্রুস্ত যদিও 'সাহিত্য' কাগজে লিখলেন না—কিন্তু বারো পাতার চিঠি লিখে সমর্থন জানালেন।

সুতরাং ত্রিস্তান জারার হইহই দলের সঙ্গে প্যারিসের যুবারা একসঙ্গে মিলে গেলেন। শুরু হল ডাডাইজমের নামে অনেক উদ্ভট কাণ্ড, রাস্তাঘাটে গোলমাল, থিয়েটারে গিয়ে চেঁচামেচি, পথের উপর বসে পড়ে কবিতা লেখা—খবরের কাগজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যাবতীয় চেষ্টা। ত্রিস্তান জারার বিখ্যাত উক্তি, 'সব রকম নিয়মের অভাবও একটা নিয়ম— এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম'— তরুণদের খুব মনে লেগেছিল।

কিন্তু ফরাসি দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনেও বহুরকম পাগলামি প্রশ্রয় পেতে পারে— কিন্তু সাহিত্য-আন্দোলনে সাহিত্য ছাড়া অন্য উপসর্গ বেশিদিন মনোযোগ পায় না। ত্রিস্তানের নৈরাজ্য অবিলম্বেই একঘেয়ে হয়ে গেল। তখন আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর দলবল নিয়ে সরে দাঁড়ালেন, শুরু করলেন নতুন শিল্প-আন্দোলন, ১৯২৪-এ প্রকাশিত হল প্রথম সুররিয়ালিজমের ইস্তাহার। এবং সুররিয়ালিজম এ-শতাব্দীতে এপর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবান শিল্পদর্শন।

সুররিয়ালিজম শব্দটা ব্রেতোঁ পেয়েছিলেন আপোলিনেয়ারের রচনায়— কিন্তু এর বীজ ছিল আরও অনেক আগে হ্র্যাম্বোর লেখায় বা আরও আগে নার্ভাল, বালজাকের মধ্যে। পৃথিবীর সেই চরম বিস্ময়কর কবি, দুর্দান্ত বখাটে বালক হ্র্যাম্বো— আজ সুররিয়ালিজমের প্রধান পুরুষ, সিমবলিস্টদের প্রধান হিসেবে খ্যাত, এমনকী এক্‌জিস্‌টেনশিয়ালিজমের প্রবক্তা হিসেবেও গণ্য, আবার ক্লোদেল ওঁর রচনা পড়েই ক্যাথলিক হবার প্রেরণা পেয়েছেন। (Rimbaud বাংলায় লেখা হয় র‍্যাঁবো। কিন্তু দেখেছি ফরাসিরা ও উচ্চারণ শুনে চিনতেই পারে না। ওরা যেভাবে উচ্চারণ করে— সেটা বাংলায় লিখলে অনেকটা শোনায় হ্র্যাম্বো। আমি বিদেশি উচ্চারণের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে নই, জ্ঞানও খুবই কম, নিতান্ত নতুনত্বের লোভেই র‍্যাঁবোর বদলে হ্র্যাম্বো লিখতে মাঝে মাঝে লোভ হয়।)

সুররিয়ালিজমের মূল বক্তব্য, কবিকে হতে হবে দ্রষ্টা, সে শুধু ভবিষ্যৎ দেখবে না— দেখবে নিজের অন্তঃকরণ, ছায়া, মগ্নচৈতন্য— হৃদয় খুঁড়ে জাগাবে বেদনা, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, ললাটলিপির মতো যুক্তিহীনতা। এই সময় সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এনে দিয়েছিলেন অবচেতনার ধারণা, ব্রেতোঁ নিজেও ছিলেন মনোবিজ্ঞানী— সেই থেকে আসে লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, মাদক সেবনের পর পারম্পর্যহীন প্রতিফলনের লিখিত রূপ— অটোমেটিক রাইটিং বা কলম হাতে নিয়ে বসে থাকার সময় যাবতীয় বিদ্যুৎস্মৃতি ধরে রাখা। সব প্রয়াস সফল হয় না, কিন্তু বহু দুর্লভ কবিতা বা ছবি এর থেকে বেরিয়ে এসেছে। অবচেতনের উদ্ধার— এ ছাড়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে মেলাবার আর কোনও উপায় নেই সাহিত্যে।

আমাদের ভারতবর্ষে সুররিয়ালিজমের প্রভাব যথাকালে আসেনি। অথচ এ তো ভারতবর্ষেরই। সুররিয়ালিজমের মূল খুঁজতে অনেক চলে গেছেন প্রাচীন গ্রিসে— যেখানে ডেল্‌ফির দেবতা সক্রেটিসকে বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো'। কিন্তু তারও বহু আগে আমরা শুনেছিলাম 'আত্মানং বিদ্ধি'। ধ্যানের সাহায্যে অপরলোকে উত্থান, শরীর ছাড়িয়ে গিয়ে দৈববাণী শ্রবণ, বেদ যে কারণে অপৌরুষেয়, অ্যালকেমির সমান্তরাল তান্ত্রিক উপাসনা— ইত্যাদি। কিন্তু সাহিত্যে আমরা এগুলো ভুলে গেছি অনেকদিন, সম্ভবত ইংরেজদের প্রভাবে। ইয়োরোপে যখন আত্মার পুনরাবিষ্কার হয়, আমরা তখনও তাকে গ্রহণ করতে পারিনি।

সুররিয়ালিজমের প্রভাব পড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, ক্রমে বিভিন্ন মহাদেশে—। দলগত আন্দোলন হিসেবে সুররিয়ালিজম বেশিদিন টেঁকেনি। ক্রমে এসে যোগ দিয়েছিলেন পল এলুয়ার, জাক প্রেভের, আন্টোনিন আর্তো, হ্রেনো শার— প্রমুখ। শিল্পীদের মধ্যে মিরহো, মাক্স আনর্স্ট, চিরিকো, পিকাবিয়া, টালি, ম্যান রে, সালভাদর দালি প্রমুখ। প্রথম দল ভাঙতে শুরু করে, ব্রেতোঁ যখন রাশিয়ার দৃষ্টান্তে কমিউনিজম সমর্থন করলেন। পরে অবশ্য, ব্রেতোঁর আশাভঙ্গ হয়েছিল এবং কমিউনিজমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তখন ভাঙা দল আর জোড়া লাগেনি। এ ছাড়া, কবিদের মধ্যে যা খুব স্বাভাবিক— ছিল ক্ষমতার লড়াই ও ঈর্ষা— আঁরি মিশোর মতো বড় কবি যেমন ব্রেতোঁর নেতৃত্বে কখনও সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দিতে চাননি, বরং প্রকাশ্যে নিন্দে করেছেন, কিন্তু উত্তরকাল জানে মিশো মনেপ্রাণে সুররিয়ালিস্ট। এ আন্দোলনে চরম আঘাত হানেন ১৯৪০-এ জাঁ পল সার্ত্র, তাঁর অস্তিত্ববাদ দিয়ে— নতুন করে জেগে ওঠার জন্য আমেরিকার নির্বাসন ছেড়ে আঁদ্রে ব্রেতোঁ আবার প্যারিসে এসে তাঁর 'সিংহের কেশর' নেড়ে ভাঙা দল জোড়ার চেষ্টা করলেন— কিন্তু, ততদিনে দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

কিন্তু দল হিসেবে অস্তিত্ব না থাকলেও আদর্শ হিসেবে প্রবলভাবে আছে। সারা পৃথিবীর সচেতন লেখকদের মধ্যে এমন বোধহয় একজনও নেই— যিনি সুররিয়ালিজমকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারবেন। যোগাযোগহীন হলেও বাংলাদেশের জীবনানন্দ দাশ এই জাতের কবি। এরপর আর কোনও নতুন সাহিত্য-দর্শন পৃথিবীতে আসেনি। এমনকী ইংল্যান্ডের অ্যাংরি ইয়ংমেন এবং আমেরিকার বিট জেনারেশন— সেই সুররিয়ালিস্টদেরই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের পুনঃপ্রকাশ। সুররিয়ালিস্টদের মধ্যে কে কত বড় লেখক ছিলেন এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে— কিন্তু এদের আদর্শ প্রভাবিত করেছে পৃথিবীর মহত্তম লেখকদের।

সুররিয়ালিস্টদের আর একটি বড় কীর্তি, গদ্যের কবল থেকে কবিতার উদ্ধার। গত শতাব্দী থেকে শুরু হয় গদ্যের প্রবল প্রচার, উপন্যাসের রবরবা— এবং উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন হল যুক্তি এবং বাস্তবতাবোধ, প্রতিটি পরিচ্ছেদের সামঞ্জস্য, যার চরম প্রকাশ ডিটেকটিভ নভেলে— যেখানে প্রতিটি কথা এবং প্রত্যেক মানুষের চলাফেরার মধ্যেই একটা ছদ্ম কারণ দেখানোর চেষ্টা। এর সঙ্গে

পাল্লা দিতে গেলেই কবিতার সর্বনাশ। ব্রেতোঁ এইজন্য উপন্যাসকে বলতেন 'দাবা খেলা'। কবিতার মুক্তি অলৌকিকে, রহস্যে, স্বপ্নের মতো আপাত যুক্তিহীনতায়। সুররিয়ালিস্টরা এই জন্য আক্রমণ করেছিলেন ধর্মকে (খ্রিস্টধর্ম)— নিৎসের 'ঈশ্বরের মৃত্যু'ও ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন— কারণ ঈশ্বরের মৃত্যু আনতে হলে— ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানতে হয়, নচেৎ যা ছিলই না তার মৃত্যু হয় কী করে। খ্রিস্টধর্মে অলৌকিক বা রহস্যের স্থান নেই, যেমন অডেন 'হোমেজ টু ক্লিয়ো' কবিতায় লিখেছেন:

> A Christian ought to write in prose
> For poetry is Magic......

সুররিয়ালিস্টের দল প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন রহস্যের, স্বপ্নের, আলোছায়ার (যার প্রভাবে পাশ্চাত্যের বহু লেখক ঝুঁকেছেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে)— এবং ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সাহিত্যের তথাকথিত বাস্তবকে— এবং শুধু কবিতায় নয়— এই রহস্যময়তা ছড়িয়ে গেল চিত্রশিল্পে, ফিল্মে, নাটকে— সুররিয়ালিস্টদের অন্যতম প্রধান আন্টোনিন আর্তো আজ পৃথিবীর আধুনিক নাট্যকারদের— ব্রেখট, বেকেট আয়োনেস্কো, জেনে— এঁদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। এই আক্রমণের হাতে অসহায় হয়ে গিয়ে ফরাসি গদ্যও অনেক যুক্তি ত্যাগ করে আশ্রয় নিল 'নিউ নভেল' আন্দোলনে, এবং সারা পৃথিবীর আধুনিক উপন্যাসই আজকাল আর তথাকথিত বাস্তব বা যুক্তিপ্রধান নয়।

সুররিয়ালিজম আন্দোলন যে আমাদের দেশে যথাসময়ে আসেনি— তাতে যে আমাদের সাহিত্যের কোনও ক্ষতি হয়েছে তা নয়। প্রত্যেক সাহিত্যেরই একটা নিজস্ব গতি আছে, বাংলা সাহিত্য সেই নিজস্ব মহিমায় অগ্রসর হয়েছে, এবং আন্দোলন না হয়েও ব্যক্তির আবিষ্কার চলেছে বাংলা গদ্য ও কবিতায়। সেদিক থেকে কলকাতা-প্যারিস-নিউ ইয়র্ক এক, দান্তে যেমন বলেছিলেন, পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই অচেনা কবি মাঝে মাঝে মুখোমুখি কথা বলে।

গিয়ম আপোলিনেয়ার

[মা পোলিশ, বাবা ইতালিয়ান, উভয়ের বিবাহ হয়নি, আপোলিনেয়ার বাবাকে ভালো চিনতেন না। তিনি নিজের নাম নিজে ঠিক করেছিলেন। জন্ম ১৮৮০, শরীরে এক বিন্দু ফরাসি রক্ত নেই, উচ্চশিক্ষা পাননি, কিন্তু আপোলিনেয়ার খাঁটি ফরাসি কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। জীবনটা অনেক ব্যর্থ-প্রেমের মালা, বিশাল চেহারা ছিল, আমুদে— হই-হুল্লোড়ে, নিজের উৎসাহে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, মাথায় গোলার ঘা খেয়ে ফিরে আসেন, সে আঘাত সারেনি, বিয়ে করলেন— তার ছ' মাস পরেই যুদ্ধ থামার আগের দিন মৃত্যু। ওঁর শব বহে নিয়ে গিয়েছিলেন পিকাসো এবং অন্যান্য শিল্পী-বন্ধুরা। নিজে ছিলেন বলিষ্ঠ শিল্প সমালোচক, কবি হিসেবে জীবিতকালে প্রায় অপরিচিত, এখন খ্যাতির শীর্ষে।

ভালোবাসায় নিবেদিত জীবন

হায় রে আমার পরিত্যক্ত যৌবন
শুকনো ফুলের মালা
এখন অন্য ঋতুর আসার পালা
সন্দেহ আর জ্বালা

নানা ক্যানভাসে এ ছবি সাজানো
নকল রক্তধারা
একটি বৃক্ষে ফুলের মতন ফুটে আছে বহু তারা
নীচে কেউ নেই এক বিদূষক ছাড়া

শীতল রশ্মি পারিপার্শ্বিকে খেলে ঝরে যায়
তোমার চিবুকে ভাসে
গুলির শব্দ চিৎকার উঠে আসে
আঁধারে একটি আঁকা-মুখ একা হাসে

এ ছবির ফ্রেমে বাতাসের কাচ ভাঙা
অচেনা হাওয়ার সুর
ভাবনা এবং ধ্বনির মধ্যে করে এসে ঘুরঘুর
স্মৃতি ও ভবিষ্যতের ভিতরে ঘুরে যায় বহু দূর

হায় রে আমার পরিত্যক্ত যৌবন
শুকনো ফুলের মালা
এখন অন্য ঋতুর আসার পালা
পরিতাপ আর যুক্তির বহু জ্বালা

বন্ধন

চোখের জলে তৈরি করা রজ্জু
সারা ইওরোপ জুড়ে ঘণ্টা বাজে
শতাব্দীরা ফাঁসিতে ঝুলছে

আমরা মাত্র দু'জন কি তিনজন মানুষ
সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত
এসো আমরা হাত ধরে থাকি

ভয়ংকর বৃষ্টি চিরে যায় ধোঁয়া
দড়ি
পাকানো দড়ি
সমুদ্রের নীচে টেলিগ্রাফের তার
ব্যাবেলের স্তম্ভগুলি বদলে হয় সেতু

মাকড়সা—মোহান্ত
এক সূত্রে সমস্ত প্রেমিকরা বাঁধা
আরও সব সূক্ষ্ম বন্ধন
আলোর সাদা রেখা
সুতো ও সমতা

হে অনুভব হে প্রিয় অনুভব
স্মৃতির শত্রু
বাসনার শত্রু
অনুতাপের শত্রু

অশ্রুর শত্রু
আমার সমস্ত প্রিয় জিনিসের শত্রুরা
আমি শুধু তোমাদেরই গৌরব দিতে লিখে যাই

[আপোলিনেয়ার কবিতায় সাধারণত কমা, ফুলস্টপ ব্যবহার করতেন না। প্রথম কবিতার মূল নাম লাতিনে, Vitam Impendere Amori, তাঁর দ্বিতীয় গান, অনূদিত হল, পরপর লাইনে মিল ছিল, অনুবাদের সময় আমার হাতে অন্যরকম মিল এসে গেছে। এ কবিতা লেখার সময় কবির বয়স সবে তিরিশ পেরিয়েছে, মারি লরাঁসাঁ নামে শিল্পীর সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের পর, সেইজন্যই এ কবিতায় ওইরকম ছবির উল্লেখ। আপোলিনেয়ারও আলফ্রেড দে মুসের মতো এক নারী থেকে অন্য নারীতে ভালোবাসার পর্যটনে বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয় কবিতার নাম Liens, অমিল মুক্ত-ছন্দে লেখা, শেষ স্তবকের প্রথম লাইনটি আমি অনুবাদে ইচ্ছে করেই একেবারে স্তবকের শেষে বসিয়েছি।]

আন্টোনিন আর্তো

[আর্তোর কবিতা আজকাল অনেক সংকলনে থাকে না, কারণ আর্তো তাঁর প্রতিভা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বহু ধারায়, কবিতা, নাটক, নাটকে অভিনয়, পরিচালনা, ফিল্ম, চিত্রনাট্য লেখা, সমালোচনা; বিশেষত অভিনয়। এ ছাড়া জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান বছর কেটেছে পাগলা গারদে। কিন্তু আর্তোর প্রভাব এখন পৃথিবীর অনেক কবির রচনায়, বিশেষত আমেরিকায় খুব প্রবল। এ ছাড়া আধুনিক নাটকে তাঁর চিন্তা বিশেষ সম্মানিত।

জন্ম ১৮৯৬, ভালো ছাত্র ছিলেন, কবিতা লেখা শুরু ১৪ বছর বয়সে, এর চার বছর পরেই মেলানকলিয়া রোগ, দু' বছর কাটে মেন্টাল হোমে, সেই থেকেই ধারাবাহিক অসুস্থতার শুরু।

সুররিয়ালিস্ট দলের এক সময় তিনি ছিলেন সবচেয়ে জীবন্ত, দুর্দান্ত, তীব্র বেপরোয়া সদস্য। এক সংখ্যা 'সুররিয়ালিজম বিপ্লবের' তিনিই সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বিচ্ছেদ হয়ে যায়, যখন ওঁরা সাম্যবাদ সমর্থন করেন। আর্তো মনে করতেন, এই নোংরা বাস্তব পৃথিবী নিয়ে মাথা ঘামানোই অশুচি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বুর্জোয়া কিংবা সর্বহারাদের হাতে থাকল— এতে তাঁর কিছু যায় আসে না। এই বিচ্ছেদ এত উগ্র যে, পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, আঁদ্রে ব্রেতোঁর দল ইস্তাহার ছাপিয়ে একান্তে ওঁর নাম কেটে দেন, এবং আর্তো ওঁদের বললেন ভণ্ড ও জোচ্চোর, তাঁর ব্যক্তিগত সুররিয়ালিজমের ধারণাই সৎ এবং খাঁটি, 'নতুন ম্যাজিক'।

বহু নাটকে অভিনয় করেছেন, নিজের শরীরে বহু মাদক পরীক্ষা করেছেন, সব সময় তাঁর মনে হত নিজের ভাবনার উপযোগী শব্দ পাচ্ছেন না, কে যেন তাঁর শব্দগুলি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই থেকে মাথার যন্ত্রণা শুরু হত। কারুর সঙ্গে ঠিক মানিয়ে চলতে পারতেন না, নিজের মতামত এমন দৃঢ়। বিষম আকর্ষণ ছিল প্রাচ্য দর্শনে। শেষবার শুভানুধ্যায়ী এবং

বন্ধুবান্ধবরা প্রায় জোর করেই পাগলা গারদে ভরে দেন, খুব আপত্তি ছিল, আর্তো ভেবেছিলেন এসব ষড়যন্ত্র, সেখান থেকে পেনসিলে রক্ত-ঝরানো চিঠি লিখেছেন, যার প্রতিটি অনুবাদযোগ্য। সেখান থেকে ছাড়া পাবার দু'বছর পর ১৯৪৮-এ দুঃখিত মৃত্যু। Antonin Artaud-এ প্রথম নামের উচ্চারণ আমি শ্রুতিনির্ভর করে লিখেছি। এ নাম সম্ভবত ফরাসিদের হয় না, গ্রিক; কারণ আর্তোর বাবা ফরাসি হলেও মা গ্রিক বংশের রমণী।]

একটি কবিতা

আমার সঙ্গে আছেন ঈশ্বর-কুকুর, আর তাঁর
ত্রিশূলের মতো জিভ বিদ্ধ করে আছে
যা তাকে সব সময় চুলকুনি দিয়েছে
পৃথিবীর দুই ভাঁজ গম্বুজের আস্তর।

এবং এখানে এক জলের ত্রিভুজ
ছারপোকার গতি নিয়ে হাঁটে
কিন্তু নীচে, ছারপোকাও বদলে যায় জ্বলন্ত কয়লায়
আর জল ছুরির মতন বিদ্ধ করে।

কুৎসিত বিশ্বের দুই স্তনের গভীরে
ঈশ্বর-কুক্কুরী লুকিয়েছে
পৃথিবীর বুক আর বরফের জল
পচন ধরায় সেই শূন্যগর্ভ জিভে।

আর এক কুমারীর এক হতে হাতুড়ি
আসছেন পৃথিবীর গুহাগুলি ধ্বংস করে দিতে
সেখানে মাথার খুলি তারকা-কুকুরের
বোধ করে বীভৎস সমতার জেগে ওঠা।

[ইচ্ছে করেই ছন্দ-মিল দিয়ে সুখপাঠ্য করা হল না অনুবাদটি। কারণ আপাত-অর্থহীনতা ও রুক্ষ কর্কশতা কবিতাটির সৌন্দর্য। যদিও মূল কবিতায় মিল আছে। দ্বিতীয় লাইনে বর্শা জাতীয় অস্ত্র ছিল, কিন্তু আমি পৃথিবী বিদ্ধ করার ইমেজের জন্য ত্রিশূল ব্যবহার করেছি। 'ঈশ্বর-কুকুর' অর্থে হয়তো ইজিপসীয় দেবতা আনুবিশ, সমাধিভবনের রক্ষক, তাঁর জিভ—

চিন্তার গমনপথ, ত্রিভুজ— সংসার, শরীর ও আত্মা, ছারপোকার মতো রক্তশোষক— যে শুধু একরকম সৌন্দর্য দেখাতে পারে। ছুরি জিভ ইত্যাদি পুরুষত্ব-প্রতীক শব্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগাবার জন্য কয়েকটি নারীত্ব-প্রতীক শব্দ আছে। পুরো কবিতাটিই এক হিসেবে চিন্তা ও লিখিত শব্দের দ্বন্দ্বের কথা। কবি আর্তো অর্ধেক ঈশ্বর ও অর্ধেক জানোয়ার— এই পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে একা বসে দেখছেন স্থূল, অকিঞ্চিৎকর বাস্তবের জেগে ওঠা।]

পল ভালেরি

[যদিও আপোলিনেয়ার দিয়ে এই পর্যায়ের অনুবাদ শুরু কিন্তু ক্লোদেল ও ভালেরিকে অন্তর্ভুক্ত না করলে ফরাসি কবিতার কোনও আলোচনাই হয় না। ভালেরি এই শতাব্দীর গভীরতম কবি। তাঁর নিজের নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ যদিও একটি ছোট সংকলনে এঁটে যায়, কিন্তু পৃথিবীর কবিতায় তাঁর স্থান চিরকালের। জন্ম ১৮৭১-এ, মুগ্ধ হয়েছিলেন এডগার এলান পো-র কবিতায় (তাঁর নিজের রচনা যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের)। মালার্মের বাড়ি সন্ধেবেলার সাহিত্য-আড্ডায় যেতেন যুবক ভালেরি, তারপর কী কারণে যেন বহুদিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফিরে এলেন বহু বছর পর, এবং তখন থেকে প্রতিটি কবিতা অসাধারণ। কবিতার ইতিহাসে এমন ত্যাগ করে আবার বহু পরে সার্থকতর হয়ে ফিরে আসার উদাহরণ আর দ্বিতীয় নেই। অঙ্ক ও বিজ্ঞানচর্চায় ছিল তাঁর আত্মার আনন্দ। ছিলেন সমালোচক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক আকাডেমির সদস্য, প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। মৃত্যু ১৯৪৫।

ভালেরির নাম যতটা পরিচিত, তাঁর কবিতা তত পঠিত নয় ফরাসি না-জানা মানুষের। অনুবাদের সম্পূর্ণ বাইরে তাঁর কবিতা। ইংরেজিতেও সার্থক অনুবাদ নেই। বাংলাতেও অনুবাদ খুব কম। 'সমুদ্রের পাশে কবর' নামে তাঁর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও কঠিন কবিতা, যেটির অর্থান্তর নিয়ে সময় কাটানো বহু গবেষক ও বিশেষ পাঠকদের ব্যসন, একটি অতি-ব্যক্তিগত কবিতা, সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভালেরি বিশ্বাস করতেন, কবিতা লেখা কোনও সৃষ্টি বা প্রেরণার ব্যাপার নয়, অঙ্কের মতো নির্মাণ ও নির্বাচন। বলা বাহুল্য, তাঁর কবিতা বহু জায়গায় তাঁর এই মতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এসে গেছে কবিত্বের আবেগ ও মর্মস্পর্শিতা। আমরা এখানে একটি কবিতার অনুবাদ করছি শুধু এইটুকুই দেখাবার জন্য যে, ভালেরির কবিতার কীভাবে তন্নতন্ন অর্থ করতে চান সমালোচকেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভালেরির শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'লা যন্‌ পার্ক' অর্থাৎ 'তরুণী ভাগ্য', ৫১২ লাইনের একটি বিস্ময়কর রচনা, যেটি নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীতে ফরাসি ভাষার সবচেয়ে দুর্বোধ্য এবং সফলতম কবিতা, এ পর্যন্ত বাংলায় পূর্ণ অনূদিত হয়নি। অবশ্যই কারুর এ চেষ্টা করা উচিত। মূলত সংগীত প্রধান বাংলা কবিতায় ক্রমশই অতি সারল্যের যে প্রবণতা এখন দেখা যায়, যার ফলে অধিকাংশ কবিতাই যে অর্থহীন আবেগ-ফলাফল হিসেবে প্রতীয়মান হয়, এর পরিপূরক হিসেবে কিছু দৃঢ়বদ্ধ, কঠিন, চেতনাপ্রধান কবিতার

আদর্শও উপস্থিত থাকা উচিত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যার শেষ চেষ্টা করেছেন। ভালেরির পাশে আদর্শ বা প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলেন বলেই আপোলিনেয়ারের সংগীতময় কবিতা অত সার্থক হতে পেরেছে। আমাদের বাংলা কবিতার আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, সংগীতময়তা, ফলে অতি সারল্য ক্রমশ আসা স্বাভাবিক।]

নিদ্রিতা

কী গোপনতার হৃদয়ে পোড়ায় আমার তরুণী সখা
ফুলের গন্ধ নেয় কি আত্মা মধুর মুখোশ পরে?
কোন নিষ্ফল পুষ্টিতে তার অশিল্প উষ্ণতা
ঘুমন্ত এই রমণীর দ্যুতি আপনি সৃষ্টি করে?

নিশ্বাস, চুপ, স্বপ্ন এবং অভেদ্য নীরবতা
হে শান্তি, তুমি অশ্রুর চেয়ে প্রবল প্রবল, তুমিই জয়ী
যখন বিশাল ঢেউ আর সেই ঘুমের গভীর পূর্ণ
অমন একটি শত্রুর বুকে আঁটে শলা-ষড়যন্ত্র।

হে নিদ্রাবতী, স্বর্ণশস্য ছায়া ও সমর্পণের
তোমার হিংস্র বিশ্রাম সাজে ওরকম উপহরে
হরিণী, অলস শরীর ছড়ানো আঙ্গুরথোকার পাশে

যদিও তোমার আত্মা এখন সুদূরে, ব্যস্ত নরকে
তোমার অঙ্গ, পবিত্রতম তলপেট, ঢাকা একটি তরল হাতে
জেগে আছে; জাগে তোমার অঙ্গ, আমার দু' চোখ খোলা।

[ঘুমন্ত নারী বহু কবিতা ও ছবির বিষয়। ভালেরির এই চতুর্দশপদী নিছক বর্ণনামূলক নয়, আবার কোনও রূপকও না। এটি প্রেমের কবিতা নয়, প্রেমের কবিতা ভালেরি প্রায় কখনও লেখেনইনি বলা যায়। আসলে একটি যুবতী সত্যিকারের নিদ্রিতা কিন্তু তার শরীর জেগে আছে। এই নারীর শরীর ও আত্মাকে পৃথক করে, শরীর যা দ্রষ্টার চোখে সুন্দর ও রমণীয়, আর আত্মা যখন বিশ্লিষ্ট তখন রক্তমাংসের মিলনে উন্মুখ, কিছুটা অসৎ সেই ইচ্ছা— এই বৈপরীত্যের খেলায় জীবন ও মৃত্যু এসে যায়। শেষ পর্যন্ত কবির চোখে এই বাস্তব নারীর দেহ নগ্ন, একটি নরম হাত উরুদেশ ঢেকে আছে, তার আত্মা অন্যত্র, সুতরাং কু-বাসনায়, কিন্তু তার ঘুমন্ত অঙ্গ দেখতে পাচ্ছে ভাবী উপভোক্তাকে অর্থাৎ কবিকে।

অবশ্য অন্যরকম অর্থও করা যায়। ভালেরির নিজস্ব নির্দেশ আমরা অগ্রাহ্য করতেও পারি। পূর্বের উল্লেখ করা, 'লা যন্ পার্ক' কবিতা সম্পর্কে ভালেরি বলেছিলেন, পাঠকরা ইচ্ছে করলে এটাকে শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা হিসেবেও গ্রহণ করতে পারেন। আর এই কবিতাটি, ভালেরির মতে, নিছক কবিতার আঙ্গিক ও শব্দ নির্বাচনের পরীক্ষা।

এখন এ কবিতার অনুবাদ অসম্ভব? বস্তুত, মূল কবিতার এই অনুবাদের দুরবস্থা দেখে আমারই কষ্ট হচ্ছে। সংস্কৃতের মতো লঘু, গুরু, প্লুতস্বরের ব্যবহারের বিশিষ্টতায় ভালেরি অসীম উদ্যমী। পণ্ডিতরা বলেন মূল কবিতায় ma, amie, ame ইত্যাদি শব্দের a অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ শায়িতা নারীর বিস্তৃত দেহের আভাস এনেছে। s-এর ঘন ঘন ব্যবহারে ঘুমন্তের নরম নিশ্বাস। আঙুরগুচ্ছের পাশে শুয়ে থাকা হরিণীর চিত্রে ভোগআশ্লেষ থেকে সৌন্দর্যের অনুভূতি এসেছে I-এর ব্যবহারে। সবচেয়ে মজার, শেষ লাইনে জেগে থাকার কথা দু'বার কেন লিখেছেন? কারণ, জেগে থাকা অর্থাৎ veille-এ শব্দের v অক্ষরের যে গঠন, এই অক্ষরটি যেরকম দেখতে, এর মধ্যের ত্রিকোণ শূন্যতা নগ্ন শরীরের ত্রিকোণের কথা মনে পড়ায়। ইংরিজি অনুবাদেও এ অনুভাব আসতে পারে না, কারণ awake আর বাংলায় জাগা! 'জ' দেখলে এরকম সুন্দর ছবি মনে পড়া অসম্ভব, 'জ'-কে দেখতেই কীরকম জ্যাঠামশাইয়ের মতো!]

পল ক্লোদেল

[ক্লোদেলের লেখা কবিতাধর্মী নাটকগুলি পৃথিবীর যেকোনও ভাষায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। কবি হিসাবেও তিনি অত্যন্ত বড়, ক্ষমতাবান, বিশুদ্ধ কবিতার বাহক, কিন্তু সব সময় শ্রদ্ধেয় নন। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন উগ্র ধার্মিক, ধর্ম তাঁকে বিনয় শেখায়নি, শেখায়নি পরধর্মসহিষ্ণুতা। যদিও তিনি বলতেন, ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন র‍্যাঁবোর কবিতা পড়ে—সেই দুর্দান্ত, বিবেকহীন, ঈশ্বরহীন, বিদ্রোহী বালক কবি র‍্যাঁবো।

জন্ম ১৮৬৮, দীর্ঘজীবনের অধিকারী হয়েছিলেন, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হিসেবে বহুদিন কাটিয়েছেন চিন দেশ ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছুদিন ছিলেন চিনে ফরাসি দেশের রাজ-প্রতিনিধি, সেই সময়কার উপলব্ধিপ্রসূত তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমার জানা প্রাচ্যদেশ'। মূলত ধর্মবিশ্বাসের জন্যই, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধার বদলে অশ্রদ্ধেয় উক্তিই তাঁর বেশি। ৮৭ বছর বেঁচে বিশাল চেহারায় তিনি ফরাসি সাহিত্যের বুক জুড়ে ছিলেন, মৃত্যু ১৯৫৫। এ শতাব্দীর ইওরোপের অধিকাংশ কবিই খ্রিস্টধর্মকে অবহেলা ও ঈশ্বরকে খুন করেছেন, আর পৃথিবীর সব দেশের কবিরা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকের আলাদা ব্যক্তিগত ঈশ্বর, সেখানে পল ক্লোদেলের প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামি এবং ঈশ্বরের প্রতি সরল ও দ্বিধাহীন বন্দনাই বৈশিষ্ট্য। সত্যিকারের মহৎ কবিত্বের অধিকারী হিসেবে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন প্রভূত, কিন্তু সকলের ভালোবাসা পাননি।]

সারমর্ম

কবির মনে আছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এবং কবি তাঁকে
কৃতজ্ঞতা জানাবার বন্দনায় কণ্ঠ তোলে। কারণ, তুমিই আমাকে
মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করেছ। বাস্তবের পবিত্রতা ও ঐশ্বর্য-কার্যকারিতার
চমকপ্রদ দৃশ্য দেখায়; সবই প্রয়োজনীয়। কবি চায়, তাকে
ভৃত্যদের মধ্যে স্থান দেওয়া হোক। কারণ, তুমি আমাকে
মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছ। নিষ্প্রাণ ও ঘাতক দর্শনের বীভৎসতা ও
অভিশাপময়তা (থেকে মুক্ত করেছ)। কবিত্বের দায়িত্ব সর্বভূতে
ঈশ্বর সন্ধান এবং তাদের প্রকাশ, যেন সবকিছুই ভালোবাসায়
মিশে যায়। বিরতি। সৃষ্টিজনিত ক্লান্তি। দৈব ইচ্ছা ও দৈব সমতার
কাছে অপাপ ও সরল আত্মসমর্পণ। পুণ্য আমার ঈশ্বর,
যিনি আমাকে আমার আমি থেকে মুক্ত করেছেন, এবং তুমি—
তুমিই স্বয়ংসম্পূর্ণ— আমার বাহুতে এই সদ্যোজাত শিশুর বেশে এসেছ।
ঈশ্বরকে বুকে করে, কবি প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করে।

মিশ্রণ

এবং আবার আমি ফিরে এলাম উদাসীন তরল সমুদ্রে।
আমার মৃত্যুর পর আমাকে আর যন্ত্রণা সইতে হবে না।
পিতা ও মাতার মধ্যে কবরে যখন শুয়ে থাকব, আমাকে
আর যন্ত্রণা সইতে হবে না।
এই অতিরিক্ত ভালোবাসাময় হৃদয় আর বিদ্ধ হবে না বিদ্রূপে।
শরীরের দীক্ষা আমার মিশে যাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, কিন্তু আত্মা
তীব্রতম কান্নার মতো বিশ্রাম নেবে আব্রাহামের বুকে।
এখন সবকিছুই মেশা, বৃথাই আমি ভারী এক চক্ষে খুঁজি আমার
চারপাশের সেই চেনা দেশ, আমার পদক্ষেপের নীচে নিশ্চিত পথ
এবং সেই নিষ্ঠুর মুখ।
আকাশ কুয়াশা ছাড়া কিছুই না, শূন্যতা শুধু জল
দেখো, সবই এখন মিশ্রিত, তবু আমি চারপাশে খুঁজি রেখা ও আঙ্গিক।
দিগন্তের জন্যও কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার রঙের অবশেষ

সব দ্রব্য মিলিত হয়েছে এক জলে, যে জল আমি অনুভব করি
আমার চিবুকে গড়ানো অশ্রুর ধারায়
এর স্বর ঘুমের মতন, যখন নিশ্বাস নেয় আমাদের ভিতরের বধিরতম আশায়
এখন সন্ধান বৃথা, নিজের বাহিরে আমি কিছুই দেখি না।
না আমার সেই দেশ, না আমার অতিপ্রিয় সেই মুখচ্ছবি।

[ক্লোদেলের অধিকাংশ কবিতাই গদ্যছন্দে, এবং এই গদ্যে আশ্চর্য ধ্বনিমাধুর্যের ব্যবহার। প্রথম রচনাটি সম্পূর্ণ কবিতা নয়। 'ম্যাগনিফিকাত' নামক দীর্ঘ কবিতার মুখবন্ধ। 'ম্যাগনিফিকাত' শব্দটি ধর্মীয়, বাইবেলে লুক লিখিত অংশে কুমারী মেরির গান, যেখানে তিনি ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাঁর সৌভাগ্যের জন্য। ক্লোদেলের কবিতাটিও অনুরূপ বিষয়ে। এখানে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন— ১৯০৭ সালে চিন দেশে তাঁর নিজের মেয়ে মেরির জন্ম উপলক্ষে। এই খণ্ড কবিতাটির শেষে 'সদ্যোজাত শিশুর' প্রসঙ্গ এসেছে ওই কারণেই। এই সঙ্গে কবি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ঈশ্বরকে, তাঁর নিজের ধর্মান্তরের জন্য, যে খ্রিস্ট সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য জন্মেছিলেন, তিনি কবিকেও উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয় কবিতাটি, 'আমার জানা প্রাচ্যদেশ' গ্রন্থের শেষ রচনা ১৯০০-১৯০৫, এই সময়ে ক্লোদেলের ধর্মবিশ্বাস খানিকটা টলে উঠেছিল, একটা অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন—যার ফলে তাঁর ধর্ম, সম্মান, এমনকী চাকরি নিয়েও খানিকটা টানাটানি পড়ে। তিনি নিজেই পরে এই সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'পারতেজ দ্য মিডি' নাটকে। মূল কবিতার প্রতিটি শব্দই প্রায় কান্না-ভরা। সাময়িকভাবে চিন দেশ ছেড়ে যাওয়া ও ব্যর্থ প্রেম, এ দুটি বিষয় মনে রাখলে কবিতাটি বুঝতে অসুবিধে হয় না।]

সাঁ-ঝঁ প্যার্স

[ব্রেতোঁ তাঁর সুররিয়ালিস্টদের নামের তালিকায় যদিও বলেছেন, 'সাঁ-ঝঁ প্যার্স দূর থেকে সুররিয়ালিস্ট' কিন্তু প্যার্স-কে সুররিয়ালিস্ট বলা বড়ই কষ্টকল্পনা। তাঁর জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। জন্ম তাঁর ফরাসি দেশ থেকে এক দূরতর দ্বীপে, অভিজাত পরিবারে, ১৮৮৭। আসল নাম আলেক্সি লেজে। ফরাসি ভাষার এরকম একজন সার্থকতম কবি, দীর্ঘ সময়ই কেটেছে ফরাসি দেশের বাইরে। ১৯৪০-এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র দুটি চটি বই, বন্ধুবান্ধব ও কিছু ঘনিষ্ঠ পাঠকের বাইরে, তাঁর নাম ছিল অপরিচিত। ১৯১৪-তে কূটনৈতিক দপ্তরে চাকরি নিয়ে ক্লোদেলের মতো বহুদিন কাটান চিন ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে। তারপর ফরাসি সরকারের বৈদেশিক দপ্তরে স্থায়ী সেক্রেটারি হয়েছিলেন। নাৎসীবাদের প্রবল বিদ্বেষী প্যার্স, ১৯৪০-এ জার্মানির ফরাসি দেশ অধিকার ও ক্রীড়নক ভিসি-সরকার গঠনে অত্যাচারের ভয়ে ও কিছু সংখ্যক দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানিতে ভগ্নহৃদয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে এলেন আমেরিকার ওয়াশিংটনে। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। ওভিদের সময় থেকে

শুরু হয়েছে যে নির্বাসিত লেখকের দল, প্যার্সও তাদের একজন। এরপর নিউইয়র্ক থেকে তাঁর পর পর কবিতার বইগুলি দ্বি-ভাষা সংস্করণে প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁকে পৌঁছে দেয় খ্যাতির উচ্চ শিখরে। ১৯৬০-এ নোবেল প্রাইজ। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের চাপা, গুমোট বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে রইলেন তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে। প্যার্সের দৃঢ়শৈলী গদ্য র‍্যাঁবো, মালার্মে, ক্লোদেলের ধারার সার্থকতার পরিণতি। ঈশ্বর, দৈবশক্তি, প্রকৃতি, পবিত্র কুমারীর প্রতি স্তোত্র, বন্দনা, সামগানের যে রীতি উজ্জীবিত করেছিলেন ক্লোদেল, প্যার্সও সেই রীতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্যার্সের প্রকৃতির মধ্যে কোথাও ঈশ্বর বা দৈবশক্তির উল্লেখ নেই, তাঁর চোখে দেখা জগতের তিনিই স্রষ্টা, প্রকৃতির উদ্ভাসন তাঁর বর্ণনায় পৃথক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। তাঁর গ্রন্থগুলির নামও এইরকম সহজ, 'বৃষ্টি' (১৯৪৩), 'তুষার' (১৯৪৪), 'বায়ু' (১৯৪৬) ইত্যাদি।

সুররিয়ালিস্টদের বিপরীত, চলিত শব্দ বা মুখের ভাষা তাঁর কবিতায় প্রায় নেই। তাঁর কবিতা ক্বচিৎ ব্যক্তিগত।]

প্রশস্তি—২

আমার মায়ের দাসীরা, দীর্ঘ, মসৃণ রমণী...এবং আমাদের
উপকথাময় চক্ষুপল্লব...হে
উজ্জ্বলতা! হে করুণা!
প্রত্যেক বস্তুকে আহ্বান করে আমি উচ্চারণ করি সে মহৎ,
প্রত্যেক জন্তুকে বলি সুন্দর এবং দয়াময়।
হে আমার দীর্ঘতম
সর্বভুক ফুলগুলি, রক্তিম পাপড়িদলে আমার সুন্দরতম
সবুজ পতঙ্গদের গ্রাস করতে উৎসুক! বাগানে ফুলের গুচ্ছে
পারিবারিক সমাধির গন্ধ! কনিষ্ঠা বোনটির মৃত্যু হয়েছে:
তিন ঘরের আয়নাগুলির মধ্যে
গন্ধ সমেত তার মেহগনি শবাধার আমার সঙ্গে ছিল।
পাথর ছুড়ে টুনটুনি পাখিদের মারা উচিত নয়...
তবু পৃথিবীর গুঁড়ি মেরে বসে আমাদের খেলার মধ্যে, দাসীর
মতন, যদিও দাসীর অধিকার আছে, পরিবারের সকলে অন্তঃ-
পুরে রইলে, চেয়ারে বসার।

বৃষ্টি—৮

......বর্ষণের বটবৃক্ষ নগরে ছড়ায় তার বিচারের সভা। স্বর্গের
হাওয়ার প্রতি এই সেই ভ্রাম্যমাণ এরকম
আমাদের মধ্যে বসবাসে আগমন! ...তুমি অস্বীকার করো না;
যারা অকস্মাৎ শূন্য হয়ে আসে আমাদের জন্য......
যাঁরা জানতে উৎসুক বৃষ্টি পৃথিবীতে এসে শোভাযাত্রা করে
গেলে কি ঘটনা হয়, তাঁরা এসে বাস করুন আমার বাড়ির
ছাদে, চিহ্ন, সংকেতের মধ্যে। অরক্ষিত শপথ! অনলস
বপন মানুষের সৃষ্ট পথের উপরে
ধোঁয়া!
আসুক বিদ্যুৎ, হাঃ! কে আমাদের ত্যাগ করে!......নগরের
দ্বারে দ্বারে আমরা ফের নীত হব
এপ্রিলের নীচে দীর্ঘকায় বৃষ্টি হেঁটে যায়, চাবুকের নীচে
দীর্ঘকায় বৃষ্টি ছোটে, যেন নিজ পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত অনুষ্ঠান।

[প্রথম কবিতার দাসী, সম্ভবত হিন্দু রমণী। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস চালান গত শতাব্দীতে বন্ধ হয়ে গেলেও এশিয়া থেকে গোপনে দাস-দাসী রপ্তানি অব্যাহত ছিল। প্যার্সের পৈতৃক দ্বীপভবনে এইরকম কয়েকজন দাস-দাসী ছিল; কোনও কোনও ভাষ্যকার এ কবিতায় যে দাসীর উল্লেখ, তাকে হিন্দুই বলেছেন। ভারতীয়দের লৌহবর্ণ শরীর ফরাসিদের চোখে বড় প্রিয়, কক্‌তো-র কবিতায় এর চমৎকার উল্লেখ আছে। এ কবিতার দাসী পৃথিবীর উপমেয়। প্যার্সের কবিতা সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর তুলনা আছে। নিজের কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিষমভাবে অনুপস্থিত। এ যেন কোনও মন্দিরের পুরোহিত দেবতাকে পূজা করছেন, পাশেই নানা সুন্দর, মহার্ঘ দ্রব্য পূজার অর্ঘ্য হিসেবে সাজানো। পুরোহিত সবই উৎসর্গ করছেন দেবতাকে, নিজেকে কিছুই না। প্যার্সও তাঁর কবিতার ও প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর উপাদান উৎসর্গ করছেন মানুষকে বা অদেখা পাঠককে। নিজের জন্য কিছু রাখলেন না। 'বৃষ্টি' কবিতার 'তুমি' সেই পাঠক।

'বৃষ্টি—৮' একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। প্যার্স একবার কৌতুক করে নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার সমস্ত কবিতা আসলে একটি মাত্র দীর্ঘ বাক্য, বিরতিহীন এবং চিরকালের জন্য দুর্বোধ্য।' সেই হিসাবে তাঁর যেকোনও কবিতাই অংশ-কবিতা। এই কবিতা বৃষ্টির বর্ণনা, ঠিক আবার বৃষ্টিও না বোধহয়। যুদ্ধের সময়ে নির্বাসিত কবির হতাশা ও তিক্ততা, পরিপার্শ্বের মানুষ তাঁকে ভুল বুঝছে, কবি দূর থেকে দেখছেন ইওরোপের ধ্বংস ও পরিবর্তন, এখানে বৃষ্টির অন্য ভূমিকা আছে। কয়েকটি শব্দের আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।

'বটবৃক্ষ' আমার রূপান্তর নয়, মূল কবিতায় ব্যবহৃত। যে বটগাছ নানান শিকড় ছড়ায়। 'বিচারের সভা' কথাটি বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। মূল শব্দের ব্যবহার পরিমিত অর্থে। assise,

ইংরেজি assizes— ইংল্যান্ডের ছোট ছোট শহরে নানান অপরাধের মধ্যযুগীয় বিচার অনুষ্ঠান। কদাচার ও পাপে পূর্ণ পৃথিবীর উপর শেষ বিচারের ঘোষণার ইঙ্গিত আছে এখানে।

শেষ লাইনের বেত্রাঘাত অনুষ্ঠানের মূল শব্দ Flagellants-এর তুলনীয় শব্দ বাংলায় নেই। অর্ডার অব ফ্লাজেলান্টস— মধ্যযুগের একরকম ধর্মীয় আচার। আত্মশুদ্ধির জন্য সাধক নিজের পিঠে নিজেই বেত মারতেন, অথবা লোক ভাড়া করতেন নিজের পিঠে চাবুক খাবার জন্য।]

ব্লেইজ স্যাঁদরার

[আপোলিনেয়ার থেকে যে আধুনিকতার শুরু ফরাসি সাহিত্যে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু সমসাময়িক আর তিনজন প্রবল শক্তিমান কবি ছিলেন। ভালেরি, ক্লোদেল এবং পেগি। শেষোক্তজন, অর্থাৎ শার্ল পেগির কবিতা আর আমরা এখানে অনুবাদ করলুম না। কারণ, পেগির কাব্যমূল্য এখনকার চোখে কিছুটা নিষ্প্রভ, তিনিও ছিলেন ক্লোদেলের মতো ক্যাথলিক, এবং মূলত ফরাসি দেশাত্মবোধের জনপ্রিয় কবি, সুতরাং এখন আমাদের কাছে উপভোগের আকর্ষণ কম।

আপোলিনেয়ারের বন্ধুবান্ধব, সমসাময়িক কবি এবং যাঁদের মধ্যে সুররিয়ালিজমের অঙ্কুর প্রথম উঁকি মারে, তাঁদের মধ্য থেকে আমি ব্লেইজ স্যাঁদরারকে বেছে নিলাম। এই দলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি আলফ্রেড জারি, মাক্স জাকব এবং লেয়ঁ-পল ফার্গ। জারির কবিতার চেয়ে নাটক বেশি সার্থক, বিশেষত তাঁর 'উবু রাজা' এই শতাব্দীর সত্যিকারের প্রথম উদ্ভট, আজগুবি, বিদ্রূপ-ঝকঝকে নাটক যা পরবর্তীকালের আধুনিক নাট্যকারদের প্রভূত প্রভাবিত করেছে। যদিও নাটকটি এই শতাব্দী শুরু হবার কিছু আগে লেখা। রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছটের হবুচন্দ্র রাজার সঙ্গে 'উবু রাজা'র খুব মিল আছে। মাক্স জাকব এবং লেয়ঁ-পল ফার্গের কবিতায় যে দানা ছিল তারই সবিস্তার রূপবান প্রকাশ আছে আপোলিনেয়ারের কবিতায়, ফলে পরবর্তী যুগে ওঁরা কিছুটা ম্লান হয়ে গেছেন। এখন ওঁরা টিকে আছেন সংকলন-গ্রন্থে। বাংলায় মাক্স জাকবের কবিতার অনুবাদ করেছেন কবিতা সিংহ ও উৎপলকুমার বসু। ব্লেইজ স্যাঁদরার বাংলায় কিছুটা অপরিচিত কিন্তু ফরাসি কবিতার ইতিহাসে ওঁর অবদান মূল্যবান।

জন্ম ১৮৮৭, প্যারিসে, খাঁটি ফরাসি নন। বহু দেশ ঘুরেছেন, বহুরকম কাজ করেছেন, এমনকী মণি-মুক্তোর সেলসম্যানগিরি পর্যন্ত। ভ্রমণ-কবিতাগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠ। প্রথম মহাযুদ্ধে ডান হাতটা কাটা যায়, বাঁ হাত দিয়ে টাইপ করে করে লিখতেন। বহু অনুবাদের কাজ করেছেন। নিগ্রোদের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব ঝোঁক ছিল। মৃত্যু ১৯৬১-তে।]

সূর্যাস্ত

সকলেরই মুখে সূর্যাস্তের কথা
পৃথিবীর এ অঞ্চলে সব পর্যটকরাই সূর্যাস্ত বিষয়ে
কথা বলতে একমত
এমন অসংখ্য বই আছে, যাতে শুধু সূর্যাস্তেরই বর্ণনা
গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যাস্ত
হ্যাঁ, সত্যিই, ভারী চমৎকার
কিন্তু আমি বেশি ভালোবাসি সূর্যোদয়
ভোর
আমি একটি প্রত্যুষও হারাই না
আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকি
নগ্ন
আমি একা সূর্যোদয়ের বন্দনা করি
কিন্তু আমি সূর্যোদয়ের বর্ণনা করিতে চাই না
আমি আমার ভোরগুলি নিজের জন্যই রেখে দেব।

জ্যোৎস্না

নাচি আমরা ট্যাঙ্গো নাচি জাহাজে
চাঁদ এঁকেছে চাঁদের বৃত্ত জলে
আর আকাশে বৃত্ত আঁকে মাস্তুল
আঙুল তুলে দেখায় দূরে তারার দঙ্গল

রেলিং ধরে ঝুঁকে রয়েছে নবীনা এক আর্জেন্টিন-বালা
ফরাসি উপকূলের আলো মালার দিকে তাকিয়ে এখন
স্বপ্ন দেখে প্যারিসের
অল্প চেনা প্যারিস তার অনুতাপের প্যারিস
জাহাজ থেকে ঘুরছে আলো দু'রঙা আলো, আলো এবং গ্রহণ
মনে পড়ায় বড় রাস্তায় হোটেল ঘরের জানলা থেকে দেখা
ওরা সবাই ফিরে আসবে শপথ করেছিল

ঐ যুবতী স্বপ্ন দেখছে আবার দ্রুত ফিরে আসবে প্যারিসে
থেকে যাবে
আমার টাইপ রাইটারের শব্দ ওঠে শব্দ ওকে স্বপ্ন শেষ করতে
দেয় না
আমার এই চমৎকার টাইপ রাইটার প্রতি লাইনের শেষে কেমন
টুং শব্দে বেজে ওঠে
আর কেমন দ্রুত ছোটে যেমন ঠিক জ্যাজ সংগীত
আমার এই চমৎকার টাইপ রাইটার আমায় কোনও স্বপ্ন
দেখতে সুযোগ দেয় না
না ওদিকের বন্দরের না বিপরীত জাহাজ মুখের
অনুসরণে বাধ্য করে শেষ অবধি এক চিন্তার
আমার চিন্তা

[অধিকাংশ পথিকৃৎকেই শেষ পর্যন্ত যে দুর্ভাগ্য সইতে হয়, স্যাঁদরারকেও তা সইতে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কবিতায় যা কিছু নতুন এবং মৌলিক, যেমন কবিতায় গদ্যধর্ম, যতিচিহ্নহীন চেতনাপ্রবাহ, ফটোগ্রাফের মতো বর্ণনা (সেটা ছিল চলচ্চিত্রের আদি যুগ, সুতরাং কবিতা চলচ্চিত্রকে বা চলচ্চিত্র কবিতাকে খুব অভিভূত করেছিল)— এই সমস্ত রীতি পরবর্তী বহু কবি এবং অনেক বেশি শক্তিমান কবিরা আরও এমন সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন যে, প্রথম ব্যবহারকের কথা আর আমাদের মনে থাকে না বা পড়তে ক্লান্তিকর লাগে। কিন্তু এঁদের থেকেই শুরু হয়েছিল এই নতুন ধারা, কবিতাকে অতিশয় ব্যক্তিগত করে তোলা, বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে কবি নিজে সব সময় উপস্থিত, বা কোনও দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাৎক্ষণিক মানসিক প্রতিফলন, পারম্পর্যহীন হলেও সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখা। এসব আমাদের বাংলা কবিতাতেও এত ব্যবহৃত হয়েছে যে, এখন আর এরকমের কবিতা নতুন মনে হবার সুযোগ নেই, তা ছাড়া স্যাঁদরারের কবিত্ব খুব বেশি কালোত্তীর্ণ হবার মতো গর্ভবতী নয়। সুতরাং, এ কবিতা পড়ার সময় ৪০/৪৫ বছর আগের ইতিহাস মনে রাখা দরকার।

অনুবাদের আরেকটি অসুবিধে এবার বোধ করলুম। আমরা মুখের কথায়, লেখায় অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু কবিতা অনুবাদের সময় প্রতিটি শব্দই বাংলা করার দিকে আমাদের ঝোঁক। কিন্তু অনেক শব্দের যে বাংলাই নেই। (যেমন অনেক বাংলা শব্দের ইংরেজি হয় না।) দ্বিতীয় কবিতার মূল শেষ লাইন, 'মনিদে'-এর বাংলা 'আমার চিন্তা' একেবারে ভালো শোনায় না। 'আইডিয়া' শব্দের বাংলা কি? ভাবনা বা চিন্তা ঠিক নয়, এ দুটোর মধ্যে যেন একটু দুঃ মেশানো আছে। আবার 'ভাব'ও চলে না— ওটা যেন বেশি গদগদ। 'আমার একটা আইডিয়া মনে এসেছে'— এর বদলে 'আমার মনে একটা ভাব এসেছে' একেবারে অসম্ভব। আইডিয়ার এক কথায় বাংলা, অভিধানে দেখলুম, চিচ্ছবি। কিন্তু এ শব্দটা চলবে কি? নাঃ!]

পিয়ের রেভার্দি

[১৯৫০-এর পর ফরাসি দেশের তরুণ লেখকরা যখন নিউ নভেল আন্দোলন শুরু করে, তখন কবিতাতেও তারা প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবিদেরও উপস্থিত করে নিজস্ব বিচারালয়ে। কাকে কাকে রাখা হবে দলনেতা হিসেবে, কে কে গণ্য হবেন সার্থক পূর্বসূরী হিসেবে, কোন কোন কবির ওপর পড়বে বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্যের খড়্গাঘাত, কার রচনায় তরুণদের সত্যিকারের আনন্দ। অধিকাংশ প্রবীণ সুররিয়ালিস্ট কবি তখন প্রাক্তন গুরু হিসেবে গণ্য, আবার ঈষৎ বিস্মৃত কয়েকজন কবির নামও প্রবলভাবে ফিরে এল নবীন লেখকদের কাছে। এই সময় আবার উচ্চকিত হয়ে উঠল পিয়ের রেভার্দির নাম, তরুণরা তাঁর কবিতার সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা বোধ করল, অথচ রেভার্দি তখন নির্জন মঠে স্বেচ্ছানির্বাসনে।

পিয়ের রেভার্দির জন্ম ১৮৮৯-এ দক্ষিণ ফ্রান্সের এক সাধারণ পরিবারে। একুশ বছর বয়সে প্যারিসে এলেন খবরের কাগজে প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়ে। এই সময় প্যারিসে আলফ্রেড জারি, মাক্স জাকব, আপোলিনেয়ার এবং কিউবিস্ট শিল্পীরা সাহিত্য, শিল্প, থিয়েটার নিয়ে প্রবল উন্মাদনায় মেতে আছেন। রেভার্দি সহজেই আবিষ্কার করলেন ওঁদের স্বজাতি হিসেবে। তিনি ওঁদের দলে মিশে গেলেন। কিন্তু কয়েক বছর পরই আরম্ভ হল প্রথম মহাযুদ্ধ। আপোলিনেয়ারের সঙ্গে তিনিও যুদ্ধে যোগ দিলেন। দু'জনেই ফিরে এলেন ১৯১৭ সালে, আপোলিনেয়ার মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে, রেভার্দি স্বাস্থ্যের কারণে। ওই বছরেই বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নর-সুদ' অর্থাৎ 'উত্তর দক্ষিণ'। এই পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে ডাডাইস্ট ও সুররিয়ালিস্টদের। আপোলিনেয়ারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় রেভার্দি, জাকব, স্যাঁদরার এঁরাই হলেন সুররিয়ালিস্টদের প্রধান অবলম্বন, প্রতিষ্ঠিত সমর্থক।

কিন্তু হঠাৎ চরিত্র বদলে গেল রেভার্দির। বিপ্লবীর ভূমিকা ছেড়ে অকস্মাৎ ১৯২৬-এ তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন, অন্তরীণ হলেন এক খ্রিস্টান মঠে, সেখানেই নির্জন হয়ে রইলেন বাকি জীবন। দীর্ঘ জীবন, ১৯৬০-এ মৃত্যুর আগে আর একবারও বিচলিত হননি।]

ভগ্নহৃদয়

আ-আজ সব চলেছে শেষের দিকে।
দেয়ালে ছড়ায় ঢিমে-লয় সংগীত
মুখে এক হাত
অপর হাতের ছোঁয়ার উলটো পিঠটুকু নেই
জানলা গলিয়ে পালায় নগ্ন প্রেম
মনোরম ছবি
একটি রমণী পরেছে ছিন্ন সেমিজ

বেশ তো ভঙ্গি এ মহৎ কামনার
কেঁদে কেঁদে সেই রমণীটি যায় আকাশের দিকে
যে আকাশ তাকে ডাকে
জল ও কঠিন বৃক্ষের দল
বেহালার সুর ছাড়া প্রণয়ের নিরাশা
যাই হোক তবু ফাঁদ পাতা আছে গোপন
চৌরাস্তায় ভারী অর্গ্যান একটি গ্রীষ্ম সন্ধ্যা
তোমার বিষাদ করেছে অর্থময়
হালকা দুঃখ
কিছুই থাকে না
বন্ধুরা সব মৃত
স্ত্রীলোকেরা তবু নিজের গরজে তাদের দেখতে যায়
তুমি এসেছ এ খেলায় একটি অশুভ চিহ্ন নিয়ে
কি তোমার সাধ ভদ্র মানুষ অথবা দস্যু হওয়া
কোনও কিছু নয়
আমরা চামড়া লুকিয়ে রেখেছি পোশাকের নীচে ভাঁজে
স্রোত বয়ে যায় যে স্রোত বয়েই যাবে
আমার হাসিও মিশিয়েছি তার সঙ্গে
ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে তোমার যুক্তির দিকে দেখি
পৃথিবী কি খুশি হাসছে পৃথিবী তোমারও হাস্য
এক রাত্তিরে আমি হারালাম আমার বয়েস শৈশব নাম

[যদিও সুররিয়ালিস্ট দলের সমর্থক ছিলেন, মেতে উঠেছিলেন নতুন রীতির আন্দোলনে, কিন্তু রেভার্দির কবিতার চরিত্র অন্যরকম, তাঁর সমসাময়িকদের সুরের সঙ্গে মেলে না। সুররিয়ালিস্টদের মতে, এই বাস্তব জীবনটাই আসলে বাজে, কোনও মানে হয় না, অবান্তর, বরং স্বপ্নের জীবন ও মগ্ন চৈতন্যই সত্য, অতি বাস্তব। সুতরাং শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ জীবন-যাপন বদলে দেওয়া। রেভার্দি নিজের কবিতায় এ মত মানেননি, বরং বিপরীত। তাঁর মতে, কবিতার কাজ হল, যে জীবন তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতেই চূড়ান্তভাবে বেঁচে থাকা, স্বপ্ন ও বাস্তব যে সূক্ষ্ম সীমায় এসে মিশেছে সেখানে দাঁড়ানো, অপসৃয়মাণ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখা, যেখানে বাস্তব কখনও কখনও হয়ে ওঠে পরম সত্য। এই নির্দিষ্ট বাস্তব জীবনকে চূড়ান্তভাবে বাঁচার ধারণাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কবিদের নতুন করে প্রেরণা দিয়েছে। রেভার্দি তাঁর কবিতায় কখনও কখনও কমা ফুলস্টপ দিতেন, কখনও দিতেন না। 'ভগ্নহৃদয়' কবিতাটিতে নেই। অনুবাদ করার সময় আমি যোগ করে দেব কিনা ভাবনায় পড়েছিলাম। তাঁর ইমেজগুলো টুকরো টুকরো, লাইনগুলি যোগাযোগহীন। কবিতায় আমরা যেরকম মানে খুঁজতে চাই, সেরকম অর্থ প্রতি লাইনে নেই। কিন্তু সমগ্র কবিতা উজ্জ্বল অর্থময়। যেন, একটি নামহীন মানুষ, একটি উদ্বিগ্ন আত্মা এই টুকরো ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে দেখছে

পৃথিবীকে। মাঝে মাঝে এক একটা লাইন হঠাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়, যেন কবি কোনও বিরাট রহস্য উন্মোচন করতে চলেছেন। কিন্তু সে রহস্য আর ধরা পড়ে না, কবির চোখ আটকে দেয় এক অদৃশ্য পরদা, আবার কবিকে ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্যে খুঁজতে হয়। রেভার্দির সমগ্র কবিতায় বিধৃত হয়েছে মানুষের ভাগ্যের দুঃখ। এইরকম তাৎক্ষণিক অনুভূতির ছোট ছোট ছবিতে গেঁথে তোলা কবিতার নাম রেভার্দি দিয়েছিলেন, 'পোয়েজি ব্রুত'— অর্থাৎ কর্কশ কবিতা।

এই কবিতায় 'আমি' আর 'তুমি' হয়তো একই ব্যক্তি। শার্ল পেগির কবিতায় যেমন ঈশ্বর এসে পেগির ভাষায় কথা বলতেন, তেমনি রেভার্দিও অনেক সময় নিজেকেই নিজের ভাষায় শাসন করেছেন।]

জাঁ কক্‌তো

[প্যারিসের যতগুলি সৌধ, স্তম্ভ, মিনার, শিল্পকীর্তি আছে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কক্‌তো-ও ছিলেন যেন তার অন্যতম। প্যারিস শহরের বিশেষ দ্রষ্টব্য। ফরাসি নাগরিক বিদগ্ধ পুরুষদের প্রতিমূর্তি। প্যারিসের অদূরে ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম, ১৮৮৯। চরম শৌখিন এবং পরম বেপরোয়া জীবনযাপন করেছেন প্যারিসেই। বদলেয়ার এবং আপোলিনেয়ার যেমন অসংখ্য রচনায় প্রিয়তম প্যারিসকে বারবার সৃষ্টি করেছেন, সেইরকম কক্‌তোও প্যারিসেরই লেখক। যদিও, কক্‌তো-র রচনা বড় বিক্ষিপ্ত, অপরিপূর্ণ।

বহু মুখে ছড়িয়েছিলেন কক্‌তো নিজের প্রতিভা। উপন্যাস লিখেছেন, লিখেছেন নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, চিত্রনাট্য। ফরাসি দেশের অধিকাংশ বড় কবিই বড় সজাগ অহংকারী, কবিতা ব্যতীত শিল্পের অন্যান্য শাখায় সহসা কার্যকারীভাবে প্রবেশ করতে চান না। কক্‌তো করেছিলেন, বহু জটিল শাখায়, ফলে ওঁর কবিতার ক্ষতি হয়েছে নিশ্চিত। ফিল্‌ম তোলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন নিজে, এমনকী অভিনয় পর্যন্ত। নাটকই শেষ পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল, বহু পরীক্ষা করেছেন, পুরাণ মহাকাব্যের পুনরুত্থান, মধ্যযুগীয় প্রেম-কাহিনীর আধুনিক রূপ, মাত্র একটি চরিত্রের নাটক— ইত্যাদি।

অর্ধশতাব্দীর প্রত্যেকটি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে ভয়ংকরভাবে যুক্ত ছিলেন। কিউবিজম, ডাডাইজম, সুররিয়ালিজম— সব ক'টি পরপর পেরিয়ে এসেছেন— প্রখ্যাত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ছিলেন পিকাসো। ক্ষীণ, স্পর্শকাতর স্বাস্থ্য, তবু শরীরে গাঁজা, আফিং ও অন্যান্য মাদক সেবনের পরীক্ষা করেছেন। যৌবনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল প্রতিভাবান, অকাল মৃত লেখক রাদিগে-র সঙ্গে। কক্‌তো পুরুষ-প্রেমের উপরেও বিশেষ জোর দিতেন।

১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে, তাঁর মৃত্যু প্যারিস শহরে যেন ইন্দ্রপাত ঘটিয়েছিল। রূপকথার মতো সেই মৃত্যু। কক্‌তো-র আন্তরিক বান্ধবী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এদিথ্ পিয়াফ্— সেই এদিথ্ পিয়াফ্— যাঁর জন্ম পথের ভিখারিণী হিসেবে, ক্রমে ভবঘুরে, চোর,

খুনে ও বারবনিতাদের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত যিনি উঠেছিলেন সমাজের শীর্ষে। কক্‌তো আর পিয়াফ্ পরস্পরের গুণমুগ্ধ। দু'জনেই অসুস্থ— বারবার কক্‌তো ভৃত্যকে পাঠাচ্ছেন এদিথ্ কেমন আছে জেনে আসতে। একই দিনে, প্রায় এক সঙ্গেই দু'জনের মৃত্যু।]

দুপুর

নাবিক, এখন দারু দেবদূত, ডানার আঘাতে
আফ্রোদিতির অস্থিচ পাখি, হীরকের হার,
শান্ত সাগর থেকে নিয়ে আসে তোমার জন্য তটের প্রান্তে
বিশ্বাসী ঢেউ, মুক্তাখচিত টমটমে জোড়া ক্লান্ত অশ্ব।

ভগ্ন জাহাজ, টিনের কৌটো, নোঙর, বরগা, মাস্তুল, আর
জেলিমাছ, নীচে জলের ভিতরে রাজধানী, তার বড় রাস্তার
জানালার থেকে তাকানো দৃষ্টি; পরে সমুদ্র
ফিরে যায় ফের, নিজের মুখের লালা শুষে নিয়ে—।
আমি খুলে ফেলি পোশাক ও টুপি নেই মুহূর্তে
বালির উপরে উলঙ্গ দেহে চিত হয়ে শুই
বন্য রৌদ্রে শরীর পুড়িয়ে প্রতীক্ষা করি, বেরুবে কখন
আমাদের এই চামড়ার নীচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়।

আনাড়ি পরীরা

আনাড়ি পরীরা তোমাদেরই অনুকরণ করেছে, হে পারাবত।
তোমরা মেরির বন্দনা গাও। ওরা সান্ত্রীর মঞ্চে
পাহারা দিচ্ছে ফরাসি রাজ্য। হায়! তবুও তো আমরা নিরাশ করেছি ওদের।

সারা রাত জেগে আকাশ তুলেছে রাশি রাশি জুঁই:
শেষ ফুলটিও তোলা হলে, ওরা খোলে জানালার ঝিল্লি।

এসেছে শরৎ, পরী ঝরানোর দিন এল আজ
দুধের ভাণ্ড থেকে গড়ানোর মতো পরীদের এই ঝরে যাওয়া।

সোনালি বৃক্ষ অপেরায় বহু কমলালেবুর ফসল ফলেছে
শীর্ষদেশের কমলার প্রতি জনসাধারণ বড় উৎসুক
কারণ নীচের কমলার স্বাদ, ওদের সবারই মুখে বিস্বাদ।

দশ লাইনের এই কবিতাটি খুব সুন্দর নাকি কুৎসিত?
কুৎসিতও নয় সুন্দরও নয়, অন্যরকম গুণ আছে ওর।

[কক্‌তো-র কবিতায় প্রাচীন কাব্যের গন্ধ ও বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে আধুনিকতা। কবিতার বহিরঙ্গ সজ্জায় অস্বাভাবিক দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি, কখনও কখনও নিখুঁত গঠনের কবিতায় যুক্ত হয়েছে তাঁর ডাডাইস্টদের ধরনে বিদ্রূপময় দৃষ্টিভঙ্গি। এসব সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁর লেখা সম্পর্কে মনে হয় সার্থকভাবে রচিত অপ্রধান কবিতা। কবিতা সম্পর্কে কক্‌তো-র বিখ্যাত উক্তি: শ্রেষ্ঠতম রচনাও বর্ণমালার বিশৃঙ্খলতা ছাড়া, আর বেশি কিছু না। প্রথম কবিতাটি ইমপ্রেশানিস্টদের ধরনের রচনা। মাঝির কথা বলেই পরমুহূর্তে সে হয়ে গেল কাঠের তৈরি দেবদূত— দেবদূত ও পরী কক্‌তো-র অতি প্রিয় বিষয়— সেই দেবদূত ডানার আলোড়নে নিয়ে এল আফ্রেদিতিকে। রোমানদের যেমন ভিনাস, গ্রিকদের সেই প্রেমের দেবী আফ্রেদিতি— সমুদ্রের ফেনা থেকে যাঁর জন্ম— যদিও কক্‌তো-র সমুদ্রে, ঢেউ একটু পরেই হয়ে গেল মুখে ফেনা মাখা টমটম বা জুড়িগাড়ির ঘোড়া। সমুদ্র থেকে যেমন উঠে এলেন আফ্রেদিতি— সেইরকমই প্রখর সূর্যের আলোর নীচে কবির চামড়া থেকে বেরিয়ে আসে এক গাঢ় রঙের ভারতীয়।]

পল এলুয়ার

[বলা যায়, ১৯২০ সাল থেকেই একরকম, পশ্চিমের সাহিত্য থেকে নারীর নির্বাসন হয়ে গেছে। নারীর বন্দনা, স্তুতি, সজ্জা—এতকাল ছিল যেকোনও সাহিত্য সৃষ্টির প্রাণ, যেদিন থেকে লেখকরা মুখ ফিরিয়ে নিলেন, নারী ক্রমশ অবহেলিতা, অনাদৃতা হতে হতে অস্তিত্বহীনা হবার উপক্রম। মালার্মে বা ভালেরি কোনও মেয়েকে ভালোবাসা নিয়ে প্রেমের কবিতা লেখা প্রায় হাস্যকর মনে করতেন। ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কা, টমাস মান— সাত্র, কামু— হেনরি মিলার, নরমান মেইলার— এঁদের রচনায় কোনও নায়িকা নেই বললেই চলে। নারী চরিত্র আছে নানা প্রয়োজনে, কিন্তু নারী নেই। হায় শ্বেতাঙ্গিনী!

পল এলুয়ার তাঁর অপর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—ব্রেতোঁ ও আরাগঁ-র সঙ্গে মিলে প্রায় যুদ্ধে নেমেছিলেন নারীর লুপ্ত মহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য। সুররিয়ালিস্টদের আদি ও প্রবল সমর্থক এলুয়ার বললেন, নারীই রহস্যের সিন্ধু। পৃথিবীর সব রহস্যেরই উন্মোচনের চেষ্টা করা যায় নারীর শরীরে ও ভালোবাসায়। এলুয়ার রমণীর বন্দনা করেছেন নির্লজ্জ, দ্বিধাহীন, সরল, আত্মার স্পষ্ট ভাষায়। পেত্রার্কের সময় থেকে শুরু হয়েছে যে প্রেয়সী বন্দনা, এলুয়ার যেন সেই ধারারই আধুনিক পূজারি। এবং তাঁর সার্থক সঙ্গী লুই আরাগঁ।

পল এলুয়ারের জন্ম ১৮৯৫, (কোনও কোনও বইতে দেখছি ১৮৯৭, আমার পক্ষে ঠিক করা সম্ভব নয়। তাঁর নামটিও যে ছদ্মনাম, এ তথ্যও সুপরিচিত নয়। ইউজিন গ্রাঁদেল নামের লোকটি যে কেন স্বনাম ত্যাগ করে সারা জীবন পল এলুয়ার নামেই লিখেছেন জানতে পারিনি।) ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানান ঘটনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে চাইতেন। নির্জন ঘরে নিজের মুখোমুখি হওয়া নয়, এলুয়ার চেয়েছেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে। কৈশোরে ফুসফুসের অসুখ হয়, তারপর প্রথম মহাযুদ্ধে আক্রান্ত হন বিষাক্ত গ্যাসে। তবু বেঁচে উঠে, নিজের মধ্যে বোধ করলেন একটা পরম ছটফটানি, নির্দিষ্ট নিয়মহীনতা। সেই টানে যোগ দিলেন ডাডাইস্টদের আন্দোলনে, কিছুদিন পর সুররিয়ালিস্টদের দলে, প্রবলভাবে মেতে উঠলেন, তারপর আবার একদিন বিকেলবেলা প্রিয় বন্ধু পিকাসোর কাঁধে হাত দিয়ে গিয়ে দু'জনেই নাম লিখিয়ে এলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। আবার, নাৎসিরা যখন ফরাসি দেশ অধিকার করে, তখন গোপন মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছেন সৈনিক হয়ে। মৃত্যু ১৯৫২।]

প্রেয়সী

সে আছে দাঁড়িয়ে আমার চোখের পাতায়
তার চুল এসে মিশেছে আমার চুলে
আমার হাতের মতো অঙ্গের গড়ন হয়েছে তার
আমার চোখের মতো তার রং দেখেছি চক্ষু খুলে
তাকে আমি গ্রাস করেছি নিজের ছায়ায়
বিশাল আকাশে যেমন হেলানো পাহাড়।
তার দুই চোখ খোলা সারা দিন রাত
আমায় কিছুতে দেয় না কখনও ঘুমোতে
খাঁটি দিবালোকে স্বপ্ন দেখে সে, স্বপ্নের সংঘাত
এমনকী ওই সূর্যকে দেয় উবিয়ে, যেমন কর্পূর

স্বপ্ন দিয়ে সে হাসায়, কাঁদায়, হাসায়, কথার স্রোতে
টেনে নিয়ে যায়, কিছুই বলার নাই থাক
আমি কথার নেশায় ভরপুর।

ঈষৎ বিকৃত

বিদায় বিষাদ
স্বাগত বিষাদ
তুমি আঁকা আছ দেয়ালের কড়িকাঠে
তুমি আঁকা আছ আমার ভালোবাসার চোখে
তুমি নও সম্পূর্ণ দুঃখ
কেননা দরিদ্রতম ওষ্ঠও তোমাকে
ফিরিয়ে দেয়
একটুকরো হাসিতে

স্বাগত বিষাদ
রমণীয় শরীরের ভালোবাসা
ভালোবাসার তেজ
তার মনোহরণ জেগে ওঠে
অশরীরী দানবের মতো
ব্যর্থকাম মস্তিষ্ক
বিষাদ সুন্দর মুখ

[১৯৪২-এ ফরাসি দেশের মুক্তিযুদ্ধে হাতে বন্দুক নিয়ে অসম সাহসীর মতো যখন লড়াই করেছেন এলুয়ার, দেখেছেন নিজের দেশের অসংখ্য মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তখনও তিনি প্রেমের কবিতায় বিশ্বাস হারাননি। তখনও তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি মেয়েকে ভালোবাসাই সব ভালোবাসার প্রথম সোপান, সেই ভালোবাসা থেকেই জন্ম হয় স্বাধীনতা ও পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসার। ভালোবাসা হচ্ছে সেই প্রবল আকর্ষণ যা দুটি নারী-পুরুষকে কাছে আনে, সর্বাঙ্গের রক্ত-মাংসের স্পর্শে জন্ম হয় সত্যিকারের পরিচয়, 'আমি' তখন বদলে 'তুমি' হয়ে যায়। 'তোমাকে ভালোবেসেই আমি পৃথিবীর মানুষের কাছে ফিরে এলাম।'

এলুয়ার যখন মেয়েদের বর্ণনা করেছেন, তাদের চুল, ওষ্ঠ, গ্রীবা, স্তন, জঙ্ঘা— সব কিছুর মধ্যেই একটা আশ্চর্য নম্র কমনীয়তা আছে। কোনও অঙ্গই তাঁর বর্ণনায় পৃথক নয়, নারীর একটি হাতও সম্পূর্ণ নারী। 'রুহিতনের বিবি' নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতার এক জায়গায় আছে, 'ভালোবাসাকে ভালোবেসে'— অর্থাৎ সেন্ট অগাস্টিন যেমন বলেছিলেন, 'প্রেমের প্রেমে পড়া'— একটি মেয়েকে ভালোবাসার পর— ভালোবাসাতেই চক্ষু আচ্ছন্ন হয়, বদলে যায় এই জগৎ— আমার আর বিশ্বচরাচরের মধ্যের সব ব্যবধান তুচ্ছ হয়ে যায়, সহপাঠিনী বালিকা হয় পৃথিবীর যেকোনও বা সমস্ত নারী।]

লুই আরাগঁ

[প্রেমিকাকে নিয়ে কবিরা ঢের কবিতা লিখেছেন ও লিখবেন। কিন্তু প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে তারপর আর তাকে নিয়ে কবিতা লেখার রেওয়াজ নেই বিশেষ। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে প্রেমের কবিতা লেখার ফ্যাশন কোনও দেশেই নেই। দু'-একজন কেউ লিখলেও, নাম না দিয়ে কিছুটা অস্পষ্ট বর্ণনায় এমন ভাব করা হয়, যেন কোনও অচিন-প্রিয়া, ইত্যাদি। রাধাকৃষ্ণ বা ত্রিস্তান-ইসোল্টের কাল থেকেই প্রেমের কবিতার নায়িকা পরস্ত্রী বা অনূঢ়া।

কিন্তু আরাগঁ লিখেছেন, প্রবল ও নির্লজ্জভাবে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম 'এল্‌সার চোখ'। এল্‌সা ত্রিয়োলেট নামের রাশিয়ান নারীকে বিয়ে করার পর বহু কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

জন্ম ১৮৯৭। আরাগঁ-র জীবনের ঘটনাগুলি অনেকটা তাঁর বন্ধু এলুয়ারের মতোই। দু'জনেই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আরাগঁ বীরত্বের জন্য পদক পান। তারপর ডাডাইজম আন্দোলনের স্বেচ্ছাচারে যোগদান। পরে সুররিয়ালিজম। আরও পরে কমিউনিজম। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ। এই সময়ে প্রকাশিত পরপর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'ভগ্নহৃদয়' ও 'এল্‌সার চোখ'— এতে যুদ্ধ ও দেশাত্মবোধের সরল কবিতাগুলি তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দেয়।

গদ্য-লেখক হিসেবেও আরাগঁ-র সুনাম আছে। তাঁর তিনখানি উপন্যাস ফরাসি ভাষায় কবিত্বময়তায় বিশিষ্ট। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর স্থান কোথায়— এ নিয়ে এখন বিপুল মতভেদ দেখা গিয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের মতে, তিনি এ যুগের একজন মহাকবি; অন্যদের মতে তিনি একটি বিপুল ব্যর্থতা। রাজনীতি-নিরপেক্ষ সমালোচকদের মধ্যেও এরকম মতভেদ। কারণ, আরাগঁ চান জনতার কাছে তাঁর রচনার সম্পূর্ণ আবেদন পৌঁছে দিতে, এবং তিনি বেছে নিয়েছেন কবিতার প্রথাসিদ্ধ রীতি ও সরল, মর্মস্পর্শী বিষয়। তাঁর ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার ক্রমশ হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষভাবে অনাধুনিক কবিতার মতো, অর্থাৎ চলিত ভাষায় আমরা যাকে পদ্য বলে থাকি। নিম্নোদ্ধৃত কবিতার অনুবাদেও আমরা আমাদের সচরাচর অব্যবহার্য কয়েকটি পুরনো শব্দ ব্যবহার করে সেই পুরনো ভাবটি আনার চেষ্টা করেছি।

যুদ্ধের সময় লেখা আরাগঁ-র 'দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ' কবিতাটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। এই কবিতাটি একসময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। এবং এখনও যুদ্ধের-উপরে লেখা সার্থক কবিতা হিসেবে এর কৃতিত্ব সমসাময়িকতা ছাড়িয়ে আছে।]

লিলি ও গোলাপ

কুসুমের মাস রূপান্তরের মাস
মে মেঘহীন জুনের পৃষ্ঠে ছুরি
ভুলব না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিশ্বাস
বসন্তে আরও লুকানো যে মঞ্জরী

ভুলব না আমি কখনও করুণ মায়ায় দৃশ্যমান
জনতার স্রোত চিৎকার রোদ্দুরে
ভালোবাসা-মোড়া সাঁজোয়া বাহিনী বেলজিয়ামের দান
বাতাস ও পথ কাঁপে মাছিদের ভনভনানির সুরে

বিবাদের আগে দ্রুত হঠকারী জয় অধিকার পায়
সুন্দরীদের লাল চুম্বন রক্তপাতের অগ্রিম
মৃত্যুর কাছে যারা যাবে তারা দাঁড়িয়ে বারান্দায়
ফুলের মালায় ভরে গেছে বুক জনতার হিমসিম

ভুলব না আমি ফ্রান্সের সেই প্রিয় উদ্যানগুলি
ওরা যেন বহু প্রাচীন কালের ভোরে প্রার্থনা গান
নৈঃশব্দের ধাঁধা সন্ধ্যার যাতনা কেমনে ভুলি
ছিল আমাদের যাত্রার পথে গোলাপ যে অফুরান......

......থেমে গেছে সব শত্রু এখন ছায়ায় নিয়েছে বাস
প্রিয় প্যারিসের পতন শব্দ শত্রুর মুখে শোনা
ভুলব না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিশ্বাস
এবং আমার দুই ভালোবাসা হারিয়েছি ভুলব না

প্রথম দিনের লিলির স্তবক ফ্লান্ডার্সের ফুল
মৃত্যু যে রঙ গণ্ডে মেশায় ফুলে সেই জাগরণী

আর তুমি হায় কোমল গোলাপ অপসরণের ভুল
আঁজুর গোলাপ তোমার বর্ণ দূর কামানের ধ্বনি

[এই কবিতার কয়েকটি উল্লেখ স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুটি মাসের ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়। ১৯৪০-এর মে-জুন। আরাগঁ তখন সৈন্যবাহিনীতে। মে মাসে ফরাসি বাহিনীর মধ্যে জয়ের ছদ্ম আশা জন্মেছিল। মে মাসের স্নিগ্ধ সূর্যালোকে সাদা লিলি ফুল সেই ভুল আশার প্রতীক। ফরাসি বাহিনী চলেছে আলরিয়ার খালের দিকে প্রতি-আক্রমণে, বেলজিয়ামের অকৃপণ সাহায্য, সেই উপলক্ষে নাগরিকদের উৎসব। যুদ্ধের ট্যাঙ্কগুলো ভালোবাসায় মোড়া— অর্থাৎ, পশ্চিম দেশের যেমন রীতি— যুদ্ধে যাবার সময় সুন্দরী তরুণীরা দলে দলে ছুটে এসে গাড়ির ওপর উঠে সৈনিকদের আলিঙ্গন-চুম্বন দেয়। সৈনিকদের গালে সেই লালচে লিপস্টিকের দাগ— যেন তাদের আসন্ন মৃত্যু-পরোয়ানা। গোলাপ ভয়ংকর জুন মাসের ফুল— যে জুন মাসে আশাভঙ্গ এবং পশ্চাদপসরণ। ১৪ জুন প্যারিসের পতন। পরাজিত সৈন্যদের ফিরে আসার পথে আর কোনও অভ্যর্থনা নেই, উৎকট স্তব্ধতা, শুধু পথের পাশে পাশে লাল গোলাপের ঝাড়। দুই ভালোবাসাকে হারানো— অর্থাৎ প্রিয় প্যারিস ও প্রিয়তমা এল্সা।

প্যারিসের বাগানগুলির সঙ্গে প্রার্থনা গানের তুলনা—একটু দূরান্বয়ী মনে হতে পারে, মূল কবিতায় আছে missel, অর্থাৎ ইংরেজি missal— আগেকার রোমান ক্যাথলিক গির্জায় রক্ষিত প্রার্থনা সংগ্রহ-পুস্তক। প্রার্থনা-পুস্তকের সঙ্গে বাগানের তুলনা এই হিসেবে হতে পারে, যে রঙিন ফুলের চৌখুপ্পি করা বাগানের সঙ্গে নানা বর্ণে চিত্রিত প্রার্থনা-পুস্তকের দৃশ্যত সাদৃশ্য। তেমনি আঁজুর গোলাপ, মূল কবিতায় আঁজু শব্দটি ছিল লাইনের শেষে। আঁজু অঞ্চলের গোলাপ এমন কিছু বিখ্যাত নয়— তবু কেন আঁজুর উল্লেখ— আগে ফ্লান্ডার্সের ফুল বলার তবু মানে হয়, কারণ সৈন্যবাহিনী এগিয়েছিল ফ্লান্ডার্স দিয়ে— কিন্তু আঁজু? ওটা মনে হয় এসেছে মিলের খাতিরে— কবিদের এরকম স্বভাব আছেই।

মূল কবিতা থেকে আট লাইন আমি বাদ দিয়েছি। মূল কবিতায় আছে লাইলাক ফুল, কিন্তু বাংলায় লিলি নামটা পরিচিত। মে মাসে লিলি ফুল ফোটার কথা তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই পড়েছি।]

আঁরি মিশো

[সাম্প্রতিক ফরাসি কবিতায় দুই সৃষ্টিশীল প্রধান কবি মিশো এবং বনফোয়া। আঁরি মিশো এখন বয়সে প্রবীন— কিন্তু এই অভিমানী, আত্মভুক, পাগলাটে পুরুষটি ফরাসি কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিনিধি।

মানুষের মনের ভিতরের হিংস্র, ভয়ংকর জগৎ থেকে দানবগুলিকে বারবার টেনে এনেছেন, কিন্তু মুক্তি বা রূপান্তরে বিশ্বাস করেননি মিশো। এই কবি নৈরাশ্যবাদী। অর্থাৎ অন্তর্জীবনের অজ্ঞানকে আবিষ্কার ও মনুষ্যত্বের রূপান্তর নয়, তাঁর কবিতা কবিতার

মধ্যেই শেষ। কবিতা লিখে মানুষের উন্নতি করতে তিনি আসেননি, বরং নিজের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ, যে যুদ্ধে জয়-পরাজয় কিছুই নেই, জীবন এইরকমই— তীব্র, নির্বাচিত ভাষায় আঁরি মিশো লিখে চলেছেন। বোদলেয়ারের পর থেকে ফরাসি কবিতায় মেটাফিজিকাল দিক যে ক্রমশ কমে আসছে, মিশোই তার চরম উদাহরণ। তাঁর লেখায় প্রতীকের ব্যবহার খোঁজা নিরর্থক। কবিতা জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তের মতো, প্রত্যেকটি কবিতারই আলাদা অস্তিত্ব আছে, মানুষ বা মুহূর্তের মতোই তার জন্ম-মৃত্যু।

মিশো-কে প্রথম অভ্যর্থনা জানান আঁদ্রে জিদ। মিশো সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। মিশোর জন্ম ১৮৯৯, আসলে জাতে বেলজিয়ান। ব্রাসেলসে ডাক্তারি পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিয়ে নাবিকের চাকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। সেই সময়ে ঘুরেছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বন্দরে। ফিরে এসে প্রথম লেখা শুরু করলেন। পঁচিশ বছর বয়সে প্যারিসে এসে আস্তানা নিলেন। সেইসময় সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন প্রবল, মিশো ওই পালকেরই পাখি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি ঈর্ষাবশত, ব্রেতোঁ-র একনায়কত্বের জন্য। আবার ভ্রমণ এশিয়া মহাদেশ। ফিরে এসে প্রবল কবিতা ও ছবি আঁকা নিয়মিত। রুগ্ন শরীর, কিন্তু গত এক দশক গাঁজা, মেস্কালিন, হাসিস, আফিম ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে পরীক্ষা করছেন। পরীক্ষা, নেশা নয়।

এশিয়া মহাদেশ ভ্রমণের পর একটি বই লিখেছিলেন, 'এশিয়ার এক বর্বর'। সে বইয়ের কোনও কোনও মন্তব্যে এ দেশের অনেক গোঁড়া লোক খুশি হন না, কিন্তু বইটি ভারী মজার।]

একজন শান্ত মানুষ

বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে দেয়াল ছুঁতে না পেরে প্লুম অবাক হয়ে গেল। সে ভাবল, 'হুঁ, পিঁপড়েতে খেয়ে গেছে.....' এবং সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরেই ওর স্ত্রী ওকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল, 'কুঁড়ের যম, একটু চোখ মেলে দ্যাখো, তুমি যখন ঘুমিয়ে কাদা, তখন ওরা আমাদের বাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেছে।' এবং সত্যিই ওদের চারপাশে সীমাহীন আকাশ ছড়ানো। 'বাঃ, হয়ে যখন গেছেই...' সে ভাবল। তারও একটু পরে সে একটা শব্দ শুনতে পেল। একটা ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে ওদের দিকে ছুটে আসছে। 'যে-রকম জোরে ওটা আসছে, তা দেখে মনে হয়' সে ভাবল, 'আমরা পালাবার আগেই...' এবং সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর শীত তার ঘুম ভাঙাল। ওর সমস্ত শরীর রক্তে ভেজা। ওর স্ত্রীর টুকরো টুকরো দেহ পাশে পড়ে আছে। সে ভাবল, 'রক্ত-টক্ত থাকলে অনেক বিশ্রী ব্যাপার পর্যন্ত গড়ায়; ট্রেনটা যদি সত্যিই না আসত, আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু যখন কাণ্ডটা ঘটেই গেছে...' সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

—তা হলে, বিচারক বললেন, তুমি এর কী কারণ দেখাতে পারো যে, তোমার স্ত্রী

যখন অমন ভয়ংকরভাবে নিজেকে টুকরো টুকরো করল— লোকেরা ওর লাশ আটটা টুকরোয় ভাগ করা দেখেছে— এবং তুমি পাশে শুয়ে থেকে ওকে এ কাজে বাধা দেবার কোনও চেষ্টাই করোনি, এমনকী তুমি কিছু লক্ষই করোনি। এটাই আসল রহস্য। পুরো কেসটা এর ওপরই নির্ভর করছে।

'এই মামলায় আমি ওকে কোনও সাহায্যই করতে পারব না', প্লুম ভাবল, এবং সে আবার ঘুমের মধ্যে ফিরে গেল।

—ফাঁসি হবে কাল সকালে। আসামি তোমার কিছু বলার আছে?

—মাপ করবেন, আমি কেসটা গোড়া থেকে কিছুই শুনিনি। সে বলল। এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আগামীকাল এখনও নয়...

ঘোরো, ঘোরো, দ্বিমুণ্ড ভাগ্য,
আমাদের ব্যান্ডেজমোড়া শরীরের গ্রহগুলি থেকে ছিটকে ওঠা
গভীর গতি, ঘোরো।

দেরির জন্য সূর্য,
আবলুশ ঘুম,
আমার স্বর্ণফলের বুক।

দু' হাত ছড়িয়ে
আমরা আলিঙ্গন করি ঝড়,
আমরা আলিঙ্গন করি আয়তন,

আমরা আলিঙ্গন করি বন্যা, আকাশ, ব্রহ্মাণ্ড,
আমাদের সঙ্গে যা-কিছু আজ আমরা আলিঙ্গন করেছি,
ফাঁসি কাঠের উপরে রতি-ক্রীড়ায়।

[অনুবাদের সীমাবদ্ধতা, অনুবাদকের অক্ষমতা ইত্যাদি প্রশ্নে এখানে আঁরি মিশোর দুটি প্রায় অপ্রধান কবিতাই অনূদিত হল। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে 'আমার রাজা'— যে কবিতায় কবি নিজস্ব মধ্যরাত্রে জেগে উঠে নিজের রাজার সঙ্গে লড়াই করছেন কিংবা 'দুর্ঘটনার পর' প্রভৃতি কবিতা অনুবাদেই মিশোর সত্যিকারের পরিচয় বোঝা যেত।

ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কা এই শতাব্দীতে যে ধরনের গদ্যলেখক, কবিতায় আঁরি মিশোও

অনেকটা তাই। কাফ্‌কার চরিত্র জোসেফ কে-র মতো, বা আলবিয়ার কামু-র মেরশো-র মতো, প্লুম নামের চরিত্রটিও মিশোর বহু কবিতায় ঘুরে ঘুরে এসেছে।

প্লুম হচ্ছে আধুনিক মানুষের প্রতিভূ— যে এই নিষ্ঠুর এবং দুর্বোধ্য জগতের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। মিশো কখনও কখনও এই লোকটিকে প্রচণ্ড বিদ্রূপও করেছেন, ওকে ক্লাউন বানিয়েছেন।]

ফ্রাঁসিস পঁঝ

[ফ্রাঁসিস পঁঝকে মনে হয় ফরাসি কবিতার...ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, একক। বোদলেয়ার থেকে শুরু হয়েছে যে হৃদয়-খোঁড়া, অজ্ঞাত প্রদেশের উদ্ভাসন, পঁঝ সে পথে যাননি। তাঁর কবিতার মূল বিষয় মানুষ নয়, বস্তু। কাঠ, লোহা, জল, সিগারেট দেশলাই, শামুক, বরফ, ঝিনুক— এইগুলিই তাঁর চোখের কেন্দ্র, বস্তুর চরিত্র অনুযায়ীই তিনি মানুষের সম্পর্কের কথা ভেবেছেন। পাসকালের স্বধর্মী পঁঝ বহির্জগতে ধ্যানমগ্ন, প্রতিদিনের দেখা জড়পদার্থের মধ্যেই তাঁর কবিত্বের আবিষ্কার। এইসব বস্তুকে তিনি জীবনের চরিত্র দিয়েছেন, কিন্তু নিজের জীবনের সঙ্গে মেলাননি, সেই হিসেবে পঁঝ প্রতীকধর্মী নন।

পঁঝের এই নির্লিপ্তভাবে গল্প বলার ভঙ্গিতে কবিতা, তাঁর পরবর্তীদের মধ্যেও অনুকারী বা অনুসারী সৃষ্টি করেনি, কবিতার চরিত্রে ফরাসি কবিতায় তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনন্য, কিন্তু ১৯৫০-এর পর কিছু আধুনিক ঔপন্যাসিক, এল্যাঁ রব গ্রিয়ে বা মিশেল বুতর—এঁদের রচনায় পঁঝের প্রভাব স্পষ্ট।

জন্ম ১৮৯৯। বাবা ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, তাঁর কাছে এবং প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে সাংবাদিকতা এবং পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলেন। সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ। ঘটনাহীন জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে সাংবাদিকদের সংগঠন করেছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে প্যারিসের আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে অধ্যাপনা করছেন।]

তিনটি দোকান

বড় রাস্তার কাছে, যেখানে রোজ খুব ভোরে আমি বসে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি, তিনটি পাশাপাশি দোকান। একটি সোনারুপোর, একটি কয়লা আর কাঠের, আরেকটি মাংসের। দোকান তিনটির দিকে পরপর তাকিয়ে আমি লক্ষ করি স্বভাবের বিভিন্নতা, আমার চোখে ধাতু, মূল্যবান পাথর, কয়লা ও জ্বালানি কাঠ এবং মাংসের টুকরো।

ধাতুগুলি সম্পর্কে বেশিক্ষণ ভাবার দরকার নেই— ওরা কাদা-মাটির ওপর

মানুষের ভয়ংকর বা নিরূপিত প্রচেষ্টার ফল— অথবা প্রাকৃতিক আলোড়ন— যার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। মূল্যবান পাথরগুলি সম্পর্কেও তাই, ওদের দুর্লভতাই আমাদের কিছু নির্বাচিত শব্দের বর্ণনা দিতে বাধ্য করে— প্রকৃতির সম্পর্কেও যেরকম শুদ্ধ বর্ণনা।

মাংসের ব্যাপারে, দেখা মাত্রেই আমি কেঁপে উঠি, এক ধরনের আতঙ্ক অথবা সহানুভূতি আমাকে আলাদা হতে বাধ্য করে। তা ছাড়া, সদ্য ছাড়ানো মাংস— একটা সূক্ষ্ম কুয়াশা বা ধোঁয়ার আস্তরণ আড়াল করে রাখে— আক্ষরিক অর্থে খাঁটি সংস্কারাদি যাঁরা প্রকাশ করতে চান— তাঁদের চোখ থেকেও। ওর কেঁপে ওঠা স্বভাবের দিকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনোযোগ গেলে— আমার যা বলার বলতে পারব।

কিন্তু কাঠ ও কয়লা সম্পর্কে চিন্তা— সত্যিকারের আনন্দের উৎস— সরল, নিশ্চিন্ত এবং শান্ত আনন্দ— যা আমি খুশি মনে ভাগ করে নিতে চাই। এর বর্ণনা দিতে আমার পাতার পর পাতা লাগা উচিত, এখানে আমার মাত্র আধ পাতা সীমা, সুতরাং আপনাদের চিন্তার জন্য আমি সূত্রাকারে এই বিষয়ের আভাস দিচ্ছি:

১) ভেকটরে অধিকৃত সময় সর্বদাই নিজের প্রতিশোধ নেয় মৃত্যুতে।

২) ধূসর— কারণ ধূসরই হচ্ছে অঙ্গার হবার পথে সবুজ ও কালোর মধ্যবর্তী পথ, কাঠের ভাগ্যে আরও— যদিও সামান্যতম— আছে একটি রোমাঞ্চকর গল্প, অর্থাৎ একটি ভুল, হঠকারিতা, এবং সমস্ত সম্ভব ভুল বোঝাবুঝি।

দেশলাই

আগুন দেশলাই কাঠিকে শরীর দেয়
একটি জীবন্ত শরীর, তার ভঙ্গি
তার পদোন্নতি, একটি সংক্ষিপ্ত গল্প
উৎস থেকে জ্বলে ওঠে গ্যাস
তাকে দেয় ডানা ও পোশাক, এমনকী শরীর;
একটি গতিময় আকার
এবং সঞ্চরমাণ। খুব দ্রুত।

একমাত্র তার মাথাটাই শুধু কঠিন বাস্তবের সংঘর্ষে
শিখায় জ্বলতে পারে,
খেলার মাঠে স্টার্টারের পিস্তলের মতো তখন এর শব্দ।

কিন্তু যে মুহূর্তে ধরা হল
শিখা
সরল রেখায়, দ্রুত— জাহাজের পাল
ঝুলে পড়ার মতো—
কাঠের রূপালী বর্ণে উঠে আসে,
এবং তাকে ছোঁয়া মাত্রই
পুরোহিতের মতো কালো করে
রেখে যায়।

[বস্তুকে মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন বলেই পঁঝের কবিতা আবেগময় নয়, বরং যুক্তিগ্রাহ্য এবং কঠিন। তাঁর শব্দ ব্যবহারও খুব নির্বাচিত এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষাময়। এ ধরনের দুরূহ কবিতা, বাংলায় বোঝাবার জন্য আমরা অবশ্য সরল ভাষাই ব্যবহার করেছি। প্রথম কবিতায়, ভেকটর শব্দটির আমি বাংলা পরিভাষা পাইনি। জ্বালানি কাঠের আশু রূপান্তর বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভেকটর অঙ্কের শব্দ, বাংলা অঙ্কের পত্রিকা "অঙ্ক-ভাবনা"র প্রথম সংখ্যায় ভেকটরের এই সংজ্ঞা পেলাম: 'ভেকটর গণিত শাস্ত্রমতে নিছক পরিমাণ, এই ভেকটরের মানগুণ্য (magnitude) এবং দিক অভিমুখ নির্ণীত থাকে। সাধারণত, ভেকটরের ব্যাপার হিসাবে বেগ এবং জোর ধরা হয়।']

জাক প্রেভের

[বিংশ শতাব্দীর ফরাসি কবিদের মধ্যে জাক প্রেভের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার জন্য যা যা দরকার, সহজবোধ্যতা, শব্দের চমক ও খেলা, লঘু সুর, চেনাশুনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি, জাক প্রেভের এর সব-ক'টাতেই খুব সিদ্ধহস্ত। কবি হিসেবে যথেষ্ট নিম্নমানের, কিন্তু তাঁর কবিতার বই হু-হু করে বিক্রি হয়, প্যারিসের নাইট ক্লাবে প্রেভেরের গান, রেকর্ড, রেডিয়ো ফিল্মেও ঘন ঘন তাঁর রচনার ব্যবহার। কিন্তু কবি হিসেবেও প্রেভেরকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা যায় না। তাঁর ছন্দ ও শব্দের ব্যবহার— বহু প্রতিষ্ঠিত কবির কাছেও ঈর্ষণীয়। প্রেভের যদিও নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেন, তিনি মজা করার জন্য নিজেকে খুশি করার জন্যই কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম বিদ্রূপবোধ এবং খেলো ও কথ্য শব্দের মধ্যে কবিত্বের বিকাশ সমালোচকরাও স্বীকার করেছেন। যেকোনও সংকলনে তাঁর স্থান নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশেও প্রেভের কিছুটা পরিচিত। বিষ্ণু দে ও অরুণ মিত্র প্রেভেরের অনুবাদ করেছেন। একটি দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

প্রেভেরের জন্ম ১৯০০ সালে। যথারীতি, সমবয়েসিদের মতো উনিও সুররিয়ালিজম, কমিউনিজমের স্তর পেরিয়ে এসেছেন পর পর। সিনেমার গল্প লিখেছেন কয়েকটি, তা

ছাড়াও সাময়িকপত্রে ছোটগল্প ও রেকর্ডের জন্য গান লেখেন। প্রেভেরের রচনা অনেকটা স্বভাবকবিদের মতো স্বতঃস্ফূর্ত— এবং প্রতিদিনের দেখা চরিত্র— অর্থাৎ পুরুত, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ— যাদের হাতে সাধারণ নিরীহ মানুষ নিয়ত অত্যাচারিত হচ্ছে— প্রেভেরের বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধে। এবং তাঁর বিদ্রূপের ধরন নানা অসংগতির মধ্যে চরিত্রগুলোকে জট পাকিয়ে উলটোপালটা এলোমেলো করে দেওয়া।]

তোমার জন্য হে আমার প্রেম

পাখির বাজারে গিয়েছি আমি
পাখি কিনেছি
তোমার জন্য
হে আমার প্রেম
ফুলের বাজারে গিয়েছি আমি
ফুল কিনেছি
তোমার জন্য
হে আমার প্রেম
লোহার বাজারে গিয়েছি আমি
শিকল কিনেছি
কঠিন শিকল
তোমারই জন্য
হে আমার প্রেম
তারপর ক্রীতদাস-দাসীদের বাজারে গিয়েছি
এবং খুঁজেছি
তোমাকে পাইনি
হে আমার প্রেম

শোভাযাত্রা

সোনায় মোড়া একটি বৃদ্ধের সঙ্গে একটি দুঃখিত ঘড়ি
রানি পরিশ্রম করছেন এক ইংরেজের সঙ্গে
আর মাছ-ধরা শান্তির জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের অভিভাবক
ব্যঙ্গনাট্যের বীরপুরুষ, তার সঙ্গে মৃত্যুর বোকা হাঁস

কফির সাপের সঙ্গে এক চশমা পরা কারখানা
দড়ির খেলার শিকারির সঙ্গে এক বহুমুন্ডের নর্তকী
ফেনার সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এক অবসরপ্রাপ্ত তামাকের পাইপ
কালো পোশাকে সজ্জিত এক পিচ্ছিল নোংরা শিশুর সঙ্গে একটি
নিকারবোকার পরা ভদ্রলোক
ফাঁসিকাঠের গান লেখকের সঙ্গে একটি গায়ক পাখি
বিবেক সংগ্রাহকের সঙ্গে এক সিগারেট-টুকরোর পরিচালক—
বাংলাদেশের একটি কচি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে একটা ধর্মীয় মঠের বাঘ
পোর্সিলিনের এক অধ্যাপকের সঙ্গে একজন দর্শন-মেরামতকারী
রাউন্ড টেবিলের একজন ইন্সপেকটরের সঙ্গে প্যারিস গ্যাস
কোম্পানির বীরবৃন্দ
সেন্ট হেলেনের একজন হাঁসের সঙ্গে টোমাটোর রস দিয়ে রান্না
করা একটি নেপোলিয়ান
নিম্নাঙ্গের এক সদস্যের সঙ্গে ফরাসি আকাদেমির পিল
একটি বিশাল ঘোড়ার সঙ্গে সার্কাসের একটি বড় বিশপ
কাঠের ক্রুশধারী একজন টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে বাসের একজন ধর্মগান গায়ক
এক ভয়ংকর শল্যচিকিৎসকের সঙ্গে একটি দাঁতের শিশুডাক্তার
আর ঝিনুকদের সেনাপতির সঙ্গে জেসুইট সাঁড়াশি।

[দ্বিতীয় কবিতাটিতে শোভাযাত্রার নানান ধরনের মানুষের চরিত্রের অসংগতি প্রেভের বর্ণনা করেছেন বিপরীতার্থক শব্দ সমাবেশে। বর্ণিত চরিত্রগুলি দেখেই কাদের ওপর প্রেভেরের রাগ—স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। বিশেষণগুলি দ্রুত উলটে দিয়ে যে কৌতুকের সমাবেশ করেছেন— তার স্বাদ কোনও ভাষাতেই অনুবাদে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, চতুর্থ লাইনে আমি যে 'বোকা হাঁস' বসিয়েছি— ওটার মূল শব্দ, Dindon, যার অর্থ টার্কি অর্থাৎ মুরগি জাতীয় সুখাদ্য পাখি। কিন্তু, ওর আর একটাও মানে হয়, বোকাসোকা লোক। ইংরেজিতেও যেমন 'গুজ' শব্দের অন্য মানে আছে— হি ইজ এ থরো গুজ! কিন্তু বাংলায় মুরগি-হাঁসের বোকামি প্রসিদ্ধ নয়। আবার পঞ্চম লাইনের 'চশমা পরা কারখানা' কিছুই প্রায় বোঝায় না কারখানার মূল শব্দ Moulin, যার অর্থ মিল বা কারখানা— যেমন আটা-ময়দার কারখানা, কফি গুঁড়োবার কারখানা। প্যারিসের বিখ্যাত নাইটক্লাব মূল্যাঁ রুঝ— তার ওই নামের কারণ, ওই লাল বাড়িটাকে দেখতেই একটা উইন্ড মিলের মতন। কিন্তু, মূল্যাঁ কথাটার আর একটা মানে আছে ফরাসিতে, মুল্যাঁ আপারোল মানে হচ্ছে বকবকানি মেয়ে। তা হলে চশমাটা কী সুন্দর মানিয়ে যাচ্ছে!

বাহুল্যভয়ে আর দৃষ্টান্ত বাড়াচ্ছি না। কিন্তু এ ধরনের কবিতা বাংলায় লেখা হয় না বলেই, কিছুটা হয়তো স্বাদ পাওয়া যাবে ভেবে এ কবিতা অনুবাদে উদ্ধার করেছি।]

রেনে শার

[সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন, রেনে শার তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। জন্ম ১৯০৭; যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন থেকেই প্রবলভাবেই মেতে উঠেছিলেন ওই সাহিত্য-আন্দোলনে, যুক্ত ছিলেন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত, তারপর এসে গেল যুদ্ধ। সুররিয়ালিস্ট দলের যে অংশ সাম্যবাদ গ্রহণ করে, তিনি তাঁদের সমর্থন করেননি, কিন্তু যুদ্ধের সময় সাহিত্য-আন্দোলনের চেয়েও বড় কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, দেশরক্ষায়। শার-এর খ্যাতির অনেকখানি অংশই— যুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর অসমসাহসিকতার জন্য, জীবনপণ করে তিনি দেশরক্ষায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃত। এবং অনেকটা এই কারণেই, খাঁটি কবি হিসেবে শার-এর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। এই উক্তির মধ্যে বৈপরীত্যের সুর থাকলেও— শার নিজের শরীর এবং জীবন পর্যন্ত দান করতে প্রস্তুত ছিলেন দেশরক্ষায়, কিন্তু কবিতার পবিত্রতা ও শুদ্ধতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অবিচল। কবিতাকে কখনও উদ্দেশ্যমূলক করেননি। অর্থাৎ আরাগঁ প্রভৃতির মতো যুদ্ধের সময়েও চিৎকারময় কবিতা লেখেননি। শার-এর সংক্ষিপ্ত, ঘন কবিতাগুলি চিরায়তের নির্যাস, সেই জন্যই দুরূহ, যেকোনও ঘটনা বা চরিত্রই তাঁর কবিতার উপজীব্য নয়। সুররিয়ালিস্টদের অপর দুর্দান্ত প্রবক্তা আন্টোনিন আর্তো-র যেমন মত ছিল, কবির সঙ্গে এই বাস্তব জীবনের কোনও সম্পর্কই নেই, তাঁর দেশ-কাল-সমাজ কোনও কিছুর সঙ্গেই যোগ নেই— শার একথা মানতেন না, তাঁর মতে জীবনে ও বেঁচে থাকায় কবি তাঁর দেশ ও সমাজের সঙ্গে জড়িত, দায়িত্বশীল, কিন্তু কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত আরাধনা, নিজস্ব মন্ত্রোচ্চারণ। কামু-র মতে শার এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসি কবি।

শার এখন বছরের কিছুদিন প্যারিসে, কিছুদিন জন্মস্থান লিল-সুর-সরগ্ নামের দ্বীপে থাকেন। মিরো, ব্রাক্ প্রভৃতি শিল্পীদের সম্বন্ধেও লিখেছেন।]

ওরিওল পাখি

ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে উষার রাজধানী
তার সংগীত তলোয়ার, এসে বন্ধ করেছে দুঃখ শয্যা
সব কিছু আজ চিরজীবনের শেষ। (৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯)

বিরুদ্ধতা

তোমার শূকরদের মান্য করো, যাদের অস্তিত্ব আছে। আমি আত্মসমর্পণ করি
আমার দেবতাদের কাছে, যার অস্তিত্ব নেই।
আমরা নির্দয় মানুষ থেকে যাই।

তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো

তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো। বন্ধু ও শত্রুদের প্রতি সমানভাবে তোমার আঠারো বছরের অবহেলা, প্যারিসের কবিদের ন্যাকামির প্রতি, আর সেই বন্ধ্যা ঝিঁঝির একঘেয়ে সুর— তোমার গ্রাম্য ও পাগলাটে পরিবার— তুমি ভালো করেছ তাদের উদার বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে, তাদের অহংকারী গিলোটিনের খাঁড়ার নীচে পেতে। তুমি বেশ করেছ, ছেড়ে চলে গেছ অলসদের রাস্তা, লিরিক-প্রস্রাবকারীদের সরাইখানা— পশুর নরকস্থানের জন্য, প্রতারকদের ব্যবসা এবং সরল মানুষের অভ্যর্থনা।

শরীর ও আত্মার সেই দুর্বোধ্য উত্থান, লক্ষ্যস্থানে আঘাত করার সময় ফেটে যায় যে কামানের গোলা, হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত, তাই তো মানুষের জীবন! শৈশব থেকে উঠে এসে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের অনির্দিষ্টকাল হত্যা করতে পারি না। কী হয়, যদি ক্বচিৎ জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে ছড়িয়ে যায় বিশ্বের বিশাল শূন্যতায়, আনে সেই গুণাবলী যারা নিজের ক্ষতস্থানের গান করবে।

তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালো করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো। আমাদের কাছে তোমার প্রমাণ করার দরকার নেই, আমরা অল্প কয়েকজন বিশ্বাসী, যে তোমার পক্ষেও সুখ সম্ভব ছিল।

[মালার্মের পর, শার-এর কবিতাই ফরাসিতে সবচেয়ে কঠিনবোধ্য, অধিকাংশ কবিতারই স্পষ্ট, সরল, নির্গলিতার্থ করা সম্ভব নয়, নানারকম ব্যাখ্যা নিয়েও অনেক সমালোচকের মধ্যে মতভেদ আছে। কবিতায় দুর্বোধ্যতার যাঁরা বিরুদ্ধে, তাঁদের কাছে আগেই স্বীকার করা হয়তো যায় যে, শার-এর কোনও কবিতারই সম্পূর্ণ অর্থ নেই। অর্থাৎ, তিনি তাঁর আবেগ বা বিশেষ অনুভূতি কবিতায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন না, মাত্র যাত্রারম্ভটুকু। যাতে পাঠকের আত্মা ক্রমশ সেই আরম্ভটুকু অবলম্বন করে, নিজস্ব বিভিন্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মগ্ন হতে পারে। তাঁর কোনও বর্ণনাই ছবি নয়, সুরের মতো। বলা বাহুল্য, এই সুরের স্পর্শ একমাত্র পাওয়া যেতে পারে কবির নিজ নির্বাচিত মূল ভাষায় অনুবাদে শুধু প্রকরণের আভাস— তাও কম নয়, আমাদের পক্ষ অন্যরকম, নতুন।

'ওরিওল' কবিতার মর্মের সূত্র পাওয়া যাবে, রচনার তারিখে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিক। ইউরেপের কালো আকাশ পেরিয়ে এল একটি পাখি। 'ওরিওল' কথাটার মানে সোনালি পাখি, হলদে আর কালোয় মেশানো যে পাখি প্রায় সর্বত্র দেখা যায়— তার নাম, আমাদের দেশে যে হলুদে পাখিগুলো 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলে ডাকে— অনেকটা সেইরকম।

র‍্যাঁবো-র উদ্দেশে কবিতাটি নিশ্চিত অপেক্ষাকৃত সরল। বিশ্ববিজয়ী কবি র‍্যাঁবো মাত্র ১৯ বছর বয়সে (মতান্তর আছে) কবিতা লেখা শেষ করে, জীবনের যে বাকি আঠারো বছর সাহিত্য ও সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে আফ্রিকার ভয়ংকর

জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে চোরাই বন্দুকের ব্যবসা করে কাটিয়েছেন, শার র‍্যাঁবো-র জীবনের সেই দ্বিতীয় অংশকেই সমর্থন করছেন। এই সমর্থনের কারণ বোঝা যায়। প্রত্যেক কবিই চায়, এক হিসেবে কবিতা লেখার হাত থেকে মুক্তি পেতে।]

রেনে গি কাদু

[রেনে কাদুকে আজকাল অনেকেই ভুলতে শুরু করেছেন। জীবনে অসফল এই কবি, ব্যর্থ, ভগ্নহৃদয়— রাজধানী থেকে দূরেই কাটিয়েছেন সারা জীবন। 'সারা জীবন' শব্দটা শুনলেই খুব দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু রেনে কাদু-র জীবন মাত্র একত্রিশ বছরের, জন্ম ১৯২০, মৃত্যু ১৯৫১। জন্মেছিলেন ব্রিটানিতে, বাবা স্কুল মাস্টার, সাধারণ পরিবার। আমরা আগে দেখেছি, অন্যান্য ফরাসি কবিরা প্রায় সকলেই নানা দেশ ঘুরেছেন, বহু অভিজ্ঞতা, বহু নাটকীয় ঘটনা জীবনে। রেনে কাদু-র জীবন একরঙা। ভ্রমণের সুযোগ হয়নি, বাকালরিয়া— অর্থাৎ বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন বলে, বড় চাকরি পাননি কখনও, প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক, আজকাল দেখা যায়, সারা পৃথিবীতেই কবিরা নগরবাসী, অথবা রাজধানী-নিবাসী। হপকিন্সের উদাহরণ নিতান্তই ব্যতিক্রম। বাংলা কবিতার কেন্দ্র যেমন কলকাতা শহর। খ্যাতি প্রতিষ্ঠা কিংবা বার্ধক্যে ধর্ম-আশ্রয় কিংবা পল্লীনিবাসে নির্জন বিশ্রামসুখ কখনও কবিদের প্রিয় হলেও যৌবনে রাজধানী বা বড় শহরের পরিবেশ, যেখান থেকে নানান পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, নতুন বই, নানান কবিদের আড্ডাস্থল— সব কবিদেরই আকর্ষণ। কবিতার ভাষা বা রীতি প্রায় দু'মাসে-ছ'মাসে বদলে যায় বলে, একমাত্র রাজনীতিতেই তার সংস্পর্শে থেকে কবিরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জনের পথ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট হয়েও, রেনে কাদু প্যারিসে এসেছেন মাত্র একবার। জীবন কাটিয়েছেন কর্মস্থল গ্রামাঞ্চলেই। সেই ছায়াময়, শান্ত পরিবেশ তাঁর কবিতায় নতুন সুর ও সরলতা এনে দিয়েছে। তাঁর জন্মস্থান ব্রিটানি বড় স্নিগ্ধ, মনোরম ভূমি। ব্রিটানির সৌন্দর্য ভুবনবিদিত। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, ফ্রান্স থেকে বহু দূরে তাহিতি দ্বীপে থেকে পল গগ্যাঁ যে শেষ ছবিটি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন, তার নাম 'ব্রিটানির তুষার'।]

কবির ঘর

যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে কবির নিজস্ব ঘরে, সে জানে না
এ ঘরের প্রতিটি আসবাব তাকে জাদু করতে পারে
চেয়ার আলমারির কাঠে সব ক'টি গ্রন্থি ধরে রাখে

যত বিহঙ্গের গান অরণ্যের বুকে আছে, তারও বেশি।
হঠাৎ টেবিল ল্যাম্প— মেয়েদের মতো তার গ্রীবার ভঙ্গিমা
মসৃণ দেয়াল থেকে উঁকি দিতে পারে কোনও পড়ন্ত সন্ধ্যায়
চকিতে সে দেবে ডাক নানা বর্ণ নানা জাতি মৌমাছির ঝাঁক।
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছে তাজা পাঁউরুটির গন্ধ সে পারে জাগাতে।
কেননা, এই যে এত নির্জনতা এই ঘরে, তার এত শক্তি
একটি বিস্তৃত হাত অন্যমনে সামান্য আদর করে যদি
এই মূক, অন্ধকার, শান্ত, হিম প্রত্যেকটি বিশাল আসবাবে
জেগে ওঠে— ভোরের আলোয় অমলিন সরল বৃক্ষের চঞ্চলতা।

হেলেনের প্রতি প্রেমের কবিতা

যেমন নদীর শুরু হয়
আপন গতিকে ভালোবেসে
নিজেকে একদম তুমি দ্যাখো
আমার দু' হাতে নগ্ন দেহে

আমি আর কিছুই ভাবিনি
চেয়েছি পাতায় ঢেকে দিতে
তোমার ও শরীরের শীত
আমার দু' হাত বৃক্ষ পাতা

শরীরের প্রাণোচ্ছল জল
তার চেয়ে কত বেশি আর
আছে ভালোবাসার আমার,
নারীর শরীর এক পলক
আমার আঙুলে দোল খায়

এমন কী সাধ্য ছিল বলো
শুধু একবার চেয়ে দেখা
তোমার ও মর্মর শরীর—

সেই চেয়ে দেখা এক পলক
নিতান্তই পাবার বাসনা?

কুমারী, উত্তর দাও তুমি
যে বাক্য অশ্রুত অন্ধকার
আমার হৃদয় মৃদু ঝোঁকে
চাপ দেয় তোমার হৃদয়ে

যদি দেখি কখনও তোমার
রূপান্তরে কোনও অস্থিরতা
তবে সেই অস্থিরতা এই:
তোমাকে প্রেমের আগে আমি
তোমার প্রেমকে ভালোবাসি।

[হেলেন-কে ফরাসিরা উচ্চারণ করে এলেন। বা, ফরাসিদের না চটিয়ে বলা যায়, এলেনকে ইংরেজরা উচ্চারণ করে হেলেন। যাই হোক, এলেনের বদলে হেলেন-ই সেই ট্রয়ের আমল থেকে পরিচিত। হেলেন একটি সত্যিকার মেয়ের নাম, রেনে কাদুর সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয় ১৯৪৩-এ, মৃত্যুর আগে বাকি কয়েক বছরে লেখা হেলেনের প্রতি প্রেমের কবিতাবলীই কাদুর শ্রেষ্ঠ রচনা, এবং এগুলি ফরাসি কবিতায় একটি অন্যরকম সরল ধারার সূচনা হিসেবে স্বীকৃত।]

ইভ বন্‌ফোয়া

[আমাদের দেশে কবিতার যেমন কোনও ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি, কবিতা বা কবিদের নিয়ে কোনও নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা আজও শুরু হল না। একটি দেশের কবিতা একটি খরস্রোতা নদীর মতো, এক-একজন বড় কবি এক-একটি গঞ্জ বা বন্দর। মূল কবিতার স্রোত থেকে কোনও কবিকেই সম্পূর্ণ আলাদা করে ছিনিয়ে এনে আলোচনা করা যায় না। আমাদের কোনও জীবিত বাঙালি কবি সম্পর্কে যদি বলা হয়, তিনি মুকুন্দরাম বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর ধারার কবি, তবে সেই কবি নিজে তো বটেই, সমালোচকরাও আঁতকে উঠবেন। অথচ এরকমভাবে যোগাযোগ টেনে নবীন কবির কোথায় বিশেষত্ব না দেখালে কবিতার আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বরং, সাম্প্রতিক সমালোচকদের মতে, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা দেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন, বিদেশ-নির্ভর, কৃত্রিম। কিন্তু, সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, এ ব্যাপার অসম্ভব। কবিতার এক হিসেবে স্বদেশ-বিদেশ নেই। আবার, অন্যদিকে কবি যে ভাষায় লিখছেন, সেই ভাষার পূর্বাপর স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেকোনও কবির পক্ষে

অবাস্তবভাবেই অসম্ভব, শারীরিক অসামর্থ্যের মতোই। শুধু চিন্তাধারা নয়, ভাষা ব্যবহারও কবিতা।

এ প্রসঙ্গে মনে এল, কারণ, বন্‌ফোয়া, যাঁকে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ফরাসি দেশের সবচেয়ে শক্তিমান কবি বলা হয়, সমালোচকরা তাঁর কবি-চরিত্রের সূত্র পেয়েছেন ভালেরির কবিতায়, এমনকী বহু যুগ পিছিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মরিস সেভ-এর রচনায়। পূর্বে আলোচিত কবিদের মধ্যে কক্‌তো-র সঙ্গে যেমন সমালোচকরা দেখেছেন মালহার্ব বা বঁসারের মিল, দেনো-র সঙ্গে নের্ভালের, এমনকী আপোলিনেয়ার— যিনি নবীন কবিদের রাজা, তাঁরও সঙ্গে পনেরো শতকের ডাকাতকবি ফ্রাঁসোয়া ভিঁয়ো-র (অথবা ভিঁলো, দু'রকমই উচ্চারণ হয় শুনেছি) কবিতার মিল! মিল ঠিক নয়, দূর-সম্পর্কের উত্তরাধিকার।

বন্‌ফোয়া-র জন্ম ১৯২৩-এ। গণিত এবং দর্শন অধ্যয়ন করেছেন। মধ্যযুগীয় শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যে উৎসাহী। ফরাসিতে শেক্সপিয়র অনুবাদ করেছেন। এখন অধ্যাপনা করেন এবং শিল্প ও কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।]

সত্য নাম

দুর্গ, একদা যা ছিলে তুমি, তোমাকে ডেকেছি মরুভূমি
এই কণ্ঠস্বর আমি নাম রাখি রাত্রি: এই মুখ অনাগত;
এবং যখন তুমি ঝরে যাও বন্ধ্যা মৃত্তিকায়
যে বিদ্যুন্মালাখানি তোমাকে এনেছে এই দেশে, সে নাম শূন্যতা।

মৃত্যু, এক তোমার অতীতপ্রিয় দেশ, আমি আসি
শুধুই অনন্তকাল তোমার আঁধারময় পথে।
আমি ধ্বংস করি স্মৃতি, তোমার বাসনা, দেহরূপ
আমি তো তোমার শত্রু, ক্রমশই অতীব নির্দয়।

তোমার নতুন নাম যুদ্ধ রাখি, নিজ হাতে তুলে
তোমার শরীরে দেব যুদ্ধের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, অধিকার
করে নেব এই হাতে, তোমার মুখের রেখা, ছিন্নভিন্ন, ম্লান
আমার হৃদয়ে এই দেশ— ঝড়ের আভায় আলোকিত।

সারা রাত

সারাটা রাত ধরে পশুটা ঘোরে ঘরে,
এ পথ কী রকম, ফুরোতে রাজি নয়?
সারা রাত ধরে হরিণ খোঁজে তির,
কারা সে অনাগত, ফিরতে চায় আজ?
সারাটা রাত ধরে ছুরিটা ক্ষত খোঁড়ে,
এ কোন জ্বালা যার পাবার কিছু নেই?
সারাটা রাত ধরে রক্তমাখা দেহে পশুটা গুমরোয়
ঘরের আলোটুকু অস্বীকার করে,
এ কোন মৃত্যু যে কিছুই সারাবে না?

কবিতার শিল্প

রাত্রি থেকে বাইরে আসে রেণুমাখা চোখ
হাত দুটি শুষ্ক, অচঞ্চল
জ্বর নির্বাপিত, হৃদয়কে বলা হল
শুধুই হৃদয় হতে। শিরা-ধমনীতে ছিল একটি দানব
গর্জনের সঙ্গে পালিয়েছে।
মুখের ভিতরে ছিল একটি হতাশাময়, রক্তমাখা স্বর
অবগাহনের পর হয়েছে উদ্ধার।

[প্রথমেই স্বীকার করি, বন্‌ফোয়া-র 'সৌন্দর্য' নামে যে কবিতাটি আমার সবচেয়ে প্রিয়, সেটি অনুবাদের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। আশা করি, অন্য কেউ করবেন। বন্‌ফোয়া শুদ্ধ রসের কবি, ধ্যানময়। তাঁর রচনাশৈলী কঠিন, শব্দ অতিশয় নির্বাচিত। মৃত্যু এবং রাত্রি— এই দু'টি বিষয় তাঁর অধিকাংশ কবিতায় ছায়া ফেলে আছে। যদিও তাঁর কবিতা নৈরাশ্যের নয়। মৃত্যুর উপস্থিতিতে যে জীবন আলোকিত, বন্‌ফোয়া সেই জীবনের স্তোত্রপাঠক। এখানে মৃত্যু বলতে সামগ্রিক মৃত্যু হয়তো, ক্ষীণভাবে পরমাণু বোমার কথাও উল্লেখ করা যায়। একথা তো আমরা সবাই জানি যে আমেরিকানরা জাপানের হিরোশিমায় বোমা ফেলেছে, কিন্তু তার প্রভাব ও দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছেন ফরাসি লেখকরা— পিয়ের ইমানুয়েল নামে অপর একজন আধুনিক ফরাসি কবি বলেছেন, 'আমরা সবাই হিরোশিমার শিশু।'

'সারা রাত' কবিতাটিকে যেমন অধিকার করে আছে রাত্রি— সেই রকম, পশু, হরিণের ব্যাকুল ডাক, ছুরি— সবই মৃত্যুর প্রতীক, কিন্তু এই রাত্রি ও মৃত্যু কিছুই রূপান্তরিত করতে পারে না, কবি মোটেই বিচলিত না হয়ে তার নিজস্ব নির্লিপ্ত সৌন্দর্য ভোগ করছেন। বন্‌ফোয়ার কোনও কবিতাই বিচ্ছিন্ন নয়, বোদলেয়ারের 'অশিব পুষ্প' বা প্যার্সের কবিতাবলীর মতোই, তাঁর প্রায় সব কবিতাই ধারাবাহিক অনুভূতি।]

পিলিপ জাকোতে

[এবার আমরা এসে পড়েছি ফরাসি কবিতার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে। পাঠক লক্ষ করুন, সমসাময়িক বাঙালি কবিদের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিল বা প্রভেদ। পিলিপ জাকোতের জন্ম ১৯২৫-এ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ প্রমুখদের কাছাকাছি বয়সের ফরাসি কবি বন্‌ফোয়া, জাকোতে, আঁদ্রে দু বুশে, রেনে কাদু, জাক দুপ্যাঁ প্রভৃতি। ওঁদের কিছু কিছু কবিতা আলোচনা করলে, বাংলা কবিতা বিষয়ে আমাদের কিছুটা হীনমন্যতা কেটে যাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুদের কল্লোলের বিপ্লবের সময়েই এই দুর্নাম ওঠে যে, আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় বিদেশিদের কাছ থেকে ধার করা। রবীন্দ্রনাথকেও এই দুর্নাম সইতে হয়েছিল কিছুটা। সমালোচকদের এ মনোভাবকে নিশ্চিত হীনমন্যতা বলব। বাংলা কবিতা পৃথিবীর যেকোনও ভাষার কবিতার তুলনায় পশ্চাৎপদ নয়, বরং মনে হয় অগ্রবর্তী, বিদেশের কাছ থেকে গ্রহণ করার কিছু থাকলেও অনুকরণ করার কোনওই প্রয়োজন নেই। বরং, বাংলা কবিতার সুপ্রচার হলে, বিদেশি কবিরাও আমাদের থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করত। কিছু কিছু যে এখন করছে, তা-ও ঠিক।

এখন দেখতে পাচ্ছি, কবিরা অনেক সাধারণ মানুষ হয়ে এসেছেন। এতদিন পর্যন্ত কবিদের একটা মঞ্চ দরকার হত, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে তাঁকে কথা বলতে হত।— এমন রটনা ছিল যে, কবি একজন দুর্লভ-জন্মা, সে প্রবক্তা, মুক্তিদাতা। বিচারক যেমন আদালতের বাইরে একজন সাধারণ মানুষ, অন্য সকলেরই মতো চেহারা, এমনকী আসামির মতোই— কিন্তু বিচারের সময় কেন যেন তাঁকে সাধারণ থাকলে চলে না, তাঁকে বসতে হয় উচ্চাসনে, মাথায় পরে নিতে হয় সাদা পরচুলা— তেমনি কবির উপরেও অসাধারণত্বের পোশাক চাপানো ছিল— এই শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত। এখন লম্বা চুল, কাঁধে-চাদরের রূপ খুলে ফেলে কবি মিশে গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, বা লুকিয়েছে। তার ব্যবহৃত শব্দ আর পাঁচজনের মুখে ভাষা, তার বিষয় তার নিজের জীবন। জাকোতেও এই আধুনিক জগতের কবি। তাঁর ব্যবহৃত ছবি কোনও বৃহতের বা অলৌকিকের আভাস আনে না, নিজের জীবনকেই উদ্ভাসিত করে।

জাকোতের জন্ম সুইটসারল্যান্ডে। লুসান বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো করার পর, এখন সমালোচকের কাজ করেন। হোমার এবং জার্মানির ঔপন্যাসিক মুজিলের অনুবাদ করেছেন।]

আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি

আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি এক আগন্তুক
শুধুই তোমার সঙ্গে কথা বলি অজানা ভাষায়,
কেননা তুমিই বুঝি হতে পারো একমাত্র আমার স্বদেশ,
আমার বসন্ত, টুকরো খড়কুটোর বাসা, বৃষ্টিপাত বৃক্ষশাখে

সকালের আলো ভেঙে কেঁপেছে আমার এই জলের মৌচাক
জায়মান রাত্রির-মাধুর্য... (যদিও জেনেছি আমি এই তো সময়
সুখময় দেহগুলি আলিঙ্গন করে তাকে প্রেমের আশ্লেষে,
তৃপ্তির শীৎকার ওঠে— কোনও একটি কৃশাঙ্গ তরুণী

বিরলে রোদন করে শীতের উঠোনে। আর তুমি? তুমি নেই?
এ শহরে, তুমি তো যাও না হেঁটে রাত্রির সম্মুখে দেখা দিতে;
এই তো সময়, যখন নির্জন আমি, অদুষ্কর শব্দের বন্ধনে

একটি বাস্তব মুখ মনে আনি...) হে সুপক্ক ফল,
সোনালি পথের উৎস, আইভি উদ্যান— আমি শুধু তোমাকেই
ডাকি, তোমাকেই বলি, হে আমার অনাগত, নিজস্ব পৃথিবী...

অভ্যন্তর

এই সেই জায়গা, আমি চেষ্টা করছি জীবন কাটাতে
এই আমার ঘর, আমি ভালোবাসার ভান করি
এই টেবিল, যাবতীয় জড়বস্তু;— একটি জানালা
প্রতিটি আঁধার থেকে ঠেলে আনে সবুজ সীমানা।
হৃৎস্পন্দনের মতো কোকিলের ডাক ওঠে ঘন আইভি-ঝোপে
ভোরের প্রথম আলো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে
পলাতক ছায়ার উপরে।
এই তো আমার ঘর, আমি এখানেই থাকব, খুব চমৎকার
ভাবে মেনে নিতে রাজি আছি, দিনভরা বহু প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু এই মাকড়শাটা বিছানার পায়ের ওপাশে
(এসেছে বাগান থেকে, মনে হয়) অবিরাম বুনে যাচ্ছে জাল—
বহু চেষ্টা করে আমি ঠিকমতো পিষে ফেলতে পারিনি ওটাকে,
এই জাল ঘিরে ফেলে, ঢাকে, স্বচ্ছ আমার অস্তিত্ব।

[জাকোতে যেহেতু সমসাময়িক কবি, সুতরাং তাঁর কিছু নিন্দে শুরু করা যাক! এই কবির এখনও সনেট লেখার দুর্বলতা আছে। অথচ, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আধুনিক কবিই এখন সনেট লেখা অত্যন্ত কাঁচা-কাজ বলে মনে করেন, কারণ, কবিতাটি লেখার আগেই বা লিখতে লিখতে কবিকে যদি আঙ্গিক সম্বন্ধে সব সময় সজাগ থাকতে হয়, বা কবিতাটি ঠিক ক'লাইনে গিয়ে শেষ হবে মনে রাখতে হয়— তবে সেটা কবির নিশ্চিত পরাজয়। এই কৃত্রিমতা কবিরা আজকাল পরিহার করেছেন। জাকোতে-র এই দ্বিতীয় কবিতার শেষেও মাকড়শার জালের উল্লেখ খুব দুর্বল। জীবনের জটিলতা-ফটিলতা বোঝাতে মাকড়শার জালের ছবি আঁকা খুবই পুরনো হয়ে গেছে। সিনেমায় বা স্টেজে মাকড়শার জাল দেখানো এখনও খুব আধুনিকতা— কিন্তু বাংলা দেশের যেকোনও সদ্য শুরু করা আধুনিক কবিও জানেন, ও জিনিস বহু-ব্যবহৃত, এখন পরিত্যাজ্য।

জাকোতে-র বিশেষত্ব, তাঁর কবিতায় সব সময় একটা অনুসন্ধান আছে— শব্দের মধ্য দিয়ে তিনি বারবার কবিতার একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, এবং সে মূর্তি কখনওই সম্পূর্ণ হয় না। প্রথম কবিতায়, কবি একজন 'পরবাসী', তিনি নিজের প্রেয়সীকে খুঁজছেন, সেই সঙ্গে স্বদেশ, কারণ, বাসভূমি না পেলে প্রেয়সীকেও পাওয়া যাবে না। বারবার প্রেয়সী এবং স্বদেশের ছবি মিলে যাচ্ছে, কবির সন্দেহ, তাঁর ভাষা হয়তো তাঁর অনুসন্ধান ব্যক্ত করতে পারছে না।]

দু'জন নিগ্রো কবি

[ফরাসি দেশের বাইরে আগেকার ফরাসি উপনিবেশগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে কয়েকজন ফরাসি ভাষায় কবিতা লিখেছেন— তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দু'জন, এমে সেজার এবং লেওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর। এঁদের মধ্যে, এমে সেজারের কবিত্ব বহুজনস্বীকৃত, তিনি সুররিয়ালিস্ট কবিদের অন্যতম, এবং উল্লেখযোগ্য ফরাসি কবিদের সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর নাম প্রায়ই দেখা যায়; যদিও আশ্চর্যের বিষয়, বহু কবিতা সংকলনে তিনি অবহেলিত। সেঙ্ঘরের কবিত্ববোধ খুব সুক্ষ্ম না হলেও, তিনিও যথেষ্ট বিখ্যাত এবং আফ্রিকার একটি নবীন রাষ্ট্রের তিনি রাষ্ট্রপতি এখন।

এককালের ভারতীয়দের কাছে বিলেতের মতো, ফরাসি উপনিবেশের প্রতিভাশালী তরুণরাও প্যারিসে লেখাপড়া শিখতে যেতেন। বর্ণ-বৈষম্যের বিষ এঁরাও সহ্য করেছেন।

একটি ফলের ব্যবসায়ী ভাল ভাল মর্তমান কলার বিজ্ঞাপন দিয়ে প্যারিসের দেয়ালে দেয়ালে প্রায়ই পোস্টার লাগান। সেই পোস্টারের ছবিতে আছে, একটি নিগ্রো আহ্লাদের সঙ্গে কলা খাচ্ছে। কালো কুচকুচে চেহারার নিগ্রো হলদে রঙের পুরুষ্ট কলা মুখে দিয়ে আছে— ছবিটা হাস্য উদ্রেক করে। দুঃখিত সেঙ্ঘর যুবক বয়সে প্যারিসের পথে পথে ঘোরার সময় লিখেছিলেন, 'আমার ইচ্ছে করে প্যারিসের দেয়াল থেকে ওই হাসিমাখা মুখগুলো উপড়ে নিতে!'

আমরা দু'জনের কবিতা অনুবাদ না করে, এমে সেজারকে লেখা সেঙ্ঘরের একটি কবিতা তুলে দিলাম। খাঁটি কবিতার আস্বাদ এতে হয়তো পাওয়া যাবে না— কিন্তু একজন সমসাময়িক কবির প্রতি অপর কবির এমন আন্তরিক আহ্বান ও শ্রদ্ধার চিহ্ন দুর্লভ। কবিতাটি খানিকটা অভিমানেরও। কবিতার সুউচ্চ স্বর্গ থেকে তিনি সেজারকে দেশের মাটিতে নেমে আসতে বলছেন।]

লেওপোল্ড সেঙ্ঘর
এমে সেজারকে চিঠি

প্রিয় ভ্রাতা এবং বন্ধুর প্রতি আমার সংক্ষিপ্ত এবং সহোদরপম শুভেচ্ছা
বোকা কালো মানুষের দল এবং দূর দুরান্ত পরিভ্রমণকারীরা তোমার প্রতি
মশলা সুগন্ধ এবং দক্ষিণের নদী ও দ্বীপের শব্দে ভরা
সমৃদ্ধ ভাষায় প্রশস্তি জানিয়েছে।
তোমার প্রশস্ত কপাল এবং তোমার সূক্ষ্ম ওষ্ঠের ফুলের প্রতি ওদের স্তুতি
তোমার শিষ্যদের জন্য শ্রদ্ধা এক মৌচাক স্তব্ধতা,
ময়ূরের বর্ণময় পাখা
চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত যে তুমি ওদের উৎসাহকে তৃষ্ণাময়
এবং অতৃপ্ত রেখে দাও
সে কি তোমার রূপকথার ফলের মিষ্টি গন্ধ না দুপুরে
মাঠে হলকর্ষণের আলো?
সাপাডিলার ছালপরা নারীরা তোমার আত্মার সেরালিও-তে
বসতি করে।

তোমার জীবন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি সময় ছাড়িয়ে মুগ্ধ
ছাইমাখা চোখের পাতা ছাড়িয়ে— তোমার সংগীতের প্রতি
আমাদের অতীত বছরের হাত ও শ্রদ্ধা বাড়িয়েছি

তুমি কি ভুলে গেছ তোমার মহত্ত্ব, তোমার কথা ছিল
পিতৃপুরুষ, রাজকুমারের দল ও ঈশ্বরের গান করা—
ফুল নয়, কুয়াশা নয়।
আমাদের আত্মায় তুমি এনে দেবে তোমার বাগানের সাদা ফুল
ফুল শুধু খাদ্য, ফসলের বৎসরেই ফুটেছে
তোমার নিশ্বাস সুগন্ধ করে নিতে তুমি তার একটি
পাপড়িও চুরি করবে না
অতীত ঘটনার কুণ্ড থেকে আমি তোমার মুখ স্পর্শ করি
তরুণ প্রণয়কে সতেজ করার জন্য আমি বসন্তকে ডাকি
তুমি রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছ, একটি ছোট পাহাড়ে বাহুর ভর
তোমার শয্যার চাপে ভূমি ঈষৎ দুঃখিত।
জলে ডোবা জমিতে দুঃখিত ঢাকের বাজনা তোমার গান গায়
তোমার কবিতা রাত্রি এবং দূর সমুদ্রের নিশ্বাস।
তুমি সংগীত ও ছন্দের নিখাদে আকাশ থেকে একটি তারা ছিঁড়ে আনবে
হতভাগ্য দরিদ্রেরা সারা বছরের উপার্জন দেবে তোমার পায়ে
তোমার নগ্ন পায়ের কাছে মেয়েরা ডালি দেবে তাদের রজন হৃৎপিণ্ড
দেখাবে পরাজিত আত্মার নাচ।

হে বন্ধু, তোমাকে ফিরতে হবে
আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব— কেইসভ্রাটি গাছের নীচে
জলপোতের অধিপতির কাছে আমি এই গোপন কথা বলেছি।
অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে তুমি ফিরে আসবে। সূর্য ডুবে গেলে
ম্লান রাত্রি যখন ভর করে বাড়ির ছাদে
খেলোয়াড়েরা যখন বরের বেশে যৌবন দেখায়
সেই কি তোমার ফিরে আসার চিহ্ন?

[সাপাডিলা এক ধরনের চিরহরিৎ বৃক্ষ, হলদে-ছাই-রঙা ফল হয়। সেরালিও (Seraglio), তুর্কি 'সেরাই' শব্দের সঙ্গে মিল আছে কিছুটা, বন্ধ ঘর— যেখানে কোনও মুসলমান তাঁর স্ত্রী বা রক্ষিতাকে আব্রুতে রাখেন। ছোট হারেম বলা যায়। কেইসভ্রাট কী ধরনের গাছ আমি জানি না। আফ্রিকার কয়েকটি প্রবাদ বা উপকথারও উল্লেখ আছে— সেগুলো আমার জানা নেই।]

ইতালির কবিতা: গোধূলি ও ভবিষ্যৎ

এই শতাব্দীর শুরুতে, ফরাসি কবিতায় যেমন যৌথ সম্রাট ছিলেন দুই দিকপাল, ভালেরি এবং ক্লোদেল— এবং পরে আপোলিনেয়ার এসে এবং সুররিয়ালিস্টদের বিদ্রোহ ফরাসি কবিতায় নতুন ধারা এনে দেয়— সেইরকমই, ইতালির কবিতায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত স্তম্ভ ছিলেন তিনজন মহৎ কবি, কার্দুচ্চি, পাসকোলি এবং দানুৎসিয়ো— এঁদের প্রতিহত করে নবীন বিদ্রোহ শুরু হয় ইতালিতে। এই তিনজনকে বলা যায় রোমান্টিক যুগের শেষ অশ্বারোহী, দীপ্ত, বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদে ভূষিত মানুষকে এঁরা মহামানব করতে চেয়েছিলেন— এঁদের প্রভাব ধ্বংস করার জন্য নবীনরা কবিতায় নিয়ে এলেন একরঙা সাধারণ মানুষের কথা— যে মানুষ লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত, আত্মগোপনকারী— এই যন্ত্র ও যুদ্ধের যুগে যে মানুষ অতি সাধারণ এবং অসহায়। এই নবীন আন্দোলনের নাম 'ভবিষ্যৎবাদ'— রোমান্টিকদের অতীতে-মুখ-ফেরানো স্বরূপের বিরুদ্ধে নবীনদের এই উত্তর। ইতালির কবিতার এই আন্দোলনের সঙ্গে সেই সময়ের ফরাসি কবিতার তেমন মিল নেই, কিন্তু ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আছে। তুলনীয় সমসাময়িককালে টি এস এলিয়ট রচিত 'ফাঁপা মানুষ' কিংবা প্রুফকের উক্তি, 'আমি যুবরাজ হ্যামলেট নই, আমি তা হতেও চাইনি!' এই ভবিষ্যৎবাদের পরবর্তী আন্দোলনের নাম 'হারমেটিক' বা বলা যায় 'নিরুদ্ধ কবিতার' আন্দোলন— যে মতবাদ, একটি কবিতার মধ্যেই শেষ। যাই হোক, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইতালির 'ভবিষ্যৎবাদ' আন্দোলনের আগে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্থক আন্দোলন হয়েছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গোধূলি কবিতা'। স্বল্পস্থায়ী হলেও সে আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

রোমান্টিকদের প্রতিনিধি যদি দান্নুৎসিয়োকে ধরা যায়, তবে, সেই বিশাল পুরুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল দুটি রোগাপটকা বাচ্চা ছেলে। নিৎসের শিষ্য দানুৎসিয়ো তাঁর গল্পে, নাটকে এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রবলভাবে আশার জয়গান, বীরত্ব এবং রমণীসম্ভোগের কথা বলেছেন উজ্জ্বল ভাষায়, শব্দের ঝংকারে, ছন্দের চমৎকারিত্বে। তাঁর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াল, তারা যেন নিষ্প্রাণতার প্রতীক— ম্লান, অলংকারহীন ভাষা, সাধারণ শব্দাবলী— ভাঙা দুর্গ, পরিত্যক্ত বাগান, ঘরের জানলা, দীর্ঘশ্বাস, হতাশা তাদের কবিতার বিষয়— প্রতি পদে জীবনের সমস্ত গৌরবকে অস্বীকার। 'গোধূলির কবি'দের মধ্যে যে দু'জন প্রধান— সেই গুইদো গৎসানো আর সার্জও কোরাৎসিনি— দু'জনেই মারা গেছেন টি বি রোগে, অল্প বয়সে।

কোরাৎসিনি মারা গেছেন মাত্র একুশ বছরে— তবু সেই বালকই দান্নুৎসিয়ো প্রমুখ মহারথীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইতালির কবিতাকে নতুন পথে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়ে গেল। গৎসানোরও মৃত্যু হয়েছে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে।

'ক্রেপুসকোলারি' বা 'গোধূলির কবি'দের নব্যরীতির নিষ্প্রাণ, বর্ণহীন, নিরাশাময় ভাষা ও ভাবের ব্যাখ্যা খুব সহজেই করা যায়। পূর্ববর্তী প্রবল প্রভাবশালী লেখকদের বিরুদ্ধে নবীনরা যখন বিদ্রোহ করেন, তখন পূর্ববর্তীদের রচনায় যেসব উপাদান নেই, নবীনদের রচনায় অজ্ঞাতসারেই সেগুলি এসে যায়। ফলে, ভাষার অন্য একটি দিক খুলে যায়, উভয় দলের কাছ থেকে ভাষা ধনী হয়। রবীন্দ্রনাথের উচ্চ মহত্ত্ব এবং বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে যেমন জীবনানন্দের নির্জন আত্মকেন্দ্রিক মগ্নতা।

গুইদো গৎসানো

[গুইদো গৎসানোর জন্মসাল ১৮৮৩। ছেলেবেলা থেকেই যক্ষ্মারোগ। এই কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে পঁচিশ বছর বয়সেই যেন তাঁর যৌবন শেষ হয়ে গেছে। বার্ধক্যের ভয়ে কবি ভীত। যদিও, সে বার্ধক্য আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু গুইদো বাঁচতে চেয়েছিলেন। যক্ষ্মা সারাবার জন্য কিটস এসেছিলেন ইতালিতে। আর ইতালির কবিরা যাবে কোথায়? গুইদো পৃথিবীর বহু দেশে আকুল হয়ে ঘুরেছেন রোগ সারাবার জন্য। তবু বাঁচতে পারেননি।]

সংলাপ

পঁচিশ বছর! বুড়ো হয়ে গেছি আমি
বুড়ো হয়ে গেছি! যৌবন গেছে শ্রেষ্ঠ ফসল লুকায়ে
পড়ে আছে শুধু শূন্যতা আর সংসার।

সময়ের পুঁথি দিয়েছে হারায়ে— সেখানে আমার শেষ
কান্নার স্বর চাপা পড়ে আছে, ধূসর পাণ্ডুলিপি
হয়তো আমারে চেনাতে পারিত অতীতের সেই ছন্দ।

পঁচিশ বছর! মনে মনে আমি করেছি আলিঙ্গন
পৌরাণিকের যত বিস্ময়— আমার আকাশ ম্লান,
একা বসে আমি দেখি সূর্যের ধীরভাবে ডুবে যাওয়া।

পঁচিশ বছর। তা হলে তিরিশও কেটে যাবে এই ভাবে
চুপিসারে, শুধু কটু অনুভূতি মরণের সাথে জোড়া
ভয়ের শিহর, তাও চলে যাবে, আবার আসিবে চল্লিশ।

কী ভয়ংকর— চল্লিশ, সে যে ভীরু পরাজয়, আর
ম্লান মানুষের বিরস বয়েস, তার পরে বুঝি বার্ধক্যের হানা
নকল দন্ত, কলপ মাখানো কেশরাজিভরা বৃদ্ধ বয়েস।
কভু পুরোপুরি-ভোগ না-করার হে আমার যৌবন
আজ দেখি আমি তোমার স্বরূপ, সত্যমূর্তি
দেখি তব হাসি, প্রেমিকের শোভা, যে শোভা মোদের

শুধু বিদায়ের বিষাদের কাল নির্দেশ করে।
পঁচিশ বছর! যত দূরে আমি চলেছি অন্যপ্রান্তে
তত বলে যাই স্পষ্ট কণ্ঠে, হে আমার যৌবন

তোমার ও রূপ মধুর প্রেমের উপযোগী ছিল!

[এই কবিতাটির শুধু প্রথম অংশ আমি অনুবাদ করেছি, দ্বিতীয় অংশে আছে, এই যে যৌবন মধুর প্রেমের উপযোগী— এই যৌবন কবি নিজে কখনও ভোগ করতে পারেননি। যেন, তাঁর হয়ে অন্য একজন কেউ ভোগ করেছে আজীবন। সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়তে যদি কারুর ইচ্ছে হয়, তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'কনটেমপোরারি ইটালিয়ান পোয়েট্রি' নামের দ্বি-ভাষা সংকলনটি দেখতে পারেন।

প্রথমত ইতালির কবিতা অনুবাদে আমি শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি। ইতালির কবিতায় ওই রকম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য, আমাদের বাংলার মতো ইতালিতেও এই শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার রীতি ছিল আলাদা। নবীন কবির দল এই হাস্যকর পার্থক্য ভেঙে দেন— কিন্তু গোড়ার দিকে সেই পরিবর্তনটুকু বোঝাবার জন্যই একটি কবিতায় সাধুভাষা প্রয়োগ করে রাখলুম।]

দিনো কামপানা

[প্যান্টের পিছন-পকেটে একটা কবিতার বই, হুইটম্যানের 'লিভস অব গ্রাস'— শুধু এই নিয়ে ইহুদি মায়ের ছেলে দিনো কামপানা কৈশোর বয়সেই বেরিয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীতে, এই বিংশ শতাব্দী তখন সবে শুরু হয়েছে। কী খুঁজতে বেরিয়েছিলেন কে জানে, কিন্তু পেয়েছেন শুধু দারিদ্র্য, হতাশা আর মাথার অসুখ। কামপানা যেন ইতালীয় কবিতার

র‍্যাঁবো— দেশ ছেড়ে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরেছেন ইউরোপের সর্বত্র, দক্ষিণ আমেরিকায়। ছুরি-কাঁচি শান দেওয়ার চাকরি থেকে শুরু করে, ইঞ্জিনের কয়লা ঠেলা, লিফ্‌ট-ম্যানের কাজ, জাহাজের ডেক পরিষ্কার করা ইত্যাদি বহু জীবিকাই গ্রহণ করেছেন। তাও সুস্থ শরীরে নয়, যৌবনেই পাগলামির লক্ষণ দেখা যায়, সব মিলিয়ে সাত-আটবার পাগলাগারদে বন্দি হয়েছেন ও বেরিয়েছেন, ইতালি ও সুইটসারল্যান্ডে দু'বার জেলও খাটতে হয়েছে। লেখাপড়া শিখতে পারেননি, কিন্তু কামপানার কবিতায় বৈদগ্ধ্য অনুপস্থিত নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার বছরে, এলোমেলো বিশ্রীভাবে ছাপা কামপানার একটি চটি কবিতার বই 'অরফিউসের গান' ইতালির সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন এনে দিল।

ওদিকে, ইতালির সাহিত্যে তখন চলছে প্রবীণদের বিরুদ্ধে নবীনদের বিদ্রোহ, 'ফিউচারইজম' আন্দোলন, একদল তরুণ লেখক বিশ্ব-সাহিত্যের তীর্থ প্যারিসে চলে গিয়ে সেখান থেকে বার করছে ইস্তাহার। ইতালির সাহিত্যকে তারা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে তুলছে। বিদ্রোহের প্রথম উচ্ছ্বাসে বহু উদ্ভট ও চোখ ঠিকরোনো রীতিও দেখা দিচ্ছে। এদের মধ্যে প্রধান মেরিনেত্তি, নানারকম মুখের আওয়াজ দিয়ে শব্দ বানাবার চেষ্টা করছেন ও ছন্দ ভেঙে কবিতা সাজাবার কায়দায় কবিতায় নানারকম চাক্ষুষ পরিবর্তন আনছেন। যদিও এজরা পাউন্ড বলেছেন, 'ইতালিতে মেরিনেত্তি না থাকলে— ইংরেজিতে জয়েস, এলিয়ট ও আমি যে ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছিলুম তা সম্ভব হত না'— কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেরিনেত্তির কবিখ্যাতি সময়কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ইতালির প্রথম দুই দশকের যে কাব্য-আন্দোলন, তার মধ্যে দিনো কামপানাই সকলকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কামপানার জন্ম ১৮৮৫-তে। ১৯৩২-এ মাত্র ৪৭ বছরে বয়েসে একটি উন্মাদ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতা রোমান্টিক রসেরই কবিতা।

জেনোয়ার নারী

তুমি এনে দিলে সমুদ্র থেকে একমুঠো পানা
তোমার অলকে, রৌদ্র তাম্র শরীরে তোমার
প্রবাসী বাতাস নানা দেশ ঘুরে এনেছে বাসনা
আমার জন্য।
আহা, কী দেবীর
মতো সরলতা তোমার তন্বী শরীরের রূপে
ভালোবাসা নয়, নয় যন্ত্রণা, মায়াবি অতীন্দ্রিয়
ছায়া যেন এক অমোঘতা, ফেরে

তোমার শান্ত, ধ্রুব আত্মায়
ভেঙে মিশে যায় আনন্দে, যায় শান্ত অলৌকিক,
যেন তাকে ফের মরুর উষ্ণ ঝড়ে নিয়ে যাবে
দূরে অনন্ত শূন্য আকাশে।
তোমার মুঠোয় এই যে বিশ্ব কত ছোট, কত পলকা

উমবার্তো সাবা

[উমবার্তো সাবা এ শতাব্দীর ইতালীয় কবিতায় একক ব্যতিক্রম। জন্মেছেন মূল ইতালি থেকে অনেক দূরে, অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের ত্রিয়েস্ত দ্বীপে। ত্রিয়েস্ত ইতালি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুদিন, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে এই দ্বীপ ইতালির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হয়। তখন সাবা-র বয়েস ৩৫। অর্থাৎ পূর্ণযৌবন পর্যন্ত তিনি ইতালির ভাষায় কবি হয়েও সে দেশের নাগরিক ছিলেন না।

কিন্তু উমবার্তো সাবা এ শতাব্দীর প্রধান তিনজন আধুনিক ইতালীয় কবির অন্যতম। উনগারেত্তি এবং মনতালের সঙ্গে তাঁর নামও সমান শ্রদ্ধেয় এবং ইতালির কবিতায় তাঁর প্রভাব অপরিমিত।

মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে ছিলেন বলে, তিনি সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনের খোঁজ পাননি। প্রত্যেক যুগেই কবিদের শব্দ ব্যবহারে এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। শব্দ নির্বাচনে এক প্রকার রুচি এক যুগের কবিদের সময় চিহ্নিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলায় আমরা জন্মদাতাকে বাবা বলে ডাকি, কিন্তু শুদ্ধ 'পিতা' শব্দটি এখনও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়নি, অথবা মুখে বলি, বাড়িটা ভেঙে গেছে, লেখাতে 'ভগ্নস্তূপ' এখনও অচল নয়। কিন্তু, বাঁশির বদলে, কোনও অর্বাচীন কবিও 'হংসী'র সঙ্গে মেলাবার দারুণ লোভ সত্ত্বেও 'বংশী' ব্যবহার করবেন না! কী সেই অলিখিত আইন— যাতে ভাঙার বদলে ভগ্নও চলে, কিন্তু বাঁশির বদলে বংশী চলে না— তা ব্যাখ্যা করা যায় না। সময় অনুযায়ী এইরকম রুচি গড়ে ওঠে— সব কবিরাই তা টের পেয়ে যান।

মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে সাবা এই ধরনের আধুনিক শব্দ ব্যবহারের রুচি টের পাননি। সুতরাং তিনি নিজস্ব শব্দ ব্যবহারের একটি রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রধানত অনুসরণ করেছেন ক্লাসিক ধারা। সরলতা এবং প্রভূত কবিত্ববোধ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র করেছে।

১৮৮৩ সালে জন্ম, প্রায় সারা জীবনই দূরে কাটিয়ে, উমবার্তো সাবা-র মৃত্যু ১৯৫৩-তে।]

নারী

যখন ছিলে ছোট্ট খুকুমণি
পারতে হুল ফোটাতে
কাঁটার ধার বুনো ফুলের মতো।

তোমার ওই ছোট্ট পা দুখানি
ছিল কেমন বন্য, তুমি অস্ত্র হয়ে লাথি ছুড়তে—
তোমায় ধরা শক্ত ছিল, বিষম শক্ত।
আজও তেমন ছোট্ট আছো

অথচ সুন্দরী।
সময় আর দুঃখ দুই সুতোয় জট বাঁধা
তোমার আমার দুই হৃদয়— আজ হয়েছে এক
এখন তোমার ভ্রমর-কালো চুলের মধ্যে আমার হাত
এখন আর ভয় করি না তোমার ওই ছোট্ট সাদা
খরগোসের মতন দুই ধারালো কান!

"সবুজ ফসল, ফল"

সবুজ ফসল, ফল, রূপসী রানির মতো ঋতুর
বর্ণনা।
বেতের ঝুড়ির মধ্যে ঝলসে ওঠে মিষ্টি স্বাদ
দাঁত লোভী করে।
এক জোড়া তামাটে পা, নগ্ন হাঁটু— আসে, অহংকারী
বালকের— ফের দৌড়ে চলে যায়।
অন্ধকার
নেমে আসে সামান্য দোকানটিতে, গাঢ় হয়—
দ্রুত বুড়ো হয়ে যাওয়া মায়ের মুখের মতো।
সেই ছেলেটা
বাইরে রোদ্দুরে ছুটে যায়, লঘু পায়ে হাল্কা ছায়া
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

[মূল কাব্যধারা কিছুটা বিচ্ছিন্ন থেকে সাবা যে প্রাচীনপন্থী হয়ে থাকেননি, কারণ, তাঁর অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক। নিছক আকাশ, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের স্তুতি বা মানুষের মহানুভবতার জয়গান না করে তিনি নিজের জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কথা লিখেছেন। 'গোধূলির কবিদের' মতো ভাষা ব্যবহারে লাঞ্ছিত এবং পরাজিত ভঙ্গি না থাকলেও, তিনি দূরে থেকে এবং না জেনে, মানসিকতায় সমসাময়িক 'গোধূলি কবিতা' আন্দোলনের কাছাকাছি ছিলেন এবং কবিত্বশক্তিতে ওঁদের চেয়ে অনেক বড়।]

জুসেপ্পে উনগারেত্তি

[যদিও বাবা-মা ইতালিয়ান, কিন্তু উনগারেত্তি জন্মেছিলেন মিশরে, এবং লেখাপড়া শিখেছেন প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভালেরি, জিদ, আপোলিনেয়ার প্রভৃতি সাহিত্যের বিখ্যাত মহীপালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, ফরাসি সাহিত্যের আবহাওয়ায় তাঁর মানস গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতালিয়ান সাহিত্যে এক সময় তাঁর নিন্দে ও প্রশংসার প্রবল ঝড় ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইতালিতে তিনিই ছিলেন একক খ্যাতি-অখ্যাতির কেন্দ্র।

জন্ম ১৮৮৮, প্যারিসে লেখাপড়া শেষ করে ইতালিতে এলেন ১৯১৪ সালে। তখন যুদ্ধ। যুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি লড়াই করলেন ইত্যালি ও ফ্রান্সে। ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে বসে কবিতা লিখতেন, তাঁর বন্ধু আপোলিনেয়ারও অন্য দিকের ট্রেঞ্চে বসে তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলি লিখছেন, সেই সময়।

যুদ্ধ থেকে ফিরে কবিতার বই ছাপলেন। সাংবাদিক বৃত্তি নিয়ে ঘুরলেন সমগ্র ইয়োরোপ, তারপর ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক হিসেবে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধার সময় তাঁকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ব্রাজিল থেকে। এখন রোমে অধ্যাপনা করছেন।

ইতালির কবিতায় হারমেটিক কবিতার যে আন্দোলন শুরু হয়, কিছু ফরাসি কবিও এই অভিধায় ভূষিত হচ্ছেন— উনগারেত্তিকে তার পুরোধা বলা যায়। হারমেটিক আন্দোলন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। হারমেটিক কবিতার আধুনিক অর্থের নিকটতম অনুবাদ হতে পারে— 'বন্ধ কবিতা'। এই কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য, যেকোনও পথ চলতি পাঠক যে হুট করে একবার চোখ বুলিয়ে এই কবিতার রস পাবেন, তার উপায় নেই। অরসিকের কাছে এ কবিতার পথ বন্ধ। এর রস আস্বাদ করতে হলে পাঠককে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে, প্রতিটি শব্দ, ধ্বনি, লাইন সাজানো ছোট বড় লাইন, লাইনের মাঝখানে ফাঁক— এই সবই অর্থময় হতে পারে। এ ছাড়া উপমার নিরাভরণত্ব। যেমন উদারহণ দেওয়া হয়েছে, 'আমার হৃদয়ের মতো একটি পাখি'— এই উপমার আরও সরল রূপ, 'হৃদয়-পাখি'— হারমেটিক কবিরা আরও সরল করে বলবেন, শুধু 'পাখি'। 'পাখি' মানেই কোনও কবিতায় হৃদয়— সেটা বুঝে নিতে হবে। প্রতীকের সঙ্গে উপমার ঠিক কোথায় তফাত, তা অবশ্য বোঝা যায় না।

শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে উনাগারেত্তির ভিন্ন মত আছে। তাঁর মতে, শব্দের কোনও আলাদা

মেজাজ থাকতে পারে না। কোনও শব্দই ইচ্ছে মতো করুণ বা মধুর বা ক্রুদ্ধ হতে পারে না। সব শব্দই ব্যবহার করতে হবে আদি, ঐতিহাসিক (আমাদের ক্ষেত্রে ধাতুগত) অর্থে। বাংলায় উদাহরণ দেওয়া যায়: 'একটি বিধবা যুবতীর কায়ক্লেশে দিন কাটছে' এই কথার প্রচলিত অর্থ, কষ্টেসৃষ্টে কোনওরকমে দিন কাটছে আর কি। কিন্তু 'কায়ক্লেশে'র আদি অর্থ মেনে বুঝতে হবে, বিধবাটির শারীরিক কষ্টও এখানে উল্লেখিত। কিংবা, প্রতিমা শব্দটির সাধারণ অর্থ খড়-মাটি-রঙের মূর্তি— কিন্তু যদি মনে রাখা যায় প্রতিমা আসলে সাদৃশ্য অর্থে 'প্রতিম' শব্দের স্ত্রীরূপ, তবে 'বৃষ্টির প্রতিমা' বা 'ঝড়ের প্রতিমা' ও বিসদৃশ হয় না।]

রহস্য-বিরক্তি

স্তব্ধতা যখন অভঙ্গ জাগে
সতেজ শরীরের প্রতি আমার যাত্রা
আমার দিকে তার বাড়ানো হাত রক্তাভ
আমার সামান্য অগ্রসরে সেই হাত পিছিয়ে যায়।

সুতরাং এখানে এই ব্যর্থ অনুসন্ধানে আমি পরাভূত।
সকাল যখন তরঙ্গময় সে এগিয়ে আসে।
সে হেসে ওঠে, আমার চোখের সামনে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

স্বকৃত উন্মত্ততা, বিরক্তি
প্রভূত নও, কখনও প্রভূত মত্ত এবং মিষ্টি নও তুমি

স্মৃতি কেন তোমার সঙ্গে সমান হাঁটে না?

তোমার দান কি একখণ্ড মেঘ?
এ শুধু ফিসফিস এই স্মৃতির বসতি
ভরায় বৃক্ষের শাখা দূরান্ত সংগীতে

স্মৃতি সঞ্চরমাণ ছবি,
বিষণ্ণ বিদ্রূপময়
রক্তের আঁধার...

ছায়াচ্ছন্ন লাজুক ঝরনার মতো

অলিভ কুঞ্জের প্রাচীন ছায়া
তুমি ফিরে আসো আমায় ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে
তবুও গোপনে প্রত্যুষে
গোপনে আমি কি তোমার ওষ্ঠাধর প্রত্যাশা করতে পারি...
আর কোনওদিন আমি জানব না!

একটি গ্রামের ভগ্নস্তূপ

এই গৃহগুলির
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না
শুধু কয়েকটি
দেয়ালের ভগ্নাংশ

কত মানুষ
যারা ছিল আমার আপন
কেউ নেই
এমন কী দেয়ালও না

কিন্তু আমার হৃদয়ে
একটি ক্রুশচিহ্নও হারায়নি

আমার হৃদয়
এক রকম অত্যাচারিত গ্রাম

[হারমেটিক কবিতার যে-আলোচনা উপরে করা হয়েছে, অনুবাদ কবিতায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা ইতালির ভাষা জানি না, মূলের প্রতিটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া দুরূহ, তা ছাড়া সেভাবে অনুবাদ করাও যায় না। তবে, আমি লাইনের গতি ঠিক করেছি, এবং ইচ্ছে করেই কোনও বাংলা ছন্দের পোশাক পরাইনি। ফলে, পড়তে হয়তো কিছুটা কর্কশ লাগবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি অস্ট্রিয়ার সান মারটিনো শহরের ভগ্নস্তূপ দেখে লেখা।]

উজিনো মনতালে

[ইতালির কবিতায় জীবিত প্রধান ত্রয়ীর মধ্যে মনতালে অন্যতম। আগে উনগারেত্তি প্রসঙ্গে আমরা যে হারমেটিক কবিতার উল্লেখ করেছি, মনতালে সেই ধারার অপর স্তম্ভ। উনগারেত্তির সঙ্গে মনতালের মূল প্রভেদ, সমালোচকদের মতে এই যে, উনগারেত্তির কবিতায় দুঃখের সুর আছে, কিন্তু সেই দুঃখবোধ খ্রিস্টান-সুলভ— অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত উত্তরণ আছে। কিন্তু মনতালে-র দুঃখবোধ আরও বিধুর, কিছুটা তিক্ত, শেষ পর্যন্ত মুক্তিহীন। মনতালে জানেন, মানুষ শেষ পর্যন্ত বড় নির্জন, এই পৃথিবীটা অর্থহীন, গাছপালা প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত বস্তুজগৎ ছাড়া আর কিছুই না। (ছেলেবেলায় তিনি প্রকৃতির সামনে বসে দৈববাণীর প্রতীক্ষায় থেকে নিরাশ হয়েছিলেন।) আধুনিক কবির দ্বিধা এবং হতাশার ছাপ তাঁর কবিতায়, পরবর্তীকালে প্রচারিত এক্‌জিস্‌টেনশিয়ালিজমের আভাস পাওয়া যায়। যদিও উনগারেত্তি বড় হয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্যের আবহাওয়ায়, এবং মনতালে-র শিক্ষা ইংরেজি আধুনিক সাহিত্য থেকে। ইতালিতে তাঁকে টি এস এলিয়েটের ধারার কবি বলা যায়।

মনতালে-র জন্ম ১৮৯৬-তে, জেনোয়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধে গোলন্দাজ হয়ে লড়াই করেছ্নে। এখন মিলান শহরে একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক।]

দুপুর কাটানো

দুপুর কাটানো, ম্লান, মগ্নতা
ঝলসানো, ভাঙা দেয়ালের পাশে বাগানে,
কান পেতে শোনা, ঝোপের কাঁটার ভিতরে
পাখির কিচির, সাপের চলার খসখস।

মাটির ফাটলে অথবা মাধবীলতায়
লাল পিঁপড়ের আনাগোনা চেয়ে দেখা
কখনও ছড়ায়, কখনও বা সারি বাঁধে
ছোট্ট টিবির উপরে ব্যস্ত পিঁপড়ে।

পাতার আড়াল থেকে দূরে চেয়ে দেখা
রেখায় রেখায় সমুদ্র উত্তাল
বাতাসে তখন কর্কশ ভাবে কাঁপে
তৃণহীন টিলা থেকে ঝিঁঝিদের ধ্বনি।

প্রখর রৌদ্রে কিছু দূর হেঁটে যাওয়া
অনুভবে শুধু বিষণ্ণ বিস্ময়
এ জীবন আর জীবনের যত শ্রম
পাশে হেঁটে যাওয়া— এই দেয়ালের মতো
যে-দেয়ালে ভাঙা বোতলের কাচ বসানো।

বান মাছ

বান মাছ, লাস্যময়ী
হিম সমুদ্রের, বালটিক উপসাগর ছেড়ে
এসেছ আমাদের সাগরে,
আমাদের মোহানায়, নদীর ভিতরে
নদীর প্রবাহ থেকে ক্রমশ গভীরে, প্রবল বন্যায়
ভেসে, নদীর প্রতিটি শাখা-উপশাখায়
শিরা-উপশিরায়, সরু হয়ে—
আরও ভিতরে, পাথরের অভ্যন্তরে ঢুকে
কাদার ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে—
তারপর একদিন
চেস্টনাট গাছ থেকে আলোর রেখা এসে ঝলসায়
নিবদ্ধ পুকুরে
পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনায়—
বান মাছ, আলো, চাবুক,
মর্ত্যে ভালোবাসার তীর
যাকে শুধু আমাদের নদীর খাত অথবা
পিরেনিস পর্বতের শুকনো ঝরনায় পথ
ফিরিয়ে দেয় প্রজনন স্বর্গে;
সবুজ আত্মা আবার জীবন খোঁজে
যেখানে শুধু জ্বলন্ত বৃষ্টিহীনতা আর
নির্জনতার ক্ষয়,
স্ফুলিঙ্গ বলে ওঠে
সেই তো সব আরম্ভ, যেখানে সব

জমে যায় কাঠকয়লায়, নিহিত কাষ্ঠে;
তোমার চোখের পাতায় সাজানো
সংক্ষিপ্ত রামধনু
তুমি উজ্জ্বল হও, অচঞ্চল থাকো
মানুষের সন্তানদের মধ্যে, যারা
মগ্ন থাকে তোমার জীবনদায়িনী কর্দমে;
তুমি কি মানো না
সে তোমারই সহোদরা?

[মনতালে-র প্রথম যৌবন এবং পরিণত জীবনের দুটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হল। প্রথমটি তাঁর উনিশ বছর বয়সের রচনা। 'বান মাছ' ইতালীয় ভাষার একটি অত্যন্ত বিখ্যাত কবিতা। সামুদ্রিক বান মাছ হাজার হাজার মাইল পার হয়ে যায়। হয়তো তারা মাটি ফুঁড়েও যেতে পারে— যেমন ভাবে তারা পুকুরে-ডোবায় আসে— এই কল্পনায় মনতালে বলছেন, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো হাজার বান মাছ বালটিক থেকে আড্রিয়াটিক উপসাগরে চলে যাচ্ছে ইতালির পর্বতমালা পেরিয়ে, শেষ পর্যন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়ে মেয়েদের চোখের মণিতে রামধনু হয়ে থাকছে। কবিতাটির শেষ অংশের 'তুমি' অবশ্যই কোনও নারী। দান্তের স্বর্গনিষিক্ত ভালোবাসা মনতালে-র কবিতায় পাতালচারী বান মাছের রূপ নিয়েছে।]

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

[বিক্ষুব্ধ কোয়াসিমোদো চেয়েছিলেন মানুষের পুনর্নির্মাণ। মানুষকে বদলে দিতে। সমালোচকরা ঈষৎ বাঁকা সুরে বলেছেন, কোয়াসিমোদো অতখানি বড় কাজের যোগ্য নন।

অর্থাৎ প্রশ্ন ওঠে, কবি কি শুধুই নতুন সৃষ্টি করে যাবেন? না, এই সৃষ্টি-করা জগৎ ও সমাজ, পরিপার্শ্ব— এর নানান বৈষম্য দূর করার জন্যও ব্যগ্র হবেন, তার মানে, সমসাময়িককালের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়বেন? কোয়াসিমোদো-র জীবনে এই দু'রকম চিন্তাধারার দুটি স্পষ্ট ভাগ দেখা যায়। প্রথম লেখা শুরু করেছিলেন আত্মমগ্ন কবি হিসেবে, হারমেটিক ধারার অন্যতম, যখন ধারণা ছিল কবিতাতেই কবিতার শেষ, সে সময়-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনী যখন ইতালির উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়, তখন নিজের গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ কবি নেমে এলেন অনেকটা জনতার কাছাকাছি, কবিতা লিখে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব বোধ করেছিলেন। কোয়াসিমোদো-র এই সামান্য রূপান্তরে পুরনো অনুরাগীরা হতাশ হয়, আবার অন্য একদল নতুন কবির জন্ম হল বলে অভিনন্দন জানায়। ১৯৫৯-র নোবেল প্রাইজ তাঁকে ইতালির সবচেয়ে বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিচয় জানায় পৃথিবীর কাছে।

কোয়াসিমোদো-র জন্ম ১৯০১ সালে, সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউসে। শৈশব সুখে

কাটেনি, 'মায়ের প্রতি চিঠি'তে তার চিহ্ন আছে। ধারাবাহিকভাবে লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। যৌবনে 'সিভিল এনজিনিয়ার্স বিউরো'র কর্মী হিসেবে সারা ইতালি ঘুরেছেন। এখন মিলান শহরের স্থায়ী নাগরিক। সমসাময়িক অন্যান্য বিখ্যাতদের মতো কোয়াসিমোদো ইংরাজি বা ফরাসি সাহিত্য থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেননি। তাঁর যাবতীয় শিক্ষা স্বদেশের ঐতিহ্যে। প্রতিবেশী গ্রিসের কিছু প্রাচীন কবিতারও তিনি অনুবাদ করেছেন।]

প্রায় গান

সূর্যমুখী ঢলে পড়ে পশ্চিমে, দিন
নিজের ভগ্নস্তূপ চোখে অস্ত যায়,
গ্রীষ্মের বাতাস ভারী হয়ে আসে, নুইয়ে দেয়
গাছের পাতা, কারখানার ধোঁয়া ওঠে।
মেঘের শুকনো আনাগোনা, বিদ্যুতের সিরসিরানির সঙ্গে
অন্তরীক্ষের শেষ খেলা দূরে
সরে যায়। আবার বহু বছরের ভালোবাসা—
খালের দু'পাশে ভিড় করা গাছের মধ্যে এসে
আমরা একটু থমকে দাঁড়াই।
তবু আজ আমাদের দিন, তবু সেই
সূর্য তার ছুটি নিয়ে যায়
স্নেহময় রশ্মির গ্রন্থিগুলি গুটিয়ে।
আমার স্মৃতি নেই, আমি আর কিছু মনে করতে চাই না;
মৃত্যু থেকে জেগে ওঠে স্মৃতি,
যেমন জীবন অন্তহীন। প্রতিটি দিনই
আমাদের। একটি দিন এর মধ্যে থেমে থাকবে চিরকাল।
তখন তুমি আমার পাশে, হয়তো সেদিন বড় দেরি হয়ে যাবে।
এখানে খালের কিনারায় বসে, আমাদের পা
দুলছে শিশুদের মতো খেলাচ্ছলে,
এসো আমরা জল দেখি, গাছের শাখাপ্রশাখায়
সবুজের গাঢ় হয়ে আসা দেখি।
নিঃশব্দে যে-লোকটা পিছন থেকে গুঁড়ি মেরে আসছে
ওর হাতে কোনও ছুরি লুকোনো নেই
ও তো শুধু একটা মাধবীলতা।

মায়ের কাছে চিঠি

...আমি উত্তরাঞ্চলে আছি, দুঃখ নেই। নিজের সঙ্গে
শান্তিতে নেই আমি। কিন্তু আমি কারুর কাছে
ক্ষমা প্রত্যাশা করি না, অনেকের কাছেই আমি
চোখের জলে ঋণী, যেমন মানুষের প্রতি মানুষ।
আমি জানি, তুমি ভালো নেই, তুমি বেঁচে আছ
যেমন সব কবিদের মায়েরা থাকে, দরিদ্র,
প্রবাসী ছেলের জন্য খাঁটি ভালোবাসা বুকে নিয়ে। আজ
আমি তোমাকে চিঠি লিখছি।— তুমি বলবে, তবু এতদিনে
ছেলেটা দুটো কথা লিখে জানাল, সেই ছেলেটা যে
একদিন রাত্তিরে পালিয়ে গিয়েছিল একটা ছোট সাইজের কোট পরে,
পকেটে কয়েক লাইন কবিতা। পয়সা ছিল না, এমন চঞ্চল
যে একদিন কেউ হয়তো ওকে মেরেই ফেলবে!
...মা, আমার মনে পড়ে...

[কোয়াসিমোদো-র অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য কবিতা এখানে অনূদিত হল। নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁর কিছু কবিতা আমাদের দেশে অনুবাদ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সুন্দর অনুবাদ করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় 'তুমি' থাকে, সেই 'তুমি'র কোনও নির্দিষ্ট নাম নেই। কোনও নারী বা পুরুষ বা যুদ্ধে নিহত কোনও আত্মা বা কবিরই অন্য স্বরূপ, কখনও স্পষ্ট বোঝা যায় না। যখন কোনও নারী বলে মনেও হয়, তখনও কোনও নির্দিষ্ট নারী নয়, মনে হয় যেন সমগ্র মহিলা সমাজের প্রতিনিধি যেকোনও একজন।]

পিয়ের পাওলো পাসোলিনি

[ভিড়ের রেস্তোরাঁর মধ্যে হঠাৎ টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে পাসোলিনি চিৎকার করে বললেন, অনর্থক মানুষ, তোমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছ। শোনো আমার কবিতা, এই কবিতাই তোমাদের বেঁচে থাকতে শেখাবে!— পাসোলিনি এইরকম স্বভাবের কবি। ইতালির তরুণ কবিদের মধ্যে পাসোলিনি-ই সবচেয়ে প্রবল এবং দুর্দান্ত, এবং সবচেয়ে বিতর্কমূলক। এক দিকে তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তা, অপর দিকে একদল তাঁকে কবি বলেই মানতে চান না। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর ছ'টি কবিতা সংগ্রহ বেরিয়েছে। এখন অবশ্য আর তিনি বয়সে ঠিক তরুণ নন।

পাসোলিনির জন্ম ১৯২২-এ। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন, পরে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেন। তাঁর ধারণা, লেখকদের শুধু লেখা ছাড়া অন্য কোনও জীবিকা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, পৃথিবীর যেকোনও দেশেই কোনও তরুণ লেখক, বিশেষত কবি, শুধুমাত্র সাহিত্য রচনা করেই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারেন না। ফলে পাসোলিনিকে ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়, কখনও কখনও নিজে অভিনয়ও করেছেন। ইদানীং পাসোলিনি চলচ্চিত্র পরিচালনাতেই মুখ্যত আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতালির আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অন্যতম। তাঁর তোলা যিশুর জীবনী একটি বিতর্কমূলক ছায়াছবি। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে শিল্পে নিওরিয়েলিজম নামে যে ধারা এসেছে, ইতালিতে যা সবচেয়ে প্রবল, কবিতাতেও তার প্রভাব দেখা যায়। পাসোলিনির কবিতার বিষয় ইতালির সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। বর্ণনার ভঙ্গি কখনও অতিবাস্তব, অনেকে তাঁর কবিতাকে নিওরিয়েলিস্টিক আখ্যা দিয়েছেন।]

আপেন্নিন

ক্যাসিনো থেকে সেই ছেলেটাকে তার বাপ মা
বিক্রি করে দিয়েছে আনিয়েনের গর্জমান সৈকতে এক
খুনির কাছে, একটি বেশ্যা ওকে মানুষ করে—
ঔপনিবেশিক রাত্রির মধ্যে যখন কিয়ামপিনোর চোখ
ধুয়ে যাওয়া তারায় অন্ধ, বোজানো চোখের পাতার নীচে
উকুনে হাসিতে ছেলেটা গুনগুন করে সম্রাটদের এরোপ্লেনের
শব্দের সঙ্গে গান গায়, আর পথে পথে
কামের প্রহরীদের পদশব্দ,
ময়লা প্রস্রাবখানার আশেপাশে অপেক্ষা করে
সানপাওলো থেকে সান গিয়োভান্নি পর্যন্ত
রোমের চরম উত্তপ্ত পাড়ায়— শুনতে পাওয়া যায়
রাত্রির অবসন্ন প্রহর বেজে উঠছে
উনিশ শো একান্ন-তে গির্জা থেকে গোয়ালঘর
পর্যন্ত নৈঃশব্দ্যেও ফাটল ধরে।
ইলারিয়ার বন্ধ চোখের পাতায় কাঁপে
ইতালির রাত্রির দূষিত আস্তরণ... অল্প
হাওয়ায় নরম, আলোয় শান্ত...
যুবকদের চিৎকার,

তপ্ত, কটূ, ভয়ংকর, উষ্ণ কম্বলের
গন্ধ, এখন ভিজে... দক্ষিণ অঞ্চলের বুড়োদের
কণ্ঠে চালাকি... সমস্বর গান
সপ্তাহান্তের দুটি পুকুরে পুকুরে, গ্রামে।
পাপের প্রদেশ থেকে, শস্তা নোংরা শুঁড়িখানার
সাদা আলোর হৃদয় পর্যন্ত
শহরের উপকণ্ঠে
মাংস এবং দারিদ্র্য শান্ত সহাবস্থান পেয়েছে,

২

হাওয়ার শব্দ... তারপর। ইলেরিয়ার
ভারী চোখের পাতায় ঘুম ছাড়া
আর কিছুই নেই। এই মেয়েটির মৃত্যুর রূপ
দিয়েছে সকাল, পূর্বকল্পিত, মার্বেল পাথর
হয়ে যাবে। ইতালির আর কিছুই নেই অবশিষ্ট
শুধু তার মার্বেল মৃত্যু ছাড়া, তার ঊষর
বাধাপ্রাপ্ত যৌবন...

তার চোখের পাতার নীচে, ঘুমের মধ্যে
পৃথিবী সশরীরী, চাঁদের আলোর
রূপালী অন্ধকারে একটি কুমারী রথ
পাথরের ধস হয়ে নামছে আপেন্নিন থেকে
খাড়া পাহাড় বেয়ে সোজা নেমে যাচ্ছে উপকূলের
দিকে— যেখানে টিরোনিয়ান এবং আড্রিয়াটিকের
ফেনা মুক্তাখচিত।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে একখণ্ড নগ্ন ঘাস জমিতে
একটি সবুজ বৃত্তে, সোরাক্‌টের সবুজ উপত্যকার
চামড়া ও ধাতুর গোল আবরণে ঘুমিয়ে আছে
কালচে জ্যাবজেবে একপাল ভেড়া, আর রাখালের
সমস্ত প্রত্যঙ্গ জমাট বেঁধে আছে

চুন পাথরের ওপরে

[‘আপেন্নিন’ নামের একটি বিশাল কবিতার একটি অংশের মুক্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হল। আপেন্নিন সমগ্র ইতালিব্যাপী দীর্ঘ পর্বতমালার নাম। উত্তর দিকে এই পর্বতমালা আল্পসের সঙ্গে মিশেছে। আড্রিয়াটিক সমুদ্রের কাছে এর শিখরের উচ্চতা সাড়ে ন’ হাজার ফুট, সেইটাই সর্বোচ্চ। ভিসুভিয়াস সমেত আর কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে এরই মধ্যে। রোম নগরীর চারপাশ ঘিরে আছে আপেন্নিন— এই পার্বত্য অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রামের উল্লেখ আছে এই কবিতায়।]

মার্ঘেরিটা গুইদাচ্চি

[মেয়েদের চোখে দেখা এই পৃথিবী হয়তো সত্যিই অন্যরকম। কিন্তু সাহিত্যে মেয়েদের চোখে দেখা পৃথিবীর সেরকম কোনও উল্লেখযোগ্য ছবি পাওয়া যায়নি। বাংলায় আমরা যাকে বলি ‘দৃষ্টিভঙ্গি’— সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেও মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের বহু ক্ষেত্রে ঢের তফাত দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁদেরই আমরা খুব উল্লেখযোগ্য বলি, যাঁদের রচনা অতিমাত্রায় পুরুষালি। পুরুষদের সমকক্ষ হবার বদলে মেয়েদের আলাদা কোনও সাহিত্যরীতি নেই। মেয়েদের কৈশোর থেকে যৌবনে রূপান্তরের সংকটকাল, সন্তানের প্রতি স্নেহ, স্বামীর জন্য ত্যাগ স্বীকার, মুখবুজে সংসারের সমস্ত যাতনা সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়গুলি পুরুষদের রচনাতেই মহৎভাবে ফুটেছে। কে জানে এগুলো সবই অতখানি সত্যি কিনা।

যদিও আমরা চোখেই দেখতে পাচ্ছি। যেমন, সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ, হাত দু’খানাকে ডানার মতো করে ছেলে-মেয়েদের সব বিপদ থেকে মায়ের আগলে রাখার চেষ্টা, পৃথিবীতে প্রতিদিন চোখে দেখা যায়। কিন্তু চোখে দেখার বাইরেও আরও কিছু অন্ধকার পরিসরে যেতে ছাড়ে না সাহিত্য। জননীর কতখানি আত্মত্যাগ, কিছুই কি আত্মবিপর্যয় নেই? সন্তান যেমন নয়নের মণি, তেমনি সন্তানই জনক-জননীকে প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠা থেকেই বাপ-মা বুঝতে পারেন তাঁরা কতখানি বার্ধক্য ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে পুরুষের লেখা কবিতা আছে, কিন্তু পুরুষরা তো স্বার্থপর নামেই বিদিত। মার্ঘেরিটা গুইদাচ্চির এ কবিতায় একই সঙ্গে সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং নিজের স্বার্থপর ভয়ের কথা আছে।

এই কবিতাটি পুরো বুঝতে হলে জানা দরকার শ্রীমতী মার্ঘেরিটা সুগৃহিণী এবং তিন সন্তানের জননী। তাঁর তৃতীয় সন্তান, মেয়ের জন্মের পর এ কবিতা লেখা। তাঁর এখন বয়েস ৪৫, শিক্ষয়িত্রী। জন্ম ফ্লোরেন্সে ১৯২১-এ, ইংরেজি সাহিত্যে বি এ পাশ করার পর ঔপন্যাসিক লুসা প্রিমাকে বিয়ে করেছেন। সাম্প্রতিক ইতালির কবিদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট এবং এই হিসেবে তিনি নতুন ধরনের কবি যে তাঁর রচনা স্পষ্ট ও নির্ভীক এবং একটি নারী হিসেবে তাঁর চোখে দেখা জগৎই তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন।

অংশ কবিতা

বহুবার নভেম্বর ফিরে ফিরে আসে
আমার জীবনে, আজ যার শুরু হল
সে নয় জঘন্যতম; শান্ত একটি দিন
কিছুটা অস্বস্তিময়। আজ আমি ঝুঁকে আছি
একটি দোলনার কাছে, আমার কনিষ্ঠতম
মেয়েটি ঘুমোয়, তার গভীর রহস্যময় ঘুম, যেন আজও
অতিথি এখানে, এই পৃথিবীর নাগরিক নয়, এখনও অচেনা
আমার স্তনের মধ্যে দুধ ভরে ওঠার সুমিষ্ট ঘ্রাণ আমি
টের পাই, কী এক নরম অনুভব
স্নায়ুর প্রতিটি তন্ত্রে, শরীরের সীমানা ছাড়ায়।
আজ এই ক্লান্ত রক্ত গোপন ঝরনার দিকে ফিরে
পুনরায় পুণ্য হল, রক্তের অপাপ রূপান্তর
শিশুর অপাপ ওষ্ঠে তৃষ্ণা হরণের যোগ্য হয়।
আমার শরীর এক অলৌকিক যন্ত্র, এ-ই শুধু
জীবনের জন্ম দিতে পারে। স্তন দুটি
যেন রূপকথার পাহাড়, এই প্রাচুর্যের নদী
বহে যায় স্বর্ণ যুগে, আর এই অবোধ শিশুর
স্মৃতির গভীরতম নদীগর্ভ সৃষ্টি হয়ে যায়, এ স্মৃতির কাছে জানি
সে আবার ফিরে আসবে একদিন স্বপ্নে কিংবা গাঢ় বেদনায়...
ওর জন্য এই ছবি স্পষ্ট, আর আমি,
আমি উপলক্ষ আজ, সময় নিষ্ঠুর ক্রুর হাতে
আমাকে বিবর্ণ করা আরম্ভ করেছে। হয়তো এই
শেষবার, আমি মাতা, এক শিশুর ধরিত্রী, কেননা আমার
দারুণ বৎসরগুলি শুষ্ক করে টেনে নিচ্ছে রস
শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গ থেকে। জানি আজও আমি
একটি জীবন্ত বৃক্ষ, হাওয়ায় ঝিলমিল করে পাতা
শরীরে এখনও আছে জন্মবীজ, কিন্তু জানি ঊষর সময়
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, গ্রাস করে নেবেই আমাকে।
কী চমৎকার এই ক্ষণিক বিরতি, আমি আজ
নিজেই নিজের কাছে হেমন্তের দিন;
সামান্য আশঙ্কা আর ভয় তাকে ঢেকে আছে।
দীর্ঘ রাজপথ হয়ে আমার অতীত

পিছনে বিস্তীর্ণ, শুধু ভবিষ্যৎ চোখ তুলে এইটুকু জানি
আমার অতীত যত দীর্ঘ ছিল, ভবিষ্যৎ তার
কিছু ছোট হবে।

['সন্তদের দিন' নামের একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ এখানে অনূদিত হল। যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতিকে তিনি 'শরৎকাল' বলেছেন, যেহেতু ওর পরেই শীত। কিন্তু আমি 'অটামের' অনুবাদ হেমন্ত করেছি, এইরকম অর্থে হেমন্তের উল্লেখ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।]

জার্মান কবিতা: দৃষ্টিবদল

জুরিখে ত্রিস্তান জারা যখন 'ক্যাবারে ভলতেয়ার'-এ নীবন সাহিত্যের হই-হল্লায় ডাডা আন্দোলন শুরু করেছিল, সেই কাছাকাছি সময়েই বার্লিনের নিউয়ের ক্লাবের সভ্যরা 'নিউপ্যাথেটিক ক্যাবারে'-তে চিৎকার করে অন্য ধরনের কবিতা পাঠ করে নতুন এক্সপ্রেশানিস্ট সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত করতে চাইছিলেন। এঁদের বিদ্রোহ কৃত্রিম কবিত্ব এবং আদর্শের বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে। ওদিকে ইতালির কবি মেরিনেত্তি শুরু করেছেন ফিউচারইজম, প্যারিস থেকে বেরিয়েছে তাঁর ঘোষণাপত্র, ফরাসি ও ইংরেজ কবিরা তাতে আকৃষ্ট হচ্ছেন আস্তে আস্তে, সেই ঢেউ জার্মানিতেও এসে পৌঁছুল। প্রায় কাছাকাছি সময়ে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, কাছাকাছি ধরনের কিন্তু আলাদা নামের সাহিত্যরীতির উদ্ভব হয়। মূলভাবে বলতে গেলে, ফ্রান্সে সুররিয়ালিজম, ইংল্যান্ডে ইমেজিজম, ইতালিতে ফিউচারিজম ও জার্মানিতে এক্সপ্রেশানিজম।

জার্মানির এক্সপ্রেশানিজম আন্দোলন অবশ্য খুব সংঘবদ্ধভাবে হয়নি, অনেকটা অপর সাহিত্যগুলির নবীন রশ্মির প্রভাবে স্বতোৎসারিত হয়ে ওঠে। এক্সপ্রেশানিজম কথাটার প্রথম ব্যবহার হয় ফ্রান্সে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে, বস্তুত ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের থেকে আলাদা হবার জন্যই এই নতুন রীতির উদ্ভব। বিমূর্ত শিল্পেরও শুরু এই সময় থেকে। অর্থাৎ যা চোখে দেখা যায় শিল্প সাহিত্যে তার প্রতিচিত্র বা ছায়া উপস্থিত করার বিরুদ্ধ মনোভাব জেগে ওঠে, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বদলে আন্তরিক উপলব্ধির সত্য প্রকাশ করতে চাইলেন এক্সপ্রেশানিস্টরা। বেনডেট্রো ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে যেমন সৌন্দর্যের রূপের বদলে অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যেই এক্সপ্রেশানিস্টদের প্রাথমিক বিকাশ, দৃষ্টিবদলের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা কবিতায় নতুন ভাষা ও রূপ, বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা আনলেন, সবচেয়ে বিশেষত্ব এঁদের মধ্যে অনেকেরই উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহারের আমূল পরিবর্তনে। যেন, মতন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে কবিত্বময় ছবির ব্যবহারের এঁরা সমূল উচ্ছেদ করলেন, ভাব ও চিত্র এক সঙ্গে মিলেমিশে গেল। ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, যদি মনে করা যায় যে ১৯১৪ সালেই ছাপা হয়েছিল, ফ্রানৎস কাফ্‌কার মেটামরফসিস নামের গল্পটি, যার নায়ক গ্রিগর সামসা জেগে উঠে দেখল সে সত্যিই একটা পোকা হয়ে গেছে, তার মনটা পোকার মতন হয়নি বা সে নিজেকে পোকা হিসেবে ভুল ভাবেনি। এখানে বিধেয় ও ভাবনা একরকম হয়ে গেল।

এক্সপ্রেশানিজমের প্রথম পর্ব খুব সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়, কারণ এর প্রধান উদ্যোক্তারা শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, এবং প্রায় সকলেরই মৃত্যু হয় অল্প বয়সে। প্রথম মহাযুদ্ধ যে কত কবিকে খুন করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আলফ্রেড লিসটেনস্টাইনের মৃত্যু হয় পঁচিশ বছরে, যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গেয়র্গ ট্রাকল ও আর্নস্ট স্টেডলার দু'জনেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান— ওই বছরেই। অগুস্ট স্ট্রাম— যাঁর নতুনত্বের কায়দা ছিল সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো— তিনি যুদ্ধে নিহত হন পরের বছর। যুদ্ধ আরম্ভ হবার দু' বছর আগেই, গেয়র্গ হেইম, যাঁকে বলা হত ধ্বংসের প্রবক্তা, তিনি এক জলে-ডোবা বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও মারা যান। জেবক ফন হোডিস, যাঁর কবিতাকে প্রথম এক্সপ্রেশানিস্ট কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তিনি ১৯১৪ সালেই পাগল হয়ে যান। এইভাবে এই তরুণ বিদ্রোহীরা হাউয়ের মতন অল্পকাল দপ করে জ্বলে উঠে অকস্মাৎ মিলিয়ে গেলেন। এঁদের নিজস্ব কবিতা কালোত্তীর্ণ হবার উপযোগী হতে সময় পেল না, কিন্তু মাতৃভাষার কবিতায় একটা বাঁক এনে দিয়ে গেল। এঁদের মধ্যে শুধু একজন, গেয়র্গ ট্রাকলকে আমি বেছে নিয়েছি।

এরপর আরম্ভ হয় এক্সপ্রেশানিজমের দ্বিতীয় পর্ব, অন্যান্য কবিদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

স্টেফান গেয়র্গ

[হোল্ডারলিনের কবিতা বাংলায় জনপ্রিয় করেছেন বুদ্ধদেব বসু। হাইনে অনুবাদ করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে মুজতবা আলি পর্যন্ত। ১৯৫৬ সাল আন্দাজ হঠাৎ কলকাতায় খুব রিলকের কবিতা পড়ার হাওয়া ওঠে। প্রায় এঁদেরই সমান উল্লেখযোগ্য হয়েও স্টেফান গেয়র্গের কবিতা বাংলায় কখনও কী কারণে যেন খুব মনোযোগ পায়নি। পূর্বোল্লিখিত কবিদের মতো অমন বর্ণময় জীবন নয় তাঁর, হোল্ডারলিনের মতো প্রভুপত্নীকে ভালোবেসে বদ্ধোন্মাদ হননি, হাইনের মতো নির্বাসিত জীবনে রহস্যময়ীর সেবা পাননি, রিলকের মতো দুর্গপ্রাকারে বসে দৈববাণীতে কবিতার লাইন পাননি, বরং হিটলারের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

গেয়র্গের জন্ম ১৮৬৮-তে। কোনও সমালোচকের মতে, তিনি নাকি দশ বছর বয়েসের আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে তিনি আলাদা জগৎ তৈরি করবেন। ধনী পরিবারে জন্ম, শৈশব থেকেই পিতার কাছ থেকে সাহিত্যচর্চায় প্রশ্রয় পেয়েছেন। বহুদিন পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন শুধু নিজেরই জন্য, বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কাছেই শোনাতেন, বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার পর নিজেকে তিনি একজন মহাপুরুষ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর উগ্র মতবাদ প্রচার শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অভ্যুদিত নাৎসিবাদ, নিৎসের মতো গেয়র্গের মতামতকেও ঈষৎ

বিকৃত করে কাজে লাগাতে দেরি করেনি। প্রথমদিকে গেয়র্গ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এজরা পাউন্ডের মতো চূড়ান্ত পর্যন্ত যেতে হয়নি, হিটলার ক্ষমতায় আসার পর দলের প্রবক্তা এবং সভাকবি করার জন্য গেয়র্গকে আহ্বান করেন, সেই সময়েই তিনি নিঃশব্দে পালিয়ে যান সুইটসারল্যান্ড এবং অচিরেই মৃত্যু, ১৯৩৩-এ।

প্রভূত পাণ্ডিত্য এবং মনীষা সত্ত্বেও গেয়র্গের কবিতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। জার্মান সাহিত্যে তাঁর আসন চিরস্থায়ী। ফরাসি সিম্বলিস্টদের কাছে তাঁর শিক্ষা, বোদলেয়ারের সমগ্র লে ফ্লর দু মাল অনুবাদ করেছেন, র‍্যাঁবোকে গুলি করার পর ভের্লেন যখন দু' বছর জেল খেটে বেরিয়ে আসছেন, গেয়র্গ ছিলেন সেখানে। মোট সাতটি ভাষা তিনি অনুবাদ করেছেন।]

তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু

তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু
তুমি সকালের মতো এত কোমল উজ্জ্বল
তুমি মহৎ বৃক্ষের থেকে প্রস্ফুটিত শাখা
তুমি পাহাড়ি ঝরনার মতো গোপন সরল
রৌদ্রময় মাঠে মাঠে তুমি আছো আমার সন্নিধে
তুমিই আলোর মতো তুমি কুয়াশায়
সায়াহ্নের শীতে তুমি কেঁপে ওঠো আমার শরীরে
তুমি ঠান্ডা হাওয়া, তুমি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

তুমি আমার বাসনা তুমি আমার ভাবনা
আমি প্রত্যেক নিশ্বাসে করি তোমাকে গ্রহণ
আমি প্রত্যেক চুমুকে করি তোমাকেই পান
আমি প্রত্যেক সুগন্ধে করি তোমার চুম্বন।
তুমি মহৎ বৃক্ষের থেকে প্রস্ফুটিত শাখা
তুমি পাহাড়ি ঝরনার মতো গোপন সরল
তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু
তুমি সকালের মতো এত কোমল উজ্জ্বল।

দ্বীপের প্রভু

মৎস্যজীবীদের গল্পে শোনা যায়, দক্ষিণ প্রদেশে
সুগন্ধ মশলা, তেল ভরা এক দারুচিনি দ্বীপে
যেখানে বালির মধ্যে ঝলসায় বহুমূল্য মণি
সেইখানে আছে এক পাখি, যার ডানা
মাটিতে ছড়ানো থাকে তবু ঠোঁট তুলে
বিশাল গাছের মাথা ছিঁড়ে আনতে পারে।
শামুকের রস মাখা যেন তার পালকের রং
যখন সে উড়ে যায় অল্প উঁচু, বিশাল শরীরে
মনে হয় যেন এক খণ্ড কালো মেঘ।
দিবাভাগে সে লুকোয় বনের ভিতরে
সন্ধেবেলা ফিরে আসে সমুদ্রের পাড়ে
ঝাঁঝি ও নুনের ঘ্রাণ ভরা সেই সমুদ্র বাতাসে
তার মিষ্টি শিস ওঠে, তীব্র হয়ে ভাসে—
শুশুকেরা গান ভালোবেসে আসে সৈকতের পাশে
সমুদ্রে সোনার পাখনা, স্বর্ণ উচ্ছলতা,
সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই সে ছিল এরকম
দৈবাৎ জাহাজ-ভাঙা মানুষেরা এক পলক দেখতে পেত তাকে
প্রথম যেদিন সাদা পাল তুলে মানব সভ্যতা
জাহাজের মুখ ফেরায় সেই দ্বীপে দৈবের নির্দেশে
সেই পাখি উড়ে গিয়ে বসল এক পাহাড় চূড়ায়
চেয়ে রইল নির্নিমেষে তার প্রিয় দ্বীপটির দিকে
বিষাদের চাপা স্বর তুলে মরে রইল সেখানেই।

[প্রথম কবিতাটি একটি প্রেমের কবিতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে লেখা কোনও বাংলা কবিতা এ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। ভালোবাসা এখানে শারীরিক আস্বাদের স্তরে এসেছে পর্যন্ত, কিন্তু কবিতাটি একটি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে লেখা। অর্থাৎ এই ভালোবাসা অনেকটা গ্রিক আদর্শের। ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রনবার্গার নামে একটি দেবপ্রতিম কিশোরকে তিনি ম্যাক্সিমিন নামে ডাকতেন এবং তাঁকে মনে করতেন প্রাচীন গ্রিসীয় আদর্শের প্রতিমূর্তি। ছেলেটি অকালে মারা যায়। গেয়র্গ এই কবিতাটি লেখেন, ম্যাক্সিমিন মারা যাবার কুড়ি বছর পরে। দ্বিতীয় কবিতায় শুশুকদের সংগীত প্রীতির প্রসঙ্গেও প্রাচীন গ্রিসের উপকথার উল্লেখ। কবি অরিওনকে জাহাজে দস্যুরা সর্বস্ব লুট করে যখন সমুদ্রে ফেলে দিতে যায়, তখন অরিওন শেষবারের মতো একটি গান গাইবার অনুমতি

চেয়েছিলেন। তাঁর মধুর গান শুনে হাজার হাজার শুশুক জাহাজের পাশে এসে ভিড় করে এবং অরিওন তখন নিজেই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন। এবং শুশুকরা তাঁকে কাঁধে করে নির্বিঘ্নে পাড়ে পৌঁছে দেয়। গেয়র্গের অনেক কবিতাই সভ্যতা শুরু হবার আগের জগৎ নিয়ে।]

হুগো ফন হফমান্সথাল

[হফমান্সথালের জন্ম ভিয়েনায়, ১৮৭৪-এ। যদিও ভিক্টর যুগো সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের সাহিত্য সাধনায় রোমান্টিসিজমকে অস্বীকার করেছেন। 'দু'জন' কবিতাটি যখন লেখেন, তখন তাঁর বয়েস ২৬, এবং জার্মান সাহিত্যে তাঁর আসন তখনই অবিসংবাদীভাবে স্বীকৃত, কিন্তু ক্রমশ তিনি কবিতা থেকে সরে গিয়ে মঞ্চ জগতে আশ্রয় নেন। জার্মান গীতিনাট্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর নাম। সোফোক্লিস, মলিয়েরের ভাষান্তর ছাড়াও তিনি কয়েকটি কালোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি লিখেছেন নিজে— এবং সুরকার হিসেবে পেয়েছিলেন রিচার্ড স্ট্রাউসকে। এখন জার্মান সাহিত্যে তাঁর সুনাম প্রধানত প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার হিসেবে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিরা হফমান্সথালের কবিতারই বেশি ভক্ত। ওঁর ছেলে হঠাৎ আত্মহত্যা করায়, ভগ্নহৃদয় হফমান্সথালের মৃত্যু ১৯২৯-এ।]

দু'জন

মেয়েটি এক হাতে নিয়েছে পাত্রখানি
মুখ ও চিবুক বাসনের মতো ডৌল
এমন সহজ, নির্ভয় তার লীলায়িত পথ চলা
হাতের পাত্র থেকে এক ফোঁটা উছলে পড়েনি মাটিতে
এমনই সহজ এবং কঠিন ছিল পুরুষের হাত
তরুণ অশ্বে আরূঢ় ছিলেন তিনি
এবং তখন অনায়াস ভঙ্গিতে
থামালেন সেই বেগচঞ্চল অশ্ব।
যা হোক, যখন মেয়েটির হাত থেকে
পাত্রটি নিতে হাত বাড়ালেন ঝুঁকে
দু'জনেরই কাছে সে কাজ বিষম কঠিন
দু'জনেই খুব কেঁপে উঠেছিল তখন
দু'জনের হাত ছোঁয়নি পরস্পর
গাঢ় লাল মদ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

বহির্জীবনের ব্যালাড

গভীর দু' চোখ নিয়ে শিশু বড় হয়
কিছুই জানে না তারা, বড় হয়, ফের মরে যায়।
মানুষেরা চলে যায় যে-যার রাস্তায়।

তেতো ফল একদিন মিষ্টি হয়ে ওঠে
মরা পাখিদের মতো ঝরে যায় রাতে
কয়েকদিন পড়ে থাকে, ফের মরে যায়।

হাওয়া আছে সব সময়, তবু বার বার
কত কথা শুনি আমরা কত কথা বলি
শরীরের যন্ত্রপাতি সুখ আর দুঃখ ভোগ করে।
ঘাসের ভিতর দিয়ে রাস্তা হয়, গ্রাম ও শহর
এখানে ওখানে ভরা পুকুর ও গাছপালা, আলো
কিছু আছে বিশ্রী লোক, কিছু আছে মড়ার মতন।

কেন এরা বেড়ে ওঠে? কেন পরস্পর
দু'জন সমান হয় না? কেন এরা এত সংখ্যাহীন?
কেন একবার হাসি, তার পরই কান্না, শুকনো হাওয়া?

এইসব ছেলেখেলা— আমাদের কাছে আর কতটুকু দামি
আমরা ক'জন তবু রয়েছি অসাধারণ, অনন্ত একাকী
চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, কখনও খুঁজিনি কোনও শেষ।

এত সব বিচিত্রকে লক্ষ করা কেন প্রয়োজন?
যা হোক, সেই তো সব কিছু বলে, যে বলে 'সায়াহ্ন'
এই এক শব্দ থেকে ভেসে ওঠে গভীর কাতর স্বর, দুঃখ নিরবধি
শূন্য মৌচাক থেকে যেরকম প্রবাহিত মধু।

[হফমান্সথালের "দু'জন" কবিতাটি বর্তমান লেখকের খুব প্রিয়, শুদ্ধ কবিতার রূপাঙ্কিত এই রচনা, অথচ বাংলায় এই কবিতাটির যথাযথ অনুবাদ প্রায় অসম্ভব। কারণ, বাংলা সর্বনামে নারী-পুরুষ বোঝা যায় না। সে বা তার ছাড়া কবিতাটিতে অন্য কোনও বর্ণনা নেই, অথচ বাংলায় মেয়েটি বা পুরুষ লিখিতে বাধ্য হলুম। 'মেয়েটি' ইত্যাদি লেখার বিপদ এই যে, এতে বয়েস বোঝা যায়। বালিকা, কিশোরী, যুবতী, রমণী বা নারী— সবই বয়েসবাচক,

যেমন ছেলেটা, লোকটা, লোকটি, পুরুষ ইত্যাদি। অথচ 'সে'— বা 'তার'-এর কোনও বয়েস নেই। যথাযথ শব্দের অভাবে বাংলা কবিতা এখনও অতিকথন দোষে দুষ্ট। প্রথম লাইনেই 'মেয়েটি' ব্যবহার করতে না হলে, এই অনুবাদের আকার নিশ্চয়ই বদলে যেত।

যেমন, দ্বিতীয় লাইনে, মেয়েটি যে সুরার পাত্রটি ধরে আছে, তার হাতলের সঙ্গে মেয়েটির মুখ ও চিবুকের রেখার তুলনা করা হয়েছে। আমি বরং উপমাটি নষ্ট করে দিয়েছি, তবু হাতল ব্যবহার করিনি। একটি মেয়ের (সুন্দরী, বলাই বাহুল্য) মুখের সঙ্গে তুলনা দিতে, এই রকম কবিতায় হাতলের মতো শব্দ ব্যবহার করতে মন চায় না। চেয়ারের হাতল আছে, লরি স্টার্ট দেবার জন্য যে বিকট লোহার ডাণ্ডাটা ঘোরাতে হয়, সেটার নাম হাতল, অফিসে যাবার সময় ট্রাম-বাসের যে দুর্লভ অংশটুকু ধরে ঝুলে থাকা যায়, তার নামও হাতল, আর চায়ের কাপটি পাতলা ঠোঁটের কাছে তুলে আনার জন্য কোনও নবীনা নারী চম্পক অঙ্গুলিতে কাপের যে-অংশটা ধরে থাকে, তার নামও হাতল? সত্যি, কী গরিব আমরা। কত অল্পে কাজ চালাচ্ছি।

হাত থেকে মদ চলকে পড়ে যাবার মানে হল, দু'জনের মিল হবে না। হফমান্সথালের কবিতার প্রতিটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েটির চঞ্চলতা, সহজ ভাব ও পুরুষটির দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, তবু দু'জনে যখন মিলিত হয়, তখন কেঁপে উঠেছিল। মদ পড়ে যাওয়া রক্তেরও প্রতীক। অর্থাৎ মিলন। এই শতাব্দীর শুরুতেই প্রথম দেখা দিল মিলনের মধ্যে সব সময় কিছুটা উৎকণ্ঠা, কিছুটা দূরত্ব ও অস্বস্তি।

দ্বিতীয় কবিতার শেষ দিকে 'আমরা', এই শতাব্দী-পরিবর্তনের কবিরা। 'সায়াহ্ন' কথাটির অর্থ— না অর্থ নয়, ভাব— কবিতা। 'সায়াহ্ন'র কথা বলা মানে এখানে কবিতা লেখা। জীবনের সব কিছুই অর্থহীন হয়ে যায়, যদি তা কবিতার মধ্য দিয়ে বলা না যায়।]

রাইনের মারিয়া রিলকে

[রিলকের জন্ম চেকোশ্লোভাকিয়ায়, ১৮৭৫ সালে। কৈশোর কেটেছে সামরিক বিদ্যালয়ে। যৌবনে তিনি নিজের কবিতা ছাপিয়ে প্রাহা শহরের পথে পথে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন পর্যন্ত। পরে তাঁর জীবন একেবারে বদলে যায়। একাধিক রূপবতী ও ধনবতী মহিলা তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন ও তাঁর জন্য প্রচুর সুযোগের সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। একবার তাঁর জন্য একটি সম্পূর্ণ দুর্গ-ভবন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কথিত আছে যার চূড়ায় বসে রিলকে দৈবী প্রেরণার প্রতীক্ষা করে ছিলেন। নিৎসের প্রেমিকা ও ফ্রয়েডের বান্ধবী লু আনড্রিয়াস সালোমির সঙ্গে তিনি রাশিয়ায় ভ্রমণ করেন ১৮৯৯ সালে, সেখানে টলস্টয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরের বছর ক্লারা ওয়েস্টহপ নাম্নী ভাস্করকে বিয়ে করার পর প্যারিসে কিছুদিন রোদ্যাঁর কাছে ছিলেন। এর পর অনুরাগী-অনুরাগিণীদের আতিথ্যে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। যুদ্ধের সময় তাঁকে জোর করে ডাকা হয়েছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। শেষ পর্যন্ত বহু সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত আবেদনের ফলে তিনি মুক্তি পান। ১৯২৬ সালে সুইটসারল্যান্ডে লিউকোমিয়া রোগে রিলকের মৃত্যু।

এক শতাব্দীর মধ্যে জার্মান ভাষায় সবচেয়ে বড় কবি এবং পৃথিবী ধ্বংস হবার আগের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন রিলকে। বাংলার প্রধান কবিরা রিলকের অনেক কবিতা অনুবাদ করেছেন, বুদ্ধদেব বসু, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখদের অনুবাদ বিশেষ পরিচিত। রিলকের কবিতার ভাষান্তরণ অতীব শক্ত, কোনও কোনও সমালোচক হয়তো রোদ্যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা মনে রেখেই— তাঁকে বলেছেন, 'শব্দ-ভাস্কর'। শুনেছি বহু শিক্ষিত জার্মানের পক্ষেও 'ডুইনো এলেজি'র বহু সাধারণ বাক্যের অসাধারণ প্রয়োগ বুঝতে পারা যথেষ্ট শক্ত। প্রথম জীবনে সরল রচনা দিয়ে শুরু করে ক্রমশ কঠিন দুর্বোধ্য শিখরে আরোহণ করেছেন রিলকে। এখানে রিলকের দুটি অপেক্ষাকৃত সরল কবিতা, যা বাংলায় আগে অনূদিত হয়নি, দেওয়া হল।

রিলকে মূল ফরাসিতেও অনেক কবিতা লিখেছেন। টি এস এলিয়টও তাঁর কাব্য সংগ্রহের শেষ সংস্করণে কয়েকটি নিজস্ব ফরাসি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মাতৃভাষায় ছাড়া কবিতা লেখা যায় না— এলিয়ট ও রিলকের ফরাসি রচনা এই ধারণার বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু এলিয়টের মূল ফরাসি রচনা ফরাসি দেশে বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি। আর রিলকের ফরাসি কবিতা সম্পর্কে ফরাসিরা বলেন, তাঁর রচনায় কিছু 'মিষ্টি ভুল' আছে।]

পাথরের সেতু

পাথরের সেতুর উপরে ওই যে অন্ধ মানুষটি আছে দাঁড়িয়ে
নামহীন বহু পরিধির সীমা-পাথরের মতন ধূসর
হয়তো ও-ই সে উপাদান, সেই অনন্ত কালের একমাত্র
যাকে ঘিরে বহু দূরে অনাদি নক্ষত্র কাল ঘূর্ণ্যমান,
ও সেই ভিখারি, এখনও সপ্তর্ষিদলে কেন্দ্রবিন্দু
ওর চার পাশ থেকে ঝরে পড়া সকল স্রোতের ধারা চরম উজ্জ্বল।

ও-ই সে অনড় ন্যায় দেবপ্রিয় একমাত্র সৃষ্টি
বসে আছে নানান জটিল ধাঁধা রাজপথের কেন্দ্রে
এখানেই মৃত্তিকার জগতের ম্লান প্রবেশের দ্বারপথে
কৃত্রিম মনুষ্য ভিড়ে অন্ধ বসে আছে এখানেই।

মৃতদেহ প্রক্ষালন

[একটি ফ্ল্যাট বাড়ির অগোছালো ঘরে একজন মানুষ মরে পড়ে আছে। তার সেখানে কোনও আত্মীয় বন্ধু নেই। দু'জন স্ত্রীলোককে ডাকা হয়েছে তার মৃতদেহ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে।]

তারা লোকটিকে কিছু চিনেছিল, কিন্তু যে-সময়ে
রান্নাঘর থেকে এল কুপি, জ্বলতে লাগল থিরথিরিয়ে
অন্ধকার হাওয়া চলাচলে— সেই অজানা মানুষ
হয়ে এল সম্পূর্ণ অচেনা। তারা তার কণ্ঠনালি ধুয়ে দিল,
এবং যে-হেতু তারা কিছুই জানত না তার জীবনের গল্প
নিজেরাই বানিয়ে নিল অন্য জীবন
ধোয়া মোছা ঠিক চলেছে, একজন কেশে উঠল একবার
একজন এক সময় ভারী ভিজে ভিনিগার স্পঞ্জ
রাখল সেই মুখে। অর্থাৎ সেই সময়ে একটু বিরতি
দ্বিতীয় নারীর জন্য। শক্ত রুক্ষ ব্রাশ থেকে জল
ঝরছে টিপটিপ করে; মৃতের ভয়ংকর হাত
মুচড়ে থেকে যেন সেই মুহূর্তের সমগ্র গৃহকে
জানাতে চেয়েছে, আর তার কোনও তৃষ্ণা নেই।

এবং সে প্রমাণও করেছে। যেন অপ্রস্তুত হয়ে সেই দু'জন নারী
সংক্ষিপ্ত কাশি দিয়ে আরও দ্রুত মোছা শুরু করে,
তারা কাজ করে যায়, দেয়ালের রঙিন কাগজে
দু'জনের বক্র ছায়া কুঁকড়ে ওঠে, কখনও গড়ায়

যেন পাশবদ্ধ, সেই দেওয়ালের চতুর্দিকে নিঃশব্দ নকশায়
যতক্ষণ চলে সেই দু'জনের সব ধোয়া মোছা
পর্দাহীন জানালার কাছে এক থেমে থাকা রাত্রি
অত্যন্ত নির্দয়। সেই নামহীন দেহ
শুয়ে থাকে নগ্ন পরিচ্ছন্ন, নিয়মের সৃষ্টি হয়।

[ঈশ্বর গরিবদের কেন বেশি ভালোবাসেন? 'ঈশ্বরের গল্পে' রিলকে বলেছিলেন, ঈশ্বর যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন সেই প্রথম মানুষ আদম, বেঁচে ওঠার অতি ব্যস্ততায় নিজেই ঈশ্বরের হাত থেকে লাফিয়ে নেমে যায়। ঈশ্বর যখন এক মুহূর্ত পরে তাকে খোঁজার জন্য তাকালেন (ঈশ্বরের এক মুহূর্ত অর্থাৎ এক কল্পান্ত)— দেখলেন সারা পৃথিবী গিসগিস

করছে মানুষে, কিন্তু সবাই, পোশাক-পরিচ্ছদে ঢেকে আছে, সুতরাং তিনি ঠিক কীভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তা আর দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, তিনি এমন একটি দরিদ্র মানুষকে সৃষ্টি করবেন, যে কিছুতেই জামাকাপড় পরে নগ্নতা ঢাকতে পারবে না। ঈশ্বর নিজের আসল সৃষ্টিকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন সব সময়।... রিলকের গুরু রোদ্যাঁও বলতেন, নগ্নতাই পৃথিবীর মূল সৌন্দর্য। প্যারিসের পঁ দু ক্যারুজেল নামে পাথরের সেতুর ওপর বসে থাকা অন্ধ ভিখিরিই এ জন্য প্রথম কবিতাটিতে প্রধান পুরুষ।

দ্বিতীয় কবিতায়, মৃতদেহ ধোয়া মোছা যেন রাজসিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠানের মতোই ঠিক বিপরীত। বহুমূল্য পোশাক ও মুকুট পরানোর বদলে এখানে সব কিছু খুলে ফেলা জীবন ছেড়ে মৃত্যুর সিংহাসনে অধিষ্ঠানের জন্য। মুখের ওপর ভিজে স্পঞ্জ রাখা, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতীক। রিলকের কবিতায় অন্যত্র সেই বর্ণনা আছে। যিশুর মুখের সামনে মদ-ভেজানো স্পঞ্জ তুলে ধরেছিল নিষ্ঠুর রক্ষীরা। এখানে শবদেহ বুঝিয়ে দিচ্ছে, তার আর তৃষ্ণা নেই। কবিতাটি কথ্য গদ্য ভঙ্গিতে লেখা, চাপা ছন্দ আছে, দ্বিধার মুহূর্তে সামান্য বিচ্যুতি।]

রুডলফ আলেকসান্ডার শ্রয়েডর

[জার্মান সাহিত্যের জন্ম ধর্মগীতি ও সন্তদের জীবন গাথায়। খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরেই ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম হয়। কয়েকটি দেশের— যেসব ভাষাকে বলা হয় রোমান্স ল্যাঙ্গয়েজ, অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, প্রভাঁসাল, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ ইত্যাদি, অর্থাৎ যাদের জননী ল্যাটিন, সেসব দেশের ভাষাগুলির জন্ম হতে একটু দেরি হয়েছে। কারণ, উন্নত-ভাষা ল্যাটিন ছিল শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর ভাষা এবং সেই ভাষাই হয়েছে প্রথম দিকে খ্রিস্টধর্মের বাহন। কিন্তু ল্যাটিন যাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা, তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য গির্জার প্রচারকরা স্থানীয় ভাষার উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। বাংলা দেশেও শ্রীরামপুরের পাদরিদের বাংলা গদ্যের চর্চার কারণ যেমন একই।

যে টিউটনিক জাতির বাসভূমি ছিল ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর জার্মানি, তাদের মধ্যে ইংরেজ ও আইরিশ ধর্মপ্রচারকরা এসে প্রচারের সুবিধের জন্য স্থানীয় ভাষাকে সুষম করতে সাহায্য করেন। সেই সমস্ত ধর্মগীতি থেকেই জার্মান সাহিত্য ধীরে ধীরে রূপ নেয়। বাংলা কবিতারও জন্ম বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের কারণে, কিন্তু নিছক ধর্ম ও দেবদেবীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে রক্তমাংসের মানুষকে সাহিত্যে উপজীব্য করতে বাঙালি লেখকদের বড় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়, চৈতন্যদেবের কালও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কোর্টলি লাভ এবং শিভালরির অভ্যুত্থান হলে, এবং ততদিনে জেগে-ওঠা ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে, দ্বাদশ শতাব্দীতেই জার্মানিতে বিশুদ্ধ প্রেমগীতি লেখা শুরু হল। ত্রিস্তান এবং সোনালি ইসল্টের অবৈধ মধুর প্রেমের গাথার প্রথম সার্থক রূপ দেখা যায় (যদিও অসমাপ্ত) ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর জার্মানিতে, গটফ্রিড ফন স্ট্রাসবুর্গের রচনায়।

তবু ধর্মগীতি রচনার স্রোত চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। শ্রেষ্ঠ জার্মান গীতি-কাব্যের অধিকাংশ ধর্মসংগীত। সেই কারণে আমরা এবার বিংশ শতাব্দীর একজন বিশুদ্ধ ধর্মসংগীতের কবিকে বেছে নিয়েছি। শ্রয়েডর ধর্মে প্রোটেস্টান্ট। কবি হিসেবে তিনি খুব বড় নন এবং জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান হয়তো তেমন উজ্জ্বলভাবে নির্দেশিত হবে না, কিন্তু ধর্মীয় সাহিত্যে তাঁর যুগপৎ বৈদগ্ধ্য ও সরলতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনার ধারা খুঁজলে সপ্তদশ শতাব্দীর পল গেরহার্ড কিংবা আরও আগে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের মূল প্রচারক মার্টিন লুথারের নাম করা যায়। যে সরল এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী প্রতিবাদ ছিল লুথারের চরিত্র (গির্জার দরজায় পেরেক ঠুকে নিজের ইস্তাহার লটকে দিয়ে আসা কিংবা মঠ-পরিত্যক্তা নানকে বিয়ে করে গির্জার অনুশাসন অমান্য করা), পরবর্তী যুগের প্রোটেস্টান্টদের তা চিরকাল প্রেরণা দিয়েছে। লুথার অনূদিত বাইবেল (তাঁর জীবদ্দশাতেই ৩৭৭ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল) প্রথম দৃঢ় জার্মান গদ্যের নিদর্শন এবং তাঁর রচিত কবিতাবলী ও গান ('ঈশ্বর আমাদের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ') পরবর্তী দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শ্রয়েডরের রচনাতেও তার চিহ্ন পাওয়া যায়।

জার্মান সাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পর ঈশ্বর হয়ে যান এক ও নিরাকার, গ্রিসের হাস্যমুখর-কলহপরায়ণ চমৎকার দেবদেবীরা ধুলিসাৎ হয়ে যান। কিন্তু গেয়র্গের কবিতার আলোচনায় আমরা দেখেছি, গ্রিক দেবদেবীদের সমাজকেই তিনি আদর্শ মানব সমাজ মনে করতেন, হোল্ডারলিনও এরকম বিশ্বাসী এবং আরও অনেকে। শ্রয়েডরও কিছুটা এই ধারার কবি।

শ্রয়েডর-এর জন্ম ১৮৭৮ সালে। বিদগ্ধ ও সাত্ত্বিক জীবন। বহু ভাষায় পণ্ডিত; গ্রিক, ফরাসি ও ইংরেজি ক্লাসিকসের অনুবাদক। তাঁর সরল ও মধুর ধর্মগানগুলি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'নৈবেদ্য' পর্যায়ের কবিতাগুলির কথা মনে পড়ায়; প্রোটেস্টান্টদের বিশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা উপনিষদের ধারণারও মিল আছে। শ্রয়েডর-এর কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে কি না বা পড়া সম্ভব ছিল কি না, আমার জানা নেই।]

দুটি গান

১

আমি তো চাইনি তোমার চোখের বালি
ও চোখের ওই বিচারসভায় আমি কে?
সানন্দে আজ ছেড়েছি আমার ঐশ্বর্যের ডালি
যা ছিল তোমার তাই তো দিয়েছি রেখে!
অপর লোকের যত্নে লুকোনো রত্নের সিন্দুকে
আবর্জনার স্তূপ জমে আছে খালি।

হে পথিক, তুমি থেমো না এখানে একা
এই বীভৎস ছবিতে
এই কুৎসিত ভয়ংকরকে দেখা
পারে বুক ভেঙে খান খান করে দিতে।
ফেরাও নয়ন, মূর্খের পদচিহ্ন অনুসরণ
তোমার জন্য নয়
ওরা শুধু বলে আবহমানের সৃষ্টির অনুখন
উৎকণ্ঠা ও ভয়।

তবু হায় আজও নিজেই পারিনে আমি
উৎকণ্ঠায় যা দেখেছি ওই মুখে
পথিকের মুখে অপমান-লাজ, নিয়েছি নিমেষে চিনে
ওই অপমান আমারই, লজ্জা রয়েছে আমার বুকে।

২

যদিও তোমার রয়েছে একটি শরীর
অস্থি মাংসে গড়া
যদিও তোমার পরীক্ষা নয় কঠিন
হৃদয় কঠিন করো!
যে-হৃদয় তুমি পেয়েছ সে যদি কখনো
ব্যথা পায়, চায় বাসনায় ঘুরে মরা,
সময়ের দাবি: প্রস্তর হোক মন
প্রস্তরই ভিত, প্রস্তর দৃঢ়তর।

গটফ্রিড বেন

[কবিতা কী, এর উত্তরে জীবনানন্দ দাশ খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন, কবিতা অনেক রকম। একথা বলার সময় তাঁর চোখ ছিল সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীর কবিতার দিকে, কারণ, বাংলা দেশে এখনও কবিতা অনেক রকম নয়। লিরিকের প্রতিই এখনও বাংলা দেশের ঝোঁক বেশি, একটু সুরেলা, কিছুটা নরম সৌরভময় পাপড়িমেলা না হলে বাংলা কবিতা এখনও যথেষ্ট গ্রাহ্য হয় না।

কবিতা যে অর্থে অনেক রকম, তার মধ্যে কিছু কিছু চাক্ষুষ রূপান্তরও পড়ে। কোনও রকম ছেদচিহ্ন ব্যবহার না করা, কখনও বড়-টাইপ, তারা-ফুটকি এগুলোও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। কিংবা অ্যাপোলিনেয়ার বা পাউন্ড যা করেছিলেন, বৃষ্টিধারার মতো বা চ্যাপটা বা সরুভাবে স্তবক সাজানো—কিংবা কামিংস যেমন ছিলেন ক্যাপিটাল লেটারের জাতশত্রু—এগুলিও কবিতারই অঙ্গ। নাটক-সংগীত বা চিত্রকলার অনুগ্রাহকদের বিপরীত, কবিতার পাঠক কখনও চোখের সামনে থাকে না বলেই কবি পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা নিতে পারেন। কিন্তু বাংলা দেশে এখনও সামান্য এলোমেলোমিকে পাগলামি বলে গণ্য করা হয়। সেদিক থেকে, গটফ্রিড বেনের কবিতায় ক্রিয়ার অনুপস্থিতি বা বাক্য সাজানোর নিয়ম অগ্রাহ্য করা— খুবই দুর্বোধ্য ঠেকবে। এই সূত্রে গটফ্রিড বেন ছিলেন নিহিলিস্ট।

বহিরঙ্গ ছাড়াও, অন্যান্য দেশের সাহিত্যের নানা আন্দোলন এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে-দেখার ভঙ্গি বার বার বার বদলে দিয়েছে। এ শতাব্দীর শুরুতে ফরাসি দেশে যখন সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছে, জার্মানিতে তখনকার নতুন আন্দোলনের নাম এক্সপ্রেশানিজম। পরবর্তীকালে সুররিয়ালিজম এবং এক্সপ্রেশানিজম দুটোই এসে মিশে যায় বা ধ্বংস হয় একজিসটেনশিয়ালিজমে।

এক্সপ্রেশানিজম সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলা যায়, এই মতবাদীদের বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বের যেকোনও বস্তুর আন্তরিক সত্যটুকুই প্রকাশ করা উচিত। তার রূপের বর্ণনা বা শুধু নাম উল্লেখ করা অর্থহীন। এবং এই আন্তরিক সত্যটি প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে আসে। এই বিশ্বাসের কেন্দ্র হয় এই সভ্যতা, যা বাইরে থেকে দেখতে চকচকে এবং সহস্র পুষ্পে সজ্জিত মনে হয়, কিন্তু সেটা আসলে ভেতরে পচা। সুতরাং 'সভ্যতা' এই নামটা অর্থহীন। গটফ্রিড বেন বলেছেন, এই বিশৃঙ্খল জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নয়, একমাত্র শিল্প ছাড়া।]

নষ্ট অহমিকা
(অংশ)

নষ্ট অহমিকা, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বিপর্যস্ত,
আয়নের শিকার, গামা রশ্মির মেষশিশু
কণিকা ও প্রান্তর, অন্তরের দুঃস্বপ্ন-প্রাণী
তোমার নত্‌রদামের ধূসর পাথরে।
তোমার জন্য দিন কাটে রাত্রিহীন, ভোরহীন
বৎসর তুষারহীন এবং ফল—
ধরে আছে অনন্ত শাসানিময় গোপন
পৃথিবী যেন শূন্য যাত্রা।
কোথায় শেষ তোমার, কোথায় ফেলবে তাঁবু

কোথায় তোমার শূন্য স্তরে প্রসারিত লাভ, ক্ষতি
পশুদের নিয়ে এক খেলা, অনেকগুলি শাশ্বত
তুমি তাদের বাধা পেরিয়ে যাও।
পশুর চাহনি, তারাগুলি ষাঁড়ের অস্ত্র
জঙ্গলের মধ্যে মৃত্যু অস্তিত্ব ও সৃষ্টির কারণ
মানুষ, জাতি সংঘর্ষ, ক্যাটালনিয়ার
প্রান্তর, পশুর গলা দিয়ে নেমে যায়।

পৃথিবী চিন্তায় খণ্ড খণ্ড। স্থান ও কাল
এবং আর যা কিছু এই মানবসমাজকে
বুনেছে ও ওজন করেছে, সবই শাশ্বতের নিত্য ক্রিয়া।
পুরাণকাহিনী মিথ্যুক।
কোথায় যাবে? কোথা থেকে? না রাত্রি, না সকাল
না ইভো, না মৃতের জন্য প্রার্থনা
তুমি শুধু চাও একটা ধার-করা স্লোগান,
কিন্তু কার কাছ থেকে ধার-করা?

আ, যখন তারা সবাই নত হয়ে প্রণাম করেছে এক কেন্দ্রে
যখন চিন্তাশীলরাও শুধু চিন্তা করেছেন ঈশ্বরকে
যখন তারা ছড়িয়ে গেছেন মেষপালক ও মেষের দিকে
প্রত্যেকবার শেষ ভোজনের সুরাপাত্র থেকে রক্ত তাদের শুদ্ধ করেছে।

এবং প্রত্যেকেই এক ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহিত
প্রত্যেকেই একটা রুটি ভেঙে টুকরো মুখে দিয়েছে
হে দূরের বাধ্য হিসেবে পরিপূর্ণ সময়
তুমি একবার নষ্ট অহমিকাও গ্রাস করেছিলে।...

[জন্ম ১৮৮৬ সাল। ডাক্তারি পাশ করার পর বেন সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ছিলেন সামরিক চিকিৎসক দলে, কিন্তু পরবর্তী কালে ডাক্তারি করার চেয়ে সাহিত্যিকদের দলে আড্ডা মারাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ১৯১২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'লাশকাটা ঘর' নামের প্যামফ্লেট খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই সময়েই তাঁর আত্মজীবনীমূলক কিছু কিছু গদ্য রচনা এক্সপ্রেশানিস্ট সাহিত্যের রূপ স্পষ্ট করে তোলে, এগুলির মধ্যেই তিনি আধুনিক পৃথিবীর বহুখণ্ডিত মানুষকে উপস্থিত করেন।

এক সময় তিনি নাৎসিদের রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিছুটা

যুক্তও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে সংস্কৃতির জগতে নাৎসিদের উৎপাত তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন, নাৎসিরা তাঁর সমস্ত রচনা বাজেয়াপ্ত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও তাঁকে ডাক্তার হিসেবে যোগ দিতে হয়েছিল। যুদ্ধ থেমে গেলে, মিত্রপক্ষও আবার তাঁর রচনা জার্মানিতে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে কিন্তু তরুণ জার্মান লেখকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, ১৯৪৯ সালে সুইটসারল্যান্ড থেকে তাঁর রচনা আবার প্রকাশিত হলে তাঁর প্রতি শাসকবর্গের বিরূপ মনোভাব ক্রমশ কমতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই, গটফ্রিড বেনের খ্যাতি জার্মানি ছাড়িয়ে সারা ইউরোপে ছড়ায় এবং ইউরোপের একজন প্রধান লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। মৃত্যু ১৯৫৬, পশ্চিম জার্মানিতে।

গেয়র্গ ট্রাকল

[প্রায় বালক বয়েসে, অথবা সদ্য যৌবনেই মৃত্যু, কিন্তু কবি হিসেবে অমর হয়েছেন, এরকম দু'-একজন কবি প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই। কিটসের কথা মনে পড়লেই চোখে ভাসে তাঁর রোগশয্যায় শুয়ে থাকা শরীর, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর দুঃখিত মৃত্যু। শেলিরও তো মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর বয়সে। কত মানুষ কত দীর্ঘ দিন ব্যর্থ বেঁচে থেকে পৃথিবীকে শুধু ভারী করে রাখে, আর ওই দুটি ছোকরা পৃথিবীকে কত ধনী করে দিয়ে গেল। ফরাসি ভাষায় এরকম উদাহরণ বেশি। র‍্যাঁবো-র কথা উল্লেখ করে লাভ নেই, কারণ শুধু ফরাসি ভাষায় নয়, সারা পৃথিবীতেই দেব-দানবের সমাহারে সৃষ্টি এরকম এক বালকের অলৌকিক কীর্তির আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে লাফর্গের কথা খুব মনে পড়ে। মাত্র সাতাশ বছরে মৃত্যু, কিন্তু লাফর্গের নাম ফরাসি ভাষায় চিরকালীন হয়ে গেছে, এবং নিজের চেয়েও অনেক বেশি প্রতিভাবান কবিদের (পাউন্ড, এলিয়ট, হার্ট ক্রেন) প্রভাবিত করেছে— ওই তিক্ত, হতাশ, করুণাপ্রার্থী যুবা। ইতালিতেও আমরা দেখেছি, গুইদো গৎসানো রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরেও বাঁচতে পারেননি, তেত্রিশ বছরে মৃত্যু।

জার্মানিতে এরকম গেয়র্গ ট্রাকল। ভয় ও বীতস্পৃহার মধ্যে মাত্র সাতাশ বছরে মৃত্যু। প্রথম মহাযুদ্ধে কর্পোরাল হিসেবে লড়াই করেছে একজন অস্ট্রিয়ান, অ্যাডলফ হিটলার, আর, আরেকজন অস্ট্রিয়ান— গেয়র্গ ট্রাকল অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে শুশ্রূষা করেছেন। কিন্তু মানুষকে বাঁচাবার কাজ ট্রাকল বেশিদিন করতে পারেননি, কারণ তাঁর নিজেরই বাঁচার কোনও ইচ্ছে ছিল না। জন্ম ১৮৮৭, ছেলেবেলা থেকেই নানারকম মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই পৃথিবীটা ছিল তাঁর কাছে ভয়ের বস্তু সেই ভয় তাঁকে সব সময় তাড়া করে ফিরত। কবিতা লেখা ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোনও অবলম্বন ছিল না। গ্রোডেকের যুদ্ধের পর রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখে তাঁর মন স্তম্ভিত হয়ে যায়, তা ছাড়া, ট্রাকল তখন মেডিকেল কোরের লেফটেনান্ট, তাঁর অধীনে ৯০ জন গুরুতর আহত সৈনিক, তাদের বাঁচাবার কোনও উপায়ই তাঁর হাতে নেই— এই পরিবেশে তাঁর মানসিক

ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হল তখন, সেখানেই তিনি আত্মহত্যা করলেন, সেদিন ৩ নভেম্বর, ১৯১৪।

এক্সপ্রেশানিস্ট লেখকদের মধ্যে ট্রাকলের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। জার্মান কবিতার তিনি একদিকে মোড় ঘুরিয়েছেন এবং সাম্প্রতিক লেখকদের ওপর তাঁর প্রভাব প্রবল। জীবনে অত হতাশা ও অসহায়তা থাকলেও ট্রাকলের কবিতাবলী ভারী মধুর, এবং বেঁচে থাকার উপযোগী একটা মিষ্টি আশার ইঙ্গিত আছে।]

একটি শীতের সন্ধ্যা

শার্সির গায়ে ঝুরুঝুরু ঝরে তুষার
গির্জায় বাজে করুণ দীর্ঘ ধ্বনি
খানার টেবিলের চামচ পিরিচ সাজানো
সজ্জিত গৃহ, মনোরম তাপ, শান্ত।

বহু পথ ঘুরে কারা যেন ফিরে আসে
আঁধার পথের পাশে দরজায় থামে
দরজার পাশে দয়ালু বৃক্ষ, থোকা থোকা সোনাঝুরি
জননী ধরার সুশীতল রস টানে।

দরজা পেরিয়ে মৃদু পায়ে এল পথিক
গভীর দুঃখে অঙ্গনটুকু নিথর।
টেবিলে সাজানো সতেজ খাদ্য টলটলে লাল মদ
নিখুঁত আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পাশ্চাত্য সংগীত

হে আত্মার নৈশ ডানার আন্দোলন;
রাখাল, আমরা একদা গিয়েছিলাম আঁধার অরণ্যে
লাল হরিণ, সবুজ ফুল এবং ধ্বনিময় বসন্ত আমাদের মান্য করেছিল
হে প্রাচীন ঝিল্লিস্বর
মন্দিরের বেদিতে গড়ানো রক্ত ফুল হয়ে ফুটে আছে

পুকুরের সবুজ নিস্তব্ধতার ওপরে ভাসে একটি পাখির কান্না।
হে ধর্মযুদ্ধ, মাংসময় শরীরের উজ্জ্বল যন্ত্রণা
সন্ধ্যার বাগানে ঝরে পড়া রক্তিম ফল
একদিন এখানে ধার্মিক শিষ্যবৃন্দ ভ্রমণ করেছিল
আজ সৈন্যদল এখানে আহত শরীর নিয়ে জেগে উঠে তারার স্বপ্ন দেখে
হে রাত্রির কোমল শস্যস্তবক!

হে তুমি সোনালি শরৎ ও শান্তির কাল
আমরা শান্ত সন্ন্যাসীরা একদিন তোমার মধ্যে বসে
আঙুর পেষণ করেছি
আর আমাদের ঘিরে পাহাড় ও অরণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।
হে তোমার শিকারদেশ ও দুর্গ; সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা
নিজের নিরালা ঘরে মানুষ চেয়েছে সুবিচার
নিঃশব্দ প্রার্থনায় দ্বন্দ্ব করেছে ঈশ্বরের জীবিত মাথার জন্য।

হে ধ্বংসের তিক্ত সময়,
এখন আমরা কালো জলের মধ্যে একটি পাথর-কঠিন
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।
তবু উজ্জ্বল প্রেমিকেরা তুলে ধরে তাদের রূপালী ঢাকনা—
মিলিত এক শরীর।
গোলাপের মতো নরম বালিশ থেকে ভেসে আসে ফুলের সুরভি
আর ঘুম ভাঙার পর মধুর গান।

বের্টল্ট ব্রেহখ্‌ট
বেচারি বি.বি.

আমি বের্টল্ট ব্রেহখ্‌ট, এসেছি কালো জঙ্গল-দেশ থেকে
আমার মা আমাকে যখন শহরে আনেন, তখন আমি ছিলুম
তাঁর পেটের মধ্যে। এবং সেই জঙ্গলের সিরসিরানি
আমার শরীরে থাকবে— যতদিন না আমি অদৃশ্য হয়ে যাই।

এই পিচ-বাঁধানো শহরে আমি বেশ মানিয়ে গেছি। প্রথম
থেকেই মুমূর্ষুর প্রতিটি মন্ত্রে আমি সজ্জিত: খবরের
কাগজ, তামাক এবং মদ। সন্দেহপ্রবণ আর অলস
থেকে শেষ পর্যন্ত তৃপ্ত।

আমি মানুষের প্রতি অসাময়িক, ওদের শিষ্টতা অনুযায়ী
আমি মাথায় টুপি পরে থাকি। আমি বলি: এরা সব
অবিকল এক একটি গন্ধমূষিক! আবার আমি বলি: তাতে
কিছু যায় আসে না, আমি নিজেও তাই।

কোনো কোনো সকালে আমি আমার খালি দোলনা
চেয়ারে কয়েকটি মেয়েকে এনে বসাই এবং খুশি চোখে তাকিয়ে
থাকি তাদের দিকে। আমি ওদের বলি: আমি হচ্ছি সেই
ধরনের মানুষ, যাদের কক্ষনো বিশ্বাস করা যায় না।

সন্ধের দিকে আমি কিছু লোক জড়ো করি। পরস্পরকে আমরা
ডাকি, 'জেন্টলম্যান'। ওরা আমার টেবিলের ওপর পা তুলে
দিয়ে বলে, শিগগিরই আমাদের সুদিন আসছে হে! আমি
আর জিজ্ঞেস করি না: কবে?

শেষ রাত্রির দিকে, ধূসর ঊষার পাইন গাছরা সময় হিসি করে,
আর গাছের উকুন অর্থাৎ পাখিরা শুরু করে চেঁচামেচি।
সেই সময়টায় শহরে আমি শেষ গ্লাসে চুমুক দিয়ে,
চুরোটের টুকরোটা ছুড়ে ফেলে ঘুমোতে যাই, উদ্বিগ্ন।

আমরা অর্বাচীনের দল এমন সব বাড়িতে থাকি, যেগুলো
ধ্বংসের অতীত বলা যায়। (এইভাবেই ম্যানহাটান দ্বীপের
বিশাল কুঠরি বাড়িগুলো তৈরি করেছি আমরা—আটলান্টিকের
মধ্যে দিয়ে কথা বলা তারাগুলোও।)

এইসব শহরগুলোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত শুধু তাই টিকে
থাকবে—যা শহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে যায়, হাওয়া! এই বাড়ি
ভোজনবিলাসীদের খুশি করে— খালি হয়ে যায়। আমরা জানি
আমরা শুধু সূচনা, জানি আমাদের পর যারা আসবে—

উল্লেখযোগ্য কিছুই না।
সামনের ভূমিকম্পে আমি আশা করছি, আমার চুরোটটা
নিবে গিয়ে তেতো হতে দেবো না।
আমি, বের্টল্ট ব্রেহখ্ট, যখন আমি মায়ের পেটে ছিলুম
সেই বহুদিন আগে কালো জঙ্গল-দেশ থেকে এই
পিচ-বাঁধানো শহরে পরিত্যক্ত হয়েছি।

নিমজ্জিতা মেয়েটি

জলে ডুবে গেল, ভেসে গেল খরস্রোতে
পেরিয়ে ঝরনা, ঢেউ উত্তাল নদীতে—
আকাশে সূর্য উজ্জ্বল নীলমণি
যেন তিনি চান ওই মৃতদেহ জুড়োতে।

শরীরে জড়াল শ্যাওলা, সাগর-পানা
ক্রমশই ভারী হয়ে এল সেই শরীর
দু' পায়ের ফাঁকে ভেসে যায় কত মাছ
শেষ যাত্রায় প্রাণী ও ঝাঁঝির বাধা বার বার জড়ায়।

সন্ধ্যা আকাশ ধোঁয়ার মতন কালো
রাত্রে তারার আলো হয়ে এল অনড়
তবুও বিকেলে ছিল স্বচ্ছতা, নীলিমার নীল দিন
আরও কিছু ভোর এবং সন্ধ্যা এখনও রয়েছে সামনে।

যখন পাচন শুরু হল তার ম্লান দেহটিতে জলে
খুব ধীরে ধীরে ঈশ্বর তাকে অনায়াসে ভুলে গেলেন।
প্রথমে মুখটি, তার পর হাত, সব শেষে তার চুল
এখন সে শুধু পচা গলা মাস, নদীতে অন্য পচা মাংসের মতন।

[নাট্যকার ও মঞ্চ প্রযোজক হিসেবে ব্রেহখ্টের প্রভূত খ্যাতি তাঁর চমৎকার লিরিকগুলিকে কিছুটা চাপা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাঁর কবিতার নিপুণ-সারল্য অননুকরণীয়। কখনও কখনও তিনি চিনে কবিতার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মতে তাঁর শব্দ ব্যবহার বাইবেলগন্ধী— যদিও কোনও কোনও সমালোচক তাঁর কাব্য-সংগ্রহকে বলেছেন, 'শয়তানের প্রার্থনা

পুস্তক'। এর কারণ, ব্রেহখ্‌ট সমাজের নিচু শ্রেণীর নরক-সমান পরিবেশের বঞ্চিত, অপমানিত মানুষের কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতে পেরেছেন।

প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর জীবনী জানা যায়। এ ছাড়া, উল্লেখযোগ্য তথ্য এই, জন্ম ১৮৯৮, রাজনৈতিক মতবাদের জন্য একাধিকবার নির্বাসন। তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং জার্মানি বিভাগের পর শেষ পর্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন পূর্ব জার্মানিতে। নাট্যকার হিসেবে তাঁর সম্মান পৃথিবীব্যাপী এবং সম্ভবত তিনিই একমাত্র কমিউনিস্ট লেখক। যাঁর নাটকের ধারাবাহিক অভিনয় হয় আমেরিকায়। মৃত্যু ১৯৫৬।]

ইনগেবর্গ বাখমান

[এই শতাব্দীর শুরুতেই নিঃসঙ্গতা নামক নির্মম ব্যাধিটি প্রবলভাবে আক্রমণ করে কবি ও শিল্পীদের। অধিকাংশ রচনাতেই ফুটে ওঠে সমাজের প্রতি কবির অনাস্থা, মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বোধ। সমস্ত শিল্পই ক্রমশ হয়ে ওঠে অতি ব্যক্তিগত, শিল্পীর একক নিঃসঙ্গতার অভিব্যক্তি। কিন্তু ১৯২০-র পর জার্মানির একদল লেখক (ব্রেহখ্‌ট প্রমুখ) চেয়েছিলেন সমাজের সঙ্গে কবির নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে, ঘোষণা করেছিলেন মানুষের সম-ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু কয়েক বছর পর হিটলারের উত্থান এই শুভ বিশ্বাসকে তছনছ করে দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, জার্মানিতে আবার এক নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাদের বলা হয় ৪৭-এর দল। এই দলের লেখকরাও বিদ্রোহী নন, শান্ত, চাপা-আচ্ছন্ন, সংগীতময় রচনা এঁদের বৈশিষ্ট্য। এঁদের মধ্য থেকে আমরা একমাত্র শ্রীমতী ইনগেবর্গ বাখমানকে বেছে নিলাম।

শ্রীমতী বাখমান জাতে অস্ট্রিয়ান, জন্ম ১৯২৬। দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট। দুটি কবিতার বই এবং একটি ছোট গল্পের বই বেরিয়েছে। এই রূপসী বিদূষী তরুণী; অল্প বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন, ইংরেজি অনুবাদকরাও বলেছেন, অনুবাদে তাঁর কবিতার রস খুবই নষ্ট হয়।

জার্মান কবিতা সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকরা বিশদ পরিচয়ের জন্য পাওলিক-হাকার-মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা নামের বাংলা অনুবাদের বইটি দেখতে পারেন।]

দুপুর

গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন লেবু গাছগুলি
নিঃশব্দে ভরে যায় ফুলে
শহরের বহু দূর থেকে দিনের বেলার চাঁদ

পাঠিয়ে দেয় আলোর ম্লান ছায়া:
দুপুর হয়ে এল,
এখন ঝরনার জলে কাঁপে সূর্যের আলো

এখন প্রাচীন ভগ্নস্তূপের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে
ফিনিক্স পাখি মেলে দেয় তার বিক্ষুব্ধ ডানা,
পাথর ছুড়ে ছুড়ে ক্ষতবিক্ষত হাত
এখন জাগ্রত ফসলে ডুবে যায়।

যেখানে জার্মান আকাশ পৃথিবীকে কালো করে দেয়
সেখানে এক মুণ্ডহীন দেবদূত খুঁজছে একটি কবর
মানুষের ঘৃণার জন্য
আর তোমার জন্য সে রেখে যায় একটি হৃদয়ের চাবি।

একমুঠো দুঃখ মিলিয়ে যায় পাহাড়ের ওপারে।
সাত বছর পর
তোমার পুরনো চিন্তা তোমার জন্য ওখানে অপেক্ষায় আছে,
সেই দরজার সামনে ঝর্নায়:
খুব গভীর ভাবে সেদিকে তাকিয়ো না, না, তাকিয়ো না
অশ্রু তোমার চক্ষু ডুবিয়ে দেবে।

সাত বছর পর
যে বাড়িতে মৃতেরা শুয়ে আছে
সেখানে গত কালের হত্যাকারীরা তুলে ধরেছে
তাদের সোনালি পানপাত্র
তুমি চোখ নামিয়ে নাও, চোখ ফেরাও।
এখন পুরো দুপুর।
ছাইয়ের মধ্যে
কুঁকড়ে উঠছে লোহা, কাঁটাঝোপ ছাড়িয়ে
উড়ছে পতাকা, আদি কালের স্বপ্নের পাথরগুলি
শিকলে রূপান্তরিত ঈগলকে ধরে আছে।
আলোয় অন্ধ হয়ে যাওয়া আশা শুধু শিউরে ওঠে।

তার শিকল খুলে দাও, শিখর থেকে নামিয়ে
আনো তাকে, তোমার দু' হাতে ঢাকো তার চোখ

যেন ছায়া তাকে ঝলসে দেয়।
যেখানে এক জার্মান আকাশ পৃথিবীকে কালো করে
সেখানে মেঘ খোঁজে শব্দ,
বোমার গর্তগুলি ভরিয়ে দেয় স্তব্ধতায়
গ্রীষ্মের আগে সেই শব্দ শুনতে পায় সামান্য বৃষ্টি ধারায়।

সারাদেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায় সেই অব্যক্ত অনুভব
শুধু ফিসফিস করে শোনা যায়:
এখন দুপুর ॥

[ফিনিক্স মিশরের একটি পৌরাণিক পাখি। এই সুন্দর উজ্জ্বল পাখিটি ৫০০ বছর বাঁচার পর নিজেই ইচ্ছে করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার সেই ছাই থেকে হয় পুনর্জন্ম। ফিনিক্স পাখি অমরত্বের প্রতীক। পাহাড় চূড়ায় যে বন্দি ঈগলের উল্লেখ আছে— সেই ঈগল পাখিও সাধারণভাবে যেকোনও জাতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে পরাভূত জার্মান জাত। কবিতাটিতে জার্মানির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বিষাদ স্পষ্ট। পৃথিবীতে যখন সভ্যতার দ্বিপ্রহর, তখন জার্মানিতে ছায়ার জন্য ভয়।]

আনড্রিয়াস ওকোপেঙ্কো

[বাংলা দেশের কবিতায় দশক ভাগ করার একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তৃতীয় দশক, চতুর্থ দশক, পঞ্চম দশক এই অনুযায়ী কবিদের নিতান্ত জন্মসাল বা কবিতার লেখার কাল দিয়ে শ্রেণী ভাগ করার রীতি আর কোথাও চোখে পড়ে না। কোনও পত্রিকা বা কোনও শক্তিশালী দলকে কেন্দ্র করে কবিতায় স্মৃতির পুনরুদ্ধার বা নতুন ধ্যান ও রীতির উদ্ভব হয়, কবিতার ইতিহাস তৈরি হয় সেরকমভাবে। বাংলা দেশে কবিদের ইতিহাস লেখা হয়েছে, কবিতার ইতিহাস নিয়ে এখনও আলোচনা শুরুই হয়নি। আমাদের যেমন রবীন্দ্রনাথ, জার্মান কবিতায় এ শতাব্দীতে তেমন বলা যায় রিলকে, কিন্তু আমি অন্তত সাতটি জার্মান কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ খুঁজে দেখেছি, কোথাও রিলকে-পূর্ববর্তী কিংবা রিলকে-পরবর্তী কবি— এ ধরনের কোনও আলোচনা চোখে পড়েনি।

এক্সপ্রেশানিজমই এ শতাব্দীতে এ পর্যন্ত জার্মানিতে মুখ্য কাব্যচিন্তা। যদিও আরম্ভের কালে ও পরবর্তী চিন্তায় অনেক পার্থক্য। জার্মান কবিতা পর্যায় শেষ করার আগে আমরা একজন তরুণ লেখককে বেছে নিয়েছি যাঁর কাব্য এক্সপ্রেশানিস্টদেরই রূপান্তর এবং বলা যায় এক্সপ্রেশানিজমের দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক, তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতেও কবিতার শরীর ভাঙাচোরার চেষ্টা করছেন। কবিতার এরকম গঠন বাঙালি পাঠকদের কাছে হয়তো নতুন ও চিত্তাকর্ষক মনে হবে।

আনড্রিয়াস ওকোপেঙ্কো জাতে চেকোশ্লোভাক, এখন অস্ট্রিয়ার নাগরিক। পেশায় রাসায়নিক, কিন্তু উগ্রপন্থী আধুনিক কবিদের অন্যতম। তাঁর বয়স এখন ৩৬, এই কবিতাটি ২৯ বছর বয়সে লেখা।]

সবুজ সুর

...সবুজ সুর নীল নারী
ছুটির দিন সাদা

আমি সবুজ মাঠের মধ্যে তরুণ গ্রামের
আমার গোলা হলুদ রং নারী সমেত শস্য সমেত
আমার নারী হলুদ রং গোলা সমেত শস্য সমেত
আমি সবুজ শস্য দেশে তরুণ গ্রামের

সূর্য এখন বাজার পথে ঘুরে চলেছেন
আমার নারী বাজার পথে হেঁটে চলেছে
আমার সবুজ শস্য নারী আমার সবুজ মাঠের নারী
আমার সবুজ তরুণী গ্রাম তরুণী এখন বাজার পথে হেঁটে চলেছে

বাজার ঘর ভরতি এখন চালকুমড়োয়
চালকুমড়োগুলোই এখন বাজার ঘরের সাদা ধুলো
দুপুরবেলার বাজার ঘরের সাদা ধুলো
সাদা ধুলো বাড়ির পথে মেয়ের দিকে বাগান পথে

আমি সবুজ বিকেলবেলা নারীর মধ্যে বাগান এখন
আমি এখন সবুজ হচ্ছি নারীর মধ্যে বাগান এখন
একটি ঘর ঠান্ডা একটি নীল রঙের ডোরা কাপড়
দুপুর কলসি নীল গেলাস একটি জল

আমিই সেই ঠান্ডা ঘর আমি এখন ঠান্ডা ঘরে
আমি এখন যেখানে শেষে মেয়েটি আমি মেয়ের সঙ্গে
মেয়েটি আর জল ও পাখি পান করেছি কিছুটা জল
কলসি এই ঘর ভিতরে আছি দু'জনে

একটা পিঁপড়ে পেরিয়ে গেল ল্যাটিন গ্রামার
জানলা দিয়ে উড়ে এল গাছের পাতা
এক ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল আমার মুখে
একটি ধীর ছোট্ট ঘড়ি সৃষ্টি করে অ্যালুমিনিয়াম বিকেলবেলা

আমি চকচক রূপে রৌদ্রে অ্যালুমিনিয়াম
ফুলের টবের মাটির নীচে কবর দিলুম আমার ঘড়ি
আমার নারী অরণ্যের ভিতরে ছোটা ঝিঁঝি পোকা না
আমার নারী গ্রীষ্মভূষায় জানলা ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে

জানলার ঝিলমিলির ওপর, ছোট চেয়ার হালকা টেবিল তার ওপরে
ছায়ার ওপর রৌদ্র স্মৃতি আজ বিকেলের ওপরে বাগান
আমি এখন বুঝতে পারি ছোট ছেলেটা কেন যে যায় তাস খেলায়
আমি এখন বুঝতে পারি ছোট মেয়েটা রাখে আখুল সবুজ পাতায়...

আমিই সব ছুটির দিন আমি সবুজ
আমি সবুজ মাঠের ওপর ধানের মধ্যে
আমিই নীল সেই নারীর ঘরের মধ্যে
বিকেলবেলা, আমি নারীর ভিতরে নীল।

[কবিতাটি থেকে তিনটি স্তবক অনুবাদে বাদ দিয়েছি। পুরো কবিতাটির একেবারে শেষ লাইনে মাত্র একটি কমা ও শেষে দাঁড়ি আছে—এ ছাড়া আর কোথাও কোনও ছেদচিহ্ন নেই। সুতরাং কোনও বিশেষ্যের সঙ্গে কোনও বিশেষণের কী সম্পর্ক— সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ পাঠকের। সবুজ রংটিকে কোথাও কোথাও ক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'আমি সবুজ বিকেলবেলা'— এখানে অর্থ, বিকেলবেলাটা সবুজ, না আমিই সবুজ, না আমি বিকেলকে সবুজ করছি এর মীমাংসা পাঠক নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে ঠিক করে নেবেন। আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি।]

স্প্যানিশ কবিতা: রূপের অনুসন্ধান

আমাদের এই আলোচনা ও অনুবাদের পরিধি বিংশ শতাব্দী। কিন্তু অনেক পাঠক হয়তো আশ্চর্য বোধ করবেন যে, বিংশ শতাব্দীর স্প্যানিশ কবিতার অনুবাদে আমি রুবেন দারিয়ো-কে গ্রহণ করিনি। রুবেন দারিয়ো এ শতাব্দীর শুরুতে অন্তত কুড়ি বছর স্প্যানিশ কবিতায় সম্রাটত্ব করেছেন।

তাঁকে গ্রহণ করিনি, তার কারণ, এই শতাব্দীর শুরুতে প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই কতকগুলি আধুনিক, জটিল ও গভীর মনোযোগযোগ্য সাহিত্য আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে এবং বহু নবীন ও বলীয়ান কবির দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় সেরকম কোনও সাহিত্য আন্দোলন দেখা যায়নি। স্পেনের সাহিত্য তখন প্রধানত ফরাসিদের ছত্রছায়ায় মুগ্ধ ছিল। রুবেন দারিয়ো নিজেই একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন, যার নাম মডার্নিজম, যা আসলে কিছুই এমন মডার্ন নয়। শুধু আধুনিকতা কথাটার কোনও মানে হয় না, পূর্ববর্তীদের তুলনায় আলাদা কোনও চিন্তা ও রীতির সৃষ্টি না হলে তা নিরর্থক। রুবেন দারিয়ো সেরকম কিছুই করেননি, পুরনো সৌন্দর্যতত্ত্ব ও রক্তমাংসের বর্ণনার সঙ্গে তিনি ফরাসি সিম্বলিস্টদের রীতি গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। যদিও লেখক হিসেবে তিনি অসীম শক্তিশালী ছিলেন, সন্দেহ নেই। দারিয়োর জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার নিকারাগুয়ায়, তরুণ বয়েসে নানা দেশ ঘুরে তিনি চিলিতে এসে কিছু সাহিত্যিকের সংস্পর্শে এসে ফরাসি সিম্বলিস্ট কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই প্রভাবে রচিত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ তাঁকে প্রভূত জনপ্রিয়তা এনে দেয় এবং মূল স্প্যানিশ ভুখণ্ডেও তিনি অবিলম্বে প্রধান লেখকের স্বীকৃতি পান। তাঁর একটি ভক্তদল গড়ে ওঠে এবং মডার্নিজম কথাটির সূত্রপাত হয়। আসলে তাঁর বিষয় ছিল বাস্তব থেকে পলায়ন, বিশুদ্ধ রূপের স্তুতি, বিদেশ বা অচেনা দেশের জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা এবং বোদলেয়ারের কাছ থেকে পাওয়া অবক্ষয় ও পাপের প্রতি কৌতূহল। ১৯১৬-তে রুবেন দারিয়োর মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই মডার্নিজমেরও মৃত্যু হয়। দারিয়োর রচনা এখন প্রায় ক্লাসিকাল পর্যায়ে পড়ে।

তবে, জাতিগতভাবেই স্প্যানিশরা অনেকখানি রূপাভিলাষী। সৌন্দর্যতত্ত্বে ও বিশুদ্ধরূপের অনুসন্ধান পরবর্তী খাঁটি আধুনিক স্প্যানিশ কবিদের মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্যজ্ঞান নিছক সময় বহির্ভূত এবং নিছক অভিভূত প্রকাশ নয়। হিমেনেথের অকিঞ্চিৎকর বর্ণনা বর্জনের প্রয়াস এবং লোরকার পল্লিগাথার প্রতি

আকর্ষণও এক হিসেবে এই সৌন্দর্য পিপাসার ইঙ্গিতবহ। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক কালের মতো নিষ্ঠুরতা, বীভৎস রসের প্রাধান্য, অলৌকিক কিংবা সুপ্ত মনের ভয়াবহতার প্রকাশ স্প্যানিশ কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। আনতোনিও মাচাদো দূরের দ্বীপে বসে তাঁর রচনাগুলিতে রুবেন দারিয়োর বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। দারিয়োর বাইরের আড়ম্বর ও উচ্ছলতা পরিহার করে তিনি প্রবেশ করেছেন অন্তরে, তাঁর ভাষা প্রায় গদ্যের কাছাকাছি সরল, কিন্তু তিনি নিজের আত্মার দিকে তাকিয়ে তবেই দেখতে চেয়েছেন প্রকৃতির রূপের প্রতিচ্ছবি, আবিষ্কার করতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে স্প্যানিশ কবিতায় নবীন সার্বজনীনত্ব, আমাদের আলোচনা এখান থেকেই শুরু করেছি। এই শতাব্দীর শুরুতে স্প্যানিশ ভাষায় আলাদাভাবে উচ্চারণ করার মতো প্রচার কোনও সাহিত্য আন্দোলন দেখা দেয়নি, কিন্তু বেশ কয়েকজন অসম্ভব শক্তিমান কবির রচনা উপহার পেয়েছেন এ পৃথিবী। ১৯৫৬ সালে হিমেনেথ যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন অনেক সমালোচক বলেছিলেন, এ পুরস্কার শুধু হিমেনেথের নয়, আসলে এ পুরস্কার মিলিতভাবে তিনজনের—হিমেনেথ, মাচাদো এবং লোরকার, কেননা, শেষোক্ত দু'জন তখন বেঁচে ছিলেন না, নইলে তাঁদের পুরস্কার না দেওয়া নোবেল পুরস্কারেরই অপবাদ।

মিগুয়েল দে উনামুনো

[এই শতাব্দীর স্প্যানিশ চিন্তা ও সংস্কৃতিতে উনামুনো এক বিশাল স্তম্ভস্বরূপ। সলোমাংকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বসে তিনি যখন বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন তখন তা শোনবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে আসত লেখক ও দার্শনিকরা। তাঁর কাছে গুণীজন আসতেন তীর্থদর্শনে। স্পেনের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় সলোমাংকা, সেখানে উনামুনো ছিলেন গ্রিক ভাষার অধ্যাপক, পরবর্তীকালে ওখানে রেকটর হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রকার আলাপচারি সক্রেটিসের কথা মনে পড়ায়, কিন্তু উনামুনোর দুর্ধর্ষ প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়েছিল তরুণ বয়সেই। জন্ম ১৮৬৪, এবং বিংশ শতাব্দী শুরু হবার মুখেই তিনি তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজের দলপতি।

পরবর্তীকালে দার্শনিক হিসেবে উনামুনো সর্বজনস্বীকৃতি পেলেও, তিনি ধর্মনেতা বা নৈতিক গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন আজীবন বিপ্লবী, 'উনামুনো' কথাটিরই শব্দার্থ 'বিজয়ী'। গোঁড়া ক্যাথলিকদের দেশেও তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গলায় টাই পরতেন না, শৌখিন শার্ট গায়ে দিতেন না, কালো গলাবন্ধ কোট পরা তাঁর চেহারা ছিল সাধুর মতো, কিন্তু ধর্মের ক্রীতদাস না হয়ে। যে-সময় রুবেন দারিয়ো স্প্যানিশ কবিতায় আধুনিকতা এনে হই-হই করছেন, বলছেন রক্তমাংসই শ্রেষ্ঠ দেবতা, তখন উনামুনো প্রকাশ করলেন সমস্ত সীমানা ভাঙার নির্দেশ। স্প্যানিশ সাহিত্য ও

সংস্কৃতিকে তিনি ইউরোপীয় তথা সর্ব জাগতিক হতে বললেন। মানুষ সম্পর্কেও তিনি বলেছেন, মানুষ তার জন্মভূমি থেকে লাফিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে এসে পড়ুক।

উনামুনো কবিতা লিখতে শুরু করেন ৩০ বছর পেরিয়ে যাবার পর। তাঁর কাছে কবিতা ছিল, ব্যক্তিগত জীবনের মুহূর্তকে অনন্ত করা। মুহূর্তকে তিনি আদেশ করেছেন, তুমি দাঁড়াও, আমার ছন্দ তোমাকে আবদ্ধ করেছে। এই কবিতাটি তাঁর একটি অতি বিখ্যাত রচনা। বিষয় ও গভীরতায় কবিতাটি ভালেরির 'সমুদ্রের পাশে কবর'-এর সঙ্গে তুলনীয়। কবিতাটিতে স্পষ্টত দুটি ভাগ, আমরা শুধু দ্বিতীয় ভাগটিই এখানে অনুবাদ করেছি। এই দ্বিতীয় অংশের যে বক্তব্য, তাঁর অধিকাংশ রচনাও বহু বিতর্কমূলক বই 'দি ট্রাজিক সেন্স অব লাইফ'-এরও বক্তব্য প্রায় এক। কবিতাটির প্রথম অংশে একটি কবরের বর্ণনা, সেখানে বৃষ্টি পড়ে, রোদ আসে, ভেড়ার পাল চরে বেড়ায়। দ্বিতীয় অংশে, কারখানার ক্রুশচিহ্ন মৃতদেহ পাহারা দেয়, আর জীবিত মানুষের জন্য কোনও ক্রুশ লাগে না—কারণ ঈশ্বর স্বয়ং ব্যগ্র হয়ে মানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই ঈশ্বরের মানুষকে দরকার। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের: আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।]

ক্যাসটিলিয়ার এক গ্রাম্য কবরে
(অংশ)

তোমার পাশ দিয়ে গিয়েছে পথ, জীবিত মানুষের
তোমার মতো নয়, তোমার মতো নয়, দেয়াল ঘেরা
এ পথ দিয়ে তারা আসে ও যায়
কখনও হাসে আর কাঁদে।
কখনও কান্নার কখনও হাস্যের ধ্বনিতে ভেঙে যায়
তোমার পরিধির অমর স্তব্ধতা!

সূর্য ধীরভাবে মাটিতে নেমে এলে
ঊষর সমতল স্বর্গে উঠে যায়
এখন স্মরণের সময় মনে হয়
বেজেছে বিশ্রাম ও পূজার ঘণ্টা
রুক্ষ পাথরের স্থাপিত ক্রুশখানি
তোমার মাটি ঘেরা প্রাচীরে দাঁড়িয়ে
নিদ্রাহীন অভিভাবক যে-রকম
একলা প্রহরায় গ্রামের গাঢ় ঘুম।

জীবিত সংসারে গির্জা ক্রুশহীন
এরই তো চারপাশে ঘুমোয় গ্রামখানি

ভক্ত কুকুরদের মতন ক্রুশখানি রয়েছে প্রহরায়
স্বর্গে যারা আছে, মৃতের সেই ঘুম।
রাত্রিময় সেই স্বর্গ থেকে যিশু
রাখাল রাজা তিনি
সংখ্যাহীন তাঁর চোখের ঝিকমিকি
ব্যস্ত গণনায় মেঘের ঝাঁকগুলি।

দেয়াল ঘেরা এই কবরে মৃতদল
একই তো মাটি গড়া দেয়াল এখানের
শান্ত নির্জন মাঠের মাঝখানে
একটি ক্রুশ শুধু ভাগ্যে তোমাদের।

আনতোনিও মাচাদো

['আমার হৃদয়ে বাসনার কাঁটা ফুটে ছিল। অনেক চেষ্টায় একদিন আমি সেই কাঁটাটা তুলে ফেললাম। তারপর থেকে আমি আমার হৃদয়ের অস্তিত্বই টের পাই না'—এই রকম সরল ভাবে আনতোনিও মাচাদো কবিতার মূল সত্যগুলি ব্যক্ত করতে পেরেছেন। পৃথিবী ও মানুষের জীবন ক্রমশ অতি জটিল হয়ে আসছে এই যুক্তিতে আজকের পৃথিবীর কবিতাও যখন জটিল—তখন মাচাদো অতি সহজ ভাষায় আশ্চর্য সৌন্দর্য সাধনা করে গেছেন। কবিতাকে তিনি বলেছেন 'আত্মার হৃৎস্পন্দন', শব্দ নয়, বর্ণ নয়, রেখা নয়, অনুভূতি নয়, কবিতা শুধু 'আত্মার হৃৎস্পন্দন'। এই নিবিড় ধ্যানময়তায় মাচাদো স্প্যানিশ ভাষায় এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

জন্ম ১৮৭৫, দক্ষিণ স্পেনের আন্দালুসিয়ায়, শৈশব কেটেছে মাদ্রিদে, যৌবন ক্যাসটিলিয়ায়। ক্যাসটিলিয়ার বোরিয়া শহরে তিনি ছিলেন ফরাসি ভাষার শিক্ষক, এখানকার ভাঙা দুর্গ, দিউরো নদী, অরণ্য, পূর্বপুরুষের গর্ব নিয়ে বেঁচে থাকা বঞ্চিত মানুষ—এই সব নিয়েই তাঁর কবিতা। বিকেলবেলা তিনি একা হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন বহু দূরে, ফুলের সমারোহ আর ঝরে পড়া পাতার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কথা বলতেন নিজের সঙ্গে, প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি প্রকৃতির স্তুতি পাঠক ছিলেন না, প্রকৃতি তাঁকে নিজের সঙ্গে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করত। এই রকম বেড়াতে বেড়াতেই বনের মধ্যে একদিন লিওনোর নামের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, সেই অপূর্ব রূপসীকে মনে হয় বনদেবী, জেগে ওঠে ভালোবাসা। পরবর্তী কালে তিনি সেখানেই থেকেছেন, এই অঞ্চলটির কথা তাঁর সব সময় মনে থেকেছে, এখানকার পরিবেশ নিয়েই লিখেছেন। ১৯৩৯-এ ফরাসি দেশে তাঁর মৃত্যু।

মাচাদো ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন অ্যাগনস্টিক বা নির্বিকার। তাঁর অধিকাংশ কবিতারই নাম নেই, কারণ কবিতা যেহেতু আত্মিক উপলব্ধি—তাই তা রহস্যময় ও আখ্যার অতীত— এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সূর্য, ফুল, স্বপ্ন, আয়না— এই বিষয়গুলি তাঁর কবিতায় বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। তাঁর কবিতার একটি প্রবল ত্রুটিও আছে, তাঁর কবিতা বড় বেশি অর্থবহ, এত বেশি অর্থ যে অনেক সময় তা রূপকের পর্যায়ে চলে যায়। কবিতার প্রত্যেক লাইনে লাইনে গভীর অর্থ থাকলে—তা কবিতাকে ক্লান্ত করে। যেমন, উপরে উদ্ধৃত প্রথম লাইনে, আমার হৃদয়ে একটা কাঁটা ফুটে ছিল—এইটুকু বলাই যখন যথেষ্ট হতে পারত·সেখানে মাচাদো সেই কাঁটাটাকে থর্ন অফ প্যাশান পর্যন্ত বলে দিতে চান।]

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
স্বচ্ছ এক ঝরনা বহে যায়
ঘুরে ঘুরে আমার হৃদয়ে।

বলো, কোন গুপ্ত গলি পথে
জল তুমি এলে মোর কাছে,
নতুন জন্মের ঝরনা তুমি
আমি যার পাইনি আস্বাদ?

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
একখানি জীবিত মৌচাক
আমার হৃদয় জুড়ে আছে।

সোনালি রঙের মৌমাছিরা
কাজে ব্যস্ত হৃদয়ে আমার
খুঁড়ে খুঁড়ে পুরনো ব্যর্থতা
মোম আর মধু তৈরি করে।
কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
একটি জ্বলন্ত সূর্য উঠে
জেগে আছে বুকের গভীরে।

সে ছিল জ্বলন্ত বিকিরণ
লাল উনুনের মতো তাপ
এবং সে সূর্য, তাই আলো,
সুর্য এসে আমায় কাঁদাল।

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি—দিব্য উদ্ভাসন—
সেই তো ঈশ্বর আমি যাকে
হাতের মুঠোয় ধরে আছি।

একটি বসন্তের ভোর আমায় ডেকে বলল

একটি বসন্তের ভোর আমায় ডেকে বলল
আমি তোমার শান্ত হৃদয়ে ফুল ফুটিয়েছি
বহু বছর আগে, তোমার মনে পড়ে পুরনো পথিক,
তুমি পথের পাশ থেকে ফুল ছেঁড়োনি।
তোমার অন্ধকার হৃদয়, সে কি দৈবাৎ মনে রেখেছে
আমার সেই পুরনো দিনের লিলির সুগন্ধ?
আমার গোলাপেরা কি এখনও ঘ্রাণ মেখে দেয়
তোমার হিরের মতো উজ্জ্বল স্বপ্নের পরীর ভুরুতে?
আমি বসন্তের ভোরকে উত্তর দিলুম:
আমার স্বপ্নেরা শুধু কাচ
আমি আমার স্বপ্নের পরীকে চিনি না
আমি তো জানিনি, আমার হৃদয় ফুলের মধ্যে আছে!
তুমি যদি সেই পবিত্র ভোরের জন্য অপেক্ষা করো
যে এসে ভেঙে দেবে কাচের পাত্র
তবে হয়তো পরী তোমার গোলাপ ফিরিয়ে দেবে
আমার হৃদয় দেবে তোমায় লিলির গুচ্ছ।

হুয়ান র‍্যামোন হিমেনেথ

[হিমেনেথের জন্ম ১৮৮১, মৃত্যু ১৯৫৮। জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে একমাত্র বড় ঘটনা নোবেল প্রাইজ পাওয়ায় তিনি সমস্ত বিশ্বে, এবং বাংলা দেশেও বহু আলোচিত হয়েছেন। বাহুল্যবোধে হিমেনেথ সংক্রান্ত বিবরণ পুনরোচ্চারণ না করে, আমরা হিমেনেথের শুধু দুটি কবিতা এখানে বাংলায় প্রকাশ করলুম। কবিতা দুটি তাঁর জীবনের দুই প্রান্তের, প্রথমটি লিখেছিলেন যখন তিনি সদ্য-যুবা, আর দ্বিতীয়টি লেখেন বার্ধক্যে পৌঁছে, স্বদেশ থেকে দূরে 'সমুদ্রের অন্য পাড়' আমেরিকায় যখন প্রবাসী। প্রথম কবিতাটি সংলাপের ভঙ্গিতে লেখা, এখানে দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর কবির। প্রথম স্তবকে জল ও ফুল নামক স্পর্শসহ অস্তিত্বে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে, দ্বিতীয় স্তবকে এনেছেন হাওয়া ও মায়া। হিমেনেথের কবিতায়—দণ্ডিত কার্মেলাইট, সেন্ট জন অব দি ক্রশ—ছাব্বিশটি কবিতার জন্য যিনি অমর হয়ে আছেন—তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে। হিমেনেথের বিখ্যাত কবিতাবলী, প্লাতেরো নামক একটি গাধার সঙ্গে কথাবার্তা, এই বিষয়টিও তিনি পেয়েছেন সেন্ট জন অব দি ক্রশের কাছ থেকে, সেন্ট জন নিজের শরীরটাকেই বলতেন, মাই ব্রাদার অ্যাস। অর্থাৎ, এখানেও, নিজের সঙ্গেই কথাবার্তা।

তাঁর রচনা যতটা গভীর, ততটা অবশ্য গতিশীল নয়। আধুনিক স্প্যানিশ কবিতায় হিমেনেথের অনুকরণ তেমন নেই।]

কেউ না

—ওখানে কেউ না। জল।— কেউ না?
জল কি কেউ নয়?—ওখানে
কেউ না। ফুল।—ওখানে কেউ না?
তবু ফুল কি কেউ না?

—ওখানে কেউ না। হাওয়া।—কেউ না?
হাওয়া কি কেউ না?—কেউ
না। মায়া।—ওখানে কেউ না? আর
মায়া কি কেউ না?
পাখিরা গান গায়

সারা রাত জুড়ে
পাখিরা
আমাকে শোনালে তাদের রঙের গান।

এই রং নয়
সুর্যোদয়ের ঠান্ডা হাওয়ায়
তাদের ভোরের ডানার।
এই রং নয়
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণে
তাদের সান্ধ্যবুকের।
এই রং নয়
রাত্তিরে নিবে যাওয়া
প্রত্যহ চেনা ঠোঁটের
যে রকম নেবে
ফুল ও পাতার
প্রত্যহ চেনা রং
অন্য বর্ণ
আদিম স্বর্গ
এ জীবনে যাকে হারিয়ে ফেলেছে মানুষ।
সেই যে স্বর্গ
ফুল ও পাখিরা
শুধু যাকে চেনে গভীর—
ফুল ও পাখিরা
সুগন্ধে আসে যায়
সৌরজগতে ঘুরে ঘুরে তারা ওড়ে।
অন্য বর্ণ,
অবিনশ্বর স্বর্গ
মানুষ সেখানে স্বপ্নে ভ্রমণ করে।
সারা রাত জুড়ে
পাখিরা
আমাকে শোনালে তাদের রঙের গান।
অন্য বর্ণ
যা শুধু রয়েছে তাদের অন্য জগতে
শুধু রাত্তিরে নিয়ে আসে তারা হাওয়ায়।
কয়েকটি রং
আমি তো দেখেছি অতি জাগ্রত
জানি আমি তারা কোথায়।
জানি আমি ঠিক কখন
পাখিরা আসবে

রাত্রে আমায় শোনাতে তাদের গান।
জানি আমি ঠিক কখন
পেরিয়ে বাতাস পেরিয়ে বন্যা
পাখিরা গাইবে গান।

লেয়ন ফেলিপ

[পৃথিবীর সব দেশেই এই শতাব্দীর কবিতা সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার ক্রমাগত অভিযোগ আছে। স্প্যানিশ কবিতা সম্পর্কে সে অভিযোগ খুবই কম খাটে। এখন আমরা এমন একজন কবিকে উপস্থিত করছি, যিনি সরল, স্পষ্ট, কিছুটা গদ্যময় কবিতায় বিশ্বাসী। তাঁর কবিতা বই পড়ার চেয়ে সভা-সমিতিতে আবৃত্তি শুনলে বেশি ভাল লাগে। এইরকম সর্বপ্রকাশ্য কবিতায় লেয়ন ফেলিপ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

লেয়ন ফেলিপের পুরো নাম লেয়ন ফেলিপ কামিনো গালিথিয়া। জন্ম স্পেনে, ১৮৮৪। অন্যান্য অনেক স্প্যানিশ কবির মতোই, তিনিও গৃহযুদ্ধের সময় দেশ থেকে পলাতক হন। এখন মেক্সিকোয় স্থায়ী নিবাস।]

আমি নই গভীর সঞ্চারী

—'আমার গভীর সমুদ্র সঞ্চারী বন্ধু পাবলো নেরুদাকে'

আর, কালকেই এসে কেউ বলবে:
এই কবি তো কোনোদিন সমুদ্রের গভীরে আসেনি
এমনকী ছুঁচো বা নেউলের মতো মাটি খুঁড়ে যায়নি ভিতরে
এই কবি কোনোদিন দেখেনি সুড়ঙ্গের প্রদর্শনী
অথবা ভ্রমণ করেনি ঘোর তন্তুর অরণ্যে
সে ঢোকেনি মাংস ভেদ করে, খুঁড়ে দেখেনি হাড়
কখনো পৌঁছতে পারেনি অন্ত্র, পাকস্থলী পর্যন্ত
শিরায় শিরায় খালে-নদীতে সে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি,
রক্তের মধ্যে জীবাণু-বাহী হয়ে পাল তুলে ভ্রমণ করতে করতে
সে পৌঁছয়নি মানুষের জমাট হৃদয়ে।

কিন্তু সে বৃক্ষ চূড়ায় দেখেছে কীট

গম্বুজের মাথায় দেখেছে পঙ্গপালের ঝড়
হীরকোজ্জ্বল জলকে দেখেছে লালচে আর পঙ্কিল হতে,
দেখেছে হলদে প্রার্থনা
দেখেছে মৃগী রুগি পাদরির পুরু ঠোঁটে সবুজ লালা
গোল ঘরের ছাদে সে দেখেছে চটপট প্রাণী
প্রার্থনার বেদিতে দেখেছে রাত-পোকা
গির্জার দরজায় দেখেছে উইয়ের বাসা
বিশপের শিরস্ত্রাণে দেখেছে ঘুণ...
সে মোহান্ত প্রভুর ধূর্ত পিটপিটে চোখ দেখে বলেছে:
ইঁদারার শুকনো ছায়ায় আলো মরে আসছে ক্রমে
এই আলো আমাদের বাঁচাতেই হবে, কান্নার বন্ধনে।

ভেলাথকোয়েথ অঙ্কিত 'ভালেকা-র শিশু' চিত্রের পরিচিতি

এখান থেকে কেউ যেতে পারবে না
যতদিন এই ভালেকার শিশুর বিকৃত মাথাটি থাকবে
কেউ চলে যাবে না।
কেউ না
না সন্ন্যাসী, না আত্মহত্যা।

প্রথমে চাই তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার
প্রথমেই চাই তার সমস্যার সমাধান
আমরাই তার সমাধানের জন্য দায়ী
এর সমাধান চাই বিনা কাপুরুষতায়
পোশাকের ডানা মেলে বিনা পলায়নে
অথবা স্টেজের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে না গিয়ে—
এখান থেকে কেউ চলে যেতে পারবে না
কেউ না
না সন্ন্যাসী, না আত্মহত্যা।
নিরর্থক
নিরর্থক সব পলায়ন
(ওপরে বা নীচে)
সকলকেই ফিরে আসতে হবে।

বারবার।
যতদিন না (এক সুদিনে)
ম্যামব্রিনোর হেলমেট—
এখন আলোর বৃত্ত, হেলমেট বা গামলা নয়।
সাঞ্চোর মাথায় ঠিক খাপ খেয়ে যায়
এবং আমার ও তোমার মাথায়
ঠিক ঠিক, মাপে মাপে—
সেদিন আমরা সবাই চলে যাবো
ডানা মেলে
তুমি, আমি, সাঞ্চো
এবং সন্ন্যাসী ও আত্মহত্যা।

[ভেলাথকোয়েথ, বাংলায় যাকে আমরা বলি ভেলাস কুয়েজ, তাঁর এই বিখ্যাত ছবিটি একটি বাচ্চা বামনকে নিয়ে আঁকা, যার সর্বাঙ্গ বিকৃত, মনও নির্বোধ ও জড়। রাজা চতুর্থ ফিলিপ এই ধরনের বাচ্চা বামনদের রাজসভায় এনে মজা উপভোগ করতেন। কবি এখানে ওই বামনটিকে সমস্ত মানব সমাজের নির্যাতন, অপমান ও দুঃখভোগের প্রতীক করেছেন।

ডন কুইক্সোট (আসল উচ্চারণ যাই হোক না কেন) এবং তারা অনুচর সাঞ্চোকে বাংলাতে আমরা বহুদিন চিনি। ডন কুইক্সোট একদিন একটা নাপিতের পেতলের গামলা কেড়ে নিয়ে মাথায় দিয়ে ভেবেছিলেন, তিনি মহাশক্তিমান দুর্ধর্ষ দৈত্য ম্যামব্রিনোর বিখ্যাত হেলমেটের অধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় কবিতার শেষ অংশে কবি এর উল্লেখ করে বলছেন, ওই হেলমেট শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক, ডন কুইক্সোটের মাথায় সেটা হয়ে ওঠে কবিত্ব ও কল্পনার আলোকমণ্ডল, কিন্তু পৃথিবীর সমস্যা দূর করতে গেলে, সাঞ্চোর মতন তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথাতেই তার বেশি দরকার।]

সেজার ভায়েহো

[এক বৃহস্পতিবার, প্রবল বর্ষার দিনে প্যারিসে আমার মৃত্যু হবে— এই নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন সেজার ভায়েহো, তখন তাঁর বয়েস ২৮, এবং আশ্চর্য, এর ১৫ বছর পর কবিতাটিতে বর্ণিত অবস্থায় প্যারিসেই তাঁর মৃত্যু হয়। অনাহারে, প্রবল যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করে, প্যারিসের একটি ঘরে মরে পড়ে ছিলেন তিনি ১৯৩৮ সালে।

তাঁর জন্ম ল্যাটিন আমেরিকার পেরুতে ১৮৯৫ সালে। ১৯১৮ সালে প্রথম কবিতার বই ছাপা হবার পর তাঁকে নির্যাতন, বিচার ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পরবর্তী জীবনে প্রবল

দারিদ্র ও উপবাসকে সঙ্গী করে স্পেন ও ফ্রান্সে ভ্রাম্যমাণ হয়ে কাটিয়েছেন। মৃত্যুর পর তাঁর কবিতা ক্রমশ বিশ্বজনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

প্রথম কবিতাটির শিরোনামার অর্থ এই, তাঁর দেশের প্রাচীন রীতি ছিল জীবনের কোনও শুভ ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রাখা হত সাদা পাথরের ফলক লাগিয়ে, দুঃখের ঘটনায় কালো পাথর।]

একটি সাদা পাথরের ওপর কালো পাথর

প্রবল বর্ষার দিনে প্যারিসে আমার মৃত্যু হবে
সেই দিন,—আমার স্মৃতিতে গাঁথা আছে:
প্যারিসেই মরবো আমি—একথায় ভয় পাইনি কোনো—
শরৎকালের এক বৃহস্পতিবার ঠিক আজকেরই মতো।
বৃহস্পতিবারই ঠিক, কারণ আজকের এই বৃহস্পতিবারে
আমার কবিতা লেখা গদ্যের মতন রুক্ষ হয়ে আসে
দু'হাতের হাড়ে খুব ব্যথা করে, যেরকম ব্যথা আমি কখনো বুঝিনি;
দীর্ঘ পথ ঘুরে এসে জীবনে কখনো আগে নিজেকে এমন
মনে হয়নি পরিত্যক্ত একা।

সেজার ভালেখা আজ মারা গেছে। সকলেই মেরেছিল তাকে
অথচ কারুর কোনো ক্ষতি সে করেনি।
তারা তাকে ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছিল, কঠিন প্রহার
কখনো চাবুকে; তার সাক্ষী আছে
বৃহস্পতিবারগুলি, দু' হাতের ব্যথাময় হাড়
আর নির্জনতা, বৃষ্টি, দীর্ঘ পথ।

আমিই একমাত্র বিদায় নিয়ে

আমি একমাত্র, পিছনের সবকিছু ফেলে বিদায় নেবো:
আমি এই বেঞ্চি থেকে উঠে দূরে চলে যাচ্ছি
আমি আমার আন্ডারওয়্যার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
আমার কাজ, এই নির্দিষ্ট জগৎ থেকে আমি চলে যাচ্ছি

আমার ভেঙে ছিটকে পড়া বাড়ির নম্বর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
সব কিছু ফেলে আমিই একমাত্র বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।
সাঁজেলিজে থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আমি
চাঁদের পিঠে কোনো এক অদ্ভুত গলিপথে একবার বাঁক নিতে।
আমার মৃত্যুও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, আমার বিছানা বিদায় নিয়েছে;
চারপাশে রিক্ত, স্বাধীন মানুষের দল নিয়ে
আমার শারীরিক দ্বিতীয় সত্তা বেড়াতে বেরিয়ে এক এক করে
বিদায় দিচ্ছে তার প্রেতগুলিকে।
আমি সব কিছু থেকে বিদায় নিতে পারি, কারণ
পিছনে সব কিছু পড়ে থাকবে সূত্র হিসেবে।
আমার জুতো, ফিতের গর্ত, কোণায় লেগে থাকা কাদা
পরিষ্কার ধপধপে শার্টের ভাঁজ—এরাও থাকবে।

[দ্বিতীয় কবিতায় উল্লেখিত 'সাঁজেলিজে' হয়তো অনেকেরই পরিচিত, তবু বলি, 'সাঁজেলিজে' হচ্ছে প্যারিসের একটি বিখ্যাত, সুরম্য রাজপথ, মূল বানান Champs Elysees।]

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা

[একদিন সকালবেলা, তখনও ভালো করে ঘুম ভাঙেনি, একদল ফ্যাসিস্ট সৈনিক এসে লোরকাকে ডাকল, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হল। তখন লোরকার বয়স মাত্র ৩৭, এবং এইভাবে স্প্যানিশ ভাষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি এবং আধুনিক পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট কবির মৃত্যু হয়। তখন ১৯৩৬ সাল, স্পেনে গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে, বহু কবিই স্পেন থেকে পালিয়ে যান সেসময়, লোরকার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখন অনেকে বলেন যে, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কোনো সৈনিক ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই লোরকাকে খুন করে।

লোরকার জন্ম ১৮৯৯, ভালো ছাত্র ছিলেন, কবিতা, নাটক এবং ছবি আঁকার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কৈশোরেই। ছাত্রাবস্থার শেষে নাটক লেখা ও পরিচালনা করাই ছিল তাঁর নেশা ও জীবিকা। একসময় সালভাদোর দালির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে সুররিয়ালিজমের প্রভাবে পড়েন কিন্তু গ্রাম্য গাথা, স্পেনের উপকথা ও জিপসিদের জীবন ও চরিত্র নিয়ে লেখাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ। বিশেষত জিপসিদের নিয়ে লেখাগুলিই তাঁকে অমর করছে। অবশ্য,

লোরকার এই শেষোক্ত কারণে খ্যাতি খুব পছন্দ ছিল না। একবার এক বন্ধুকে দুঃখ করে ছেলেমানুষের মতো লিখেছিলেন, জিপসি নিয়ে লিখি বলে লোকে ভাবে আমার বুঝি শিক্ষাদীক্ষা কিছুই নেই, আমি যেন একটা গ্রাম্য কবি! আমি মোটেই তা নই।

অনূদিত দ্বিতীয় কবিতাটি জিপসিদের নিয়ে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। সেজন্যও লোরকার দুঃখ ছিল। কারণ, অনেকে এই কবিতাটির আদিম সৌন্দর্য বুঝতে না পেরে শুধু যৌন সম্ভোগচিত্রই উপভোগ করেছে!]

বিদায়

যদি মরে যাই
জানলা খুলে রেখো

শিশুটির মুখে কমলালেবু
(জানলা থেকে আমি দেখতে পাই)
গম পেষাই করছে এক চাষা
(জানলা থেকে শব্দ শুনতে পাই)

যদি মরে যাই
জানলা খুলে রেখো।

অবিশ্বাসিনী পত্নী

তখন তাকে নিয়ে এলাম নদীর ধারে
ভেবেছিলাম যে সে তখনো কুমারী মেয়ে
কিন্তু তার স্বামী ছিল।

সে রাত ছিল সন্ত জেমস উৎসবের
কিছুটা যেন বাধ্য হয়েই ঠিক তখন
পথের আলো ক্রমশ নিবে আঁধার হল
আলোর মতো জ্বলে উঠল ঝিঁঝি পোকার সমস্বর

শহর ছেড়ে নির্জনতায় এসে
ছুঁয়ে দিলাম তার ঘুমন্ত স্তন দুটি

তখুনি তারা আমার জন্য পাপড়ি মেলে ফুটে উঠল
কচুরিপানার মঞ্জরীর মতন।

তার বুকের ব্রেসিয়ারের শক্ত মাড়
খসখসিয়ে উঠল আমার কানের কাছে
যেন রেশমি এক টুকরো মসৃণতা
দশ ছুরিতে ছিন্নভিন্ন করল কেউ

পাতার ফাঁকে নেই রুপোলি আলোর রেখা
বৃক্ষগুলি দীর্ঘ হয় ক্রমশ
এক দিগন্ত ভরা অসংখ্য কুকুর পাল
ডেকে উঠল বহু দূরের নদীর প্রান্তে।

পেরিয়ে কালো জামের বন
রাঙচিতে আর কাঁটাগাছের ঝোপ ছাড়িয়ে
তার চুলের আড়ালে বসে বেলাভূমিতে
নরম কাদায় আমি একটা গর্ত খুঁড়ি।

আমার গলার টাই খুলেছি একটানে
সে খুলেছে তার ঘাগরা, কাঁচুলি
রিভলবার সুদ্ধ আমার কোমরবন্ধ খুলে রেখেছি
সে খুলেছে চার রকমের অন্তর্বাস।

মাধবীলতা, সাগর ঝিনুক পায়নি এত রূপ
এত মসৃণ, সুন্দর তার ত্বকের রং
স্ফটিক-রঙা দিঘিতে চাঁদের আলোও নয়
তার শরীরে এমন উজ্জ্বলতা।

দু'খানি উরু পিছলে যায় উরুর নীচে
হঠাৎ ধরা মাছের মতন যেন অবাক
খানিকটা তার উষ্ণতা আর কিছুটা হিম
জঙ্ঘা ভরা শীত গ্রীষ্ম দুই ঋতু

সেই রাত্রে আমার অশ্ব-ভ্রমণ হল
জগতের সব পথের মধ্যে সেরা পথে

হিরে-পান্না দিয়ে সাজানো তরুণী ঘোড়া
বল্গা নেই, রেকাব নেই, তবুও বাঁধা।

পুরুষ আমি, তাই কখনো বলতে চাই না
ফিসফিসিয়ে আমায় সে যা শুনিয়েছিল
জিপসিদের ছেলে আমি, এটুকু জানি
গোপন কথা গোপন রাখাই খাঁটি নিয়ম।

চুমোর আঠা, বালির মধ্যে মাখামাখি
নদীর তীর থেকে উঠিয়ে নিলাম তাকে,
অন্ধকারে বনতুলসীর ধারালো পাতা
হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে মেতে ব্যস্ত তখন।

পুরুষ আমি, জানি পুরুষ-যোগ্য ব্যবহার
খাঁটি জিপসি সন্তানের মতন
একবাক্স রঙিন সুতো কিনে দিয়েছি তাকে
আড়াই গজ হলুদ-রঙা সাটিনও উপহার।

কিন্তু আমি প্রেমে পড়িনি সেই নারীর
আমি তো ঠিকই বুঝেছিলাম সে বিবাহিতা
তবুও কেন মিথ্যেমিথ্যি বলল আমায় কুমারী সে
যখন তাকে নিয়ে গেলাম নদীর ধারে?

[জিপসি ও অবিশ্বাসী নারী একসঙ্গে শুয়ে ভ্রমণ শুরু করল। বল্গাহীন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ। লোরকার এই বিখ্যাত কবিতাটি নিয়ে এক সময় বিতর্কের ঝড় ওঠে। লোরকা এখানে একটি নৈতিক সিদ্ধান্তও করেছেন যে, সঙ্গমের পর মেয়েটিকে পরিত্যাগ করার সময় পুরুষটির কোনো গ্লানি নেই—কারণ শুধু এই যে, সে জেনেছে মেয়েটি কুমারী নয়। পুরুষটিকে নির্দোষ দেখাবার জন্য লোরকা এমন একটি কায়দা প্রয়োগ করেছেন, যা অনেক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কবিতার সব স্তবকগুলো চার লাইনের হলেও প্রথম স্তবকটি তিন লাইনের। অর্থাৎ একটি লাইন উহ্য আছে, সেখানে আন্দাজ করা যায়, মেয়েটিই প্রথম মিথ্যে কথা বলে পুরুষটিকে প্রলুব্ধ করেছিল।]

রাফায়েল আলবের্তি

[দেবদূত বিষয়ক কবিতাবলীই রাফায়েল আলবের্তির শ্রেষ্ঠ রচনা। যদিও সমুদ্র ও আন্দালুসিয়ার প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার জন্য মাত্র ২৩ বছর বয়েসে তিনি সাহিত্যের জাতীয় পুরস্কার পান, হিমেনেথ প্রমুখ প্রবীণ কবিরা তাঁকে অভিনন্দন জানান, এবং সেই তরুণ বয়সেই আলবের্তি প্রতিষ্ঠিত কবি। কিন্তু যেবিষয়ে লিখে সার্থক হয়েছেন—তাকে অবলীলায় পরিত্যাগ করে বিষয়ান্তরে যেতে কোনও কবিরই দ্বিধা হয় না। সমুদ্র ছেড়ে আলবের্তি এলেন স্থলভাগে। কোনও সমালোচক এই দ্বিতীয় স্তরের আলবের্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'স্থলে ভ্রাম্যমাণ তরুণ ইউলিসিস।' নিঃসঙ্গ দেবদূতের মতো তিনি অচেনা মানব সমষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আলবের্তির জন্ম সাল ১৯০২। প্রথম যৌবন স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মাদ্রিদে কাটলেও পরবর্তী দীর্ঘ জীবন কাটে প্রবাসে, নির্বাসনে। শীতের সময় মানস সরোবর ছেড়ে আসা পাখিদের মতো, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোপন্থীদের বিজয়কালে, দলে দলে কবি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে চলে যান, অনেকেই আর ফিরতে পারেননি। নিরাশা, অত্যাচার এবং কবি বন্ধুদের মৃত্যু দেখে (লোরকা ছিলেন আলবের্তির ঘনিষ্ঠ সুহৃদ) প্রথম দিকে খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, আর কবিতা লিখবেন না। পরে, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার একমাত্র উপায় হিসেবে, দূর থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতন কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন স্পেনের উদ্দেশ্যে। মাতৃভাষার প্রতি স্প্যানিশ লেখকদের টান এত প্রবল যে প্যারিস বা লন্ডনে তাঁরা নির্বাসন নেননি, অনেকেই গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা, কিংবা মেক্সিকোয় যেখানে স্প্যানিশ ভাষা চলে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর বুয়েনস এয়ারিসে কাটাবার পর আলবের্তি এখন ইতালিতে আছেন, মাতৃভূমির কাছাকাছি।

কবিতার বহিরঙ্গে প্রথাগত ফর্ম এবং প্রাচীন ছন্দের পুনরুদ্ধার করলেও আলবের্তি মনে প্রাণে একজন সুরলিয়ালিস্ট।]

সংখ্যার দেবদূত

কুমারীদের সঙ্গে টি স্কোয়ার,
কম্পাস, নজর রাখে
অন্তরীক্ষের ব্ল্যাক বোর্ডে।

এবং সংখ্যার দেবদূত
ভাবুক, উড়ে যায়
১ থেকে ২, ২ থেকে
৩, ৩ থেকে ৪-এ।

ঠান্ডা চক এবং স্পঞ্জ
ঘষে দেয়, মুছে দেয়
মহাশূন্যের আলো।
না সূর্য চাঁদ, না তারা
না বজ্র বিদ্যুতের
আকস্মিক সবুজ,
না বাতাস, শুধু কুয়াশা।

কুমারীদের সঙ্গে টি স্কোয়ার নেই
কম্পাস নেই, কাঁদছে।
এবং মৃত ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর
সংখ্যার দেবদূত
মৃত, ঢেকে শোয়ানো
১ এবং ২-এর ওপরে,
৩-এর ওপরে, ৪-এর ওপরে...

দেবদূতের প্রত্যাগমন

যাকে আমি চেয়েছিলাম, সে ফিরে এসেছে,
যাকে আমি ডেকেছিলাম।
সে নয়, যে মুছে নেয় নিরস্ত্র আকাশ
নিরাশ্রয় তারা,
দেশহীন চাঁদ,
তুষার।
একটি হাত থেকে ঝরে পড়ে যে তুষার
একটি নাম
একটি স্বপ্ন
একটি কপাল

সে নয়, যার চুলের সঙ্গে
বাঁধা আছে মৃত্যু।
আমি যাকে চেয়েছি
বাতাস ছিন্নভিন্ন না করে

পাতাদের আহত না করে, জানলার শার্সি না কাঁপিয়ে
সে আসবে, যার চুলের সঙ্গে
বাঁধা আছে নিস্তব্ধতা।
সে আমাকে আঘাত না দিয়ে খুঁড়ে তুলবে
আমার বুকের মধ্যে এক মিষ্টি আলোর ভাণ্ডার
এবং নৌবাহনযোগ্য করবে আমার আত্মাকে।

[প্রথম কবিতায়, এই বিশ্বের সুর সংগীত যে এলোমেলো ভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তার তির্যক উল্লেখ। দ্বিতীয় কবিতায় মানুষকে শাস্তি দিতে একজন দেবদূতের পুনরাগমন। যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা, লোভ, অন্ধকারের পরেও এক একজন দেবদূত আসে নিস্তব্ধতার বন্দনা শোনাতে। দেবদূত, অর্থাৎ কবি। কবিই ইচ্ছে করলে অন্ধকার জাগাতে পারে, আবার তারই হাতে উদ্ভাসনের অধিকার।]

পাবলো নেরুদা

সোনাটা

যদি আমায় প্রশ্ন করো, কোথায় আমি ছিলাম, তবে
আমি বলব, "এই রকমই হয়ে থাকে।"
আমি তখন পাথর-ঢাকা মাটির কথা বলতে বাধ্য,
বলতে হবে নদীর কথা ধৈর্য যাকে ধ্বংস করে;
আমার জানা শুধুই যে-সব পাখির ত্যক্ত
পিছনে ফেলা সাগর কিংবা এখন আমার বোনের কান্না।
কেন রয়েছে এত জগৎ, কেন প্রতিটি দিনের সঙ্গে
অন্য দিন সুতোয় বাঁধা? কেন একটি আঁধার রাত্রি,
মুখের মধ্যে ভরে উঠেছে? কেন মৃত্যু?
যদি আমায় প্রশ্ন করো, কোথা থেকে যে এসেছি আমি—
আমাকে কথা বলতে হবে ভাঙা জিনিসের
বলতে হবে তিক্ত আসবাবের কথা
কথা বলব, কখনো পচা, বিশাল বিশাল প্রাণীর সঙ্গে
কথা বলব আমার কাতর বুকের কাছে।
যা কিছু যায় হৃদয় ঘুরে সকলই নয় স্মৃতির ছায়া
বিস্মৃতিতে ঘুমোয় এক বাদামি পায়রা, সেও তো নয়,
কিন্তু কান্নাসিক্ত মুখ

গলার কাছে আঙুল
আর যা পাতা ঝরায়, তাদের ছায়া;
দিনের কালো মিলিয়ে যায়
আমাদের এই দুঃখী রক্তে প্রতিপালিত একটি দিন।
এখনও আছে মাধবীফুল, ইষ্টকুটুম পাখির ডাক
এসব দেখে ভালোই লাগে, এসব দেখি মিষ্টি শখের
ছবির কার্ডে
যেন সময় মধুরতার দু' হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়।
এসব দাঁত ছাড়িয়ে আরও গভীরে যাওয়া ভালো না
নৈঃশব্দ্যের ঢাকনাটাকে কামড়ে ছেঁড়া ভালো না
কারণ আমি জানি না ঠিক কী উত্তর দেব:
এত মৃত্যু। চতুর্দিকে কত মৃত্যু
সমুদ্রের কত দেয়ালে চিড় ধরাল লাল সূর্যের আলো
কত না মাথা নৌকোর গায় ধাক্কা মারল
কত না হাত দু' হাত ভরা চুমু রেখেছে
কত কিছুই আমি এখন ভুলতে চাই।

এখন আমি লিখতে পারি

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা

ধরা যাক লিখি: "আকাশ তারায় সাজানো
তারা, নীল তারা, কাঁপে দূর মহাশূন্যে।"

রাত্রির হাওয়া ঘুরে ঘুরে আসে, মহাকাশে গান গায়।

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা
আমি তাকে খুব ভালোবাসতুম,
সেও কোনোদিন আমায় বেসেছে ভালো
এরকমই কোনো রাতে আমি তাকে
দুই হাত ভরে জড়িয়ে রেখেছি।

আকাশের নীচে কত অসংখ্য চুম্বন করেছিলাম ওষ্ঠে।

সে আমায় খুব ভালোবেসেছিল,
কোনো কোনোদিন আমিও বেসেছি ভালো
আয়ত শান্ত তার দুই চোখ ভালো না বাসা কি সম্ভব?

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা
শুধু এই ভেবে, সে তো কাছে নেই, হারিয়েছি তাকে আমি।

কান পেতে শুনি বিশাল রাত্রি
তাকে ছাড়া আরও বিপুল বিশাল
কবিতা আমার বুকের ভিতরে ঝরে ঝরে পড়ে,
ঘাসের উপরে শিশিরের মতো।

আমার প্রণয় তাকে কাছে ধরে রাখতে পারেনি,
কিবা আসে যায়
রাত্রি এখন তারায় তারায়, সে আমার কাছে আজ নেই আর।

এই সব শেষ। দূর থেকে যেন গান গায় কেউ, খুব দূর থেকে
তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় একটুখানিকও পূর্ণ হয়নি।

যেন তাকে কাছে টেনে নিতে চাই,
আমার দৃষ্টি খুঁজে ফেরে তাকে
আমার হৃদয় খুঁজে পেরে তাকে,
সে আমার পাশে আজ আর নেই।

আমি তাকে ভালোবাসি না এখন,
একথা সত্যি, তবু কত ভালোবেসেছি তাকে
আমার কণ্ঠ বাতাস খুঁজেছে, তার শ্রবণের কাছে পৌঁছোতে।

অপরের। আজ সে তো অপরের। যেমন আমার চুম্বন নিত
তার স্বর, তার সরল শরীর, অনাদি চক্ষু সবই অপরের
আমি তাকে ভালোবাসি না এখন, হয়তো এখনো ভালোবাসতুম
ভালোবাসা কত সামান্য, আর বিস্মৃতি এর বিপুল দীর্ঘ

এরকমই কোনো রাতে আমি তাকে
দুই হাত ভরে জড়িয়ে রেখেছি
তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় একটুখানিকও পূর্ণ হয়নি।

এই শেষবার তার ব্যথা আমি হৃদয়ে পেলাম
আমার জীবনে তার উদ্দেশ্যে এই কবিতাই শেষবার লেখা।

[পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪-এ, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে। স্বদেশপ্রেম ও মানবতা সম্পর্কে তার সরল ও জোরালো কবিতাবলীর জন্যই তিনি বিখ্যাত। বাংলায় তাঁর কবিতা আগে অনেকগুলি অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই, একটি নারী যে কবিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাকে উদ্দেশ করে লেখা ২০টি কবিতার সিরিজে এইটিই শেষ কবিতা।]

নিকোলাস গিয়েন

[আমেরিকায় সম্প্রতি যে নতুন করে নিগ্রো স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিকোলাস গিয়েন রচিত নিগ্রোদের বিষয়ে একটি মর্মান্তিক কবিতা এখানে অনুবাদ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিকোলাস গিয়েন-এর জন্ম ১৯০২ সালে, কিউবায়। কিউবার তিনি প্রখ্যাত কবি এবং সমগ্র স্প্যানিশ কবিতাতেও তাঁর স্থান উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা অনেকটা চারণ কবিতাসুলভ, আন্তরিকতায় এবং ছন্দ ও ধ্বনি মাধুর্যে খুবই প্রফুল্ল। স্পেনের প্রখ্যাত দার্শনিক ও কবি উনামুনো এক সময় নিকোলাস গিয়েনকে লিখেছিলেন, 'আমি আপনার কবিত্ব প্রতিভায় এবং শব্দের উপরে অধিকার দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছি। আপনার কবিতা পড়েই আমি নিগ্রোদের কথায় সুর ও ছন্দ বুঝতে শুরু করেছি।'

এই কবিতাটি যেসময়ে লেখা, তখনও কিউবা আমেরিকার মিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কমিউনিস্ট ঘেঁষা রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। আমেরিকার সঙ্গে কিউবার তখন ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার ফলে, আমেরিকার নিগ্রোদের দুঃখের সঙ্গে কিউবার একাত্মবোধ ছিল। কবিতায় বর্ণিত নিগ্রোদের দুরবস্থার সঙ্গে এখনকার নিগ্রোদের অবস্থার বিশেষ কোনও তফাত নেই। তবে নিগ্রোরা এখন পেয়েছে আইন অনুযায়ী সমান অধিকার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমর্থন।]

নিগ্রো

একটি ব্লুজ পাঠিয়ে দিল ছন্দময় আর্তনাদ
চমৎকার ভোরের দিকে।
লিলি শুভ্র দক্ষিণ তার চাবুক নিয়ে বেরিয়ে এল,
ভাঙল তাকে।
কচি নিগ্রো ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায়, সঙ্গে তাদের
ঘিরে রয়েছে শিক্ষা বন্দুক।
যখন তারা ক্লাসের মধ্যে ঢুকবে এসে
তারা দেখবে জিম ক্রো স্বয়ং তাদের শিক্ষক
লিঞ্চ নামে সেই জজ সাহেবের ছেলেমেয়েরাই অন্য ছাত্র;
প্রত্যেকটি নিগ্রো শিশুর দেরাজে থাকবে
কালির বদলে তাজা রক্ত
পেন্সিল নয় জ্বলন্ত কাঠ।

এই তো দক্ষিণ, এখনে কখনো চাবুকের শিস থেমে থাকে না।
সেই অত্যাচারিত জগতে
সেই কর্কশ, গ্যাংগ্রিন হওয়া অসহ্য আকাশের নীচে
নিগ্রো শিশুরা
সাদা শিশুদের পাশে বসে লেখাপড়া করতে পারবে না।
তারা তো শান্তভাবে বাড়িতে বসে থাকলেই পারে—
অথবা—অথবা আর কী পারে কে জানে—
তারা রাস্তা দিয়ে না হাঁটলেই পারে
অথবা তারা পারে চাবুকের তলায় আত্মসমর্পণ করতে
অথবা বেছে নিতে পারে বন্দুক অথবা থুতুর নীচে মৃত্যু;
তারা একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে শিস দিতে পারে
অথবা ভয় পেয়ে, চোখ নিচু করে বলতে পারে, 'হ্যাঁ,'
মাথা নিচু করে, 'হ্যাঁ'

এই 'স্বাধীন পৃথিবীতে'—ডালেস যার ঘোষণা করছেন
বিমানবন্দর থেকে বন্দরে, 'হ্যাঁ,'
আর, এই সময় একটা সাদা বল
লঘু ছন্দময় ছোট একটা সাদা বল
প্রেসিডেন্টের গল্‌ফ খেলার বল—সেই ক্ষুদ্র গ্রহ—

গড়িয়ে যায় নিবিড় ঘাসের ওপর দিয়ে,
সবুজ, পবিত্র, নরম, মসৃণ ঘাস, 'হ্যাঁ'।
তা হলে এবার,
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, তরুণ যুবতীরা,
শিশু
এবং বৃদ্ধ—টাক অথবা চুলো মাথা, এবার
ইন্ডিয়ান, নিগ্রো, মুলাটো, সঙ্কর, এবার
এবার একবার ভেবে দেখুন
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত দক্ষিণ অঞ্চল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত চাবুক এবং রক্ত
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই সাদা মানুষদের জন্য সাদা ইস্কুল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত পাথর আর খুদের দল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হত ইয়াঙ্কি আর অত্যাচার
ভাবুন সেই মুহূর্ত একবার
অন্তত একবার তা কল্পনা করে দেখুন!

[এ কবিতায় 'দক্ষিণ' বলতে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের চারটি প্রদেশ—মিসিসিপি, জর্জিয়া, অ্যালাবামা ও ভার্জিনিয়া—এদের বোঝায়। নিগ্রোদের প্রতি অত্যাচার এখানেই সবচেয়ে প্রবল এবং অনবরত।

ব্লুজ—নিগ্রোদের লোকগীতি। এর সুর হয় ঢিমে লয়ের জ্যাজ—এবং এ গানের কথা সব সময়েই খুব করুণ। জিম ক্রো—একটি প্রাচীন নিগ্রো গান। এখন এই একটি মাত্র শব্দে—নিগ্রোদের প্রতি সমস্ত অত্যাচার ও বৈষম্য বোঝায়।

লিঞ্চ কথাটার মানে কোনও লোককে বিনা বিচারেই জনতা কর্তৃক হত্যা। শব্দটি তৈরি হয়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভার্জিনিয়ার দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট, কর্নেল চার্লস লিঞ্চ আর ক্যাপ্টেন উইলিয়াম লিঞ্চ এদের নাম থেকে। এই দু'জন বিচারক কোনও আইন না মেনেই অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিগ্রো) জনতার হাতে তুলে দিতেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলার জন্য। বিমানবন্দরে ডালেসের ঘোষণা—এর মর্মার্থ, আমেরিকার বিমানবন্দরে, কোনও বিদেশি পদার্পণ করলেই তার হাতে একটি ছাপানো শুভেচ্ছাবাণী তুলে দেওয়া হয়, যার বক্তব্য, এই স্বাধীন দেশে সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির সমান অধিকার। ইন্ডিয়ান—আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড ইন্ডিয়ান'দের ডাকনাম।

মুলাটো— অর্থাৎ কোনও নিগ্রো আর ককেশিয়ান—অর্থৎ সাদা মানুষের মিলনের ফলে জাত সন্তান। অর্থাৎ যাদের গায়ের রং কিছুটা হালকা, প্রায় ফর্সা।]

অকতাভিও পাজ

[অকতাভিও পাজের জন্ম মেক্সিকোতে, ১৯১৪, শিক্ষা মেক্সিকো ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। মেক্সিকোর সাহিত্য আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাকে বলেছেন, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী সবচেয়ে খাঁটি কবি। তিনি এখন ভারতবর্ষে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে থাকেন।]

নীল উপহার

যখন জেগে উঠলাম, ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভেজা। আমার ঘরের মেঝে সদ্য ধোয়া, লাল ইট থেকে উঠে আসছে উষ্ণ কুয়াশা। একটা মথ বাল্‌বের চারপাশে ঘুরছে, আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে। আমি খাট থেকে নেমে খালি পায়ে সাবধানে হেঁটে এলাম, যাতে না একটা কাঁকড়াবিছেকে মাড়িয়ে দিতে হয়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি ঘুমন্ত প্রান্তর থেকে ভেসে আসা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই। আমি শুনতে পাই রাত্রির গভীর, রমণী নিশ্বাস। তারপর আমি বাথরুমে গিয়ে বেসিনে জল ঢেলে তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিলাম। ভিজে তোয়ালে দিয়ে আমি আমার বুক ও পা মুছে, খানিকটা শুকনো হয়ে, পোশাক পরতে শুরু করি, আগে দেখে নিই জামাকাপড়ের ভাঁজে ছারপোকাটোকা লুকিয়ে আছে কিনা। হালকা পায়ে সবুজ রং করা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে হোটেল ম্যানেজারের মুখোমুখি পড়ে যাই। লোকটির এক চোখ কানা, দুঃখী, স্বল্পভাষী মানুষ, সে একটা দড়ির চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল চোখ বুজে।

সে ভাল চোখটা খুলে আমার দিকে তাকাল। শুকনো গলায় প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছেন, সেনর?

—একটু বেড়িয়ে আসি। আমার ঘরের মধ্যে বড় গরম।

—কিন্তু এখন তো সব বন্ধ। আমাদের এখানে রাস্তায় আলো থাকে না। আপনার ঘরে থাকাই ভালো।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিম্নস্বরে বললুম, 'এখুনি ফিরে আসব।' অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম। প্রথমটায় আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। পাথর-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে সোজা খানিকটা হেঁটে আমি সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়ালাম। হঠাৎ একটা কালো মেঘের পেছন থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, উদ্ভাসিত করে তুলল একটা জল-হাওয়া-জর্জর দেয়াল। সেই বিপুল সাদায় আমার প্রায় চোখ ঝলসে গিয়েছিল। ঝুরুঝুরু বাতাস দুলে উঠল, আমার নাকে ভেসে এল তেঁতুলগাছের গন্ধ। রাত্রির মধ্যে পাতার খসখসানি ও কীটের গুঞ্জন। চোখ তুলে তাকালাম উঁচুতে, এখন নক্ষত্রও ফুটে উঠছে। আমার মনে হল, এই বিশ্ব একটি বিশাল সংকেত প্রকল্প, বিশাল অস্তিত্বের কথোপকথন— আমার কান, ঝিঁঝির ডাক, তারার মিটমিটানি— এগুলি সবই

আসলে সেই সংলাপের যতি, পর্ব, অসম তাল। আমি একটি মাত্র শব্দের একটি মাত্র সিলেবল। কিন্তু সেই শব্দটা কী? কে সেই শব্দ উচ্চারণ করছে? কাকে? আমি সিগারেটটা রাস্তার পাশে ছুড়ে দিলাম, সেটা জ্বলন্ত অর্ধবৃত্তে ধূমকেতুর ছোট সংস্করণের মতো ঘুরে পড়ল। আমি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটলাম। নিজেকে নিরাপদ এবং মুক্ত মনে হল, কারণ সেই বিশাল ওষ্ঠ আমাকে এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছে, এমন সুখে। রাত্রি একটি চক্ষুর উদ্যান।

যখন একটি রাস্তা পার হচ্ছিলাম, বুঝতে পারলুম, কেউ যেন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ফিরে তাকিয়ে কারুকে দেখতে পেলাম না। দ্রুত হাঁটতে শুরু করি। একটু পরেই পাথরের ফুটপাতে লোহা-পরানো জুতোর শব্দ। পিছন ফিরে তাকাইনি, যদিও অনুভব করছি একটা ছায়া আমার কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। দৌড়ব ভেবেছিলাম, পারিনি। হঠাৎ আমি থেমে গেলাম। কেন জানি না। আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম কিন্তু তক্ষুনি আমার পিঠে একটা ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার স্পর্শ টের পেলাম। একটি চাপা কণ্ঠস্বর, 'নড়বেন না, সেনর, তা হলেই কিন্তু মৃত্যু।'

মাথা না ঘুরিয়েই আমি বললাম, 'তুমি কী চাও?'

'আপনার চোখ, সেনর।' লোকটির গলা অদ্ভুত রকমের ভদ্র, যেন কিছুটা অপ্রস্তুত।

'আমার চোখ? আমার চোখ নিয়ে কী করবে? দেখো, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, খুব বেশি নয় যদিও, তা সবই আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না।'

'না, না, সেনর, আমি আপনাকে খুন করতে চাই না, আমি শুধু আপনার চোখ দুটো চাই।'

'কেন?'

'আমার বান্ধবীর একটা শখ। সে এক গুচ্ছ নীল চোখের স্তবক চায়। বেশি লোকের তো ওরকম নেই।'

'তা হলে আমার দুটো দিয়েও কাজ হবে না। ও চোখ নীল নয়, ধূসর।'

'আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি আপনার নীল চোখ।'

'কিন্তু, আমরা খ্রিস্টান হে! তুমি হঠাৎ আমার চোখ দুটো তুলে নিতে পারো না। আমি আমার কাছে যা আছে সব দিচ্ছি।'

'শুধু শুধু গণ্ডগোল করবেন না,' তার কণ্ঠ এবার কর্কশ, 'ফিরে দাঁড়ান।'

আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বেঁটে রোগা লোকটা, তালপাতার টুপিতে অর্ধেক মুখ ঢাকা। ডান হাতে একটা লম্বা ছুরি, চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে।

'মুখের সামনে একটা দেশলাই জ্বালুন।'

আমি দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে মুখের সামনে ধরলাম। আলোর জন্য আমার চোখ বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু সে আঙুল দিয়ে আমার চোখের পাতা খুলে দিল। সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না, সে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঁকি মারল।

দেশলাইকাঠি পুড়ে শেষ হয়ে আসায় আঙুল জ্বালা করতেই ছুড়ে ফেলে দিলাম। সে একটুক্ষণ চুপ।

'এখন দেখলে তো? আমার চোখ নীল নয়।'

'আপনি বড় চালাক, সেনর। আর একটা কাঠি জ্বালুন।'

আমি আর একটা কাঠি জ্বেলে চোখের খুব কাছে ধরলাম। সে আমার জামা টেনে বলল, 'নিচু হয়ে বসুন।'

আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। সে আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিল। তারপর সে আমার ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, ছুরিটা কাছে এগিয়ে এল, আরও কাছে, ছোঁয়া লাগল আমার চোখের পাতায়। আমি চোখ বুজলাম।

'চোখ খুলে তাকান!' সে বলল, 'পুরোপুরি!'

আমার চোখ চাইলাম। দেশলাইয়ের আগুনে পুড়ে গেল আমার চোখের পাতা। হঠাৎ আমায় ছেড়ে দিল।

'নাঃ, নীল নয়! মাপ চাইছি আমি।' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এই কথা বলে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মিলারেস ও দে লা সিলভা

[স্প্যানিশ কবিতা প্রসঙ্গে আমরা মূল স্পেন ভূখণ্ড ছাড়াও স্প্যানিশ-ভাষী কিউবা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশের কবিদের কথা আলোচনা করেছি। এবারে আমরা খুব ছোট দুটি দ্বীপ-দেশের কবিকে উপস্থিত করছি, যেখানকার ভাষাও স্প্যানিশ। এই কবিদ্বয় তাঁদের স্ব স্ব দেশের বাইরে তেমন পরিচিত নন, কিন্তু এঁদের রচনার সরলতা ও আবেগের তীব্রতা সর্বজনীন।

অগাস্টান মিলারেসের জন্ম ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে, ১৯১৭ সালে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ঠিক কোথায়, পাঠকের যদি এই মুহূর্তে মনে না পড়ে তবে জানাই, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপ-সমষ্টি ক্যানারি, জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ।

সলোমন দে লা সিলভার জন্ম ১৮৯৩ সালে নিকারাগুয়ায়। নিকারাগুয়া মধ্য আমেরিকায় ক্যারিবিয়ান আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে ছোট্ট দেশ, লোকসংখ্যা এগারো লক্ষ। সলোমন দে লা সিলভা জীবনে অনেক কাজ করেছেন, উপন্যাস, কবিতা ও সাংবাদিকতা ছাড়াও যুদ্ধ করেছেন, শ্রমিক আন্দোলন গড়েছেন ও রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্যারিসে নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন, ওইখানেই ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যু।]

অগাস্টান মিলারেস

শুভেচ্ছা

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে কবিতা
শুধু মানুষের সত্য অস্তিত্বের প্রকাশ,
কবিতা শুধু সত্যের গান, তাকে জাগিয়ে তোলা
যে দৈত্য দিবা রাত্রি পাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে।

কবির কণ্ঠই একমাত্র পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে
সেই উষাকে ভেদ করে জেগে ওঠা প্রথম শিখর
সেই পাহাড়েই ধ্বনিত হয় সময়ের সংগীত
তার হৃদয়ই প্রথম ছিন্নভিন্ন হয় যেকোনো যুদ্ধে

প্রথম সারিতে তার স্থান কখনওই অস্বীকার করা যাবে না
স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে তার আত্মীয়তা তাকে সেই স্থান দিয়েছে
একজন কবি সব সময়েই সেই মানুষের সঙ্গী
যারা যুদ্ধের সময় নির্ভীকভাবে ঝাঁপ দেয়

কবিই মৃত্যুরোধকারী জনতার প্রতিনিধি—
আকস্মিক রাত্রে যখন সব কিছুই বিস্মৃত
যখন কোথাও কোনো স্বাধীনতা নেই, কোনও জীবিত কবি নেই
তখন বাতাস না থাকায় পাখিরা ওড়ে না।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আমার ক্রোধ
যখন শাসানি আসে স্বাধীনতার প্রতি, আমাদের উষ্ণকারী সূর্যের প্রতি।
পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে এলে কবিও উত্তাপহীন হয়ে যায়
পৃথিবীতে তখন হৃদয় নেই, সুবিচার নেই।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আজকের দিনের
কর্কশ পথে একজন কবিকেই মানুষ তার ভাই বলে চিনবে।
আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে একজন কবিই সত্যিকারের মানুষ
যদিও কখনো কখনো সে আমাদের বোঝাতে যায় যে সে দেবতা।

সলোমন দে লা সিলভা
বুলেট

যে বুলেট আমাকে হত্যা করবে
সেই বুলেটেরও প্রাণ থাকবে

এই বুলেটের আত্মা হবে একটি গোলাপের মতো
যদি ফুল গান গাইতে পারে:
অথবা সে হবে হলদে মুক্তার সৌরভ
যদি রত্নেরও সৌরভ থাকে:
অথবা সে হবে সংগীতের শরীরের ত্বক
যদি আমাদের হাত দিয়ে
নগ্ন সংগীতকে স্পর্শ করা সম্ভব হত।

যদি সেই বুলেটটি এসে আমার মাথায় আঘাত করে
তবে সে বলবে, "আমি দেখছিলাম তোমার ভাবনা কত গভীর।"
যদি সে ঢুকে যায় আমার হৃৎপিণ্ডে
তবে সে বলবে, "আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাই,
আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি।"

রুশ কবিতা: প্রতীক্ষিত ক্রান্তিকাল

১৯১৭ সালের বিপ্লব রাশিয়ার জীবনযাত্রা, ইতিহাস সব কিছু অকস্মাৎ বদলে দেয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু বিপ্লব-পরিকল্পনার অনেক আগে থেকেই রাশিয়ার সাহিত্যে একটা আমূল পালাবদল প্রতীক্ষিত ছিল।

গত শতাব্দীর প্রথম খণ্ডেই রুশ কবিতার স্বর্ণ-যুগের অভ্যুদয় ও অবসান। এই স্বর্ণ-যুগের সম্রাট ছিলেন পুশকিন, এ ছাড়া প্রায় কাছাকাছি প্রতিভাধর জুকভস্কি এবং ব্যাটিয়োস্কভ। পুশকিন একই সঙ্গে সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতার সভাকবি, তিনি রাশিয়ার লোকসংগীত, পল্লিগাথার সঙ্গে মিলিয়েছিলেন সমগ্র ইউরোপীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ফসল, তাঁর অবিশ্বাস্য ক্ষমতাবলে রুশ কবিতা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে মন্দাকিনী ও ফল্গু। রাজনৈতিক কবিতা রচনার জন্য তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন, সেই নির্বাসন তাঁর ক্ষেত্রে সুফলা হয়েছিল, নির্বাসনকালে লেখা তাঁর দীর্ঘ-কবিতাবলীতে রোমান্টিসিজম, সৌন্দর্যবন্দনা এবং বাস্তবতার অপূর্ব সমাহার দেখা যায়।

১৮৩৭ সালে পুশকিনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রুশ কবিতার স্বর্ণ-যুগের অবসান হয় বলা যায়। পুশকিনের সময় আর একজন বিপ্লবী তরুণ, লেরমেনটফ কবিতায় বিদ্রোহ আনার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, বাসনার তীব্রতা এবং অহংকৃত নৈঃসঙ্গ ফুটে উঠেছিল লেরমেনটফের কবিতায়, কিন্তু মাত্র সাতাশ বছরে তাঁর মৃত্যু অকস্মাৎ সেই বিপ্লবে ছেদ এনে দেয়। পুশকিন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার গদ্যকাহিনীও লিখেছেন, তখনকার রাশিয়ার সেই কিশোর-গদ্য ক্রমে অতিকায় দানবের রূপ নিয়ে জেগে ওঠে, কবিতাকে দমন করে গদ্যের এমন প্রভুত্ব গত শতাব্দীতে পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। ১৮৪০-এর পর অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে রাশিয়ায় কবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে। পুশকিন এবং গোগোলের গদ্য রচনা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, পরবর্তী দু' তিন দশকে আস্তে আস্তে দেখা দিলেন, ডস্টয়েফস্কি, টুর্গেনিফ, গনচারফ এবং টলস্টয়। তখন আর কবিতা কে পড়ে! এঁদের রচনায় সামাজিক বাস্তবতা এমন মর্মভেদী এবং সত্য হয়ে দেখা দেয় যে, তখন বহু সমালোচক কবিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরে বলেছিলেন যে, সেসব কবিতা লেখার কোনওই মানে হয় না, যার সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার কোনো সম্পর্কই নেই। এমনকী, একজন সমালোচক এসময় বলেছিলেন, একজোড়া জুতোর দামের চেয়েও শেকসপিয়ারের রচনাবলী কম মূল্যবান! টলস্টয়ও লিখেছিলেন, শেকসপিয়ারের রচনা

শুধু মাতাল, বেশ্যা আর খুনোখুনিতে ভরতি, ওর মধ্যে কোনও সাহিত্য নেই। ফলে এই সময় কবিতা খানিকটা মুখচোরা হয়ে পড়ে। সমাজের অনুশাসন মেনে কিংবা নিছক দেশের উপকারের জন্য কবিরা কখনও কলম ধরতে চাননি, কখনও হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে রাজি হননি। ফলে রাশিয়ায় সেই সময় কবিতা নিষ্প্রভ হয়ে গদ্যের উদ্ভাসিত জ্যোতি প্রত্যক্ষ হয়। তারপর সিম্বলিস্টরা এসে এই প্রায়ান্ধকারের অবসান ঘটায়।

গদ্যের এই জয়যাত্রার যুগে মাত্র দু'জন বড় কবির দেখা পাওয়া যায়। এই দু'জন দু'-দলের প্রতিনিধি। একদল সমাজবাস্তবতাবাদী, অপর দলের তখনও বিশ্বাস আর্ট ফর আর্টস সেক। এই দ্বিতীয় দল তখন কোণঠাসা, কিছুটা ধিকৃত, এঁদের মধ্যে প্রধান, আফানাসি ফেট—মধুর ললিত ভাষায়, প্রকৃতি, প্রেম ও বিষাদের কবিতা লিখে কিছু লোকের মন জয় করেছিলেন। তবু, ফেট-কে অবশ্য বিপ্লবের বহু আগেই 'রি-অ্যাকশনারি' আখ্যা পেতে হয়েছিল। প্রথম দলের প্রধান কবি নেক্রাসফ প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তখনকার গদ্যবাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। নেক্রাসফের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশের দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক অপব্যবহার—এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যই কবিতা লেখা উচিত। অনুগামীদের তিনি ধমকে বলেছিলেন, 'তোমাকে কবি না হলেও চলবে, কিন্তু তোমাকে দেশের খাঁটি নাগরিক হতেই হবে!'

রাশিয়ার কবিতার জগতে এরকম বিশৃঙ্খলা চলেছিল গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত। ১৯১৭-র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, সাহিত্যকে সমাজবাস্তববাদী হতেই হবে এমন যে দাবি ওঠে, দেখা যাচ্ছে সেটা আকস্মিক বা ঠিক জোর করা নয়, এরকম প্রত্যাশা রাশিয়ায় গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই জেগেছিল এবং শুরু হয়েছিল। সে চেষ্টা অবশ্য ধারাবাহিক হয়নি, বাস্তবতা ও আদর্শের চিৎকারে পুরোপুরি হাঁপিয়ে ওঠার পর ১৮৯০ সালে আবার কবিতায় আধুনিক আন্দোলন শুরু হয়। একদল কবি বাস্তবতার বাড়াবাড়ি অগ্রাহ্য করে— ফিরতে চাইলেন হৃদয় গহনে, সামাজিকের বদলে ব্যক্তিগত দুঃখবোধ, অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধান, রহস্যের বন্দনা, ইত্যাদি প্রবেশ করল কবিতায়। ফঁ্যা দ্য সিয়েক্ল— অর্থাৎ শতাব্দী-শেষের কবিতায় যে চরিত্রলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল ফরাসি কবিতায়, রাশিয়াতেও তার প্রভাব দেখা গেল, এই আধুনিক আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে সিম্বলিজম, বহু শক্তিমান কবির অভ্যুদয় হল, সমালোচকরা এই পর্বের নাম দিয়েছেন রুশ কবিতার দ্বিতীয় স্বর্ণ-যুগ। কিন্তু প্রথম স্বর্ণ-যুগের পুশকিন কিংবা লেরমেনটফের তুল্য মহান শক্তিধর কবি এঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না বলে, একে রুপোলি যুগ বলাই ভাল। রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই কবিরাই প্রধান স্থান অধিকার করে ছিলেন।

সিম্বলিস্ট আন্দোলনের প্রথম দলের কবিরা, ভাষার তীক্ষ্ণতা, শব্দঝংকার, ছন্দবৈশিষ্ট্য নিয়েও বেশি কারিকুরি দেখিয়েছেন। এঁদের পরবর্তী কবির দলই প্রকৃত অর্থে সিম্বলিস্ট, এঁদের মধ্যে সকলকে ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠে আসেন আলেকসান্দার ব্লক, বিংশ শতাব্দীর প্রকৃত রুশ কবিতার তিনিই প্রথম স্তম্ভ।

আলেকসান্দার ব্লক

[বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুশ কবিতায় দুটি পর পর স্পষ্ট সাহিত্য আন্দোলনের বিকাশ দেখা যায়। এই দুটি আন্দোলনেরই জন্ম পশ্চিম ইউরোপের অন্য দুটি দেশে। ফরাসি দেশ থেকে সিম্বলিস্টদের কবিতা ও রচনাদর্শ অনুপ্রাণিত ও পুনরুজ্জীবিত করে রুশ কবিতা, ব্লক এই ধারার অন্তর্গত। এর কিছু পরেই, ইতালির ফিউচারিস্ট আন্দোলনের ঢেউ-ও এসে পৌঁছায় রাশিয়ায়, এবং এ আন্দোলনের নেতা হিসেবে দেখা দেন মায়াকভ্স্কি।

আলেকসান্দার ব্লকের জন্ম ১৮৮০-তে। রাশিয়ার সিম্বলিস্ট কবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ, আজ পর্যন্ত রুশ কবিতায় তাঁর প্রবাহ অপ্রতিরোধ্য। বোদলেয়ার, মালার্মের প্রভাবে রাশিয়ায় সিম্বলিস্ট কবিরা জেগে ওঠেন। বোদলেয়ার প্রচারিত করেসপন্ডেন্স অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে একটা সত্য যোগসূত্র আছে, একমাত্র কবিরাই ব্যক্তিগত প্রতীকে তা প্রকাশ করতে পারেন, রুশ কবিরাও এ ধারণা গোড়ার দিকে মেনে নিয়েছিলেন। পরে কবিদের নিজস্ব প্রতিভায় তা অনন্যতা পায়। তিনি কবিতায় সুরের সর্বাত্মক প্রাধান্য বিশ্বাস করতেন।

১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, বস্তুত ১৯০৫ সাল থেকেই বিপ্লবের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শান্তি ও সংগীতময় জগৎ পেয়ে যাবার আশা করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের ঠিক পরেই যে অবধারিত বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা যায়, তাতে তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়েন। দেশের কোথাও তখন সুরের উপযোগী আবহাওয়া নেই, সুতরাং শেষ জীবনে তাঁরও বুক থেকে সুর হারিয়ে যায়, কবিতা লেখার সব প্রেরণা থেকে নিঃস্ব হয়ে তাঁর মৃত্যু মাত্র ৪১ বছরে, ১৯২১ সালে।]

নামহীন একটি কবিতা

তুষার গোধূলিতে একটি কালো কাক
রৌদ্রে পীত কাঁধে কৃষ্ণ মখমল
একটি সুরময় কণ্ঠে মৃদু গান
আমাকে শোনাল সে দক্ষিণাঞ্চলে রাত্তিরের গান।

হৃদয় লঘু, এল কামনা বাধাহীন
সাগর যেন আজ জানাল সংকেত
অতল পাতালের থেকে অনন্তে
কীটেরা উড়ে যায় সঘন শ্বাস ফেলে।

বরফ-মেশা হাওয়া, তোমার নিশ্বাস
আমার নেশাখোর ওষ্ঠাধর...
ভ্যালেন্টিনা, তুমি স্বপ্ন, তারা!
তোমার দোয়েলেরা কেমনে গান গায়...

ভীষণা এ পৃথিবী! বড়ই ছোট এই বুকের তুলনায়!
তোমার চুম্বনের প্রলাপ জড়ানো,
জিপসি গানে গানে অন্ধকার ফাঁদ,
আকাশে উল্কার সবেগে উড়ে যাওয়া।

সুরদেবীর উদ্দেশ্যে
(শেষ অংশ)

রাত্রি, রাজপথ, আলো, একটি ওষুধের দোকান
একটি অর্থহীন মিটমিটে বাতি।
যদি তুমি বেঁচে থাকো আরও এক সিকি শতাব্দীতে
সব কিছুই তবু এই রকম থাকবে। এর থেকে মুক্তি নেই।
তুমি মরে যাবে, আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করে দেখো
সব কিছুরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, সেই পুরনো কালের মতন;
রাত্রি, খালের জলে বরফ-মেটানো ছোট ঢেউ, সেই
একটি ডাক্তারের দোকান, রাজপথ, সেই আলো।

আনা অখমাতোফা

[রুশ দেশে সিম্বলিজম ও ফিউচারিজম এই দুই আন্দোলনের মাঝখানে আর এক সংক্ষিপ্ত কাব্যাদর্শ দেখা দিয়েছিল, যার নামকরণ হয়েছিল অ্যাকমেয়িজম, এর আয়ু মোটামুটি ১৯১০ থেকে ১৯১৭। সিম্বলিস্টদের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য এই ছিল যে, লৌকিক ও অলৌকিকের যোগাযোগের ধারণা ভুল, কবির যাবতীয় জ্ঞান এই মাটির পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই। কবিতায় এঁরা শব্দের নানা অর্থ পরিহার করে নির্দিষ্ট একটি অর্থকেই প্রকাশ করতে চান। আফ্রিকার আদিবাসীদের গান, অজানা বিদেশি রীতির প্রতি রোমান্টিক মোহ, প্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সরল বিষয় ছিল এঁদের বৈশিষ্ট্য। আনা অখমাতোফা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রথম রচনা শুরু করেন।

তাঁর জন্ম ১৮৮৮-তে। আসল নাম আনা আন্দ্রিয়েফনা গোরেঙ্কো। ২৬ থেকে ২৯ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি প্রভূত সুনামের অধিকারিণী হয়েছিলেন। অ্যাকমেয়িস্ট দলের প্রধান কবি গুমিলেফের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এর কিছু পরেই একটি পারিবারিক ট্র্যাজিডিতে তিনি আঠারো বছর কবিতা লেখা ছেড়ে চুপ করে ছিলেন। তাঁর স্বামী গুমিলেফ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অসম সাহসে লড়াই করেছেন, কিন্তু শেষ দিকে বলশেভিকদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়েন। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কবি গুমিলেফকে গুলি করে মারা হয়।

দীর্ঘকাল পরে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি আবার কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রেষ্ঠ জীবিত কবির সম্মান পান। তাঁর 'নায়কহীন একটি কবিতা' নিউইয়র্ক থেকেও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ সালে।]

সায়াহ্নে
(অংশ)

বাগান থেকে সুরের ধারা ছড়িয়ে যায়
            শব্দহীন ব্যথায়
টাটকা, কটু সাগর ঘ্রাণ ভেসে আসে
            বরফে গড়া পিরিচে রাখা ঝিনুকে।

সে বলেছিল, আমি তোমার আন্তরিক সখা—
            শুধু আমার পোশাকে তার হাত
আলিঙ্গনের চেয়েও এ যে অন্যরকম,
            একটুখানি ছোঁয়া।

এমনি করেই মানুষ তার পোষা বিড়াল, পাখি
            ছুঁয়ে আদর করে
এমনি করেই মানুষ দেখে সার্কাসের নটী।
সোনালি তার লঘু চোখের শান্ত পাতার নীচে
            রয়েছে শুধু হাসি।

আলগা ধোঁয়ার আড়াল থেকে বাজে করুণ বীণা
            যেন আমায় বলে:
স্বর্গে জানাও নতি, কারণ আজই প্রথম তুমি
            একা পেয়েছ তোমার দয়িতাকে।

'নায়কহীন একটি কবিতা' থেকে
১৯১৩-র সেন্ট পিটার্সবার্গ

ক্রিসমাস-জোয়ার উজ্জ্বল হয়েছে উৎসবের আলোয়,
শকট উলটে যায় ব্রিজ থেকে, সমগ্র লোকের শহর
ভেসে যাচ্ছে কোন অজানা লক্ষ্যে, নেভা নদীর
নিম্ন স্রোতে অথবা উত্তরণে, যেখানেই হোক, তার
কবর থেকে অনেক দূরে। গ্যালারনায়া রাস্তার তোরণ
অন্ধকারে রেখাচিত্রার্পিত, গ্রীষ্মের বাগানে একটি আবহাওয়া-যন্ত্র
ধাতব সুরে গান গায়, উজ্জ্বল রূপালিচাঁদ হিম হয়ে
আসে রুশিয়ার রূপালি যুগে।
প্রতিটি রাজপথে একটি ছায়া ধীরে এগিয়ে আসে
প্রতিটি গুল্মের কাছে, সেইজন্য অন্ধকার
ঘনায় বসবার-ঘরে, খোলা-মুখ ফায়ার প্লেস থেকে
আর তাপ আসে না, ফুলদানিতে শুকিয়ে যায়
লাইলাক ফুল। এবং সমস্ত সময় জুড়ে দম আটকানো,
হিমশীতল, কামুক এবং অশুভ যুদ্ধপূর্ব দিনগুলির
বাতাসে একটি দুর্বোধ্য ঘর্ঘর শব্দ লুকানো...কিন্তু
সেই শব্দ তখন শূন্যগর্ভ শুনিয়েছিল...ঠিকমতো
কানে এসে পৌঁছোয়নি, হারিয়ে গেছে
নেভা-র তুষার-স্রোতে।
মানুষ যেন তখন আচ্ছন্ন, কোনো ভয়ংকর
রাত্তিরের আয়নায় সে নিজেকে তখন চিনতে চায়নি,
আর সেই প্রবাদময় নদীতীরে, ক্যালেন্ডারের নয়,
বাস্তব বিংশ শতাব্দী এগিয়ে আসছিল।

বরিস পাস্তেরনাক

[পাস্তেরনাক সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন তার পুনরুল্লেখ অবান্তর। মুখ্য তথ্যগুলি এই: জন্ম ১৮৯০, পিতা ছিলেন খ্যাতিমান চিত্রকর, প্রথম কবিতার বই বেরোয় ১৯১৪ সালে, কোনও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেননি, প্রায় ১৯৩৪ সাল থেকেই ১৯৫৩-তে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত, যখন সরকারের পক্ষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার লোকদের প্রতি নানান অনুশাসন জারি হতে থাকে, তিনি কবিতা লেখা

বা প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন, এই সময় বিদেশি সাহিত্যের বিশেষত শেকসপিয়ার অনুবাদ করেছেন। তাঁর উপন্যাস 'ড. জিভাগো' রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হলেও গোপনে ইতালিতে ছাপা হয় ১৯৫৭ সালে, পরে ইংরেজিতে। ১৯৫৮-তে তাঁর নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা ও প্রত্যাখ্যান, ১৯৬০-এ ভগ্নহৃদয় মৃত্যু। তাঁর রচনা রাশিয়ায় অন্যায় ভাবে নিষিদ্ধ করা এবং রাশিয়াকে সমালোচনা করার জন্য পশ্চিমি সভ্যতা তাঁর রচনাকে যেরকম অস্ত্রের মতন ব্যবহার করেছে—এই দুই বিষয়েই তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। বাংলায় পাস্তেরনাকের কবিতার সার্থক অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। পাস্তেরনাকের একটি কবিতা সংগ্রহ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন নচিকেতা ভরদ্বাজ।]

হ্যামলেট

ফিসফাস মিলিয়ে গেছে। আমি এসে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি
দরজার ফ্রেমের গায় ভর দিয়ে কান পেতে শুনি
দূরাগত প্রতিধ্বনির ভিতরে কোন বাণী,
কোন উপাদান, গল্প আগুয়ান আমার জীবনে।

রাত্রির গ্রহণ-আলো এখন আমার মুখে স্থির
সহস্র অপেরা-গ্লাস এদিকে ফেরানো
যদি বা সম্ভব হয়, তবে আব্বা, পিতা,
এ পেয়ালা আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও তুমি।

আমার পছন্দ হয় তোমার এ কঠিন রচনা
এই ভূমিকায় আমি অভিনয়ে যথেষ্ট সহজ
কিন্তু দেখো, এসময় অন্য নাটকের মধ্য পথ—
এখন আমার সেই রূপান্তরে মুক্তি পেতে চাই।

যদিও প্রতিটি দৃশ্য সুচিন্তিত, পূর্ব নির্ধারিত
যেখানে শেষের অঙ্ক, সেখানেই অবিচল শেষ।
আমি এক, সব কিছু ডুবে যায় কপট বিশ্বাসে
মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া—এক জীবন শেষ করা নয়।

শীতের রাত্রি

সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে
ছড়িয়ে গেল তুষার,
ছড়িয়ে গেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

যেমন আগুনের শিখার দিকে উড়ে যায়
গ্রীষ্মের পতঙ্গের ঝাঁক
বাইরের মিহি বরফ ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসে জানলার দিকে।

হিম ঝঞ্ঝা বৃত্ত হয়ে ঘোরে,
তির পাঠায় জানলার শার্সিতে
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

ঘরের উজ্জ্বল ছাদে ছায়া পড়ে;
দু' দিকে মোড়া হাত, দু' দিকে মোড়া পা
দু' দিকে মোড়া নিয়তি।

ধপ্ করে শব্দ হয়ে দুটো জুতো পড়ল মাটিতে
পোশাকের ওপর কান্নার ফোঁটার মতন মোম
ঝরে পড়তে লাগল রাত্রির আলো থেকে।

আর সব কিছুই হারিয়ে গেল
ধূসর-সাদা তুষার-কুয়াশায়
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

কোণ থেকে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল
মোমের শিখায়
তখনি পরীর মতন, লোভের উত্তাপ তুলে ধরল দুটি ডানা
ক্রুশকাষ্ঠের ভঙ্গিতে।

বারবার মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি

['জনতার রুচির গালে এক থাপ্পড়'—এই নামে একটি ইস্তাহার বেরুল ১৯১২ সালে। নতুন সাহিত্য অভিযান শুরু করে যে চারজন তরুণ কবি এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিল তাদের মধ্যে ১৯ বছরের ছোকরা মায়াকভ্স্কিই সবচেয়ে তেজি। ইতালির মেরিনেত্তি যে ফিউচারিস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার প্রভাব এসে পড়ে রাশিয়ায়, কবিতার পূর্ব সংস্কার ভেঙে একদল কবি বিপ্লব করলেন। যা কিছু তথাকথিত কবিত্বময়, প্রথাসিদ্ধ সুন্দর, সেইসব আবরণ খুলে ফেলে এঁরা কবিতাকে রক্তমাংসের, সমসাময়িক জীবনের ও যথাযথ আবেগের প্রকাশ হিসেবে দেখতে চাইলেন। তারপর ১৯১৭ সালে এসে গেল রুশ বিপ্লব। মায়াকভ্স্কির মধ্যে একটা বেপরোয়া, তেজি, উদ্দাম-হৃদয় ছিল, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লবের মধ্যে। এবং রুশ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত হলেন। তাঁর জোরালো ও উচ্চকণ্ঠ শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারের ক্ষমতা ও ঝোঁক, তাঁর কবিতাকে বিপ্লবের প্রেরণা হিসেবে জনতার কাছে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, বিপ্লবীরা আসলে জন্মরোমান্টিক। সাম্যবাদী বিপ্লবের মধ্যে রোমান্টিকতার স্থান সামান্য, কিন্তু যে সমস্ত কবি ও লেখক প্রথমে এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন এক প্রকার রোমান্টিক প্রেরণাবশত। এইজন্যই এইসব সাহিত্যকারদের মধ্যে অবিলম্বেই আত্মহত্যা, নির্বাসন ও স্বপ্নভঙ্গের হিড়িক পড়ে যায়। বিপ্লবের মধ্যে একটা প্রবল ভাঙাচোরা আছে—যা শিল্পকে সব সময়েই আকর্ষণ করে, কিন্তু পরবর্তী গঠনের যুগে শিল্পী নিশ্চিত খানিকটা উদাসীন। কারণ, তাঁর বুকের মধ্যে ব্যক্তিগত বিপ্লব থেকেই যায়। বিপ্লবের কবিতাগুলির জন্যই মায়াকভ্স্কি বিখ্যাত, কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতাবলী, ভয়ংকর আবেগ, আত্মঘাত, অপমানবোধ, ক্রোধ ও করুণা প্রার্থনা—ইত্যাদির মিশ্রণে পৃথিবীতে অনন্যস্বাদ।

১৯৩০ সালে মায়াকভ্স্কি আত্মহত্যা করেন। বয়স মাত্র ৩৭, তখন তিনি খ্যাতি ও সম্মানের উচ্চশিখরে। তাঁর নোট বইয়ের মধ্যে যে ক'টা অসমাপ্ত কবিতা পাওয়া যায়, তার দুটি টুকরোও আমরা এখানে উপস্থিত করেছি।]

আমাদের যাত্রা

বিপ্লবের দামামা বেজে উঠুক ময়দানে
উচ্চে তোলো সারবন্দি অহংকারী মাথা
বিশ্বময় সব শহর ভাসিয়ে দেবো বানে
দ্বিতীয় মহাপ্রলয় আজ ছড়াবে সবখানে।
দিনের বাহন হেলে পড়েছে অতি
বৎসরের গরুর গাড়ি ঢিমে
গতি আমাদের দেবতা, শুধু গতি
হৃদয়গুলি দামামা সম্প্রতি।

আমরা সোনার চেয়েও দামি, জানি
বুলেট যেন ভ্রমণ, বুকে বেঁধে না
গানে আমরা হয়েছি শস্ত্রপাণি
গলার সুরে সোনালি ঝনঝনা।
ধূসর মাঠ, আনো তোমার সবুজ
দিনের জন্য পথ বানাও ঘাসের
হে রামধনু, এবার নীলাকাশের
ঘোড়া ছোটাও বৎসরের, সঘন নিশ্বাসের।

তারায় ভরা আকাশ আজ ম্লান
ওদের ছাড়াই আমরা লিখি গান।
সপ্ত ঋষি! শোনো এ দাবি জানাই
আমরা স্বর্গে জীবন্ত যেতে চাই!
চালাও ফুর্তি! গান করো! উৎসব!
বসন্ত ঋতু প্রত্যেক ধমনীতে
হৃদয়ে এখন তোলো যুদ্ধের রব
ধাতুর দামামা হৃদয়ের বৈভব।

অসমাপ্ত

২

এখন রাত একটা
  তুমি নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে আছ
অথবা, হয়তো, তুমিও আমার মতো...
  আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই।
এখন কোনো মানে হয় না, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে
  তোমাকে জাগিয়ে তোলা বা বিরক্ত করার—

৫

আমি জানি শব্দের ক্ষমতা, আমি জানি শব্দের মাদকতা
সেই শব্দ নয়, যা থিয়েটারে হাততালি পায়,
সেই শব্দ যা কফিন ফেটে বেরিয়ে দারুময় চার পায়ে হাঁটে
কখনো কখনো লোক তোমাকে বাতিল করে, ছাপা হয় না, প্রকাশক জোটে না
কিন্তু শব্দ তো অশ্বারোহী, বল্গা দৃঢ় করে ছুটে যায়
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাজে সেই শব্দ
রেল ট্রেনও একসময় হামাগুড়ি দিয়ে আসে কবিতার
  বিবর্ণ হাতে চুম্বন করার জন্য।
আমি জানি শব্দের ক্ষমতা। কখনো তাকে দেখায় খুব সাধারণ
নর্তকীর পায়ের কাছে ঝরে পড়া পাপড়ির মতন
কিন্তু মানুষ তার নিজের আত্মায়, ওঠে, হাড়ের মধ্যে...

সার্গেই এসেনিন

আমার মা-কে লেখা চিঠি

বুড়ি, তুমি কি এখনো বেঁচে রয়েছ?
আমিও বেঁচে আছি। আমি তোমায় ভালোবাসি
আমি তোমায় আশীর্বাদ করি তোমার ছোট্ট ওই বাড়িতে
বাণীর অতীত সায়াহ্নের আলোক ঝরে পড়ুক!

লোকে আমায় চিঠি লিখেছে, তোমার চোখে মুখে
—যদিও খুব লুকোতে চাও,—উৎকণ্ঠা, ভয়
আমার জন্য, আমার জন্য অধীর প্রতীক্ষায়
তোমার নাকি জীবন কাটে? বেরিয়ে এসে পথে
পুরনো কাঁথা শরীরে মুড়ে আমার জন্য তাকিয়ে থাক দূরে?
কখনও বুঝি সন্ধেবেলা নীল অন্ধকারে
হৃদয় কাঁপে আশঙ্কায়, প্রতিদিনের একই আশঙ্কায়
সরাইখানার মারামারিতে এই বুঝি কেউ আমার
বুকের মধ্যে ধারালো একটা ছুরি বসিয়ে দিল!
বুড়ি, আমার মামণি, তুমি ভয় করো না, এসব
কিচ্ছু না, এ তো শুধুই ঘূর্ণী, মায়ার খেলা।
আমি কি এমন পাঁড় মাতাল হয়ে গিয়েছি, ভাবো?
তোমায় শেষ দেখার আগেই হঠাৎ মরে যাব?
আমি তোমার আগের মতোই ভালোবাসার আছি
এখন আমার দিবস জুড়ে একটি মাত্র স্বপ্ন
কখন আমি অস্থিরতা, দুঃখ ছিঁড়ে বেরিয়ে
তোমার কাছে গ্রামের সেই বাড়িতে ফিরে যাব।
ফিরব আমি, যেদিন তোমার ছোট্ট সাদা বাগান
বসন্তের অনুকরণে ছড়াবে বহু শাখা
তখন যেন খুব সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ো না তুমি আমার
যেমন তোমার স্বভাব ছিল আট বছর আগে।
যে সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে তাদের জাগিয়ো না
যে সব সাধ সত্য হয়নি, তাদের ছুঁয়ে কী লাভ!
আমার এই নিয়তি ছিল, এমন দুঃখ পাওয়া
জীবন আমার শুরুই হল যন্ত্রণার দিনে।
আমাকে তুমি বলো না আমার প্রার্থনার মন্ত্র,
অতীত কালে ফেরা আবার অসম্ভব আমার।
তুমিই শুধু একা আমার সাহায্য ও শান্তি
তুমিই শুধু আমার কাছে বাণীর অতীত আলো।
আমার জন্য অমন আর ভাবনা করবে না তো?
অমন করে থেকো না আর আমার প্রতীক্ষায়
দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে পথের দিকে চেয়ে
পুরনো কাঁথা শরীরে মুড়ে দাঁড়িয়ো না আর তুমি।

শেষ কবিতা

হে বন্ধু, বিদায়
প্রিয় বন্ধু, তুমি আছ আমার হৃদয়ে...
আমাদের পূর্বনির্ধারিত এই বিদায় মুহূর্ত
ধরে আছে ভবিষ্যতে মিলন শপথ।
বিদায়, হে বন্ধু, কোনো কথা নেই, হাতে নেই হাত
দুঃখিত হয়ো না, শোকে বাঁকিয়ো না ভুরু
এ জীবনে মৃত্যুর ভিতরে কোনো নতুনত্ব নেই
অবশ্য একথা ঠিক, বেঁচে থাকা খানিকটা অভিনব বটে।

[যদিও মা-কে লেখা চিঠিতে এসেনিন বলেছিলেন, আমি সেরকম বদ্ধ মাতাল হইনি যে তোমার সঙ্গে দেখা না করে হঠাৎ মরে যাব—কিন্তু তিনি কথা রাখেননি। এলোমেলো দুর্দান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন এসেনিন, হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বিয়ে করলেন ইসাডোরা ডানকানকে। কিন্তু শিল্পের সৃষ্টি ও মানুষের জীবনকে ধ্বংস করার জন্যই তো ওসব নারীর জন্ম। সারা পৃথিবীকে তখন অকপট সৌন্দর্যের স্পন্দনে কাঁপিয়ে দিয়েছিল যে নারী, তাকে বিয়ে করল এক সাতাশ বছরের কবি। ইসাডোরার বয়স তখন চল্লিশ পার এবং অন্তত চল্লিশ জন পুরুষকে নিভৃতে দেখেছেন। সেই বিবাহবন্ধন টিকে ছিল মাত্র দেড় বছর। এর পর থেকে এসেনিন অবিরাম মদ্যপান শুরু করেন, জীবনযাত্রার সমস্ত নিয়ম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারপর একদিন লেনিনগ্রাডের এক হোটেলে হাতের শিরা কেটে ফেললেন। নিজের হাত থেকে বেরিয়ে আসা ফোয়ারার মতন রক্তধারায় কলম ডুবিয়ে লিখলেন শেষ কবিতা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। তখন কবির বয়স মাত্র ৩০, তখন ১৯২৫ সাল।

এসেনিনের জন্ম ১৮৯৫-তে, বয়েসের হিসেবে তিনি যদিও পাস্তেরনাক বা মায়াকভ্স্কির পরে, কিন্তু এসেনিন যেন রাশিয়ান কবিতার একটি হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়। তখন মায়াকভ্স্কির প্রবল প্রতাপ, এসেনিন তাঁর নেতৃত্ব বা প্রভাব মানতে চাননি, তিনি এজরা পাউন্ড প্রভৃতি ইমেজিস্টদের ধরনের আন্দোলন আনতে চাইলেন রাশিয়ায়। কিন্তু তাঁর মানসিকতা ছিল অন্যরকম, ফলে এই দ্বিধার মধ্যে তাঁর কবিতা যথার্থ মর্যাদা পরবর্তীকালে পায়নি। এসেনিন বর্তমান অনুবাদকের প্রিয় কবি।

এসেনিন ছিলেন চাষার ছেলে, নাগরিকতার সবগুলো বিষ গ্রহণ করেও তিনি গ্রামের শ্যামলতার জন্য চিরদিন উন্মুখ ছিলেন। রুশ বিপ্লবের সময় তিনি সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন এবং শ্রেণীহীন সমাজ ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু দেশের অগ্রগতির জন্য যখন গ্রাম ভেঙে আধুনিক কলকারখানা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি তৈরি শুরু হয়, তখন তিনি অযৌক্তিকভাবে কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য অরণ্য বিনাশ করে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা দরকার, কিন্তু তবুও দু'-একজন কবি থেকে যাবেই যারা ইস্পাতের সমস্ত উপকারিতা ভোগ

করেও সেই লুপ্ত অরণ্যের জন্য শোক করবে। বন্যা বন্ধ করার জন্য নদীতে বাঁধ দিতেই হবে, তবু দু'-একজন কবি নদীর সেই উগ্র, ভয়ংকর রূপ আর দেখতে পাওয়া যাবে না ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেই, তা বলে, এদের প্রগতির বা সভ্যতার শত্রু বলা যাবে না, এরাই 'ধনুকের ছিলা রাখে টান'।]

এফগেনি এফতুশেংকো

[রুশ বিপ্লবের বছর পনেরো পর থেকেই শুরু হয় রাশিয়ার সাহিত্যের সবচেয়ে দুঃসময়ের কাল। সাহিত্যের ওপর আদর্শবাদের জুলুম এসে সৃষ্টিশীল লেখকদের চুপ করিয়ে দেয়। ১৯৪৯ সালে সমস্ত সাহিত্যের গ্রুপগুলোকে জোর করে ভেঙে তৈরি হয় একমাত্র রাষ্ট্রশাসিত 'সোভিয়েট লেখক সমিতি' এবং যেসব রচনায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের স্পষ্ট ছাপ নেই, তা তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হতে থাকে। এই সময়ই আইশাক বাবেল তিক্ত হাস্যে বলেছিলেন, এখন খাঁটি লেখকদের দেখাতে হবে, হিরোইজম অফ সাইলেন্স। ততদিন এসেনিন এবং মায়াকভ্স্কি আত্মহত্যা করেছেন, পাস্তেরনাক ও অখমাতোফা চুপ।

স্টালিনের শিল্প-বিরোধ শাসন ও লাভেন্তি বেরিয়ার পুলিশ চক্র শেষ হলে জেগে ওঠে রাশিয়ার দ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়। এরা বিপ্লব চোখে দেখেনি, বিপ্লবের পরবর্তী দুঃখ ও নিষ্পেষণ সহ্য করেনি, এরা সুসময়ের ফসল ভোগ করছে। সুতরাং শিল্পে সাহিত্যে এরা স্বাধীনতা ও বিশ্ব আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল। এই নবীন দলের প্রধান কবি এফতুশেংকো এবং ভজনেসেনস্কি। ক্রুশ্চফের আমলে পশ্চিমের জানলা কিছুটা খুলে যায়, রুশ সংস্কৃতিদলের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করার সময় এফতুশেংকো রাশিয়ার বাইরে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হন। প্যারিসের একটি পত্রিকায় তাঁর অতিসচেতন আত্মজীবনী ছাপা হতে থাকে।

তরুণ এফতুশেংকোর কবিতা সরল ও ধ্বনিপ্রধান। তাঁর কবিতার বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, হাজার হাজার লোক শুনেছে তাঁর কবিতা পাঠ। তাঁর আবেগ সহজে মর্মভেদ করে। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন, আমি কমিউনিজম জানি না, ভালোবাসা জানি। ইয়ং কমিউনিস্ট লিগ থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল, তাও গ্রাহ্য করেননি।

কিন্তু ক্রুশ্চফকে যতটা উদার মনে করা হয়েছিল, শেষদিকে সে ধারণা তিনি নিজেই ভেঙেছেন। একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ফিলিস্টিনিজম নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। অতিরিক্ত স্বাধীনতার বাড়াবাড়ির জন্য পশ্চিম ভ্রমণের মাঝপথেই এফতুশেংকোকে দেশে ফিরিয়ে এনে ধমকে দেওয়া হয়। ক্ষমা প্রার্থনা করে এফতুশেংকো কমিউনিজম ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানান। তাঁর কবিতা এখনো তারুণ্যের দীপ্তি ও দুঃসাহসময়।]

সীমান্তের বিরুদ্ধে

পৃথিবীর সব সীমান্ত আমায়
বিরক্ত করে।
আমার বিশ্রী লাগে যে আমি কিছুই জানি না
বুয়েনোস এয়ারিস কিংবা নিউ ইয়র্ক
সম্পর্কে।
আমার ইচ্ছে করে এলোমেলোভাবে
ঘুরে বেড়াই লণ্ডনের পথে পথে,
কথা বলি মানুষের সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা
ভাষায়।
বালকের মতন আমার ইচ্ছে হয়
সকালবেলার প্যারিসে
বাসে চড়ে বেড়াতে।
এবং
আমি চাই একটি শিল্প
যা আমারই মতন
পরিবর্তনশীল।

একটি কবিতা

আমি ভিজে মাটির ওপর শুয়ে থাকব
আমার কোদালটাকে জড়িয়ে।
মুখের মধ্যে একটা ঘাসের শিস
টক টক ঘাস।
এই অভিশপ্ত জমিকে খুঁড়তে খুঁড়তে
এত জোরে—যাতে কোদালটা ভেঙে যাবে প্রায়,
ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ব,
কিন্তু ঘুমের প্রশ্নই তো ওঠে না।
'কী?
নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারো না?
দেখো তো ওই ছোট্ট পাখিটাকে!'

আকাশ-নীল ব্লাউজ আর বুট পরা মেয়েটির
কাছ থেকে এই বিদ্রূপ ভেসে আসে।
এবার সে একটা বিরক্তিকর গান শুরু করবে:
'যেদিন পাব প্রিয় তোমায়
  সারা শরীরে নখের দাগ বসাব'—
তার ধূসর রঙা কোদালটা হাওয়ায় ঝলসিয়ে
কানের দুলে ঝুমঝুমে শব্দ করে
সে এইরকম চালিয়ে যাবে—যতক্ষণ না
ছেলেরা গুমরে গুমরে ওঠে।
প্রত্যেকেই হাসবে:
  'সাপিনী একটা!
আংকা, একটু চুপ করতে পারো না!'
শুধু আমি জানি,
আকাশের তারা এবং লেবুর ঝোপ জানে
যখন সে আমার সঙ্গে রাত্রি বেলা অরণ্যে যায়
লেবুর গন্ধময় রাত্রে সে কেমন নিঃশব্দে
হাত দিয়ে ঘাসগুলোকে সরায়
মাতালের মতো অসংবদ্ধ ওর পদক্ষেপ
কী দুর্বল আর অসহায়,
রৌদ্র-তাম্র হাত দু'খানি ঝুলিয়ে
সে আমার সঙ্গে কথা বলে সুন্দর বিভ্রান্ত ভাষায়...।

আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি

স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন

স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন লেগেছে!
সেই হলঘরগুলি
সেই সব রেখাচিত্র, সব
জায়গায় আগুন, মার্জনার চিঠির
মতন, আগুন! আগুন!

লাল-নিতম্ব গোরিলার মতন
ওই উঁচুতে ঘুমন্ত কার্নিশে—
জানলা ভেঙে যায়, গর্জন করছে ঝাঁপিয়ে
পড়ার জন্য, আগুনে!

আমার ফাইনাল পরীক্ষার জন্য
পড়াশুনো করছিলুম, হ্যাঁ, আমাদের
উচিত, আমাদের খাতাপত্র, থিসিস
বাঁচানো! আমার গবেষণাগুলো
এর মধ্যেই ফাটতে শুরু করেছে তালাবন্ধ
সিন্দুকে—
বিরাট একটা কেরোসিনের বোতলের মতন
পাঁচটা গ্রীষ্ম, পাঁচটা শীত
হুস করে জ্বলে উঠল শিখায়
হে আমার মধুর যৌবন
আঃ, আমরা এখন আগুনে পুড়ছি!

পরীক্ষায় টুকলি করার জন্য ছোট ছোট
কাগজে নোট, উৎসব, দল, সব গেল,
যাচ্ছে, এই যে গেল, উঁচুতে উঁচুতে
লকলকে শিখায়—
তুমি ওইখানে রইলে, ট্যাপারির ঝোপে
একটি ছিটে গোলাপি
বিদায়! বিদায়!
বিদায় স্থাপত্য
বিদায় আগুনের শিখায়
শিশু কন্দর্পদের ছোট ছোট গোয়ালঘর
প্রাচীন জমকালো সেভিংস ব্যাঙ্ক, তোমাদের বিদায়
হে যৌবন, হে ফিনিক্স
হে মূর্খ, তোমার সার্টিফিকেটগুলো যে
সব আগুনে পুড়ে গেল!
হে যৌবন, লাল স্কার্টের মধ্যে তোমরা
তোমাদের পেছন দোলাচ্ছ, হে যৌবন
তোমরা বক্‌বক্‌ করে জিভ দোলাচ্ছ—

বিদায়, সীমানার কাল,
মাপজোক, জীবন এই রকম
এক জ্বলন্ত উৎসব থেকে অন্য প্রজ্জ্বলনে
যাতায়াত, আমরা সবাই আগুনের মধ্যে—
তুমি বেঁচে আছ—তুমি আগুনে জ্বলছ,

কোন ঘোরানো কল, কোন স্তম্ভ জেগে উঠবে
এই আগুন থেকে—
ট্রেসিং পেপারের ওপর দিয়ে প্রথম স্কি করার
দাগের মতন ছুটে যাওয়া?

কিন্তু কাল, অশুভ পাখির মতন কিচির মিচির করে,
ভোমরার চেয়ে বেশি রাগী,
এক মুঠো ছাইয়ের মধ্যে দেখা যাবে কম্পাসটাকে
হুল ফোটাবে...

সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,
বাঃ
সবাই এবার বুক ভরে নিশ্বাস নাও।
সব কিছু শেষ?
সব কিছুর শুরু হল
এবার চলো, আমরা
সিনেমা দেখতে যাই!

[রাশিয়ার যে তরুণ কবিকুল সাম্প্রতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তাঁদের মধ্যে ভজনেসেনস্কি কনিষ্ঠতম, এবং এখন সমালোচকদের বিচারে, তিনিই ওই তরুণ দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। এফতুশেংকো নেতা হিসেবে প্রচুর সম্মান ও প্রচার পেয়েছেন কিন্তু শব্দজ্ঞানে ও কবিত্বে ভজনেসেনস্কিই পাঠকদের কাছে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য। তাঁর বয়েস এখন তিরিশ পেরিয়েছে। ১৯৬০ সালে লেখা এই কবিতাটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছে, বহুদিন পর রাশিয়ার কবিতায় আবার দেখা গেল যে অগ্নিকাণ্ডের জয়গান করা হয়েছে, ভাঙন নিয়ে উল্লাস ও ইয়ার্কি করা হয়েছে। শুধু সৃষ্টি, সংগঠন, সংঘবদ্ধতার নামে জয়ধ্বনি তোলা—যা ছিল সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে সরকারি নীতি, তার বাইরে বেরিয়ে এলেন এই যুবা কবিবৃন্দ। যৌবন বয়সের সাহিত্য ভাঙার দিকে যাওয়াই স্বাভাবিকধর্ম— যেকোনও দেশে।]

সংযোজন: অগ্রন্থিত কবিতা

সূচিপত্র

একটা চিঠি

বলাকা, তোমার শুভ্র চোখেতে পায়নি ঘুম?
জানো নাকি এটা কুয়াশায় ঢাকা
রাত নিঝুম!
স্বপ্ন দেখো না? এখনো কি তার
সময় নয়?
বলাকা, তুমি কি পেয়েছ ভয়?
জানো নাকি আমি পথে ঘুরে ঘুরে, দিশে হারা।—
আকাশের মায়া গান গেয়ে করে
গৃহ ছাড়া।
তোমার বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছি আমি
সেই ধ্বনি—
বলাকা এই কি জাগরণী?
মরু পর্বতে ঘূর্ণি ঝড় যে হল শুরু।
আকাশের বুকে মেঘ শিশুদের
গুরু গুরু।
হিংস্র নখর এখনো লুকোয় বাঁকে বাঁকে
সরল কুমারী বোবা চোখে শুধু
চেয়ে থাকে।
সমুদ্র-ঝড় আসেনি এখনও
মনে মনে?
বলাকা-হৃদয় এখনো কি শুধু দিন গোনে?
মন উত্তাল পাখি শুধু ডাকে বোবা যুগে,
ফেরারি বাহিনী বছর কাটায়
উদ্যোগে।
মনের সূর্য তবুও ভাঙবে
অন্ধ ঘোর
বলাকা, তুমি কি দেখোনি ভোর?
হৃদয় জাগানো পরশমণির সন্ধানেই
তাইতো অলস দুপুর যাপনে
শঙ্কা নেই।
স্বপ্ন-সাগরে দিয়েছি নিজেকে
বিসর্জন
বলাকা, তোমার গ্রন্থি হবে না উন্মোচন?

ঈগল পাখি ঝড়েতে উৎসুক।
আসুক ঝড় তবুও আমি ঋজু ৷৷

অন্ধকারে নগ্ন করো তনু
সমুদ্রের মুকুরে দেখো মুখ
হঠাৎ যদি মত্ত তোলপাড়ে
অজানা কোনো কাঁপনে কাঁপে বুক
আমাকে পেতে হয়ো না উন্মুখ।
যদিও ঝড়ে ঈগল উৎসুক
আসুক ঝড় তবুও আমি ঋজু
সমুদ্রের মুকুরে দেখো মুখ!

তিন

রাত্রি, বৃষ্টির মত্ত বৈশাখে চন্দ্রাতপ
স্বপ্ন মনে হয়— স্বপ্ন মনে হয় অরণ্য
নিবিড় বাসনার রূপান্তর বুঝি কলাপিনী।
নিবিড় কুন্তল ছড়ানো, মুখখানি বিস্মৃত—
মাটিতে চোখ ঢেকে ক্লান্ত দিবসের বিরহিণী
করুণ কান্নায় অমন করে কেন বুক ভাঙো!

আকাশে লাখো হাত তুলেছে বৈশাখে অরণ্য
স্বপ্ন মনে হয়, স্বপ্ন মনে হয় অরণ্য।
তোমাকে বিরহিণী একদা মনে হত অরণ্য।

চার

তোমার মহিমা জীবনের মতো মনোলোভা
অয়ি মায়াবিনী ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা
আমার বিশাল জীবন সাজাও প্রতীক্ষায়
অয়ি বিরহিণী ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা।

রবীন্দ্রনাথের তেইশ বছরের শোক

স্পষ্ট দেখা যায় সেই দীর্ঘকায় উজ্জ্বল যুবাকে
ঝকঝকে চোখের রঙ— যাকে দেখে দেবমূর্তি মনে হয়েছিল
নবীন সেনের। পশ্চিমের বারান্দায় স্পষ্ট দেখা যায়
স্তব্ধ তেইশ বছরের সুকুমার ভঙ্গিটির ছবি।
সদর, প্রাঙ্গণ কিংবা সামনের পথের দৃশ্য, মানুষ—
জীবন স্মৃতির কটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে, হে পাঠক, কল্পনার সঙ্গে জুড়ে নিন।

—আমার চোখের জল শিউলি ফুলের মতো ঝরে গেছে আজ ভোরবেলা
কৈশোরে একটি মালা তুমি দিয়েছিলে, তার ফুলগুলি আজ
তোমাকে দিলাম, শুভ্র, চোখের জলের মতো পবিত্র, অম্লান।
কাল সারারাত ভরে রাশি রাশি জোনাকির উৎসব দেখেছি
পথভ্রষ্ট এক বনে,— মনে হল যেন আমি নীল অন্ধকারে
একটি নীলরঙা পাখি খুঁজতে বেরিয়েছি, যে আমার নাম ধরে
একদিন ঘুম ভাঙবার আগে ডেকে উঠেছিল। হে সখি, বিচ্ছেদ,
বলে দাও কার নাম ভালবাসা, মনে পড়ে একটি পতঙ্গের
ডানা ছিঁড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে ছিলাম, একদিন নিতান্ত শৈশবে,
বহুদিন পর এক সন্ধেবেলা সেই কথা মনে ভেবে সহসা দুঃখের
প্লাবনে ডুবেছি আমি। কে সেই দুঃখের দূতী। তুমি নও, তুমি, ভালবাসা?
পদ্মায় অনেক ছবি দেখেছি, প্রবাসে নীলিমায়
সুন্দরের স্তব্ধ গান, একদিন কোন মন্ত্রবলে
বৃক্ষের ভাষায় আমি বৃক্ষদের সাথে কথা বলতে শিখলাম।
কে শেখাল, ভালবাসা, তুমি ভালবাসা?
আমার চেয়েও তুমি মৃত্যুকে অধিক ভালবেসে কূল ছেড়ে
দেশান্তরে, কালান্তরে চলে গেলে, অথবা নতুন খেলা ভেবে
নিজের হৃদয় জ্বেলে, চন্দন কাষ্ঠের মতো শরীর পুড়িয়ে
মায়াবি দুঃখের সাজে আমাকে সাজালে, সর্ব অঙ্গে, চোখে, মুখে
হাতের নখের কোণে, ভুরুতে, কপালে ঠিক জোনাকির মতো
শীতল আগুন এঁকে দিলে।
এখন আমাকে ঘিরে কে রয়েছে, তুমি নও, মনে হয় অন্য একজন
আমি তার স্পর্শ পাই, আমি তার স্বরূপ জানি না।

—আমি শোক, চিনতে পারোনি, আমি যৌবনের প্রথম প্রহরী,
তোমার হৃদয় আমি মুচড়ে ভেঙে টেনে আনব নির্বাসিত দ্বিতীয় যুবাকে

তোমার অযুত মূর্তি চতুর্দিকে, চেয়ে দেখ, উদ্ভাসিত চোখে
মহর্ষি আকাশ তাঁর দক্ষিণ হস্তের বরাভয়
তোমার সম্মুখ দিকে রেখেছেন; দেখ এই বাতাসের স্রোত
কত প্রিয় শব্দ কত প্রিয় গন্ধ নিয়ে যায়, কুহকী সময়
কালো ওড়না ঢাকা দেয় চকিতে প্রেমের শুভ্র মুখে।
আমি শোক, ব্যাধের শবের মতো শোক—
আত্মশুদ্ধ, মহৎ দস্যুর মতো তোমাকেও পোড়াব তীব্র দাহে,
যেন সেই যন্ত্রণার স্রোত, একদিন নানা বর্ণে উৎসারিত হয়, যেন
প্রতিদিন ভালবাসা এবং আমার প্রতি প্রতিশোধ নিতে
তুমি সব ভুলে থাক, সুখ, শান্তি, সচ্ছলতা তৃপ্তির আসব।

সমর সেন

তখন লক্ষ লক্ষ তলোয়ারের মতো রোদ
ঝলসাত কলকাতার আকাশে। যে সমস্ত সৈনিক
পুরুষেরা পানিপথ, হলদিঘাট, ফতেপুর সিক্রির ধুলোয়
স্বেদ আর শোণিত ঝরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাদের
হাতিয়ারের ধারে জ্বলত কলকাতার রোদ উনিশশো
চল্লিশে। পার্কের ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকত সমর সেন।
স্পষ্ট দেখা যায় সেই কিশোর-প্রতিম যুবাকে।
হরিদ্রা-বর্ণের চামড়ার নীচে হাজার বছরের পুরোনো মদের
মতো তীব্র ঝাঁঝালো রক্তস্রোত, হঠাৎ মনে হত একখণ্ড
বাঁকা রোদ হয়তো শুয়ে আছে, স্পষ্ট
দেখা যায় সেই কিশোর-প্রতিম যুবাকে।

কৃপণের মতো সংশয়ী বিশ্বাসে জীবন খুঁটে খুঁটে আনতে পথ চলতি
হাজার মানুষের মধ্য থেকে। তারা কেউ
মানুষ নয়, এক একটি শব্দ, দৃশ্য, এক
একটি কবিতার লাইন যারা আগে কখনও আসেনি
এই রাস্তায়, হাঁটেনি আমাদের অনুভূতির জগতে। ছন্দ
ছুড়ে দিয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের দিকে। তখন ভাবিনি

তুমি নিজেই কোনওদিন
সত্যেন দত্তের মতো নির্ভেজাল মাত্রাবৃত্ত কিংবা ত্রিপদী হয়ে যাবে!

হাতের বাঁকা অক্ষরগুলো সোজা হবার আগেই তুমি
মাতামহের উদাত্ত নিশ্চিন্ততায় প্রত্যহ
আড়াই বোতল আসক্তি পান করে আঙুলের
ডগাগুলো পর্যন্ত ভোঁতা করে ফেললে।
এখন জানুয়ারির শীতে রাশিয়ায় তুষার-ভল্লুকীর পেটের
কাছের উষ্ণতার জন্য ঘুরছ লোভী শৃগালের মতো।
চক্‌চক্ করছে মাথার চুল আর পায়ের জুতোর পালিশ—
ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রপ্ত হয়েছে সেই পর-ভাষা, সুতরাং
সান্ধ্য নিমন্ত্রণে রমণীদের অন্তঃস্থলে ভোঁতা আঙুল বসাবার
আপ্রাণ চেষ্টাই বা মন্দ কী।

এদিকে কলকাতার শো-কেসে তোমার মরা মুখ দেখে প্রত্যহ
আড়চোখে তোমার সহযাত্রীরা। আর কুকুরের লেজের মতো
কুণ্ডলী পাকিয়ে য়ুনিভারসিটির লনে বালক-বালিকারা
কখনও কখনও উচ্ছিষ্ট স্তোক স্তুতি উচ্চারণ করে।

কিছুক্ষণ

যেমন স্বপ্নের মধ্যে তীব্র নীলাকাশ
সময়ের মধ্যে এক সময়হীনতা
যেমন দৃষ্টির মধ্যে দৃশ্য, কিংবা দৃশ্যেরও জন্মের
অন্তরালে চিরন্তন যেমন অমোঘ রহস্যের স্থির রস
মুখোমুখি সৃষ্টি ও পাতাল পরস্পর মুখ দেখে যেমন কৌতুকে
যেমন নিজেরই রক্ত থ্যাঁতলানো মশার পেটে দেখে ঘৃণা হয়
আমি ঠিক সেই রকম এক অনিবার্যতায় পঁচিশ বছরে
ভিজে ঘাসে মুখ ঢেকে শুয়ে আছি পঁচিশ বছরে
কিছু চুরি-করা রত্ন নিপুণ গোপন করে পঁচিশ বছরে
স্বপ্নে লোভে বিপরীত তৃপ্তিতে ঘৃণায় শুয়ে আছি
সময়ের মধ্যে এক সময়হীনতা হাতে নিয়ে।

স্মৃতির অঙ্গার মেখে কে যায় ও গহন সন্ন্যাসী?
মেঘদল ক্ষণে ক্ষণে মত্ত হয় নীলিমা আহারে;
এ-বৎসর কোনো ঋতুভেদ নেই, আজ মনে হয়
বাতাস এ-বৎসর দিক বদলাবে না
শতাব্দীর গ্রীবা মুচড়ে ধরেছে কে নির্লিপ্ত-নিষ্ঠুর?
এ-বৎসর মৌমাছিরা পান করবে শিশিরের জল।

ঘাসের ছায়ায় একটি পিঁপড়ে শুয়ে আছে
দলছাড়া, গতিহীন, এমন নির্জন পিঁপড়ে এর আগে কখনও দেখিনি
রোদ্দুরে অপরিচ্ছন্ন চোখেমুখে বিপুলা পৃথিবী ঘুরে আসি বহুবার
সব দিকে অস্পষ্টতা, আলজিরিয়া, লেবানন, ভারতের কনিষ্ঠ প্রদেশে
সব দিকে অস্পষ্টতা, লুকানো ছুরির ফলা, অস্থির বিশ্বাস, আমি
ঘুরে ঘুরে দেখি,
ঘাসের ডগার নীচে যে বিশুদ্ধ ছায়া
সেখানে শয়ান এই নির্জন পিঁপড়ের মতো আর দৃশ্য নেই।
অনেক বসন্ত ঋতু সমুদ্রের গর্ভের ভিতর
মৃত প্রবালের স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে
আমিও রক্তের মধ্যে অনেক তরঙ্গ, প্রেম, সমুদ্র বিস্তার
গেঁথেছি, তবুও আজ কোনো মায়াদ্বীপ—আমার সম্মুখে নেই...
মায়াদ্বীপ নেই, বিধৃত যৌবনে কোনো মায়াদ্বীপ নেই,
এই কথা ভেবে আমি পৃথিবীর জ্যেষ্ঠতম ভয়ে
চাপা, আর্ত শব্দ করে বহুবার ছুটে গেছি কোনো এক পাখির কাছে
জানুতে লুকিয়ে মুখ, ওষ্ঠ চেপে অরুণ যোনিতে
দুরন্ত পশুর মতো অজ্ঞাত বোধের স্পর্শে কেঁপে
আত্মার আগম পথে অস্ফুটে বলেছি
চলো মায়াদ্বীপে যাই, একবার মায়াদ্বীপে, চলো
এখনি দু'জনে যাই, স্বপ্নের কৃতার্থে যাই, মায়াদ্বীপে, মায়া...

—জানি, একে পলায়নবাদ বলে, যুবাদের বড় প্রিয় পেশা,
এই কথা বলে সেই রমণীটি আমাকে সম্মুখে তুলে ধরে
তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষে হলুদ রুমাল বেঁধে দেয়
আমি তার রূপ দেখি, বিদ্যুল্লেখার মতো রূপ—
আকাশ অদ্ভুত বর্ণ, একটি হলুদ চিল ঘুরে ঘুরে ডাকে।
ভিজে ঘাসে মুখ ঢেকে আজ আমি শুয়ে আছি পঁচিশ বছরে,
পঁচিশ বছর তার অন্তঃস্থিত সময়হীনতা

নিরন্তর স্রোতের নীচে চিরকাল শান্ত নীল জলের মতন
অকস্মাৎ মেলে ধরে; সব কিছু স্বাভাবিক নিয়মে চলেছে জেনে আমি
স্বপ্নে, লোভে, বিপরীত তৃপ্তিতে ঘৃণায় শুয়ে আছি,
মুষ্ঠিতে লুকিয়ে রেখে দুর্লভ শিল্পের পরমায়ু।

আমি কি শিল্পের জন্যে প্রাণ দেব? তবে তো শিল্পের বরতনু
কত পূর্ব-শহিদের রক্ত মেখে বীভৎস, নিষ্ঠুর!
বাণীর মন্দিরে পূজা দিতে এসে যূপকাষ্ঠ কে চায় সাজাতে
কোন মূর্খ অভিমানে, পিপাসায় ধর্না দিয়ে আছে?
কিটসের অমর মৃত্যু লেগে আছে সন্ধ্যার আকাশে।

সহসা বাতাস এসে দেবদারু বৃক্ষটির প্রত্যেকটি পাতায়
কিছু শিহরন রেখে গেল।
একটি আঁধার জাল এখনি আকাশ থেকে রাতচরা পাখিগুলি
সব নিয়ে যাবে।
আকাশ স্বপ্নের মতো তীব্র নীল এ-প্রদোষকালে।

এবার আমিও যাব, দেখা হবে সাতটা পঁচিশে
গাড়ি বারান্দার নীচে, প্রতীক্ষায় আছে সেই নিরবধি নারী
সুপ্ত পূর্বস্মৃতি খুলে শরীরে উত্তাপ এনে নেব
দেশ-কাল-শিল্পবোধ আমাদের কিছুদূর পৌঁছে দিয়ে যাবে
ঈশ্বর নৌকোর হাল হাতে নেবে নরকের খেয়াপার ঘাটে।

—তোমার কপালে কিছু ধুলো লেগে আছে, বলে মেয়েটি একবার
আঁচলের প্রান্ত দিয়ে আমার ললাট মুছে দেবে।

আবর্তন

শোনো, শোনো, বলি, ম্লান সন্ধ্যায় এ কোন মায়ায় তুমি
দিনের তুচ্ছ হাওয়ায় মাতালে নীলান্ত বনভূমি
অথচ তুমিই অনিবার, তুমি তীব্র কৌতূহলে
আকাশ ব্যাপ্ত নীল অরণ্য জ্বালিয়েছ দাবানলে।

দিন ভরা শুধু ছায়ার কাকলি, গত রাত্রির ঘুমে
তোমাকে করেছি নিঃশেষ আমি ভীরু শীত মরশুমে।
তোমার হৃদয়ে কান পেতে শুনি অন্ধকারের স্বর
তোমার আগুনে আমার শরীর মাধুর্যে ভাস্বর।

এ কোন উজ্জীবনের মন্ত্রে আবার আজকে তুমি
আপন রূপের বিভাসে মাতালে বিষণ্ণ বনভূমি।
কী দেবে আমাকে এবার আবার, সৌরভ সত্তার?
মুঠো খুলে শুধু উপহার দিলে একটু অন্ধকার।

অন্য দেশ

হিরণ্ময়, আমরা কাল অন্য এক দেশে চলে যাব
বিবর্ণ ধূসর চোখে তুমি শুধু থাকবে হিরণ্ময়
কয়েকটি যুবক-দস্যু আমরা কাল লাল রক্তে আকাশ ভেজাব
জ্বলন্ত মশাল নিয়ে পোড়াব দিগন্ত আর রাত্রির আশ্রয়!

এক জীবন নিতান্তই ওষ্ঠ উল্টে যাব পার হয়ে
ধুলো উড়বে অশ্বক্ষুরে, ধুলো, ধুলো—পৌরাণিক বিহঙ্গের মতো
ডানায় সূর্যকে ঢাকবে,—সন্ধ্যা এক বারাঙ্গনা কেঁপে উঠবে ভয়ে
অলঙ্কার ছুড়ে ফেলবে মন্দির-চুড়োয় কিংবা জলে ইতস্তত।

তুমিও আমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে এস, হিরণ্ময়,
কী হবে এখানে এই বিবর্ণ, বিস্বাদ, দীর্ঘ দিনে
স্বেদ থেকে সোনা করছ, চোখের জ্যোতিতে তবু কীসের সংশয়
নগরীতে কত লোক আজও কত ক্রীতদাস
নিয়ে যায় নানা দামে কিনে।

তুমি যার কৃপা চাও সে তোমার পৌরুষ-প্রত্যাশী
উঠে এস, হিরণ্ময়, অভিমান-অন্ধ-কূপমণ্ডূকতা থেকে
আমরা সবাই জেনো, মূঢ়তার ছদ্মবেশী-মূর্তি ভালবাসি

সবাই অচেনা থাকি, চিরকাল, তাই ভ্রান্ত নিজ মুখ দেখে।
কাল আমরা চলে যাব আদিম দস্যুর সাজে অন্য এক দেশে
কোন দেশে? যারা জানত তাদের রক্তের স্রোত দেখ ওই
গোধূলিতে মেশে।

স্বপ্নে দেখা জীবন

রূপসী রতির ওষ্ঠে, চক্ষে, ভ্রূ-বিলাসে
পদতলে
কতদিন, কতকাল আমি শুয়ে আছি;
কপিশ রাত্রির চোখ রক্তাক্ত দেহের স্বাদ বড় ভালবাসে
রক্ত জ্বলে
সিংহের মতন ঘোরে অন্ধকার হিংস্র কৌতূহলে।

বিপুল শ্রোণীর ভারে, স্তনের উদ্যত গর্বে, মুক্ত মেখলায়
ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকে দুর্লভ দণ্ডায়মান এই মূর্তিখানি
চিরকাল
আমাকে পায়ের নীচে রেখে হাসে, কুন্তল দোলায়;
খড়্গের মতন জঙ্ঘা, চন্দ্রের মতন ওই নাভি, আমি জানি
নিমেষেই ছিঁড়ে ফেলবে রহস্যের সব অন্তরাল,
মুছে দেবে অন্য সব দৃশ্য, শোভা, আকাশের শান্ত নীল বাণী।

সব গ্রন্থ শেষ হলে, পুরানো গ্রন্থেরই মতো নিসর্গের স্বাদ
যুবক-জিহ্বায় লাগে বড় নষ্ট, বড়ই ধূসর;
মানুষের দিকে ফিরলে চোখে পড়ে মানুষেরই ধ্রুব-পরমাদ!
আত্মার কান্নার মতো দণ্ড-পল-মুহূর্তের শর
চকিত-বিদ্যুৎ সম বুকে বেঁধে, আমি ঘুরে ঢলে পড়ি
সেই পদতলে
সিংহের মতন এসে অন্ধকার শুঁকে যায় হিংস্র কৌতূহলে।

পৃথিবীর শেষতম নির্জনতা মনে হয় রমণী শরীরে

আমি তার স্তন্য, স্বেদ, অশ্রু পান করি,
চক্ষু ঘিরে
লক্ষ লক্ষ ঢেউ ওঠে, ভেঙে যায়, স্বপ্নে দেখা সমুদ্রের তীরে।

তোমার ঘুমের পাশে

তোমার ঘুমের পাশে আমার বিমূর্ত জাগরণ বসে থাকে
তোমার উড়ন্ত চুলে মিশে যায় আমার নিশ্বাস—
হাওয়া নেই, তবু কেন শব্দ আসে, চরাচর নিমেষে কাঁপিয়ে
বিমানের গুরু ধাবমান
শব্দ অকস্মাৎ এসে আমাকে শরীর দেয়—
তোমার ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরা বদলে দেয় রূপের আকার
সব কিছু বড় বেশি মোহময় মনে হয়
তোমার নিদ্রার সঙ্গে আমার বিমূর্ত জাগরণ খেলা করে।

ঝুপসি বটের মাথা ছাড়িয়ে, প্রান্তরময় গ্রাম বাংলায় সুপ্ত
নিশীথিনী অন্তরীক্ষ জুড়ে
বিমানের ধাতু-শব্দ, ঝিল্লি ঐকতায় আর নদীর তরঙ্গে
তার ছায়া
পূর্ব গোলার্ধের যাত্রী সঙ্গিনীর কাঁধে রাখে ঘুমমাখা হাত
স্তনের বোঁটায় ঠিক তিনটি বা চারটে ফোঁটা ঘাম
ক্রয় ক্ষমতার মতো সময়ের তাপ কমে আসে—
আবহাওয়া মুরগি যেন দিকবদলের জন্য ছটফটায়
গির্জার চূড়োয়
তোমার শরীরখানি আর একবার পাশ ফেরে, কপালের চূর্ণ চুলে
আমার নিশ্বাস
স্বপ্নে কাঁপে ঠোঁট—

আমি জানি
তোমার স্বপ্নের সেই বিমানের আরোহিনী,
গ্রাম বাংলার বুক ছেড়ে উড়ে যায়
আমি জানি, তোমার ঘুমের পাশে আমার বিমূর্ত জাগরণ
স্বপ্নকেও দেখতে পায়।

বৃক্ষ-বন্দনা

যে বৃক্ষের সব পুষ্প স্বচ্ছ, চিরলোহিত, উজ্জ্বল,
যে বৃক্ষের পত্ররাজি ঈশ্বরের ইশারায় কাঁপে,
আমার সমস্ত ধ্যান জুড়ে আছে সেই বৃক্ষতল
আমার আত্মার রক্ত ঝরে পড়ে সুস্বাস্থ্য উত্তাপে

সহজ, সহসা-দৃষ্ট সেই মায়াতরুর শিকড়ে;
উত্তর আকাশ থেকে মধ্যযামে তীব্র এক দ্যুতি
কত মুখচ্ছবি, প্রেম, নির্জনতা উদ্ভাসিত করে;—
একদা রূপের তৃষ্ণা, বাসনার করেছি যে স্তুতি

পাপের উল্লাস, দৃপ্ত, কলঙ্কিত জীবনের লোভ
সব কিছু শেষাবধি স্বপ্নের গৌরব সাক্ষ্য রাখে,
আমার মৃত্যুর পর আমার এ বুকের বিক্ষোভ
যেন এই কল্পবৃক্ষে চিরকাল বিদ্যমান থাকে।

লোভ এবং নির্জনতা

অন্ধকারে ঝলসে ওঠে হিরের ছুরির মতো লোভ
রূপসী স্মৃতির মূর্তি অদৃশ্যে ডেকেছে স্নিগ্ধ স্বরে
হে অভিজ্ঞ দুঃখ, এসো, শান্ত করো বুকের বিক্ষোভ
মুগ্ধা ডাকিনীর গান ভেসে আসে সমুদ্রের থেকে
এই ভাঙা ছোট ঘরে

হস্ত পদ দৃঢ় বদ্ধ, তবু লোভ,—তবু লোভ দুঃসাহসী
ইঁদুরের মতো
ঠুকরে খায় দুই চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, রক্তে লাগে লবণ বাতাস
পৃথিবীর সব যুবকের স্বপ্ন মনে হয়, নিশ্চিত বুকের অন্তর্গত-
অন্ধকারে ফুটে ওঠা হলুদ রঙের দীর্ঘশ্বাস।

সারা রাত খণ্ড, লঘু বাতাসেরা খেলা করে আমার শিয়রে
বিস্মৃতি চাই না আমি ঘৃণা করি সময়ের সামরিক সাজ
যদিও অনেক দিন নির্বাসিত আছি আমি অন্তর গহ্বরে
জানি, যাকে আয়ু বলি, তার অন্য এক রূপ বিপক্ষের
দক্ষ তীরন্দাজ।

রমণীরা গূঢ় হাসে, কৃত্রিম ঝরনার শব্দে তাদের মত্ততা
পাখির নখের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তারা সব সুখ বিঁধে রাখে
আমি লোভে ছিন্ন ভিন্ন—তবু যেন দৃষ্টির অতীত নির্জনতা
নিশি বিহঙ্গের মতো দূর থেকে ডাক দেয় আমার আত্মাকে।

জেগে আছ?

হাওয়া এসে ডেকে বলে, নিশীথ কুসুম, জেগে আছ?
ঘুঁটে কুড়ুনির আত্মা নিবন্ত চুল্লির কাছে প্রশ্ন করে, জেগে আছ?
নদীর এপারে গাছ ওপারের শকুনিকে বলে, জেগে আছ?
তরাই জঙ্গল থেকে কেরালায় ধ্বনি যায়, জেগে আছ?
ত্রিস্তান, ত্রিস্তান, আমি সোনালি ইসল্ট, তুমি জেগে আছ?
ব্যাকুল কৈশোর থেকে মধ্যজীবনের দিকে হাহাকার ভেসে আসে,
জেগে আছ?
জানলার ঝিল্লিতে স্বপ্ন থমকে থেকে ডাকে, জেগে আছ?
ঘুমন্ত স্তনের পাশে ভেজা ঠোঁট ফিসফিসোয়, জেগে আছ?
ভূমধ্যসাগর থেকে তারবার্তা ছুটে যায়, জেগে আছ?
প্রতিটি ব্যর্থতা তার নিজস্ব প্রস্থান-পথে বলে যায়, জেগে আছ?

রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা

ট্রেন এলে চলে যাব, ততক্ষণ চেয়ে দেখি প্রজাপুঞ্জ সহ এই সম্রাট আকাশ
অলীক মূর্তির মতো কয়েকটি মনুষ্য বিন্দু ঘুরছে ফিরছে প্লাটফর্মে, লাইনের উপরে
আমার বন্ধুটি পাশে সিগারেট ঠোঁটে চেপে ছুটি-শেষ-করা এক ঘন দীর্ঘশ্বাস
ধোঁয়ায় মিশিয়ে ছুড়ল আমার চোখের দিকে, রামগড়ে, বাতাসের প্রতি স্তরে স্তরে।

কলকাতায় ফিরে যাবে সহস্র সুতোয় বাঁধা কীর্তিমান সুদর্শন ছিম-ছাম যুবক
ট্যাক্সিতে সময় মাপবে, অনেক সন্ধ্যাকে খুন করবে নানা রেস্তোরাঁয়, এরোড্রামে, ভিড়ে
শনিবার তাস খেলবে, ঘরভরা অট্টহাসে টেনে নেবে বন্ধুদের চোখের চুম্বক
সুখের নানান সুর এঁকে রাখবে ওষ্ঠে, চোখে, দ্যুতিমগ্ন যৌবনের বুক চিরে চিরে।

এখন সে অকস্মাৎ চেয়ে দেখল রামগড়ের যুবতী-প্রতিম এই সায়াহ্নের দিকে
কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ আমাকে বলল কেঁপে উঠে যেন এক অন্য কণ্ঠস্বরে
'আশ্চর্য, আশ্চর্য, দেখ!' সবলে আমার হাত ধরে রেখে চেয়ে রইল, তীব্র নির্নিমিখে
অশ্রুর বিন্দুর মতো শীতের করুণ রৌদ্র তখন বিরলে ঝরছে পর্বত শিখরে।

গ্রিসীয় মূর্তির মতো রূপবান, বস্তুনিষ্ঠ, আবেগ-অগ্রাহ্য-করা আমার বন্ধুকে
সেই একবার শুধু নিতান্ত সামান্য, ক্ষুদ্র, পটভূমিকার পাশে মূঢ়, অসহায়
সংগীতে দেখেছি আমি।—'সুনন্দ, ট্রেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?' তৎক্ষণাৎ আমি তার বুকে
প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে বলে উঠে, লঘু হেসে, চৈতন্য এনেছি সেই মায়াবি সন্ধ্যায়।

মৃত্যু

কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি, কখনো মানুষ নই, তবুও সন্ধ্যায়
ব্রিজের অনেক নীচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ...
ব্রিজের খিলান ধরে ঝুঁকে থেকে মনে হয় অবিকল মানুষেরই মতো
মানুষের জল দেখা, জলের মানুষ দেখা, পরস্পর মুখ;
মানুষ দেখেছে জল বহুদিন, মানুষ দেখেছে অশ্রুজল

মানুষ দেখেছে মুখ অশ্রুভেজা ব্রিজের অনেক নীচে হিম কালো জলে
কালো জল বহু ঊর্ধ্বে দেখেছে কান্নায় সিক্ত গোপন কঠিন মুখ
মানুষের মতো
আসমুদ্র দয়াপ্রার্থী আবার বৃষ্টির কাছে অতি পলাতক
কখনো নিথর জলে স্পষ্ট মুখ, কখনো তরঙ্গে ভাঙা হীন-মানবীয়।

জলের কিনারে এলে জলের ভিতরে যাওয়া, জলের ভিতরে
মানুষ যখনই যায় একা, তার অলঙ্ঘ্য শরীর
মাতৃগর্ভবাস যেন অগোপন, অথবা না হোক একা, বন্ধু ও সঙ্গিনী
অদূরেই জলযুদ্ধে, একটিবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর উরুর জোড়, খোলা স্তন কী রকম আশ্চর্য সরল...
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো, সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যেরকম মানুষের হাত
জলের ভিতর গিয়ে নিজের শরীরটাকে চিনে নেয়, জলের ভিতরে
সহাস্যে পেচ্ছাপ করে লজ্জাহীন, বাতাসের মতো জল পরাগ ছড়ায়।

কখনও মানুষ সেজে বিয়ার-বাস্কেট নিয়ে বসেছি নারীর
কাছাকাছি সিন্ধুতটে সন্ধেবেলা, জ্যোৎস্না ভাঙে লাবণ্য হাওয়ায়...
আকাশে অসংখ্য ছিদ্র, ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বলে ফসফরাস, দেখেছিল মুখ
অথবা ঢেউয়ের দল মানুষের মুখ চেয়ে সার বেঁধে আসো
এমন উজ্জ্বল জল, মানুষের মুখ দেখা যেন তার আশৈশব সাধ!

মানুষের ছদ্মবেশে আছি তাই চোখে আসে অশ্রু,
মুখ ঢাকি!

উৎপাত উপলক্ষে গদ্য রচনা

ভেবেছিলাম কোনোদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব না
মরে যাব এই ভেবে নয়
মানুষকে মারতে হবে এই ভেবে—
একটা পিঁপড়েকে মারার পাপস্খালন একজীবনে হয় না।
আমার দিকে কেন বন্দুক তুলেছিল বেল্লিক?

কতদিন পর এই হিমালয়ের স্তব্ধতাকে হত্যা?
তীব্র ভালোবাসা বড় তীব্রতম ঘৃণা হতে পারে।
আমি ভালোবাসায় দীর্ঘ হতে চেয়েছিলাম
আমি ভালোবাসা চেয়েছিলাম স্ত্রীলোকের, বালকের,
জননীর, অচেনা মানুষের;
চেয়েছিলাম ন্যাশপাতির, জ্যোৎস্নার, নিস্তব্ধতার—
জানি না মানুষ মেরে কার জন্য কিসে সাম্যবাদ।

জীবনে প্রথমবার প্লেনে চেপে সীমান্তের দিকে চলে যাবো
এ শীতে দাঁতের বাজনা থেমে যাবে কামানে রাইফেলে
লোভী, পীত সিঁধেলের মাথায় চালাব রাগী বুলেট
রক্ত, ঘিলু, থ্যাঁতা মাংস ছিটকে পড়বে পাহাড়ের ওপারে
উল্লাসে হো-হো করে বাড়ি ফিরে বলব:
জয়ী আমি আজ।
আমার বুক থেকে ভালোবাসা মুছে এমন ভয়ংকর ক্রোধ
জাগিয়ে তোলার জন্য, অতীতের কবিতা ছবির দেশ চিন,
তোমাকে আবার কবে ক্ষমা করতে পারব জানি না।

চরিত্রের অভিধান

ভূতগ্রস্ত

ডাক্তার জ্যোতিষ মতে অশ্লেষা মঘায় চাপে গাড়ি
বসন্তের টিকা নেয় বশংবদ শীতলা পূজারী
আদার ব্যবসা ফেঁদে কলিমুদ্দি শেখ বানিয়েছে
জাহাজ মার্কা এক বাড়ি
অন্ধকারে চোখ ঢেকে শেষে আমরাও
দিনের বেলার ভূত হয়ে যেতে পারি।

কুমারী

চুম্বনের বাসনা নিয়ে প্রতিক্ষণ ঘোরে
সকলে ওরা স্বপ্নে বেঁচে আছে,
এমন লঘু দু' পায়ে ওরা কোথায় যায়
কোন স্রোতের তোড়ে
কোন পাহাড়ে, কোন মেঘের কাছে!
প্রতি মুখের উজ্জ্বলতায়, অভিমানিনী স্তনে
স্পর্শ পাবার তীব্র দুঃখ, গোপন লজ্জা,
স্বপ্নে ভরে নেবে
প্রতিটি নিশ্বাস, কান্না, সুখের স্বাদ;
স্বচ্ছ চোখে, মনে
সময় ওদের চিরস্থায়ী চুম্বনের চিহ্ন এঁকে দেবে।

প্রেমিক

চোখে চোখ রাখো, বাহুতে শয়ান বাহু
ধমনী শোনায় দুই হৃৎস্পন্দন
মুখচন্দ্রিমা গ্রাসে ওষ্ঠের রাহু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়;
স্মৃতি যেন পায় রক্তবীজের আয়ু
পান করো এই দেহের তীব্র অমিয়।

প্রতিপক্ষ

রোদ্দুরে বৃষ্টির স্বাদ ওই লোকটা বেশি পেয়েছিল,
ওই লোকটা বুক ভরে আজীবন নিশ্বাস নিয়েছে
পবিত্র ঘুমের স্বাদ, সমস্ত স্বপ্নের স্বর্গ, স্বচ্ছ জীবনের
সব উপভোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে
একলা ওই লোকটা গেল বেঁচে।

বারাঙ্গনা

ঘুমোবার আগে রোজ হৃৎপিণ্ড ধুয়ে মুছে
যত্নে তুলে রেখো
গোপন সিন্দুকে
এবং চাবির গোছা ছুড়ে দিও স্বর্গের দরজায়।

লেখক

অত্যন্ত কুটিল চোখ, বক্র নখে চিরে দেয় জীবনের পবিত্র স্বরূপ
যুগপৎ সাধু ও ঠক, অহংকারী, ঋদ্ধিমান, কভু কাপুরুষ
অবিরাম স্মৃতিক্ষয়ে ক্ষীণজীবী, দুর্গন্ধ দূষিত জলাশয়ে
দপ করে জ্বলে ওঠা আলেয়ার মতো ঠিক ওদের হৃদয়।

কোটিতে কয়েকটি মাত্র এই আত্মা, এক দেশে এক শতাব্দীতে।
বাকি সব ভাণমূর্তি, জনপ্রিয়, দুর্মূল্য কাগজে ঢালে কালি
অথবা খানিকটা দূর পৌঁছে গিয়ে দুরারোগ্য বেরিবেরি রোগে
পা দুখানা ভারী করে স্থির হয়, নতুবা নিজেরই গলা কাটে
ওদের লেখার মধ্যে সপ্-সপ্ ঝোল-টানার শব্দ শোনা যায়।

বন্ধু

দু'জনেই একমত হলে—রক্তে তীক্ষ্ণ হুল ফোটে
যেন কোনো ভয়ংকর খাদের কিনারে এসে
প্রতিযোগিতায় হাঁটা হয়;
কেউ কারো বিপদে, শোকে, অনটনে হৃদয় পোড়াবে
এর নামও সৌহার্দ্য বা সখ্য ঠিক নয়,
মানুষের জন্য এ তো মানুষের সামান্য পদবি!
অস্তিত্বে উত্তাপ দিও, কিন্তু কারও আত্মা ছুঁয়ে
উচ্ছিষ্ট করো না।

আত্মঘাতী

সমস্ত দরজা খোলা, এ পৃথিবী মুক্ত অবারিত
বার বার ঝাপটা মারে নীল শূন্য, স্বপ্নের দেবতা
স্থানু বৃক্ষদল যেন আশীর্বাদ-ভঙ্গিতে ধ্বনিত
রাত্রি আনে গাঢ় শস্য, শুদ্ধ নীরবতা।
এ পৃথিবী যেন বড় বেশি আছে, অপর্যাপ্ত,
বড় ক্লান্তিকর—
এই কথা ভেবে কেউ, আত্মাকে মুষ্টিতে ধরে
হতে চায় নিজের ঈশ্বর।

রাজনৈতিক

ওদের সবার জন্য একটি পৃথক ভূমি খুঁজে দিতে হবে
বাচাল বুড়োর দল ছেলেখেলা নিয়ে মত্ত
থাকবে সেইখানে।
সব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আণবিক, অতি দানবিক
ক্রেমলিন-লন্ডন-রোম-পিকিং-প্যারিস-সাদাবাড়ি
ওই যে অদ্ভুত মুখ, উত্তেজিত ক্ষীণমুষ্টি চোখ সারি সারি
ওরা নিজেদের জন্য তিন হাত মাটি খুঁড়ে নিক।

হীনম্মন্য

বুকের পাঁজর খুলে দয়িতাকে দিলে
এ পৃথিবী বলবে, লোকটা কী নির্বোধ দেখ—
মানুষের হাড় পাঁজরা ভেদ করে হানো দীপ্ত ছুরি
এ পৃথিবী বলবে, লোকটা কী নির্বোধ দেখ!

রূপসী

কোথায় তোমার রূপ, গ্রীবায় বা চক্ষের মণিতে
অথবা স্তন-কোরকে, উন্মুক্ত জঙ্ঘায়, ঠিক জানি না।

কে আছে হেন পুরুষ, এক শরীরের রূপ দেখে নিতে পারে
নিতান্ত এক-জীবনে, মর-চক্ষে?
কেউ পারে না জানি।

অসতী দর্পিতা হলে রূপ আসে, স্ফুরিত অধরে
ঝলসায় মিথ্যে প্রেম, মোহিনী ভ্রূভঙ্গে
লোভ রতি প্রবঞ্চনা নরকের আহ্বান ফোটালে
রমণীরা কিছুক্ষণ আকর্ষণযোগ্য হতে পারে।

পাপী

বাতাসে বিষণ্ণ চোখ, মুখ ভাসে হিম নীলিমায়
কেন প্রাকৃতিক দুঃখে মূঢ় আর্তনাদ?
মন্দিরে ঘণ্টা বাজাও। অস্থিতে মজ্জায়
কেন এত আবর্জনা? পূর্ণিমার চাঁদ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে আসে চামচিকে, তোমারও বিষাদ
যেন প্রতিমার মতো লাবণ্যের গোপন সজ্জায়
সাজায় বিশুদ্ধ শোক, এ জীবন ধারণের গূঢ় অপরাধ,
রক্তে অন্তর্গত পাপ, যেন প্রতি মুহূর্তকে স্বাগত জানায়।

সম্পাদক

ধীমান ও পরিশ্রমী, চোখে হয়তো গোল চশমা আঁটা
মুখে মাকড়সার জাল, ক্ষীণদেহ, অভিব্যক্তিহীন ওষ্ঠে বড় সদালাপী
সকলেরই প্রীতি কিংবা স্নেহ কিংবা শ্রদ্ধার আস্পদ।

কেউ ঘন ঘন এসে বন্ধুত্ব ও প্রণয় জানাবে
কেউ নববর্ষে কিংবা বিজয়ায় পদধূলি শিরে নিয়ে যাবে
অথবা, 'আমার বিয়ে', 'ছেলেটার মুখে ভাত', 'জন্মদিনে', 'সাহিত্যসভায়'
'আপনি না হাজির থাকলে কিছুতেই সম্পন্ন হবে না।'

ঈষৎ প্রবীণ দল বলবেন, শোনো হে অমুক,
এ রচনা লেখামাত্র তোমাকেই পড়াতে এলাম
তুমি ছাড়া কে বা বুঝবে সাহিত্যের গূঢ় সমাচার,
একমাত্র, লেখার পর, তোমাকেই পড়িয়ে তৃপ্তি পাই।

মৃত্যুর দ্বিতীয় মাসে অনেকেই কিন্তু তার নাম ভুলে যাবে।

কলকাতা ১৯৬৬

বসিরহাট থেকে এসেছে ভানু মণ্ডল মানিকতলায়
সঙ্গে দুটি পুঁটুলি আর বেঁটে বউটি
বাচ্চা দুটো কোলে কাঁখালে, বউটি ঘোমটা খুলে তাকালে
দুপুরবেলার মানিকতলা হা হা শব্দে জ্বলে উঠল।

আমতা থেকে ছোট লাইনে পথ এল বাঁয়ে ডাইনে
দুই মেয়ে তার দুটোই সর্বনাশী
ভাতার পুত খেয়েও তাদের আশ মেটেনি পোড়ারমুখি
এখনও খিদে, পেটের মধ্যে চোখের মধ্যে অমন খিদে
খা না, আমার মাথা খা না! পদ্মর মুখ হাঁড়িপানা
কপালে দুই শিরা ফুলল, নাকের সিঁধে
হাওড়া ইস্টিশানে এসে থামল ট্রেনের হাজার চাকা
অমনি টিকিটবাবু এসে বলল, টাকা?
না পারিস তো নেহাৎ একটা আধুলি দে!

দমদম এয়ারপোর্টে নামলেন মি. কানিংহাম আর সুজি
ঝোপ কামিজ আর প্রজাপতি শার্ট, সুজির বুকে একটা নয়
তিনটে ক্যামেরা
ট্যাক্সি! হপ ইন! হিয়ার উই গো
আঃ, চমৎকার, তাই না? পাতার রং লাল নয় কিন্তু
শরতের আকাশ কি নীল?
দিস ইজ দা মোস্ট সিনফুল সিটি ইন দি ইস্ট অব আডেন
তা হোক, আকাশের কোনো পাপ নেই

আমরা আকাশ দিয়ে উড়ে এসেছি!
কোথাও বিপদ নেই, তবুও সাইরেন তার নিজস্ব চিন্তার মতো বেজে ওঠে
শনিবার ঘুম ভেঙে সংবাদপত্রের থেকে চোখ তুলে
সাইরেনের শব্দ শুনি
ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম নেই
শব্দ থেমে গেলে তবু শব্দ আছে
আমি ঠান্ডা চায়ে ফের ঠোঁট রেখে
চোখ রাখি পৃথিবীর সুখে ও অসুখে
মুখে কোনো রেখা নেই, কেননা মুখের কাছে অপর মুখের
কোনো ভাষা নেই...

বাধা

কথা বলতে এসো না, আমি থুতুর গন্ধ সইতে পারি না
কালো জিভ দিয়ে লাল নাকগুলো চেটে নাও
ভুরু বেঁকালেই মনে হয় পা ছড়িয়ে বসে আছ
আমি তোমাদের সমস্ত দরজা দেখতে পাই।
আমি একা বসেছিলাম তোমরা এলে তিনজন শাড়ি ও একটি স্কুল ফ্রক
ঠান্ডা গলায় মাত্র জিজ্ঞেস করলুম ভালো আছ? তোমরা
বললে পৃথিবীতে কেউ ভালো নেই আজ আর, কেন
যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা আর তোমরা—একথা আমি
বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু মনে পড়ল মনে পড়ল মনে পড়ল
মনে, আমি আমি আমি
গভীর অরণ্যের মধ্যে তোমাদের হাতের গুচ্ছ ধরে স্বর্গে
নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, আমি তোমাদের চোখের
জলে অনেক সকালবেলা মুখ প্রক্ষালন করেছি আমি
তোমাদের, তোমাদের, তোমাদের, তোমাদের, আমি
ঠান্ডা মাটির মধ্যে ছ'মাস ঘুমিয়ে ছিলাম
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্তব্ধতা চুপ করে ছিল
আমার ছায়া বহুমূল্যে বিক্রী হয়ে গেল, আমি অসংখ্য
উত্তর পেলাম। আমি আর
তোমাদের বাদ দিয়েও একা নই।

নির্বাসন

বারবার ভেঙে যায় নীল শঙ্খ, সমস্ত দৃশ্যের মূল বিভা
অন্তহীন ধ্বনি ওঠে তীব্র কণ্ঠে না না না না না না
না ক্ষোভ, না স্মৃতি, তৃপ্তি, না প্রেমের অমর প্রতিভা
বারবার মুছে যায় রক্তের ধারক এই শরীরের কৃতার্থ সীমানা।

কী বিদ্রোহে মত্ত আছি মন্ত্রজিহ্বসম নির্বিকার সিদ্ধ সাজে
আলো কিংবা অন্ধকার সমার্থক এক বর্ণে কেঁপে কেঁপে ওঠে
একটি সূর্যমুখী ফুল ঝরে গেলে লক্ষ বৎসরের দুঃখ বাজে
স্বয়ং সূর্যেরও ঘুম কখনও বা মুছে যায় অভিমান, মেঘের সংকটে।

আমার দুঃখেরা আজ দেবতার আসনে বসেছে, অমলিন
রৌদ্রের পার্থিব চিহ্ন কে তাদের মসৃণ ললাটে, ভ্রূ সন্ধিতে
এঁকে দিয়ে গেছে, আমি, শৃঙ্খল আবদ্ধ নতজানু, কীর্তিহীন
দণ্ডিতের মতো বসে আছি, কোনও অনির্দিষ্ট দূর রাজ্যে নির্বাসন দিতে

এসেছে প্রহরীবৃন্দ, কোথাও বাজে না ক্ষীণ প্রতিবাদধ্বনি
যেদিকে তাকাই শুধু ভ্রান্তি, প্রৌঢ়, হিম, ক্লান্তি, অমোঘ শূন্যতা
ধূলায় লুণ্ঠিত নেই আকুল মূর্ধজা কোনও রোদসী রমণী
সন্ধ্যার করুণ রশ্মি নেমে আসে, যেন কাঁপে লক্ষ দ্রাক্ষালতা!

অবিশ্বাস, অতৃপ্তির, অপ্রেমের শুদ্ধ অন্ধকারে ডুবে থেকে
আমার বিদ্রোহী আত্মা জেগে উঠবে শিল্পের উজ্জ্বল অভিষেকে।

অতীত কিশোরী

কোথায় লুকাবে মুখ কোন নিঃস্ব হৃদয় গভীরে
কোথায় মেলাবে তুমি দৃষ্টিভ্রান্ত বিক্ষত হৃদয়
যতবার তুমি চাও মেঘ ভাঙা রৌদ্রের বিভাস
সন্ধ্যার সন্ধানী হাত খুঁজে আনে রাত্রির সংশয়

কত মৃদু মুহূর্তের প্রতীক্ষায় শান্ত সিন্ধু তীরে
ক্লান্তিহীন ঢেউ গোনা, তারপর ঘুমের বিষাদ
ছুঁয়ে গেছে তোমারই তো পদ্মচোখে শতদল সাধ
বাতাসে আভাস নেই, সময়ের বিষণ্ণ বাগান।

পৃথিবীর মুগ্ধ বাহু তুচ্ছ করে কঠিন স্পর্ধায়
আপন স্বরূপ তুমি চিনে নাও রূপসী পার্থিবা
সন্ধ্যার সন্ধানী হাত খুঁজে আনে রাত্রির সংশয়
অন্ধকার মুছে দিয়ে মুক্ত করো আলোর প্রতিভা
অথচ জানো না তুমি শরীরের মধুর দ্বিধায়
কী এক আশ্চর্য গানে অজানিতে হৃদয় মুখর
ছদ্মবেশে তবু ছিলে প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে নির্ভয়
জানো না কখন এসে ছুঁয়ে গেছে কঠিন সময় ॥

প্রতীক্ষার পর

প্রতীক্ষায় আয়ু বাড়ে, পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায়
জন্ম নিল বাংলাদেশ
তুমি চিরজীবী হও!
অশ্রু ও রক্তের কথা আমি জানি
প্রান্তরে নদীর ধারে পড়ে আছে সংখ্যাহীন
মানুষের হাড়
ভস্মীভূত গৃহ সারি, তাল গাছে সাক্ষী আছে
বুলেটের দাগ
পাখিরাও উদ্বাস্তু হয়েছে।
অশ্রুজলে ভেজা মাটি এখন উর্বর
রক্তপাতে লেখা হয়ে গেল
অমর দলিল
এই দেশ চিরজীবী হোক,
প্রতীক্ষায় আয়ু বাড়ে, পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায়
দেখেছি বাংলার মুখ—

এই ছবি কখনও মুছবে না
সর্ষে ও শুঁটির ক্ষেতে প্রাণবন্ত কোলাহল
নদীর ওপারে কেউ ডেকে ওঠে
প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে যায়
আমার জন্যও একটি ডাক আছে
হাত তুলে বলে উঠি, এই যে, এখানে—
তুমি যতদিন আছ, আমিও এদিকে আছি
তোমার ও রূপের পূজারী।

চলো যাই

সারাদিন রেডিয়োতে কান
মন প্রাণ জুড়ে আছে গোটা বাংলাদেশ
ইচ্ছে হয় আমিও যাই
পুরনো বন্ধুবান্ধবদের পাশে দাঁড়াই
সেই সব চেনা নদী-বিলের
আনাচে কানাচে
শত্রুকে যুযুৎসু মেরে
নিশ্বাস নিই স্বাধীন বাতাসে
যেখানে জন্মেছিলাম, এখন সেখানে
প্রাণ দিতেও পারি
চলো যাই...

সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশে

সময় একবারই আসে
এবার সে ফিরে যাবে না
মানুষ মরছে, কোটি কোটি মানুষ
জেগে উঠছে বাংলাদেশে

ভিতু, জ্বরো রুগির মতন
শত্রুর মুখে এখন চিৎকার, প্রলাপ
কামান বন্দুককে উপহাস করে
এগিয়ে যাচ্ছে মুক্তিসেনানী
মূর্খ জল্লাদ, এবার ভাগো!
জেগে উঠেছে বাংলাদেশ
সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশে
আমরাও আছি
আমরাও ওদের পাশে দাঁড়াব
কিছুদিনের জন্য কলম ফেলে রেখে
তুলে নেব তলোয়ার—

বাদলা পোকা

মেয়েটি শয্যায় শুয়ে, পুরুষটি দরজায় দাঁড়ানো।

জানলায় নীল পর্দা, নীল আলো এক চক্ষু জ্বলে
একটি বাদলা পোকা আলোর চৌদিকে ঘোরে বিকারের ঘোরে
মেয়েটি শয্যায় শুয়ে, পুরুষটি দরজায় দাঁড়ানো।

আলোকে রমণী বলে, পোকাটাকে প্রেম নামে ডেকে
কবির পরম শান্তি, আকাশে বিশাল
যৌবনের দুর্নিবার স্পর্ধার নিশান আর ছন্দে মিলে বাঁধা
কাব্যের পরমা—ক্লান্তি, স্মৃতির শয্যায়।

মেয়েটি শয্যায় শুয়ে পুরুষটি দরজায় দাঁড়ানো।

যে আধারে সন্তানের দুধ জমা হবে
মেয়েটির সেই দুই সোনার কলসে ডাকে সমুদ্র-বাতাস
এক বাহু উপাধান, আর এক হাতে যোনি ঢেকে
রূপসী আচ্ছন্ন হাসি স্তরে স্তরে ছড়াল সে ঘরে

সমস্ত শরীর ভরে রেখার নিপুণ কারুকাজ
আর তার দৃঢ় শুভ্র উরুযুগে দুটি চক্ষু আঁকা...

বাদলা পোকার মৃত্যু হাহাকারে ভরে দেয় মন
আলোকে হৃদয় বলে; পোকাটাকে লোভ নামে ডেকে
কবির পরম শান্তি;
কী লাভ অনর্থক বাদলা পোকায়?
নীল আলো নিভে গেল উরু থেকে দুই চক্ষু মুছে।

সুন্দরবন ভ্রমণ

সুন্দরবন থেকে ফিরলে, বাঘ দেখেছ?
দেখিনি
বাঘ আমাদের দেখেছে!
নদীতে কী কী মাছ পেলে?
সব মাছ সেদিন ছুটি নিয়েছিল
জঙ্গলে ছিল গাছেদের নিজস্ব পিকনিক।
ঝড় বৃষ্টি হয়নি?
বাতাসের তো সেদিন বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা
আকাশ ঢাকা ছিল হলুদ পর্দায়—
তা হলে কী দেখলে শেষ পর্যন্ত?
সোনাবিবি আর রূপোবিবির হাসি-কান্না
তার মানে?
যেমন সব তরঙ্গেরই মানে আছে
যেমন সব বাঁশের সাঁকোর দুলুনিরই মানে আছে
যেমন নৌকোর দুটো চোখ...

তবুও আনন্দে আছি

তবুও আনন্দে আছি, সকালের চায়ের সঙ্গে ডিম সেদ্ধ খেয়ে বেশ
মজে আছি
মাসমাইনের কথা মনে পড়লে চুম্বনের স্বাদ পাই,
ফুল ফোটার দৃশ্য দেখে মনে হয় মেয়েরা ফুলের মতো,
কাগজ ফরফর শব্দে উড়ে যায়...

নিউজ প্রিন্টের গন্ধ
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা ষাট পয়েন্ট ডি সি
ভিয়েৎনাম বোল্ড বক্স
মহাপুরুষের কোলাহল, বিশ্ব সুন্দরীরা চারকলম
খাদ্যাভাব জ্বলন্ত লিডার
সামিল কবিতায়, লেখা আজকের বাজারদর
সার কারখানার কথা সার বুঝে নিয়েছে জাপান
মহাশূন্য ও আসামের বন্যার
খবর, এস সি লাডলো
ডট, স্টার, স্পেস
স্পেস—
বর্জাইস দুঃখ
মানুষ চিরকাল অনৈতিহাসিক, মানুষ নীরব
আমি শুনতে পাই বাইরে কলকাতার কলরব।

লক্ষ্মীকান্তপুরের লক্ষ্মী খিদিরপুরে ঘোরে একলা
ছাপরা জেলার রামভরোসা ছবক্কু শিংকে খুঁজে পেয়েছে
ডালহৌসিতে
গয়াজিলার আদমি এল ভবানীপুরের গয়া জেলায়
কটক থেকে তিনটি কটক সটকে এল কাঁটাপুকুরে
গুজরাতের ছিপিওয়ালা পেয়ে গিয়েছে সোডা-বটল ধর্মতলায়
জবরদস্ত রাজস্থানি কলুটোলায় ঘোরায় ঘানি
সর্দারজি বাঁয়ে ঘুমকে হঠাৎ এসে দেখে থমকে
দাড়ি কামানো আরেকজনের খবরদারি
বাড়ি কোথায়? ফরিদপুর? চলেন তবে যাদবপুর!

সামান্য

আমি তার মুখ চেয়ে সময়ের শূন্যতাকে খুঁজি
যে হেতু আমিও নিঃস্ব, প্রাচুর্যের ভিড়ে
প্রত্যহের দীনতায় ক্ষয়ে যায় সামান্য যা পুঁজি
অন্ধকার খনি গর্ভে শুধু জ্বলে প্রার্থনার হিরে।

স্রোতের ফুলের মতো আকাঙ্ক্ষার ক্ষুর
সারাদিন শত কাজে বারে বারে ছুঁয়ে যায় প্রাণ
যদিও স্মরণে তার মূল নেই, একান্ত সুদূর
যে ফুল শুকিয়ে গেছে, যেন তার ভুলে যাওয়া ঘ্রাণ।

আমি তার মুখ চেয়ে সময়ের শূন্যতাকে খুঁজি
আমি তার দুই চোখে দূরান্তের দৃষ্টি হতে চাই
শেষ করে দিয়ে যাব কৃপণের সামান্য যা পুঁজি
যখন পরম প্রাপ্তি, তখনই তো নিজেকে হারাই!

দেখা

সবুজ শাড়ির সঙ্গে দেখা হল বাদামি শার্টের
গড়িয়াহাটায়
কেউ কারুর মুখ দেখতে পেল না
কেননা ধূসর আলো ছিঁড়ে পড়ল হঠাৎ বৃষ্টিতে
ঢেউয়ের মতন বৃষ্টি উড়ে এল গাড়িবারান্দার নীচে
খুব মনখারাপ সেই সন্ধেবেলা
কেউ কারুর মুখ দেখতে পেল না!

বুকের ভিতর ঘড়ি

বুকের ভিতরে ঘড়ি, বেজে উঠল প্রথম সংকেত
রাত্রি, তুমি সব বন্দনার চেয়ে দামি
রাত্রি, তুমি ঘুম কেড়ে আজীবন কৃতজ্ঞ করেছ
কৃতজ্ঞ পথের ধুলো পায় পায় উঠে যায় নগ্ন দেবালয়ে
ধুলোর পুরুষ মূর্তি, রাত্রির কৃতজ্ঞপথ নগ্ন দেবালয়ে
কী যেন আহ্বান করে, চোখ মেরে হাসে;
চোখ যে সুখের গুরু, সুখ তার প্রথম উষ্ণতা
রানিকে জানাতে চেয়েছিল,
রানি ও নারীর কাছে শিখে আসে
অপরূপ উরু ব্যবহার!

ক্রমশ পৃথিবী

জল থেকে পদ্ম তুলে মূর্তির পায়ের কাছে রাখি
কী এমন ক্ষতি ছিল সমূর্তি এ নিখিলও
যদি জলে ডুবাতাম, ভেসে যেত অশ্রুর চালাকি।
দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্ব, ঈশ্বরের চেয়ে নিঃস্ব
দৃশ্যগুলি
ভিখারির মতো পায়ে পায়ে ঘোরে; আমার অঙ্গুলি
চেয়েছিল সুদর্শন, তার বদলে ঠুলি পরা মানুষের
ঘিলুহীন খুলি

হৃদয় ও উদরের নিয়ত ঘর্ষণ
করে সুখী আছি; আজ কোনও বন্দনার দাম নেই
দুঃখিত মুখের কাছে পৃথিবীর কোনও শব্দ নেই,
আমি অপরাধী!

পতন

মানবসভ্যতার পতন শুরু হয়ে গেছে
ভারত সরকার এখনও তা টের পাননি
স্বাধীনতা কোনো সীমান্তের তোয়াক্কা করে না
ভালোবাসা আর স্বাধীনতা এক নয়, কারণ
ভালোবাসায় সীমান্ত প্রহরী লাগে না
পার্ক স্ট্রিটের এক ফ্ল্যাটে পরশুদিন
ঈশ্বর আত্মহত্যা করেছেন
পৃথিবীর শেষ কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে
শরীর, তুমি চোখে চোখ রেখো না,
পুলিশ!
জন্ম নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সার্থক হতে চলেছে,
কোনো মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা হয় না
আমিষাশী হিন্দুরা গরু খেতে শুরু করুক!

এ শহরে আজ

হায়, এ শহরে আজ গান বন্ধ!

কোথায় গেল সেই বনবালার দল, অপ্সরী-কিন্নরীরা! রঞ্জিত ওষ্ঠা, মানিনী, পৃথুল-মধ্যমা সুন্দরীরা! করতল তাল বলয়াবলী বাজিয়ে ললিত কলস্বনে গান গেয়ে উঠছে না এ শহরে! কলকাতার আজ কী ম্লান দশা। ম্লান, ছলোচ্ছল চোখ, দুঃখিনী বালিকার জন্য ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছে না রাজকুমার, একা পাঁচজন গুণ্ডার সঙ্গে লড়াই করছে না কেউ, পিড়িং পিড়িং শব্দে শুকনো গাছে ফুটে উঠছে না ফুল, পাথরের মূর্তি কথা বলছে না, বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টির রাত্রে আঁচল উড়িয়ে অভিসারে যাচ্ছে না প্রোষিতভর্তৃকা। এক সপ্তাহ হিন্দি সিনেমা বন্ধ।

ঘুম

কতদিন এমন সৌরভ তুলে হৃদয়ে ঘুমোবে?
এবার বেরিয়ে এসো, মুখোমুখি মুখ দেখি চৌরাস্তার
পাগল আলোতে
নরম পোকার মতো ঘাসফুলে ভরা এই শহরের পথে
প্রথম যৌবনময় হাত ধরে ক্ষীণ সন্ধেবেলা হেঁটে যাই।

আর তো সময় নেই, জুলপিতে ছোপ লেগেছে সাদা
আমের নতুন মুকুলের গন্ধ ভুলে গেছি, স্মৃতির ভিতরে এত ধাঁধা
ছিল?
রাত্রির বিশাল মাঠে জ্যোৎস্না দেখে ভয় পাই আমি
ঘুম আসে না ঘুমের প্রহরে
হোটেলের কোন ঘরে বিশল্যকরণী বুকে ধরে
কতদিন অন্য রমণীর ঘুম চুরি করে হারিয়ে ফেলেছি তার চাবি...
আজ চোখে পাক দেয় দুঃখ, অপর মুখের কাছে আর
কোনও দাবি নেই!

ফুটেছে অমূল শস্য, হঠাৎ বাতাস বলে, 'কেমন আছিস?'
আর তো সময় নেই, আর তো সময় নেই, কেঁপে ওঠে বুক
নবীন যুবার মতো হাতে নিয়ে বিষ
এখন তোমার কাছে প্রাণপণ, এবার বেরিয়ে এসো, মুখোমুখি
মুখ দেখি চৌরাস্তার পাগল আলোতে
নরম পোকার মতো ঘাসফুলে ভরা এই শহরের পথে
প্রথম যৌবনময় হাত ধরে ক্ষীণ সন্ধেবেলা হেঁটে যাই।

এমন মানুষ রোজই দেখি

এমন মানুষ রোজই দেখি, যাঁরা আমায় আগে চিনতেন, ডেকে বলতেন
এই যে সুনীল, কেমন আছ, এসো চা খাও

এখন তাঁরা মুখ ফিরিয়ে শুকনো হাস্য, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন
কালো গহ্বর
ঘরে ঢুকলে অনেকে আজ জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হুকুম করেন...

বৃষ্টি হয়নি বিকেলবেলা, বিষম গরম, সে অপরাধে আমি হয়েছি মূল আসামি
মধ্যরাতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন, আমার ঘুম হল না
পাগলা হাওয়ায় উড়িয়ে নিল হলুদ রুমাল, একটি তারা খসে পড়ল
পুড়তে পুড়তে খসে পড়ল বনের মাথায়
এসব যেন আমারই দোষ, একটি মেয়ে সেই থেকে আর কথা বলে না
মুখের দিকে তাকাই, আমার বুকের ভিতর কাতর ক্ষমা প্রার্থনা
কথা বলিনি, মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকেছি...

বয়েস হল তিরিশ পার, বাঁ জুলপিতে একটি সাদা শিকড়
আর কয়েকটা বছর মাত্র বেঁচে আছি
সবার মুখের দিকে তাকাই, বুকের ভিতর কাতর ক্ষমা প্রার্থনা
কথা বলি না, নির্নিমেষ চেয়ে থাকি
দু'চার মাস কবিতা লেখা না হলে আমার মুখের কথাও
ভালো শোনায় না
যে সব পাপ করিনি, আমি তারও অগ্রিম ক্ষমা
চেয়েছি নিঃশব্দে।
এই পৃথিবী আমায় একটা বিশাল গর্ত খুঁড়তে বলেছিল,
এবার শেষ হল
আর পাঁচটা বছর বাঁচব, এখন আমি পোশাক বদলে
তৈরি হয়ে নিচ্ছি
গোপালপুরে সন্ধেবেলা শুয়েছিলাম সমুদ্রের পাড়ে
একলা চিত হয়ে
জলের শব্দ, নীল রঙের মধ্যে আমার দু'হাত ছড়ানো
সেদিনই খুব মরে যেতে ইচ্ছে হল,
এমনভাবে আগে কখনও ইচ্ছে হয়নি!

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি বারান্দায়
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিয়রে
মাথা রেখে আছ?

তুমি তো আমারই শুধু, দূর থেকে দেখা
শুকনো চুল, ভিজে মুখ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি নীরা,
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না—
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

বিচ্ছেদ

দেখা হয়, কথা হয়, তবু বিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে
খুঁড়ে তোলা মাটি থেকে জমে ওঠে নিকৃষ্ট পাহাড়
চোখের সম্মুখে তুমি দাঁড়ালেও স্বচ্ছ বাতাসের ব্যবধান
আমার এমনই রাগ, আমি সেই স্বচ্ছতাকে শত্রু বলে ভাবি!

ভালোবাসা শব্দটিতে ইদানীং প্রচুর মিশেছে জল
বস্তুত বন্যার স্রোতে ভেসে যায় ভালোবাসা
ঐ দ্যাখো, সকলেই দেখে
এ রকম সার্বজনীনতা আমি পছন্দ করি না!

বিচ্ছেদ শব্দটি যেন নিজের শরীরে সাদা পুঁজ-ফোঁড়া
অতি সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে আরাম লাগে বেশ
এ যেন নির্মাণ-সুখ, অথচ দুঃখের চাপা ব্যথা!
নীরা, এই কথাগুলো রোজ বলি বলি করে
ফিরে যাই,
মধ্যরাত্রে জানে শুধু পথের কুকুর!
একাকিত্ব গাঢ় হলে আমি অন্ধকার দিয়ে
গড়ে নিই
তোমার আদল
সে আদল বুকে নেওয়া কত সোজা,
কত তীব্র আলিঙ্গন

সজিভ চুম্বনে সেই কবেকার নদীতীরে প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা
কৈশোরের স্বাদ
সেই ছবি, নীরা, তুমি স্নানঘরে দর্পণে দেখো না?

সিঁড়ির ওপরে

কোনো ঘরে জায়গা নেই, তুমি আমাকে
বসতে বললে সিঁড়িতে

আঁচল দিয়ে ধুলো মুছতে যাচ্ছিলে, আমি বললাম, থাক!
আমার মুখের ঘাম মোছার ইচ্ছে ছিল ওই আঁচলে
কিন্তু সেটা ছড়িয়ে রইলো মাঝখানে
প্রবাদের খড়্গের মতন
তার ওপর দিয়ে উড়ে যায়
স্পর্শকাতর বাতাস।
সিঁড়ির নিস্তব্ধতা ভেঙে যখন-তখন জেগে ওঠে পদশব্দ
আমি সঙ্কুচিত হয়ে বসি, ইচ্ছাশক্তিতে কেন মানুষ
অদৃশ্য হতে পারে না!
অচেনা দৃষ্টিগুলি আমার শরীরে বেঁধে, নীরা তুমি হেসে ওঠো

তোমার বিমূর্ত হাসিতে সিঁড়ি হয়ে যায় জলপ্রপাতের কিনারা
সেখানে ঝুঁকে আছে স্নেহময় বৃক্ষ,
জলে খেলা করে পাতার ছায়া
নব ভ্রূপল্লব, নব বেদনাময় আহ্বান!
তোমার নরম স্থিতি থেকে আমার বাসনা অনেক দূরে
তবু সিঁড়ির ওপরে বহুদিনের বিচ্ছেদ বেদনা ধুলো হয়ে গেল।

সংযোজন: অনুবাদ কবিতা

সূচিপত্র

যুদ্ধ

সাও সুং

একদা যা ছিল আমাদের পাহাড়, আমাদের নদী
আমাদের উর্বর ভূমি
আজ তা শুধু সৈনিকের মানচিত্রে কয়েকটি বিন্দু ও রেখা।

যুদ্ধ আমাদের সবাইকে বিমর্ষ করে দিয়েছে
কেউ আর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবে না।

সামরিক বিভাগে ধাপে ধাপে
পদোন্নতির প্রশ্নও এখন
অর্থহীন;
কেন না আমি জেনে গেছি,
সেনাপতির খ্যাতি নির্ভর করে থাকে একরাশ শুকনো
হাড়ের ওপর—
যারা একদিন মানুষ ছিল!

ক্লান্ত সৈনিক পেছনে তাকিয়ে

ৎসেমা চা

বাড়ির পাশে ছিল জমি, ফেরার পথ নেই—
কে তার চাষ করে! এখানে একা শুয়ে
সীমান্তের এ শহরে, স্বপ্ন দেখি
নতুন পাকা ধান, আঃ কি সুঘ্রাণ!
স্বপ্ন ভেঙে যায়, এখন যুদ্ধ
এখানে কুৎসিত রক্ত-গন্ধ।

হানের সম্রাট তবুও প্রাসাদের গহনে শুয়ে থেকে

রাজ্য বাড়াবার স্বপ্ন দেখছেন!
অর্ধ দেশ জুড়ে জ্বলছে আগুন—
প্রতিটি গৃহ থেকে
সুস্থ লোকদের যুদ্ধে ডাক পড়ে।

একথা কে না জানে, সীমান্তের জমি বন্ধ্যা-অফলা
তবুও বিস্ময়, সেই পোড়ো জমির লোভে
কেন এ মারামারি!
দক্ষ চাষিদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া নিছক অর্থহীন
পাহাড়ি মানুষের তলোয়ারের ঘায়ে মরছে তারা!

সীমান্ত ঘাঁটিতে

সু হান

সাং কান-এর উত্তরাঞ্চলে সারারাত ধরে যুদ্ধ চলল
এমন ঘোর যুদ্ধ যে আমাদের অর্ধেক সৈন্যবাহিনী
আর ফিরে এল না।

সকালবেলার ডাকে বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে
লিখেছে
শিগগিরই শীতের পোশাক পাঠানো হচ্ছে ওদের জন্য।

দম্পতি

কার্ল স্যান্ডবার্গ

পুরুষটি ছিল শিনশিনাটিতে, মেয়েটি বার্লিংটনে
পুরুষটি টেলিগ্রাফের তার বসানোর দলের একজন কর্মী
মেয়েটি এক বোর্ডিং হাউসে থালাবাসন ধোয়।
'কান্না বড় নিঃসঙ্গ', মেয়েটি লিখে জানায়,
'এখানেও তাই', পুরুষটির উত্তর।
শীত এসে পেরিয়ে গেল, পুরুষটি ফিরে এল, ওরা দু'জনে বিয়ে করল
আবার কোথায় ঝড়-বৃষ্টিতে উপড়ে পড়েছে টেলিগ্রাফের দণ্ড, তারগুলো ঝুলে
পড়েছে
বরফের শক্ত ধারায়, পুরুষটি আবার চলে গেল

মেয়েটি আবার চিঠি লেখে, 'কান্না বড় নিঃসঙ্গ'
'এখানেও তাই', ফের পুরুষটির উত্তর।
ওদের পাঁচটি সন্তান এখন পড়ছে উত্তম ইস্কুলে
পুরুষটি ভোট দেয় রিপাবলিকান দলের প্রার্থীকে, নিয়মিত কর দেয়
ওদের চেনা পরিমণ্ডলে সবাই ওদের চেনে
সৎ আমেরিকান নাগরিক হিসেবে, সৎ জীবনযাপন করছে।
অনেক জিনিস যা অন্যদের উত্যক্ত করে, ওরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না
ওদের পাঁচটি সন্তান এবং ওরা একটি দম্পতি,
যেন একজোড়া পাখি, ডাকে পরস্পরের দিকে চেয়ে, এবং তাতেই পরিতৃপ্ত।
যখনই পুরুষটি দূরে কোথাও যায়, নারী নিশ্চিত লিখে জানায়, 'কান্না বড় নিঃসঙ্গ'
এবং পুরুষ সেই একই পুরনো উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাঠায়, 'এখানেও তাই।'
শিনশিনাটিতে টেলিগ্রাফের তার বসাবার কাজ করত যখন, তারপর বহুদিন কেটে
গেছে
বার্লিংটনে থালাবাসন ধোওয়ার কাজ থেকেও সে এখন বহুদূরে
এখনও ওরা পরস্পরের প্রতি ক্লান্ত নয়, ওরা একটি দম্পতি।

ঠান্ডা কবরে

কার্ল স্যান্ডবার্গ

আব্রাহাম লিংকনকে যখন কবরে নামিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হল, তিনি
তখন ভুলে গিয়েছিলেন দক্ষিণ সমর্থক অবিশ্বাসীদের, হত্যাকারীকে...
...মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে।

এবং ইউলিসিস গ্রান্ট আর মনে রাখেননি তার বিশ্বাসী সহচরদের
কথা, ওয়াল স্ট্রিট; টাকা আর হুন্ডি, কোম্পানির কাগজ পুড়ে ছাই...
...মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে।

রানি পোকাহোনটাস-এর শরীর, পপলারের মতন মনোহারিণী, নভেম্বরের
রক্তকরবী অথবা মে মাসের কামরাঙার মতন মিষ্টি... তিনি কি অবাক
হয়েছিলেন? কিছু মনে পড়েছে তাঁর?... মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো এক ঝাঁক মানুষকে তুলে নাও, পোশাক আর
তৈজসপত্র কিনছে, উল্লাস জানাচ্ছে তাদের মনোমতন বীরপুরুষকে, রঙিন
কাগজের ফুল ওড়াচ্ছে হাওয়ায়, বাজাচ্ছে টিনের ভেঁপু... আমায়
বলো প্রেমিকরাই বঞ্চিত কিনা... আমায় বলো প্রেমিকদের
চেয়েও কেউ বেশি পায় কিনা... মাটির নীচে, ঠান্ডা কবরের মধ্যে।

সংযোজন: ছড়া

সূচিপত্র

বাংলার ছড়া

এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর
তার উপরে বসে আছে সিপাহি বিস্তর।
এক সিপাহি ফড়িংগুঁপো এক সিপাহি আধলা চাঁদ
আয়রে আমার সোনামণি, আয় দেখবি বালির বাঁধ।
বালির বাঁধে ডুমুরের ফুল, বালির বাঁধে ঘোড়ার ডিম
মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি নিম গাছেতে হচ্ছে সিম।
মাসির বাড়ি নারায়ণগঞ্জ, ফুফার বাড়ি আমেদপুর
এ পারেতে দুধ উথলোয়, ও পারেতে খেজুর গুড়।
পায়ে ফুটল খেজুর কাঁটা, মাথায় তাগা বাঁধবে কে
রোদের মধ্যে বৃষ্টি নামল, শ্যাল কুকুরের হচ্ছে বে!
এ পারেতে বৃষ্টি পড়ে ফুটো ঘরের চালা
ও পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা!
মানিক গেছে কুষ্টিয়ায় রাক্ষসেরা পান খায়
পান সাজতে হল বেলা খান সাহেবরা বাড়ি পালা
ঝড়ে ডুবল গয়নার নাও, তাঁবু ঠেকল গাছে
তাই দেখে টাকডুমাডুম বিলিতি ভোঁদড় নাচে!
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, তুর্কি নাচন দেখে যা!

ও পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!
ফুসমন্তর ফুসমন্তর দেখো তুমি কার?
চোখ খুললে যায় না দেখা, মুদলে পরিষ্কার!

আমার বাংলা

শোনো বলি এক আজব দেশের কথা
সে আজব দেশ আমার বাংলা দেশ
বৈশাখে তার নিদারুণ কঠিনতা
আষাঢ়-শ্রাবণে বৃষ্টি-বাউল বেশ।

সোনার শরতে শুভ্র মেঘের মতো
অপরূপ সাজে সেজে থাকে সারা দিন
নানা উৎসব আনন্দ আছে যতো
সব নিয়ে আসে—সে সুখ তুলনাহীন।

অঘ্রাণে তার মায়ের মতন স্নেহ
সোনার ধান্যে করে সে আশীর্বাদ
ধান্যের ঘ্রাণে পবিত্র হয় দেহ
ফাল্গুনে পাই নব জীবনের স্বাদ।

কত আর লিখি, লেখার তো নেই শেষ
স্বপ্নেতে গড়া আমার এ বাংলাদেশ ॥

বর্ষা

সারাটা গ্রীষ্মে পুড়েছে পৃথিবী দুঃখে
পুড়েছে আকাশ ফেটেছে মাটির বুক
এতদিনে তার অশ্রু গড়াল চক্ষে
এই বর্ষায় আসবে মনের সুখ

গাছের পাতায় ছিল না হাওয়ার খেলা
মানুষের মুখে ছিল শুধু আঁকা ক্লান্তি
দিনরাত্তির ভরা শুধু অবহেলা
এতদিনে শেষে আসবে বুঝিবা শান্তি

এতদিনে বুঝি ভরবে নদীর বুক
সোনার ফসলে হাসবে বাংলাদেশ
মুছে যাবে সব বিষাদ ক্লিষ্ট মুখ
এই বর্ষায় দুঃখের হবে শেষ ॥

মা বললে

মা বললে, ঘরের বাছা আয়রে ফিরে ঘরে
মুখের কথা উড়িয়ে নিলে বৈশাখের ঝড়ে
ঘর ভাঙল চাল উড়ল জল উঠল ফুলে
ময়ূর খোঁজে কেউটে সাপ নদীর কূলে কূলে
উড়াল দিয়ে নামল নীচে শিকরে বাজপাখি
পায়রা ভাবে বুকের ওম কোথায় তুলে রাখি!
কলার ভেলা সাজিয়ে নিয়ে ভাসাই দরিয়ায়
মেঘ বৃষ্টি ঝড়ের মুখে কত না দিন যায়!
অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ে ক্লান্ত ঝরঝর
উজান গাং পেরিয়ে এসে সামনে হালির চর।
আবার শেষে দুঃখে সুখে নতুন ঘর বাঁধি
কিন্তু কোথায় মা হারাল? সেই কথাতে কাঁদি!

পারিজাতের মালা

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা, এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
ঘুম ঘুম ঘুম, শালিক বলে, সবাই তোরা ঘুমো
এমন নরম রোদের ফোঁটা, কপালে দেয় চুমো!
শির শির শির, বাতাস হাসে, চোখ ভরতি জলে
টুকরো ছেঁড়া মেঘের তুলো ফিসফিসিয়ে বলে
বাবা আছেন যেমন, তেমন মায়ের বুক ফাটে
চল আমরা পালাই দূর সমুদ্দুর পাড়ে...
ফুরফুরিয়ে ভাসল মেঘ বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কাপড় কাচা নীলের মতো আকাশ থাকে শুয়ে।

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা, এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা

নদীর জল খুশির তোড়ে বাজায় রিনিঝিনি
ঘাসের ফুল, শিশির ফোঁটা, বললে, যেন চিনি।
একটি সাদা কাশের গোছা, বললে পেন্নাম
চিনি তোমায় হে মহারাজ, শরৎ তোমার নাম!

গভীর রাতের ম্যাজিক

মাঝরাত্তির হলে সবাই ঘুমোলে,
আকাশের তারাগুলো হা-ডু-ডু-ডু খেলে।
হা-ডু-ডু-ডু হা-ডু-ডু-ডু চু-কিত-কিত।
গরম না শীত ভাই, গরম না শীত?
এক তারা খসে পড়ে, এক তারা হাসে,
চাঁদের দু' পাশে আরও দুটো চাঁদ ভাসে।
তিন চাঁদে গলাগলি, যেন তিন নারী,
এই হেসে গড়াগড়ি, এই হল আড়ি!

এক চাঁদ নেমে আসে পুকুরের জলে,
আর একটি দোল খায় বনে জঙ্গলে।
বাকি চাঁদ সেই চাঁদ, সকলের চেনা,
সে যে ঘুমে ঢলে পড়ে, কেউ তা জানে না।
ঘুম চাঁদ, চাঁদ ঘুম, মেঘ দিয়ে ঢাকা,
তখনো আকাশে চাঁদ খড়ি দিয়ে আঁকা!
জঙ্গুলে চাঁদটার ঘুম নেই চোখে,
জোনাকিরা ছিনিমিনি খেলে নিয়ে ওকে।
একজোড়া প্যাঁচা এসে বলে, 'ওরে চাঁদি,
আয় ভাই গলা ছেড়ে এক সুরে কাঁদি!'
ভয় পেয়ে কাঁদে চাঁদ খানিক খানিক,
মাঝে-মাঝে হেসে ফেলে ফিক ফিক ফিক!
পুকুরের চাঁদখানা ডোবে আর ভাসে,
মৃদু সুরে গান গায় মিহিন বাতাসে।

ছোট ছোট মাছগুলো বলে, আয় খেলি,
হাততালি দিয়ে ওঠে চাঁপা, জুঁই, বেলি!

শেষ রাতে সব কিছু বিষম আলাদা,
আকাশে কত না রং, অন্ধকার সাদা!
সুনীল দেখেছে এই দারুণ ম্যাজিক
তোমরা দেখোনি কেউ! ধিক ধিক ধিক!

খাওয়ার পরে ঘুম

হাওয়া বয় শনশন, বৃষ্টিরা ঝমঝম,
নুন খেয়ে গুণ গাও, ঝাল খাও কম কম।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু, পাখি ডাকে টিট্টি,
আমলকী মুখে দাও, জল খুব মিষ্টি।
মৌমাছি গুন গুন, মাছি ওড়ে ভন ভন,
বেশি আম খাও যদি, ফোঁড়া হবে টন টন।
সেতারের টুংটাং, তবলায় ধপাধপ,
তেতো খাও এক ফোঁটা, সন্দেশ গপাগপ।
কাচ ভাঙে ঝনঝন, ঝড় আসে হুড়মুড়,
পাউরুটি লাগে খাসা, যদি থাকে ঝোলাগুড়।
নদী বয় কলকল, গাছে গাছে ঝিলমিল,
পান খাও এক খিলি, হাসি পাবে খিলখিল।
কথা হয় ফিসফিস, জল পড়ে টুপটাপ;
আর কত খাবে বলো, চারদিক চুপচাপ।
কাগজের খসখস, নূপুরের রুমঝুম,
খাওয়াদাওয়া হল বেশ, এই বারে টানা ঘুম।
বাজি ফাটে দুমদাম, কাঠফাটা রোদ্দুর,
ঘুম এলে উড়ে যাও, যেতে চাও যদ্দূর!

সাইকেল ও সাঁতার

ওপাড়ার নটবর খুব নাকি গুণধর
সাইকেল চালিয়েই চলে গেল দেওঘর।
এপাড়ার সুবিনয় হাবাগোবা অতিশয়
সাইকেল দেখলেই, তার পেটে ব্যথা হয়!

নটবর থিয়েটারে রাম সাজতেও পারে
সুবিনয় চুপিচুপি আশেপাশে উঁকি মারে
একদিন দয়া করে তাকে ধরে আনা হল
এপাড়ায় কত ছেলে, সে-ই শুধু পার্ট পেল
চোখে মুখে রং মেখে হনুমান সাজল সে
রামরূপী নটবর ঘোরে ফেরে রাজবেশে
হনুমান ছোট পার্ট, তাতেই সে কুপোকাত
রামরূপী নটবর আগাগোড়া বাজিমাত
নটবর খালি-খালি পেল কত হাততালি
সুবিনয় ভুলো-মন, পেল শুধু গালাগালি!

তবে খুব মজা হল এবারের বর্ষায়
মাঠঘাট ডুবে গেল যতদূর দেখা যায়
জল থইথই, আরও মেঘ গুড় গুড় করে
বন্যার জল বুঝি বাড়িতেও ঢুকে পড়ে।
কত লোক চলে এল রাস্তায় গাড়ি ফেলে
এ সময় নটবর ফিরছিল সাইকেলে
কী সাহস বলিহারি একা-একা দেয় পাড়ি
ঝুপ করে পড়ে গেল, পথ হয়ে গেছে খাঁড়ি
হায় হায় এ কী হল, নটবর যায় ভেসে
এত গুণধর তবু সাঁতারটা শেখেনি সে!
কলকল করে জল নটবর খাবি খায়
সাইকেল আগে গেল, সেও শেষে ডুবে যায়
আর ঠিক তক্ষুনি সুবিনয় সাঁতরিয়ে
চুল ভরা মাথা এক পেয়ে গেল হাতড়িয়ে!
ছাদে ছাদে কত লোক দেখল সে দৃশ্যটা
হাততালি শোনা গেল অন্তত পাঁচশোটা।

রাম ভয়ে নীল, তার বুক করে ধুকধুক
হনুমান লজ্জায় মুখ লাল টুকটুক!

ফুলডাঙার পুকুর

পুকুরধারে কদমগাছ
তার দু'পাশে কলা এবং লিচু
জলে ভাসছে তিনটে হাঁস
ফুরুসগাছে ফুল ফুটেছে কিছু।
কদমগাছে কোকিল আসে
ডাকতে শুনি, যায় তাকে দেখা
এক পা তুলে বকবাবাজি
ধ্যান করে যায় সকাল-দুপুর একা।

তিনটি তালগাছই বড়
ছাড়িয়ে গেছে আর সবার মাথা
অন্য একটা ঝাঁকড়া গাছ
কেউ চেনে না। আসলে তেজপাতা।

টপটপিয়ে বৃষ্টি এসে
কতরকম ছবি আঁকছে জলে
শোল মাছের বাচ্চা হল
পোনার ঝাঁক ঝিকমিকিয়ে চলে।
বিকেলবেলা আকাশ খুশি
সোনার আলো ছড়ায় মেঘ ভাঙা
বাতাস এসে হল্লা করে
ঝুপুস করে পড়ল মাছরাঙা।

তিনটে হাঁস শেষ গা-ধুয়ে
গলা মিলিয়ে ডাকল তিনবার
সূর্যদেব অস্তে গেলেন
অন্ধকার ঢাকল চারিধার।
তালপাতায় শরশরানি

ঝিরঝিরানি ইউক্যালিপটাসে
টুপটুপিয়ে ঝরে শিউলি
কতরকম সুবাস ভেসে আসে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকি
যতই দেখি, তবু মেটে না সাধ,
এখন সব কালোয় ঢাকা
মাঝপুকুরে দোল খাচ্ছে চাঁদ।

সুকুমার রায় নেই

বাবুরাম সাপুড়ের দুঃখটা জানো কেউ?
কেন সে যে একা বসে কাঁদে শুধু ভেউ ভেউ?
সুকুমার রায় নেই, আর কে বা দুনিয়ায়
তার বাকি কথাটুকু লিখবে যে হায় হায়!
বিষ ছাড়া সাপ আছে ঝুড়িটার মধ্যে
কেউ আর সেই কথা লেখে নাকো পদ্যে।

হুঁকোমুখো হ্যাংলার আরো বেশি মুখভার
তার কত কেরামতি, দেখল না সুকুমার!
মাছ্য তাড়া করা কাজ আর নয় শক্ত
মাছি-মারা কেরানিরা সব তার ভক্ত!

হাঁসজারু ভাবে বসে ব্যাকরণে সবই সয়
ট্যাঁশগরু অফিসের বড়বাবু মহাশয়
প্যাঁচা আর প্যাঁচানির চেঁচানির শেষ নেই
যার গোঁফ চুরি গেল, আজ তার কেশ নেই।

সুকুমার রায় নেই, তাঁর লেখা কোথা পাই
'আবোল তাবোল' পড়ো, আর পড়ো 'খাই খাই'!

শান্তিলতা

একটা ছোট্ট দোকানে এক পুঁচকে মেয়ে বসে
খদ্দের না থাকলেই সে স্লেটে অঙ্ক কষে
কোঁকড়া চুল, দু কানে দুল, বয়েস মোটে বারো
কক্ষনো সে কাঁদে না, তারা চক্ষু দু'টি গাঢ়।
একখানা নয়, দুখানা নয়, এগারোখানা স্লেটে
এ পিঠ ও পিঠ ভরালে তার অঙ্ক-ক্ষুধা মেটে।
একটা বাল্‌ব কিনতে গেছি, বললে সেই মেয়ে
তালমিছরি নিন না, এখন শস্তা সবচেয়ে
ফাগুন মাসে বেগুন কিনলে হবে দারুণ ক্ষতি
তিন লক্ষ কিলোমিটার বলুন তো কার গতি?
উত্তর না পেলেই তার হাসি খেলবে ঠোঁটে
দোকানখানা দিব্যি চলে, খদ্দের নেই মোটে।

এত কী সব লিখিস রে তুই, একটু দেখতে পারি?
একের পিঠে শূন্য শূন্য রয়েছে সারি সারি
ওরেব্ বাবা, এ যে দেখছি মেয়ে আইনস্টাইন
নাম কী তোর? বলল হেসে, শান্তিলতা পাইন!

রিংরাং টোটো

বলো দেখি কোন দেশ রিংরাং টোটো
যে দেশের মানুষেরা সব থেকে ছোট
সে দেশের পাহাড়েরা যেন উইঢিবি
সে দেশের সব মেয়ে হরতন-বিবি!

রিংরাং টোটো দেশে গান গায় যারা
গুড় দিয়ে মুড়ি মেখে শুধু খায় তারা
রাজা নেই, মন্ত্রীর ছেলে খায় গজা
ইশ্‌কুলে মাস্টার নেই, খুব মজা!

রিংরাং টোটো দেশে একটাই পথ
গাড়ি নেই, ট্রাম নেই, চলে শুধু রথ।
কপকপ ঘোড়া ছোটে, থপথপ হাতি
সেনাপতি ঘুমোলেই জাগে তার নাতি।

রিংরাং টোটো দেশে সব রিংরাং
রিং ছেলে রাং মেয়ে নাচে ডিংডাং
পিংপং খেলা নিয়ে দিন রাত কাটে
কিংকং বাঁধা থাকে এ-দেশের মাঠে!

এলাটিং বেলাটিং

এলাটিং বেলাটিং টইলো
কী খবর আইলো?
বৃষ্টি বৃষ্টি আবার বৃষ্টি
খিচুড়ির থালায় টক-ঝাল-মিষ্টি
চাঁদের গায়ে হিরামন ছাপ!

এলাটিং বেলাটিং টইলো
কী খবর আইলো?
রোদ্দুর রোদ্দুর দারুণ খরা
সুন্দরবনে নদীতে চড়া
গল্পের গরু তাল গাছে ওঠে
কবিতার কালো মেয়ে কেঁদে মাথা কোটে ॥

শীত-গরমের ছড়া

দুধের মধ্যে নতুন গুড়, মুড়ি এবং কলা
খেয়েং মজা, খুলেং গেল গান গাইবার গলা।

এবার শীতে জ্যোৎস্না রাতে ইচ্ছে হল নাচি
ডিডিং ড্যাডাং, টম টমাটম, তিনটে মোটে হাঁচি!

নাচলে শরীর গরম থাকে, চাই না গরম জামা
ঘরেং নাচো, ছাদেং নাচো, মেঝেতে দাও হামা!

নাচের সঙ্গে গান চাই যে, নইলে কী ভাই জমে?
সারেং গামা, আহাং উহাং, গাইবে পুরো দমে।

এই রে আবার খিদে পেল যে, ধরে যাচ্ছে গলা
দুধং নতুন গুড়ং আনো, মুড়িং এবং কলা।

এমন ছড়া গরম কালেং কেমন লেখাং হবে?
নতুন গুড়টা বাদ পড়বে, মনেং রাখতে হবে।

দূরে কেন, পাশাপাশি

তলোয়ার নেই, শুধু ঢাল নিয়ে
হয় নাকি যুদ্ধ?
পুব নেই এদেশের, পশ্চিম
লেখাটা কি শুদ্ধ?

দোয়াতটা রয়ে গেছে, কালি নেই
কী করে যে লিখিরে

জল দাও, পানি দাও, ঢেউ দাও
সাঁতারটা শিখিরে!

সাহেবরা চলে গেছে, থুতু নিয়ে
কারা যেন চাটছে
পায়ে ঘড়ি, হাতে দড়ি, মরি মরি
ওই কারা হাঁটছে!

ভাই ভাই এক ঠাঁই, দূরে কেন
পাশাপাশি আয় না!
মুখ খানা চেনা নয়? ভালো করে
দ্যাখ না রে আয়না!

মিনির গল্প

ছোট্ট মিনি ভূতের গল্পে মাথা দুলিয়ে
হাসতে থাকে খুব
একটুও ভয় পায় না
মায়ের কাছে যায় না
কাতুকুতু দিলেই নাকি ভূতেরা সব
জলের মধ্যে ডুব!

রাজপুত্রের গল্প শুরু হতে না হতেই
মিনি বলবে, না, না!
পক্ষীরাজ চায় না
বাঘ-সিংহ-হায়না
সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, দৈত্য দানো
এসব কিছুই মানা।

কী মুশকিল, মিনির জন্য চক্ষু বুজে
কীসের গল্প খুঁজি?

রূপকথা শুনবে না
যুদ্ধও চলবে না
বলবে ওসব গল্প তুমি বানিয়ে বলছ,
আমি বুঝি না বুঝি?

কখনো মিনি নিজেই একটা গল্প বলা
হঠাৎ শুরু করে
এক যে ছিল ময়না
ডানায় হিরের গয়না
খিদে পেলেই বাংলা বলে, অন্য সময়
ইংরিজি ঝরঝরে!

কালো ও সাদা

একটা কুকুর কালো ভেলভেট
একটা কুকুর ফরসা
দু'জনে যেদিন জন্ম নিল
সেদিনটা খুব বরষা।

একই মায়ের এ দুটো বাচ্চা
দুধ নিয়ে টুঁসোটুঁসি
আবার দু'জনে খেলায় মাতলে
মা-কুকুর খুব খুশি।

খেলায় খেলায় বেড়ে ওঠে তারা
কালো ও ফরসা দু'ভাই
কেউ চলে যায় কামস্কাটকায়
কেউ-বা হয়তো দুবাই!

বহুদিন পরে যদি দেখা হয়

দু'জনে গন্ধ শোঁকে
আদরে, আমোদে গড়াগড়ি খায়
দেখে কাছাকাছি লোকে।

॥ ২ ॥

কালো ও ফরসা মানুষেরা থাকে
নানা দেশে দুনিয়ায়
এ ওকে চেনে না, ভাইও বলে না
মুখটা ফিরিয়ে যায়।

কালোরা অনেকে ভালো গান গায়
খেলার জগতে সেরা
ফরসারা জানে জ্ঞান-বিজ্ঞান
সাগর-পাহাড়ে ফেরা।

দুই ভাই মিলে রাস্তা খোঁজে না
শুধু কোঁচকায় ভুরু
কখনো অস্ত্র ঝনঝন করে
বিচ্ছেদ হয় শুরু।

হোক না কালো বা ফরসা আমরা
কী করে যে ভুলে যাই
আমাদেরও মা তো একই! সবাই
পৃথিবীতে জন্মাই!

কোনটা আসলে সত্যি?

চশমা খুলেই উঠেছি, নদী তো ছিল না এখানে
আগে তো দেখেছি ধু ধু মাঠ আর তিনটে মোষের বাচ্চা
চোখের নিমেষে এত বড় নদী, কোথা থেকে এল কে জানে
নদীটা মিথ্যে? খালি চোখে দেখা মিথ্যেটাই কি সাচ্চা?

খোকা-খুকি মোষ কোথায় উধাও হয়ে গেল এই মাত্র?
নদীর দু'ধারে বড়-বড় ঢেউ, তবু নেই কোনো শব্দ
আকাশ মেঘলা, তবু রোদ্দুরে ঝলসে যাচ্ছে গাত্র
যা দেখছি তার কিছুই মেলে না, হচ্ছি তো খুব জব্দ!

চক্ষু বুজলে সঙ্গে-সঙ্গে এ কী অপূর্ব দৃশ্য
ধু ধু মাঠ নেই, নদীটাও নেই, আলো ঝলমল পাহাড়ে
ছবি হয়ে যেন দোদুল দুলছে অন্য একটা বিশ্ব
গাছগুলো গান গায় আর কত ফুল ফুটে আছে বাহারে।

তা হলে এবার বুঝে নিতে হবে কোনটা আসলে সত্যি
পাহাড়ের আলো, মোষের বাচ্চা, নদীটিও মোটে ভুল না
তিনটেই আমি দেখেছি যে তাতে মিছে নেই এক রত্তি
তবু চোখ বুজে যা দেখেছি তার নেই বুঝি কোনো তুলনা!

শীত

দেবদারু কেন সাজল এমন সাজে
বাতাস মাতল পাতা ঝরানোর কাজে
বনে বনে শুনি কত কান্নার স্বর
মনের ভুল কি, হয়তো বা মর্মর!
এসো বসন্ত, তোমায় যে আমি ডাকি!
'শীত এসে গেছে', বলল একটি পাখি।

কী ভয়ে সূর্য ডুবে যায় এত আগে
মেঘ নেই শুধু একলা আকাশ জাগে।
রজনীর ঘন অন্ধকারের সাথে
মিশে যেতে হয়, জেগে উঠি ফের প্রাতে।
এসো বসন্ত, তোমায় যে আমি ডাকি
'এখন যে শীত', বলল একটি পাখি।

কবে যে আবার ফুটবে নানান ফুল
কানন পরবে রাঙা ঝুমকোর দুল
কবে দেবদারু সাজবে সবুজ সাজে
কোকিল ডাকবে কাজ ভোলানোর কাজে।
বসন্ত আয়, কখনও আসবে নাকি!
'শীত চলে যাবে'—বলল একটি পাখি!

বিদ্যাসাগর

'আমরা বাঙালি'—এই যে গর্ব
তুমি আছ এর মূলে
তোমার কীর্তি এ বাংলা দেশ
যাবে না কখনো ভুলে।
জননীর প্রতি তোমার ভক্তি
তোমার জ্ঞানের তৃষা
তোমার সাহস, সত্যনিষ্ঠা
ঘুচাল অন্ধ নিশা।
যেমন তোমার বিদ্যা অসীম
তেমনি তোমার দান
তোমার অশেষ কীর্তির কোনো
হয় নাকো পরিমাণ!
তোমার জীবন আজিকে বাঙালি
আদর্শ রাখে মনে
তোমাকে স্মরণ করি গো তোমার
পুণ্য জন্মক্ষণে।
'বীরসিংহের' হে বীর মানব
ধন্য তোমার নাম
তোমার চরণে নীরবে আমরা
জানাই আজি প্রণাম।

বৃষ্টির রূপকথা

মেঘের মুলুকে আজ কী যে কোলাহল
কে যেন ঝরায় তার দু' চোখের জল
বাড়ির কর্তা কাকে রেগে গরজায়
ভীষণ চাবুক দেখে চোখ ঝলসায়।
ফাজিল ভাইপো তার উত্তুরে হাওয়া
হি-হি হু-হু হেসে শুধু
করে আসা যাওয়া।
আকাশের বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার
সেই ভাঙা জমে হল বিরাট পাহাড়
টিমটিম জ্বলছিল চাঁদ-লণ্ঠন
হঠাৎ ঢাকল তাকে মেঘ-পল্টন
আঁধারেতে ঢেকে গেল সব কোলাহল
শুধু শুনি ঝরে কার দু' চোখের জল।

প্রতিদান

আকাশ আমাকে এত আলো দেয়
আমি দেব তাকে অর্ঘ্য
আমার মনের স্নেহ সুধা প্রেম
স্বপ্নেতে গড়া স্বর্গ।

বর্ষার নদী, ঘন নীল বন
দু' চোখেতে দেয় শান্তি
আমিও তাদের গানে ভরে দেবো
ঘোচাব প্রাণের ক্লান্তি।

আমার পৃথিবী এত সুমধুর
তার দানে নেই অন্ত

কত না দুঃখ, জ্বালা সয়ে তবু
দিন হয় মিলনান্ত।

পৃথিবীকে আমি কিবা দিতে পারি
সে দেয় আমাকে মুক্তি
তাকে দেব আমি নীরব প্রণাম,—
ব্যথায় জমানো শুক্তি।

খোকার ভাবনা

নদী যদি হ্‌তে চায় দূরের আকাশ
তবে কি বৃষ্টি হবে গোটা বারো মাস?
খোকা বলে, বলো না মা, একি হয় না কি?
মা বলেন, থাম বাপ, ঢের কাজ বাকি।
যা এখন খেলা কর, আঁচলটা ছাড়
রোদ্দুরে দিতে হবে আমের আচার।

খোকা ভেবে ভেবে মরে পায় না তো মানে
কত যে অভাব আছে কেউ তাকি জানে?
মাথার পেছনে যদি হয় দুটো চোখ
চাপা পড়ে মরতো কি রোজ এত লোক?
মনে মনে খেলে যদি যেত পেট ভরে
তা হলে কি অনাহারে এত লোক মরে?

এ রকম আরও কত আছে যে অভাব
কখনও কি মিটবে তা কে দেবে জবাব?
ভগবান্‌ই জানে না তো তুমি আমি ছার
তার চেয়ে খাওয়া যাক আমের আচার।

গ্রন্থপরিচয়

সেই মুহূর্তে নীরা
প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৯৭। পৃ. ৮০। মূল্য ৩০.০০।
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী।
উৎসর্গ: মল্লিকা সেনগুপ্ত/ও/সুবোধ সরকার-কে।

ভোরবেলার উপহার
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯। পৃ. ৬৪। মূল্য ৩৫.০০।
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন।
উৎসর্গ: মুনমুন ও সৌমিত্র মিত্র-কে।

অন্যদেশের কবিতা
প্রথম আনন্দ সংস্করণ বৈশাখ ১৪০০, তৃতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১০।
পৃ. ১৩২। মূল্য ৫০.০০।
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রচ্ছদ: সুনীল শীল।
উৎসর্গ: সাগরময় ঘোষ/শ্রদ্ধাস্পদেষু।
প্রথম সংস্করণ: মাঘ ১৩৭৩।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র, ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
শিক্ষা: কলকাতায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ: 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।
২০০৪-এ সরস্বতী সম্মান।
ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম— 'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
প্রয়াণ: ২৩ অক্টোবর ২০১২

....

প্রচ্ছদ সুনীল শীল

কবিতাসমগ্র

৪

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

কবিতা সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

9 788177 567137

কবিতা সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ কালানুক্রমিক রূপে বিন্যস্ত করে প্রকাশিত হচ্ছে ‘কবিতাসমগ্র’র এক একটি খণ্ড। বাংলা কবিতার যাঁরা প্রেমিক পাঠক, তাঁদের কাছে এ এক মস্ত খবর সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম সেরা রচয়িতা যিনি, তিনি বাংলা কবিতারও এক অতি শক্তিমান স্রষ্টা, তা কে না জানেন। এই কথাটাও সবাই জানেন যে, পঞ্চাশের দশকে ‘কৃত্তিবাস’ নামক যে-আন্দোলন একদিন বাংলা কবিতার মোড় একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সুনীলই ছিলেন তার নেতৃস্থানীয় কবি। পাঠক, সমালোচক— সবাই সবিস্ময়ে লক্ষ করেছিলেন যে, এই কবি কোনও পুরনো কথা শোনাচ্ছেন না; তিনি যা কিছু লিখছেন, তারই ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক ঝলক টাটকা বাতাস, আর সেই বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে এমন এক সৌরভ, যা তার আগে পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
কথাসাহিত্য ও কবিতার দাবি একই সঙ্গে মেটানোর কাজটা বড় শক্ত। এ কাজ সবাই করতে পারেন না। সুনীল যে পেরেছেন, তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। সবদিক থেকে একজন সাহিত্যিক হয়েও এই সরল সত্য তিনি কখনও বিস্মৃত হননি যে, মূলত তিনি কবিই, এবং গদ্য নয়, কবিতাই তাঁর প্রথম প্রেম।
এই খণ্ডে সংযোজিত হল চারটি কাব্যগ্রন্থ— ‘ভালোবাসা খণ্ডকাব্য’, ‘বাংলা চার অক্ষর’, ‘যার যা হারিয়ে গেছে’, ‘শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা’ এবং একটি কাব্যনাটক ‘প্রাণের প্রহরী’। এ ছাড়া তিনটি ছড়ার বই— ‘মালঞ্চমালা’, ‘আ চৈ আ চৈ চৈ’, ‘মনে পড়ে সেই দিন’। কয়েকটি ছড়াও সংযোজিত হয়েছে।

২৫০.০০

ISBN 978-93-5040-267-2

কবিতাসমগ্র

৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩

ISBN 978-93-5040-267-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি৪ সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

KABITASAMAGRA V
[Poems]
by
Sunil Gangopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

প্রকাশকের নিবেদন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাসমগ্র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডটির পরিকল্পনাও লেখক করে গিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী এই খণ্ডে সংযোজিত হল চারটি কাব্যগ্রন্থ— 'ভালোবাসা খণ্ডকাব্য', 'বাংলা চার অক্ষর', 'যার যা হারিয়ে গেছে', 'শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা' এবং 'প্রাণের প্রহরী' কাব্যনাটকটি। তিনটি ছড়ার বই— 'মালঞ্চমালা', 'আ চৈ আ চৈ চৈ', 'মনে পড়ে সেই দিন'। এ ছাড়া কয়েকটি ছড়াও সংযোজিত হয়েছে।

গ্র ন্থ সূ চি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভালোবাসা খণ্ডকাব্য

ভালোবাসা খণ্ডকাব্য

সূচি

মধ্য দিনমানে

মধ্য দিনমানে ঈষৎ কম আলো
পুকুরে ঝাঁপ দেয় মাছরাঙা
বাতাস উন্মন, কাজ-ভাঙা!

মাঠের শেষ রেখা নীলের মতো কালো
একলা কেউ হাঁটে টোকা মাথায়
পিঁপড়ে ভেসে যায় ঝরা পাতায়

জানলা খোলা আমি কীসের ডাক শুনে
দাঁড়াই শিক ধরে নিষ্পলক
সহসা অশনির এক ঝলক!

দিনের পর দিন দণ্ড-পল গুনে
ভুলের পর ভুল প্রতীক্ষায়
ভেবেছি এ ভাবেই জীবন যায়।

দেশকে কোনো দিন জননী বলিনি তো
মাটির পৃথিবীটা নারীও নয়
ও সব মাঝে মাঝে বিকার হয়।

তবু এ দিবাভাগে বৃষ্টি বর্ণিত
ধুলোর সংসারে এ কী মায়া
চক্ষে লাগে যেন ধূপছায়া।

এই যে ধরণীর এমন চেয়ে থাকা
ইহার মাধুরীর নীরব ডাক
বুকটা কেঁপে ওঠে। রুদ্ধ বাক্

সুষমা খুঁটে খুঁটে দু'হাত ভরে রাখা
দিয়েছি কতটুকু ইহজীবন
কত যে ঋণী এই শরীর-মন!

সাত সকালে নীরা

শায়ার ওপর পুরুষ-জামা, সাত সকাল নীরা
চিরুনি-ভোলা খোলা চুলের চালচিত্রে মুখ
পেস্ট না ছোঁয়া ঠোঁটে এখন ঘুম ভাঙার গন্ধ
হাত দু'খানি নিরাভরণ, কানের লতি মুক্ত
জানলা খুলে এক ঝলক বাতাস মেখে নিলে...

প্রসাধনহীন নীরা হঠাৎ এ ভোর বেলা আমাকে সুদূরে নিয়ে গেল

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা লক্ষ বছর আগে
নদীর নাম সরস্বতী, অথবা নামই ছিল না
বৃক্ষটিও শাল্মলী বা শিংশপার মতন
তার ছায়ায় আগুন মাখা সেই গোধূলি বেলা
গাছের ছাল ঘিরে রেখেছে অর্ধতনু, চুলে
ধুলো কিংবা ফুলের রেণু, একটি লোভী ভ্রমর
তোমার ওষ্ঠাধরের মধু পানের আশায় ঘুরছে
কালিদাসের উপমা চুরি, হয়তো মার্জনীয়
তুমি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গিতে হানলে এক বিদ্যুৎ
ঠিক তখনই বৃষ্টি এল, তুমি বসন খুলে
নেমে পড়লে নদীর জলে, নদীটিও তো নগ্ন
দুলতে লাগল স্রোতের ধারায় তিনটি বুনো হংসী

আমাদের বনবাস, সেই স্মৃতি, একটুও মলিন হয়নি আজও দেখ

কয়েকখানা পাতায় ঢাকা কোমর, আমি কাছেই
লগুড় হাতে দাঁড়িয়েছিলাম, তখনো বাল্মীকি
ক্রৌঞ্চবধে উচ্চারণ করেননি তাঁর শ্লোক
আমার কোনো ভাষা ছিল না, তবু রূপের বিভায়
যেন ক্ষণেক অন্ধ হয়ে পড়ছি ভূমিতলে

অস্ত্র ফেলে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে প্রকৃতিকে
যেন তুমিই, তুমিই নীরা, করেছি কত আদর
হীরা পাথর, চুনী পাথর, মাটিতে সোনা রুপো...

এবার বাথরুমে যাবে, সারাদিন অন্য ছবি, সব প্রয়োজন অকারণ

কাঁচপোকার চোখের আয়নায়

প্রৌঢ়টির চোখের পর্দায় একটি অদৃশ্য নারীমুখ
কুয়াশা এগিয়ে আসছে, এক্ষুনি নদীর সঙ্গে শুরু হবে রতি
মানুষটির পায়ের নীচে যে ভূমি, সেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো
নক্ষত্র-কণা
সে ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করে, তার মাথা ছাড়িয়ে যায়
রুদ্র পলাশের চূড়া
আর উঁচু হয়ো না অ্যারিস্টট্‌ল, আকাশে মাথা ঠুকে যাবে যে!

এর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল তমসা নদীর তীরে
ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির বধের সময় এ বলল,
বেশ করেছিস নিষাদ!
অন্যজন চোখের জলের সঙ্গে উচ্চারণ করল শ্লোক
সঙ্গে সঙ্গে দু' দিকের দুটো রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল
সাদা কালো মানুষ
ভেসে আসছে শরীরবাদীদের উদাস বিরহের গান
একটা ঘাসের ডগা কাঁপছে স্বপ্ন-দেখা চোখের পাতার মতন
ভোরের আলোয় ঝরে পড়ছে স্বর্গের বেহালা বাদকদের
লোকসঙ্গীতের সুর

দশই জানুয়ারি, ষোলোশো দশ, গ্যালিলিও গ্যালিলি
হাপিস করে দিলেন সেই স্বর্গ!

যারা স্বর্গ-বেশ্যাদের নাচের ঘূর্ণির পায়ে নিবেদন করেছিল
তপস্যার পুণ্য
তারা এখন সোনাগাছি খুঁজতে খুঁজতে হারিয়ে যাচ্ছে অনবরত
পিঁপড়েদের শোভাযাত্রায়
বস্তুবিশ্ব বহুরূপী গিরিগিটির মতন রূপ বদলাচ্ছে বারবার
আকাশে আকাশ নেই, সময়ের শুরু ও শেষ নেই, তুমি কেন
জন্মেছিলে মানুষ?
সামান্য এই প্রশ্নটিরও উত্তর পেলে না আজও
জানলার পর্দা, রোদ্দুরে সোনার ফ্রেম, কাঁচপোকার চোখের
আয়নায়
এ আমি কী দেখলাম?

শিল্প ও ছন্দপতন

একটা মেল ট্রেনের হঠাৎ ড্রাগন হবার ইচ্ছে হয়েছিল
আগুন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে যখন শূন্যে
লাফ দিতে উদ্যত
পাহাড়ের চূড়া থেকে এক জাদুকর বলল, দাস ফার
অ্যান্ড নো ফারদার!
অনেক দূরে মুচকি হেসেছিল সমুদ্র।

একটি রমণীকে উপহার দিতে গেলাম গুঞ্জাফুলের মালা
সে বলল, আমি টিশিয়ানকে ভালোবাসি, আমাকে
মুখ ফেরাতে বলো না

শিল্পের নারীরা কখনো মুখ ফেরায় না, মাটির প্রতিমাই
শুধু গলে গলে পড়ে
শিল্পের নারীরা মাকড়সানীদের মতন শিল্পীকেও খেয়ে
হজম করে ফেলে
মাটির প্রতিমা খিদেয় ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার খুদে ছেলেমেয়েরা
হাপুস নয়নে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়
তার বুকের আবরণী ছিঁড়ে গেলেও কেউ চেয়ে দেখে না
এত অন্ধকার, চাঁদের ওপিঠের মতন চির অন্ধকার তার
নাভি নিম্নে
বাসি ফুল আর বেলপাতায় দাপাদাপি করে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর
শব্দে গাঁথা মালাটি কচমচিয়ে খেয়ে যায় ছাগলে...

এবার সমুদ্রের পালা
সে মেল ট্রেনকে বলল, ভাঙো, ভাঙো, ব্রিজটা ভেঙে
ঝাঁপ দাও খাঁড়িতে
ওসব জাদুকর-ফাদুকর, রাজা-গজা আমি ঢের দেখেছি
কোনো কবিকে কখনো দেখেছ, তোমার ছন্দপতন নিয়ে
চোখের জল ফেলতে
ঐ ওরা যাকে বলে কবিতা?

আমাকে ধরো ধরো

আমাকে ধরো ধরো, তলিয়ে যাচ্ছি যে
আমাকে তুলে ধরো
ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে, আমাকে ঠেলে দেয়
হিংসা পাংশুটে
আমাকে তুলে ধরো, অকূল কিনারায়

আঙুলে শুধু ভর
যেখানে ছিল নীলকমল কত শত
সেখানে এত ক্লেদ
হে দেশ, প্রিয় দেশ, কোথায় যাব আমি
বুক যে ভেঙে যায়
স্বপ্নে ছিলে তুমি, চক্ষু মেলে দেখি
সে দেশ তুমি নও
রক্তমাখা দিন, রক্তে ভরা নদী
সে দেশ তুমি নও
অকূল কিনারায় আঙুলে শুধু ভর
দ্বিধার এক পল
চরম চলে যাব, কাচের মতো মিহি
ধুলোয় মিশে যাব
বুক যে ভেঙে যায়, আমাকে ধরো ধরো
কেউ কি বলবে না
যেও না থাকো থাকো, দ্যাখো এ করতলে
তোমার নাম লেখা
এদিকে চোখ রাখো, কাঙাল, চেয়ে দেখো
ফিরেছে ভালোবাসা!

জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা

তিনদিন শুয়ে আছো, নীরা, চোখের পাতায় ভাঙা ভাঙা ঘুম
জ্বরের বিছানা জুড়ে, সিলিং-এ, খাটের নীচে স্বচ্ছ প্রজাপতি
মশারির বাইরে শীত, বাথরুমে ঠিক ঝর্না পতনের ধ্বনি
মেরুন চাদরে মুড়িসুড়ি, শুধু পা দুটিতে রোদ আঁকিবুকি

জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা, তুমি আপেল খেও না
আঙুর না, বেদানা না, হাসপাতাল নয় তো, নিজের শয্যায়
কিছুই খাবে না, বই পড়বে না, লক্ষ্মী সোনা, চোখ খোলা রাখো
ডাক্তারকে লঘু হাস্যে বলে দিও, ছুটি নিয়ে কাঠমাণ্ডু যাক!

বহুদিন দূরে ছিলে, আজ এত কাছে যেন মহাশূন্যে দেখা
মহাশূন্য? নীল রঙে ভেসে ওঠা নির্জনের এই সমারোহ
না-দেখা জাজ্জ্বল্যমান, শিল্পের সমূহ টান, এত ছবি লেখা
শরীরে পাও না টের, নীরা কারও নিশ্বাসের বিশল্যকরণী?

বাঁশির শব্দ

এই তো সেদিন তেজী, অস্থির, ব্যস্ত বাবা কোনওক্রমে সময়
বাঁচিয়ে
দায়সারা সময় দিত ছেলেকে
শোনাত মেঘনাদ বধ, টিনটিন ও কণিষ্কের মুন্ডু কাহিনী
এখন সেই বাবাই ছেলের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে
বারবার
কমপিউটারের ইঁদুর সরানো শিখতে ভুল করছে,
বাবার শিরা-উপশিরা থেকে যৌবন শুষে নিয়েছে ছেলে
জিনবাহিত উত্তরাধিকারের মধ্যে কোথাও শোনা যাচ্ছে
একটা বাঁশির সুর
ঝর্নার পাশে বল্কলের পোশাক পরে একজন কেউ
সুর সেধেছিল

ইন্টারনেটের মধ্যে যতই উঁকি মারছে সারা বিশ্ব
ততই বাবা ও ছেলের মধ্যে চওড়া হচ্ছে দূরত্ব

টুকরো টুকরো বাক্য ও নিস্তব্ধতা, তবু
কত কথা জমে আছে
ঝনঝনাচ্ছে টেলিফোন, রিসিভার তোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত
আমার না তোমার?
খেলনা টেলিফোন ভেঙে ফেলে একদিন যে কেঁদেছিল
এখন সে বলছে, ই-মেল আসছে, বাবা, তুমি ধরো না
ক্যাসেটে আধা-পর্নোগ্রাফি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল
প্রৌঢ় মানুষটি
ছেলে টি ভি বন্ধ করে বাবার গায়ে বিছিয়ে দিল কম্বল
মা শখের রান্না ঘরে ছ্যাকছোঁক শব্দে, স্ত্রী জল-ফোয়ারার নীচে
ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল
আবার নেমে এল নীচে
অনেক কথা বাকি আছে তাই বসল বাবার শিয়রের কাছে
বাবা যেন একটা শিশু, তার ইচ্ছে করল হাত বুলিয়ে দিতে
জন্মদাতার কাঁচা পাকা চুলে
দিল না, বাবার চেয়েও বড় হয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল
জিনবাহিত উত্তরাধিকারের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একটা
বাঁশির শব্দ...

নিতান্তই একজন মানুষ

এসো, এবার সবাই নিজের নিজের দরজায় ঢুকে যাই
একজন রাত জেগে বসে রইল বাইরে
এসো, সকাল হয়েছে, কত রকম লাইনে দাঁড়াতে হবে
একজন সরে গেল আড়ালে
এসো, এবার একসঙ্গে হাত বজ্রমুষ্টি করি

শুধু একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না
সেই একজনের জন্য এত ব্যাকুলতা, এত চোখ-ছোটাছুটি
সে কোথায়, সে কেন অদৃশ্য হয়ে গেল
যেন সব কিছু থেমে যাবে
তাকে আগে চাই, ধরে আনো, সবার সামনে দাঁড় করাও
অথবা কাঠগড়ায়
নইলে যে কারুর ঘুম আসছে না, সব লাইন শুনশান
একজন নেই, তাই কারুরই কাজে মন নেই
হঠাৎ বৃষ্টি নেমে পায়রার দঙ্গলের মতন সবকিছু ছত্রভঙ্গ
আকাশ-বাতাস, গলি-ঘুঁজি তাকে লুকোতে পারবে?
অথচ কোনও চেনা বাড়িতে সে নেই, সমস্ত অচেনা বাড়ির
জানলা খোলা
উল্টো-সোজা মানুষেরা হাত তুলে বলছে
আমি নই, আমি নই
কেউ তার মুখ মনে রাখেনি, এমনই মনে-না-রাখার মতন মুখ
কেউ তার নাম মনে রাখেনি, এমনই মনে-না-রাখার মতন নাম
যদিও সে ছিল চায়ের দোকানে, পার্কে, তোমার আমার
পাশে পাশে, কখনও একটু থেমে, জুতোর ফিতে বাঁধতে
দেরি করে
সে কোথায় পালাল, তাকে না পেলে যে সবকিছু ব্যর্থ!

সে এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে এক ধু ধু দিকশূন্যপুরের
দিকে
কোন্ দিক সে জানে না, তবু ওই দিকেই যেন তাকে যেতে
হবে
গাছের ছায়া হাতছানি দিচ্ছে তাকে
দু' একবার থমকে গিয়ে, নষ্টচন্দ্রের শৈশবের চোখে তাকিয়েও
সে থামছে না
তার ভয়বোধ নেই, তবু সে হারিয়ে যাচ্ছে
বিশ্বাসের সংঘাত নেই, তবু সে নিঃসঙ্গ

সে অনেকের হাত ধরেছে, কিন্তু পায়ে পা মেলাতে পারেনি
সে মিলিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে
খাল পেরুবার ছোট্ট একটা সাঁকো
তার নীচে খুব মায়াময় একটুকরো আকাশ
বাঁশঝাড়ের সরসর শব্দে আবহমানের বাল্যকাল
টনটনে দুঃখময় ভালোবাসার মতন
একটা নদীর বাঁক
বাতাস ওড়াচ্ছে কাশফুল, অথবা কাশফুল
উড়তে চাইছে বাতাসে
যেমন একদলা মাটি পুতুল হতে চেয়েছিল
পুতুলটাও হঠাৎ ফিরে যেতে চায় মাটি-জন্মে
ফল ফিরে যেতে চায় ফুলে, নর্তকী ফিরে যেতে চায়
মাতৃগর্ভে
ইস্কুলমাস্টাররা ছাত্রজীবনে, পিতার ছবি
তার সন্তানের মুখে
সে কোথায় ফিরে যেতে চায়, তালকানা, বর্ণকানা
জন্মান্ধের মতন?

যেখানেই যাক না, ছেড়ে দাও না ওকে
একজনই তো মোটে, এলেবেলে, কিছু না
ও তো আলাদা কণ্ঠস্বর তোলেনি
ফিসফিসিয়ে ও বলেনি কিছু
সন্ধে কিংবা রাত্রিভোর, কিছুতেই কিছু যায় আসে না
ওকে মন থেকে ছেঁটে ফেলে দাও
তলোয়ারের মতন বিদ্যুৎ অথবা যুঁই সমারোহের মতন
জ্যোৎস্না
এসো, আমরা এইসব দেখি, শুরু হোক কর্মযজ্ঞ
মাঠের মধ্য দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে একজন মানুষ
চরমতম একলা, তার পায়ে বোধহয় কাঁটা বিঁধেছে
সে হাঁটছে, একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে

তবু কেন হাজার হাজার নারী-পুরুষ হ্যাংলার মতন
চেয়ে আছে তার দিকে
সুদূরে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুটি থেকে ফেরাতে পারছে না,
দৃষ্টি
কেন বাতাস এত দীর্ঘশ্বাসময়
কেন আর সব কিছু থেমে আছে?

এই অনিত্যে এমন মায়া

তিন আঙুলের একটা জীবন, সাত শো মাইল অন্ধকার
সাত শো মাইল অন্ধকারে একটা বিন্দু, একটা জীবন
তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, মধ্যে একটা শাপলা ফুল
আবার বলি, তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, ভরা বিষাদ
মধ্যে একটা শাপলা ফুল
সেই ফুলটাই চক্ষু টানে, এই অনিত্যে এমন মায়া

ছদ্মবেশে ঘুরছি ফিরছি, ডুবে যাচ্ছি নিজের মধ্যে
গভীরতায় ডুব সাঁতার, কালের চেয়েও আরও অধিক
সবাই জানে সুসামাজিক, গ্রীবায় নেই ভুলের রেখা
ঠিক ছন্দে পা মেলাচ্ছি সবাই দেখে, কেউ জানে না
ভালোবাসার কাঙাল একটা ভিক্ষে করে দু'বেলা খায়
ভালোবাসার কাঙাল একটা ভিক্ষে করে দু'বেলা খায়
ভালোবাসার গোলকধাঁধায় ভালোবাসাকে খুঁজে বেড়ায়
ভালোবাসায় দু'হাত ভরা, ভালোবাসায় চক্ষে আঠা
বুকের পাশে ভালোবাসা, পায়ের নীচে ভালোবাসা
আবার বলি, তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, ভরা বিষাদ
মধ্যে একটা শাপলা ফুল
সেই ফুলটাই চক্ষু টানে, এই অনিত্যে এমন মায়া!

রাজকুমারী ও এক ভিখারি

চাকরির দরখাস্ত হাতে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সলজ্জ শরীরে
তাকে বসতেও বলা হয়নি
ক্ষমতার ধ্বজাধারী ব্যক্তিটি এমনই ব্যস্ত, চোখ ঘোরাচ্ছেন অনবরত
তাঁর আসলে পাঁচ সাতটা মাথা, বারো চোদ্দটা হাত
হৃদয় আধখানা
ঘর ভর্তি অনেক মানুষ, টাইপ রাইটারের শব্দ
বুক পকেটে টেলিফোন
টেবিলের ওপর বিমানের টিকিট, খালি পা, তাঁর জুতো পালিশ হচ্ছে
তিনি মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছেন না
ওর হাতের কাগজটা দেখারও দরকার নেই, তিনি জানেন—
চাকরি খোলামকুচি নয় যে যত ইচ্ছে বিলোনো যায়
তা ছাড়া রাশি রাশি সুপারিশের ধাক্কা
যাকে কিছু দিতে পারবেন না, তার সঙ্গে কথা বলারই বা দরকার কী
এমনিতেই মিথ্যে বলতে বলতে মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে
তিনি মাঝে মাঝে গোপনে কুঁচকি চুলকোচ্ছেন
আর লাল টেলিফোনে অনুবাদ করছেন হাসি ঠাট্টা

মেয়েটির ছিপছিপে তনুতে নীল শাড়ি, চুল খোলা
আভরণহীনা, চোখের কোণে শুকনো জলের দাগ
সে এক সময় বলল, আমি যাই?
কয়েক পলকের জন্য চোখাচোখি, তিনি চমকে উঠলেন
কে এই ছদ্মবেশিনী? যেন এক ঝলক যৌবনের দ্যুতি
চিরকালের মতন পরিত্যাগ করে যাচ্ছে তাঁকে
এই ব্যস্ততার পূতিগন্ধময় আবর্জনায় নির্বাসন দণ্ড আজীবন
তিনি হাঁটু গেড়ে আর্ত গলায় বলতে চাইলেন
যেও না, দাঁড়াও, আমি অকিঞ্চন, কৃপাজীবী
আমাকে দেবে তোমার করুণার এক কণা?
বলা হল না, পিছন ফিরে মেয়েটি চলে গেছে দরজার কাছে
বিপদ সঙ্কেতের মতন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে আবার টেলিফোন...

বর্ষার গান

বর্ষার ঝাপটে ঘুম ভাঙল কি কাঁচপোকাদের সংসারে
কাঁচপোকা তার প্রতিবেশীদের ডেকে বলল, হাহা-হাহা-হাহা
সাপেদের গর্ত ডুবু ডুবু, নদী ফুলে ফেঁপে ছুঁতে চায় মেঘলা আকাশ
আকাশ দেখেনি যারা তারা দেখল অশনি ঝলকে যেন খুলে যায় স্বর্গের জানালা
এ সময়ে তারা খসে পড়ে, বড় কোমল মায়ায় মিশে যায়
গ্রামবাংলায় আলো, যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানেও বিদ্যুতের আলো
অকস্মাৎ এক ঝলক, এত তীব্র, দেখা যায় বাচ্চাদের খিদে মাখা মুখ
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ছুটে আসে ভিজে চুলে পুকুর-কিশোরী
বৃষ্টির চাদর গায় একজন মানুষ
দুনিয়া বিস্মৃত, লঘু পদচারণায় রত একজন মানুষ
স্পষ্ট দেখা যায় তাঁকে, শোনা যায় গুনগুনানি
শ্যামলীর বারান্দায় নির্জন রবীন্দ্রনাথ
গান বাঁধছেন।

বিন্দু বিন্দু

পাথর

এক যে ছিল পাথর, তাকে হঠাৎ কারা
বানিয়ে দিল দেবতা
পাথরটি তা চেয়েছিল কি চায়নি, কেউ
কখনো ভাবে সে কথা?

গুরু-শিষ্য

গুরু অ্যারিস্টট্‌ল, তাঁর পিঠে চেপেছে ছাত্র
গুরুর বয়েস অনেক, ছাত্র বছর দশেক মাত্র।
গুরু হলেন ঘোড়া, ছাত্র ছপটি মারছে বারবার
বিশ্বজয়ে যাবেই যাবে, নামটি আলেকজান্ডার।
পণ্ডিতে বই লিখছে শুধু, লাগে কলম-কাগজ
রক্ত ছড়ায় ছাত্রের দল, লাগে না কোনো মগজ!

সত্য

সত্য কাকে বলে?
হস্তী দর্শনের মতো কত ব্যাখ্যা নানান ছলেবলে
হস্তী আসলে কী?
গুলি চালাও, ছবিতে রাখো, জ্যান্তটাই মেকি!

নারী-স্বাধীনতা

এমনও তো হতে পারে, মেয়েরা বলতেই পারে
কিছুতেই ছেলেদের করব না বিয়ে!
অজাত শিশুরা সব বিমান ও রেলপথ
গাড়ি-ঘোড়া, রাস্তাঘাট দেবে আটকিয়ে?

এখন

রাখালরা আর বাজায় না বাঁশি
রাজপুতরাও চালায় না অসি
বাঘ গর্জায় চিড়িয়াখানায়
ভূতেরা এখন সিনেমা বানায়।

ভালোবাসা

ভালোবাসায় আছে একটা অতি গোপন আলো
কেউ দেখে না সেটা, কিংবা কেউ বা দেখে কালো
ভালোবাসার অন্ধকারেও জ্বলে সবুজ শিখা
কেউ পেয়ে যায় পথের দিশা, কেউ বা মরীচিকা।

প্রজাপতি

শ্রম ছাড়া ধনরত্নের স্বাদ পাবার উপায় কিছু নেই আর
গরিব কবিরা খাটো, খাটো, খুব শরীর ঘামাও কাজে দাও মতি
এই কথা লিখে গিয়েছেন কবি, মহান ফরাসি আপোলিনেয়ার
কত কবি মুখে রক্ত তুলছে, গুটিপোকা থেকে হবে প্রজাপতি।

কলম

কলম বলল, অনেক দিন তো থাকতে হল
অন্য হাতের অধীন
এবার নিজেই রচনার কথা ভাবব।
হাতটি বলল, ভালোই তো ভাই, খাটতে খাটতে
হয়েছি বিষম ক্লান্ত
স্বাধীন ভাবেই লেখো না অমর কাব্য!

কুমির

কুমিরেরা সত্যি যদি লোপ পায় নদী-খালে-বিলে
তাদের কান্নার কথা থাকবে না আর অভিধানে?

খরা ও বন্যায়, ভোটে, মন্দিরে-মসজিদে রক্ত ক্ষয়ে
কুম্ভীরাশ্রু বয়ে যাবে তবু জোয়ারের হু হু টানে।

কবিতা-গদ্য

একটা কবিতা কবুতর হয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে
তবু মেঘহীন সন্ধ্যায় কবি ঝড়-ঝঞ্ঝাটে আটকা
কাজ-অকাজের দু'খানা কেল্লা গোলাগুলি ছোড়ে গদ্যে
কে জেতে কে হারে, ভুরুসন্ধিতে এই নিয়ে চলে ফাটকা!

দীর্ঘশ্বাস

পেয়ারা গাছের ডালে দোল খায় কৈশোরের স্বপ্নময় ছবি
জলের আয়নায় স্বর্ণ ভোরবেলা মাধুর্যের কণাগুলি ঝলসে ওঠে গুপ্ত ইশারায়
আলোকলতার মূল খোঁজে এক দার্শনিক, হেসে ওঠে অবিশ্বাসী কবি
আকাশের দেবতারা লোভীর মতন দেখে, কত দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায়।

মাতৃভাষা

ঘুঁটে কুড়ুনির ছেলেটি দিব্যি পড়তে শিখেছে বই
গড়গড় করে ছড়াও সে বলে খাসা
মাকে সে শুধোয়, জননী বানান দীর্ঘ-ই নাকি হ্রস্ব-ই
হায়রে
কত না মায়েরা শেখে না মাতৃভাষা!

স্বাধীনতা

দেশটা হয়েছে স্বাধীন, এবার পূর্ণ অর্ধ শতক
তবু মনে মনে রয়ে গেছে এক ধন্ধ
কত হল সেতু, বাঁধ, কারখানা, আকাশচুম্বী সৌধ
শুধু ফুল থেকে চলে গেল কেন গন্ধ?

অমরত্ব

জানতেন কি রাজা অশোক ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে
ঠিক ক' পাতায় চিরকালের স্বত্ব?
শাজাহান কি তাজমহলটা বানিয়ে ছিলেন পাঠ্যবইয়ের
ছবির লোভে, তাতেই অমরত্ব?
তবু তাঁদের কীর্তি গরিমা যুগ যুগ সঞ্চিত
কত তলোয়ার ঘোরানো বীরেরা রয়ে গেল বঞ্চিত!

বনভোজন

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে কেউ না
কী করে পশুরা জেনে গেল সেটা, হি হি করে হাসে হায়েনা।
মানুষের হাতে ভিক্ষের ঝুলি, মানুষের হাতে অস্ত্র
কেউ হাঁক ডাকে গগন কাঁপায়, কেউ ভয়ে গলবস্ত্র।
জন্তুরা এই গল্পে মেতেছে, পাখিরাও মাতে কূজনে
ভারী কৌতুকে মিলেছে সবাই, বসে গেছে বনভোজনে।

পরিত্যক্ত

সাহেবরা গেছে, রেখে গেছে কিছু
থুতু ও গয়ের, শ্লেষ্মা
তৈরি হয়েছে নকল নবীশ
স-টাই, বাঁদর, বেশ্যা!

হরি, হরি

সাপটি বলল, ওহে ব্যাঙ ভায়া, যথেষ্ট হল খেলা
এবারের মতো জপ করো হরিনাম
ব্যাঙটি বলল, হরি তো নিজেই দূরদর্শনে আটক
কী আর করব, পুরাও মনস্কাম!

মা ও মাটি

মায়ের কথা শুনতে গেলাম ধানের ক্ষেতে, বিদ্যুৎ চমকাল
মা-মাটি সব পিতৃহীনের মতন মিশকালো
রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য, সেই রক্তে ছিল জল
অন্ন নেই, ভোটের কাগজ, কাগজই সম্বল!

খাওয়া-দাওয়া

একটা সময় পাথর চিবিয়ে খেতুম, কিংবা লোহা
বললেন এক অম্বুলে রুগি হাত পা ছড়িয়ে চাতালে
আজকেও যারা পাথর মিশিয়ে আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ
তারাও যখন তখন ছুটছে, পেট রোগা, হাসপাতালে!

কেউ জানে না

দেশ হয়েছে স্বাধীন
একটা, দুটো, তিন পেয়ালা চা দিন।
বোমা ফাটাল ফুটুস মোটে পাঁচটা
ফিকফিকিয়ে হাসে অশোক গাছটা।
দেশ বিদেশে কত কি লোকে ভাববে
কেউ জানে না কী লেখা হল উপন্যাসে, কাব্যে।

নদী ও খাল

খাল বলে নদীটিকে, কী যে তোর চেহারাটা
এত আঁকাবাঁকা
সভ্য সমাজে আর মান রাখা দায় হয়
আজ থেকে আত্মীয় বলে ডাকা মানা।
নদী বলে বেশ কথা, আমি আর কত দিন,
ঠিক নেই থাকা বা না থাকা
তুমি ভাই বেঁচে থাকো, জলে যদি টান পড়ে
পাহাড় বা সাগরের জানো তো ঠিকানা?

বকুলতলায়

বিকেল পাঁচটায় তুমি দাঁড়িয়ো বকুল গাছটার নীচে
আমি ঠিক যাব, দেখা হবে
যদি না যাই, যদি না যেতে পারি?
পাতাল থেকে হাত বাড়িয়ে যদি পা ধরে টানে শয়তান

বকুল শাখা থেকে ঝরে পড়ছে এক একটি মুহূর্তের ফুল
আমার চুলের মুঠি ধরে কে পেছন থেকে টানছে?
কারা ঠিক এই সময়ে আগুন দিল ট্রাম-বাসে?
বকুল গন্ধে উন্মন বাতাস, বকুল গন্ধে ফিসফিসানি
প্রত্যেকটি পাতা উদগ্রীব হয়ে দেখছে তোমাকে
তুমি দাঁড়িয়ে রইলে একলা
তোমার ফর্সা ডান হাতে কালো ব্যান্ডের ছোট ঘড়ি
আর কিছু নেই, সমস্ত দৃশ্যের মাঝখানে তোমার নিঃসঙ্গতা
পৃথিবীর কোনো বকুল গাছ আমাকে আর কোনোদিনও
ক্ষমা করবে না।

চিঠির উত্তর

উত্তর দেব ভেবে চিঠিখানা রাখলাম একটা বইয়ের ভাঁজে
তারপর কখন টেবিল থেকে সরে গেল বইটি
তারপর দিনের পিঠে লাফিয়ে পড়ল আর একটি দিন
পরদিন আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলকের পর নামল
সতেরো কোটি বৃষ্টির ফোঁটা
মাঝপথে একটা ট্রেন থেমে গিয়ে হুইস্‌ল দিতে লাগল ঘন ঘন
বিদ্যুৎ উধাও হয়ে সন্ধেবেলাটি হল আদিমকালের মতন
সকালবেলার খবরের কাগজ রক্তে মাখামাখি
ক্যাস্ট্রো কি ক্লিন্টনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন,
না মেলান নি?

তাতে আমার কিছু যায় আসে?

কী বই ছিল সেটা, কিছুতেই মনে পড়ছে না

ঢাকনা-খোলা ড্রেনের মতন মনের মধ্যে অনবরত জমা হচ্ছে
ইতিহাসের বহু অমীমাংসিত বঞ্চনার কাহিনী
প্রত্যেক দিন যত সিঁড়ি দিয়ে উঠি, তার চেয়েও বেশি সিঁড়ি দিয়ে নামি
কত বই নিজেরাই হারিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল
একটা চিঠির উত্তর প্রস্তুত হয়ে আছে বর্ণে বর্ণে
লেখা হবে না কোনোদিন।

খণ্ডকাব্য

যাকে ভালোবাসি তার ঘুম, তার ঘুম ছাওয়া মুখখানি এমন অচেনা!
পাশে যে রয়েছে শুয়ে, সে কে? সে কোথায়?
শরীর আলাদা কথা, এমনকি খোলা চুল, ভ্রূসন্ধিতে ঘাম
সেও তো শরীর, পায়ে স্তব্ধ অস্থিরতা, আর ঊরুর উত্তাপ
তবু যেই পাশ ফেরা, আধো মুঠি, ওষ্ঠে কোন্ মায়া
অসমাপ্ত এ জীবন, ভালোবাসা অলীক ভ্রমর
অথবা উপমাহীন, বাথরুমে মৃদু আলো, কেউ তো জাগে নি
বন্ধ জানলার কাচে রাত পোকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, শব্দ হয়
সে শুয়ে রয়েছে খোলা চুলে, ক্ষীণ শায়ার দড়িতে
ঘুম বিহারিণী, তুমি কোন্ রাজ্যে, কোন্ পথিকের সহচরী
যেমন আমার স্বপ্নে তুমি নেই, সে কথাটা বলেছি কখনো?
জাগরণ দিয়ে ঘেরা যতটুকু, তার বাইরে নিষিদ্ধ সীমানা
জাগরণ দিয়ে ঘেরা যতটুকু তাই বাইরে আমরা কেউ নই
ভালোবাসা খণ্ডকাব্য, বাকিটুকু লেখাই হবে না।

লেখা আর ঘুম

একটা লেখা, আরও একটা, কটা লিখব আজ?
কাজের মধ্যে ছুটি আমার, ছুটির মধ্যে কাজ
রোদ্দুর না, বৃষ্টিও না, বাইরে চেয়ে কিছুই দেখব না
যতই ভোরে বাঁশি বাজুক, সন্ধেবেলা যতই ঝরুক সোনা।
চেয়ার ছেড়ে যাওয়া নিষেধ, চেয়ার জুড়ে দিন রাত্রি কাটে
কলম ছোটে পাহাড় চূড়ায় কলম ছোটে সাগর, নদী, মাঠে
সাদা পাতায় রাত্রি জাগি, ঘুমোই কালো পাতায়
রবীন্দ্রনাথ হাত বুলিয়ে দিলেন আমার মাথায়।

স্থির মুহূর্ত

ওদের একটু চুপ করতে বলো, আমি আপাতত
নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কথা বলছি

গেট ঠেলে সবাই ঢুকে পড়ছে পরের বাড়িতে
কেউ দেখছে না সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে
কত সোনার বোতাম

ঝুল বারান্দায় একটি স্বচ্ছ নারীমূর্তি, তাকে ভেদ করে যাচ্ছে
পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম রশ্মি
বেতের চেয়ারে আধো ঘুমন্ত পিতামহের দিকে
খলখল করে হাসতে হাসতে মৃত্যু এগিয়ে আসছে
একটি বালকের রূপ নিয়ে
ওকে একটা খেলনা দাও না, একটা সীমান্ত যুদ্ধ

যারাই পরের বাড়িতে আসে, গেটে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে
পাপোশে সিগারেটের ছাই ফেলে কেউ কেউ তাকায় অপরাধী চোখে
ওদের সবাইকে স্থির মুহূর্ত দাও
আমি আপাতত নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কথা বলছি
স্থির মুহূর্ত, স্থির মুহূর্ত!
ঝুল বারান্দার রমণী এবার ঝাঁপ দেবে সায়াহ্নের দিকে
সবই পূর্বকল্পিত, ভবিষ্যতের ছবির মতন
তার আগে আমি জরুরি কথাবার্তা সেরে নিচ্ছি
এখুনি স্থির মুহূর্তের সঙ্গে জুড়ে যাবে দুটি ডানা।

অমৃত শিশুরা

পৃথিবীর পেট ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় শতাব্দীর অমৃত শিশুরা
চতুর্দিকে হা-হা শব্দ, আরও চাই, আরও দাও, দাও
স্তন্য নয়, স্তন দাও, পীযূষ কে চায়, দাও রক্ত দাও, দাও
রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে দুনিয়া দাপায় আজ অমৃত শিশুরা।

এক বটবৃক্ষে আজ শ্বেতকেতু প্রশ্ন ভুলে প্রাণ খুলে হাসে
বৃক্ষটির পাতা নেই, ন্যাড়া ডালে শীর্ণ আলো, ক্ষুধার্ত আঙুল
চতুর্দিকে ভেদ বমি, গন্ধ চাটে গর্ভপাতে উন্মুখ আঙুল
অনাগত কালে কেউ খেলার সঙ্গীও চায় না, একা একা হাসে!

শূকরীর মতো তবু এ পৃথিবী সন্তানের জন্ম দিয়ে যায়।

মন্দির-কাহিনী

ট্রামটা যখনই চারমাথা মোড় পেরোয়, অফিসবাবুরা
হাত দুটো তোলে কপালে যেদিকে কালী ঠাকুরের মন্দির
তিরিশ বছর আগে যা দেখেছি, এখনও ছবিটা তেমনি
সে সব অফিসবাবুরা অনেকে হাড় জুড়িয়েছে শ্মশানে
কিংবা ছেলের সংসারে আজ বিনা বেতনের ভৃত্য
হাত জোড় করে কী চেয়েছিলেন, কী বা পেয়েছেন কে জানে!

ছেলেরা এখন অফিসযাত্রী, একই রাস্তায় রোজ যায়
ঠিক জায়গায় হাত জোড় করে, চোখ বুজে কিছু বিড় বিড়
মন্দিরখানা প্রায় একই আছে, খসেছে কিছুটা চল্‌টা
কালী মূর্তির স্তন খুঁটে যায় আরশোলা এক গন্ডা
কলার খোসা ও রাশি রাশি বাসি ফুল পচা কটু গন্ধ
ধেড়ে ইঁদুরেরা রাজত্ব পেয়ে রাত্তিরে করে হুল্লোড়
গত বছরই তো চোর ঢুকেছিল, নিয়ে গেছে সব গয়না
পুলিশরা এসে ভোগ খেয়ে গেছে, ঢালাও মদ্য মাংস!

পুরুত মশাই কাঁদছেন, তাঁর মেয়ের প্রেমিক খ্রিস্টান
ছেলেটা দিব্যি বোমা বানাচ্ছে, বাড়িতে দেয় না পয়সা
মল্লিকবাবু সেবায়েৎ, তাঁর লিঙ্গেও বাঁধা মাদুলি
তবু গাঁটে গাঁটে বাতের বেদনা, বাঁজা রইলেন গিন্নি

মহাকাল থেকে ঝুরঝুর করে খসে পড়ে কিছু ময়লা
একটি বৃদ্ধা রোজ ভোরবেলা ঝাঁট দিতে দিতে ক্লান্ত
তারই ফোকলা মুখের হাসিটি ধার চায় কালী মূর্তি
তিনটি ভিখিরি চট পেতে বসে, কুকুরটা করে ঘুর ঘুর
প্রথমেই আসে রুক্ষ নারীটি, প্রণামের ছলে কেঁদে যায়
অশ্রু ফোঁটায় প্রতিদিন শুরু হয় জীবনের গল্প...।

‘সারাদিন ছুটি আজ...’

সারাদিন ছুটি আজ কারখানা বন্ধ
সারাদিন ছুটি আজ পাঠশালা বন্ধ
উনুন জ্বলেনি আজ খাওয়াদাওয়া বন্ধ
বহুদিন বহুরাত সব কিছু বন্ধ
কেউ কেউ অভিমানে, কেউ রাগে অন্ধ
সারাদিন ছুটি আজ কারখানা বন্ধ
হাওয়া বয় শনশন পচা-পচা গন্ধ
উনুন জ্বলেনি আজ, খাওয়াদাওয়া বন্ধ
ধিকিধিকি জ্বলে খিদে, তবু চলে দ্বন্দ্ব
গেটে ঝোলে বড় তালা, কারখানা বন্ধ
সংসার ভেঙে যায়, বাড়ে খানাখন্দ
কাজ নেই, কাজ নেই, সব কিছু বন্ধ
বলো দেখি, কে যে ভালো, আর কে যে মন্দ
উনুন জ্বলেনি আজ কারখানা বন্ধ
কাজ চাই, কাজ নেই, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব
ওদিকে অভাব নেই, নাচ-গান-ছন্দ
ওদিকে মাংস-মদ, আতরের গন্ধ
এদিকে শিশুরা কাঁদে মা-বাবারা অন্ধ
খেলা নেই, পড়া নেই, সব কিছু বন্ধ
ধিকিধিকি খিদে জ্বলে, তবু এত দ্বন্দ্ব
কেড়ে খেতে পারো নাকি? কপালটা মন্দ
কপাল দু’ হাতে নয়? চোখ বুঝি অন্ধ?

সারাদিন সারারাত, কারখানা বন্ধ...

শুধু একটি ঝলক

একটু আগে কী বলছিলে? হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়লুম
ঘুমের মধ্যে দেখি একটা নৌকো একলা একলা দুলছে
মাঝ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, নীলের মধ্যে ডুবেছে নীল
এটাকে ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না, শুধু একটি ঝলক
আবার চক্ষু মেলেই দেখি, তোমার চালচিত্র আকাশ
বসে রয়েছ দিগন্তের রেখার ওপর, মুখে পড়েছে
চূর্ণ অলক, হাওয়ায় উড়ছে নীলিমাময় শাড়ির আঁচল
একটু আগে কী বলছিলে? আবার বলো। মায়া ঘুমের
জন্য দোষী, তবু ঐ যে একলা নৌকো, নীলের নৌকো
না দেখলে কি তোমার অমন দিগন্ত রূপ চক্ষে পেতাম?

এবার আমি উঠে বসছি, তুমিও কাছে এগিয়ে এসো
সমুদ্র বা দিকবলয়ের জন্য শুধু দুই মুহূর্ত
তার বেশি আর সহ্য হয় না, ইচ্ছে করে তোমায় ছুঁতে
স্পর্শে অনেক জন্ম স্মৃতি, ওষ্ঠ-ঢেউয়ে গোপন ভাষা
মাঝে মাঝেই অন্য মানুষ, এক পলকে সব অচেনা
হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে চায় দূরত্বের অসীম বাধা
অনুভবের রং বদলায়, শরীর থেকে শরীর হারায়
আবার তাকে ফিরিয়ে আনি, না না, শরীর অনেক ভালো
শরীর দিয়ে গল্প শুরু, রূপ ছাড়া কি গল্প জমে?

কাহিনী বিন্যাসের মতন শরীরে তাপ রক্ত ছড়ায়।

দুটি গাছ

একটি গাছ ফুলের বদলে অজস্র জোনাকিতে সেজে আছে
আর একটি নিঃস্ব গাছ দেখছে পাশ থেকে
চোখ নেই, তবু দেখে, কান নেই তবু শোনে, পেট নেই
তবু খায়, মাথা নেই তবু চিন্তা করে
এমনই প্রাণী এই গাছেরা
বিশুদ্ধ গান শুনলে খুশি হয়
ওদের কি ঈর্ষা আছে, কিংবা লোভ, প্রতিহিংসা?
ওরা ভালোবাসার মতন কত কী দেয়, বিনিময়ে
চায় কি কিছু?
আমি পাশের বঞ্চিত গাছটির দিকে চেয়ে আছি
যেন শুনতে পাচ্ছি ওর কান্না
জোনাকি মগ্ন গাছটিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায় না
দুঃখের এক একটি বিন্দু উঠে আসে কোন অতল থেকে
মনে পড়ে যায়, মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

বড় মানুষের ঝি

আরে ছি ছি ছি ছি ছি, পাড়ার লোকে বলবে কী
রাত দুপুরে বাড়ি ফিরছে বড় মানুষের ঝি

সন্ধেবেলা মশারি ফেলে যারা ঘুমোতে যায়
মাঝরাত্রে হুড়ুস ধাড়ুস সবাই বারান্দায়
ঐ এল কি, না এল না, সঙ্গে আছে কে?
পাড়ার যত হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে
রাস্তাখানা ছটফটাচ্ছে, তারও অমন দশা
গাছগুলোনও নিথর চুপ, বন্ধ পাতা খসা
গাড়ি থামবে চণ্ডীতলায়, বাকি পথটা হাঁটা
ভয় পায় না, আঁচল ওড়ায়, যম দুয়োরে কাঁটা।

কোথায় যায়, চরণ দুটি টলমলে না সোজা?
বড় মানুষের ধরন ধারণ সহজ নাকি বোঝা!
অঙ্গখানি সোনার বর্ণ, সোনার ভরি কত?
অমন মেয়ে হাত ঘুরোলেই আসবে শত শত

এক এক রাত ভোর হয়ে যায় , তবুও আসে না সে
পোড়া কপাল, সে নাকি আজ ছাদে রয়েছে বসে!
অপ্সরা না কিন্নরী গো, এল আকাশ পথে
কোন সিনেমার নায়ক তাকে উড়িয়ে আনল রথে?

হাসিতে যার মুক্ত ঝরে, মেঘবরণ কেশ
ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে যারা, দেখে নির্নিমেষ
ওগো কন্যা, তুমি হঠাৎ লক্ষ্মী মেয়ে হলে
কী যে বিপদ হবে বলো তো, পাড়ার দঙ্গলে!
গল্প নেই, রাত্রি জাগা হবে কীসের টানে
সবাই ফের চক্ষু গরম করবে দিনমানে
বড় মানুষের মেয়ে, তোমায় মন্দ হলেই মানায়
নইলে কেন জন্মালে না ওদের গরিবখানায়!

নতুন লেখা

নতুন কী লিখছেন, সুনীলবাবু? আপাতত কিছু না
কেউ বিশ্বাস করে না
যদি বলি, একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছি
সবাই অন্যমনস্ক হয়ে যায়, হঠাৎ বলতে শুরু করে
আজ রাস্তায় ট্রাফিকের বড় গোলমাল

নতুন লেখা মানেই লম্বা-লম্বা উপন্যাস
সে-রকম কয়েকখানা লিখে অন্যায় করে ফেলেছি?

এখন রাত পৌনে-একটা, আজ আকাশ অদৃশ্য
কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সরস্বতী-বিসর্জনের খুব হই-হল্লা ছিল
এ-বারে একটিও সরস্বতী মূর্তির সামনে দাঁড়াইনি
এখন দূরে-দূরে কিছু আলো শান্তভাবে ঘুমন্ত
দিনের বেলা পিকনিকে যথেষ্ট পানাহার ছিল, রাত্তিরে আবার
কেন হুইস্কি খাচ্ছ? স্বাতী খুব নরম, মৃদু অনুযোগ করেই
চলে গেল বিষয়ান্তরে, তারপর শুতে চলে গেল
হ্যাঁ, সত্যি আমি বেশি-বেশি পান করছি, বেশি-বেশি সিগারেট
কেন? কেন?
কোনও ব্যর্থতাবোধ থাকার কথা নয়, বেশ তো চমৎকার জীবন
তবু এই রাত্তিরে চুপ করে বসে থাকি, বিছানা ডাকে, যাই না
চিন্তাকেও স্তব্ধ করে রাখি, স্তব্ধতাকে আদর করি
নাঃ, কোনও অনুতাপ নেই, আঙুলে কোনও পাপ নেই
কলম সরিয়ে রেখে চেয়ে থাকি সাদা পৃষ্ঠার দিকে
যা-যা লিখতে পারিনি, তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই
এত-এত লেখা, তার পরেও সংখ্যাহীন না-লেখা
তারা হাসে, হাত ধরে নাচে, চোখ টিপে সরে যায়
যেন একটা মঞ্চ, এই খালি, এই ভর্তি, উইংসের একপাশে ওরা
অন্যপাশে উঁকি দেয় কে? চেনা-চেনা লাগে, চিনতে পারি না

আরও আড়ালে চলছে পাশাখেলা, একজন চোখ-ভেজা রমণী
আর তার বিপরীত দিকে...এই, এই, ভুল চাল দিয়ো না!

প্রেম বিষয়ক কিছু কথা

কবি, এবারে সত্যি করে বলুন তো, মধ্যগগন পেরিয়ে সূর্য এখন
চলে যাচ্ছে মধ্য বয়েসে, যেমন আপনার বয়েস,
প্রথম ফুল ফোটার মতন যৌবন উদ্‌গমে এবং বাতাসে বন্যার জলের মতন
আরও অনেক বছর
আপনি যে সব প্রেমের কবিতা লিখেছেন, ঠিক যেন
নেশাগ্রস্তের মতন প্রেম,
এই প্রেমের দাপট কি আপনার এই বয়েসেও থাকে? প্রেম কি
সত্যিই কখনো পুরনো হয় না, হারিয়ে যায় না?
প্রশ্ন শুনে কবি স্মিতহাস্যে বললেন, তুমি সেই গল্পটা
জানো না বুঝি?
একজন রবীন্দ্রনাথকে প্ল্যানচেটে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, গুরুদেব,
মৃত্যুর পর সত্যিই কি স্বর্গটর্গ...
তরুণ প্রশ্নকারীটি ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল, আপনি আমার
উত্তর এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করলেন?
বুড়ো বয়েসে বুঝি এরকম হয়?
আমি পরকাল কিংবা স্বর্গ-নরক নিয়ে...
কিন্তু প্রেম, সে কি ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু, কিংবা
চোখ খোলা স্বপ্ন, কিংবা চার দেয়ালে বন্দির একটিমাত্র জানলা?
কবি হাসলেন, রবীন্দ্রনাথের কৌতুকটি তুমি বলতেই দিলে না
তা হলে প্রথম থেকেই এত উপমা দিচ্ছিলে কেন?

এসব প্রশ্ন করতে হয় সোজাসুজি!
তরুণটি বলল ঠিক আছে, স্পষ্টাস্পষ্টিই জিজ্ঞেস করছি, প্রেম
কতদিন টেঁকে বলুন তো? ক' মাস? ক' বছর?
একজনের সঙ্গে আজীবন প্রেম কি সম্ভব?
কবি মুচকি হেসে বললেন, আমার সোজাসুজি উত্তর, তোমায় বলব কেন?
তরুণটি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ব্যস, ভয় পেয়ে গেলেন, ভাবলেন
বুঝি আপনার ওসব মাখো মাখো প্রেমের কবিতাগুলো
আর কেউ পড়বে না?
কবি বললেন, তুমি এবার চাঁছাছোলা ভাষায় কথা বলছ
তবে আমি উপমা শুরু করি?
প্রেম একটা নদী। আসলে নদী বলে কিছু নেই অথচ
পৃথিবী ভর্তি নদীর কত নাম! কত কাব্য!
আজ তুমি একটা নদীতে স্নান করতে গেলে, কী সম্ভোগের দাপাদাপি
এক বছর পরে যাও, সেই নদীর অন্য জল, তুমিও অন্য মানুষ
ফুল আর ভ্রমরকে কতবার মেলানো হয়েছে, ফুল দু'একদিনে ঝরে যায়
ভ্রমরেরই বা কতটুকু আয়ু?
তবু ফুল ফুটতেই থাকে, ভ্রমরও আসে গুন গুনিয়ে
যেন একই ফুল, একই ভ্রমর

তরুণটি বলল, আপনি কিন্তু এখনো উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন
কবি বললেন, উপমা মাত্রই তো এড়িয়ে যাওয়া, তুমি
মধ্য গগনের কথা বলছিলে
কেন জানতে চাওনি, এই বয়সেও আমার সেই অঙ্গটি চাঙ্গা থাকে কিনা?
তরুণটি খানিকটা থতোমতো খেয়ে বলল, তার মানে, তার মানে
প্রেম শুধু শরীর, মানে এতকাল যে...
কবি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, শরীরও এক শরীর নয়,
নদীর মতন, হৃদয়ও এক হৃদয় নয়, নদীর
মতন। অথচ সবই আছে।
যাও, সন্ধেবেলা একটা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকো

তোমার সঙ্গিনীর কানে কানে সুমধুর শাশ্বত মিথ্যেগুলো বলো
তাকে দুঃখ দিও না,
সে-ও তোমাকে যা-দেবে, তুমি তার মানেই বুঝবে না।

নীরার কৌতুক

নীরার অভিমান আমাকে সাত জন্ম নির্বাসন দেয়
আমি সইতে পারি না, পারি না, পারি না, অন্য লোকেরা
কী ভাবে সহ্য করে?
রাস্তায় কত শুকনো মুখ মানুষ দেখি, ওদের কোনো নীরা নেই?
ওগো দুঃখী পকেটমার, এক জীবন নিঃস্ব থেকে গেলে?
হায় রাইটার্স বিল্ডিং, হায় লালবাজার, তোমরা কেউ
নীরাকে চিনলে না
কী রুক্ষ তোমাদের জীবন যাপন, কী নির্মম আত্মবিস্মৃতি!
আমি কখনও অস্ত্র হাতে তুলে নিলে নীরা এই বসুন্ধরাকে
আড়াল করে দাঁড়ায়
এক এক সময় আমি অসহিষ্ণু ভাবে বলি,
খুকী, জীবনটা শুধু ভালোবাসার ছেলেখেলা নয়!
নীরা লঘু কৌতুকে উত্তর দেয়, ভালোবাসার ছেলেখেলা ছাড়া
আর সব ফুঃ!

ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে

কী মুস্কিল, একটা ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে
উঠে পড়লুম ভুল বাসে
তারপর বদলে গেল সব রাস্তা
এত সব অচেনা ভুরু কোঁচকানো মানুষ
অন্যরকম গাছপালা, নীল রঙের বৃষ্টি হয়ে
গেল এক পশলা
বাস থেকে নামতেই বাড়িগুলি সব সাদা রঙের
এক রকমের বন্ধ দরজা
হলুদ রঙের নারীরা দাঁড়িয়ে ঝুল বারান্দায়
কোথাও ফুল দেখছি না, তবু এত ভ্রমর কেন?
ঠিকানা খুঁজব কী, একজন জিজ্ঞেস করল
তুমি কে?
আর সবাই তর্জনী দেখিয়ে হাসছে
আমার শরীর ছোট হতে হতে একটা ল্যাংটো শিশু
অগত্যা দৌড় দৌড় দৌড় উল্টো দিকে
একদম পৃথিবী পেরিয়ে...

মায়ের চিঠি

কাল সারা রাত ধরে তুষারপাত, তিন ফুট
গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করতে...
কফি ফুরিয়ে গেছে, শিট! আগে খেয়াল হয়নি
কাচের জানলার বাইরে পাতাহীন গাছের ডালে
থোকা থোকা বরফ, জাপানি ছবি
দেখলেই ভুরু কুঁচকে যায়, আজ আবার?

· গরম লাগছে, মিলির বড্ড বাতিক, এতখানি হিটিং
টি ব্যাগ, জল ফুটছে, হোয়ার দ্যা হেল ইজ সুগার?
অজস্র জাঙ্ক মেইল, একটা শুধু বাড়ি মর্টগেজের
ওঃ হো, আর একখানা, মায়ের বাংলা চিঠি
মাকে একটা কমপিউটার...বারাসতে প্রায়ই লোড শেডিং
দেশটা দিন দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে,
রাস্তায় কেউ চাপা পড়লেই বন্‌ধ ডাকে
ই-মেইলে বাংলা চালু হয়নি
প্রত্যেক সপ্তাহেই তো তোমাকে টেলিফোন করি, মা, তবু
কেন চিঠি লেখো?
বাংলা হাতের লেখা আমি ভুলেই গেছি

খালি পেটে দিনের প্রথম সিগারেট
থ্যাঙ্ক ইউ ফর নট স্মোকিং, মিলি বাড়িতে নেই
গাড়িটা বদলাতে হবে, আবার ব্যাঙ্ক লোন
ফ্রিজ প্রায় খালি, বাজার করা হয়নি উইক এন্ডে
টুথ পেস্টও শেষ, যা খুঁজবে কিছুই পাওয়া যাবে না,
ওয়ান অফ দোজ ডেইজ
ঘড়ির কাঁটা দৌড়োচ্ছে, শিট, এখনো স্নান হয়নি
আর একটু দেরি হলেই জ্যামে পড়তে হবে,
বাম্পার টু বাম্পার, টেলিফোন বাজছে, বাজুক,
আনসারিং মেশিনে...মিলি শিকাগোয়, প্রিয়তোষের সঙ্গে
একটু প্রেম করতে চায় তো করুক
দু'খানা টোস্ট, মার্মালেডও তেতো লাগছে, আর একটা মোজা
কোথায়?
ড্যাম ইট!
আজই বসের বাড়িতে ডিনার, মনে আছে? ড্যাম ইট!
আমি কাঁদছি? ক্যান ইউ বিট ইট, আমি কাঁদছি? ড্যাম ইট!
যদি আজ অফিস না যাই, সারা দিন, সন্ধে, রাত্তির একলা একলা কাটাই?
মা, আজ আমি ঠিক তোমায় বাংলায় চিঠি লিখব!

সহসা ফিরে দেখা

একটা দেশ ছিল, মা বলে ডাকা হত
নিজের ঘরখানা কখনও দেশ নয়, পৃথিবী আবছায়া
শখের টুকিটাকি, বাইরে হাহাকার
দু’ চোখ বুজে থাকা, দু’ কানে তুলো গোঁজা, কেমন বেঁচে
থাকা?

বাইরে যাও তুমি নদীর ধার ঘেঁষে
স্বপ্ন দেখা নয়, শুধুই ছবি নয়, সামনে বাস্তব
শীর্ণ অঙ্গুলি, অচেনা মুখগুলি
কথার কথা দিয়ে তুমি কি ফিরে যাবে নিরালা জানলায়?

শরীর ঘোরে ফেরে, জীবন দু’ রকম
একটা জানলায়, একটা মাঝে মাঝে নদীর কিনারায়
জীবন শুধু নয়, হৃদয়ে দুটি ভাগ
প্রথম আধো-চেনা, চেনারও ভ্রম হয়, দ্বিতীয় পলাতক।

কিছুটা ভালোবাসা, কিছুটা উচ্চাশা
এ হাতে পূর্ণতা, ও হাতে মরীচিকা, নিছক পাগলামি
জয়ের গরিমায় দামামা যে বাজায়
দেখেছ মুখখানা, সেও তো ঘন ঘন পেছন ফিরে চায়!

যে নিল সন্ন্যাস, সে-ও নার্সিসাস
দু’ হাতে বরাভয়, নিম্ন উদরেও লুকিয়ে রাখা ভয়
এ দিকে ডিডেলাস, ও দিকে ইকারুস
স্বর্গে সশরীর যুধিষ্ঠির তবু যেমন ঢাকে চোখ।

জীবন কেটে যায়, সহসা ফিরে দেখা
নারী ও নর্মের অমৃত ছেঁচে কেন ওষ্ঠ বিস্বাদ
সত্যি? নাকি এও শখের হা-হুতাশ
মানুষ দূরে থাক, উচ্চাসনে শুধু বসাব মানবতা?

অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী

তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
সহ্য করতে পারি না পারি না পারি না
রাস্তায় ঘুরি, চটিটা হঠাৎ ছিঁড়ল
আমারই ছিঁড়বে, অন্য কারও তো ছেঁড়ে না
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে? সারা রাত আলো জ্বলেছে
চিঠিখানা এল তারিখ পেরিয়ে পরদিন
ঝাড়গ্রাম যাব, সেদিনই শহরে হরতাল
কবিতায় আসে বার বার ভুল ছন্দ
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে, সারা রাত আলো জ্বলেছে—

আমার রাত্রি বিছানায় ছটফটানি
আমার স্বপ্ন গুঁড়োয় হামানদিস্তে
ভুল ঠিকানায় কাকে যে গিয়েছি খুঁজতে
নাম মনে নেই; খোঁজাটাও বুঝি ছলনা
হে জীবন, তুমি সাতাশ বছরে ভ্রান্ত
হে সময়, তুমি প্রহেলিকাতেই দীর্ণ
সোজাসুজি পথ ডুব দিতে গেল নদীতে
কেউ কি ডাকল, কেউ না শুধুই বৃষ্টি
কোনাকুনিভাবে তাকালেই চোখে পড়বে
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে, সারা রাত আলো জ্বলেছে
সহ্য করতে পারি না পারি পারি না!

ওরা

ওরা একটা বোমা বানাচ্ছে, যাতে সব মৌমাছিরা শেষ হয়ে যাবে
মৌমাছির সঙ্গে ভোমরা, ফড়িং টড়িং-এর মতন পোকা মাকড়
আর কোনো ক্ষতি হবে না
বাঁচা যাবে। মৌমাছিরা আর হুল ফোটাতে পারবে না মানুষকে
মানুষকেও আর চুরি করতে হবে না পরের ঘরের মধু
হ্যাঁ, মধু আর পাওয়া যাবে না অবশ্য, তাতে আর এমন কী
'মধ্বাভাবে ঘুড়ং দদ্দাৎ' কথা আছে না?
মধুর অভাবে গুড়, কিংবা চিনি, চিনি তো থাকছেই
মানুষের ঠোঁটে ও জিভে মিষ্টির কোনো অভাব হচ্ছে না
শুধু ফুলগুলো ঠায় বসে থাকবে প্রতীক্ষায়
প্রেমিকের প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় বেলা যাবে, সে আর আসবে না গুনগুনিয়ে
এক সময় তারা নেতিয়ে পড়বে
প্রেম না পেলে ফুল বাঁচে না, ওরা তো আর মানুষের মতন নয়
চারদিকে তাকিয়ে দেখো সারা পৃথিবীতে আর একটাও ফুল নেই
'ফুল ফুটুক না ফুটুক তবু বসন্ত' আসবেই নিশ্চিত
ফুল টুল নিয়ে অনেক কবিত্ব হয়েছে, আর অত আদিখ্যেতার দরকার কী
আগামী শতকে ফুল ছাড়াই দিব্যি চলে যাবে
তবু যদি মন কেমন করে, ঠিক আছে, কাগজের ফুল অনেক বেশি বাহারী
আম-কাঁঠাল-জম্বুরার মতন বড় বড় ফলগুলো নাকি ছোট্ট ছোট্ট ফুল থেকে হয়?
ফুল তবে শুধু টেবিল সাজাবার জন্য নয়, কোমল হাতের জন্য নয়
ফুল নেই, তাই ফল নেই, কাগজের ফুল থেকে ফল ফলাতে পারবে বিজ্ঞান?
মা ফলেষু কদাচন
অত ফলের জন্য লোভ করতে শাস্ত্রেও বারণ করেছে
ফল বাদ যাক, আজকাল বিধবারাও তেমন ফল খেতে চায় না
আম-কাঁঠালে নীল মাছি আসে, কলার খোসায় পা হড়কায়
এসব আপদ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে
ধান-গম-যবের দানা, এগুলোও আসলে ফল, আগে খেয়াল হয়নি

তা হলে তো একটু মুশকিল
ফুল না ফুটলে ফসলের খেতগুলোও খাঁ খাঁ করবে
দুনিয়ার সব ভাঁড়ার ফুরোলে টান পড়বে যে ভাত-রুটিতে
রুটি নেই তো কী হয়েছে, কেক খাও, কেক খাও, বলেছিলেন না এক রানি?
নাঃ, সে আপ্তবাক্যে বিশেষ সুবিধে হয়নি
ভাতের বদলে কি প্রাথমিক শিক্ষায় পেট ভরবে, বলে দিন না অমর্ত্য সেন স্যার
কিংবা ভাতের বদলে ধর্ম চুষে চুষে খাবো?
অন্ন চিন্তা চমৎকারা কা তরে কবিতা রুথঃ!
খালি পেটে কবিতা হবে না, সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়াও যাবে না
সামান্য চাষাভুষোদের এতখানি কর্তৃত্ব মানুষের শিল্প-সংস্কৃতির ওপর?
নাঃ, মুশকিলটা যাচ্ছে না, উল্টো দিকে ফেরো, উল্টো দিকে ফেরো
ঘুরে দাঁড়াও, আগে ধরে আনো যত নষ্টের গোড়া ঐ মৌমাছিটাকে
কিন্তু এখন আর তা কী করে হবে, দেরি হয়ে গেছে দেরি হয়ে গেছে অনেক
ওরা যে আগেই বুকের মধ্যে সোনার কৌটোয় রাখা মৌমাছিটাকে
বিষের ধোঁয়ায় মেরে ফেলেছে।

আয়নার মানুষ

কেন সেই দিনটির কথা মনে পড়ছে বারবার?

সেই আমার উনত্রিশ বছর বয়েস, সেবারের সেই শীত
আমার প্রবাসী ঘরে, একদিকের দেয়াল জোড়া আয়না
সেটাই আমার একমাত্র বিলাসিতা
তার সামনে উলঙ্গ হয়ে নিজের সঙ্গে বেশ কথা বলা যায়
কদিন ধরে তুষারপাত হচ্ছে একরাশ নীরবতা ঘিরে
আমি এক শৃঙ্খলহীন নিজের স্বাধীন দরজায় বন্দি
ঘরের উত্তাপ বড় বেশি, গেঞ্জি-জাঙ্গিয়াও খুলে ফেলতে ভালো লাগে

আমার সারা গায়ে রোম, বিবর্তনের পথে কি এক ধাপ পিছিয়ে?
অনায়াসেই আমাকে এক শিম্পাঞ্জির মাসতুতো ভাই বলা যায়
সেই প্রথম নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, কী চাও তুমি?
এই ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমাণ জীবন, এরপর কোন্ দিকে?
এখানে সবাই রয়েছে, কাবার্ড ভর্তি পানীয়, এবং টেলিফোন
তুললেই ছুটে আসবে প্রিয় বান্ধবী, এবং সবকিছু
জানলার ওপাশে কয়েক হাজার মাইল দূরে কলকাতা
কেন টানছে, কেন এখানেই থেকে যাবে না, কী তোমার ভালো লাগে
আয়নার মানুষ বলো বলো, কী তোমার অন্বিষ্ট?
দু'জনেরই চোখে জল আসে, একজন আর একজনকে বলে
একটাও কি সার্থক কিছু লিখে যেতে পারব এ জীবনে?

যখনই লিখতে বসি, দেখতে পাই সেই আয়নার মানুষটির কান্না...

এত প্রশ্ন, এত প্রশ্ন

শীত এলই না, বইতে লাগল বসন্তের হাওয়া
(হাওয়া'র বদলে প্রথমে বাতাস লিখেও কেটে দিয়েছি)
এবার ক্যালেন্ডারে বসন্তের আগে ভাগেই পাত পেড়ে
বসে যাবে গ্রীষ্ম
হিংসের মতন রোদ্দুর বুক চাটবে ধরিত্রীর
(ধরিত্রী, না পৃথিবী, না মাটি পাথরের বস্তুবিশ্ব?)
তা আসুক না চড়া রোদ, আমি গরম ভয় পাই না!
সইয়ে নিতে হবে গরম, আরো বাড়বে, গরম তো ক্রমশই বাড়বে
শরীর গরম, আমার নোখের ধুলোও গরম
(আরও কোনো কোনো অঙ্গ তপ্ত লোহার মতন হলেও তা
লেখা ঠিক কী?)

বাজার গরম, হাওয়া গরম, চোখ গরম, চাটু গরম
এমনকী কোনো দুঃখও আর স্যাঁতসেঁতে হবে না,
পান করতে হবে গরম গরম
(এক সঙ্গে এত গরম কি কবিতা সহ্য করে? উষ্ণ শব্দটি
যে ঠিক মানাচ্ছে না!)

দুঃখ কি পান করি, না উপভোগ, না গায়ে মাখি?
হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে, জ্বলছে চিরহরিৎ অরণ্য
(গুলি না গুলো? অরণ্যের বদলে বন, না জঙ্গল, না
শুধু গাছপালা?)
তার আগে দুঃখের মীমাংসা হোক, কার দুঃখ, কীসের দুঃখ
ধরা যাক, একটা সীমান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি,
এক্ষুনি ভেঙে পড়বে রেলিং

(আগের লাইনটি আবার একটু অন্যরকম)
ধরা যাক, ঠেলতে ঠেলতে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে এক সীমান্তে
পাশেই একটা সুবিশাল খাদ, যেমন গ্র্যান্ড কেনিয়ান, এখানে
দুঃখের কি কোনো স্থান আছে,
না আমরা ডানা চাইব?
ধরা যাক, দরজার আড়ালে উন্মুখ নারীর সঙ্গে চকিতে
শরীর মিশিয়েছি, পাখির মতন
ঠোঁটে ঠোঁট, হঠাৎ এসে পড়ল কোনো শিশু
(আঃ ফের ঝামেলা, নারী না মেয়ে? পাখির উপমা কেন,
শিশুটি কি বাচ্চাবেলার আমি?)

ধরা যাক, সূর্য নিবে গিয়ে জ্বলে উঠল জুপিটার
সমস্ত গরমের চেয়েও গরম এক অগ্নি-নরক টান মেরেছে
মানব সভ্যতাকে

তখন কি দুঃখ নামে এক সমুদ্রে ডুব দেওয়াই
একমাত্র বাঁচা?

আচ্ছা, অঙ্ক কষা ভবিষ্যৎ থাক, কল্পনায় কাছাকাছি আসা যাক
সে রকম কোনো দিনে তুমি আর কবিতা পড়বে না? তোমাকে
আর চিঠি লিখব না?

তোমাকে ভালোবাসা জানাব কোন্ ভাষায়?
(এত প্রশ্ন চিহ্ন, এত প্রশ্ন চিহ্ন)
হঠাৎ ভেতর থেকে উঠে এল একটা প্রবল অট্টহাসি
সমস্ত প্রশ্নের গালে থাপ্পড় কষিয়ে বলল, ওরে পাগলা
এত গরম, ঘাম, নর্দমা, বিষ বাষ্প, গ্রীন হাউজ এফেক্ট
সব কিছু ছাপিয়ে এক পরিষ্কার শূন্যতায় যে ছবিখানি,
অসংখ্য হাত বাড়ানো রয়েছে সেদিকে, দেখছিস না?
একটা মালা দুলছে, একটা মালা দুলছে,
দুলছে, দুলছে, দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে।

চোখের এক পলক

আমার উপহার পাওয়া ডায়েরিটির বাঁ দিকের পাতায় পাতায়
রামায়ণের স্কেচ
আজকের পৃষ্ঠায় সীতা হরণের ষড়যন্ত্র করছেন মারীচের
সঙ্গে রাবণ
সীতার মুখের সঙ্গে তোমার মুখের আশ্চর্য আদল, নীরা
এই শিল্পী কি তোমাকে চেনে?
কে তোমায় অশোকবনে বন্দিনী করে রেখেছে?

কেউ না। তোমার গায়ে হাত ছোঁয়াবে, এত সাহস দশ লক্ষ
রাবণের নেই
তবু তুমি কোথায়, কতদিন দেখিনি, কোথায়, কোথায়?
বাক্য দিয়ে খুঁজি, সুর দিয়ে খুঁজি, রং দিয়ে খুঁজি
এই বিদ্যুৎ ঝলক সহসা, এই প্রগাঢ় তমস
এই হাটবাজার, এই শান্তিনিকেতনের নির্জন রাস্তা
এই অন্তর্ধান, এই সম্প্রকাশ, আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছ
বাসস্টপের দিকে
লাল রঙের চটি, ঠোঁটে লোধ্ররেণু, আঁচলে ঝড়ের ঝাপটা
রাবণ-টাবণ সব এলেবেলে, চোখের এক পলক ফেললেই
সব অন্যরকম!

নীরব সংসার

খাবার টেবিল, পাঁচটি মুখ, কিছু কথা কি
হবে না আজও বলা?
কীসের জন্য বৃষ্টি নামে, জ্যোৎস্না রাতে কেন বা ছলাকলা!
কাঁচা স্যালাড, গোলমরিচ, হাতবদল, আঙুলে নেই ভাষা
আলোর নীচে অনবরত পোকার যাওয়া-আসা
সামনে যারা দেখতে পাই না, আড়ালে মুখ কার
বেগুন ভাজায় নুন পড়েনি, নীরব সংসার
অতীত থেকে উদ্ভাসন, সে তুমি, কে তুমি
যেখানে ছিল শিউলি ফুল, সেখানে মরুভূমি
একটা-দুটো খেজুর গাছ, মাত্র একটু ছায়া
এসো বরং সেখানে বসি, ঝলসে উঠুক মায়া
ছবি-জগৎ, দু'দিকে মুখ, ভ্রমের মধ্যে চেনা
ঝগড়াঝাঁটি হোক না তবু দক্ষিণা লাগবে না!

দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও

নীরা, তুমি আধো অন্ধকার এক ঝুল বারান্দায়
দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও
জোনাকির ঝিকিমিকি, গুপ্ত চোখ, ছোট ছোট চাওয়া
বড় ঢেউ ছোট ঢেউ বাতাসের কিংবা সমুদ্রের
বালির পাহাড় ভাঙে, স্নিগ্ধ উপত্যকা
দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও
তোমার শরীর ঘিরে এত উষ্ণ শ্বাস
কে ডেকেছে? চাঁদ নয়, একবার মুখটি ফেরালে
এদিকে নিছক নশ্বরতা, সভ্যতার শেষ, আর অন্য দিকে
দাউ দাউ অগ্নি। ঠিক রোমকূপে আগুন শরীর
আকাশের পেট চিরে জ্বলন্ত উল্কার ছোটাছুটি
নৈঃশব্দ্যের কথকতা, দেখা যায় না বুক থেকে বুকে
এত ঝড় বিনিময়, এক মৃত্যু থেকে
আর এক সুদূর যাত্রা, নীরা, তুমি একা
দাঁড়িয়ে রয়েছ চুপ, ঠিক একা নও, অন্ধকার মধ্যযামে
ছদ্মবেশী ক্রুবাদুর কোথাও পেয়েছে মরীচিকা
দু'হাতে আচমন করে রূপ, তার পদপ্রান্তে ধর্ম, অর্থ, কাম
নিরালার নারী, তুমি টের পাওনা স্তনাগ্রে সহসা
চিবুকে, ঊরুতে কোনো ব্যর্থ প্রেমিকের ছোঁয়া, কত যে সুদূর!

সময় তখন খেলার সঙ্গী

ধোঁয়া লাঞ্ছিত শহুরে বাতাস, তবু আচমকা চাঁপার গন্ধ
এদিকে ওদিকে তাকাই ফুলের
কোনো দিশা নেই

কোনো রূপ নেই
চেনা মানুষের অচেনা চাহনি
চেনা রাস্তায়
দিক বিভ্রম
ভ্রম নিয়ে বাঁচি, ভ্রম নিয়ে খেলি, ভ্রম নিয়ে কাটে সকাল সন্ধে!

এবং মধ্যরাত্রেও খেলা, জীবনধারণ অমৃত পাত্রে
তারা জগতের একটি বিন্দু,
এই পৃথিবীর
পরিসীমা নেই
আর কেউ নেই, বিছানার পাশে নারীটিও নেই
সবই অদৃশ্য
চেতনা বিশ্বে এক মুহূর্ত, একটু হাসির শব্দ মাত্র

ঘুমের মধ্যে অন্য মানুষ, ভ্রমণে ত্রস্ত প্রতিটি অঙ্গ
ঘুমে ছায়া নেই, ঘুমে রং নেই
স্বপ্নের ঘুমে
ফুঁপিয়ে কান্না
বহুকাল মৃত পিতার সঙ্গে
সংলাপ চলে
না-বলা কথার
চোখের পলকে স্থির যৌবন, ফিরে আসে সব খেলার সঙ্গী।

কাকে যে বলি

দিনের বেলায় ছিল আঁকিবুকি জীবন, একটা কবিতা পড়ে
মন ভালো হয়ে গেল

এ কথা কাকে যে বলি, কেই বা বুঝবে!
বৃষ্টি এল কি এল না, আকাশ মেঘলা
লুপ্ত চাঁদ

আমার একটা হারানো বোতামের জন্য কষ্ট হল
এ কথা কাকে যে বলি, কেই বা বুঝবে

বুঝবে না, আসলে বোঝানো যাবে না, আত্ম পাগলামির
এ এক নিভৃত জগৎ

তোমাকে মুখোশ পরতেই হবে, ভড়ং দেখাতেই হবে,
তোমার নকল কণ্ঠস্বর
নাটকের মতন উঠবে নামবে, তুমি হাসবে

আসলে আমি যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি
কেউ বুঝবে না, বোঝানো যাবে না।

ব্যর্থতার কথা

শেখ সুলতান একটা আঙুল তুললে
তক্ষুনি আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়

শেখ সুলতান নৌকোয় আমার পাশে বসে বলল,
গরম লাগছে বুঝি, এই নাও দক্ষিণের বাতাস

আমি আশ্চর্য হই না
অনেকবার দেখেছি, অসম্ভবকে নিয়ে ছেলেখেলা করার
দিকে তার খুব ঝোঁক

ঠিক ম্যাজিশিয়ান বলা যায় না তাকে
তার আলখাল্লার মধ্যে লুকোনো থাকে না পায়রা
কিন্তু সে মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে ফুলগাছ বসায়
বন্যায় ভেসে আসা শিশুর গলা থেকে ছাড়িয়ে নেয়
নীল রঙের সাপ
গোরুর চোখের দিকে সেবারে সে তাকিয়ে হাসল, অমনি
যমজ বাছুর হল
তার নিজের অবশ্য গোরুও নেই, বাছুরও নেই
কিন্তু তার অনেক রাস্তা আছে, অনেক ধু ধু প্রান্তর
অনেক নদীর নিরালা ঘাট
জঙ্গলের একটা শিমুল গাছে চড়ে সে দিগন্ত পর্যন্ত
তার রাজত্ব দেখিয়েছিল একবার
মাঝে মাঝেই দেখা হয় তার সঙ্গে
প্রত্যেকবারই সে কিছু না কিছু উপহার দেয় আমাকে
এক পশলা বৃষ্টি, মেঘ-ছেঁড়া আলো, সকালবেলার ঐকতান
শুধু একটা জিনিসই দিতে পারে না সে
তার সেই ব্যর্থতার কথা লেখা উচিত নয় কোনো কবির
দেখো শেখ সুলতান, আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি!

কবির বাড়ি

বগুড়া রোড, বাঁকের মুখে বাড়ি
টালির চাল, কাঁঠাল গাছের ছায়া
কালকাসুন্দি, হেলেঞ্চার বেড়া
শীতের রোদে ছড়িয়ে আছে মায়া।

সদর দ্বার আধেকখানি খোলা
কেউ কি আছে? বাগান বেঁচে আছে
নরম মাটি, মৃদু পায়ের ছাপ
ইষ্টকুটুম পাখিটি নিম গাছে।

কবির বাড়ি, কবি এখন নেই
শতাব্দীও ফুরিয়ে এল ক্রমে
বাতাসে ওড়ে ছিন্ন ইতিহাস
জীবন ভাঙে ইতিহাসের ভ্রমে।

কবির বাড়ি, কবি এখন সেই
তা হলে আর ভেতরে কেন যাওয়া
একটা ভোমরা গুনগুনোচ্ছে একা
শব্দটুকুই পাওয়ার মতন পাওয়া।

ভোরবেলার স্বপ্ন

রাজমোহন্‌স ওয়াইফ লেখা মাঝপথে বন্ধ করে
বাংলায় কলম ডোবালেন বঙ্কিমচন্দ্র
দেড় শতাব্দী পরে খর চোখে তাকালেন আমার দিকে
তাঁর কপালের ভাঁজ ও ভ্রূকুটি দেখে

কে না কেঁপে উঠবে?
আমি মুখ নিচু করে থাকি অপরাধীর মতন
রামধনু আঁকা আকাশের শেষ প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে যে-সব পাখি
সেগুলি বিলীয়মান বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা...
পাতলা বইখানা হাতে নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র বললেন,
এই নীলদর্পণ কেন লিখেছিলাম জানো?
একদিন হঠাৎ মনে হল, আমাদের তলোয়ার-বন্দুক নেই বটে
কিন্তু ভাষার অস্ত্র তো রয়েছে হাতে
তোমাদের তা মনে নেই? মনে রাখো নি?
কার্মাটায় খুব মন দিয়ে সাঁওতালি ভাষা শিখছেন বিদ্যাসাগর
এবার তিনি এই ভাষায় ব্যাকরণ লিখবেন
তাঁর কপালের ভাঁজে অনেকগুলি সিঁড়ি
বাংলার কথা তাঁর মনেও পড়ে না, মনে করতে চান না
ক্যাপটিভ লেডির নামও আর উচ্চারণ করেন না মধুসূদন
ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ সিংহের মতন পায়চারি করতে করতে
মাঝে মাঝেই বলে উঠছেন ভাঙা গলায়:
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব...
হঠাৎ টিভি-তে হিন্দি রামায়ণ সিরিয়াল দেখে
চোখ উলটে গেল তাঁর
অজ্ঞান হয়ে ধড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে
পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করাচ্ছিলেন কালীপ্রসন্ন
বাংলা মহাভারত দেশের মানুষদের বিনা পয়সায় পড়াবেনই পড়াবেন
তার জন্য জমিদারি বিক্রি হয়ে যায় তো যাক
এখন নিজেই সে মহাগ্রন্থের পাতা ছিঁড়ছেন
আর কেউ পড়বে না, আর কেউ পড়বে না
গঙ্গায় নৌকোতে যেতে যেতে বিস্ময়ে ধনুক হয়ে গেল
বিবেকানন্দর ভুরু
দু' পাশে কীসের এত ধ্বংসস্তূপ?
নিবেদিতা বললেন, এটা কোন্ দেশ, চিনতে পারছি না!

গান লিখছেন রবীন্দ্রনাথ আর গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন
এক সময়, মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন খুব মৃদু কণ্ঠে
তোমরা দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে পারলে না?

কৃষ্ণনগরের বাড়িতে দিলীপকে গান শেখাচ্ছেন তার বাবা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
আচমকা থেমে গিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন দ্বিজেন্দ্রলাল
জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ
কী ভেবে লিখেছিলাম, আর আজ তার কী অর্থ
সকল দেশের রানি যে চাকরানি হতে চলেছে এই দেশ?
আর একটু দূরে, মুর্শিদাবাদে নিখিলনাথ রায় কাতরাচ্ছেন ঘুমের মধ্যে
বারবার বলছেন, আমার বাংলা কোথায় গেল আমার বাংলা!
দর্শক আসন শূন্য, মঞ্চে একা গিরিশচন্দ্র
দু' চোখে জলের ধারা, ফিসফিস করে বলছেন,
আমার সাজানো বাগান, শুকিয়ে গেল? নাটকে নয়, সত্যি শুকিয়ে গেল?
সাজানো বাগান, আমার দেশ?

অন্য একটি মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, পার্ট ভুলে গেছেন
দু' চোখে বিস্ময়, বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কান
উইংসের আড়ালে যারা কথা বলছে, তাদের মাতৃভাষা নেই?

সুকুমার রায় 'আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে'
গানটি গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে বললেন বাবা উপেন্দ্রকিশোরকে
না, না, আর ফিরে কী হবে এই হাঁসজারুর দেশে

অবনঠাকুর হাত তুলে কিছু বলতে গিয়ে চিত্রার্পিত
নজরুল আর শরৎচন্দ্র হাঁটছেন একই রাস্তার দু' পাশ দিয়ে
যেন কেউ কারুকে চেনেন না
রাস্তার লোকেরাও চিনতে পারছে না তাঁদের
একটি অল্প বয়েসী রোগা ছেলে, তার কাশিতে রক্ত পড়ে

দাঁড়ালো এসে নজরুলের সামনে
নজরুল তার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, তবু তোমায় লিখে যেতে
হবে, সুকান্ত!
তারাশঙ্করকে হাতছানি দিয়ে ডেকে শরৎচন্দ্র বললেন,
জানো, শিশির নামে ছেলেটি ইংরিজি অধ্যাপনা ছেড়ে
বাংলায় নাটক করছে?
তারাশঙ্কর বললেন, কে শিশির, আজ কেউ তাকে চেনে না
দাদা, সত্যি কথাটা শুনবেন, শতবার্ষিকী হলেই আমাদের
সবাই ভুলে যায়
নজরুল বললেন, তাই তো আমি চলে যাচ্ছি, ওপারে বাংলাদেশে!
জগদীশচন্দ্র আর সত্যেন বসু ব্যাকুলভাবে ডাকছেন ছাত্র-ছাত্রীদের
কেউ শুনছে না, বিমানে চেপে মিলিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে
বুদ্ধদেব বসু চেয়ে আছেন তাঁর ক্ষত বিক্ষত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে
কৈশোরে যার প্রেমে পড়েছিলেন, সেই ভাষাই খেয়ে নিচ্ছে তাঁর আয়ু
জীবনানন্দ কালি ঢেলে দিচ্ছেন রূপসী বাংলার পাণ্ডুলিপিতে
হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন, মহাপৃথিবী না ছাই! জন্মভূমিটাই
থাকল না!
প্রেমেন্দ্র আর শৈলজানন্দ কাঁধ ধরাধরি করে হাঁটছেন
শ্মশানের বাগানে
সেখানে দিন দুপুরে চলছে প্রেতের নৃত্য
বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে
বার বার ডাকছেন, অপু, অপু, ছেলেরা কেউ গ্রাহ্য করছে না
বনফুল আর সতীনাথ কথা বলতে পারেন হিন্দিতে,
লেখেন বাংলায়
এক সময় কলম থামিয়ে চেয়ে রইলেন উদভ্রান্ত ভাবে
আজ উনুন জ্বলবে কি জ্বলবে না ঠিক নেই, তবু দুর্দান্ত তেজে
কী লিখছেন মানিক
এক সময় চেঁচিয়ে উঠলেন, উল্লুকদের চিৎকার থামাও, গায়ে জ্বালা
করছে আমার
রান্নাঘরে বাঁধাকপির তরকারি চাপিয়ে এসেছেন আশাপূর্ণা

ফাঁকে ফাঁকে লিখে ফেলছেন কয়েক পাতা, কারা যেন হুড়মুড় করে
ছুটে যাচ্ছে পাশের গলি দিয়ে
ওরা কেউ কিছু পড়ে না

রেডিওর সামনে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ
শুনছেন নিজেরই গান
এখনো অনেক ছেলেমেয়ে তাঁর গান দিব্যি গাইছে
একটু আধটু সুর এদিক ওদিক হয় বটে, তবু তৃপ্তির সঙ্গেই
মাথা দোলাচ্ছেন তিনি
এক সময় খেয়াল হল, তাঁর একটা গান তো কেউ আর গায় না
সীমান্তের ও পারেও না, এ পারেও না
সহ্য করতে পারবেন না বলে এতদিন সীমান্ত দেখতে যাননি
আজ গিয়ে দাঁড়ালেন সেখানে
এখন শিলাইদহে যেতে তাঁর ভিসা লাগবে
নিজেই গলা খুলে ধরলেন তাঁর সেই প্রিয় গানটি
বাঙালির গান, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক...
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক...

এ কী, রবীন্দ্রনাথ কাঁদছেন?

অকতাভিও পাজ-এর কবিতা

কোচিন

১
সারি সারি নারকোল গাছের মধ্যে
ছোট্ট সাদা রঙের
পর্তুগিজ গির্জাটি
পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁকি মেরে
দেখছে আমাদের চলে যাওয়া।

২
দারচিনি রঙের সব পাল
শনশনে বাতাসে তুলে নেয়
শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বুক

৩
ফেনায় তৈরি শাল জড়িয়ে
চুলে জুঁইফুল
কানে সোনার দুল
তারা সন্ধে ছ'টার প্রার্থনা সভায়
মেক্সিকো শহর বা কাদিজ-এ নয়
ত্রিবাঙ্কুরে।

৪
নেস্টোরিয়ান পেট্রিয়ার্কের সামনে
আমার ধর্ম-অবিশ্বাসী হৃদয়
আরও প্রচণ্ড উত্তাল।

৫

খ্রিস্টানদের সমাধিভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে
অন্ধবিশ্বাসী
সম্ভবত শৈব
গোরুগুলো।

শেক্‌সপিয়ারের অপ্রকাশিত প্রেমের কবিতা?

অনুবাদকের কথা: গ্যারি টেইলর নামে এক তরুণ গবেষক শেকসপিয়ারের একটি অপ্রকাশিত অজ্ঞাতপূর্ব কবিতা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেছেন। তার ফলে বিরাট উত্তেজনা, কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে সারা বিশ্বের শেকসপিয়ার-প্রেমীদের মধ্যে। চার শো বছর পরেও শেকসপিয়ার এখনও প্রায়ই সংবাদের শিরোনাম হন। শেকসপিয়ারের নামে প্রচলিত বিস্ময়কর, মহৎ রচনাগুলি ঠিক কার লেখা এ নিয়ে সংশয় এখনও পুরোপুরি মেটেনি। স্ট্রাটফোর্ড অন আভন্-এর যে-পলাতক বালকটি লন্ডনে এক নাট্যশালার আস্তাবলে ঘোড়ার রক্ষক হয় এবং পরবর্তীকালে অভিনেতা পদে উন্নীত হয়, সেই উইলিয়াম শেকসপিয়ারই যে অসাধারণ, কালজয়ী নাটকগুলি লিখেছেন তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। অত্যুৎসাহী গবেষকরা কখনও মার্লো, কখনও ফ্রান্সিস বেকন বা অন্য কারুকে ওই সব রচনার পিতৃত্ব দিতে চেয়েছেন। শেকসপিয়ারের কবরও খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। তবু অবধারিত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এর মধ্যে বহু অন্য লেখকের রচনাও শেকসপিয়ারের নামে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। গত তিন শো বছরে অন্তত ৮০টি নাটককে শেকসপিয়ারের নাটক বলে দাবি করা হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র একটাকে সম্ভবত সঠিক পর্যায়ে রাখা যায়। অপরপক্ষে, পণ্ডিতদের ধারণা, শেকসপিয়ারের অন্তত দুটি নাটক হারিয়ে গেছে, তার মধ্যে একটির নাম 'লাভস লেবার ওন'।

শেকসপিয়ারের সনেটের সংখ্যা ১৫৪, এ ছাড়া তাঁর তিনটি দীর্ঘ কবিতা,

'ভিনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস', 'দা রেপ অফ লিউক্রিস' এবং 'দা ফিনিক্স অ্যান্ড দা টারট্‌ল' একত্রে ছাপা হয়েছিল একটি সংকলনে। এ ছাড়া তিনি আর কি কোনও ছোট কবিতা লেখেননি?

গ্যারি টেইলরের আবিষ্কারটি চমকপ্রদ হলেও এক কথায় অবিশ্বাস করাও যায় না। মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস হলেও এই আমেরিকান যুবকটি শেকসপিয়ার-চর্চায় প্রভূত যোগ্যতার অধিকারী। সব মিলিয়ে দেখার জন্যই তিনি বড়লিয়ান গ্রন্থাগারে শেকসপিয়ারের সব লেখার প্রথম লাইনের সূচি মিলিয়ে দেখছিলেন। সেখানেই তিনি একটি লাইন দেখতে পান, ''শ্যাল আই ডাই? শ্যাল আই ফ্লাই?'' এ লাইন তিনি আগে পড়েননি। কোথায় এই লাইন আছে খুঁজতে খুঁজতে গুদাম থেকে একটি খাতা পাওয়া গেল। খাতাটি চামড়ায় বাঁধানো। লাল রিবন দিয়ে বাঁধা। খাতাটি সপ্তদশ শতাব্দীর একটি কাব্য সংকলন, কোনো অভিজাত ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য কোনো পেশাদার লেখক দিয়ে তাঁর পছন্দ মতন কবিতাগুলি লিখিয়েছিলেন। এর মধ্যে শেকসপিয়ারের দুটি কবিতা আছে, অন্যটি পরিচিত। কাগজ, কালি, হাতের লেখার বয়েস এখন সহজেই পরীক্ষা করা যায়। সে সব পরীক্ষায় খাতাটি পাশ করেছে। তা ছাড়া কম্পিউটারে রচনা পদ্ধতি পরীক্ষারও ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক লেখকেরই বিশেষ বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক থাকে, তাঁদের সমগ্র রচনাবলী থেকে এই ধরনের নিজস্ব শব্দ ব্যবহার পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়, কম্পিউটার তা অনায়াসে বলে দিতে পারে। গ্যারি টেইলর কম্পিউটারের সমর্থন পেয়েছেন। এবং কবিতাটি তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের আশু প্রকাশিতব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

অনেক পণ্ডিত যেমন গ্যারি টেইলরের আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনই সংশয় প্রকাশও করেছেন কেউ কেউ। সংশয়বাদীদের আপত্তির কারণ, কবিতাটি হালকা ধরনের, মহাকবির উপযুক্ত নয়।

৯০ লাইনের এই কবিতাটি হালকা ধরনের ঠিকই। এটি প্রেমের উচ্ছ্বাসময় এক গাথা, যা অনায়াসে সংক্ষিপ্ত হতে পারত। একই শব্দ নিয়ে পান করা শেকসপিয়ারের অন্যতম মুদ্রাদোষ। কবিতাটিতে মিল দেবার ঝোঁক অত্যন্ত বেশি, তাতেই মনে হতে পারে, কোনো বড় কবি তাঁর প্রতিভা-উন্মেষের প্রথম দিকে একটা হালকা বিষয় নিয়ে ছন্দ-মিলের পরীক্ষা করছেন। বাংলায় দ্রুত ভাবানুবাদ।

আমি কি প্রাণ দেব? আমি কি উড়ে যাব?
প্রেমের প্রলোভন এবং প্রতারণা
দুঃখ প্রসবিনী?
আমি কি দূরে রবো? আমি কি কাছে যাব?
আমি কি প্রকাশিব না করি অনুতাপ
আমার আচরণ?
সকল দিক ছেয়ে তাহার রূপলেখা
আমাকে বাঁধে যেন অমর ক্রীতদাস।
যদি সে ভ্রূকুটায় আমি যে মরি শোকে
বিষাদে ডুবে যাই, ভুলি যে সব সুখ!

তবুও নিরুপায় আমার ভোগতৃষা
দেখাতে হবে খুলে, প্রেমের যন্ত্রণা
বাড়ে যে দিন দিন!
যদি সে হাসি দেয় নির্বাসনে যায়
আমার সব জ্বালা, যদি সে তোলে ভুরু
বিষাদে দুরু দুরু আমার সব সাধ
ওরে ও সন্দেহ, তুই যা দূরে যা
আমাকে জ্বালাপোড়া করিস নিশিদিন
সমূলে সব কিছু নিয়ে যা উড়ে যা
এখন প্রেমে আমি হয়েছি বলীয়ান!

আমার প্রিয়তমা তাকে কী দোষ দেব
দোষেরও দোষ নেই, এবার প্রমাণিব
তাহার প্রীতিকণা
যতন নিতে হবে, দেখি না সে কী বলে
সুখের আশ্বাস, কিংবা মুখ-ফেরা
অথবা পরিহাস

যা হয় হোক তবু সইব সব কিছু
যাতনা দিলে যদি সে পায় কৌতুক,
সেটুকু মেনে নেব
রূপের পাশে থাকে কিছুটা মরুভূমি
কিছুতে মোছে না তা, ভুলের বোঝা বাড়ে
ভুলের ধুলো মেশে।

যেন সে একদিন স্বপ্নে এসেছিল—
যদিও হায় সব স্বপ্ন চলে যায়
যেমন মরীচিকা—
আমার প্রিয়তমা, আমার কবুতরী
কয়েছি কত কথা, হেঁটেছি তার পাশে
নিরালা প্রান্তরে
দু'দিকে কী যে গেল, কিছুতে চোখ নেই
অনেক দূর এসে আকাশ যেথা মেশে বসেছি
সেইখানে
নিবিড় পাশাপাশি ওষ্ঠাধরে মিল
বাহুর বন্ধনে বেঁধেছি সেইখানে হৃদয় সম্পদ।

তখন সুপবন পেয়েছে কত খেলা
লোভীর মতো এসে উড়িয়ে দেয় তার
সোনালি কেশরাশি
এমন খেলা যেই দু'চোখ ভরে দেখি
অমনি চোখ যায়, রূপের ঝাপটায়
অবশ অনুভূতি
মায়ায় বাঁধা যেন দৃষ্টি থমকানো
এমন রং কোনো মানবী তনু ধরে
রূপের এই জোর হল রূপান্তর
আমার ভালোবাসা ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

অলকদামে ঘেরা ললাটখানি তার
কোমল সমতল যেন বা মখমল
শুভ্র সুন্দর
নিপুণ ভুরুরেখা আকাশে যেন আঁকা
সেখানে জ্বলে দুটি তারকা ঝিকিমিকি
প্রেমের জয়ে জয়ী
কপোল দুটি ছেয়ে সূক্ষ্ম দেখা যায়
দুধে ও আলতায় হয়েছে মেশামেশি রূপের নব বিভা
যতই চেয়ে দেখি, ততই বাড়ে নেশা
যতই নেশা তত তৃষ্ণা জেগে ওঠে।

ওষ্ঠ দুটি রাঙা যেন বা চাঁদ ভাঙা
এমন মধুরিমা মিষ্টতর হয়
পুরুষ ঠোঁটে মিশে
সেখানে বিনিময় সুখের অধীরতা
এবং আরও চাওয়া
চিবুক যায় জিনি একটি লহমায়
বিশ্ব নিখুঁতের সকল রং-রেখা
মরাল গ্রীবা তার মসৃণতা যেন
মূর্তি ধরে আছে এমন সৌষ্ঠব।

বক্ষ উপহার তুলনা নেই তার
সুগোল চূড়া দুটি যদিও কাছাকাছি
তবুও দূর দূর
কভু কি ছোঁয়া যায় এমন সুন্দর
এমন দুর্লভ এ দুটি চুম্বক
পরশে বিস্ময়
প্রকৃতি যেন তার উজাড় করে দেওয়া

সকল গুণ দিয়ে করেছে নির্মাণ;
কোথাও নেই এক বিন্দু মলিনতা
সে যেন পৃথিবীর রূপের মহারানি।

স্বপ্নে যে প্রহর ছিলাম সমাহিত
ছিল না কোনো ক্ষোভ, ছিলাম ভাসমান
সাগরে সুখস্রোতে
চক্ষু মেলে দেখি কোথাও কিছু নেই
কোথায় ধ্রুবতারা, কোথায় সুখ এই
আঁধার নিরাশায়।
বুঝেছি সুতরাং এবারে জেগে উঠে
আমাকে যেতে হবে আমাকে পেতে হবে
হৃদয় যাকে চায়
কিছুতে দেরি নয়, নিমেষও বড় বেশি
সে যদি চলে যায় রইবে বুক ভরে অনল অনুতাপ।

Shall I die? Shall I fly
Lovers' baits and deceits,
sorry breeding?
Shall I fend? Shall I send?
Shall I shew, and not rue
my proceeding?
In all duty her beauty
Binds me her servant for ever.
If she scorn, I mourn,
I retire to despair, joying never.

2

Yet I must vent my lust
And explain inward pain
by my love breeding.
If she smiles, she exiles
All my moan; if she frown,
all my hopes deceiving
Suspicious doubt, O keep out,
For thou art my tormentor,
Fly away, pack away,
I will love, for hope bids me venter.

3

'Twere abuse to accuse
My fair love, ere I prove
her affection.
Therefore try! Her reply
gives thee joy—or annoy,
or affliction.
Yet howe'er, I will bear
Her pleasure with patience, for beauty
Sure will not seem to blot
Her deserts, wronging him
doth her duty.

4

In a dream it did seem
But alas, dreams do pass
as do shadows—
I did walk, I did talk
With my love, with my dove,
through fair meadows.
Still we passed till at last
We sat to repose us for our pleasure.
Being set, lips met,
Arms twined, and did bind
my heart's treasure.

5

Gentle wing sport did find
Wantonly to make fly
her gold tresses,
As they shook I did look,
But her fair did impair
all my senses.
As amazed, I gazed
On more than a mortal complexion
Them that I love can prove
Such force in beauty's inflection.

6

Next her hair, forehead fair,
Smooth and high, next doth lie

without wrinkle,
Her fair brows, under those,
Star-like eyes win love's prize
when they tinkle.
In her cheeks who seeks
Shall find there displayed beauty's
banner,
Oh admiring desiring,
Breeds as I look still upon her.

7
Thin lips red, fancy's fed
With all sweets when he meets,
and is granted
There to trade, and is made
Happy, sure, to endure
still undaunted,
Pretty chin doth win
Of all the world commendations,
Fairest neck, no speak;
All her parts merit high admirations

8
A pretty bare, past compare,
Parts those plots which besots,
Still asunder
It is meet naught but sweet
Should come near that so rare

Its a wonder,
No Mishap, no scape
Inferior to nature's perfection,
No blot, no spot
She's beauty's queen in election

9

Whilst I dream, I exempt
From all care, seemed to share
pleasures in plenty,
But awake, care take—
For I find to my mind
pleasures scanty
Therefore I will try
To compass my heart's chief contenting
To delay, some say,
In such a case causeth repenting.

William Shakespeare

বাংলা চার অক্ষর

সূচি

সংযোজন

হাওয়ায় উড়ছে

যে-মুহূর্তে তোমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটল
অস্ফুট কাতর শব্দে অবনত হলে তুমি
সেই মুহূর্তে, নারী, তুমি শিল্প হয়ে গেলে
কত ছবিতে, ভাস্কর্যে, বিজ্ঞাপনে তুমি চিরকালীন
তোমার সেই মুহূর্তের ব্যথা, ভয় ও অসহায়তার
কথা কেউ মনেও আনবে না
বাঃ শিল্প হতে গেলে তোমাকে মূল্য দিতে হবে না কিছু?
তুমি চাও বা না চাও, তোমার ঐ ভঙ্গিমাটিকে
শিল্প ছাড়বে না।

পুরুষদের পায়ে কাঁটা ফুটলে তা শিল্প হয় না
কাঁটা বনে যদিও পুরুষরাই বেশি যায়।

বিশ্বব্যাপী শিল্পে ভরে আছে নারীদের অভিমান
পুরুষদের অভিমান থাকতে নেই
মজার কথা এই, এসব তো আমার মতন
পুরুষদেরই রটনা
পুরুষরাই নানা যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে নারীদের
পায়ের তলায় রাখে, আবার মাথায় বসায়
দেবী নাম দিয়ে...
আমি কি নারীবাদী কবিতা লিখছি নাকি?

হাওয়া উড়ছে দু-জোড়া অশ্রুভরা চোখ ও
একটি আঁচল
হাওয়া উড়ছে হাঁটু ভাঙা সিংহের মতন
অসহায় গজরানি
হাওয়ায় উড়ছে ব্যর্থ প্রেম, অলৌকিক ব্যাকুলতা
হাওয়ায় উড়ছে ভুল বোঝাবুঝি, নারী ও পুরুষদের
কোনোদিন ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায়
মুখোমুখি দেখা না হওয়ার অতৃপ্তি...

অর্ধরতি

পায়ে চলা পথ, ঝিরিঝিরি এক নদী
মেঘের খেলায় এই আলো, এই ছায়া
ওপারে দাঁড়িয়ে যারা দেয় হাতছানি
জানি তারা সব ছদ্মবেশিনী মায়া।

স্বচ্ছ সলিল, বালিতে স্বর্ণকণা
হাঁটু গেড়ে বসি, করতলে আচমন
যে-মুখের ছবি হারিয়ে গিয়েছে কবে
জাদু আয়নায় দেখা যায় যৌবন।

মন্দ কী, হোক নদীটি মন্দাকিনী
অর্ধরতির বাকি অংশটি আজ
শেষ আশ্লেষে এখানেই হোক সারা
খুলে ফেলে সব অহঙ্কারের সাজ।

মায়া সশরীর, ঘূর্ণি হাওয়ার নাচ
নদী তোলপাড়, কালিমালিপ্ত বেলা
হে পথিক, তুমি ভুলে গেছ সব শ্লোক
মৎস্যগন্ধা বেয়ে চলে যায় ভেলা।

এক জন্মের অভিমান

দেখতে দেখতে জানতে জানতে ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া
পৃথিবীর মতো মহাশূন্যেও কত অনন্ত বৃত্ত
জীবনটা শুধু একমুখী, তার পেছনে চক্ষু নেই

কোথাও একটু বিরতিও নেই, দু’-এক কদমও কেউ কোনওদিন ফেরেনি
সিঁড়িতে একলা বসে থাকা, চোখ হতবাক, পটভূমিতে অন্ধকার
বসে থাকাটাও থেমে থাকা নয়, আয়ুতে ঘড়ির কাঁটা।

বৃষ্টির ফোঁটা ফিরে ফিরে যায়, নদীও কিছুটা ফেরে
ঝড়-বিদ্যুৎ, বাজ গর্জন, মাটিতে শীত বসন্ত
শুধু প্রাণ, যার এত দাপাদাপি, সে মিশে যাবেই ধুলোয়
সময় এমনই হিংস্র যে তাকে কামড়ে চিবিয়ে কুলকুচি করে হাওয়া
মরীচিকা, নাকি দূরের আলেয়া, টেনে নিয়ে যায় এক দিগন্তপ্রান্তে
অসম যুদ্ধ, মানুষের কোনও হাতিয়ার নেই সেই পড়ন্ত বেলায়!

চোখ ভরে দেখা, চোখের আলোও ছায়া ছায়া হয়ে আসে
এত জানাজানি, এত কিছু শোনা, শুধুই ভ্রমের শ্রম?
অর্ধেকও কাজে লাগে না জীবনে, হঠাৎ কখন বিস্মরণের হানা
সব সাধ, সব ভালোবাসাবাসি অপূর্ণ থাকে, মাঝপথে যবনিকা
অসহায় রাগে খাক হয় মন, জলে ধুয়ে যায় ছবি
এই চলে যাওয়া, সকলেই যায়, বুক ভরা এক জন্মের অভিমান!

এক পলক

যেই এক পলক ফেললাম, দৃশ্য বদলে গেল
রোদ ঝলকাচ্ছিল না? এখন মৃদু চুম্বনের শব্দে বৃষ্টি পড়ছে
সেই বৃষ্টির রং একটি কিশোরীর ঘুমভাঙা চোখের মতন
যে-রাস্তায় ছ’জন লোক হল্লা করছিল, এখন সেখানে
শুধু এক অন্ধ ভিখিরি
পেয়ারা গাছের ডালটায় তিনটে ছাতারে পাখি নেই,
একটি মাত্র ফড়িং

বদলে যায়, এক পলকে অনেক কিছু বদলে যায়
বিনতা মাসি হাঁটু গেড়ে চোখ বুজে বসে আছেন, আগে তাঁর চোখে
চশমা ছিল না
রশিদ খান হারিয়ে গিয়েছিল, মশমশিয়ে হেঁটে আসছে রশিদ
পাশের তালাবন্ধ বাড়িটায় কেউ গলা সাধছে
মাঠের মধ্যে ফাঁকা মঞ্চ, মুখ্যমন্ত্রী সাপ-লুডো খেলছেন
তাঁর মেয়ের সঙ্গে
একটা ঘুড়ি দুলতে দুলতে গোঁত খেয়ে পড়ল পুকুরে
গেরুয়া পরা ছোট মামা মাথার চুলের মুঠি ধরে কাঁদছেন
ইস্কুলের ঘণ্টা হঠাৎ বেজে উঠল আজ ছুটির দিনে
একটু জিরিয়ে নেবার জন্য চেতন মিস্তিরি বাজাচ্ছে বাঁশি
ব্রিজের ঠিক মাঝখানে গম্বুজের মতন দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পলক শেখ সুলেমান
সুনীল গাঙ্গুলির কলমের ডগায় প্রেমের কবিতার বদলে মৃত্যুভাবনা
চেনা মাছওয়ালা ঢোল বাজিয়ে মেতে উঠেছে হরি সংকীর্তনে
বারান্দা থেকে ঝুঁকে আছে যে-মেয়েটি, তাকে ঝাপটা দিয়ে গেল
পলাশ রঙের আলো
বদলে যায়, এক পলকে অনেক কিছু বদলে যায়
কৃষ্ণচূড়া পাতার আড়ালে একটা কোকিল শুধু ডেকেই চলেছে
কেউ সাড়া দেয় না, তবু সে ডাকে।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রামচন্দ্র ছিলেন নেত্ররোগী, দীপশিখা তাঁর সহ্য হত না
আর কতবার তুমি অগ্নিপরীক্ষায় যাবে, সীতা?
লক্ষ্মণকে একটি চুম্বন দিলে তেমন কিছু পাপ হত কী?
অগ্নি যে সবার সামনে তোমাকে আলিঙ্গনের সুখ ভোগ করে নিল
তা কেউ বুঝল না?

রাম বরাবরই আগুনকে ভয় পান
সীতাকে জীবনসঙ্গিনী করার মতন পৌরুষই ছিল না রামচন্দ্র বেচারির
সীতাকে উদ্ধার করার জন্যও তিনি লঙ্কা অভিযানে যাননি
লোকে কী বলবে, সেই ভয়েই তো তাঁকে অত ঝুঁকি নিতে হল
লোক, লোক, লোক, তারা সবাই হাত না তুললে সিংহাসন
ফিরে পাওয়া যায় না
বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে হারাবার মতন ক্ষমতা ছিল না
রামচন্দ্র আর তাঁর দলবলের
তাই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের সাহায্য নিতে হয়েছিল
সেই শুরু হল ছলে, বলে, কৌশলে, সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে
ক্ষমতা দখলের রাজনীতি
শ্রীরামচন্দ্রই এর প্রবর্তক
যারা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে তারা সবাই
ওই বিভীষণের বংশধর!
সেই প্রথমবারই যদি তুমি অগ্নিপরীক্ষা অস্বীকার করতে, সীতা?
সগর্বে অসতীত্ব মেনে নিয়ে উড়িয়ে দিতে আত্মসম্মানের জয়ধ্বজ
তা হলে হয়তো লোক, লোক, লোক, অন্ধ লোকশক্তি
আর ফিরতেই দিত না রামকে
অযোধ্যায় রামের নামে মন্দিরও গড়া হত না
এবং সেই মন্দির ভেঙে মসজিদ বানাবার বর্বরোচিত অন্যায়
এবং আবার ভাঙাভাঙির দুঃসময় থেকে মুক্তি পেত কি
এই হতভাগ্য দেশ?

অলীক দেখা

ঝড়ের যেমন একটা চোখ থাকে তেমনি নদীরও থাকে
দুটো ডানা
পাহাড় মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে
এক দেশ সরে যায় অন্য সমুদ্রের দিকে
মরুভূমি লকলকে জিভ দিয়ে চাটে মেঘ
নারীরা মিহিন বাতাসে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়
এক একদিন রাত্তিরের ঝিমঝিমে অন্ধকারে বসে থেকে দেখেছি
পাথরের গায়ে ছেনি দিয়ে লেখা হচ্ছে ইতিহাস।

অকস্মাৎ শোনা যায় ছুটন্ত নক্ষত্রগুলির গগনভেদী শব্দ
বিশ্ব-নিখিলের ঐকতানে একটু একটু করে লাগছে রং
বইয়ের পৃষ্ঠায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে অতৃপ্ত মৃত লেখকরা
একটা পোড়ো, ভাঙা বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে
অতি বৃদ্ধ, বিস্মৃত রাজমিস্তিরি
দেওয়ালের বাঁধানো ছবি ঝড়কে ডাকছে, এসো, এসো
একদিন রাত্তিরের ঝিমঝিমে অন্ধকারে বসে থেকে দেখেছি
জোনাকিগুলি উড়ে উড়ে রচনা করছে
আমারই ব্যর্থতার ছবি
কে যেন ডাকছে, এমন অজানাতম দুঃখী কণ্ঠস্বরে?

জয়জয়ন্তী

পাঁচ মাত্রায় হেসে চলে গেল চাঁপা ফুল-রঙা সপ্তদশীটি
ট্রাম-ব্রেক কষা ধাতু-কর্কশ শব্দে বাজল কড়ি মধ্যম
সন্ধেবেলায় বাতাসে হঠাৎ এমনি এমনি শোনা যায় মৃদু
পূরবীর সুর

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি কি সত্যিই শুনি, অথবা কিছু না
মাঠের মধ্যে তালগাছগুলো নন্দলালের ছবির মতন
বৃষ্টি-বিকেলে তারা আর গাছ থাকে না, শুধুই ছবি হয়ে যায়...

কী লাভ এসব দেখে, বা সুরের সঙ্গে আমার শ্রবণ মিলিয়ে
জীবন যাপনে এসব তুচ্ছ, জীবন শুধুই বাস্তব, তার লকলকে শিখা
ছড়িয়ে রয়েছে লোভে হিংসায়, শিশু হত্যায়, সবুজ ধ্বংসে
সেখানে শ্রী নেই, ক্রন্দন ছাড়া কোনো সুর নেই, ক্রোধ-লোভ ছাড়া
কোনো রস নেই
ভাঙছে মাটির দেয়াল, খনির গর্ভে মিশেছে কত কঙ্কাল
রক্তপাতের এত ছলছুতো, মানুষ নামের প্রাণীরা এ গ্রহে
কেন জন্মাল
আকাশে লক্ষ গ্রহ তারকায় আর কেউ আছে, কেউ কি দেখছে?
সুজলা, সুফলা এই পৃথিবীতে মানুষ মেতেছে কাল-সংহার
দারুণ খেলায়...

গালে হাত দিয়ে এই সব ভাবি, তবু কেন শুনি অন্তরীক্ষে
বাজায় না কেউ, তবু বেজে যায়, বাঁশির শব্দে জয়জয়ন্তী!

একটু দাঁড়াও

তুমি যে-ই মাথা নিচু করলে আমি দেখতে
পেলাম তোমার পায়ের পাতা
আমি তোমার স্তনবৃন্ত কখনো দেখিনি
শুধু দেখছি কুয়াশায় অধোলীন তোমার বুকের
অর্ধবৃত্ত
তোমাকে কতবার দেখেছি

কিন্তু আমি তোমার যথার্থ নির্মাণ একবারও দেখিনি
তুমি তোমার তুমিত্ব থেকে যে-ই বেরিয়ে এলে
তার আগে আমি আমার আমিত্বের খোলসে ঢুকে পড়ে
হয়ে গেলাম চৌরাস্তার যাত্রী
এই মুহূর্তে তোমাকে চাই অথচ তোমাকে চিনতেই পারছি না
তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আর কার সঙ্গে যেন
চোখাচোখি করলে?
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি অনিত্যকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলে
মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে তুমি নেমে আসছ, পেছনে সব
মন্দির ভেঙে পড়ছে
সমস্ত দেবী মূর্তি তুচ্ছ করে তুমিই শেষ পর্যন্ত একমাত্র...
দেবী নও, কী করুণ ও সাধারণ, হাহাকারময়, ক্ষীণতনু,
এদিক ওদিক তাকাচ্ছ অসহায়ের মতন...
একটু দাঁড়াও, আমি অনন্তের উজান ঠেলে আসছি
এই তো এসে পড়লাম বলে...

মেঘমল্লার

ভীমসেন যোশীর মেঘমল্লার শুনতে-শুনতে বৃষ্টি নেমে এল। অবশ্য
এ কথা আকাশও জানে, এখন বৃষ্টি না-দিলে মেঘেরা হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে বসবে।
কোমল শুদ্ধের মধ্যে খেলা করছে দুর্জয় নিখাদ। এখনো নামেনি সন্ধে, কদম্বের
ডালে বসে আছে অতি একলা মাছরাঙা। শাহজাদির ওড়নার মতন
ঝিলমিলে বাতাস
খুশির ছলে ছুঁয়ে যাচ্ছে পুরনো লোহার দরজার বুক, ক্ষুধার্ত নদীটি এবং
একলা নদীটি আজ সহসা এমন ভাগ্যে সাজপোশাক সব খুলে নৃত্যে মেতে উঠল
ভীমসেন যোশী কি কিছু জানলেন, না বুঝলেন? ক' টাকা পেলেন এই
রেকর্ডিং-এর জন্য?

কোনো-কোনো জলসা হয় সারারাত, ভীমসেন ঘুমোবার সময় পান
না। এখন অন্যের গান, ভীমসেন বসে আছেন, রাত তিনটে, ফেরার ব্যবস্থা
ঠিক নেই। মদ্যপান ছেড়েছেন শোনা যায়। স্থির দৃষ্টি, হাঁটুর ওপর ধুতি
শূন্য করতল। হঠাৎ নম্রবৃষ্টি, প্রতিটি ফোঁটার শব্দ তবলার বোল কিনা,
তিনি ছাড়া আর কে বুঝবেন? লয় ঠিক নেই, সমে ভুল, ভীমসেন মাথা
দোলাচ্ছেন আর কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু তারপর তিনি অদৃশ্য। দরজায় কেউ যেন লাথি
মেরে গেল। এখন মাঝারি মাপের মানুষেরা পরিবেশন করে যাচ্ছে মাঝারি
সঙ্গীত। বিরাট বজ্রপাতের শব্দে স্পষ্ট হল্‌কতান। আকাশে
আহ্‌মদ জান থেরাকুয়া আর তাঁর সঙ্গে টক্কর দিচ্ছেন পাগলা ভীমসেন!

অন্য জীবন

বাইরে যখন ফর্সা আকাশ, মাথায় গোলকধাঁধা
অসীম যখন উদ্ভাসিত, তখন চক্ষু বাঁধা!

এসব হল ভাবের কথা, অভাব চতুর্দিকে
শরীর ভরা আগুন জ্বলে খিদেতে ধিকধিকে।

রাস্তাগুলো দিক ভুলে যায়, দুপুরে মরীচিকা
অন্ধকারে কোথাও নেই একটা কোনো শিখা?

এ জীবনের একদিকে প্রেম, অন্যদিকে অন্ন
ভাতের থালায় নুন পড়েনি, প্রেমও মতিচ্ছন্ন!

সকালবেলা মন যদি দাও বিশ্ব বিসম্বাদে
পৃষ্ঠা জুড়ে রক্তারক্তি, লক্ষ শিশু কাঁদে।

তবুও বেঁচে থাকার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক
ঝলসে ওঠে অন্য জীবন, দু' চোখ নিষ্পলক।

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না, বিপদে পড়বে
যে-বয়সে মেঘ বেশি ডাকে তার আকাশ অন্য
কবিতার বই ভুলেও ছুঁয়ো না, আঙুল পুড়বে
কবিরা নিজেরা স্বেচ্ছায় জ্বলে লেখার জন্য।

সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে
কী শুনলে তুমি? কে যেন ডাকছে অচেনা গলায়
কেউ নেই তবু হাওয়াও জড়ায় দু' হাত বাড়িয়ে
মেঘ ভাঙা চাঁদ তোমাকে ভোলায় ছলায় কলায়।

যারা কাছাকাছি, সব বড় চেনা চোখের চাহনি
এক এক সময় স্নেহ তেতো লাগে, দপ করে জ্বলো
যখন যা আসে সব ভুল, তুমি কিছুই চাওনি
বাথরুমে গিয়ে আয়নার ঠোঁটে সব কথা বলো।

কুমারী মেয়েরা, কবিতা পড়ো না, ছুঁয়ো না ও বই
ছেলেরা পড়ুক, চিঠিতে দিক না খাসা উদ্ধৃতি
বুঝে বা না বুঝে বন্ধুরা মিলে করো রৈ রৈ
কোনো একদিন সেই হাসিটাই হয়ে যাবে স্মৃতি।

যে-সব নারীরা আড়ালে, অচেনা নদীর মতন
কবিরা তাদেরই মূর্তি গড়ার ভাষা খুঁজে মরে
তাদের লুকোনো দুঃখে থাকে না ছন্দপতন
নির্মাণ খেলা সারাটা জীবন কালো অক্ষরে।

কুমারী মেয়েরা, বিপদটাকেও আচারের মতো
চেখে নিতে চাও চকিতে একলা দুপুরের দিকে?
চাখো তবে, দায়ী করো না কিন্তু, হও সম্মত
এমন মধুর সর্বনাশের জন্য কবিকে!

তুচ্ছ ছন্দ মিলে

মধ্য পুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তোলা
দুপুর বেলায় বাজি ফেলা সেই আঁকুপাঁকু করা ত্রাস
এখন দরজা জানলাও সব খোলা
মধ্য বয়েসে ফিরে আসে সেই জলের কঠিন ফাঁস।

কৈশোর ছিল আজিব স্বপ্ন মাখা
এই লুকোচুরি, এই কান্নায় মায়ের আঁচলে চোখ
এই ভূমিতল, এই কাঁধে দুটি পাখা
নরকের খুব কাছ ঘেঁষে ছিল রঙিন অমৃত লোক!

সতেরো বছরে হয়েছিল রাহাজানি
প্রথম মৃত্যু, বিষটিষ নয়, বন্দুক বেয়নেট
করমচা-রং মেয়েটির হাতখানি
বুক ছুঁয়েছিল, আল্‌পনা পায়ে এই মাথা ছিল হেঁট।

মধ্যবয়েসে স্বপ্ন দেখার মানা
দুপুরের ঘুমে কায়াহীন ছায়া-শরীরেরা আসে ফিরে
ব্যর্থ প্রণয় মনোলোকে দেয় হানা
মুখহীন নারী চকিতে হারায় গড়িয়াহাটের ভিড়ে।

দেশ না পৃথিবী, কে যে দিয়েছিল ডাক
মনেও পড়ে না, হাঁটুর ব্যথাটা বেশি করে চাড় দিলে
সত্যি-মিথ্যে, মাঝখানে থাকে ফাঁক
কবিতা লেখায় নিজেকে লুকোই তুচ্ছ ছন্দ-মিলে!

কলম অসহায়

ছায়ার পায়ে পায়ে মানুষ ঘোরে
মানুষ নেই, তবু দেয়ালে ছায়া
কিসের গোলযোগ গলির মোড়ে
কে ছেড়ে যেতে চায় মর্ত্যকায়া!

দুঃখী সংসার জয়নগরে
মেয়েটা কাজ করে ইঁটভাটায়
ছেলেটা মাটি ছেনে মূর্তি গড়ে
দু' বেলা মুড়ি খেয়ে দিন কাটায়।

ইঁটের পর ইঁট উঁচু প্রাসাদ
সিঁড়ির ধাপে ধাপে পায়ের ছাপ
কে জানে ছিল কার গোপন সাধ
কে হাসে, কে লুকোয় মনস্তাপ?

দোকানখানি ছোট হাটখোলায়
কেন রে সেটা ফেলে মিছিলে যাস?
আগুন লাগে কেন ধানগোলায়
রক্তমাখা পথ, পুকুরে লাশ!

ছোঁয়নি কোনোদিন কাগজ খাতা
কবিতা-কাহিনীর জানে না কিছু
যখনই লিখি আমি তাদের গাথা
কলম অসহায়, মাথাটা নিচু!

আমার বয়েস বাড়ছে

ছোট ছোট আয়নাগুলো দূরে সরে যাচ্ছে
আমার বয়েস বাড়ছে, আয়নাদেরও বয়েস বাড়ে না?
ভাঙা কাচ দেখে মনে পড়ে
এই কি সেই মুখচ্ছবি?
যেন জল ভেঙে যাওয়া
জলের অতলে খুব নিঃশব্দে ডুবে যায় মুখ।
আমার জলের কাব্য সব মিথ্যে
মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে থেমে যাই
কেউ নেমে আসছে হুড়মুড়িয়ে
শপ্‌শপ্‌ শাড়ির শব্দ, বনবিড়ালীর মতো অন্ধকারে
জ্বলে-ওঠা চোখ
কয়েকটি মুহূর্ত যেন অনন্ত, যেন সব কিছু স্থির
কে যে কাকে দেখে, কেউ চেনার পলক থেকে
অচেনা জগতে চলে যায়
আমার সিঁড়ির কাব্য সব মিথ্যে,
মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

আমার বয়েস বাড়ছে
নদীদের বয়েসের গাছ পাথর নেই
আমার তারুণ্যে দেখা তন্বী নদীগুলি সব
ফল্‌গু হয়ে গেল?
নগর ছড়ায়, মরুভূমিও ছড়ায়
শুধু আদিম অরণ্য কুঁকড়ে মুকড়ে যাচ্ছে সরে
শিমুল গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসে কেউ
বাঁশি বাজাবে না?

কোমরের ভাঁজে কলসি, লেপ্টে থাকা ভিজে শাড়ি
উরুতে বিদ্যুৎ
আমার বয়েস বাড়ছে, সে কি আরও আগে চলে গেল
আমার সময় কাব্য সব মিথ্যে, মুখখানি বুকে বিঁধে আছে।

কথা দেওয়া আছে

এখানে ওখানে জ্বলছে আগুন, তবুও তোমার সঙ্গে আমার
দেখা হবে নাকি বকুল গাছের নিরালা ছায়ায়?
সব রাস্তাই বন্ধ, মানুষ ছুটছে শুধুই দিক ভুল করে
বাতাসে ধোঁয়ার বিষের বাষ্প, কিংবা মিথ্যে কথার গন্ধ?

তবুও কি আমি দরজা-জানলা রুদ্ধ রাখব
মরুঝড়ে উট যেমন বালিতে মুখ গুঁজে রাখে
আমিও তেমন, ঝড়ে নামব না?
নদী উত্তাল, আকাশে বারুদ, প্যাঁচা ও বাদুড়
ওড়াউড়ি করে মধ্য দুপুরে
ক্ষুধিত মানুষ ধর্ম খাচ্ছে, মাথায় ও পায়ে ধর্ম মাখছে
ইতিহাস ছিঁড়ে জ্বালছে উনুন, কোথা থেকে এত হাঙর-কুমির
হাসি হাসি মুখে খেলতে এসেছে?

এত বাধা, এত যবনিকা ছিঁড়ে যেতে দেরি হবে
তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেই কথা দেওয়া আছে
বকুল গাছকে
যদিও বা তুমি আগে পৌঁছোও, দেখো যেন সেই
বকুল গাছটা ঝলসে না যায়!

বহুরূপীর গীতা

গোড়ালি-ডোবা কাদার মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি গড়বন্দিপুরের দিকে
একটা অশথ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ
আকাশে উড়ছে শকুন, পুকুর হওয়া মাঠে জাল ফেলছে
এক ঠেঙো-ধুতি জেলে
এক দঙ্গল বাঁদর-সাজা ছেলেমেয়ে তাড়া করছে একটা কুকুরকে...
মাথায় ময়ূরের পালক, মুখের রং নীল ধরনের, জরির পোশাক পরা
কৃষ্ণ একমনে বিড়ি খাচ্ছে
অনেকদিন বহুরূপী দেখিনি
একটানা বৃষ্টির মাসে বহুরূপীটির বোধহয় বাজার খারাপ
কেউ আর ও-সব আমোদে পয়সা দিতে চায় না
সঙ্গীদের থামতে বলে তার সামনে গিয়ে বললুম, কী গো ভাইটি,
তুমি কি গড়বন্দিপুরে থাকো,
সেখানকার খবর কী?
হাতে সুদর্শন চক্র নেই বটে, তবু তীব্র চোখে তাকিয়ে
নব দূর্বাদলশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ যা বলতে লাগলেন, তা অবশ্যই এক
নতুন গীতা!

তোমরা বাবুরা সেখানে হঠাৎ উদয় হচ্ছো কেন গো?
ভোট আবার এসে গেল বুঝি?
হঠাৎ দাঙ্গা-টাঙ্গা লেগে গেল নাকি?
কাঁধের ঝোলায় জলের বোতল আছে, তাই না?
আমাদের গাঁয়ের জল খেলে তোমাদের ওলাউঠো হয়,
আমাদের হয় না
সাপের বিষের ওষুধ এনেছ? কালকেই আজু শেখের এন্তেকাল
হয়ে গেল
মা মন্‌সার বিষের ছোবলে!
বীজতলা রোয়ার সময় বৃষ্টি এল না
বৃষ্টি নেই, আকাশ শুকনো, মানুষের মুখও আমসি

এখন আবার শালা এত বৃষ্টি পড়ছে, পড়ছে তো পড়ছেই,
সব ভেসে গেল
এতে আর গরমিণ্ট কী করবে, গরমিণ্ট তো ভগমানের মতন
আকাশ সামলাতে পারবে না
কিন্তু ইস্কুলে একটাও ম্যাস্টার নেই, তা পাঠাতে পারো না?

আমার একজন সঙ্গী বলল, এ সব তুমি কী বলছ, বহুরূপীদা
সবই তো জানি, গ্রাম তো আর রাতারাতি বদলায় না
কিন্তু গ্রাম-পঞ্চায়েত কতটুকু কাজ করেছে, আর
আপনিই বা কী করেছেন?

এবার শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসলেন
মুখের চেহারাটা বদলে গেল, গাঢ় কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন
এই কলি যুগের মুক্তির উপায় বড় জটিল
একটা বিশাল গুহা, তার মধ্যে সবাই ঢুকে যাচ্ছে দলে দলে
স্বামী পোড়াচ্ছে স্ত্রীকে, স্ত্রী খেয়ে ফেলছে স্বামীকে
সন্তানরা বাবার পরিচয় না জানলেই ধর্মও জানবে না
বাচ্চারা হাতের আঙুলের বদলে পায়ের আঙুল চুষতে শিখবে
ছোট মেয়েরা অদৃশ্য হয়ে যাবে পূর্ণিমার রাতে
চোরদের ধরে এনে পদ্মবনের সামনে দাঁড় করালেই তারা কাঁদবে
কুকুরে চাটবে হিন্দু-মুসলমানের মারামারির রক্ত
তখন বিধবা লক্ষ্মী আর নীলোফার এ ওকে জড়িয়ে ধরবে
ধানের দুধ পোকায় খাবে না, আমি খাব
একটা নদী ঘরের দরজার কাছে এসে বলবে, ওগো,
আমায় রাত্তিরটা থাকতে দেবে?
একটা পুঁটি মাছ পৌঁছে যাবে সমুদ্রে
কুমিরেরা দর্জির দোকানে জামাকাপড়ের মাপ দেবে
আর আকাশ থেকে খসে পড়া একটা তারা নাচবে উদ্দাম হয়ে
তোমরা অবশ্য কিছুই দেখতে পাবে না, সবই অদৃশ্য,
হা-হা-হা, সবই মায়া!

আমি মহাভারতের খটোমটো গীতা কখনো ভালো করে
বুঝতে পারিনি
স্বয়ং বেদব্যাসও কি বুঝতে পারতেন এই নতুন গীতা?

ভুল বোঝাবুঝি

ধড়াম করে দ্রুত দরজাটা বন্ধ করার পরই মনে হল
এই ব্যস্ততা কি ভুল বুঝবে দরজাটা?
এত জোর শব্দ তো তাকে অপমান করাও বটে
তা হলে কি তুমি চাবি দিয়ে খুলে আবার যাবে ভেতরে
ধীরে সুস্থে এক পা এক পা এগোতে এগোতে ক্ষমা চাইবে?
সারা পৃথিবী তোমাকে মনে করবে পাগল।

সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামতে নামতে হঠাৎ দেখতে পেলে
একটা চড়ুই পাখির বাচ্চা চিঁ চিঁ করছে
ওপরের ঘুলঘুলিতে বাসা, বাচ্চাটা পড়ে গেছে নীচে
মা-পাখিটা ডাকাডাকি করছে ব্যাকুল ভাবে
তুমি পাশ কাটিয়ে নেমে গেলে খানিকটা
জরুরি কাজের বিশ্ব সংসার টানছে তোমার কান ধরে
তবু তুমি থমকে গেলে, ফিরে আসতে শুরু করলে
বাচ্চাটাকে ওর মায়ের কাছে, বাসায় তুলে দিলে
এখনো বাঁচানো যেতে পারে।
সেটাও কি জরুরি নয়?
মা-পাখিটা অন্য স্বরে চিৎকার করে ঘুরতে লাগল
তোমার মাথার ওপরে
এই রে, ওকি ভাবছে, তুমি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চাইছ?
মানুষ পাখিদের মারে কিংবা বন্দি করে, মানুষ কি পাখিদের বাঁচায়?

মা-পাখিটা ভয় পাচ্ছে, তোমার হাতের তেলোয় বাচ্চাটা, কয়েকটি মুহূর্ত,
কয়েকটি মুহূর্ত
যদি বাচ্চাটা সত্যি মরে যায়?

বাংলা চার অক্ষর

ওকে অন্য একটা সেঞ্চুরি দাও
ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ
তখন দেখবে চকমকাচ্ছে ওর আসল তেজ
বলেছিলেন কমলকুমার
তবে কি আমি এ যুগের উপযুক্ত নই?
এসব রাস্তা চিনি না বলেই এত হোঁচট খাই।
এখনও নৌকো দেখলে উচ্ছল হই। বিমানে উঠি বাধ্য হয়ে
ত্রুবাদুরদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি, বাউল ফকিরদের সঙ্গেও
চার্বাকপন্থীদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছি
যেতে ইচ্ছে করে সমস্ত সীমান্তের ওপারে
রথের মেলায় হারিয়ে গিয়ে এক চাষির বাড়িতে শুয়ে থাকি
অন্ধ কিশোরীটিকে দেখে মনে হয় ওর স্পর্শে
আমার কপাল জুড়োবে
যখন দিনদুপুরে দেখতে পাই উল্লুকদের উৎপাত
কোমর বন্ধ না থাকলেও আমি অদৃশ্য তলোয়ার খুঁজি।

কিন্তু আমি তো ছেঁড়া চটি পরে মন্দিরের পাশ দিয়ে
যেতে যেতে থেমে গিয়ে প্রণাম করিনি কখনও
রামধনুকে জেনেছি শুধু জলবিন্দুর কারুকার্য
ফ্রয়েড, ডারউইন ও কার্ল মার্কস, এই তিন দাড়িওয়ালার
উত্তরাধিকার মেনে নিয়েছি

অনুভব করেছি আইনস্টাইনের শেষ জীবনের মনোবেদনা
ইন্টারনেটে দেখি বিশ্বকে, ই-মেইলে চিঠি পাঠাই
তবু কমলদা, আপনি ঠিকই বলেছিলেন
আমার কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না এই সেঞ্চুরিটা
কুড়ি থেকে একুশে পা, তবু সাবালক হচ্ছে না এই সভ্যতা
চতুর্দিকে কীসের এত শব্দ, অধঃপতনের?

আপনি কোন সেঞ্চুরিতে আছেন, কমলদা, তেইশ না চব্বিশ?
তখন কি বাতাসে পেট্রোল-ডিজেলের গন্ধের বদলে
বনতুলসীর গন্ধ ফিরে আসবে
শরীরের উন্মাদনাকে ঘিরে থাকবে একটা কিছু পবিত্রতা
রাত জেগে আয়ুক্ষয় করবে কবিরা
চার অক্ষরের শব্দের মধ্যে বাংলা ভালোবাসা
প্রথম স্থান অধিকার করে নেবে?

সিঁড়িতে কে বসে আছে

সিঁড়িতে কে বসে আছে মুখ ঢেকে একা?
এত অন্ধকারে এক জীবনের সারাৎসার দেখা।

সিঁড়িতে কে মুখ ঢেকে একা বসে আছে?
চিনতে পারো নি, যাও চুম্বনের ছলে ওর কাছে।

মুখ ঢেকে একা বসে আছে কে সিঁড়িতে?
সমস্ত হারিয়ে যাওয়া এসেছে ফিরিয়ে কেউ নিতে!

সিঁড়িতে কে বসে আছে একা ঢেকে মুখ?
ওর কি অতীত ছাড়া নেই কোনো বিশ্বস্ত সম্মুখ!

সিঁড়িতে কে আছে মুখ ঢেকে একা বসে?
যে চুম্বনে শেষ নেই, তাও গেছে বৃন্ত থেকে খসে!

সিঁড়িতে কে বসে আছে একা মুখ ঢেকে?
দণ্ড পল থেমে আছে, অন্তরীক্ষ দেখছে দূর থেকে!

সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে

নদীটি শুকিয়ে গেছে, পড়ে আছে নদীটির নাম
পূর্ণিমার চাঁদ এসে দোল খেতে গিয়ে দেখে
জল নেই, শুনশান, স্থির মধ্যযাম!
ভেঙে যায় সুন্দরের ছোট ছোট
প্রিয় স্বপ্নগুলি
ইঁদুরেরা খেয়ে নেয় প্রেক্ষাপট, রং মাখা তুলি!

সুন্দরের স্বপ্ন ভাঙে, হারায় না, ফিরে ফিরে আসে
এই বৃষ্টি, এই রোদ যেমন আকাশে।
যেমন শৈশব স্মৃতি, এ সবই তা জেদি
চতুর্দিকে যত হোক কামান গর্জন, তবু
মায়ের গলার স্বর
সব শব্দভেদী!
সুন্দর লুকিয়ে থাকে, খেলা করে একান্ত নিভৃতে
সে জানে কেউ না কেউ ঠিক এসে যাবে তাকে
বুকে তুলে নিতে।

সুন্দরের এক কণা এসে পড়ে এঁদো জলে,
কচুরি পানায়
তাজমহলের চেয়ে সেখানেও তাকে কিছু কম কি মানায়?
শুধু তো গোলাপে নয়
ঝরে পড়া শেফালির, আশ্বিনের কাশে
গরিব ঘরের চালে সে হঠাৎ কুমড়োর ফুল হয়ে হাসে
শালিক পাখিটি উড়ে যায়, কিছু শব্দ রেখে যায়
বাবুই পাখির বাসা সুন্দরের ঘর বাড়ি
এমনকী লেগে থাকে পরিশ্রমী
পিঁপড়েদের পায়
ঘুম যদি নাও আসে, স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা ভার
বারবার ফিরে এসো সেই স্বপ্নে
সুন্দর আমার!

প্রকৃতির প্রতিশোধ

শেখ সুলেমান একটা চড় মেরেছিল নীলোফারের ভাই, বাচ্চা মজনুকে
সাতজেলিয়া থেকে মোল্লাখালি যাবার খেয়া নৌকো
এমনই কুমড়ো গাদা যে সবাই সবার গা ঘেঁষে আছে
বেশি টালমাটাল হলেই উল্টে যাবে ভরা বর্ষার রায়মঙ্গলে।
শতকরা সাতষট্টি জন যাত্রী সুলেমানের এই বেয়াদপি
মেনে নেয়নি মনে মনে
কিন্তু শেখের বিরুদ্ধে কে মুখ খুলবে, সবাই চুপ
আর শতকরা একুশ জন (হিসেবে মিলল না, তাই না?
কিছু লোক তো সব সময়ই বাইরে থাকে)
সুলেমানের সমর্থনে হেসে উঠল খলখলিয়ে

অবশ্য তারা সবাই জানে, পা মাড়িয়ে দেবার জন্য
মজনুকে চড় মারলেও
সুলেমানের আসল নজর ছিল নীলোফারের অপূর্ব দুটি
স্তনের ডৌলের দিকে
এ রূপ দেখলে ফেরেস্তাদেরও মতিভ্রম হতে পারে
কিন্তু মাছওয়ালি নীলোফার যে বড় বেশি সতীত্বের ছেনালি দেখায়।

একটা বাচ্চাকে চড় মারলে সে ঘটনা বেশিদূর গড়ায় না
খেয়া নৌকো ওপারে পৌঁছয়, সবাই ভুলে যায়, শুধু মজনু
কুঁ কুঁ করে মৃদু মৃদু কাঁদে
নীলোফার একবার মাত্র রক্ত চোখের ঝলক দিয়েছে
সুলেমান সাহেবের দিকে
তারপর বেশ কিছুদিন আর যায় না সাতজেলিয়ার হাটে
মজনু কোথায় কেউ তার খবরও রাখে না।
শেখ সুলেমান ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং নানান কাজে ব্যস্ত
তার চোরাই কাঠের ব্যবসা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার
সময় নেই
তা ছাড়া কেউ মুরুব্বির পা মাড়িয়ে দিলে তাকে চড় মারায়
দোষ হবে কেন?
তবু শেখ সুলেমান হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পায়
নীলোফারের ঊরু জড়িয়ে ধরা কিশোরটির কান্না ভরা মুখ
খেয়াঘাটের বট গাছটা হঠাৎ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
শীতকালের আকাশের বিদ্যুৎ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
একটা লঞ্চের ভোঁ তাকে বলে, ছি ছি, সুলেমান
ফিনফিনে বাতাস তার কানে কানে বলে যায়, ছি ছি, সুলেমান
এ গ্রামের মানুষজন শেখ সুলেমানকে কিছু বলে না,
কিন্তু প্রকৃতি তাকে যেন ভূতের মতন তাড়া করছে
নৌকোর দাঁড়ের শব্দের মধ্যেও ছি ছি
গরম ভাতের থালায় ফিসফিস করে ছি ছি

যে হাত দিয়ে সে থাবড়া মেরেছিল, সেই হাতের তালুতে
লেখা ফুটে ওঠে ছি ছি
সুলেমান ক্ষমা চাইতে চায়। কিন্তু কোথায় নীলোফার, কোথায় মজনু
তারা আর দেখা দেবে না কোনোদিন।
মজনু ক্ষমা না করলে চিরকালই অদেখা থেকে যাবে
নীলোফারের বুকের ডৌল
এই দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় শেখ সুলেমান।

সম্বোধনে মরীচিকা

চিঠিতে তোমাকে সম্বোধন করতাম, ওগো মরীচিকা, তাই না?
তখন বয়েস ছিল তেইশ, মরুভূমিটি দিগন্ত ছড়ানো, আর
সব সময় তৃষ্ণায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ
তুমি কখনো কখনো দাঁড়াতে এসে ঝুল বারান্দায়
সমুজ্জ্বল দন্তরুচির হাসিতে, এক পাশে মুখ ফিরিয়ে
ছড়িয়ে দিতে ছাতিম ফুলের মতন কিছু পরাগ-রেণু
তারপরেই আমার জ্বর হত
দেখা, চেনা হাসি, কিন্তু কাছে ডাকতে না
জ্বর হলেই আমার চিঠি লেখার ইচ্ছে হত খুব
রক্ত মাখা পরাবাস্তব চিঠি শুধু এক শো চার ডিগ্রি জ্বরেই লেখা যায়
আমার সারা শরীরে মরুভূমির বাতাস, অন্তঃস্থল পর্যন্ত
দগ্ধ করে দিচ্ছে
চিঠির অক্ষরে পিণ্ডি চটকাতাম বাংলা ভাষার

কখনো কখনো তোমাকে মনে মনে রাক্ষসীও বলতাম
তোমার ঠোঁটে রক্ত, টপটপ করে ঝরে পড়ছে, আমারই রক্ত
সে রকমই দেখতাম, কেমন স্বাদ বলো তো, জিজ্ঞেস করিনি।

যেবার তুমি হঠাৎ সিঙ্গাপুর চলে গেলে কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে
সেবারে না-লেখা চিঠিতে তিনবার বলেছিলাম, হারামজাদি!
এতদিন পর সত্যি কথা বলছি, এখন আর লজ্জা কী, বলো
ছাদে উঠে নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম
এর নাম কি প্রেম, না নারী-মাংস চেটেপুটে খাবার তীব্র বাসনা?
কিন্তু তুমি তো নারী নও
তুমি নারী ছিলে না, নারীর আদল, কুয়াশা ভেদ করা
এক বিমূর্ত অভিমান
না হলে সুহৃদয়ের বোন মণিদীপা কী দোষ করল
তার স্তন দুটি ও ঊরুর ডৌল তো তোমার চেয়ে মন্দ বলা যায় না
আমি বেকার জেনেও মণিদীপা আমার দিকে তরল করেছিল চোখ
একদিন সারা দুপুর কেউ নেই, মণিদীপার নাকের পাটা ফুলে গেছে
আর একটু হলেই...তুমি এসে কল্পনায় দারুণ উৎপাত শুরু করলে
তোমার কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিইনি, যদি একটা দুপুর
মণিদীপার সঙ্গে...তারপর সব মুছে ফেলা যেত
তবু পারিনি, সেদিন তোমায় বলেছিলাম, হিংসুটে আহ্লাদী পেল্লাদি!

তুমিও আমাকে দু-তিনটে চিঠি লিখেছিলে
না, মোট পাঁচটা, ঠিক মনে আছে
কী সম্বোধন করেছ, শুধু নাম, তাই না?
তোমাদের বাড়ির কাজের লোক আর আমার নাম একই
তবু তুমি অন্য নাম দাওনি
সে সব চিঠি রেখে দিইনি অবশ্য, বিয়ের আগে নষ্ট করে ফেলতে হয়েছে
আমি জানি, আমার ছিন্নপত্রগুলিও হাওয়ায় উড়তে উড়তে
কোনো মরুভূমিতে কিংবা লবণ সমুদ্রে ছড়িয়ে গেছে
একেই বলে, সাধনোচিত ধামে প্রস্থান!
সরকারি কাজে বাইরে যাচ্ছি, এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা
অনেক বছর বাদে, একটুক্ষণের জন্যে, মনে আছে?
কী সব এলেবেলে কথা হল, ইংরিজিতে যাকে বলে স্মল টক
বাংলায় আমড়াগাছি, আমার একদম পছন্দ হয় না

ওদিকে তোমার স্বামী বেচারি অতিরিক্ত লাগেজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত
তোমরা যাবে মুম্বাই, আমি দিল্লি, আমাদের সময় আলাদা
সময় আলাদা, সময়ের মাঝখানে বিরাট ফাটল, আমরা কেউ কারুর নয়
তোমার একটা ছেলে, বোধহয় তিন চার বছর বয়েস হবে
তোমার ঊরুর শাড়িতে মুখ ঢেকে মিটি মিটি চোখে দেখছে আমাকে
সরল শৈশব অতি সাংঘাতিক, বয়স্করা দুর্বল হয়ে পড়ে
এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল, এ আমার সন্তান
হলেও তো হতে পারত
যদি আমি পেরিয়ে আসতে পারতাম একটা মরুভূমি
আমিও অবশ্য অন্য দুটি সন্তানের পিতা, তারা আমার খুবই প্রিয়
তবু ঐ বাচ্চাটা জুল জুল করে তাকাচ্ছে, কী যে মায়া হল
ওর মাথার চুলে আদর করতে গিয়েও সরিয়ে নিলাম হাত

সিকিউরিটিতে ঢোকার আগে আমি মনে মনে কী বললাম জানো?
এই নারীকে আমি মরীচিকা বলতাম এক সময়, তাই না?
ও আসলে আমার মরূদ্যান
কোনো দিন পৌঁছোতে পারিনি, কিংবা চাইনি, কিন্তু ওর অঞ্জলি থেকেই
তো জল পান করে গেছি সেই যৌবনে
শুধু ঐ টুকুই, মনে রেখো, তুমি আমার বুক মুচড়ে দিতে পারোনি
তোমার মূর্তি গড়িয়ে ভালোবাসার নামে ঘোরাফেরা করেছি
শিল্পের আশে পাশে
সব চিঠি, সব সম্বোধন, তোমাকে নয়, সেই মূর্তিকে
ঝুল বারান্দা থেকে আমিই তোমাকে নেমে আসতে দিইনি
ধুলো মাটির রাস্তায়!

তুম্বুনিতে সেই রাত্রি

তুম্বুনিতে সেই রাত্রি, মাঠের মধ্যে ঘোর অন্ধকার
বসন্ত পোদ্দার নামে দৈত্যাকার মারাঠি যুবক
আর কঠোর চেহারার কুসুমকোমল রশিদ খান
শক্তির দাপাদাপি আর সন্দীপনের জাদুবাস্তবতার প্রতিশ্রুতি
সবচেয়ে কৃশকায়, সবচেয়ে মায়াময় যোগব্রত
চাঁদ উঠবে না, আলপথে অনেক গর্ত ও রিপুভয়
হঠাৎ হঠাৎ পুরুষকারের ঠোকাঠুকি, অট্টহাসি ও
মধুমাখানো ছুরির সংলাপ
এবং গান, আমরা হাঁটছি, যে কেউ বেসুরো হবার জন্য স্বাধীন
তারই মধ্যে কোথায় ছুটে গেল যোগব্রত, একটা প্রবল
ই-ই শব্দ করে, অভিমানের কুয়াশা মেখে
আমরা থমকে যাই, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলি
আকাশে উড়ন্ত বাদুড়, কোথাও ডাকছে প্যাঁচা, আর
কেন এত ঝিঁঝির ডাক
এগারোটি কণ্ঠে সেই পাতলা যুবকটির নাম ধরে চিৎকার করে
টুপটাপ খসে পড়ে এক একটা নক্ষত্র, উল্কা ছুটে যায়
তুম্বুনির মাঠে আমরা ডেকে চলেছি গলা চিরে
যোগব্রত ফিরে আয়, যোগব্রত, ফিরে আয়, ফিরে আয়
যুদ্ধযাত্রী পুরুষেরা হাহাকার করছে একজনের জন্য
অভিমান ছাড়া যার আর কোনো হাতিয়ার নেই।

দরজার কাছে এসে

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক নারী

তোমার তো দেখার দরকার কিছু নেই
তুমি থাকো সহস্র ব্যস্ততা-নির্বাসনে
ঠান্ডা হোক সকালের চা, তুমি খাও চিঠির কাগজ
তুমি খাও টেলিফোন, তোমাকেও খেয়ে নিক কিছু লোভী চোখ
বিভিন্ন হাতের পাঞ্জা, মানুষের ভাষা।

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক জনমদুখিনী

কে ডাকছে? এগারো রকম কণ্ঠস্বর
একই উত্তর
শরীর জাগ্রত, অন্য শরীরের টান
রং দিয়ে মুছে দাও, কিংবা থাকো ঘুমের গভীরে
জামার বোতাম একটা অসময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে?
দু'আঙুলে ছুঁয়ে দিলে বুক।

দরজার কাছে এসে কে দাঁড়িয়ে আছে
ভিজে-পা খালি-পা এক জীবনসর্বস্ব।

রাশি রাশি শুকনো পাতা

সবাই অনেক কিছু জেনে গেছে, যে-সব জানার কোনো
দরকারই ছিল না
এত সব অকিঞ্চিৎকর জানার আবর্জনা ভর্তি মাথা
তাই তো পদক্ষেপে মাঝেমাঝেই থাকে না নিজস্বতা

সমস্ত রাস্তাই যদি চেনা হয়ে যায়, তখনও
উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকে কয়েকটি অচেনা
স্বপ্নগুলোও সরল, সাদাসিধে হয়ে গেলে
আর বেঁচে থাকারই কোনো মানে থাকে না।

এই দেশের বুকের মধ্যেও রয়েছে একটা গোপন দেশ
পরিচিত মানুষের ভিড়ে একটি রহস্যময় মুখ
গণ্ডি এঁকে ঘিরে রাখা নারীর আঁচল ওড়ে, ঢেকে দেয় চোখ
আর তখনই সমস্ত গণ্ডির বাইরে ছুটে যায় অসংখ্য পলাতক
একটি মৃত নদীর গর্ভে শোনা যায় কুলুকুলু ধ্বনি
বাতাসে কীসের ঘ্রাণ, যেন যাত্রা শুরু হবে আবার
শৈশব থেকে, কিংবা মধ্য বয়েস থমকে গিয়ে ঘাড় ফেরায়
গাছের মতনই পাতা ঝরে, পাতা ওড়ে, রাশি রাশি
শুকনো পাতা...

জীবনের আত্মজীবনী

আমার একত্রিশতম পূর্বপুরুষ
যখন একটি ছটফটে নদীর পাশে, ভর দুপুরে
খোলা মাঠে তার ছ'নম্বর রমণীটির সঙ্গে

চিৎ-উপুড় খেলায় হাঁপাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই
হঠাৎ তাঁর পিঠের ওপর এসে বসল একটা বাজপাখি।
কী ঝামেলা!
বাজপাখিকে সরিয়ে দেওয়া যায় না, খেলাও বন্ধ করা যায় না
তখন নাকি আবার আকাশে আগুনের ছড়াছড়ি
দুই দিগন্ত থেকে ছুটে আসা ঝড় রং বদলাবদলি করছিল
ঘুমন্ত পাহাড়ের গায়ে ঘাস-আগাছার মধ্যে তুঁত বরণ ফুল
আর অনন্ত অবাক-চোখে ফড়িং
পায়রারা তাদের ঠোঁটে ধরে ধরেই খেয়ে ফেলছিল কচকচিয়ে
এই সবের মধ্যে হল কী
আমার ত্রিশতম ঠাকুরদা জন্মালেন অষ্টাবক্র হয়ে
তাঁর চেহারাটা শালিক-শালিক আর ভেতরে
বাজপাখির আত্মা!

এই সবই লেখা আছে ধারাবাহিক জিনের আত্মজীবনীতে
আর সব আত্মজীবনীতেই কিছু কিছু ভুল থাকে ইতিহাসে
আগুন? না, সে সময়ের আকাশ ছিল ভবঘুরে সাদা
মেঘে ঢাকা?
হয়তো ঝড় ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছিল মান ভাঙার গান
পায়রাগুলো সত্যিই হিংস্র ছিল? এখন তারাই
শান্তির পতাকায় পতপত করে
আমার নারীর কাছে, আমি, এক এক সময়
কী যে হয়, বাজপাখির মতন ডানা ঝাপটাতে যাই
সে খুব শান্ত, নীল স্বরে বলে, দেখো,
সরবিট্রেট রেখেছ তো জিভের তলায়?

ধ্যান ভঙ্গ

আমার সেই অরণ্য প্রবাসে, উপবাস-খিন্ন দেহের সামনে
তুমি পায়সান্নের বাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে না?
গাছতলার আলো ছায়ায় আর কেউ ছিল না
আমার সমস্ত শরীরময় ক্ষুধা
তবু আমি প্রথমেই সুঘ্রাণ চরুর জন্য লোভ করিনি
আগে দেখেছি তোমার পায়ের পাতা
পদনখে কয়েক সহস্র চাঁদ, আলতা রাঙা গোড়ালি
মাঝখানে লাল রঙের পৃথিবী
তারপর দুটি পা বেয়ে ওঠা হিলহিলে লাবণ্য
চালতা ফলের মতন গুল্ফ, ভাঙা পর্বতশৃঙ্গের
মতন জানু
ছাল ছাড়ানো কলা গাছের মতন ঊরুদ্বয়
হে রম্ভোরু, আমি কেঁপে উঠেছিলাম
কোথায় গেল আমার ক্ষুধা ও ক্ষুদ্র তৃষ্ণা
তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলে সুমেরু
আড়াল করে
নাভিতে মেঘলুপ্ত চাঁদ
কী গভীর রহস্যময় যোনিদেশ
যেন বিষাদময় এক ঝর্নার উৎসমুখ
মরাল গ্রীবার মতন তোমার দুটি হাত
সদ্য ফোটা পদ্মের মতন দুটি সুগন্ধ স্তন
না, তোমার হাতে ধরা সোনার পাত্রটি আগে দেখিনি
দেখেছি তোমার ময়ূর-নিন্দিত গ্রীবা, দেখেছি
তোমার শিশু-সারল্যের থুতনি
নদীর বাঁকের মতন দুটি চোখ
উড়ন্ত ভুরু, দৃষ্টিতে বৃষ্টিস্নাত রোদ...

কীসের জন্য কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না
‘অয়ি’ বলে তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে হয়
আর ফিরে আসবে না?
সমগ্রতায় যদি নাও আসতে পারো
শুধু দুটি রক্তিম পায়ের পাতা
নাভিতে সদ্য বিলুপ্ত চাঁদ, ভুরুতে অচিন পাখি
দাঁড়িয়ে থাকার নিস্তব্ধ সঙ্গীত, ঊরুর বিষণ্ণতা
কিছু একটা দেখা দাও
ধ্যান ভেঙে বসে আছি, দেখা দাও, দেখা দাও!

কুয়াশার মায়াপাশ

ঝড় উঠবার আগেই সে কেন হঠাৎ হারিয়ে গেল
নৈরাজ্য বা বিপর্যয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করল না
আকাশ যখন মেঘের সঙ্গে মেতে ওঠে সংঘর্ষে
তখন চতুর্দিকেই তো চলে এলোমেলো আনাগোনা।

যারা কাছে ছিল তারা কোন্ টানে চলে গেল খুব দূরে
একা বসে আছি সারাটা বিকেল রোদ ঝলমল ছুটি
কিংবা আমিই জ্যা-মুক্ত এক তিরের মতন বেগে
কিছুই না জেনে বাতাসে রেখেছি ব্যর্থ বজ্রমুঠি!

মায়ের সঙ্গে দেখাও হয় না, বাবার ছবিটি ম্লান
কৈশোর যেন সাদা কালো ছবি, উইধরা অ্যালবাম
সুন্দর, তুমি পাঠালে আমায় অলীক অন্বেষণে
যেখানে যেখানে আঙুলের ছোঁয়া ব্যর্থ মনস্কাম।

কেউ কি হারিয়ে গিয়েছে, অথবা আমিই এখানে নেই
এই যে আকস্মিক সন্ধ্যায় শুরু হয় হা-হুতাশ
ঈষৎ নেশায় মনগড়া সব দুঃখেরা উদ্বেল
সব দুঃখই নদীসঙ্গমে কুয়াশার মায়াপাশ!

আগমনী কান্না

সভ্যতার সঙ্কটের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে হয়
রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন
অমনি শুনতে পাই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ
শেষ রাতে স্বপ্ন দেখি পিকাসোকে
আবার গের্নিকা আঁকছেন
ঘুম ভাঙার পরও ঘোর কাটে না
দেয়ালে লেনিনের ছবির চোখ দুটো মনে হয় জীবন্ত
যেন কিছু বলতে চাইছেন তিনি
জানলার বাইরের উন্মত্ত চিৎকারে কি মাথা খারাপ
হয়ে যাচ্ছে আমার;
ওঁরা তো কেউ নেই, অনেক দিন নেই
চলে গেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল ও গান্ধীজি
চার্লি চ্যাপলিন নেই, চলে গেছেন সত্যজিৎ রায়
পল রবসন, বড়ে গুলাম আলি খান
মাদার টেরিজা আর মার্টিন লুথার কিং
যাঁদেরই কথা মনে পড়ে, সবাইকে খেয়ে নিয়েছে
বিংশ শতাব্দী
তা হলে এই নতুন শতাব্দীতে সুস্থতার ভরসা চাইব
কার কাছে?

পরের মুহূর্তেই শুনতে পাই
সদ্য জন্মানো পঞ্চান্ন হাজার শিশুর আগমনী কান্না...

কল্পান্তের আগে

কাছাকাছি সব কিছুর মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ছে দূরত্ব
দূরত্ব শব্দটাই অনবরত জ্বালাচ্ছে আমাকে
যা-ই লিখতে যাই, কলমের ডগায় পিঁপড়ের মতন দূরত্ব এসে যায়
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?
মাথা তুলছে ডুবো পাহাড়, মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে
শিকড় সমেত গাছপালা
অতিকায় প্রাণীর মতন সহস্রাব্দ ল্যাজ আছড়াচ্ছে
পাশ ফিরে
এমনও কি হতে পারে, দিন-দুপুরে যা আমার চোখের সামনে জীবন্ত
তা অন্য কেউ দেখছে না?

ময়দানে ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে জামার সবক'টি বোতাম খোলা ছেলেটি
আর মেয়েটির শাড়ির পাড়ের বাইরে রক্তাভ পায়ের পাতায়
বিন্দু বিন্দু শখের দুঃখ
ওরা অন্য কিছু দেখছে না, ওদের মধ্যেও কি উঁকি মারছে দূরত্ব
নইলে সন্ধে হবার আগেই ও কীসের, পর্বতের মতন দীর্ঘ ছায়া?
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?
নদীরা সব দল বেঁধে ফিরে যাচ্ছে বাপের বাড়িতে
মাথা তুলছে ডুবো পাহাড়, মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে
শিকড় সমেত গাছপালা
ধান-ক্ষেতে পড়ে আছে এত গুঁড়ো গুঁড়ো স্বপ্ন...

হঠাৎ শহরটা বিনা যুদ্ধে ব্ল্যাক আউট ঘোষণার মতন
অলীক হয়ে যায়
চোখের নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এক-একটা রাস্তা
গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে যে ছুটছে, তারই পিঠে
লাগছে প্রথম গুলিটা
নিভে যাওয়া বাতিস্তম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল
চকখড়ির মতন মুখওয়ালা একজন মানুষ
কী অসম্ভব ঠান্ডা চোখে সে খুঁজছে কোনও পাশা খেলার সঙ্গী
মেঘের গুরু গুরু ডাকে শোনা যাচ্ছে সমস্ত নিয়ম ভাঙার আহ্বান
তবে কি শুরু হয়ে গেল কল্পান্ত?

ময়দানে বোতাম খোলা ছেলেটি আর একটু দাঁতে কাটুক ঘাস
মেয়েটির চোখ থাক না কান্নাভেজা, রুমাল ছোঁয়াবার দরকার নেই
আরও কিছুক্ষণ, আরও কিছুক্ষণ
বিশ্ব-সংসার চোখ বুজে থাকো
দূরত্ব, তুমি থমকে দাঁড়াও!

অ-প্রেম

ভালোবাসা ছিন্ন করে চলে যাওয়া তেমন শক্ত না
অনেকেই যায়, তারা কোন দিকে যায়, নিরুদ্দেশে?
রক্ত সাগরের তীরে জাহাজ অপেক্ষমাণ, অথবা রক্ত না
কালো হ্রদ, দুর্নিবার মেঘ ঝঞ্ঝা দিগন্তের শেষে।

বুকের ভেতরে মেঘ, যার অন্য নাম অভিমান
পায়ের তলায় ফুল, কিংবা পিঁপড়ে দলে পিষে যাওয়া
ভালোবাসা তাও নয়, আরও পলকা, একটি ফুৎকারে খান খান
মরুভূমি জেগে থাকে, শিয়রে সশস্ত্র ঘোরে হাওয়া।

তবু একটা গভীর অরণ্য

জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য
বেশি দূর যেতে হয় না, মাঝে মাঝে খুব কাছে আসে
নীরব পাঁশুটে গাছ, হাতছানি দেয় ছোট-বড় পরগাছা
পায়ে চলা সরু পথ, মাঝে মাঝে ঘোর অন্ধকার
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য—

বাতাসে কীসের শব্দ, বিন্দু বিন্দু আলো নয়, উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ
পাতা-পোড়ানিরা সব বৃত্ত হয়ে বসে আছে দীর্ঘ চুল মেলে
কেউ কারো দিকে চায় না, শোনা যায় দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি
এক দৌড়ে বাইরে আসা যায়, তবু পিছুটান গেঁথে থাকে পিঠে
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য—

ভাতের থালায় এসে উড়ে পড়ে পোকা ধরা অজানা বৃক্ষের
জীর্ণ পাতা
সিঁড়ির তলায় লম্বা সাপ আর পাহাড়ি ইঁদুর খেলা করে
খেলার ওদিকে আমি, বাড়িখানা ভাঙা মন্দিরের মতো নিথর নির্জন
একদা যেখানে ছিল ঝর্না তার শুকনো খাতে দিকহারা ফড়িঙের ঝাঁক
পাথরের খাঁজে বসে থাকা যায়, হাওয়ায় অসংখ্য দীর্ঘশ্বাস
জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে ঠিকই, তবু একটা গভীর অরণ্য
মাঝে মাঝে কাছে আসে, অথবা স্বেচ্ছায় তার গাঢ় তমসায় ছুটে যাই!

স্বপ্ন

সাত পা এক সঙ্গে হাঁটা, তারপর স্বপ্ন দেখা শুরু
যখন তখন, দিন দুপুরে, রান্না ঘরে, বাথরুমে জলের ধারায়
স্বপ্ন বদলে যায় বারবার
তুমি মেয়ে চেয়েছিলে, আমি কেন ছেলে চাই
নিজেই জানি না
দেখো, যে এসেছে সে যে দু'জনেরই
দু' চোখের মণি
হামাগুড়ি দিতে দিতে টলটলে পায়ে দাঁড়িয়েছে
এখন দুধের গ্লাস নিজে ধরতে পারে, কী দারুণ
চমৎকার দুষ্টুমি শিখেছে।
এবার ইস্কুলে যাবে, মামণি ইস্কুলে যাবে
তুমি কিংবা আমি পৌঁছে দেব, কিন্তু কে আনবে
স্কুলবাস অ্যাদ্দুর আসে না।

আবার সে স্বপ্নটাই ফিরে ফিরে আসে
আমাদের চার দেয়াল, আমাদের নিজস্ব বারান্দা
ঘিঞ্জি বসতিতে নয়, শহরতলিতে নয়
নতুন রাস্তায়
অফিস যাবার পথে রোজ দেখি। সার সার বাড়ি উঠছে
তিনতলার ফ্ল্যাট
পুরোটা দক্ষিণ খোলা, বড় বড় জানলা সব দিকে
দেখো, দেখো, মেঝেটা কী ঠান্ডা, আর দেয়ালগুলোও
বেশ দূরে দূরে
রং বদলাতে হবে, যেমন দেখেছিলাম ভোরবেলা
কাঞ্চনজঙ্ঘায়
মামণি, দেয়ালে তুমি খবরদার পেনসিল দিয়ে
ছবি আঁকবে না
টবে ঝুলবে মানি প্ল্যান্ট, এবং মায়ের ঘরে রামকৃষ্ণদেব

খাঁচার ময়না পাখি, মা ওটা আনবেনই,
যখন তখন কথা বলে
দরজায় বেল বাজলে বলে ওঠে, কে এল গো? এসো, বসো
চা খাও, চা খাও!
কী মুশকিল, ওর জন্য কলের মিস্তিরি আর পিয়নকেও
চা খাওয়াতে হয়।

আচমকা চোখে জল

একদিন যারা খুব কাছাকাছি ছিল, এখন তারা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে
কেউ কেউ অদৃশ্যলোকে
এটা নতুন কিছু নয়
কোনো সময়ে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলোও তো জড়ামড়ি করেছিল
একান্নবর্তী পরিবারের ভাইবোনদের মতন
তারপর আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যেমন হয়, একটু একটু ব্যবধান
তারপর তাদেরও আলাদা আলাদা বৃত্ত
কয়েক ঋতুর অদেখা, ক্রমশ আলোকবর্ষ
এখন গোটা মহাবিশ্বই বেলুনের মতো ফুলছে
অস্তিত্বগুলো পালাচ্ছে যে যেদিকে পারে
কেউ কারুর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না
মুছে ফেলছে পূর্বস্মৃতি, পিছুটান নেই, এমনকী
রেয়াত করছে না মাধ্যাকর্ষণও
একদিন এই বেলুনটা হঠাৎ ফেটে গিয়ে সবাই ডুবে যাবে
মহাকাল সাগরে
এই ধাবমানতাই ডেকে আনবে অন্তিম পরিণতি
আমার প্রতিটি পরমাণুতে বহন করছি
সেই দূরত্ব সৃষ্টির বিশ্ব ইতিহাস...

হে মহাকালের প্রবাহ, তোমাকে দেখতে পাই না
তবু কেন আচমকা চোখে জল এসে যায়
এক একটা অশ্রুবিন্দু নিজেই জিভ দিয়ে চাটি!

রিঙ্কু-রঞ্জনের বাড়ির কোলাজ

হলুদ রঙের ডুবো-তরী, কে আসছে কে যাচ্ছে,
কেউ ভাসছে নীল বাতাসে

সিঁড়িতে বসা দুই কিশোর, বাংলা গলায় স্পেনীয় গান,
টুঙ্গি ঘরে ছবির পর ছবি

এই সকাল, এই বিকেল, কয়েকখানা মহাদেশের
গল্পে মেতে থাকা মধ্যরাত

কাজের মেয়ে কবিতা পড়ে, ফোন বাজছে,
মোটর সাইকেলের শব্দ হঠাৎ দরজায়

দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবন, অতীত এবং ভবিষ্যৎ গলা জড়িয়ে
খুলছে সব জানলা

একটি বিন্দু আলো কিংবা অন্ধকার, একটি বিন্দু বহুবর্ণ
এক-একবার হাতের মুঠোয়, এক-একবার
শূন্যে

হলুদ রঙের ডুবো-তরী, কে আসছে, কে যাচ্ছে,
কেউ ভাসছে নীল বাতাসে...

গল্প

রঞ্জন গল্প শোনাচ্ছে গল্পরাও নির্মাণ করছে রঞ্জনকে
একতাল মাটি গড়া মূর্তির মতন মাঝে-মাঝে
বদলে যাচ্ছে তার মুখের আদল
নিপুণ শিল্পীর মতন গল্পগুলি পরীক্ষায় মেতে আছে
রঞ্জনের গাত্রবর্ণ নিয়ে
আমরা চেয়ারে বসে আছি, চেয়ারগুলো বসে আছে আমাদের
কোলে রেখে
যেমন আমরা বিছানায় শুলে বিছানারা আমাদের নিয়ে
ঘুমোয়
গল্পের চরিত্ররা মাঝে-মাঝে এসে ঘুরিয়ে দিচ্ছে
কাহিনীর মোড়
মাসতুতো বোন ও প্রবাসিনী বউদিরা ভাঁজ করে দিচ্ছে
সময়
পুরনো গল্পেরা খুলে ফেলছে পোশাক
নিরুদ্দিষ্টরা ফিরে আসছে সমুদ্র পেরিয়ে
বাবা বয়স কমিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন ছেলের থেকে
স্ত্রী ফিরে গেছে, মিলিয়ে গেছে কৈশোর প্রেমিকায়
সময় থেমে থাকে না, সময় পেছনে ফিরেও যায় না
অপরিকল্পিত এক একটি গল্প রঞ্জনের বুক
থেকে উঠে এসে কণ্ঠস্বরের অলিগলি ও সেতু
পেরিয়ে
বেরিয়ে আসছে খোলা মাঠে, যেন বিগত ও
অনাগতদের নিয়ে লোফালুফি
খেলছে রঙিন বেলুনের মতন
বেলুনের পেটে বেলুন, সহস্রার পদ্ম, পাপড়ি মেলে
দিচ্ছে, উড়ছে বাতাসে।

হিমালয়কেও দেখা যায় না

কোথাও একটা হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙছে ভাঙুক
আকাশে তবু ডেকে যাচ্ছে একটা রাতপাখি।

রাস্তাগুলো রিপুভয়ের জন্য রোজই বদলাচ্ছে দিক
দিকভ্রান্তের নিজস্ব রাস্তাটাই অদৃশ্য!

এবার তবে জলে নামবে, মুছবে পদচিহ্ন?
ভালোবাসার জড়ুলে তবু লেগে থাকবে রক্ত।

পিছন ফিরে তাকাও, ছুটে আসবে হাজার প্রশ্ন
খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছে অন্ধ ত্রিকালদর্শী।

প্রশ্নগুলি বীর্য হয়ে যাবে নারীর গর্ভে
একটি হাসির ঝিলিকে সব ক্ষণকালের শিল্প।

যেমন তুমি দাঁড়াও এসে আমার চোখের সামনে
হিমালয়কেও দেখা যায় না, আর তো সবই তুচ্ছ!

বাজের শব্দ

স্নান করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে মেল
ট্রেনের মতন ছুটে আসছে খিদে, অথচ কয়েক
লাইন লেখা বাকি। এই সময় হঠাৎ যদি
একটা প্রচণ্ড
বাজ পড়ে? তাহলে আমি মেল ট্রেনটাকেই

খাব, না-লেখা লাইনগুলো স্নান করবে,
আর বাজের মধ্যে শিশুর কান্নার মতন একটা
শব্দ শোনা যাবে, খিদে, খিদে, খিদে!

হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা...

হে রাত্রি, পাথর-ভাঙা, শিকলের ঝনঝনানি আর কতক্ষণ?
পুকুরের ধারে নিচু চাঁদ
পুকুরের ধারে নিচু চাঁদটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে
খয়েরি খরগোশ
তালপাতার উড়ন্ত শাম্পানে ভেসে গেল একটি আকুল মূর্ধজা
কান্নাপরী
জানলায় কাচ নেই, কে দাঁড়িয়ে রয়েছে এত একা?

চোখ গেল পাখিটির সঙ্গে চোখ গেল
স্বর্গ উত্থানের সিঁড়ি ভগ্নস্তূপ হয়ে পড়ে আছে
চলে যাবে?
বুক ভরা এত ভালোবাসা, আহা, কতখানি খরচই হল না
আগুন কি ভালোবাসা চেনে?

রাধা

কোন ঘাটে যাবি রাধা, যে-ঘাটে রয়েছে
কালো বাঘটা ঘাপটি মেরে?
আর সব ঘাটে দেখ, দু’ পয়সার বিকিকিনি
ঠিকঠাক চলেছে
পারানিরা চেনা শুনো, কড়ি বুঝে নেয়,
ঘর গেরস্থালি সব অবিকল থাকে
তুই কেন যাস সখী জেনে শুনে ভুলপথে
বাঘের খপ্পরে?
ও রাধা আয় রে ফিরে, আমরা সবাই
বসে আছি এই
যমুনার তীরে।

রাধার কোমর থেকে গাগরি উছলে ওঠে
দু’পায়ের মলে যেন লেগেছে তুফান
বাঘটা ডাকেনি তাকে, চুপ করে চেয়ে আছে
কে ডেকেছে, কে টেনেছে তাকে?
বুকে হাত দিয়ে দেখে, উথাল পাথাল, যেন
সমস্ত সংসার নিরুদ্দেশ
নীবিবন্ধে এ কী জ্বালা, দূর ছাই, এ মরণে
কত সুখ, কেউ তা জানবে না!

প্রথম দেখার মতো

প্রতিবার দেখা, কিছু নীরবতা, প্রথম দেখার মতো
নম্র গোধূলি, মায়া দর্পণ, আলো যেন জলকণা

সহস্র ঢেউ, চার পাশে, তার মাঝখানে এক দ্বীপ
দূর থেকে, যেন কল্পলোকের ওপারে দাঁড়িয়ে কথা।

গোধূলিও নয়, শহুরে সন্ধে, ভিড় ঠেলে ঠেলে আসা
ঝুলকালি মাখা ধোঁয়াটে নগরী, পদে পদে পিছু টান
তবু সেই দ্বীপ, দু' চোখের দ্যুতি, এসেছি তোমার কাছে
প্রতিবার দেখা, কিছু নীরবতা, প্রথম দেখার মতো!

মানুষ হারিয়ে যায়

মানুষ হারিয়ে যায়, চতুর্দিকে হারানো মানুষ
সকলেরই নাম আছে
কেউ কারো ঠিকানা জানে না
নিজেরই বাড়িতে এসে মনে হয় অচেনা সবাই
এক একটা মুহূর্ত আসে
সব কিছু ভুল হয়ে যায়
যেন ভুল করে ফেরা, কথা ছিল অন্য কোনোখানে;

মানুষ হারিয়ে যায়, চতুর্দিকে হারানো মানুষ
যেন অন্য পোশাকের
আড়ালে লুকিয়ে থাকে কেউ
নাম ধরে ডাকাডাকি, চোখে ফুটে ওঠে অন্য ভাষা
ভুল মর্ম, ভুল নর্ম
তাই নিয়ে কাটে সারাবেলা
সবাই অন্যকে খোঁজে, শুধু কেউ নিজেকে খোঁজে না!

কবির উপহার

ছায়া সিনেমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার অল্প বয়েস
নয় কি এগারো, হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে পড়ছি কবিতা
'বল বীর, চির উন্নত মম শির...' সামনেই বাবা
ভয়ে উদগ্রীব, যদি ভুল করি, যদি মুখস্থ ফসকায়
আমি নির্ভয়, সেই সভা ঘরে ক্ষুদে আবৃত্তিকার
হাততালি কম পায়নি, এবং একটা রুপোর মেডেল!

বাংলার স্যার একদিন নিয়ে গেলেন কবির কাছে
জন্মদিনের উৎসব, কত ভক্ত এবং ফুলটুল
কবি রয়েছেন নির্বাক, চোখ কারুকেই দেখছে না
প্রণাম করেছি, পিঠে খোঁচা মেরে স্যার বললেন, শোনাও
কবিকে শোনাও সেই কবিতাটা, অন্য অনেক লোকেরা
তারাও বলল, শোনাও ও খোকা, শুরু করো, শুরু করো
কিন্তু আমার গলা থেকে আর বেরুল না কোনো শব্দ
পালাতে পারলে বাঁচি, ভিড় ঠেলে কী করে কোথায় লুকোব
ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে মুকড়ে আমি যেন অদৃশ্য!

অত গোলমাল, অত স্তবস্তুতি কবির সহ্য হল না
গলার মালাটা একটানে ছিঁড়ে দিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে
একখানা ফুল ছিটকে পড়ল আমার বুকের ওপর
চট করে সেটা তুলে নিই কেউ দেখল কি দেখল না

সেই ফুলখানা আজও রাখা আছে আমার খাতার ভাঁজে...

কে তুমি? কে তুমি?

সুপর্ণ বেরিয়ে যায় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায়
সুপর্ণটা কে?
বাঃ সে একজন বহুরূপী নয়?
নারী সেবা সমিতিতে সকলেই তাকে জানে
মিসেস অলকা বিশ্বাসের হাজব্যান্ড
অগ্রণী তরুণ সঙ্ঘে সম্বিতের বাবা
নন্দিতারও বাপি, তবে সেটা বলে রাস্তার ওপারে
হলদে বাড়ির মাসিরা
অফিসে, পার্টিতে তার ডাকনাম এস বি, কিংবা
'এস ও বি'-ও বলে কেউ কেউ
গাড়ি আসে সাড়ে ন'টায়, সদ্যস্নাত সুপর্ণ বিশ্বাস ঠোঁটে
সিগারেট ঝুলিয়ে দরজা খোলে।
তার ফিরতে রাত হবে, দিল্লি থেকে হেড অফিস
উড়ে আসছে সন্ধের বিমানে
এটা আজ ছুতো নয়, অন্যদিন ক্লাব গমনের মতো নয়
অবশ্য সে ভুলে যায় না ছেলে মেয়েদের জন্মদিন।

সম্বিৎ থার্ড ইয়ার, তার আছে কলেজে যাবার
কিংবা না-যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা
কোনো কোনোদিন খুব ভোর থেকে সে নিশ্চুপ, একাচোরা
বিশ্বসংসারের সঙ্গে কোনো যোগ নেই
আবার কখনও তীব্র নাদে সে বাজায় বহুক্ষণ
বিদ্যুৎ-গিটার
সেদ্ধ ডিম খাবে বলেছিল, পড়ে রইল, সে খেল না
দুই বন্ধু এসে
ডেকে নিয়ে গেল নিরুদ্দেশে।
ছোট মেয়ে নন্দিতাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক তুলে দিতে হয়
পৌনে দশটার স্কুলবাসে

ইদানীং সাজগোজ নিজেই সে করে নেয় বেশ
সদ্য সে চোদ্দোয় পা, তার বালিকাত্ব খসে যাচ্ছে হুড়মুড়িয়ে
বিরলে মায়ের সঙ্গে গোপন কথার দিন শেষ
বাথরুমে ভেজা ফ্রক ও ব্রা ফেলে রাখে
বকুনিতে গ্রাহ্যও করে না
অন্যদিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে ফুরফুরিয়ে হাসে
স্কুল থেকে ফিরেই সে হলদে বাড়িটায় কেন যায়
মার চেয়ে মাসিদের দরদের এতখানি টান
ও বাড়িতে কারা যেন মড়াকান্নার মতো গান গায়
প্রত্যেক সন্ধ্যায়
এখন নন্দিতা আর 'মা যাচ্ছি' বলে না।

তারপর, অলকা বিশ্বাস, তুমি কার?
সুদীর্ঘ দুপুর, সল্ট লেকে ধু-ধু বেলা
কাক-শালিকেরও ছুটি, চিলেরাও ক্রমে ঊর্ধ্বাকাশে
উঠে যায়
রাস্তায় কুকুরগুলো ঘুমের আশ্রয় খোঁজে
সাইকেল রিক্সার নীচে পাতলা ছায়ায়
এ অঞ্চলে ফেরিওয়ালা বিশেষ আসে না
ক্বচিৎ গাড়ির শব্দ স্তব্ধতার তালভঙ্গ করে যায়
বেরসিকভাবে
অলকা বিশ্বাস দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে
উঠতে উঠতে থেমে গেল কেন যে সহসা
আঁচল স্খলিত, দুই বুকে তার সমুদ্রের আঁটোসাঁটো ঢেউ
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, এ মুহূর্তে
কে তুমি কামিনী?

দুপুরের ফাঁকতালে চুপি চুপি আসবে কোনো গোপন প্রেমিক
এ তেমন ছেঁদো গল্প নয়

দু’-তিন ঘণ্টার জন্য শাড়ি ছেড়ে, সালোয়ার কামিজে সেজে
বাড়ি থেকে যাবে না সে
কোনোরূপ গোলকধাঁধায়
কৈশোরের গানের মাস্টারটির স্মৃতি আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে
মাসতুতো দাদার বন্ধু, সবজান্তা, কন্দর্পের মতো কান্তি
সন্দীপের মুখ মনে পড়লে হাসি পায়
উড়ো টেলিফোনও বন্ধ হয়ে গেছে চার বছর আগে
পোষা কোনো দুঃখ নেই, অলীক, শৌখিন
বুক ব্যথা কিছু নেই
এ জীবন স্বেচ্ছাকৃত, স্বামী ও সন্তানে সমর্পিত
সংসারের সব কিছু নিজে গড়া, নীল পর্দা, বাঁকুড়ার ঘোড়া
হুইস্কির বোতলে মানি প্ল্যান্ট, টবে লঙ্কা গাছে সাদা সাদা ফুল
একখানা যামিনী রায়, (আসল না কপি?) ভ্যান গঘের প্রিন্ট
সামনের আলমারিতে শুধু সুদৃশ্য ইংরিজি বই
কিছু বাংলা অত্যন্ত অন্দরে
সবই ঠিকঠাক আছে, তাই নয় কি অলকা বিশ্বাস?

তুমি কে? তুমি কে?
এমন দুপুরে মায়া হরিণীরা বিচরণে আসে
এমন দুপুরে রোদে ভোজবাজি ঝলসে ঝলসে ওঠে
এমন দুপুরে আধ-খোলা উপন্যাস কিংবা
কুরুশ কাঠির ভুল বোনা সোয়েটার
কিছুই পড়ে না মনে
পাহাড়ি নদীতে ভেসে আসে কাঠকুটো, ছিন্ন মালা
সিঁড়িতে কোত্থেকে এল এত জল, বৃষ্টি না
বন্যার মতো ঢল
দরজা বন্ধ, কেউ নেই, তুমি একা
একাকিত্বেরও চেয়ে একা
নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, তন্বী-শ্যামা উত্তর চল্লিশ

মেঘ ডাকছে বজ্র নাদে, কে তুমি, কে তুমি?
অলকা বিশ্বাস, সাড়ে তিনটেয় আছে নারী-সেবার মিটিং,
মনে নেই?
খিদে মনে নেই, ঘুম মনে নেই, ঘুগনি বানাবার কথা
মনে নেই?

শরীরের মধ্যে মৃদু জ্বালা, বুকে কস্তুরীর ঘ্রাণ
শাড়ি ও সায়ার মধ্যে অস্তিত্বের তমসায় বাতাসের
মৃদু ফিসফিসানি
কে তুমি? কে তুমি?

ঝনঝন শব্দে একটা ছবি খসে পড়ল, এই তো
ফিরে পেলে হারানো তোমাকে!

কুসুমের গল্প

মাদারিহাটের চা-বাগানের কম্পাউন্ডার বাবুর মেয়ে, তার ডাকনাম কুসুম
চেহারা এমন আহা মরি কিছু নয়
বয়েসের তুলনায় বড়সড়, নাকটা একটু চাপা
শ্রাবণের মেঘের মতন গায়ের রং
তার চোখ দুটিতে পাহাড়ের লুকোনো ঝর্নার চঞ্চলতা
গান জানে না, কবিতা পড়ে না, শুধু কী করে যেন একটা নাচ শিখেছে
ইস্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানে ক্লাস টেনের সেই কুসুম
আর দুটি মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে
তালে ভুল করল তিনবার
ফিক করে হেসে ফেলল লজ্জায়
কী আশ্চর্য, তবু উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা

এই বাগানের মালিকের ছেলের বন্ধু উজ্জ্বল নামে যুবকটি
মুগ্ধ হয়ে গেল তাকে দেখে
নাচ নয়, কুসুমের হাসিটাই বেশি পছন্দ হয়েছিল তার
শুধু কম্পিউটার দক্ষ নয়, সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের পর
সে হরিয়ানার একটি কারখানার উত্তরাধিকারী হয়েছে
আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না, এ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য
তিনমাসের মধ্যে বিয়ে, কুসুমকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল
দিল্লির উপান্তে

কলেজে ভর্তি করানো হল কুসুমকে, তার উচ্চারণে
বড় বেশি ভুল
নাচ শিখতে পাঠানো হল সোনাল মানসিং-এর কাছে
সোনাল তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তিন সপ্তাহ বাদে
তার পায়ে ছন্দ নেই
দেখতে দেখতে কেটে গেল চার বছর
উজ্জ্বল চলে গেল অন্য বাগানের ফুলের দিকে
তারপর পশ্চিম গোলার্ধের স্বর্ণ মরীচিকার হাতছানিতে।
হরিয়ানার কারখানার কোয়ার্টারের দোতলায় থাকে কুসুম
এমনি কোনো অসুবিধে নেই, টিভি'র বেলায় কাটে সারাদিন
আর প্রায় সর্বক্ষণ আঙুলে চাটে তেঁতুলের আচার
সেইজন্যই সে চিঠি লিখতে পারে না
এক এক রাতে সে উঠে আসে ছাদে
এখানে চা-বাগানের সবুজ ঢেউ নেই
দিগন্তে নেই পাহাড়ের রেখা
শুধু শুকনো ঊষর প্রান্তর, ডাঙা জমি আর কারখানার চিমনি
মাদারিহাট থেকে বোঁটা ছিঁড়ে আনা কুসুম কিছুতেই শুকিয়ে
ঝরে যেতে রাজি নয়
সোনাল মানসিং যাই বলুন, সে এখনো একা একা নাচে
আকাশের নীচে
মাঝে মাঝে একটু আধটু তালভঙ্গ হয় হোক, কেউ তো দেখবে না

স্কুলের ফাংশনে আর যে-দুটি মেয়ে নেচেছিল তারা এখন
কোথায়, কে জানে
তাদের নাম অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা নয়
কিন্তু কুসুমের বাবা-মা শখ করে তার ভালো নাম রেখেছিলেন
শকুন্তলা
নিজের তলপেটে হাত রাখে সে আনমনে
টের পায় একটু একটু নড়াচড়া
আসছে, একজন আসছে, সে খেলা করবে সিংহশিশুর সঙ্গে

এখনো অনেক কিছু ঘটবে!

দেশ-কাল-মানুষ

যে আমি এককালে দেশকে ভালোবেসে গেয়েছি কত গান
দেশের ডাক শুনে, অথবা না শুনেও, চেয়েছি প্রাণ দিতে
মুঠোয় আমলকী, ব্যাকুল কৈশোর, ভুলেছি জননীকে
দেশই গরিয়সী, স্বপ্ন মাখা রূপ দেখেছি দিকে দিকে
সে আমি ইদানীং আয়না-সম্মুখে বিরলে কথা বলি
শূন্য করতল, পাথর অভিমান, একলা পথ চলি
জন্ম দৈবাৎ, কোথায় কোন্ মাটি, তা কেন দেশ হবে...

[এভাবে লিখতে লিখতে একেবারে অন্তঃস্থলের ক্ষোভ এমনই ফেটে বেরুতে চায় যে মনে হয়, এখন ছন্দমিল দিয়ে লেখা আমার পক্ষে একধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। তাই অতি দ্রুত আবার অন্যভাবে লিখতে শুরু করি...]

যে-আমি একসময় কত দেশ দেশ বলে গান গেয়ে গলা ফাটিয়েছি
দেশের ডাক শুনে, আসলে সেরকম কিছু না শুনে

পেছন দিকের ধাক্কায় চেয়েছি প্রাণ দিতে
মুঠোয় ছিল আমলকী, সেই পাগল পাগল কৈশোরে
নিজের মাকেও ভুলে গিয়ে দেশকেই মনে হত গরিয়সী
কত স্বপ্ন দিয়ে গড়া একখানা অপার্থিব প্রতিমা
সেই আমি ইদানীং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে আত্মধিক্কার দিই
খবরের কাগজের ওপর থুথু ফেলতে ইচ্ছে হয়
আকস্মিকতাতেই সকলের জন্ম, যে-কোনও মাটিতে, গাছের মতন
দেশ আবার কী, নিছক ছেলে ভুলোনো রূপকথা
ক্ষমতালিপ্সুরাই পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে দেশ বানিয়েছে
সমস্ত সীমান্তগুলিই লোভ আর দম্ভ দিয়ে ঘেরা
স্বদেশবন্দনার কাব্য আর গান শুধু অবোধ, আবেগতাড়িতদের
মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার ভাঁওতা
দেশ মানে বন্দিত্ব, দেশ মানে অন্ধ কুসংস্কার
জীবনধারিণী ধরিত্রীর সারা দেহে অনবরত ছুরি মেরে চলেছে
মানবসন্তানেরা!

যে-আমি ঈশ্বর কিংবা দেবলোক অস্বীকার করে এসেছি
প্রথমযৌবন থেকে
স্বর্গ-নরক নস্যাৎ করে ধন্য মনে করেছি শুধু একবারের মতন
মনুষ্যজন্মকে
মানুষকে মনে করেছি অমৃতের সন্তান
মানুষের জন্য পারস্পরিক হাতে হাত ধরা, বুকের উত্তাপ,
মানুষের জন্য ভালোবাসা
শিশুকে আদর, নারীর সুঘ্রাণ, প্রেমেই স্বার্থক ইহলোক
সেই আমিই এখন মানুষকে ভয় পাই, শিউরে উঠি জনসমষ্টি দেখে
মানুষ কোথায়, পৃথিবী ভরে গেছে ছদ্মবেশী অমানুষে
যারা প্রতিবেশী শিশুকে ছুড়ে দেয় দাউ দাউ আগুনে, তারা মানুষ?
যারা ধর্মের নামে এক হাস্যকর গুজবে মেতে উঠে
রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়, তারা মানুষ?

যারা নিতান্ত পেশিশক্তিতে নারীকে ধর্ষণ করে, তারপর
খণ্ড খণ্ড করে তাকে কাটে,
তারা মানুষ?
যারা মন্দির, মসজিদ, গির্জা গড়ে তারপর এ ওরটা ভাঙে,
সে তারটা ভাঙে, ছিন্নমুণ্ড দিয়ে ভিত গাঁথে,
তারা কি মানুষ?
যারা এইসব ভাঙাভাঙি আড়চোখে দেখে, হত্যালীলায়
হাততালি দেয়
তারা কি মানুষ?
যারা ধ্বংসের অস্ত্র ছড়ায়, অনবরত ধ্বংসের উস্কানি দিয়ে
নিজের সন্তানদের দুধে ভাতে রাখে আর বিকেলবেলা
কুকুর নিয়ে বেড়াতে যায়,
তারা কি মানুষ?
মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো নাকি পাপ
আমি যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি, কিছুতেই আঁকড়ে রাখতে পারছি না
এই সব কিছুর জন্য নিজের জন্মটাকেই দায়ী মনে হয়।

যারা আমার পরে জন্মেছে ও জন্মাবে
তাদের জন্য কেমন থাকবে এই পৃথিবীটা? আমি
শেষের দিকে কোনও কৃত্রিম, অবিশ্বাসী
আশাবাদ শোনাতে পারব না
তারা কি পারবে সমস্ত দেশগুলির সীমানা মুছে দিতে
অথবা সমুদ্রগুলি ভরে যাবে রক্তে?
তারা কি সমস্ত ধর্মগুলোকে গু লাগা কাগজের মতন ফেলে দিতে
পারবে আবর্জনায়?
(অথবা একটু ভালো করে বলতে গেলে ধর্মগুলিকে ঠেলে দেবে ইতিহাসে?)
অথবা ধর্মধ্বজীরা আরও বেড়ে উঠবে রক্তবীজের মতন?
ঈশ্বরবিশ্বাসীরা কি তাদের ঈশ্বরকে দাঁড় করাতে পারবে কাঠগড়ায়?
পরিশ্রমের ফসল সবাই ভাগ করে নেবে, না অনবরত কেড়ে নেবে
অন্যের মুখের অন্ন

তারা লাইব্রেরি পোড়াবে, তাজমহলে গিয়ে গণপেচ্ছাপ করবে
হে অনাগত ভবিষ্যৎ ও পর-প্রজন্ম, তোমাদের জন্য আমরা কিছুই
রেখে যেতে পারলাম না,
ব্যর্থতা ছাড়া!

[অথবা এসবই কি আমার নিজস্ব নৈরাশ্য?
অন্য কোথাও আছে অন্য মানুষ, যারা এই সব কিছু বদলে দেবে?
তারা পারবে, ঠিক পারবে তো? সত্যিই আছে
সেই অন্য মানুষ
আমি কি তাদের দেখে যেতে পারব?]

একটি গানের খসড়া

আর দূরে নেই স্বর্গরাজ্য, হ্যাঁচ্চো!

এমন সাধের বিকেলটা আজ
রাজা পরেছেন কোটালের সাজ
ধরে আন আছে যত ধড়িবাজ
হ্যাঁচ্চো!

দিকে দিকে আজ কত প্রকল্প
প্র-পূর্বক কল্প গল্প
আমি বেশি নেব, তুমিও অল্প
হ্যাঁচ্চো!

শোনো শোনো আজ উলট পুরাণ
সেতুবন্ধনে সীতা ঘুষ খান
রাবণকে দেখে রাম পিঠটান
হ্যাঁচ্চো!

নন্দ ঘোষেরা থাকেন দিল্লি
নাকি সুরে গায় আদুরে বিল্লি
শুনে শুনে ফাটে কানের ঝিল্লি
হ্যাঁচ্চো!

দিল্লির খুড়ো-খুড়িরা ব্যস্ত
পদী-পিসিমার চরণে ন্যস্ত
পদী পিসি খান মুন্ডু আস্ত
হ্যাঁচ্চো!

সকলেই আজ তাসের খেলুড়ি
ইস্কাবনের বিবি থুরি থুরি
যে-যেমন পারো ছুঁয়ে থাকো বুড়ি
হ্যাঁচ্চো!

আরও খেলা আছে চোর ও পুলিশ
তুমি পুঁটি খাও, আমার ইলিশ
তুমি বাংলায়, আমি ইংলিশ
হ্যাঁচ্চো!

(হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, দূর ছাই, এ কী সর্দি হল রে বাবা, রুমালটাই বা কোথায় যে গেল!)

রুমালটা ছিল কোথায় যে গেল
আমার পকেটে কে হাত ঢোকাল
কিল খেয়ে তবু চুপ থাকা ভালো
হ্যাঁচ্চো!
আর দূরে নেই স্বর্গরাজ্য
হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো।

রচনাকাল ১৯৭৭

যার যা হারিয়ে গেছে

সূচি

তিনটি প্রশ্ন

তারপর ধর্ম বক বললেন, বৎস,
তোমাকে আমি আরও তিনটি প্রশ্ন করব
বলো তো, মানুষের কোন কষ্ট মুখের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না
কিংবা বলতে গেলেও কেউ বুঝবে না?
মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে যুধিষ্ঠির বললেন,
কোনো কবি যখন ভাব প্রকাশের জন্য প্রকৃত ভাষা খুঁজে পায় না
তখন তার যে কষ্ট তা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে
সহমর্মী হওয়া সম্ভব নয়!
ধর্ম বক হৃষ্ট হয়ে বললেন, বেশ, এবার বলো
মানুষের জীবনে এমন কোন্ মুহূর্ত আছে, যা রমণ সুখের চেয়েও
বেশি তৃপ্তি দিতে পারে?
এবারেও নির্দ্বিধায় যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বললেন,
কোনো শিল্পীর সৃষ্টিতে শেষ তুলির টান দেওয়ার মুহূর্তটি
তার সঙ্গে অন্য কোনো সুখেরই তুলনা চলে না
ধর্ম বক পুনরপি বললেন, বেশ! এবার শেষ প্রশ্ন, বলো
কখন ধর্মকে মনে হয় অধর্ম?
নত নেত্রে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, কম্পিত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,
যখন ধর্ম আসেন বকের ছদ্মবেশে, যখন মৃত্যু দিয়ে
পরীক্ষা করা হয় মানুষকে!

যার যা হারিয়ে গেছে

সেই যে একদিন এক ছোকরা বাজিকর অমলতাশ গাছতলায়
জোর গলায় হেঁকে বলেছিল:
কার কী হারিয়ে গেছে, এসো, এসো, আমাকে বলো
আমি সব খুঁজে দেব, আমি সব খুঁজে দেব!

এমন কে আছে, যার কখনও কিছু হারায়নি
এমন কে আছে যার কিছু হারাবার দুঃখ নেই
এমন কে আছে যে কিছু ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে না
অনেক মানুষ এসে জড়ো হল সারা গায়ে রোদ্দুর মেখে
অনেক মানুষ এল এক চোখে বিশ্বাস, অন্য চোখে
অবিশ্বাস নিয়ে
অনেক মানুষ এল সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে দু'হাতে
পিছুটান সরিয়ে সরিয়ে
সবাই তাকে পলকহীন ভাবে দেখে নেয়
সবাই তার অচেনা মুখে একটুও চেনা চিহ্ন আছে কি না খোঁজে

টুকরো টুকরো রঙিন কাপড় জোড়া দেওয়া আলখাল্লা পরা
পুরুষ্টু গোঁফটা নিশ্চয়ই নকল, তার জোড়াভুরু নরম
নবীন তৃণের মতন
তার থুতনিতে মুছে যায়নি কৈশোরের লাবণ্য
চোখ দুটি দুরন্ত ঘোড়সওয়ার
তার উত্তোলিত ডান হাতে কিছু নেই, তবু যেন অদৃশ্য
জাদুদণ্ড ধরে আছে

কে আগে নিজের কথা জানাবে?
সকলের ঠেলাঠেলির মধ্যে কেমন যেন লজ্জা ভাব
কতই বা বয়েস ছেলেটার, তার কাছে কি মন খোলা যায়
তবে হতেও পারে কোনও গুনিনের বংশধর
যার হারানো বস্তু সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর, সে-ই প্রথম
মুখ খুলতে পারে
মাঝ বয়েসী, মুখে-মেছেতা স্ত্রীলোকটি বলল, ওগো
আমার একটা কাঁসার রেকাবি, ঠাকুরের...
তার কথা শেষ হল না, জাদুকর তার হাতে পাঞ্জার বরাভয়
দেখিয়ে বলল,
জানি, জানি, পাবে, ঠিক পেয়ে যাবে, তিন সত্যি

এরপর ফুটফাট বাজি ফোটার মতন শুরু হয়ে গেল
আমার আংটি, আমার ফাঁদি নথ, আমার জলে-ডোবা
পেতলের ঘড়া, তিনখানা একশো টাকার নোট,
মায়ের ছবি...
সে যদি নারী হত, তা হলে বলা যেত, তার হাসি
পূর্ণিমার আলোর মতন
সে পুরুষ, তাই তার হাসি যেন সদ্য ভাঙা নারকোলের
ভেতরের শুভ্রতা
সেই হাসি দিয়ে সে সবাইকে বলতে লাগল, পাবে
ঠিক পেয়ে যাবে, তিন সত্যি, তিন সত্যি
অনেকেই আশা করেছিল, সে সাঁইবাবার মতন শূন্যে হাত ঘুরিয়ে
তক্ষুনি তক্ষুনি এনে দেবে বাতাস থেকে
হারিয়ে যাওয়া সব কিছু
তবু তার তিন সত্যিতে এমন সরল সত্যের দৃঢ়তা
যা মুখের ওপর অস্বীকার করা যায় না
শূন্যতার মধ্যেও যেন ফুল ফুটছে, মেঘলা আকাশেও
যেমন ঝিকমিক করে তারা

শুধু দু'তিনজন দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে
তারা কিছুই জানাল না, তাদের যা হারিয়েছে
তা জানাবার মতন ভাষা নেই
এ এমনই এক নিঃস্বতা যে বস্তুবিশ্বের অন্য কিছুই
তাদের মনে পড়ে না
তাদের নতচক্ষু, মনে মনে কাঁদছে বোধহয়
কেউ অন্যদের দিকে তাকাচ্ছে না
পাশাপাশি দাঁড়িয়েও তারা একলা
তাদের প্রত্যেকের হারাবার বেদনার নিজস্ব তীব্রতা এক নয়
তাদের কান্নাও আলাদা
বাজিকরটি আর সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছে দৃষ্টি
প্রত্যেককে দিয়েছে তিন সত্যি

এই ছোট দলটির দিকে সে চেয়ে রইল একটুক্ষণ
এদের কোনও দাবি নেই, এদের কান্নাও সে শুনতে পায়নি
তবু বুঝতে তার দেরি হল না
তার মুখের হাসি অন্ধকার হয়ে গেল
নেমে এল ডান হাত
আর সে তিন সত্যি বলতে পারল না

বিকেল ফুরিয়ে গেছে, রাত্রি আসছে অন্য দেশ থেকে
মানুষেরা ঘরে ফিরবে, গোধূলিতে শোনা যাবে
যাই যাই মৃদু ফিসফিসানি
অনেকেই চায় তবু এ ছোকরাটি কারুর বাড়িতে
আশ্রয় নেবে না
কোনও গৃহস্থের বাড়ি শয্যা পাতা তার নাকি গুরুর নিষেধ
সে অন্ন নেবে না, ফল-মূল নেবে না, কোনও দক্ষিণাও চাই না
তবু কেন সে মানুষের হারিয়ে যাওয়া সব কিছু উদ্ধার
করতে এসেছে?
মন্ত্র-টন্ত্রও কিছু শোনায়নি, কোন সাহসে তিন সত্যি
উচ্চারণ করল এতবার?
যে কিছুই চায় না, সে কেন মানুষকে কিছু দেবে?
এ কোন্ আজব প্রাণী, সে কি এই পৃথিবীর নয়
তার খিদে তেষ্টাও নেই, সে শুয়ে থাকবে আকাশের নীচে
সে কোথা থেকে, কেনই বা এল, কেউ কিছুই বুঝল না
এবং পরদিন সকালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল
তবে কি সত্যিই অলীক, দৈবী মায়া, সে রকমই ভাবতে ইচ্ছে করে
সে কি শত শত শতাব্দীর এক পথিক, হঠাৎ হঠাৎ
গাছতলায় এসে দাঁড়ায়?

দু'একদিনের মধ্যেই কেউ পুকুরঘাটে ফিরে পেল রেকাবি
কারও মায়ের ছবি উদ্ধার হল ইঁদুরের গর্ত থেকে
এ রকম দু'একটিতেই দিকে দিকে রটে গেল তিন সত্যির মহিমা

এসব কাকতালীয় বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না
তার চেয়ে অলৌকিকত্ব অনেক জোর এনে দেয়
আসবে, আসবে, এরপর সব কিছুই ফিরে আসবে
অমলতাশ গাছটির নীচে স্থাপিত হবে এক অজ্ঞাত
দেবতার নামে বেদী
তেত্রিশ কোটির পরেও আরও একজন
শুধু যে-কয়েকজন নিস্তব্ধ ছিল, যারা কিছু চায়নি
যারা পায়নি তিন সত্যির প্রতিশ্রুতি
তারা আর ওই গাছতলায় যায় না, তাদের কান্না থামেনি।

এ বছর বন্যায় নদী এসে গ্রাস করেছে ইস্কুলবাড়ি
এ বছর তিল চাষ নষ্ট হয়ে গেছে শোঁয়া পোকার উপদ্রবে
এ বছর জমিতে জমিতে অনেক রক্ত ঝরেছে
এ বছর সদ্য স্তনবতী দুটি মেয়ে হারিয়ে গেছে মালবাজারে
এ বছর উদরাময় এসেছে রাক্ষসীর বেশে
তবু মজা পুকুরের পাঁক থেকে একটি শূন্য পেতলের কলসি
ভেসে উঠলে
চতুর্দিকে শোনা যায় জয়ধ্বনি
সবাই তো আগেই বলেছিল, তিন সত্যি কখনও
মিথ্যে হয় না
সেই বাজিকর অবশ্যই ফিরে আসবে
এর মধ্যে যার যার হারিয়েছে, সে সবও সে চোখের সামনে
এনে দেবে।

শুধু যা হারিয়ে যাওয়ার কথা মুখে বলা যায় না
তার সন্ধানেই তো ছুটে বেড়াচ্ছে সেই আলখাল্লা পরা, পাতলা ছেলেটা
যে মেয়েটি মুখ বুজে করে যাচ্ছে ঘর সংসারের কাজ
তার ভালোবাসা হারিয়ে গেছে তাই সে নিভৃতে গোপনে কাঁদে
শিলাবৃষ্টিতে ঝরে যাচ্ছে আমের বোল, তার সব ফুল
ঝরে গেছে আগেই

আগুন লাগল গ্রামের হাটে, তার বুক যে পুড়ে খাক হয়ে গেছে
কেউ জানে না
ভালোবাসা হারিয়ে গেছে, তাই শুকিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী
ভালোবাসা হারিয়ে গেছে তাই চতুর্দিকে এত দুর্গন্ধ
বাতাসে এত তাপ, পাতাল থেকে উঠে আসছে বিষাক্ত কীট
অনেক মানুষ সারা জীবন জানলই না সত্যি সত্যি সে
কী হারিয়েছে
তাপ্পি মারা আলখাল্লা পরা ছোকরাটি রাত কাটাচ্ছে
এক গাছতলা থেকে অন্য গাছতলায়
এক এক সময় সে নিজেই উছাড়ি পিছাড়ি হয়ে কাঁদে
কোনওদিন কি সে পারবে তিন সত্যি দিয়ে
বন্দি করতে ভালোবাসাকে?

অর্জুনের সংশয়

এরপর অর্জুন বললেন, হে বাসুদেব, তুমি এই ক্ষণে
আমাকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করালে
তা কি অন্য আর কেউ দেখতে পেয়েছে?
কৃষ্ণ বললেন, না, আর কেউ অধিকারী নয়
দেখো না, তোমার রকম সকম দেখে দু' পক্ষেরই যুযুধান সবাই বিস্ময় বোধ করছে
অর্জুন বললেন, তুমি কৌরবসভাতেও একবার এই রূপ দেখিয়েছিলে, শুনেছি।
কৃষ্ণ বললেন, তা বটে। তখন প্রয়োজন হয়েছিল
অর্জুন বললেন, তখন কেউ কি বলেছিল, এ তোমার জাদুর খেলা
কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, তা কেউ বলতেও পারে, আমিই তো
এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকর।
এই মহাবিশ্বও তো জাদুর খেলা
এই যে প্রস্তুতি, সামান্য, ক্ষুদ্র বীজ থেকে বনস্পতি

চাঁদের অদৃশ্য টানে সমুদ্রে জোয়ার
এও কি নয়, মহা ভোজবাজি? নাও, নাও, আর দেরি কোরো না

অর্জুন বললেন, আমার শেষ প্রশ্ন
তুমি তোমার অতুলনীয় জাদুবলে সমস্ত মানুষকে
নিরস্ত্র করে দিতে পারো না?
তা হলে তো আর যুদ্ধের প্রয়োজনই হয় না।
বন্ধ হয়ে যাবে সব রক্তক্ষয়, এই আত্মীয় হনন
মৃত্যুর সময় হলে মানুষ মরবে
আর যদি রেষারেষি, প্রতিস্পর্ধা না যায়, তা হলে
শুধু বাক্যুদ্ধ থাক

কৃষ্ণ বললেন, কোনো প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন নয়
সব প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায় না
তোমার মন থেকে আমি এই প্রশ্ন মুছে দিচ্ছি
যারা যুদ্ধ করে, তারা এত প্রশ্ন করে না
নিজের বিবেকের কাছেও না!

চাঁদমালা

ওভার ব্রিজের রেলিং ঘেঁষে ঘুমিয়ে আছে একজন মানুষ। এটা
ওর দোতলা বাড়ির ছাদের স্বপ্ন।

*

ফুটপাথের যে বাচ্চাটা নর্দমায় হাত ডুবিয়ে খলবল করছে
ওকে কি সাধ করে আনা হয়েছে এই অনিশ্চিত জীবনে?
দু'জন নারী পুরুষের রমণের সুখ থেকেই তো ওর জন্ম
অথবা সুখ ছিল না, সুখের বোধ ছিল না

কিংবা সেই দু'জন হয়তো চুম্বনের স্বাদও জানে না
চুম্বনহীন সঙ্গম কিংবা জীবনচর্যাও মানুষের পক্ষে সম্ভব?

*

ইংলিশ বাজারে মাছ বিক্রি করতে আসে গৌরাঙ্গ সুলেমান
আসলে সে কখনও সুলেমান, কখনও গৌরাঙ্গ, একই অঙ্গে দু'জন
গৌরাঙ্গ খুব পোস্ত খেতে ভালোবাসে, সাত বছর খায়নি
সুলেমান ভালোবাসে প্রকাশ্যে কুঁচকি চুলকোতে,
সেটা সম্ভব নয়
বছরের পর বছর অবদমন, তাই থুতু ফেলে যখন তখন!

*

পরেশবাবুদের বিড়ালীটির পায়ে কে আলতা পরিয়ে দিয়েছে
হাতচাপুড়ি দিলে সে দু' পা তুলে নাচে
মাঝরাতে সে পাঁচিলের ওপর উঠে পিঠ বাঁকায়
চোখ দুটি জ্বলন্ত অঙ্গার
চাঁদ ধরার জন্য সে লাফ দেয় আকাশের দিকে
খানিকবাদে তার মুখে মাখামাখি টাটকা রক্ত।

*

ফ্ল্যাটবাড়ির কাজের মেয়েটি, সতেরো, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে
যে-যে কারণে এ রকম হয়, তার কোনওটাই তো মেলানো
যাচ্ছে না
ওখানে কোনও পুরুষ মানুষই নেই, দুটি বিধবা
ও এক চিরকুমারীর সংসার
কেউ ওকে চড়-চাপড় মারে না, খুব বেশি চোপাও করে না
সবাই আতপ চালের ভাত খায়, মাছের টুকরোও প্রায়
সমান সমান
সন্ধেবেলা পাড়া বেড়ানোতে কোনও বাধা নেই
তবু তুই মরতে গেলি কেন রে মেয়ে?
ঝুলন্ত লাশের উত্তর: বাঃ, গরিব মানুষদের বুঝি অকারণে
মন খারাপ হতে পারে না?

*

একটা নদী যখনই অন্য একটা নদীতে এসে মেশে
অমনি একটু দূরে আর একটা নদী বাইরে বেরিয়ে যায়
ওদিক থেকে আসা নদীটির গতর দিন দিন শুকোয়
অন্য নদীটি পাড় ভেঙে ভেঙে খেয়ে দিব্যি ফুর্তিতে আছে
মূল নদীটি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে জ্যোৎস্নারাতে
প্রথম জোয়ারের মৃদু কুলকুলু ধ্বনিতে সে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে
ফিরে-আসা নদীটিকে সে বুকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে,
কী রে, তোর বুঝি সমুদ্র পছন্দ হল না
দু'জনে যখন নির্লজ্জতায় মেতে উঠে
প্রায়-শুকনো নদীটি তখন চেয়ে থাকে ভ্রাম্যমাণ মেঘের দিকে
তার দীর্ঘশ্বাসে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে
মেঘের ওপরে এক দেবতা!

*

এ এক যুগ এসেছে, কাপুরুষরাই শুধু যুদ্ধের দামামা বাজায়
ওই দামামাগুলো যারা বানায়, তারা সবাই জন্মান্ধ
বিনিময়ে তাদের জন্য আসে প্রচুর গিল্টি করা আয়না
সেই আয়নায় ঠোক্কর খায় মৌমাছি আর চড়াই পাখি
মধুলোভীরা হা হা শব্দ করে ভোট বাক্সে, আর উজানে যায় নদী
তার ওপরে সেতুটি নড়বড় করছে, কারুর হুঁশ নেই, ছুটে আসছে ট্রেন
দু'দিকের রাস্তা বিস্তারিত হতে হতে খেয়ে নিচ্ছে ফসলের ক্ষেত
আর সেই সব ফসল উনুন খুঁজতে চলে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে
এদিকে কত যে উনুন খালি পড়ে আছে, আগুন নেই, শুধু ছাই
সারা গায়ে ছাই মেখে গাজনের সঙ্ বেরিয়েছে, দর্শক নেই একটিও
কোথাও চলেছে হরির লুট, তার বাতাসাগুলো টপাটপ খেয়ে নিচ্ছে
স্বয়ং শ্রীহরি
এ ভাবেই গল্পের গোরু গাছে ওঠে আর কবিতার নটে গাছটি মুড়োয়...

মনোহরণ

নদীতে ঢেউ, শরীরে ঢেউ, কোথাও বাঁশি বাজছে
সে মেয়েটির নাম কি রাধা? পুঁটি হলেও দোষ কী?
আগুন জ্বলছে পাড়ায় পাড়ায়, হিংস্রতার গর্জন
ভুল মানুষ, ভুল খেলায় সারা জীবন মত্ত!

ধানজমিতে রক্তপাত, কারখানায় দাঙ্গা
সত্য, তবু সত্য নয়, চোখ ভুলোনোর ভেল্‌কি
কেউ জেতে না, খেলার রাজা টান মারছে সুতোয়
একটা শালিক, দুটো শালিক মুখ থুবড়ে মরছে।

নদীতে ঢেউ, শরীরে ঢেউ, কোথাও বাঁশি বাজছে
আমার খুব ইচ্ছে করে, পুঁটিই রাধা হোক না
আবহমান কালের কাছে মুখ লুকোবে বাস্তব
নিজের সুতোয় জড়িয়ে যাবে বর্তমানের কংস।

সরু একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছেলেটা
চাকরি পায়নি, যাত্রা দলে না-হয় কেষ্ট সাজুক
সেখানেও খুব উলুক ঝুলুক তাল-বেতালের নৃত্য
তবু তো কেউ একলা রাতে বসে থাকবে নদীর ধারে
মনোহরণ দুঃখে!

কেউ কেউ ক্ষমাপ্রার্থী

মল্লিকা বলেছে, শেক্‌সপিয়ারের কোনো নায়িকাকে নিয়ে
একটি কবিতা লিখতে
কী মুস্কিল, অন্য লেখকের মেয়েছেলেদের নিয়ে কেন
টানাটানি করতে যাব আমি?
তা হোন না তিনি শেক্‌সপিয়ার কিংবা রবীন্দ্রনাথ
আমার নিজের কল্পনায় বা বাস্তবে কি রমণীদের
অভাব আছে?

তবু মনে পড়ে যায় পাঁচশো বছর আগের অনেকগুলি মুখ
পোরশিয়া, ক্রেসিডা, মিরান্ডা, ভ্রান্তিবিলাসের দুই বোন
এড্রিয়ানা আর লুসিয়ানা
এবং কর্ডেলিয়া, জুলিয়েট
পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে পড়ল
এক সময় ফাঁকা মাঠে রাত্তিরবেলা চিৎকার করতুম
আ হর্স, আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স!
ক্লিয়োপেট্রা আর ওফেলিয়া বড় বেশি ফিল্মের নায়িকা
যদি বেছে নিতে হয়, তবে আমি কাকে
এ যেন এক উল্টো স্বয়ম্বর সভা, মজার ব্যাপার
হঠাৎ ঠিক যেন কানে ভেসে আসে ডেসডিমোনার
সেই আকুল মিনতি
আমাকে আর একটি রাত্রি বাঁচতে দাও...
অন্তত আর আধ ঘণ্টা
একটি প্রার্থনার সময়টুকু...
তার গলায় ওথেলোর নির্মম আঙুল

মল্লিকা, পুরুষরা আজও অনেকে ওথেলোর মতন মূঢ়
তবু কেউ কেউ ক্ষমাপ্রার্থী!

চোখ এবং হাত, নাক অদৃশ্য

চুম্বন শুধু অধরে ওষ্ঠে মেলামেশা নয় মোটে
সে তো পাখিরাও যখন তখন ঘষাঘষি করে ঠোঁটে

প্রথমে রয়েছে চোখের যোজনা, দৃষ্টির সম্মতি
আঁখি পল্লবে মৃদু কম্পন, দ্রুত ধমনীর গতি।

নাসিকার কোনো ভূমিকাই নেই, চক্ষুও যাবে বুজে
পরম সময়ে হাতই প্রধান, নেবে বুক দুটি খুঁজে!

সাতাশ শতাব্দী পর

ইথাকা নগরীর এক প্রান্তে পথের ধারে বসে আছেন
এক প্রবৃদ্ধ কবি, সামনে কয়েকটি শ্রোতা
অন্ধকার গাঢ় হলে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল
স্থান-কাল-আয়ু নিরপেক্ষ এক সুঠাম পুরুষ
তার সর্বাঙ্গে অন্য কোনো পোশাক নেই, শুধু একটা
কালো চাদর জড়ানো
আকাশ পথে উড়ে গেল কয়েকটি বাদুড় আর তারও ওপরে
কালপুরুষের কোমরবন্ধে একটি তারা
বৈদূর্যমণির মতন উজ্জ্বল
বিশাল ডানা ঝাপটে একটি অ্যালবাট্রস এসে বসল
কাছাকাছি এক সুউচ্চ ম্যাগনোলিয়া গাছে
তাতে ফুটে আছে অজস্র ডিম্বাকার ফুল
সমুদ্র বাতাসে ভেসে আসছে মাল্লাদের অস্পষ্ট গান...

হোমার বললেন, এক দিনার দাও, আর কী শুনতে চাও বলো
প্যারিস ও মিনেলাসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিংবা হেকটর পতন
কিংবা সেই রমণীর মুখের বর্ণনা, যার জন্য সহস্র রণতরী
ভেসে পড়তে পারে বসফরাসে
কালো চাদর জড়ানো মানুষটি কোনো কথা বলল না
তার নীরবতা অতল জলের স্রোতের মতন বাঙ্ময়
তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি ভবিষ্যকালের ডেভিডের ভাস্কর্যের মতন
অ্যালবাট্রসটি তৃতীয় সপ্তক স্বরে বলে উঠল:
আমার এক পূর্ব পুরুষের নাম ছিল সম্পাতি, আমি
বংশানুক্রমিক কাহিনীতে শুনেছি জনকদুহিতা সীতার কথা
রাম নামে রাজার প্রিয়তমা, যে রাজার আর কোনো মহিষী ছিল না
রাবণ সেই সীতাকে হরণ করার পর সমুদ্রের বুকে সেতু বন্ধন হয়েছিল
মানুষেরা এক রমণীর জন্য হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে যায়
প্রায় তো আপনার কাহিনীর মতন একই রকম!
হোমার শুনলেন, কিন্তু বিস্মিত হলেন না
কৌতুক হাস্যে বললেন, জাহাজ বানাতে শেখেনি, তাই সমুদ্র
বেঁধেছে পাথর দিয়ে
তাও মন্দ নয়!

আগন্তুকটিকে তখনো বাক্যহীন দেখে হোমার আবার প্রশ্ন করলেন,
তুমি কি রাজপুরুষ, না যোদ্ধা, না বণিক, না দস্যু?
যদি লুণ্ঠন করতে এসে থাকো, তবে জেনে নাও, আমি
নিতান্তই অকিঞ্চন
যদি আমাকে শাস্তি দিতে চাও, শুনে রাখো, কবিরা অবধ্য!
অর্থাৎ অতি সামান্য কীট-পতঙ্গের মতন বধের অযোগ্য, হা-হা-হা
আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না, কে তুমি?
তিনি হাত বাড়িয়ে লোকটির কোমরের অস্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে
টের পেলেন তার পৌরুষ
আবার সহাস্যে বললেন, তোমার তো ঔৎসুক্য আছে, তা হলে দাও দু'দিনার
শোনাব এক নয়, তিন রমণীর কথা

কিংবা জানতে চাও অডিসিউস, আথিনার উপাখ্যান?
আগন্তুকটি তবু নিশ্চুপ
অ্যালবাট্রস বলল, প্রাচ্যে তখনো রণতরী ছিল না বোধহয়
তবে, আমি শুনেছি যুদ্ধ জয়ের পর রাম তাঁর রানিকে নিয়ে
রাজধানীতে ফিরেছিলেন
আকাশ পথে উড়ন্ত রথে!
এবারে শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক বামন বলে উঠল, মনোরথ! মনোরথ!
যেমন আমি মাঝে মাঝে
চাঁদের গায়ে হাত রাখি!
আর এক প্রৌঢ় বললেন, প্রাচ্যের মানুষ নানারূপ জাদুবিদ্যা জানে
ওরা মায়ারূপ ধারণ করতে পারে, ওদের সব মন্ত্রই
ঝঙ্কারময় বিশুদ্ধ কাব্য!
হোমার দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, ঝঙ্কারময় হলেই বিশুদ্ধ কাব্য হয় না!
তবু সেই সব কবিদের আমি প্রণতি জানাই!

এই সময় ধীর পায়ে সেখানে এল এক জ্যোৎস্নামাখা রমণী
তার সঙ্গে এক অনিন্দ্যকান্তি দুরন্ত শিশু
সবাই কাব্য ভুলে চেয়ে রইল সেই জীবন্তরূপের দিকে
রমণীটি হোমারকে বলল, বাবা, বাড়ি চলুন, কত রাত হল
আপনার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই?
বালকটি টানাটানি করতে লাগল হোমারের হাত ধরে
কোমরের ব্যথা নিয়ে বৃদ্ধ কবি উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে
আজ তাঁর উপার্জন অকিঞ্চিৎকর
এক শিষ্যকে বললেন, আজ যা যা বলেছি, সব কণ্ঠস্থ করেছ তো বাছা
দেখো, যেন একটি শব্দও বাদ না পড়ে
শিশুটি ছটফটিয়ে বলল, আঃ, চল না
হোমার এক পা বাড়িয়েও কালো চাদর ঢাকা পুরুষটিকে বললেন,
তুমি তো কিছুই জানালে না, জানতে চাইলে না, তুমি কোন দেশের?
সে এবার বিষণ্ণ স্বরে বলল, আমার ভাষা জ্ঞান নেই
কী ভাবে জানাব জানি না

আমি প্রাচ্যেরও নই, প্রতীচ্যেরও না
আমি এক ব্যর্থ কবির বাল্যসঙ্গী, আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি
তার সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিথ্যে হয়ে যায়, তার ব্যর্থতা আমার গায়ে বেঁধে
কখনো সখনো সে শব্দের সন্ধানে মাথা কোটে, তার কপালে থাকে রক্তলেখা
আমার যা কিছু সার্থকতা তাকে দেখে শিহরিত হয়
তার অতৃপ্তি আমাকেও ছুটিয়ে মারে
হে কবিশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমার একটিই প্রশ্ন
মানুষ কেন কবিতা লেখে? কেন এই বৃথা কষ্ট! না লিখলে কী হয়?
এ প্রশ্ন শুনে রমণীটি আধো আঁচলে মুখ ঢেকে কুলকুল করে হেসে উঠল
বৃহৎ ডানার পাখিটি বলল, একেই বলে রসাভাস!
বামনটি বলল, ভুল সময়, ভুল পরিবেশ, ভুল মানুষ!
চঞ্চল বালকটির হাত ধরে একটু দূরে গিয়ে হোমার বললেন,
এ প্রশ্নের উত্তর তুমি কখনো পাবে না
আরও কয়েক পা গিয়ে তিনি আবার বললেন অর্ধ নিমীলিত চোখ ফিরিয়ে
হয়তো এর উত্তর আছে, আমি জানি না
যুগের পর যুগ, এই এক প্রশ্ন, নিরুত্তর
অস্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি, আর পঁচিশটা কিংবা সাতাশটা শতাব্দী পার
হয়ে গেলে
আর কোনো মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসাই থাকবে না
আঃ, সে বড় দুর্দিন!

হে মরুভূমির পথিক

খবরের কাগজের পৃথিবী আর ভোরবেলার আকাশের নীচে পৃথিবী
এক নয়
আমি কোন্ পৃথিবীতে বেঁচে আছি?
চোখ বুজলেই দেখতে পাই একটি সুদীর্ঘ, নির্জন তরুবীথি

সে রকম রাস্তা কবে অদৃশ্য হয়ে গেল
এখন বাঁকে বাঁকে আততায়ী
সকালে শিশুদের ঝলমলে, শুভ্র, চিরকালীন হাসি শুনতে পাই
দুপুরের হিংস্র রোদে সব মিলিয়ে যায়...

ভেবেছিলাম, সুন্দরের আরাধনা ছাড়া এ জীবনে আর কিছুই কিছু না
তার এত ছদ্মবেশ, যখন তখন দৃষ্টিবিভ্রম!

ঘুম ভাঙার পর চায়ের তৃষ্ণায় ছটফট করি, না খবরের কাগজের জন্য?
আকাশ দেখি না
অথচ সেই অজস্রদল পদ্ম যেন দেখছে আমাকেই
দৈবাৎ একদিন চোখাচোখি হতেই কেঁপে উঠেছিলাম
মনে হয়েছিল
জানলা খুলে ঝাঁপ দিই
অপবিত্র, রক্তমাখা মাটি ছেড়ে চলে যাই মাধুর্যের স্রোতের দিকে
যাওয়া হয়নি
হে মরুভূমির শ্রান্ত, সহ্যের শেষ সীমার পথিক
একবার কি বৃষ্টি নামবে
তুমি পৌঁছোতে পারবে দিগন্তের রেখার ওপারে?

বিরোচনের বিয়ে

বিবাহ বাসরে বিরোচন বসেছেন গ্যাঁট হয়ে, কন্যাটি অদৃশ্য
প্যাঁ পো করে সানাই বাজছে, ফুলের গন্ধে চতুর্দিক ম ম
লগ্নের আগেই খেতে বসে গেছে এক ব্যাচ, এর মধ্যে
সালঙ্কারা, চন্দনচর্চিতা মেয়েটি কোথায় গেল?
এত আলোর মধ্যেও যেন সব কিছু অন্ধকার

না, গয়না সে সব খুলে গেছে, চন্দন মুছে ফেলেছে কিনা
কেউ জানে না
কার সঙ্গে গেল, কিংবা একাই সে ঝাঁপ দিল সমুদ্রে?
ফিসফাস বন্ধ করে এখন আর একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে এলেই তো হয়
এ দেশে কি আইবুড়ো দুর্ভাগিনীর অভাব?
বিরোচন অপমানে গর্জে উঠে এখনি শুরু করতে পারেন তাণ্ডব নৃত্য,
তিনি জোড়াসাঁকো থানার হেড কনস্টেবল
কত মেয়ের ভাগ্য ফিরে যেত, যে কোনো মেয়ে হতে পারত
বিনা পণে, বিনা ফ্রিজ, আলমারিতে পাটরানি
দুধ-ননি আর সোনা দানা কিছুরই অভাব হত না
শনিবার রাত এগারোটায় সে রকম পাওয়া গেল না একজনও
তবে কি ফিরে যাবে বিরোচন গলার মালা ছিঁড়ে ফেলে?

নন্দী ভৃঙ্গি সমেত বরযাত্রীরা বার করল অস্ত্র, শুরু হল ধুন্ধুমার
এটা খবরের কাগুজে কাহিনী নয়, গত শতকের উপন্যাসও নয়
আমাদের কন্যাটি চিঠি লিখে গেছে, নিজের বাবাকে নয়,
বিরোচনকে
এই বাসর মিথ্যে, বিরোচনের সঙ্গে তার দেখা হবে কন্‌খলের এক গুহায়
সেখানে তার নাম হবে অপর্ণা
সে গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে রাখবে, বাতাসে ভাসবে ঝর্নার ঝঙ্কার
শুধু একটাই শর্ত, বিরোচনকে তার হাত পায়ের সব
পাপ ধুয়ে আসতে হবে
যেন সে পঞ্চশরের অন্তত একটি শরের যোগ্য হতে পারে।

চড়াই পাখিরা কোথায় গেল

চড়াই পাখিরা গাছে বাসা বাঁধে না
তারা মানুষের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছিল
ছেলেবেলায় আমাদের পড়ার ঘরের ঘুলঘুলিতে দেখেছি
চড়াই পাখির বাসা
একদিন একটা বাচ্চা চড়াই পড়ে গেল মাটিতে
বেচারি এখন উড়তে শেখেনি
চড়াই পাখির মায়েরা নিজের সন্তানদের কোলে নিতে পারে না
মাটিতে পড়ে থাকা সন্তানদের তুলবে কী করে,
আমার মা দুধে সলতে ডুবিয়ে বাচ্চাটাকে খাওয়াবার
চেষ্টা করলেন
তাঁর মাথার ওপর কিচির মিচির করে ঘুরছে মা পাখিটা
এই দৃশ্যটি এত কাল আমার মাথায় গেঁথে আছে
এখন যেখানে থাকি, সেখানে কোনো ঘরেই
ঘুলঘুলি নেই
কোনো কংক্রিটের বাড়িতেই আর ঘুলঘুলি থাকে না
লম্বা টানা বারান্দাগুলোও অদৃশ্য
চড়াই পাখিরা কোথায় যাবে

মানুষের ওপর অভিমান করে চড়াই পাখির দল
নিরুদ্দেশে চলেছে
বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না, আজ তারা মরণপণে
উঠে যাচ্ছে চিল-শকুনদের ছাড়িয়ে
বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছাড়িয়ে, মানুষের সভ্যতা ছাড়িয়ে
ছোট্ট ছোট্ট বুকে অনেকখানি দুঃখ নিয়ে
তারা বিদায় নিচ্ছে।
হিমালয় পার হয়ে, মরুর দেশ, মেরুর দেশ পার হয়ে
আমাদের বাল্যকালের সব চড়াই পাখিরা
চলে যাচ্ছে মহাশূন্যের বিপুল অন্ধকারে।

মণিকর্ণিকার ঘাটে

মণিকর্ণিকার ঘাটে গাঁজা টানছে কয়েকটি সাধু। অ্যালেন, পিটার, মোহন, রাকেশ আর আমি যোগ দিয়েছি সেই অর্ধবৃত্তে। এখানে গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা খেলে না, ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় নদী যেন এক অচেনা দেশের স্বপ্নময় রাজপথ। কাছাকাছি চিতায় যে জ্বলছে, সে অর্ধ-দগ্ধ অবস্থায় আসা একটি তরুণী। কে যেন বলল, তার জীবনের চেয়ে তার মৃত্যুর এই আগুন বেশি সুখের।

অ্যালেন জিজ্ঞেস করল, আমরা কি আমেরিকা বা ভারতের মানুষ? না পৃথিবীর? অথবা মহাজাগতিক সন্তান?

আমি বললাম, যে মেয়েটি আমাদের সামনে পুড়ে যাচ্ছে, সে ভারত চেনেনি, আমেরিকা চেনেনি, পৃথিবীও চেনেনি, গ্রামের পাশে যে গম ক্ষেত, তার দিগন্তই ওর চোখের সীমানা। এই প্রথম তার ক্ষত-বিক্ষত শরীর এসেছে শহরে, চিতায় দগ্ধ হবার জন্য।

কয়েকবার গাঁজায় টান দেবার পর আমাদের মন বেশ যুক্তি ঝেঁটিয়ে ফেলে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আকাশ উন্মুক্ত, বাতাসে মাংস পোড়া গন্ধ সুগন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত বেসুরো ঘণ্টাধ্বনিগুলি সুরেলা হয়ে ওঠে। আমরা ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক হতে থাকি ক্রমে। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন অলডাস হাক্সলি আর টিমোথি লিয়ারি। কত বিশ্ব বিশ্বাসের কথা বলাবলি হয়।

চিতাটিতে মেয়েটির আলতা পরা দুটি পায়ের পাতা এখনো বেরিয়ে আছে বাইরে। অক্ষত, অনির্বচনীয়। কেউ কি ওকে মনে রাখবে? ওর কি একটা অর্ঘ্য প্রাপ্য নয়! ওর মুখ দেখিনি, তবু ওর মুখ আমি রচনা করি। আমি অ্যালেনকে বলি, এসো, ওর পায়ে আমরা চুম্বন দিই। সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক এই ক'জন গাঁজাখোর উঠে গিয়ে সেই চিতাটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে।

কল্পান্ত

সেই দূরত্বের দুর্গ ভাঙার বারুদ ছিল
হাতের পাঞ্জায়
মাথা তুলছে ডুবো-পাহাড়, শুরু হয়েছে কল্পান্ত
অতিকায় প্রাণীর মতন সহস্রাব্দ পাশ ফিরে
ল্যাজ আছড়াচ্ছে
কেউ দেখছে না, ময়দানে ঘাস ছিঁড়ছে জামার বোতাম খোলা
ছেলেটি
আর মেয়েটির শাড়ির পায়ের বাইরে রক্তাভ পায়ের পাতায়
বিন্দু বিন্দু শৌখিন দুঃখ
নদী ফিরে যাচ্ছে বাপের বাড়িতে
ধান ক্ষেতে গুঁড়ো গুঁড়ো স্বপ্ন
মাথা তুলছে ডুবো-পাহাড়, শুরু হয়েছে কল্পান্ত

অলীক নগরীতে পুরোপুরি ব্ল্যাক আউট
গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে যে ছুটছে, তারই পিঠে লাগবে
প্রথম গুলিটা
হঠাৎ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এক একটা রাস্তা
বাতিস্তম্ভের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এল চকখড়ির
মতন মুখওয়ালা একজন মানুষ
মাথা তুলছে ডুবো-পাহাড়, শুরু হয়েছে কল্পান্ত

সেই দূরত্বের দুর্গ ভাঙার বারুদ ছিল
হাতের মুঠোয়
অন্ধ ভ্রমে কেন আমি ছুটছি উল্টো দিকে?

ফুলের বদলে

যে রাস্তাখানি ছুটতে ছুটতে ঝাঁপাল নদীতে
ভরা বর্ষায়
সে আর ওপারে উঠল না মাথা তুলে।
অনেকেই আসে, দেখে চলে যায়, একজনই শুধু
কোন ভরসায়
বসে থাকে তীরে সব পিছুটান ভুলে।

নদীর ওপারে বাবলার ঝাড়, কালকাসুন্দি
ঝড়ে ভাঙা, নত
ঝোপে আগাছায় অগম্য চারদিক
শুধু রাশি রাশি ছুটছে ইঁদুর, দু'চোখে আগুন
পাগলের মতো
বাঁশ গাছে ফুল এসেছে আকস্মিক।

একদিন কোনো জ্যোৎস্নার রাতে হারিয়ে গিয়েছে
একটি কন্যা
মুখ চেপে তাকে কেউ কি নিয়েছে সবলে
পার করে এই পথহারা নদী, সব দিক ভুল
তখন বন্যা
ইঁদুরেরা তাকে খেয়েছে ফুলের বদলে?

একজন তবু বসে আছে তার জন্য!

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

এসো
এসো, ভালোবাসা দাও, দেরি
হয়ে যাচ্ছে, দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, দাও,
দাও, আঙুলের ডগা থেকে। এক্ষুনি
খসে পড়বে গাছের একটি পাতা, দাও, দাও
ভালোবাসা। দু' হাত বাড়িয়ে, খুব
দেরি হয়ে যাচ্ছে
দেরি হয়ে যাচ্ছে
জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে, দাও
গম্ভীর ডমরু বাজছে মেঘে, দাও
দাও ভালোবাসা, কাঙালি ভোজের শেষ খাদ্যকণা
দাও, দাও
ভুরুর সামান্য ভঙ্গি, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসা
ভালোবাসা, দাও
আর কিছু চাই না, আর কিছুই না, দাও, দাও
একটা জলস্তম্ভ ভেঙে পড়বে এই মুহূর্তে
একটা ঝড় নিভে যাবে এক ফুঁয়ে, দাও
সমস্ত শরীর ভরে
পায়ের নোখের ধুলো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শরীর ভরে
দাও
শরীর ফুরিয়ে গেলে ইথার তরঙ্গে
দাও, দাও, যবনিকা নেমে আসছে
শব্দ ডুবে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্যের অসীমে
আকাশ ডানা মেলে ঝাঁপ দিল নীচে
দাও, দাও, আর সময় নেই
দাও, ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা...

বাঁধানো ছবি

যদি ভাবতে পারতাম, শ্যামল এখন আড্ডা দিচ্ছে
কবিতা সিংহের সঙ্গে
পাশে বসে আছে শক্তি, বিমল আর শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
মিটি মিটি হাসছে ভাস্কর দত্ত...

কেন ভাবতে পারব না, এ দৃশ্য তো রচনা করাই যায়
ফিনফিনে সাদা পাঞ্জাবি পরা, নিষ্পাপ, সরল-সাদা শ্যামলের মুখখানিতে
রাজ্যের দুষ্টু পরিকল্পনা
শক্তির কথা যখনই ভাবি, সে একটু একটু দুলছে, যেন
দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের ডেকে
বিমল চুটকি দিয়ে খোঁচাচ্ছে শঙ্করকে
কবিতা বারবার বলছে, আমি কিন্তু খেলব না, আমি আর খেলব না
ভাস্কর হঠাৎ বলে উঠল, সুনীল কোথায়, সুনীলকে ডাক না
আমরা খালাসিটোলায় যাব
স্মৃতি দিয়ে বাঁধানো কফি হাউজের সিঁড়ি, ভেতরে
যৌবনের হল্‌কা
হঠাৎ এসে ঢুকলেন, সক্রেটিসের মতন, কমলকুমার...........

আমি এ ছবিটা ভাঙতে চাই না
শুধু মনে মনে একটু অপরাধ বোধ হয়, তখন
জানলা খুলে দিই!

আমার কৈশোরের মা

লাইনের আগে তিনটে বডি, সেই জন্য অপেক্ষা
এখানে সবাই ফিসফিস করে কথা বলে
মাথা নিচু করে রাখাই রীতি, কান্না নয়
কেউ কেউ হয়তো স্মৃতি-কাতর, কেউ বাড়ি ফেরার সময়
মাপছে
আমি যথা সম্ভব নির্লিপ্ত, হয়তো সেটা ভান
মুখাগ্নি করবে আমার মেজ ভাই
ছোট ভাইটি দূর বিদেশে, ছোট বোন নেপাল থেকে
উড়েছে আকাশে

কোথা থেকে এক দল তিরিশ-বত্রিশ এসে বসে পড়ল
চাতালে গোল হয়ে
তাদের সঙ্গে কোনো শব নেই
বিনা ভূমিকায় তারা শুরু করে দিল দুর্বোধ্য গান
ওরা অনায়াসেই গাঁজাখোর হতে পারে, কিন্তু
ওদের এমন সঙ্গীতপ্রীতির কোনো কারণ বোঝা যায় না
শিরিটির শ্মশানে ওরা কাকে গান শোনায়
গা জ্বলে গেলেও কিছু বলা তো চলবে না
আমাদের নিস্তব্ধতাকে তোয়াক্কাই করে না ওরা

শেষ দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম উঁচু জায়গাটার দিকে
হঠাৎ একটা চমক লাগল
কী আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে আমার চুরাশি বছরের মাকে
মুখ-চোখ ফুলে গিয়েছিল, এখন একেবারে পরিষ্কার
সোনার মতন রং, টিকোলো নাক, লাজুক চোখ,
ঠিক যেমন ছিলেন আমার কৈশোরে
যেন সেজে গুজে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছেন
মনটা ভালো হয়ে গেল, এই মাকে তো আর কোনো দিন
হারাব না।

সত্যি থেমে গেছে

ট্রেনের টিকিট কাটা আছে, ব্রিজে জ্যাম হতে পারে
অন্তত দু'ঘণ্টা আগে বেরুনো উচিত
সকলেই তো তাড়া দিচ্ছে, ট্যাক্সি এসে দুয়ারে প্রস্তুত
এই সময় অকস্মাৎ মনে হয় যদি, আজ না গেলে কী হয়?
আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে কামাতে সেই ক্ষ্যাপাটে লোকটা
অর্ধেকটা গালে থেমে গেল
ঠোঁটে মৃদু হাসি, এক চক্ষু টিপে সে বলে উঠল
ট্রেন কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না?
রাস্তাময় গাড়ি-ঘোড়া, তোমরা সব শুধুই আমার জন্য
একটা দিন থামতে পারো না?
অনন্ত ঘূর্ণন একটু থামিয়ে পৃথিবীদেবী
বিশ্রাম পারে না নিতে কয়েক লহমা?

অর্ধেক সাবান মাখা গালে লোকটা
একা হাসছে জানালায় দাঁড়িয়ে
থেমে গেছে, সত্যি সব থেমে গেছে, নিথর দুনিয়া
ঈর্ষা মাখা মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছে তাকে।

দেখা

একদিন কেউ এসে বলবে, তোমার বুকের সিন্দুকটা
অনেকদিন খোলা হয়নি, একটু আলো লাগাও
আমি আকাশ থেকে কয়েক ঝলক বিদ্যুৎ এনেছি...

একদিন কেউ এসে বলবে, তোমার ঘরখানি
অনেকদিন ধোয়া মোছা হয়নি
আমি লুকিয়ে একটা নদী এনেছি...

একদিন কেউ এসে পাতালে নেমে যাবার আগে
আমার হাত ধরবে
একদিন মানুষ মানুষের কাছে
একদিন মানুষ মানুষের কাছে...
না, না, মানুষ নয়, আমার হাত
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বন্দি হাত
মানুষ নয়, সর্বজনীন নয়, শুধু একজন
সমস্ত গুহাবাদী দর্শনের শীর্ষে এক চূড়ান্ত উপভোগের তৃষ্ণা...

একদিন ধড়াম করে দরজা খুলে যাবে। সেখানে
পেছন দিকে উড়ন্ত আলো। সিলুয়েট
সিঁড়িতে কে দাঁড়িয়ে
কে?

যে কবিতা লেখা হয়নি

যে কবিতা লেখা হয় নি, সেই কবিতা
চুপ করে আমাকে দেখে

আমার অকাজের ব্যস্ততা, আমার সর্দি বসা বুকে
সিগারেটের অনবরত ধোঁয়া।

আমার না-লেখা আঙুলগুলো দেখে সে হাসছে
যে-সব কথার কোনো মর্ম নেই, আমায় বলতে হচ্ছে
সেইসব শব্দ ফুলঝুরি

আমার না-লেখা কবিতার দিকে আমি একবার
তাকাই অন্যমনস্কভাবে
না-লেখা কবিতার কি অবয়ব আছে? শরীর,
হাসি মাখা ঠোঁট?

সব বাংলা কবিতাই ব্যাকরণ সম্মত নারী
সে তিরস্করণী বিদ্যা জানে, তাই অদৃশ্য হতে
পারে যখন তখন

এত ভিড়ের মধ্যে সে মিশে আছে, আমি চোখ
বন্ধ করারও সময় পাচ্ছি না।

উপমা ও উপমেয়

খুব ইচ্ছে করে আমি এই বাংলার রূপ নিয়ে
মাঝে মাঝে মুগ্ধতার উপমায় লিখি
উপমা নির্মাণে কত ছলকলা, কেমন সহজ
আহা অন্যরা জানে না
প্রকৃতিই প্রকৃতির উপমেয়, রংগুলি শব্দ মেখে
লেগে থাকে দিগন্তের এপারে ওপারে
তবু মালদার এক ভাঙন-উন্মুখ গ্রামে শঙ্খচিল ঘুরে ঘুরে
আমাকে যে উড়ালের আলপনা দেখায়

তার কোনো চিত্রকল্প ভাবার আগেই কেন
জীবনানন্দের প্রতি খুব রাগ হয়
চিল-কাব্য, নদী-কাব্য লিখে লিখে পরবর্তী প্রজন্মের
মাথাটি খেয়েছেন
ঐ যে মানুষগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁধে,
আঁকা বাঁকা ভঙ্গিমায়
ওদের কি উপমার অপমানে কবিত্ব ফলাতে পারে কেউ?
প্লাবনে দরজা ভাঙে, কবিতা ভাসে না বটে, কারা সব কাঁদে?
আরো দূরে, রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, এ কোন্ জীবন?
হাত থেকে খসে পড়ে কলম, কাগজ, স্বপ্ন দেখি কৈশোরের
সেই কৈশোরের এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে ধরা
শান্তি পারাবত!

সে ও আমি

সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি বাড়ি ফিরতে চাই
বাড়ি
মাধবী মঞ্জরী শেষ পাতা ঝরা দিন
বারান্দায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে শীত
ডাক বাক্সে একটি চিঠি জটিল অক্ষরে।

সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি বাড়ি ফিরতে চাই
বাড়ি নয়, ঘর
সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি বাড়ি ফিরতে চাই
বাড়ি নয়, ঘর
সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, আমি ঘরে ফিরতে চাই
ঘর নয়, জানালার পাশে বিছানায়

মরুভূমি পার হয়ে ছাড়াছাড়ি, দূরে আরিজোনা
লাভার মতো রোদ, স্বর্ণলোভীদের রক্তে মেশা
এখন সূর্যাস্ত, ফেরা পথ
দু'দিকে পথের বাঁক, মানুষকে বেছে নিতে হয়।

সে চলে গিয়েছে মেক্সিকোয়, অথবা কি ক্যালিফোর্নিয়ায়
কিংবা উজানে
নদী তীরে নৌকা বাঁধা, একটুখানি পায়ে লাগবে কাদা
শুকোয়নি মাধবী মঞ্জরী, সাদা জবা
মধ্যরাতে পাখি ডাকে জানালার পাশে বিছানায়
এই মাত্র বালিশে জুড়োচ্ছে
তার মাথা
আমি পথ ভুল করে এখনো মরুতে
শতাব্দীর দিশাহারা, দূরত্ব দণ্ডিত
ফণিমনসার নীচে কাক জ্যোৎস্নায় একা বসে
লিখে যাচ্ছি চিঠি।

সান্ধ্য বিতর্ক

একদিন সন্ধেবেলা পুকুরঘাটে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতিদেবীর দেখা
পান খাওয়া লাল ওষ্ঠ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উল্টে তিনি বললেন,
হ্যাঁ মশাই, লোকে রটাচ্ছে, আপনিই নাকি এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা?
বাঃ বেশ বেশ, এই সব মাটি, জল, গাছপালা, পাহাড়, প্রাণী-ট্রানি
সব বেরুল আমার এই হাতের তালু থেকে
আর আপনি চ্যালাচামুণ্ডো জুটিয়ে সব জবরদখল করতে চান
এ যে পরের ধনে পোদ্দারি। আপনার চক্ষুলজ্জাটুকুও নেই?
ঈশ্বর আকাশ প্রভুর রূপ ধরে সুমিষ্ট স্বরে বললেন,

ভদ্রে, এমন লোকায়ত ভাষায় কি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ চলে?
প্রকৃতিদেবী ফুঁসে উঠে বললেন, তবে কি সংস্কৃত ঝাড়ব?
আমি ঝড়ের ভাষায় কথা বলতে পারি, ঝরনার ভাষায়, আগ্নেয়গিরির
আবার মলয় হিল্লোলে, ফুলফোটার, এমনকী অব্যক্ত ভাষায়
আপনাকে কেউকেটা বলে মানছি না বলেই প্রাকৃতজনের ভাষায়
জিজ্ঞেস করছি
আসল প্রশ্নটার জবাব দিন!

ঈশ্বর বললেন, কী যেন প্রশ্নটা, এর মধ্যে তুমি কত বদলে গেছ
ও হ্যাঁ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাপারটা তো
না, না, আমি এসব করিনি, আমার এত সময় কোথায়
আমি শুধু সৃষ্টি করেছি তোমাকে, তারপর থেকে তুমিই সব

প্রকৃতি বললেন, আবার একখানা ধাপ্পা চালালেন?
আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আপনাকে সৃষ্টি করল কে?

ঈশ্বর সহাস্যে বললেন, সে অতি নিগূঢ় রহস্য, জানতে চেও না।

প্রকৃতি বললেন, রহস্য না ছাই! আমিই তো তৈরি করেছি আপনাকে
নিতান্ত খেলার ছলে, তারপর ঢুকিয়ে দিয়েছি মানুষের মগজে
মানুষই আপনাকে নিয়ে ভড়ং করে, এই তালগাছটা কি আপনাকে চেনে?
বনের একটা বাঘ, নদী, ফুল ও মৌমাছিরা আপনার কথা জানেই না

ঈশ্বর বললেন, চারুশীলে, ওরা তোমাকে চেনে, তাই তো যথেষ্ট
পায়সান্ন যেমন চেনে দর্বি অর্থাৎ হাতাটাকে, কিন্তু সেটিকে
কেউ চালনা না করলে কি ঠিক ঠিক স্বাদ হয়?

প্রকৃতি ক্রোধচঞ্চল নয়নে বললেন, মশাই, আপনার
আস্পর্ধা তো কম নয়, আমার নিজস্ব নির্মাণ ক্ষমতা নেই?
দেখবেন, দেখবেন, আপনাকে এক্ষুনি চিরস্থায়ী নিরাকার করে দিতে পারি
কি না

তখন কোথায় থাকবে আপনার হাত, থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে

ঈশ্বর বললেন, তুমি হাতা কথাটার মর্ম বুঝতে পারলে না...

ঝোপের আড়ালে এক শুঁটকো পুজুরি বামুন সব শুনছিল গোপনে
এবার সে মনে মনে বলে উঠল, হা কপাল
ভগবান সত্যিই বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন
নইলে এই সুন্দরী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে লীলাখেলায় মন না দিয়ে
চালিয়ে যাচ্ছেন ফালতু তর্ক
এদিকে যে পায়সান্নে পোড়া লেগে যাচ্ছে!

একার চেয়েও একা

ঠিক যে-রকম চাঁদ আমি ক্লাস ফোরে আঁকতাম ফটফটে আকাশে
অবিকল সে রকম একটা ডোঙার মতন চাঁদ দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে
ভরা বর্ষায় এমন চাঁদ মোটেই ভালো নয়, তাতে খরা আসে
সে সব এখন জানি
হোটেলের ঘরে একলা, ইচ্ছে করলে টি ভিও দেখা যায়
এই একালের ঊর্বশীদের নাভি দেখানো নাচ, সঙ্গে বিপুল বাজনা
সামান্য আঙুল তুললেই অন্য দৃশ্য, মাটি চুষে চুষে খাচ্ছে একটি গেঁয়ো পরিবার
আবার পরের মুহূর্তেই চলে যাওয়া যায় নিউইয়র্কে কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে
খাবারের অর্ডার দিতে হবে, হট অ্যান্ড সাওয়ার সুপ? ক্রিস্‌পি নুড্‌লস
সামনে খাতা খোলা। মন চাইছে কিছু লেখালিখি করা যেতে পারে

রাত মাত্র পৌনে দশটা
আজকাল ঘড়িতে কোনো শব্দ হয় না, তবু কোথাও সময়ের প্রবাহ ধ্বনি
আমার হাতে হুইস্কির গ্লাস

একা, অত্যন্ত চমৎকার ভাবে একা। চরম বিলাসিতার মতন একা
টেলিফোন ঝনঝন করে উঠল, আমি ধরব না, আমি এখন কারুর কেউ না
চেনাশুনো বৃত্তের কেউ নয়
অচেনার হাতছানিও জানতে চাই না
এই পানীয়র গ্লাস, চেয়ারে আলগা হয়ে বসে থাকা, জানলার বাইরে
ছেলেবেলার চাঁদ
টি ভি বন্ধ, অপরূপ স্তব্ধতার মধ্যে শুধু ওঁ হারমোনি
মহাকালের এমনই একটা বিন্দু যার আয়তন কল্পনাতেও ধরা যায় না
তার মধ্যেও প্রেম বিরহের খেলা, হঠাৎ হঠাৎ বুক মোচড়ানো স্মৃতি
বন্ধ দরজা, তবু সেখানে একটি নারী দেখা দিয়েই
মিলিয়ে যাচ্ছে অলীকের মতন
আঃ কী যে ভালো লাগছে
সমস্ত জীবনের যত কিছু যা পাওয়া, যাবতীয় ব্যর্থতা
এই গেলাসে মিলিয়ে একটু একটু চুমুক দিচ্ছি
কলমটা গড়িয়ে পড়ল, যাক না হারামজাদা, নিরুদ্দেশের দিকে

নতুন নতুন নরক

নরকে খুব ভিড় জমেছে, স্বর্গখানা ফাঁকা
নরক এখন এসি এবং স্বর্গে নেই পাখা!

বিজ্ঞাপনে ঢক্কানিনাদ, সস্তা নরক যাত্রা
হরেক রকম মচ্ছবের সেখানে নেই মাত্রা!

নানান দেশে নানান খানা সবই থাকে তৈরি
একসঙ্গে পাত পেতে খায় বন্ধু এবং বৈরী!

স্বর্গ এখন ম্যাড়মেড়ে খুব, ফুল ফোটে না গাছে
ময়ূরেরাও স্বর্গ ছেড়ে যম-বাগানে নাচে।

স্বর্গে যত হুরি-পরি, বাহাত্তুরে বুড়ি
নরক-নারী চাঁদের থেকে রূপ করেছে চুরি।

কেউকেটা আর রূপ ও রুপোর বল্‌গা যারা টানে
নতুন নতুন নরক তারা মেতেছে নির্মাণে।

দুঃখ

একজন ফুলচাষী এখন কাজ করছে বিস্কুট কারখানায়
সারাক্ষণ সে কষ্ট পায় গন্ধের জন্য
একজন কীর্তন গায়ক এখন সাইকেল রিক্সা চালায়
সংসার খরচ চলে যায়, তার গলা একেবারে বেসুরো
একজন বেতের ঝুড়ি বানাত, বেত এখন দুর্মূল্য
এখন প্লাস্টিকের খেলনা বিক্রি করে, তার আঙুলের
গাঁটে গাঁটে ব্যথা
একজন যাত্রার অভিনেতা চোখে ভালো দেখতে পায় না
সে পুরোপুরি অন্ধ সেজে গেছে, তাতে ভিক্ষে বেশি মেলে
তাঁতের কাপড়ের ওপর ছবি আঁকতো যে মানুষটি, একদিন অন্ধকারে
কে যেন ছুরি ঢুকিয়ে দিল তার পেটে
বেঁচে গেছে, এখন কোনো দৃশ্যেই সে রং দেখতে পায় না
কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে এক কবি, এখন ক্ষমতার রণাঙ্গনে
সে এক যোদ্ধা
ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়, খুবই জমাট ঘুম
সেই ঘুমে বিন্দুমাত্র স্বপ্ন নেই!

মানুষের ডানা

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আকাশে পাখির মতো উড়ছে মানুষ
মাত্র কয়েকদিন আগে, বিশ্বজুড়ে ধ্বংস যজ্ঞে শেষ হয়ে গেছে
সমস্ত চার চাকার গাড়ি
বাতাসে বিষের ধোঁয়া ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে
পশু-প্রাণী, বৃক্ষ-লতা, আবার পেয়েছে ফিরে
নিজস্ব মাটির অধিকার
সব মানুষের হাতে ডানা বাঁধা, যেন ইকারুশ
পাখিদের সঙ্গে মিলে মিশে, দূরে কাছে বাতাসে সাঁতার কাটে
ইস্কুলে, অফিসে যায়, মেঘের আড়ালে
এর সঙ্গে ওর দেখা হয়
যন্ত্র রব, লাল আলো-টালো নেই, অস্থিরতা গর্জন করে না
কোনো কোনো মহীরুহে দু'দণ্ড জিরোনো যায়, কেউ বাজায় বাঁশি
সীমান্তে পাহারাদারি কবে শেষ, নেই কাঁটাতার
মাটি ছেড়ে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে উড়ে গেলে নীলিমার কাছে
মানুষের মনও উঠে যায় সব তুচ্ছতার অনেক ওপরে
সকালের স্নিগ্ধ রোদ, সন্ধ্যায় রক্তিম উপহার
ধুয়ে দেয় সব গ্লানি, প্রতিদিন শুদ্ধতার দিকে
আমার হাঁটুতে আর ব্যথা থাকবে না...

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পবন পদবী পেয়ে গেছে একদিন
মানুষের ডানা
বসে আছি, আজ সাত সেপ্টেম্বর, দু' হাজার তিন।

নদীর কোন্ পারে তুমি, নীরা

নদীর কোন্ পারে তুমি, নীরা, আমি নদীর মাঝখানে
খুব কাছে ঝুঁকে আছে মেঘ
যেন অজস্র রুমাল নীল, কালো,
সূর্যের পাপড়িতে দুলে দুলে আসে অন্ধকার
আচমকা বাতাসে কিছু ঘরে ফেরা পাখিরাও
দিন হারা
নদীর কোন্ পাড়ে তুমি, নীরা, আমি নদীর মাঝখানে।

ফেরি স্টিমারের ডেকে চাপ চাপ মানুষ
আমাকে দেখেনি তারা কেউ
আমি ফেরি-দুনিয়ার কেউ নই
ওরা শুধু ঢেউ দিয়ে যায়
ব্রিজের গুম গুম শব্দে জেগে থাকে মানব সভ্যতা
মাছ ধরা নৌকাগুলি শতাব্দী বিহীন, ওরা
সন্ধ্যার জোনাকি
কখনো আজান শুনি, জলের কল্লোলে ভাটিয়ালি
নদীর কোন্ দিকে তুমি, নীরা, আমি নদীর মাঝখানে।

আমার দু'হাত বেশ ভালোই সাঁতার জানে,
পা দুটিও বজরার দাঁড়
সেই ফুলেশ্বর থেকে ভেসে আসা
এখন ভাটার টান, বিপরীত স্রোত
এখন আকাশ নেই, নীচে শুধু টান মারে
রাত্রির অতল
যে যাবে মোহনা খুঁজতে, আমার শরীর চায়
অভিপ্রেত তীর

নীরা, তুমি কেমন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছ?
কোন্ শুভ্র বারান্দায় তোমার আঁচলখানি
স্বর্গের নিশান
তোমার নাভির কাছে চাঁদ আর কুচযুগে সুবর্ণ মঞ্জরী
দেখা দাও, সাড়া দাও, জাদুকরী
নদীর কোন্ পারে তুমি, নীরা, আমি
নদীর মাঝখানে।

স্থির চিত্র

স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বজিৎ, ট্রেন এল
সে উঠল না
এমন নয় সে পরবর্তী ট্রেনটির প্রতীক্ষায় থেকে যাবে
এমন নয় যে তার পয়সাকড়ি একেবারে নেই
এমন নয় যে তার মুখে আঁকা প্রচ্ছন্ন বিষাদ
এমন নয় যে উল্টো দিক থেকে অন্য ট্রেনে
আসবে কোনো ব্যাকুল তরুণী
শখ করে স্টেশনে বেড়াতে আসা বেকারও সে নয়
কেউ তাকে ডাকছে না, সে কারুর চোখে চোখ
রাখেনি একবারও
প্যান্ট-জামা স্বাভাবিক, চলনসই জুতো
দু'আঙুলে সিগারেট, অন্য হাতে দেশলাই
এখনো জ্বালেনি
মাঝারি স্টেশনে ভিড়, দোলাচল, দেওয়ালের কাছে
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা বিশ্বজিৎ,
কতক্ষণ থাকবে তা কে জানে
সে কি দুঃখী, ছন্নছাড়া, পলাতক, দিক ভুলে গেছে?

সংসার বিরাগী, কিংবা নতুন জীবনে তার
পদক্ষেপে দ্বিধা?
গল্প লেখকেরা তাকে যা খুশি ভাবুক
কবিতায়
সে একটি স্থির চিত্র
সে একটি স্থির চিত্র, প্ল্যাটফর্মে আসন্ন সন্ধ্যায়.......

নাভি কাব্য

এখন আকছার খুব সহজেই মেয়েদের নাভি দেখা যায়
মুখ বা দুটি বুকের আগেই নাভির দিকে চোখ পড়ে
তকতকে পলিমাটির মতন পেট, মাঝখানে অর্ধলুপ্ত চাঁদ
যেমন কালিদাসের আমলের নিম্ননাভি সমস্ত তন্বীর
তারপর বহু যুগ ধরে প্রচণ্ড ঢাকাঢুকি
যত কাব্য শুধু চোখ আর ওষ্ঠাধর নিয়ে
তাও বোরখা পরা মুসলমান মেয়েদের ঠোঁট বা চিবুকের ডৌলও
দেখা যায়নি

কদাচিৎ দুটি তীব্র চোখ
ওদের কবিরা গোটা মধ্যযুগ ধরে কী নিয়ে কাব্য রচেছে?
আমি অনধিকারী, কিন্তু গোপন চিন্তা তো কেউ রোধ করতে পারে না!

এই তো গত এক দশক ধরে সাগরপারে তরুণী মেমরা
ভারতীয় নর্তকীদের কাছ থেকে নাভি খুলে রাখতে শিখেছে
এখন চতুর্দিকে শুধু নাভি, নাচটাচ জানার দরকার নেই
প্রত্যেকটি নাভির মধ্যে রয়েছে একটি মৃণাল
পুরুষ নতজানু হয়ে বসে জাগাতে চায় কুলকুণ্ডলিনী

ফুটে ওঠে একটি সহস্রদল পদ্ম
বস্তুত কোনো নারী যদি খুব কাছে, কাছের থেকেও কাছে,
হিমালয় পাহাড়কে আড়াল করে দাঁড়ায়
তখন সেই পদ্মের সুগন্ধ পুরুষটিকে নিয়ে যায় জন্মের মুহূর্তে

মেয়েরা এসব কিছুই জানে না
না জানাই ভালো!

বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীরা

বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীরা
অন্তরাল থেকে ওকে দুঃখী চোখে দেখছে মনীষীরা
মনীষীরা সপ্তরথী, ওরা কেউ চেনে না আমাকে
আমি প্রতিদ্বন্দ্বী নই, আড়ালেই থাকি কোনো রাজপথের বাঁকে।

কতজন ব্যর্থকাম, কতজন ছুঁতে চায় নীরার আঁচল
আমি অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলি, হাত দুটি রাখি অচঞ্চল
মাথায় আগুন, তবু ডুব দিই শিল্পের গভীরে
কেউ যদি নিতে চায়, নিক না নীরাকে কোনো নীল সিন্ধুতীরে।

বৃষ্টিধারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে নীরা
এ শহরে আর কেউ নেই, ঘুমে মগ্ন প্রহরীরা
নিওনসর্বস্ব পথ, শব্দ নেই, ভয়হীনা সেই এক নারী
শিল্প ভেঙে রক্তমাংসে ফিরে আসে, সঙ্গে ছায়া গোপন সঞ্চারী।

নীরা, তুমি যেতে চাও অন্য কারো সঙ্গে সন্ধেবেলা?
লুকিয়ে রাখব আমি বাঘনখ, তবে কি এবার সাঙ্গ খেলা!

কেন বারবার তবে মুখ ফেরাও, করতলে রাখো আমলকী
তার ঘ্রাণে বাল্যকাল, অতি সাধারণ হওয়া তোকে আর মানাবে
না সখী!

এক মুঠো ভবিষ্যৎ

মনে করো, এই রাত্তিরে তুমি আছ এক রূপকথার
দেশে
আমিও এক অলীক রাজ্যের রাজা
রূপকথার দেশের রাজকন্যাটন্যারা সাধারণত
বন্দিনীই থাকে
তাদের পোশাকের রং সবুজ
আমি যদি লাল রঙে পালটে দিই
না, ক্যাটকেটে লাল ঠিক নয়, ধরা যাক গোলাপি
গোলাপ অবশ্য সাদা হয়, হলুদও হয়, সবুজ কিংবা কালো দেখিনি
পোশাকের নীচে তোমার যে শরীর দেখেছি
ডায়মন্ড হারবারে
তা ছিল চাঁপা ফুল রঙের, ঊরু যুগে বৃষ্টি ভেজা নবীন তৃণের সুগন্ধ
হ্যাঁ, সেই রাতে ডায়মন্ড হারবারে খুব উল্কাপাত হয়েছিল মনে আছে?
তারপর আকাশ ফাঁক হয়ে গেল, ঘড়ঘড়িয়ে
চলে গেল একটা রথ

আমি আসছি তোমার কাছে, আর তিনবার
বিদ্যুৎ চমকের পর

একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা বসে কাঁদছে একটা
ছাতিম গাছের তলায়

পৃথিবীর সব বাচ্চাদের কান্না আমি দূর করতে
পারব না
কিন্তু একটা শিশুকে অন্তত পৌঁছে দিতে পারি
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে
তাকে তুলে নিতে গেছি অমনি শোনা গেল সেই রথের শব্দ
ওরে বাবা, এ তো যে সে শিশু নয়, যেন
মহাকাল, যেমন তার গলার স্বর
তেমনই বিশাল তার খিদে
তার দু'চোখে জোনাকি

কারা যেন আমার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল
চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ ঠিক চিনতে পারছি না
তারা সমস্বরে বলতে লাগল, পারবে? তুমি পারবে?
কেন ওরা আমাকে এই পরীক্ষায় ফেলতে চাইল
অন্তরীক্ষে আরও কতজন উঁকি মেরে দেখছে
প্রতিটি গাছপালার মধ্যে সেই প্রতীক্ষা, পারবে, পারবে?
সব ফুল ফোটা বন্ধ, তারারা মিটমিট করছে না
নদীতে ঢেউ নেই, স্টিমারে ভোঁ নেই, জেলে
নৌকোয় জ্বলছে না টেমি
হা-হা স্বরে বাতাস বলছে, পারবে তুমি
শিশুটিকে এক মুঠো ভবিষ্যৎ দিতে?

ওগো, রূপকথার দেশের বন্দিনী কন্যে
আমার ঢাল-তরোয়াল, টুথব্রাশ, পক্ষিরাজ,
জাঙিয়া-গেঞ্জি সব তৈরি
তবু আমি আটকে আছি নদীর ধারের এক গাছতলায়
ভূত-ভবিষ্যতের গোলকধাঁধায়!

এক জীবনের মর্ম

জীবন প্রবাহের এক পাশে দাঁড়িয়ে যদি কোনওদিন
হঠাৎ প্রশ্ন জাগে
এ জীবনের মর্ম কী?
তখনই আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকায়, শোনা যায় রথচক্রের শব্দ
কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবী বধির
তবে কি এই প্রশ্ন ভুলে যাবার নামই নিয়তি?
যদি এই শুকনো নদীটি এবারের বর্ষাতেও রূপ ফিরে না পায়
ডাঙায় উল্টে আছে নৌকা, যদি আর না ভাসে
খরখরে কাদায় রয়ে গেছে অনেক পায়ের ছাপ
ঢেউ উঠে এসে আর প্রণাম জানাবে না?
এই নদীর জীবনেরও কোনও মর্ম নেই?

সব নদীই পাহাড়ের সন্তান, যেমন সব মানুষই মাটির
সেই মাটিতেই রক্তপাত ও অশ্রু
এবং চরম ঘুম
মাঝখানের জীবনটাও তো মাটি খেয়েই বেঁচে থাকা
চেটেপুটে খাই নখের ধুলো
মাটিতেই লেখা জীবন চরিত, কপাল ভর্তি মাটি
বৃষ্টি ভেজার পর হাঁটতে হাঁটতে টের পাই
আমি আর আমার মা সহোদর, এমনকী বাবা ও
আমার ভাই
সবাই এই ধরিত্রীর ছেলে মেয়ে
বিশ্বজোড়া একই সংসারে তবু সর্বক্ষণ চলছে গৃহ বিবাদ!

অরণ্য থেকে ঘরে ফিরে আসার দিনেই প্রথম পাপ হয়েছিল
মাটিতে ব্যক্তিগত সীমানার গণ্ডিকাটা
আসলে কী চেয়েছিলাম আমি, নিজস্ব ফসল, না নারী?
নারী কোনওদিনই পুরুষকে তার সর্বস্ব দেয়নি

এমনকী, ভালোবাসার আকিঞ্চনেও না
ভালোবাসা এই আছে, এই নেই, কখনও অলীক
প্রথম শিল্পের মতন অপরূপ কৃত্রিমতা
ভালোবাসা পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি সত্য
ভালোবাসার জন্য ছটফটানি
এর মাঝখানে থেকে যায় শরীরের অসূক্ষ্ম দাবি, আর
অপত্য-বন্ধন
এত কাছাকাছি তবু অপরিচয়ের দূরত্ব বেড়ে যায় দিন দিন
অদৃশ্য অস্ত্রের ঝনঝনায় মাধুর্য হারিয়ে যায় বারবার
পুরুষ সব সময় নিজেকে জয়ী ভেবে রচনা করে
এক মূর্খের স্বর্গ
আসলে নারীরা চুপি চুপি ঝাঁজরা করে দেয় তাদের হৃদয়।

মাঠে যে-ই ফসল ফলল, অমনি শেষ হয়ে গেল
সব বন্ধুত্ব
ফসলের জন্য এই নগর সভ্যতা আর তার সমস্ত অভিশাপ
ফসলের জন্য সব রকমের বিশ্বাস ঘাতকতা
সেই আকাশের নীচে রোদে পোড়ে,
ঝড় বাদল মাথায় নেয়
দগ্ধ উদরেও সৃষ্টির গান গায়
সেই আচ্ছাদনের আরামে, সুখ শয্যায় শুয়ে
বঞ্চনার শ্বেতপত্র তৈরি করে
নদী প্রতিবাদ করেছিল, তার গলা কেটে দেওয়া হল
পাখিরা গান না গাইলে তাদের জন্য দেওয়া হল বিষ
ফসলের খেতের পাশে বসে যারা খিদের জ্বালায় কাঁদে
যাদের বাড়িতে উনুন জ্বলে না
তাদের বাড়িতে যখন তখন আগুন ধরিয়ে দিয়ে
পুড়িয়ে মারাটাই তো সোজা
খালি পেট থাকলেও কাঁদতে পারবে না
নগর সংস্কৃতির বিঘ্ন ঘটাবে না

চাঁদের উল্টো পিঠের মতন এটাই সভ্যতার গোপন শর্ত!
মাটি কিন্তু ভোলে না।
সম্রাটকেও তারা টেনে নিয়ে যায় মাটির নীচে
আলেকজান্ডার, চেঙ্গিজ, হলাকু, নেপোলিয়ন, চার্চিল, হিটলাররা
মাটির গণ্ডির লোভ করেছিল, তারা শেষ পর্যন্ত
ভূ-গর্ভে পোকা মাকড়ের খাদ্য
সব অস্ত্র শেষপর্যন্ত ভোঁতা হয়ে যায়
যারা লোভী, তারা মরে উদর পীড়ায়
যারা প্রাসাদ বানিয়েছিল, তারা বটগাছের শিকড়ের জোর জানে না
যারা সবাইকে পদানত করতে চেয়েছিল, তাদের আজ পা নেই
যারা দেশাভিমানী, দেশ তাদের মনে রাখে না
উই ধরা ছবি এক সময় খসে পড়ে ঝনঝন শব্দে
আজ যে দু'হাত ওপরে তুলে আছে, কাল সে অঞ্জলি পেতে করুণা-ভিখিরি!

মানুষ কি তখনই আত্মধ্বংসের দিকে যায়
যখন সে মুছে ফেলে বাল্যকালের ছবি?
মানুষের গলা তখনই কর্কশ হতে শুরু করে
যখন সে ভুলে যায় ভালোবাসার মুহূর্তগুলি
শরীরের মাধুর্য তখনই মিলিয়ে যেতে শুরু করে
যখন মিলনের মধ্যে এসে মেশে গরল
আহা, সেই সব মানুষ কত দুঃখী, যারা গায়ে জ্যোৎস্না মাখে না
উন্মুক্ত দিগন্তের মধ্যে শুধু একটা ঝাঁকড়া গাছ, আর কিছু নেই
তার নীচে একজন ঘুমন্ত মানুষ, তার শিয়রের কাছে
একটা বাঁশি
সে হয়তো কিছু একটা স্বপ্ন দেখছে
আমিও তাকেই স্বপ্নে দেখেছি সারাজীবন!

আকাশ দেখার অধিকার

এক ফোঁটা অন্ধকার দিয়ে তুমি কপালে একটা টিপ পরে নিলে
আজকাল তো কালো টিপ আর চালু নেই
কেন না কালো লিপস্টিক হয় না বোধহয়
দুই বাহুমূলে লাগিয়ে নিলে ধূপের ধোঁওয়া
এখন ধূপ তো ঠাকুর ঘরের বাইরে আর দেখি না
ঠাকুর ঘরগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছে রান্নাঘরের সঙ্গে
রাস্তায় কাঁচুমাচু ছেলেরা ধূপ বিক্রি করতে এসে ভিখিরি হয়ে যায়
এক আঁজলা বৃষ্টির জলে কুলকুচো করে নিলে তুমি
বৃষ্টির জলে কত পলিউশান তোমার মনে পড়ল না
খোঁপায় গুঁজে নিলে গুঞ্জাফুলের মালা
আঁচল খুলে বুকে মেখে নিলে মেঘ ভাঙা জ্যোৎস্না
নাভিতে প্রতিফলিত চাঁদের টুকরো
তম্বুরার মতন দুই নিতম্বে কামিনী ফুলের ঘ্রাণ
যোনিপথে ওঁং ধ্বনি
পায়ের পাতায় রক্ত চন্দনের আভা
আঃ কতগুলো যুগ কেটে গেল, এখনো তোমার যোগ্য হয়ে
উঠতে পারলাম না আমি
আজ আবার এসেছ পরিহাসের অপূর্ব উন্মাদনায়
আমার চোখ ঠেকবে মাটিতে
যেন আমার আকাশ দেখার অধিকার নেই আর নেই!

পড়ে থাকবে একটি ঝরা কুসুম

ভালোবাসার নদীতে ভাসা, ডুব সাঁতার ব্যাকুল সারা জীবন
সারাজীবন?
পাগল নাকি, তিনশো সাতাশ নিমেষ
ভালোবাসবে আমায়, আমি তাতেই অমর হব!
অমরত্ব দেড় মুহূর্ত, যেমন একটা বিদ্যুতের ঝলক
কিংবা রাস্তা হারিয়ে ফেলে টিলার পাশে একটুখানি
            শ্যাওলা মাখা সিংহাসনে বসা!
কি বিচিত্র দুনিয়াদারি সবই দেখছি, দুই চক্ষু বাঁধা
মিলে অমিল, শরীরে ভুল, যখন তখন রংবিহীন হোলি
বাজাও বাজাও কাড়া নাকাড়া, এ উৎসবে আমরা কেউ
কারুকে চিনব না
মাটির নীচে অন্ধকার, চমৎকার, এ বিছানা ভুলতে
            কেউ পারে?
স্মৃতিও নেই, শরীর খেলা কখন শেষ, কখন আমি
            অনিত্যের মায়ায় ডুবে আছি
হা অনন্ত, বসেছে দেখো দু' হাত জুড়ে রামভক্ত
            হনুমানের মতন
ভালোবাসার নদীও নেই, পড়ে থাকবে একটি ঝরা কুসুম।

জীবন মাত্র একবার

পেটে বোমা বেঁধে যে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে
ও কি পরজন্মে বিশ্বাস করে?
যাবার পথে হোঁচট খেলে ওর পায়ে ব্যথা লাগে না?
ওই তো দেখতে পাচ্ছি মুখে কালো মুখোশ পরে
                        এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুদূত

মুখোশের নীচে ওর মুখখানা কি এক নশ্বর মানুষের নয়
ও কি নিজেকে ভাবছে দেশপ্রেমিক?
ও কি জানে না, মানুষ শুধু মাতৃগর্ভেই জন্মায়
দেশ বলে কিছু নেই
কামিকাজি বিমান চালকরা আগুনের মধ্যে খুঁজে ছিল দেশ
ও কি নিজেকে ভাবছে কোনও ধর্মের ধ্বজাধারী
ও কি জানে না, সব ধর্মই একদল নেশাখোরের অলীক বিলাস
দেশ নেই, আছে এক একটি হৃদয়হীন রাষ্ট্র
ও কি ডেভিড হয়ে লড়তে যাচ্ছে গোলায়াথের সঙ্গে
ও কি অভিমন্যুর মতন ভেদ করতে চাইছে সপ্তরথীর চক্রব্যূহ
তা হলে নিজের মাথার ঘিলু আগেই রেখে এসেছে কার পানীয়ের গেলাসে
যারা ওকে পাঠায়, তারা মানুষের মাথার ঘিলু চুক চুক করে
পান করতে ভালোবাসে
যেমন এক একটি রাষ্ট্রনায়ক স্নান করে মানুষের রক্তে
ওরে পাগল, তুই কি জানিস না মানুষের জীবন মাত্র একবার
মাত্র একটাই
ওরে পাগল, তুই না থাকলে যে মুছে যায় সারা পৃথিবীর মানচিত্র
ওরে পাগল, তোর কাজের মেয়েটির শরীরের যে উত্তাপ
তোর স্বপ্নে দেখা স্বর্গের হুরি-পরিদের তা থাকে না
এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যাচ্ছে ভ্রমর, ওদের পরজন্ম নেই
উড়ছে ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি, দোল খাচ্ছে বাতাসে
নিরালা ঝর্নায় পা ডুবিয়ে বসে আছে একজন মানুষ
ও চিরকাল বসে থাকবে ওখানে
ওর গান খুব মন দিয়ে শুনছে চারপাশের হরিৎ গাছপালা
ওখানে বারুদের গন্ধ নেই।

ব্রিজের ওপরে ও নীচে

শীর্ণ নদী দেখলেই আমি চোখ ফিরিয়ে নিই
কিন্তু কোন্ দিকে চোখ ফেরাব, ভাঙা ঘাটে বসে আছে
দু'তিন জন জীর্ণ মানুষ
পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে তার সর্বাঙ্গে দগদগে ক্ষত
গোরুর গাড়িটি যেমন নড়বড়ে, তার গাড়োয়ানটিও তেমনি ভাঙাচোরা
আর গোরুদুটি শুধু কঙ্কালের ওপর চামড়া দিয়ে মোড়া
একটু দূরে চেতন মিস্তিরির বাড়িটি পড়ো পড়ো
যেন আবোল তাবোলের বুড়ির বাড়ির মতন
আঠা আর থুতু দিয়ে জোড়া
তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি পা-ব্যাঁকা ছেলে
আর তার মায়ের বুকে স্তনের বদলে
দুটো খালি ঠোঙা
একটা যুদ্ধে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে তবু
একটা কিছু মানে বোঝা যেত
যুদ্ধ নেই। এখন নাকি শান্তি, তবু চতুর্দিকে
এত মুমূর্ষু দৃশ্য আমার সহ্য হয় না...

অবশ্য এসব না দেখলেও তো চলে
মরা নদীর ওপরে তৈরি হয়েছে নতুন, ঝকঝকে ব্রিজ
কত রকম আকার-প্রকারের স্বাস্থ্যবান যানবাহন ছুটছে
ওপর দিয়ে
সুকুমার, সরল, সুন্দর ছেলে মেয়েরা চাটছে আইসক্রিম
ডানা কাটা অপ্সরীরা হাসছে ঝর্নার জল ছিটিয়ে
চওড়া কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখছে গাড়ি-চালক বাবা
ব্রিজের ওপরে ও নীচে একই দেশ, একই দেশের মানুষ
একই বাতাসে নিশ্বাস, তবু কেউ কম, কেউ কেউ অতিরিক্ত বেশি
আমিও তো অনেকখানি বাতাস নিয়ে নিচ্ছি ওদের বুক থেকে টেনে।

সত্যের যমজ

শূন্যের আড়াল থেকে একটি মুখ
ঈষৎ ফেরানো, পুব দিকে
শূন্য থেকে যেমন শিশির কিংবা চাতকের ডাক
বাকি চরাচরে কেউ নেই
শুধু সে-ই দেখে, যার আঙুলে কলম

ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?

শব্দের নির্মাণে কিছু মিথ্যে তো থেকেই যায়
যা আসলে সত্যের যমজ
শূন্য কি কিছুর জন্ম দিতে পারে? তবু যেন আসে
অলীক খড়িতে আঁকা মুখখানি, কপালে অলক
শুধু পুব দিকটাই স্থির সত্য, সমস্ত দিকেরা
সেটা জানে।

এখন দিন না রাত্রি? অথবা কুয়াশা
হঠাৎ ভাঙলে ঘুম যে-রকম সময়ের ভ্রম
দু'দিকের জানলা খোলা, আলো কিংবা অন্ধকার
দু'রকম নীল
হাতে যে কলম নিয়ে বসে আছে তার বুকে
দুঃখ ভাঙা সারাৎসার, সে যা-ই খুঁজুক
সাদা পৃষ্ঠা অক্ষর ও শব্দাবলী ছাড়া
আর কিছুই দেবে না।

জ্যোৎস্না, রাত একটা পঁয়তিরিশে এক নারী

টেবিলটার মাঝখান দিয়ে উঁচু নিচু ঢেউ উঠেছে
তাই তোমাকে বাড়িতে ডাকতে পারছি না
টেবিল কারা ঠিক করে দেয়, তাও কি তোমার কাছেই জানতে হবে?
যাঃ টেলিফোনটা হঠাৎ বোবা-কালা হয়ে গেল আজ বিকেলে
মোবাইলটা তো চুরি হয়ে গেল পরশুদিন
কিংবা চোরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমিই কোথাও ফেলে এসেছি
আচ্ছা, ওই ফোন কি জলের নীচেও শোনা যায়?
সে দিনই বাড়িতে নিজেকে ফোন করলুম ওই নম্বরে। বাজলও ঠিক
যেন প্রথমে কাদের জড়ামরি কণ্ঠস্বর, তারপর প্রবল জলস্রোতের শব্দ
তারপর একজন, বোধ হয় জলকন্যা, বলল, পাতালপুরীর দরজা যে খুলছে না!
হ্যাঁ সত্যি, বলেছে এই কথা
সেই দরজা শেষ পর্যন্ত খুলেছে কি না তা আর জানা হল না
আমার ঘাড়ে একটা বাঘ কামড়ে দিয়েছে, সেখানে এখনও রক্তের রেখা
ভেসে ওঠে
তুমি আসবে না, না ডাকলে তুমি আসবে না?

আমি বাথরুমে একা কাঁদি, খুব বিচ্ছিরি, খুব মলিন, না, না
সে কান্না অবশ্য তোমার জন্য নয়, একটা গানের সুর ভুলে যাবার জন্য
কিন্তু নিজের বাঁ দিকের স্তনে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বলি, এটা তোমার
আমার আঙুল তোমার আঙুল হয়ে যায়
এ সব কথা বোধ হয় লেখা উচিত নয়, তাই না?
আমি কী করব, রাত্তির ঠিক একটা পঁচিশে
একটা সাদা পেঁচা উড়ে যায়
বারান্দার টবে এক থোকা রজনীগন্ধার পাশে দুটো জোনাকি
আমি শুধু পাতলা, সবুজ নাইটি পরা, ব্রা নেই, প্যান্টি নেই
টবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছি, যেন জোনাকি আলো কখনও দেখিনি
জ্বলছে, নিবছে, অদৃশ্য হবার খেলা দেখাচ্ছে
বৃষ্টির ফোঁটার মতন রজনীগন্ধায় আসছে সুগন্ধ

যে সব দেশে তুষারপাত হয় না, সে সব দেশে জ্যোৎস্না অনেক গাঢ়
রাত্তির একটা পঁয়তিরিশে বুক মুচড়ে সব মেয়েরই মনে হয়
কেন হারিয়ে গেল গত জন্মের দুটো ডানা?

সাবধান কলম

যখন মধ্যপ্রাচ্যে একটি নৃশংস, বর্বর যুদ্ধ চলে, তখন কি নেহাত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনুভূতি নিয়ে কবিতা লেখা যায়? তখন কি যুদ্ধ নিয়েই তুমি লিখবে কিছু? অবিরাম গোলাবর্ষণ, গুচ্ছ গুচ্ছ বোমা। আকাশ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে লেলিহান আগুনে। এদিকে ওদিকে লাশ, মায়ের কোলে রক্তাক্ত শিশু, গাছের ডালে আটকে আছে ছিন্ন ভিন্ন হাত-পা, বাতাস কাঁপছে কত শেষ নিশ্বাসে, এই সব দৃশ্যের কাছে কবিতার সব শব্দই অসহায় মনে হবে না?
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও একটা স্রোত আছে। আজ এখানে সব পেট্রল পাম্প বন্ধ, এক জায়গায় রাস্তা জুড়ে বসে আছে পদাতিকরা, কারা যেন দোকানের কাচ ভাঙছে, দুপুরবেলা কামান গর্জনের মতন বজ্রগর্ভ মেঘের ডাক, ভিখিরিরা ইটের উনুন জ্বালিয়ে ভাত চাপিয়েছে ফ্লাই ওভারের নীচে, কবিতা এই সব জায়গায় উঁকি মেরেই সরে যাচ্ছে দ্রুত, কলম হাতে চুপ করে বসে আছে কবি, তার খিদে পেয়েছে, খালি পেটে সিগারেট টেনে যাচ্ছে অনবরত, বারান্দায় একটা কাক ডেকে চলেছে বিশ্রী ভাবে, হুস হুস করলেও সে যায় না, হঠাৎ বৃষ্টির ঝাপটা এসে তাকে উড়িয়ে দিল!... পৃথিবীর থামবার উপায় নেই, প্রতিটি বিকেল গড়িয়ে যাবেই সন্ধের দিকে, মুছে যাবে আকাশের রং।
রবীন্দ্র জয়ন্তীতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাগুলি খালি থাকবে না, তুমি কী লিখবে? বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাবে এক ঠিকানাহীন কিশোরী? তার পাশেই এক ভিখারিনি হাত বাড়িয়েছে গাড়ির জানলায়, ওকে তুমি বাদ দেবে? আজকের মতন সব কবিতা নারী বর্জিতও তো হতে পারে। দুনিয়ায় কত দুঃখী মানুষ, তাদের প্রতি সহমর্মিতায়... কিন্তু খুঁজে নিতে হবে সঠিক ভাষা, যেদিন কলম ভাষা-হারা, সেদিনও কি তুমি ক্রোধ বা দুঃখের বশে লিখবে? রেলিং-এর

কাকটা আবার ফিরে এসেছে, সাবধান কলম, যেন এই সব সময় ভাষার বিশুদ্ধতা না হারায়!

অরণ্য গভীরে

সুষুপ্তির মধ্যে একটা দরজা শব্দ করে খুলে যায়
উন্মুক্ত প্রান্তরে এত চোখ ধাঁধানো নীল বর্ণ রোদ
চক্ষু সয়ে আসে, ক্রমে ফিরে আসে অসংশয়ী বোধ
একটি আহত চিতা নিজের রুধির চেটে খায়

পোড়া ঘাসে বীর্যপাত করে গেছে তিতিক্ষু সন্ন্যাসী
কেউ যেন ভাঙা কাচে ফেলে গেছে চোর পুলিশ খেলা
এর নাম মরীচিকা? হলুদ বালিতে স্বর্ণ ঢেলা
নগ্ন ভাঙা পুতুলের চোখে, ঠোঁটে জলজ্যান্ত হাসি!

অর্থ চাও?
এ কবিতা তোমাকে দেখেই শিউরে ওঠে
ছাপার অক্ষর থেকে
দ্রুত
এর পতনই নিয়তি
নির্বাসন থেকে
যারা গান গেয়ে ফিরেছে সম্প্রতি
আবার ফেরার পালা, অরণ্য গভীরে তারা ছোটে!

মৃত্যু নিয়ে

মৃত্যু নিয়ে দার্শনিকতাটা, এঃ নিছকই ছ্যাবলামি

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হলে, বসে পড়া ভালো
একটা গাছের ছায়া পেয়ে গেলে অতি চমৎকার
না পেলেও ক্ষতি নেই, কালভার্টে, পশ্চাৎদেশ ঠেকিয়ে দিনে-রাতে
পল অনুপল নিয়ে কিছু লোফালুফি
সব দার্শনিকরাই এরকম শতাব্দীগুলিকে রূপ রস দিয়েছেন
বিছানায় রতি খেলা অকস্মাৎ থেমে গেলে, অসমাপ্তি শেষ কথা নয়
মুখোমুখি নগ্ন শরীরের চেয়ে থাকা
তারও নন্দনতত্ত্ব ছুঁয়ে থাকে শিল্প গরিমায়
অতৃপ্তিই মূল কাব্য, বাকিটুকু পরাবাস্তবতা

মৃত্যুতে আসঙ্গ লিপ্সা মুছে যায়, তাই সেটা সত্যের জারজ!

সমস্ত দেহতত্ত্ব তুচ্ছ করে

আমি যতবার এসেছি তোমার কাছে, তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ
ফেরার রাস্তা খুঁজে পাইনি, হোঁচট খেয়েছি বারবার
আমার অন্ধত্ব মিথ্যে নয়, তার নীচে চাপা পড়েছে সব অহমিকা
এক এক সময় অন্ধ হতে কী যে ভালো লাগে, তখন পোশাক থাকে না
অন্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে শিল্পের কলমে বীর্যে অক্ষরে
কি জন্মায়নি কোনো মহা কবির কবিতা

একটা বাগানের পাশ দিয়ে রাস্তা, আমি বাগান দেখছি না
ছ'টা ছ'রকম পাখি দোল খাচ্ছে কদমের ডালে

যথেষ্ট হয়েছে পাখির উপমা
সমস্ত দেহতত্ত্ব তুচ্ছ করে তুমি বসে আছ নদীর ধারে
জলে পা ডুবিয়ে
এক ঝলক তাকানো মাত্র আমার চোখ ঢেকে গেল কুয়াশায়
এখন নারীর চেয়ে নদী বেশি টানময়ী
ডুব দিয়ে নীল গভীরতায় খুঁজি কবিতার বিদ্যুল্লেখা।

উত্তর নেই

আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?
শুনিনি, শুনতে চাই না, তার চেয়ে বরং
শীতকালের বৃষ্টি
আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?
না শুনব না, শুনব না বরং একটা গান
কিংবা একলা সঙ্গমের সময় যেমন জোর করে ছবি
ফোটাতে হয় কোনো লাস্যময়ীর
আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?
চোখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু কান বন্ধ করা যায় না কেন?
প্রত্যেকবারই এই মিনমিনে কাতর প্রশ্নটা স্বরতরঙ্গ বাড়াচ্ছে
এবারে বজ্র গর্জনের মতন, সারা আকাশ জুড়ে
আর তো কোনো উপায় নেই, আমিও তবে গলা
মিলিয়ে দিচ্ছি
আমি এখন কী করব, বলতে পারেন?

বারান্দার নীচে

একজন অসাবধানী নারী হঠাৎ আমার দৃষ্টিকে চোর করে দেয়
সে ঘুরছে আর টুকটাক করে ভাঙছে এক-আধটা নিয়ম
শাড়ির আঁচলে উড়িয়ে দিচ্ছে কত না নিষেধ
হাসি কুলকুচি করছে আর ঝরে পড়ছে শাস্ত্র-টাস্ত্র
বারান্দা থেকে অতখানি মুখ ঝুঁকিয়ে কী দেখছে সে
ওখানে দেখার তো কিছু নেই
তার ঠিক মাথার ওপরে একটা তেল মাখানো চাঁদ
আর মালগাড়ির মতন লম্বা একটা রাত
কখনো সে ভাস্কর্যের নারী, কখনো নদী
আমার চোখের পলক ফেলতে ভয় করে
যদি সে হারিয়ে যায়
হারিয়ে যেও না, ভাঙো ভাঙো, আরও অনেক
ধূসরতা ভেঙে দাও

বারান্দার থেকে অতখানি ঝুঁকে কী দেখছ
ওখানে তো কেউ নেই।
তুমি বুঝি শূন্যতাও দেখতে পাও!

সময় জানে না

পৃথিবী কি জানে তার ডাক নাম পৃথিবী?
সূর্য কি জানে তার আছে কত শতনাম
চাঁদ কি জেনেছে তার নামে কত কাব্য
মহাশূন্যতা নাম পেয়ে গেল নীলাকাশ।

ভ্রমর বেচারি খিদেয় ঘুরছে সারাদিন
সেও হয়ে গেল লোভী প্রেমিকের তুল্য
ফুলগুলো সাজে পোকা মাকড়ের জন্য
রমণীরা এসে ছিঁড়ে গুঁজে দেয় খোঁপায়!

আঁধার রাত্রি কেন রহস্যময়ী?
দিনও জানে না, সে কেন শুধুই নগ্ন
ছ' মাইল গভীর তবু সমুদ্র অতল
নদীরা জানে না, তারাও নারী ও পুরুষ!

জল কণাটির হয়তো সাতটি রং
চোখ নেই, তার, নিজে সে বর্ণ অন্ধ
গাছের শিকড়ে শোনা যায় ফিসফিসানি
যার নাম মেঘ, সেই কেন হয় বৃষ্টি?

সময় জানে না সময়ের ইতিহাস
কার নাম দিন, ঘণ্টা ও পল, অনুপল
মাস ও বছর, শতক, সহস্রাব্দ
যারা ভাগ করে তারাও হারিয়ে যায়।

বিন্দু বিন্দু

উল্টোপাল্টা

এমন বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি ভাল্লাগে না
পরের বছর খরায় দেশের বাড়ল দেনা।
তেমন একটা ভূমিকম্প কতদিন যে হয় না
কালো টাকায় গিন্নিরা সব গড়িয়ে যাচ্ছে গয়না।

তাড়াহুড়ো

একটা জানলা বন্ধ ছিল, একটা জানলা খোলা
এদিকে কেউ মাথা ঠুকছে, ওদিকে পথ ভোলা
আলোর নীচে কালো ছুটছে, সবুজ মৃত্যুবাণ
ওরা শুধুই মরতে জানে, মৃত্যুতে খান খান।
মরার আগে কেউ কি বলল, দেখা হবেই আবার
এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে প্রয়োজন কি যাবার?

কেউ জানে না

দেশ হয়েছে স্বাধীন
এবার সবাই মনের সুখে লম্বা গোঁফে তা দিন!
বোমা ফাটল দুম ফটাস গোনাগুনতি পাঁচটা
ফিকফিকিয়ে হাসে অশোক গাছটা।
দেশ বিদেশে কত কী লোকে ভাববে
কেউ জানে না কী লেখা হল উপন্যাসে, কাব্যে!

বারবার প্রথম দেখা

নীরার হাত-চিঠি এল পড়ন্ত বিকেল বেলায়
আমি তখন হিজিবিজি জট-পাকানো সুতোর গিঁট খুলছি
তার মধ্যে একটি সদ্যস্নাত যুঁইফুল
ডুবন্ত মানুষ যেমন নিশ্বাসের জন্য আঁকুপাঁকু করে ওঠে।
আমিও সূর্যকে বললুম, আজ একটু দেরি করো
নীরা আমায় ডেকেছে, দিগন্তরেখা, আবছা হয়ে যেও না
জানলায় এত ঝনঝন শব্দ কীসের, ছিটকিনি, শান্ত হও

বইয়ের খোলা পৃষ্ঠা, প্রতীক্ষায় থাকো
আঙুলে কালির দাগ, লক্ষ্মীটি, অদৃশ্য হও
যুঁইফুলটি চেয়ে আছে, সদ্য-জন্মানো ঝর্নার মতো হাসছে
একটি ঝর্নার পাশেই বারবার নীরাকে আমার প্রথম দেখা
মেঘভাঙা দ্যুতি এসে পড়েছে তার চিবুকের রেখায়
নতুন বসন্ত-বৃক্ষের পাতার মতন তার চোখের আলো
তার বুকে দুলে দুলে উঠছে কৈশোরের সমুদ্র-স্নান
নীরার ডাক এসেছে, মেঘ, নিরুদ্দেশ যাও
দরজায় আর কে এসে দাঁড়াল, আমি কোথাও নেই
শব্দ তুমি থামো, বাক্ তুমি নিশ্চুপ হও
সমস্ত সুতোর পাক লণ্ডভণ্ড করে আমায় উঠে দাঁড়াতে হবে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে......।

সেই একদিন

একদিন গাছেরা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে
লতা গুল্মে শোনা যাবে ফিসফিস ধ্বনি
দোপাটি ঝাড়ের কাছে থেমে যাবে কিশোরীর হাত
ফুলগুলি খিলখিল করে হেসে উঠবে
একদিন সবাই জেনে যাবে মনে মনে
যার কাছ থেকে তুমি কিছু নাও, তাকেও কিছু দিতে হবে
একটা দোয়েল পাখি শিস শোনালে তাকে কিছু দেবে না?
নদীকে একটি গান, মাটিকে দু' ফোঁটা চোখের জল
ভোরের সোনালি আলো-কে আর কিছু না হোক
অন্তত একটি প্রণাম!

ঘণ্টায় ঘণ্টায়

মহাশয়, ঘণ্টিকীর
প্রথম সংখ্যাটি
দেখলুম। অবশ্যই
অতি পরিপাটি
এবং নিখুঁত প্রায়;
তবে ভয়ে ভয়ে
একটি ছোট প্রশ্ন করি,
অচিরে প্রলয়ে
পৃথিবী কি ধ্বংস হবে?
নচেৎ এমন
কবিতার ঘনঘটা
শব্দ উপমার ছটা?
যেন প্রাণপণ
এখুনি যা কিছু লিখে
এবং ছাপিয়ে—
দুনিয়া কাঁপিয়ে
দিয়ে চলে যেতে হবে!
এই নব্য রীতি
দেখে বড় ধাঁধা লাগে!
নিবেদনমিতি।

বৈজ্ঞানিকের বাজি

টাইটান উপগ্রহে কি প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে?
এক সরাইখানায় বসে বাজি ধরেছে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক
কত দিন, কত দিন, ততদিনে কি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে সব প্রাণ?
একে একে পৃথিবী থেকে অনেক প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে
অরণ্যগুলি কৃশ হতে হতে অদৃশ্য
মানুষের সংখ্যা অবশ্য বাড়ছে, উল্কার মতন ছুটে এসে সেই
সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শূন্যের পর শূন্য
মহাশূন্যে এখনও পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ
যদিও সে জানে, তার নিজেরই মধ্যে রয়েছে ধ্বংসের বীজ
খাঁচায় সাদা ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা যেমন আত্মধ্বংসে মাতে
যদুবংশ যেমনভাবে ধ্বংস হয়েছিল
সমগ্র মানববংশ থেকে মুছে যাচ্ছে বাৎসল্য
শিশুদের খুন করতেও আজ তাদের হাত কাঁপে না
এই তো চিহ্ন, এই তো সেই শেষ মারণযজ্ঞের শুরু
জনসংখ্যার শূন্যগুলো মুছে গিয়ে পড়ে থাকবে শুধু শূন্যতা
তারপর টাইটান উপগ্রহ থেকে নেমে আসবে অন্য প্রাণ?
কিন্তু তখন কোথায় সেই সরাইখানা, বাজি জেতার জন্য
কে বসে থাকবে?

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা

সূচি

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তি

এখন অনেকের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে,
কী, শরীর ভালো আছে তো?
কেন এত শরীরের কথা?
যতই শুভার্থী হোক তবু তাদের ব্যগ্রতায় ফুটে ওঠে
একটি সরল সত্যের আভাস
আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, এবার কবে কখন
টুক করে কেটে পড়তে হবে ঠিক নেই!
প্রকাশ্যে নানা রকম পোশাকেই তো ঢাকা থাকে শরীর
তবু তার সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে
মানুষের কত কৌতূহল
কিন্তু শরীরের কথা তো অন্যদের বলতে নেই
সেটা ঠিক রুচিকর নয়
কেমন আছো? এর উত্তর শুধু, ভালো
সেটা কি শরীরের না অস্তিত্বের সংবাদ, বলা শক্ত?

যতই আয়ু বাড়ে, ততই মানুষ অনেক কিছু হারায়
মাঝে মাঝে একলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবি সেই কথা
জীবনের যাত্রা শুরু যাদের সঙ্গে, তাদের অনেকেই আজ কোথায়?
বাবা, মা, ছোট মাসি, কৈশোরের নর্মসঙ্গিনীরা
উত্তর জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, যাদের সঙ্গে দেখা না হলে
দিনটাই মনে হত ব্যর্থ
তারা দূরে সরে যেতে যেতে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তের ওপারে
কেউ ফেলে গেছে এক জোড়া চটি, মানুষটি অদৃশ্য
গৌহাটি থেকে যার চিঠি এসে পৌঁছোল সোমবার
সে আগের শুক্কুরবারেই নিশ্বাস সব খরচ করে ফেলেছে
অথচ চিঠিতে আগামী দিনকালের কত স্বপ্ন ছিল!

শুধু বান্ধবকুল নয়, একদিন এই দেশটাও তো ছেড়ে যেতে হবে
দেশ? দেশ বলে কি সত্যিই কিছু আছে?

সবটাই তো অলীক
কাঁটাতারের বেড়া আর বন্দুক ওঁচানো পাহারা দেওয়া
ভূমির নাম দেশ!
আমি যদি দৈবাৎ জন্ম নিতাম বেলুচিস্তানে
তবে আমি খেলা করতাম পাহাড়ের গুহায়?
তা হলে জন্মটাই কি আসল
মানুষের জন্মও তো ক্রোমোজোমের খামখেয়াল
মাতৃগর্ভে আমার কোনও দেশ ছিল না
আমার জনক-জননীও দেশের কথা চিন্তা করেননি
শিশুরা নাকি সব স্বর্গ থেকে আসে
কিন্তু স্বর্গ কারুর স্বদেশ হয় না
কৈশোর পেরুতে না পেরুতেই স্বর্গ টর্গ মুছে যায়
ঝলসায় বড় বেশি রোদ, চচ্চড় করে পুড়তে থাকে চামড়া
সহজ পথগুলো জটিল হয় ক্রমশ
ঈশ্বরও টালমাটাল হয়ে পড়ে চার্বাক দর্শনে
অথবা মার্কসবাদে
নারীরা টান মারে, যখন তখন বুকে বেঁধে তির
এর মধ্যে দেশ কোথায়?
জন্তু-জানোয়ারেরা অনুভূতি দিয়ে যেমন বোঝে টেরিটরি
তারই নাম কি মানুষের দেশ?

ইহজীবনে চোখ দুটো থাকে সদাব্যস্ত
আঁচলের বাতাস ও অন্যান্য খেলাধুলো ছাড়িয়ে
দৃষ্টি চলে যায় ক্ষণে ক্ষণে অনেক দূরে
গোঁফ দাড়ি না গজালে নিসর্গকে ঠিক ঠিক চেনা যায় না
স্বর্ণাভ গোধূলি ও নীল রঙের ভোর, গাছপালার
রহস্যময় নীরবতা
ভোমরা আর মৌমাছির মতন কালচে রঙের কুরূপ পতঙ্গেরা
অপরূপ সব বিউটি কনটেস্টের ফুলগুলিতে ছড়িয়ে যায় প্রেম
আর মাছরাঙার ডানায় কেন এত অপ্রয়োজনীয় রং
এই সব দেখি, আরও দেখি প্রকৃতির অন্য সন্তানদের
ফসল কাটা হয়ে গেছে, এখন খাঁ খাঁ করছে মাঠ

শীতকালে বাঁধের ওপর উবু হয়ে বসে থাকা সারি সারি মানুষ
দীর্ঘশ্বাস নয়, তারা মাঝে মাঝেই থুতু ফেলে
হৃদয় ট্রিদয় নয়, চোখই চিনতে পারে ওদের পরিচয়
সকালে আমি যখন বেগুন ভাজা দিয়ে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাই
চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাঁধের সেই মানুষদের মুখগুলি
ওদের রুটি নেই, বেগুন ভাজাও নেই
এতদিনে তো জেনে গেছি, যারা খিদে চেপে রাখে তারাই
বেশি থুতু ফেলে
যেমন রমজানের মাসে রোজার উপবাসীরা
কিন্তু তাতে আমার কী দায়িত্ব, আমার কী আসে যায়
মানুষ তো স্বার্থপর প্রাণী, সারাজীবন ধরেই চলে আত্মরক্ষা
তবু এই যে উতলা হওয়া, এরই নাম কি দেশের টান?
ঠিক বিশ্বাস হয় না, এ তো ক্ষণকালের ঝলকানি
একটুখানি অন্যমনস্কতা, তাও চোখেরই কারসাজি
কোনওদিন তো নিজের ভাগের রুটি বাঁধের মানুষদের
দিতে যাইনি
তত্ত্ব তৈরি করেছি, চ্যারিটিতে সমস্যার সমাধান হয় না
বরং বেড়ে যায়
তার চেয়ে মাঝে মাঝে মিছিলে পা-মেলানো অনেক সহজ
তাতে একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক আর বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যায়
আমি সব মিছিলেরই মাঝপথের পলাতক
তবু অন্যান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞদের দেখে কিছুটা কৌতূহলী আর
অনেকটাই মুগ্ধ হয়েছি
কোনও মিছিল এক সময় ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে, কোনও মিছিল
সংসদের শীত-তাপ নিয়ন্ত্রণে
ওরা দেশকে চিনতে পেরেছে, আমি পারিনি।

হ্যাঁ, যেতে তো হবেই, বেশ কাটল এতগুলো বছর
পরলোককে চুরমার করেছি অনেক আগেই
আত্মার অবিনশ্বরতা এক ছেলেভুলোনো রূপকথা
আত্মা ফাত্মা কিচ্ছু নেই, যেমন মানুষের বুকে থাকে না হৃদয়

একটা টুলু পাম্পকে হৃদয় বলে কত না আদিখ্যেতাই করা হয়েছে
বহুকাল ধরে
মাথা সর্বস্ব এই প্রাণী
সেই মাথার একদিকে কঠোর যুক্তিবোধ
অন্যদিকে কী চমৎকার উপভোগ্য অন্ধ বিশ্বাস
একদিকে মহাবিশ্ব, অন্য দিকে মন্দির-মসজিদ-গির্জা
আমি বেদ-উপনিষদের বদলে মেনেছি জৈমিনির মীমাংসা
এপিকিউরিয়ান দর্শনের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি জীবনযাত্রার
দৃশ্যমান জগৎকে দেখেছি স্পিনোৎজার চোখ দিয়ে
ভালোবাসাকে বসিয়েছি সবচেয়ে উঁচু, অদৃশ্য সিংহাসনে
সেই ভালোবাসা শরীর সর্বস্ব আবার শরীর বিরহিত
তবে, ভালোবাসার মধ্যেও কি ছোটখাটো মিথ্যে থাকেনি
সেই সব মিথ্যে বাদ দিলে সব কাব্য সাহিত্যও তো তুচ্ছ
মিথ্যে আর সত্য কতবার জায়গা বদলা বদলি করেছে
যেমন অনেক উপভোগের মধ্যে থাকে দুঃখ, কত কান্নার মধ্যে আনন্দ

কোনও পরিতাপ নেই
ভুল তো করেছি অনেক, সেসব মানুষেরই ভুল
একটু আধটু অহংকার, আবার উপলব্ধির থাপ্পড়
সিঁড়িতে ওঠার একাগ্রতায় ভুলে গেছি পাশ ফিরে তাকাতে
রূপ দেখেছি, বুঝিনি রূপের আড়াল
তবে একটা পাশবিক অন্যায় করিনি কখনও, নিজে ক্ষতবিক্ষত
হয়েছি অনেকবার
কিন্তু অন্যের রক্তদর্শন করার ইচ্ছে হয়নি...
পাশবিক? ছিঃ, এটা বলা ঠিক হল না।

কেউ যখন জিজ্ঞেস করে, শরীর কেমন আছে?
তক্ষুনি উত্তর না দিয়ে মনে মনে বলি:
যাচ্ছি, যাচ্ছি, এত ব্যস্ততার কী আছে?
পৃথিবীতে মানুষের পা ফেলার জায়গা কমে যাচ্ছে
জায়গা তো ছেড়ে দিতেই হবে

যাচ্ছি, যাচ্ছি, তবে ফুরফুরে মেজাজে, প্রিয় মানুষদের
কিছু না জানিয়েই যেতে চেয়েছিলাম
তবে বুকের ওপর কেন চেপে আছে একটা বিষণ্ণ পাথর
মায়া? পিছুটান?
জানলার কাছে দাঁড়ালেই চোখের সামনে ঝলসে ওঠে
একটা ছবি, আমি কেঁপে উঠি
দেশ টেশ মানিনি, পৃথিবীকে নিয়েও নিছক ভাবালুতা ছাড়া
আর বেশি সময় ব্যয় করিনি
তবু এতকাল পরে কী করে ফিরে এল দেশ-দেশান্তর
চতুর্দিকে এত রক্ত, পশুরা হাসছে মানুষের হিংস্রতা দেখে
আকাশ থেকে, সমুদ্র থেকে, জঙ্গল থেকে চলেছে মানুষেরই হাতে
মানুষের হত্যালীলা
বলতে তো পারতাম, তাতে আমার কী আসে যায়, আমি তো চলেই যাব
কেন মন তা মানছে না
রক্তের ফোয়ারা, রক্তের নদী, তাতে ডুবে যাচ্ছে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস
এই দৃশ্য চোখে নিয়ে চলে যেতে হবে
এত কষ্ট, আঃ, এত কষ্ট, সত্যিই বুকে কষ্ট হচ্ছে খুব!

চতুর্থ বাঁকের পর

প্রথম বাঁকে একটা পাথরের সিংহাসন
তার ওপরে একটা পল্লবিত দেবদারু
এখানে কেউ যোগ চিহ্ন দিয়ে লিখে গিয়েছে দুটি নাম
অস্পষ্ট হয়ে আসছে সেই নাম, চিহ্নও বদলায়নি তো?

তারপর অনেকটা খাড়া চড়াই
নিশ্বাস যখন বেশ দ্রুত, তখনই দ্বিতীয় বাঁক
এখান থেকে দেখা যায় উপত্যকা, তার সর্বাঙ্গে
ছোট ছোট ক্ষত

এ জায়গাতেও বিশ্রামের জন্য থামবার দরকার নেই
তুমি আমার হাত ধরতে চাও, এই নির্জনতায় কাঁধে হাত রাখো
জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, সেফটিপিনে আর কতক্ষণ আটকাবে
ওপর থেকে যারা নামছে, তারা চোখে চোখ ফেলছে না
অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত

তৃতীয় বাঁকে বসে আছে পিঠ ফেরানো তিন ছায়ামূর্তি
এক রাশ ঝরা পাতা, কয়েকটা ন্যাড়া গাছ
কেউ ফেলে গেছে একটা হাত-ভাঙা পুতুল
তোমার চোখে কেন জল? আর কেউ সঙ্গে আসবে না
আর সবাই ছড়িয়ে গেছে দিগন্তের নানা প্রান্তে
শোনা যাচ্ছে অনেক কণ্ঠস্বর, দেখা যাচ্ছে না কারুকে।

চতুর্থ বাঁকের কাছটা খুব সরু
খাদের দিকে তাকিয়ো না, কে যেন বলেছিল
ঠিক এইখানেই রিপুভয়, তবু এখানেই একবার বসতে হয়
তুমি আঁচলের বাতাস খাচ্ছ, আমার চোখে ঢুকেছে ধুলো
দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে পথ, তুমি কেন দূরে সরে যাচ্ছ
ডাক শুনতে পাচ্ছ না আমার? আমিও তোমার ডাক
এখানেও রয়েছে মরীচিকা, তার গোপন হাতছানি
তুমি ভুল করে অন্য পথটায়, কিংবা আমিই পথ ভুলেছি
কার কতটা ভুল, কে কার থেকে দূরে
এখানে উপত্যকার সব ক্ষত ঢেকে গেছে, ওড়নার মতন
ছড়িয়ে আছে মাধুরী।
বড় ভয়ংকর মোহময়, ইচ্ছে করে ঝাঁপ দিতে
দৌড়ে এসে কে কার হাত ধরল?
আরও অনেকগুলো বাঁক, কমে যাচ্ছে আয়ু
তবু ওপরে যেতে হবে, আরও অনেক ওপরে
জয় করতে হবে শিখর, সে শপথ মনে নেই?

পাহাড়ের রেলগাড়ি

এ যেন পাহাড়ের ওপরে ওঠা রেলগাড়ি
খানিকটা এগোয়, আবার কিছুটা পিছিয়ে আসে
উপমা: মানব সভ্যতা।

কখনও তরতর করে বেশি ওপরের দিকে উঠতে গেলে
ভেঙে পড়ে যায় নীচে
উপমা: মিশর, ব্যাবিলন।

কখনও এক একটা ধ্বনি ওঠে, মানুষ হাতে হাত মেলায়
এ ওকে আলিঙ্গনে টানে বুকের কাছে
আধখানা শতাব্দী যেতে না যেতেই
সেই সব হাতে ঝলসে ওঠে ছুরি।

কখনও জমাট পাথরের বুক থেকে বেরিয়ে আসে শিল্প
অরণ্যে ধ্বনিত শব্দব্রহ্ম
আবার পাহাড় উড়ে যায় বিস্ফোরণে, বিকট দামামায়
কানে তালা লাগে

কখনও সব কামরায় হুড়মুড় করে উঠে পড়ে
টিকিট না কাটা যাত্রী
রাজতন্ত্রকে চিবিয়ে, চুষে খায় গণতন্ত্র
আবার এক একটা যুগে গণতন্ত্রের পিঠে চাবুক কষায়
দু'-একখানা নেপোলিয়ান আর হিটলার

কখনও সমস্ত মানুষের সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি
স্বপ্নের একখানা ছবি হয়ে দোলে
আবার স্বপ্নের মতনই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সেই ছবি।

কখনও মানুষ হয়ে ওঠে নরদানব, তারা মানুষেরই রক্ত চাটে

কানাকড়িতে বিকোয় মনুষ্যত্ব
উপমা: ইরাক, পালেস্তাইন

তবু কি শোনা যায় কু ঝিক ঝিক শব্দ
রেলগাড়িটা আবার ওপরে উঠবে
নাকি এখন মহাশূন্যযান, মহাশূন্যেই পরমাগতি!

এই সব লিখে চলেছি, আমি একজন দুঃখী মানুষ
সভ্যতার জারজ সন্তান
আজ আমার মন খারাপ পাতালমুখী...

ছন্দ-মিলের বন্দনা

ছন্দে লিখতে চাইনি, তবুও শব্দ প্রণয়াবদ্ধ,
এ ওকে দোলায়! আঙুলের দোষ? লেখনী স্বাধীন? শ্রীমতী
তুমি কি চাইলে ঝর্না কলমে ঝর্না জাগুক সদ্য?
যদি তাই হয় তার পরে আর মিল দিলেই বা কী ক্ষতি!

ভয় হয় কেউ বলবে এমন পুরনো রীতির স্তোত্র
পাথরের গায়ে মানায় হয়তো, কিন্তু রক্তমাংস?
এসব কবিরা দাড়িওয়ালা সব প্রাচীন কবির গোত্র
রূপের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় শরীরের অর্ধাংশ!

ছিল একদিন, হাটে বাজারের মানুষের মণিমুক্তো
কুড়িয়ে গেঁথেছি কবিতায়, যত কর্কশ তত স্বস্তি
তুই-তুকারিতে শ্রীমতী সেদিন অরুণ বর্ণ মুখ তোর
রাজপ্রাসাদকে বানিয়ে তুলেছি সব-হারাদের বস্তি।

ছন্দ মিশেছে জুতোর ধুলোয়, মিলকে দিয়েছি ফুৎকার

বেশি উপমার বাড়াবাড়ি হলে, গিয়েছি সটান গদ্যে
চাঁদ বিলুপ্ত, যে-কোনও সময় বর্ষণ হত উল্কার
গুরু ও চাঁড়াল, চোর-সন্ন্যাসী, মিশেছে বিষ ও মদ্যে!

আজ কি শ্রীমতী উদাস লাস্যে সব কিছুকেই না-মানা
সমুদ্রতীরে আমাকেও ভুলে আরও দূরে চলে যেতে চাও?
শিল্প বিভায় ক'টি মুহূর্ত ছোঁবে অনন্ত সীমানা
ছন্দ-মিলের এই বন্দনা, সখী, করতল পেতে নাও!

এক সন্ধে থেকে মধ্যরাত্রি

১

আয় মন বেড়াতে যাবি
কল্পতরু গাছের অভাব নেই, চতুর্দিকেই চারি ফল ছড়ানো
কুড়িয়ে খেলেই তো হয়
কিন্তু মুশকিল হয়েছে দুটি নারীকে নিয়ে
বেড়াতে বেরুলে কক্ষনও দুই রমণীকে সঙ্গে নিতে নেই
রামপ্রসাদ কী ভুলটাই না করেছিলেন
এক নারী একটু গায়ে গা ঠেকিয়েছে না ঠেকায়নি
অমনি অন্যটির মুখ ভার, সরে যাবে দূরে
আবার তাকে কাছে টানতে গেলে সে সজোরে ঠেলে দেয়
নিছক অভিমানে নয়, তার নামই যে নিবৃত্তি
ধর্ম আর অর্থ চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যায়
কিন্তু কাম তো তা নয়, তার লাগে প্রেম নামে এক ঝাল-মিষ্টি আচার
তখন যে তরুণীটি শরীরিণী হয়, তার নাম প্রবৃত্তি
তার লাস্যে এত মোহ
আমার এই এক জীবনে সেই মোহ থেকেই অতৃপ্তির শোধ হল না
তাই চতুর্থ ফল মোক্ষটোক্ষ নিয়ে মাথাই ঘামানো
হল না কখনও

বিশ্বাস করুন রামপ্রসাদ সেন মশাই
আমার এই লেখাটি এক পলকে পড়ে নিয়ে
হাততালি দিয়েছেন সবুজ রঙের প্রকৃতিদেবী
আপনার মতন সাধকরা তো তাঁকে চিনলেনই না!

২

আসলে নেই তেমন কোনও গর্জমান নদী
যদির সঙ্গে মিল দেব না মরে গেলেও, নিরবধি তো নয়ই
ছেলেবেলার ছোট্ট চোখে সবই তো ছিল বৃহৎ
সৃষ্টিরও তো বাল্যকাল, আকাশে পক্ষিরাজ।

৩

আয় রে আয়, ছেলের পাল, খিচুড়ি খেতে যাই
যে-যার চাটাই বগলে নিয়ে পাত পাতব ভাই
আয়রে আয়, ঘণ্টা বাজে, পেটে আগুন খিদে
আমিনা দিদি, লেবু চাই না, একটুখানি ঘি দে!
পোড়া কপাল, ঘি খেয়েছেন, বাপ-দাদারা কবে
তেমন ভাগ্য তোদের ভাগ্যে আর কোনও দিন হবে?
গরম গরম খেয়ে দেখ না, একটু একটু করে
বাঁধাকপির তরকারিটা আসছে একটু পরে।
ছি ছি ছি ছি দিদি রাঁধতে শেখেনি
খিচুড়িতে তেল দেয়নি, তরকারিতে চিনি!
রাঁধতে শিখিনি যে তবু খেলি অনেক হাতা?
আমিনা দিদি, তোমার জন্য স্বর্গে আসন পাতা!

৪

খুল যা সিমসিম, অ্যাবরা ক্যাডাবরা, ছু মন্তর
এই যে দেখে নাও, দরজা খুলে গেছে, গোপন নেই
না দেখা ছিল ভালো, চক্ষে ধাঁধা লাগে অসম্ভব
রক্ত মাংসের বাইরে আরও কিছু এত গভীর!

সিঁড়ির পর সিঁড়ি, বাঁকের পর বাঁক, গহন পথ
আলো ও আঁধারির এমন অপরূপ শব্দময়
শব্দ ঢেউ তোলে, শব্দ ছবি আঁকে নিরন্তর
এ কার মহাকাশ, সীমানাহীন সীমা, অলীক নয়!

না দেখা ছিল ভালো, চক্ষে ধাঁধা লাগে, অসম্ভব!

৫

আমাদের গেস্ট হাউজের চাতালে উথালপাথাল করছে
একটা আলকেউটে
মাটি ছেড়ে সিমেন্টে এসে সাপটাই পড়েছে মহা আথান্তরে
আমরা ভয়ে এগুতে পারছি না, সে বেচারিও পালাবার পথ
ভুলে গেছে
কে যেন চেঁচিয়ে বলল, ক্যামেরা, ক্যামেরা।

নিরাপদর ছেলে কালাচাঁদ ফিরে আসছে হাতে দুধের
ঘটি ঝুলিয়ে
ও খোকা, এখন আসিস না, দাঁড়া, দাঁড়া উঠোনে সাপ
দশ বছরের ছেলেটি যে আসলে বদ্ধ কালা তা আমরা
ভুলে গেছি
কিংবা যার মনে আছে, সেও ইচ্ছে করে চ্যাঁচাচ্ছে?
আমার মনে পড়েছিল, কিন্তু আমার হাতে ক্যামেরা, আমার তো

অন্য দায়িত্ব নেবার কথা নয়
নিরাপদ কেন সিগারেট আনতে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেও
ফিরছে না
সব দোষ তার!

৬

শুধু মাঠ, সবুজের ঢেউ, তবু কেন বুক কাঁপে?
জন্মের পর কান্না, তা কি মনে পড়ে যায় অন্য মনস্তাপে
উদ্ভিদের মতো আমি মাথা তুলে উঠেছি এ ভূমি, জলকাদায়
এই বাংলায়
ঝিনুক তোলার জন্য ডুবে গেছি অনেক গভীরে
বুলবুলি পাখির ডিম চুরি করে, ফের রেখে এসেছি সে নীড়ে
পুকুরের জলে চাঁদ ডুবে যায়, আবার চকিতে ঠিক ভাসে
ঝড়ের সুগন্ধ আমি পেয়েছি যে কতবার পশ্চিমের উড়ন্ত বাতাসে।

সবুজের বুক চেরা হাইওয়ে, গাড়ি থেকে নেমে আমি দাঁড়িয়েছি
একা
কেন চোখে জল আসে, কেন মনে হয়
আমি এই পৃথিবীর কেউ নয়।

৭

শেষ কয়েকটি নিশ্বাস ফেলার আগে
বাবা বললেন, আমি এবার বাড়ি ফিরে যাব
বাড়ি? কোথায় বাড়ি? আমরা থাকি কলকাতায় পাখির বাসায়
ভাড়াটে, লঝঝরে একতলায়
বাড়ি যাকে বলে, সে তো লুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল আগে
সে এখন অন্য দেশ
বাবা কি তবে রূপক অর্থে বলছেন, কিংবা স্বপ্ন দেখছেন স্বর্গের?

এ সময় খুব মেপে মেপে নিশ্বাস খরচ করতে হয়
বাবা অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, বড় অশ্বথগাছটার
পাশ দিয়ে রাস্তা
সিধু ধোপার টিনের ঘর, পাটখেত
বারোয়ারি পুকুরের ঘাটে দাঁতন করছেন
চৌধুরীমশাই
গন্ধ লেবুর বাগানের পাশে একটা জম্বুরা গাছ
রান্নাঘরের দাওয়ায় উনুনে পায়েস চাপিয়েছেন মা, মা ঠিক জেনে গেছেন
আমি আজ আসব
এই তো এসে গেছি, মা

এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতি নিয়ে চলে যাওয়াও তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়!

থমকে দাঁড়াবার অধিকার

হাওয়ায় কীসের যেন সুর
বাদল দিনের বাতাসও বোধহয় শিখে নিয়েছে
গোটা কতক রবীন্দ্রসংগীত
এমন দিনে জানলার দিকে চেয়ে যে বসে থাকব
তার কি উপায় আছে
দু' কান ধরে টান মারছে বস্তু বিশ্ব
খবরের কাগজে চটচট করছে রক্ত
আমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার জন্য
ধেয়ে আসছে মধ্যসত্ত্বভোগীরা

তুমি কবিতা লিখছ
তুমি কি পরিব্যাপ্ত সময় সম্পর্কে অন্ধ থাকতে চাও?
'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'
পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াবার অধিকারও হারানো যায়?

ফসলের খেতে রাহাজানি হলেও কি ঘাসের ডগায়
শিশিরবিন্দু জমে থাকবে না?
শরীরলোভী, তোমার নিজেরও তো শরীর খারাপ হয় কখনও

একটা না একটা সীমানা, তুমি এক একবার এপারে
এক একবার ওপারে
কবিতা থেকে যখন তখন থেমে যায় কলম
যেন একটা মুক্তোর মালা হঠাৎ ছিঁড়ে সবগুলো গড়িয়ে গেল...
ধুলোর মধ্যে আঙুলের দাগ
ওদিকে কোথাও জলের ছলোছল শব্দ
কান্না?
নাকি কারুর আলতাপরা পায়ের ঘুঙুর
অসমাপ্ত কবিতা তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

মনে পড়ে প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে

কবিতা লেখার আগে চুপ করে বসে থাকি
মনে পড়ে প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে
কার প্রতিশোধ এই চুপ করে বসে থাকা।
সকালে পায়ের পাতা শিরশির করে উঠে
বুকের ভিতরে কাশ, অসরল প্রতিটি নিশ্বাস
কিছু নিরুত্তাপ আজ বিদেশের চিঠি, মনে পড়ে
প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে কার প্রতিশোধ
এই চুপ করে বসে থাকা।

বরুণার বিয়ে কাল, অথচ ২৪ ঘণ্টা হরতাল
ছ'রকম ভয়ে কাঁপে সাতজন, সেনবাবুদের মেজো ছেলে
পরশু বিকেল থেকে ফেরেনি বাড়িতে, না ফিরুক, আমি তার

জন্য দায়ী নই, আমি গুলি চালাবার জন্য দায়ী নই, আমি
দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী নই, বিনয় কোথায় থাকবে আজ রাত্রে
আমি দায়ী নই, যে যেখানে মরুক বাঁচুক—
পৃথিবী উচ্ছন্নে যাক, দেবালয় থেকে স্বর্ণ চুরি হোক
স্পেনের মৃত্তিকা যাক নেভাডায়, তাসখণ্ড খণ্ড খণ্ড হোক
আমি কেন দায়ী হব? আমি শুধু বেঁচে থাকব, আমি
মহা স্বার্থপর হয়ে বেঁচে থাকব, যতদিন পারি।
শান্তিনিকেতনে যদি পুরোপুরি দোল খেলা হয়
তা হলে আমার লেখা কেন থামবে? আমি টেবিলের
কাছে বসে থাকি।

কিন্তু বড় চুপ করে বসে থাকা; মনে পড়ে
প্রতিশ্রুতি, মনে পড়ে কার প্রতিশোধ
এই তিক্ত, অপমানে অতি রুক্ষ ব্যর্থ বসে থাকা।

এক একদিন

এক একদিন ঘুম ভাঙলে আচমকা মনে হয়,
এখন সন্ধে না সকাল?
এটা কোন দেশ?
এ কার বালিশে আমার মাথা
কিংবা বালিশটা আমার হলেও মাথাটা কার?

এক একদিন মনে হয়, দুনিয়ায় আমার
একজনও চেনা মানুষ নেই
অচেনা লোকেরা আড়চোখে তাকিয়ে চলে যায়
কোথায় যেন একটা সেতু ভেঙে পড়ছে
কিন্তু আমার তো কোনও নদী নেই
কারুর কান্না শুনলে মনে হয়

আমিই সে জন্য দায়ী
অথচ কী অপরাধ করেছি জানি না
বাতাস আর বকুল গাছের শাখায় কী সব কথা
কানাকানি হয়
সারবদ্ধ পিঁপড়েরা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে উলটো দিকে ফেরে
কোনও দিঘির বুকজলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী
তার চোখ খোলার প্রতীক্ষায়
কেটে যায় অনন্তকাল!

এক একদিন হাওয়ায় অজস্র পাখির মতন
উড়তে থাকে চিঠি
তার একটাও আমার জন্য নয়!

নদীর ধারে নির্জন গাছতলায়

ফুলের বাগানে গভীর রাতে লুকিয়ে বসে আছে একটা চোর
মৃদু জ্যোৎস্না, পাতলা অন্ধকার, ওড়াউড়ি করছে পেঁজা তুলোর মতন মেঘ
হঠাৎ দু'-একটা পাখিও ডেকে ওঠে
নিশীথ কুসুমের তীব্র গন্ধ কেমন আবেশময়, সেই গন্ধ কি
ওকে সম্মোহিত করতে পারে না?
চোর হলেই কি তার থাকবে না সৌন্দর্যবোধ?

দিন দুপুরে একটা সাত বছরের বাচ্চা মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল
একজন মুখোশধারী
ওরা মুখোশ পরেছে, পরুক, কিন্তু অতটুকু বালিকার
মুখের হাসি কি ওরা দেখে নি?
গলা টিপে সেই হাসি মুছে দিতে গিয়ে ওদের বুক কাঁপবে না?

তোমার হাতে তলোয়ার থাকলে তোমার শত্রুরও একটা থাকবে

তারপর মুখোমুখি হবে লড়াই
এটাই তো মানুষের নিয়ম
যারা পেছন দিক থেকে আঘাত হানে
নিরস্ত্রকে পুড়িয়ে মেরে অট্টহাসিতে হাওয়া কাঁপায়
তারা কি মানুষ?
জনসংখ্যা যত বাড়ছে, ততই মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে?

এই সব কথা মনে এলে কোনও খাদ্যে আর স্বাদ থাকে না
সব সুরই মনে হয় বেসুরো
সব গাছ থেকে ঝরে যায় ফুল, শিকড়ে লাগে পোকা
নদীর ধারে নির্জন গাছতলায় এখনও কি কেউ
আপন মনে বাঁশি বাজায়
তার প্রতীক্ষায় বসে থাকি।

চোখ ঢেকে

যে যেমন জীবন কাটায়
তার ঠিক সেই রকম এক একটি পোশাক রয়েছে
আলো ও হাওয়ার মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে কে যে
আনন্দ-ভিখারি
উড়ুনি ভিজিয়ে সেও বিধ্বংসী নদীর থেকে
শান্তি চেয়েছিল
সহসা বিদ্যুৎ-স্পর্শে চোখ ঢেকে আমিও একদা
অচেনা প্রান্তরে একা ছন্নছাড়া, সমূলে দেখেছি
দিগম্বর মৃত্যু স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সার সত্য

আজ দশতলার জানলায় আমি হু-হু করা কোমল বাতাস খাচ্ছি
এই তো আমিই হাঁটছি আলপথে, বুকে পিঠে গড়াচ্ছে ঘাম
এখন আমার হাতে গরম পানীয়ের গেলাশ। সামনে কাজু
এই আমার হাতেই আমানির শানকি, সঙ্গে শুকনো লঙ্কার টাকরা
কারা যেন আসছে আমাকে কোথাও সম্বর্ধনা দিতে নিয়ে যাবে
আমিই তো এক পরিবারে না-পোষা বেড়ালের মতন লাথি-ঝাঁটা খাওয়া
সৎ ভাই
আকাশে গুমগুম শব্দ, আবার বুঝি আমাকে উড়ে যেতে হবে
এই আমিই তো এক দিঘির ঘাটলায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি
জ্ঞান নেই
সেই পুকুরটা দেখতে গিয়েছিলাম বহু বছর পর
মানুষের মতন দিঘিরাও নিরুদ্দেশে যায়...

আমি ভূগোল থেকে ইতিহাসে যাতায়াত করতে গিয়ে
কতবার পড়েছি মুখ থুবড়ে
এক সভ্যতার সংসার থেকে বেরিয়ে অন্য সীমান্তের তারকাঁটায়
এক জীবনের মর্ম খুঁজতে খুঁজতে পিছলে যাচ্ছে ভালোবাসার অণু-পরমাণু
বিশ্বাস হারিয়ে যাওয়ায় প্রবল বেদনায় এত শীত
মাঝে মাঝে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছি জলের সামনে, যেখানে ছবি ভেঙে যায়
তারপর একদিন মেঘলা দুপুরে ঝলসে ওঠে সেই সার সত্য
বেঁচে থাকা ছাড়া আসলে আর কোনও গভীর সত্য নেই!

রাত্রির কবিতা

বেশ রাত ছাড়া কবিতা লেখা যায় না, কেন না
সব সকালগুলোই বড় কর্কশ
ভোরবেলা খবরের কাগজ ছুঁলেই হাতে রক্ত লেগে যায়

মানুষের রক্ত
তার আগে চিল-চিৎকার কিংবা কাকের ডাকে ঘুম ভাঙে
শহরে দোয়েল কিংবা টুনটুনি থাকে না
আমার চোখেও লাল আভা
একজন সংসার-লোভী আর একজন সংস্যার-ত্যাগী
দরজায় এসে দাঁড়ায়
তারা কথা বলে চাঁচাছোলা গদ্য ভাষায়
একজন সাপুড়ে আর একজন বাঁদরওয়ালা বসে থাকে রাস্তায়
দু'পা এগোলেই হাঁ করে আছে একশোটা দোকান
ট্রাম ও বাসের শব্দে কণামাত্র সুর নেই
দুনিয়ার কোথাও নেই কণামাত্র কবিতা
আমি অপেক্ষা করি রাত্রির জন্য
গভীর রাত, কোনও সঙ্গিনী না থাকলেও
সেই রাত্রিই হয়ে ওঠে নারীর মতন
আমাকে তার খোলা বুক দেখিয়ে আদর করতে ডাকে
প্রতিটি চুম্বনে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু কবিতা...

সুড়ঙ্গের ওপাশে

সুদীর্ঘ সরল একটা সুড়ঙ্গের ওপাশে একটু একটু আলো
কয়েকটি ছায়ামূর্তি হাত-পায়ের ন' দশ রকম
ভঙ্গিমায় খুব ব্যস্ত
অন্ধকারের গায়ে বিদ্যুতের মতন রং, ওরা কাকে ডাকে?
শব্দহীন এক উল্লাস, যেন মুক্তির হাতছানি
আমি কি অত দূরে যাব, না পিছনে ফিরব?

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য এই দৃশ্য, তারপরই পর্দায়
অন্য ছবি

বইঘেরা ঘর, টি ভি, টেলিফোন, মদের গেলাসের সামনে আমি
বাইরের কাটাকুটি রাস্তায় ঝলমলে আলোতে কোলাহল করছে
শহুরে রাতের পৌনে আটটা
ব্রিজ পেরিয়ে মফস্‌সল পর্যন্ত কংক্রিটের টংকার
মানুষের গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষিতে উৎপন্ন হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ
আবার এরই মধ্যে চার-দেয়াল ঘেরা একাকিত্ব
অথচ মন খারাপ নেই, মিহিন বৃষ্টির গুঁড়োর মতন
দেখা যায় না এমন ঔদাসীন্য...
সুড়ঙ্গের ওপাশে ওরা ডাকে, ওরা ডাকে...

সবই অসমাপ্ত

আড্ডা যখন ক্রমে জমে উঠে, তখনই বাড়ি ফেরার তাড়ায়
আড্ডা ভাঙতে হয়
তার আগে বাজে খরচ হয়ে যায় অনেকটা সময়
সুদীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে এসে দুর্ঘটনা হয় হঠাৎ
বাড়ির খুব কাছে
সমস্ত আসরের মধ্যে টের পাওয়া যায় একটা অন্ধকার
বিন্দু
লুকিয়ে আছে।
ভালোবাসার মর্ম বুঝতে বুঝতে, হঠাৎ এ কী,
ফুরিয়ে যাচ্ছে জীবন
জয়-পরাজয় নির্ণয় হল না, তার আগেই আত্মসমর্পণ!

মনে পড়ে রবীন মজুমদারের গান, জীবন এত ছোট কেনে?
ভালোবেসে মিটিল না সাধ...
ভালোবেসে মিটিল না সাধ...
ভালোবেসে মিটিল না সাধ...
ঠিক কথা

ওরে কবিয়াল, সেই দুঃখেই তো সমস্ত কবিতায়
ছড়িয়ে থাকে
এমন ধূপছায়া বিষাদ!

নতুন মানুষদের গল্প

নদীর ধারে ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িটায় নতুন মানুষ এসেছে
মরচে পড়া লোহার গেটটা খোলা হল কতকাল পরে
আগাছার মধ্যে ফুটে আছে অনেক নয়নতারা
ওরা দেখছে আর খুশি হয়ে ঢলে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে
লাল রঙের চটি পরা দুটি ফরসা পা, গোলাপি শাড়ি পরা
কিশোরীটির কাঁধে ফুটে গেল বাবলা কাঁটা
পিঁপড়ের চোখের মতন এক বিন্দু রক্ত
সে কি এই বাড়িটার গল্প জানে?

মিস্তিরিরা ভাঙা জানলা সারিয়ে রং লাগাচ্ছে সবুজ
পাশাপাশি দুটি বাঁশের মইতে চেতন মিস্তিরি
আর তার অন্ধ ছেলে
ছেলেটির হাতেই রঙের বুরুশ
দুপুরবেলায় ঘূর্ণি হাওয়ায় সে অনেক কিছু শুনতে পায়
ওরা দু'জনেই এক সময় ডানা মেলে উড়তে চেয়েছিল
অন্য দুনিয়ায়
ছেলেটিই বেশি দূরে চলে গিয়েছিল, তাই ঝলসে গেছে
তার চোখ
এখন সে জাগরণের মধ্যে গন্ধ পায় ঘুমের
চেতন মিস্তিরির চোখ বুজে আসতেই সে বলে উঠল,

আব্বাজান, সাবধান
ততক্ষণে উলটে গেছে রঙের কৌটো
অন্দরমহলে শোনা যাচ্ছে তিন রকম কণ্ঠস্বর...

পায়রাদের ওড়াউড়ি

ভোরবেলা পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে আছে
একজন মানুষ
চিন্ময় আলোয় একঝাঁক পায়রার দিকে এক দৃষ্টিতে
চেয়ে আছে কৈশোরের দিকে
কাছাকাছি পথচারীদের পায়ের আওয়াজে একটা ঝটাপট শব্দ তুলে
উড়ে যাচ্ছে পায়রাগুলো, আবার
ফিরে আসছে ঠিক একই জায়গায়
কী যেন খুঁটে খাচ্ছে আবহমান কাল থেকে
লোকটি শুধু সেদিকে তাকিয়ে আছে, কোনও চিত্রকল্প নয়
এমনই তাকিয়ে আছে
মুসোলিনি কিংবা হিটলার কোনওদিন ওই পায়রাদের ওড়াউড়ি দেখেনি
যখন যুদ্ধে জমে উঠেছে পৃথিবী, কেঁপে উঠেছে ভারসাম্য
তখনও ওই পায়রাগুলো ডানা কাঁপিয়ে উড়ে এসেছে নির্মেঘে
হাওয়া থেকে ধুলোমাটির স্বর্গে
ওই লোকটি ঠায় বসে থাকে পার্কের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে।

এদিকে গর্জন করছে ওয়াল স্ট্রিট, অন্য দিকে জাঁকিয়ে বসেছে
মুখোশ ব্যবসায়ীরা
যারা বন্দুক উঁচিয়ে অমর হবে ভেবেছিল
তারা শেষ পর্যন্ত হয়েছে পোকামাকড়ের খাদ্য
যারা অন্যের মাথায় পা রেখে জয়ের আনন্দ পেতে চেয়েছিল

তাদেরই ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি খেয়েছে জল কাদায়
তারই মধ্যে ওড়াউড়ি করেছে চঞ্চল পায়রাগুলি, নরম পালকের
শব্দে আদর করেছে অনাদি সময়কে
আর পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে থেকেছে
চিরকালের একজন মানুষ
চিন্ময় আলোয় চেয়ে থাকে
কৈশোরের দিকে...

দুপুরের বর্ণ

দূর যাত্রিণীর হাতে একটি শুধু গন্ধরাজ ফুল
গাছ তলায় যে বসে আছে, সে এমনই নিথর যেন
বিসর্জন দেওয়া এক মাটির দেবতা
গাছটির মগডালে একটি নীল-রঙা মাছরাঙা।

এখন দুপুর খাঁ খাঁ, বাতাসে ভাসে না কোনও গান
কিন্তু ছবি তৈরি হয়, মুহুর্মুহু ছবি বদলায়
রং আছে অফুরন্ত, নিভে যাওয়া রান্নাঘরে
কালো বিড়ালিটি অঙ্গ চাটে
শুষ্ক ঢালা শূন্য রাস্তা, আলো ও ছায়ায় মাঝে মাঝে
পাশ ফিরে শোয়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লতা-গুল্ম, হাওয়া নেই, তবু
কাঁপে একটা হলদে হওয়া পাতা
কলা গাছে লাল পিঁপড়ে, এই মাত্র ডেকে উঠল মেঘ।

পুকুর ঘাটলায় বসে আছে সেন বাড়ির ছোট বউ
কস্তা ডুরে শাড়ি পরা, সদ্য তার সিঁথিতে সিঁদুর

দু’ চোখে আঁচল ঘন ঘন, তবু এত অশ্রু জমা হয়ে আছে
কেন, তা সে নিজেও কি জানে?
ফিকে নীল অভিমান নিয়ে সে কি চলে যাবে গভীর অতলে?
একটি রুপোলি মাছ এক ঝিলিকে বলে উঠল, সাঁতার জানো না
জলে নেমো না, লক্ষ্মীটি, একা নামতে নেই, বেঁচে থাকো
কিংবা দেশান্তরী হও, একটা সোনালি দেশে তোমাকে কী সুন্দর মানাবে!

এই তো সময়

এই তো সময় সব কিছু বিলিয়ে দেবার
বাথরুমের জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন
রাজা
প্রয়াগ তীর্থে দিনের শেষে হর্ষবর্ধনের মতন
সাবানটা পড়ে গেছে কমোডে
তোয়ালেটা অন্যের ব্যবহৃত ভিজে
বাইরের রাস্তায় বাঁদর নাচের খেলা দেখতে জমেছে ভিড়
রাজা ফিসফিসিয়ে বললেন,
দিলাম তোমাকে মুক্তি
কে যেন বাইরে থেকে তাড়া দিচ্ছে
দরজা খোলো, দরজা খোলো...

যার আর কিছুই নেই, সে এখন দিতে পারে সর্বস্ব
ক্রীতদাসদের বাজারে দাঁড়ানো যায় মাথা উঁচু করে
বাঁদরটার চেয়েও যার বন্দিত্ব অনেক বেশি শিকল দিয়ে বাঁধা
সে আগেই চুকিয়ে ফেলেছে সব খেলা
শুধু একটা জিনিসই সে এখনও

লুকিয়ে রেখে দিতে পারে গোপনে
সেটা কোনও জিনিসও না
কিছুই না
খুব মৃদু গন্ধের মতন
মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়, ফিরেও আসে

সিঁড়িতে বসে আছে নীরা

এ ভাঙা মন্দিরে দেবতা নেই, সিঁড়িতে বসে আছে নীরা
শাড়িটি নীল তাই শরীরে ঢেউ
ঘামের চন্দন কপালে টিপ
এ ভাঙা মন্দিরে দেবতা নেই, সিঁড়িতে বসে আছে নীরা

এ দেব দেউলের চূড়াটি নেই, শিকড়ে জড়িয়েছে বট
যেখানে বিগ্রহ সেখানে সাপ
যেখানে ঝাড়বাতি সেখানে কালি
একলা ঘণ্টাটি এখনও দোলে, আপনি বেজে চলে রাতে

শিউলি ফুলগুলি ছড়িয়ে আছে, যেমন ছিল বহুদিন
একদা যে বালিকা সাজিতে ভরে
পুজোয় দিত এসে আলতা পায়ে
যুবতী সে এখন, কাঁটার পথে একলা যেতে ভয় নেই

অনেক দিন ঘুরে একটু থামা, আঁচলে হাওয়া খাও তুমি
তোমার বসে থাকা সমুখ জুড়ে
পিছনে পটভূমি অনাদিকাল
শিল্প হয়ে ওঠে বাস্তবতা, সত্য এত অপরূপ

তোমার এ ক্ষণ রূপ চিরকালের, কী করে ধরে রাখি আমি
তুমি তো জানো নীরা, এই আঙুল
জানে না ছবি-ভাষা, রেখা ও রং
শুধুই ছুঁতে চায় তোমার ঠোঁট, না-ছুঁয়ে শত শত চুমু।

শিল্পের বন্দিনী

সেই দিনটিতে ছিল বর্ষার ঘোর
সব রাস্তাই ঠনঠনে ঊরু-ডোবা
তিনটি শরীর, উনিশ কিংবা কুড়ি
পেঁজা শার্ট আর চিরুনি-না-ছোঁয়া চুল।

বাড়ি ঘর সব চকখড়ি টানা রেখা
পাখির তীক্ষ্ণ চোখের মতন মা
কলেজ পালানো দুপুরে নদীর ধার
সন্ধে গড়িয়ে শরীরে অন্ধকার।

ঝড়ে উত্তাল নদীর ঝাপসা ঢেউ
বিদেশি জাহাজ হেলে আছে আধখানা
কেউ স্নানে নেমে সমুদ্রে পাড়ি দিল
বজ্র হানায় মন্দির চৌচির।

তিনটি বক্ষে একই মানবীর ছবি
জল রং, তেল এবং অ্যাক্রিলিক
সময় ছুটছে তুচ্ছ কথার ছলে
হাসির হররা আসলে গোপন খেলা।

বন্ধুরা আজ কোথায় নিরুদ্দেশ
সেই মানবীটি তিনটি হৃদয় ছিঁড়ে
পরবাসে গিয়ে সাজিয়েছে ফুলদানি
তার ছবিখানি শিল্পের বন্দিনী!

উনিশ বড় সাংঘাতিক উনিশ

নদীর ঘাট, উনিশ, পাতলা ছেলে
কপালে ধুলো, পা ডোবানো জলে
তেচোখো মাছ, শালুক পাতায় ফড়িং
ধাম্‌সা বাজে নমোশূদ্র পাড়ায়।

গড়িয়ে যায় বিকেল থেকে সন্ধে
কাজল মেঘে রক্তারক্তি ধারা
জারুল গাছে একলা কাল প্যাঁচা
দুটি জোনাকি জ্বলছে দুই চোখে।

এ ছেলেটার পেটে বিষম ব্যথা
কিছুটা ঝোঁকা, কুঁচকে গেছে ভুরু
খিদে? তেমন কথা তো নয়, চুলো
দু' বেলাতেই মায়ের হাতে জ্বলে।

বাতাস নেই, নদীও নিঃশব্দ
এখন আর আসে না কেউ ঘাটে
নতুন গড়া সাঁকোর ডান পাশে
খেয়া নৌকো উলটে শুয়ে আছে।

উনিশ বড় সাংঘাতিক উনিশ
মুখের রোমে যৌবনের ভাষা
শরীরে গান-বাজনা শুনতে পায়
ছন্দ-মিল নেই, তালও নেই।

অন্তরীক্ষ, যত্ন করে দেখো
ছেলেটা কেন নদীর ধারে একা
ব্যথাটা তার আসলে তলপেটে
এই কষ্ট এত মধুর গোপন!

কেউ কি তার মনকে ছুঁতে চায়
বকুলতলায় চকিত আলো ছায়ায়
আঁচল দিয়ে দু' চোখে দেয় ভাপ
পক্ষী ভাষায় হৃদিভাষ্য শোনায়?

হৃদয় থেকে শরীর কত দূরে?
সে দূরত্ব নিয়েই সারাজীবন
দ্বন্দ্ব চলবে, আজ জানে না কিছু
নদীর জলে দেখে নিজের ছায়া।

আয়ু

পঁয়তিরিশ সেকেন্ডের একটি চুম্বন
দেড় দিনের আয়ু বেড়ে যায়
সেই মুহূর্তগুলিতে মনে পড়ে না মানুষের সভ্যতার পতনের কথা
ইরাকের যুদ্ধ কিংবা মন্দির-মসজিদের বিস্ফোরণ

তুমি মেয়েটির ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে, সে বাধা দিল না
তাতে কোনও লাভ নেই
যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার একটি হাত তোমার কাঁধে না রাখবে
স্বেচ্ছায়, আপনমনে
ততক্ষণ খবরের কাগজের রক্তাক্ত পৃষ্ঠা তোমাকে ছাড়বে না...

কোনও ফুলেই এখন আর গন্ধ নেই, না থাকুক
কিন্তু বুকে বুক ছোঁওয়া, হাত খুঁজছে কিছু, সেই দ্রুততার
সুগন্ধই আলাদা
বিছানা পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই, গেলেও হয়, না গেলেও এমন কিছু নয়
বিছানায় মানুষের আয়ু বাড়ে না, বিশেষত যখন তুমি ঝড়ের শিখরে
শয্যা-রতি হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক করে দেয়, শরীর ভুলিয়ে দেয়
বরং ঠোঁটে ঠোঁট, প্রতিটি পল-অনুপলে ইতিহাস রক্ত জানে
যদি সে শুধুই মেনে নেয়, তখনও অন্য কারুর কথা ভাবে?
ক্ষমা চাও, চোখ না সরিয়ে
তার পায়ে নিদেন করে দাও খানিকটা আয়ু খরচের দীর্ঘশ্বাস!

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা

কতকগুলো সদ্যযুবা আড্ডা দিত শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়
বিকেল-সন্ধে ফুটপাথের রেলিং-এ ঠেস, এক সিগারেট দু'-তিন জন
কখনও কফি হাউসে ঢুকে পকেট খালি, ফের রাস্তায় দু'পায়ে ভর
কীসের টান? শুধু কবিতা? কবিতা ছাড়াও বক্ষ্যমান জীবনস্রোত
কতকগুলো সদ্যযুবা আড্ডা দিত শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়।

সেখানে ছিল চোখে-না-দেখা কালপুরুষ, পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনত

মাঝে মাঝেই হেসে উঠত, তার আঙুলে খেলা করত ভবিষ্যৎ
যে চ্যাঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে, সে-ই একদিন নামবে গভীর খনিগর্ভে
যে জানাচ্ছে প্রতি রাত্রে ঘুমের চেয়েও কবিতা লেখা বেশি জরুরি
সে পালাবে তিন সমুদ্র সাতাশ নদী পেরিয়ে এক ঘুমের দেশে
প্রেমে পাগল ছেলেটি বলত, শরীর ছাড়া সমস্ত গান-বাজনা মিথ্যে
সে কি জানবে রূপের সত্য, সে কি জানবে সুর হারানো দিনের দুঃখ?
যেখানে ছিল চোখে-না-দেখা কালপুরুষ, পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনত।

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা কবে উধাও, কেউ যেন তা টের পেল না
সে সব নভোচারীর দল মেঠো রাস্তায় হারিয়ে গেল কঠিন রোদে
বিদায় শব্দ কেউ বলেনি, তবু বিদায়, ছন্দ ভুলের মতো বিদায়
কে যে কোথায় পৌঁছল বা পৌঁছল না, তা নিয়েও তো তর্ক অনেক
কালপুরুষের হাতের লেখা চিরকুটটি আজও হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়
মাঝে মাঝেই কালপুরুষের গায়ে লাগে সেই যুবাদের স্বপ্নের আঁচ
যা দৃশ্যমান তাও তো মিথ্যে হতেই পারে, স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না।

টান মারে দোলাচল

ফিসফাস শব্দ শুনি। সেদিকেই অফুরান রাত
মধুলোভী যোষিৎ ও পুরুষেরা পরাগ ওড়ায়
হেমঅগ্নি বুক থেকে অন্য বুকে আলোক সম্পাত
কত কিছু ভাঙাভাঙি, গুপ্ত চোখ শরীর পোড়ায়!

বটবৃক্ষ মূলে এক বসে আছে বাউল উদাসী
জীবনদর্শনে কিছু ধাঁধা ঢুকে পড়েছে সহসা
আঙুল নীরব তার কণ্ঠ যেন সুরহারা বাঁশি
অনাম্নী চিঠির মতো গাছের এক একটি পাতা খসা।

আমি কোন দিকে যাই
হুল্লোড় দিয়েছে হাতছানি
তবু কেন মনে হয়
বাউলটির পাশে গিয়ে
বসি
শরীর
সম্ভোগ চায়
তবু যেন অশ্রুতের বাণী
টান মারে,
দোলাচল,
জেগে থাকে নিদ্রাহীন শশী।

এক জন্মের সমস্ত চলে যাওয়ার মধ্যে

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এসো
তারপর আমি মাঠে মাঠে ঘুরছি, রোদ্দুরে
ঝলসে যাচ্ছে কপাল

কিংবা বৃষ্টিতে শপশপে, ভয় দেখাচ্ছে পূর্বপুরুষের আর্তনাদের মতন
মেঘের এপার ওপার শব্দ

চটি ছিঁড়ে যাক, পায়ে কাঁটা ফুটুক
কিছু আসে যায় না, আমি শুধু শুনতে পাচ্ছি দুটি মাত্র অক্ষরের
পরম বাঙ্ময়তা, যেন মহাকাশের সংগীত
হাট করে খুলে যাচ্ছে দুনিয়ার সব দরজা
গভীর অরণ্য থেকে ভোরবেলার আলো বলছে, এসো
এই মাত্র জন্ম হল যে ঝর্নার, সে বলছে, এসো

মধ্যরাত্রির আকাশের শান্ত নীরবতা বলছে, এসো
শুধু প্রকৃতিতে নয়। শুধু হৃদয়ে নয়, শরীর বলছে, এসো
ওষ্ঠের অমৃত, স্তনবৃন্তের খেদ, যোনির লবণস্বাদ বলছে, এসো
তারও পরে, আরও গভীরে, যেখানে সময়ের সঙ্গে মিশে আছে
চিরকালের শূন্যতা, সেখান থেকেও
ডাক শুনতে পাচ্ছি, এসো
এক জন্মের সমস্ত চলে যাওয়ার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে, এসো—

মেঘলা দিন, মিহিন বাতাসে

রাজ্জাক হাওলাদার, আমার সে গ্রাম সহোদর
বহুকাল পর দেখা, বস্তুত তা কালেরও অতীত
তার জন্মগ্রহণের আগে আমি মাইজপাড়া-ত্যাগী
তবু দেখামাত্র ঠিক রক্তের সম্পর্কে চেনা হল
আমি ঢের বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তাই তার কাঁধ ছুঁয়ে উৎকণ্ঠায় বলি
কত দূর থেকে এলি, রাস্তাটা পিচ্ছিল ছিল না তো
পায়ে কি ফুটেছে কাঁটা? মুখ শুকনো, চুলে এত ধুলো
বসে আগে জিরিয়ে নে, তারপর সব কথা হবে।

রাজ্জাক হেসে বলল, দাদা, আপনি ভুল করলেন,
আমি তো আসিনি দূর থেকে, আমি স্বস্থানেই আছি
আপনিই দূর থেকে বহু দূরে, সে দূরত্ব মাপজোক করা
কোনও মানদণ্ডে কিংবা সময়ে সম্ভবপর নয়।
আপনারই পথে বহু বিঘ্ন আর রিপুভয় ছিল
নৌকো ছিল দোলাচলে, অসাবধানে জুতো হারালেন
সে সবই শুনেছি, জানি, সীমান্তের কাঁটাতারে কাঁধ
ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরল, কেউ কেড়ে নিয়েছিল জামা...

এবার আমিও হাসি, আজগুবি গুজব এসব
সীমান্তের কাঁটাতার কখনও দেখিনি, জুতোটাও
হারায়নি, নদীস্রোতে নিজেই দিয়েছি বিসর্জন
রক্ত ঝরেছিল বটে, কাঁধে নয়, বুকের মাঝখানে
সে অন্য কাহিনি, তবে দূরত্বের কথাটা সঠিক
কেউ পৃথিবীর এক প্রান্তে, আমি, ধরা যাক, আছি অন্য পিঠে
কে যে কার থেকে দূরে, এই প্রশ্ন অনন্তকালের
এমনকী কাছাকাছি থেকেও তো দূরত্বের বিষাক্ত নিশ্বাস
টের পাওয়া যায়। কত প্রতিবেশী, পিঠোপিঠি রয়েছে মানুষ
নিতান্ত অচেনা হয়ে, অথবা কখনও মুখোমুখি হলে পরস্পর
তুলেছে সর্পিল ছুরি, পাশাপাশি গ্রাম পুড়ে যায়,
বাল্যের খেলার সঙ্গী স্বার্থপর উত্তর-বয়সে
একে অপরের রক্ত গায়ে মাখে, বিভেদের কত না ছলনা
কখনও ভূমি বা নারী, কিংবা ধর্ম, দুনিয়ার এখানে ওখানে
পবিত্র ধর্মের নামে কত ঘৃণা, ধর্মের মহিমা
পৃথিবীর ধুলো মেখে কখনও বারুদ হয়, কখনও কালের
সিংহ থাবা! যারা স্বর্গ চেয়েছিল, তারা দেয় ভুল আত্মাহুতি
যারা স্বর্গ চেয়েছিল, তারাই তো খুলে দেয় নরকের দ্বার।

রাজ্জাক আমাকে বলল, দাদা ওই সমস্ত কথা, এখন রাখেন
মানুষের ইতিহাস ভরাই যে কত মিথ্যা, আপনি তো জানেনেই
আমিও তা জানি কিছু কিছু। এই সভ্যতায় একদিক সাদা
অন্যদিক বড় বেশি ভয়ংকর কালো। তবু দেখেন না আকাশে বিদ্যুৎ
পথ ভুলে অন্ধকারে একা একা কানামাছি, অকস্মাৎ যার
গায়ে হাত ঠেকে, দেখি আলোর ঝলকে সে-ই একান্ত আপন
সে ভাবেই পেয়ে গেছি আপনাকে, অথবা আপনিই বুঝি আমাকে ছুঁলেন!
নদীর দু'পারে দুই মানুষ খাড়ানো, মেঘলা দিন, মিহিন বাতাসে

মনে পড়ে, এক কালে এই নদী, আড়িয়াল খাঁ, বাপ্‌রে কী দুরন্ত
ক্ষুধার্তই না ছিল!

মনে পড়ে? ইলিশের নৌকাগুলি ঘাটে এসে ভেড়ে
আমরা দুইজন পাশাপাশি।

একশো হাজার ঢেউ

এদিকে মা, ওদিকে মেয়ে
মধ্যিখানে জল
তিন সমুদ্র, সাতাশ নদী, বন বাদাড়
এদিকে রোদ বাঘ-আঁচড়া, ওদিকে ঝড়
সৃষ্টি টলমল।

এদিকে দিন, ওদিকে রাত
একই দুনিয়াখানা
মা খাচ্ছেন চা বিস্কুট, হাতে কাগজ
মেয়ের বাড়ি ফেরার পথে ক্লান্ত চোখ
স্বপ্ন দেখা মানা!

লম্বা গাড়ি, চওড়া গাড়ি
গাড়ির মধ্যে ঘর।
পাঁচ রাস্তা, সাত রাস্তা, সব দুদ্দাড়
কেউ সারাদিন কাজ-বন্দি, ফাঁদে ফন্দি
কেউ বা নিশাচর।

চাবি খুলছে, ফোন বাজছে
মেয়ে দৌড়ে এল
নিঝুম ঘর, ঘড়ির চোখ, জানলা খোলা
তুষারপাত, সামনে এক লম্বা রাত
মায়ের গলা পেল!

মেয়ে হাসছে, মা হাসছে
কাঁদছে না তো কেউ
ভালো আছি মা, তুমি ভালো তো, সবাই ভালো
দুই গোলার্ধ, দু' দিকে তার বুকের মধ্যে
একশো হাজার ঢেউ।

পাখির চোখে দেখা ১

১

একবুক জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের চোখের জলও
মেশাচ্ছে সেই স্রোতে
কয়েক পলক মাত্র দেখা
আমি ওই মানুষটিকে চিনি না
তা হলেও কি ওই মানুষটিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়?
লেখার চেষ্টা করেছি কখনও কখনও
ঠিক নয়, না?
কিছুই না করার চেয়ে এই চেষ্টাটাও কি একেবারে মিথ্যে?

২

বাড়ির দরজার বাইরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে ধর্ষিতা মেয়েটি
ওকে ঘিরে আছে একদল মানুষের অহি-নকুল চোখ
ওর ছিন্নভিন্ন শাড়ি ও শরীরে লেখা আছে কিছু ইতিহাস
এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়
তবু তা পাঠ করার জন্য একদণ্ডও দাঁড়ানো যায় না
দাঁড়ালেই কান মুলে দেবে বিশ্ব বিবেক
মাটির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে যায় হুস করে
একটা কদমগাছ থেকে খসে খসে পড়ছে পাতা
সামান্য মেঘের আড়াল, সূর্যেরও এখন উঁকি মেরে দেখার
অধিকার নেই...

৩

কলাপাতাগুলো ছিঁড়বেই, ছেঁড়া পতাকার মতো উড়বে
নিমগাছটায় পাখিরা বসে না, তালগাছে ঝুমঝুমি
একটি বালিকা আমলকী তুলে রাখছে হাতের মুঠোয়
সে জানে না তার করতলে ধরা পড়েছে বসুন্ধরা!

ছাতারে পাখিরা সাত ভাই বোন, সারাদিন ঝগড়ুটে
ঘুঘুকে দেখেও কিছুই শেখে না, ইষ্টিকুটুম একা
ভোরের ডাহুক ডাক দিয়ে যায়, রাই জাগো, রাই জাগো
ধড়মড় করে রাই উঠে বসে পরপুরুষের ঘামে ভেজা বিছানায়।

কালোমানিকটি দাঁতন করছে কাজলাদিঘির ঘাটে
মাথার ওপর মেঘ গুরু গুরু, সুদিন আসছে বুঝি
শীর্ণ নদীতে কাপড় কাচছে চণ্ডীদাসের রামী
কানা বৈরাগী দোতারার তার ছিঁড়েও মুচকি হাসছে।

আবহমানের থেকে তুলে নেওয়া কয়েক টুকরো ছবি
বড়ই পলকা, কাঁচা শিল্পীর তুলট কাগজে আঁকা
শুধু ভোরবেলা
রৌদ্র প্রখর হলেই সাম্প্রতিকের
বিষ আর রোষ, বুকে গুরুভার, এও তো সত্যস্বরূপ!

আমার প্রিয় জামা

ছেলেবেলার নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
পায়ে ফুটেছে কাঁটা
এখন বয়েস আকাশের প্রান্তে, শরীরে পোকামাকড়ের কামড়
একটু একটু খুঁড়িয়ে চলা, নদী কি চিনতে পারছে আমাকে?
আমার পক্ষেও চেনা মুশকিল, কবে সে হারাল তার লাস্য!
একটু দূরে নতুন ব্রিজ, ঘোলাটে জলে পোঁতা কেন এত
খেজুরের ডাল?
একসময় ছিপ ফেলে তুলেছিলাম কালবোস মাছ, সে মাছ
আর বহুদিন দেখিনি
খলসে মাছেরাও কোন নিরুদ্দেশে চলে গেল?

নদী, তুমি আর কবিতায় নেই
ওসব ছেলেবেলার পদ্য! এই তো ঝমঝম করে যাচ্ছে ট্রেন
জানলায় নেই একটিও বিস্ময়মাখা মুখ
কলিমুদ্দি আর ফেরি নৌকো নিয়ে বসে থাকে না
খুব ফড়িং ওড়াউড়ি করত না একসময়?
কলসি কাঁখে বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ আজকাল
দেখা যায় না সিনেমাতেও
ননী পিসির মতন কেউ অভিমানে ঝাঁপ দেয় না মাঝরাত্তিরে

শুধু একটা মাছরাঙা ঘুরে ঘুরে কী খুঁজছে কে জানে
আমার পায়ে ব্যথা, হাঁটতে পারব না বেশিদূর
একটা ভাঙা ঘাটলায় জলে পা ডুবিয়ে কে বসে আছে?
ওই ডোরাকাটা নীল শার্টটা আমার বড় প্রিয় ছিল!

অলীক জন্মকাহিনী

যে নদীতে সাঁতার শিখেছিলাম
সেই নদীটিই আর নেই
মাঝে মাঝে নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে ভাবি
সত্যিই কি একদিন সেই জলে ডুবেছি আর ভেসেছি?

ঝিরঝিরি করে ঝরে পড়ত জামরুল ফুল
বাড়ির ঠিক সামনেই পরমাত্মীয়ের মতন বাহুমেলা সেই গাছ
একটা ল্যাজঝোলা খয়েরি পাখি এসে বসত প্রায়ই
কী জানি কী নাম, লোকে বলত ইষ্টকুটুম
তেমন পাখি আর দেখি না কখনও
জামরুল গাছটা স্বপ্নের মতন ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে
ফুটপাথে জামরুল বিক্রি হয়, ছুঁই না কোনও দিন...

সন্ধেবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে গায়ে হেঁটে আসত
অন্য পাড়ার বিন্তি মাসি
আমার জীবনে সেই প্রথম দেখা নারী
সিংহিনীর মতন কোমরের খাঁজ, কচি বাতাবির মতন
ঘন স্তন
তানপুরার মতন নিতম্বের দোলানিতে মুহূর্তে মুহূর্তে
তাকে মনে হত স্বর্গের দেবী

সেই দেবীই দূর থেকে জাগিয়েছিল এক বালকের
যৌন তেজ
গায়ে আগুন লাগিয়ে বিন্তি মাসি একদিন হারিয়ে গেল হঠাৎ
সেই আগুন আমাকে আজও পোড়ায়!

এক পাশে রান্নাঘর, অন্য পাশে ধলা ঠাকুমার ঘর
আঁতুড় ঘর তৈরি হত মাঝখানের উঠোনে
বৃষ্টি, কী বৃষ্টি, এক বিদ্যুৎ চমকানো ভোরে
মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম
গ্রাম বাংলার প্রথম নীল আলো
একটু দূরে বড় ঘরটার দাওয়ায় হুঁকো হাতে
বসেছিলেন ঠাকুর্দা
ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না শুনে অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন...

এই সব গল্প শোনানোর মানুষগুলি আর নেই
কোথায় সেই বাড়ি? অলীক হয়ে মিলিয়ে গেছে
সেই রান্নাঘর, সেই উঠোন, সেই দাওয়া, কিছুই নেই
বাস্তুভিটের ওপর দিয়ে এখন চালানো হয় লাঙল
লকলক করে সেখানে সবুজ ধানের শিষ
জন্মস্থানটাই বিলীন, এক এক সময় মনে হয়, সত্যিই কি
আমি কখনও জন্মেছিলাম?

সর্বহারা অবিশ্বাসী

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী, বেশ সেজেগুজে এসেছে
কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে না
আজ তার নীলষষ্ঠী

যৌবন বয়েসে এই নিয়ে কত না চটুল রঙ্গ করতাম
এখন শুধু একটা পাতলা হাসি,
অন্যের বিশ্বাসে নাকি আঘাত দিতে নেই
আর এক বন্ধু, যে প্রথম আমায় ছাত্র রাজনীতিতে টেনেছিল
তার আঙুলে দেখি একটা নতুন পাথর-বসানো আংটি
আমার কুঞ্চিত ভুরু দেখে সে দুর্বল গলায় বলল
শরীরটা ভালো যাচ্ছে না,
তাই শাশুড়ি এটা পরতে বললেন, মুনস্টোন
না বলা যায় না
আমার মনে হল, এ যেন আমারই নিজস্ব পরাজয়!

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের বাড়ি, মাঝে মাঝে যাই তাঁর আলাপচারী শুনতে
এখনও কত কিছু শেখার আছে
আজই প্রথম দেখলাম, তাঁর দরজায় পেছন দিকে,
গণেশের মূর্তি আটকানো
প্রশ্ন করিনি, তিনি নিজেই জানালেন,
দক্ষিণ ভারত থেকে ছেলে এনেছে, কী দারুণ কাজ না?
সুন্দর মূর্তির স্থান শো-কেসের বদলে দরজার ওপরে কেন
বলিনি সে কথা, সেই ফক্কুড়ির বয়েস আর নেই
বয়েস হয়েছে তাই হেরে যাচ্ছি, অনবরত হেরে যাচ্ছি
অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই, অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই
চতুর্দিকে এত বিশ্বাস, দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কত রকম বিশ্বাস
যে গেরুয়াবাদী ঠিক করেছে, পরধর্মের শিশুর রক্ত
গড়াবে মাটিতে, চাটবে কুকুরে
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
ধর্মের যে ধ্বজাধারী মনে করে, মেয়েরা গান গাইলে গলার নলি
কেটে দেওয়া হবে
টেনিস খেলতে চাইলেও পরতে হবে বোরখা
সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস
যে পেটে বোমা বেঁধে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে

যে পেশি ফুলিয়ে, দেঁতো হাসি হেসে
পদানত করতে চাইছে গোটা বিশ্বকে
এরা সবাই তো বিশ্বাসীর দল
সবাই বিশ্বাসী, বিশ্বাসী, বিশ্বাসী...

এক একবার ভাঙা গলায় বলতে ইচ্ছে করে
অবিশ্বাসীর দল জাগো
দুনিয়ার সর্বহারা অবিশ্বাসীরা এক হও!

পাখির চোখে দেখা ২

১

ভুরুর মতন নদীর বাঁক, কুকুর-জিভ রাস্তা
ঘুমের মতন ঘুমন্ত গ্রাম, স্বপ্ন সুখ-সায়র
সদ্য হলুদ ধানের গন্ধে অনেক না-বলা কথা
আশঙ্কার মতন চিল, ছুটির মতন দুপুর

বাল্যকালের মতন স্বচ্ছ দুলছে আলোকলতা
শিমুল তুলোর অনুসরণ প্রথম ভালোবাসা
বৃষ্টি এল পুষ্পধারায়, রতির মতন বাতাস
ভেজা মাটিতে রভস গন্ধ, বিদ্যুতের ঝিলিক
সেও আকাশের তৃপ্ত হাসি, গাছেরা লুটোপুটি
দিনের মতন দিন চলেছে, রাতের মতন রাত!

২

গড়বন্দিপুর থেকে ফেরা, শেষ ট্রেন
দশটা পঁচিশে
ঘুরঘুট্টি কালো রাস্তা, সঙ্গিনী ও বান্ধবেরা ঘুমিয়ে নির্বাক
যদি ট্রেন চলে যায়, বাকি রাস্তা ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না
জোরে চলো, আরও জোরে, আর মাত্র সাত-আট মিনিট
হঠাৎ পথের মধ্যে দু' বাহু ছড়িয়ে, নগ্ন
নিঃশব্দে দাঁড়াল মহাকাল
যেন পেছনের সেতু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল
শোনো সেই শব্দ-মহোৎসব
সম্মুখেও গতি নেই, কাঁপতে কাঁপতে দেখে যেন গাড়ির ইঞ্জিন
এবার মাটিতে নেমে হাঁটু গেড়ে বসা
রাত-চরা পাখিটির ডাক উড়ে যায় দূরে ধারালো বাতাসে
দু'দিকে প্রান্তরে কোনও জোনাকি জ্বলে না
দিকশূন্যপুরে কেউ জেগে নেই, তাদেরই স্বপ্নের মধ্যে
বন্দি এই আমরা ক'জন আপাতত!

৩

শেখ সুলেমান হাতের দা দিয়ে পাগলের মতন কাটছে কচু গাছ
শেখ সুলেমান থু থু করছে পাশের নয়ানজুলিতে
শেখ সুলেমান কক্ষনও কাঁদে না, বিরলে কান্নার কোনও
জায়গাই নেই তার
শেখ সুলেমান বৃষ্টির মধ্যে ভিজছে তো ভিজছেই
তার চোখ দেখা যায় না
শেখ সুলেমান পীর সাহেবের মাজারের পাশ দিয়ে চলে গেল
ভ্রূক্ষেপও করল না
শেখ সুলেমান তিনটে বাচ্চা সমেত এক ভিখিরিনিকে
ভয়ংকরভাবে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়াল

শেখ সুলেমান লাথি কষাল একটা বেড়ালকে
শেখ সুলেমানের শুধু রাগ নয়, নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে মানুষটার
খবর্দার, কেউ তার কারণ জিজ্ঞেস করতে যেয়ো না
বরং যে যত পারো তরঙ্গ পাঠাও!

এই স্বপ্নের ঘোর

দশটা সতেরো, দরজা বন্ধ, হাওয়ায় ভাট ফুলের গন্ধ
দশটা আঠেরো, দরজা বন্ধ, অকস্মাৎ রেডিয়ো স্তব্ধ
দশটা উনিশ, ড্যাম্ ইট, ফুল, জানলাটা দিয়ে তাকাও বাইরে
জানলা, জানলা, ইন্টারনেট, টোয়েন্টি ফার্স্ট, জানলা জানলা
দশটা একুশ, ইঁদুরের দৌড়, বাজারে আগুন, ফ্লাইট ক্যানসেল্ড
দশটা বাইশ, ল্যান্ড টেলিফোন, ডোন্ট মুভ, ওটা মেসেজে থাকবে
দশটা পঁচিশ, জিসাস! মিটিং, অন্তত সোওয়া ঘণ্টার ড্রাইভ।

এই পৃথিবীতে কোনও ঘড়ি নেই, স্টিফেন হকিং, সময় স্তব্ধ
এই পৃথিবীতে সব ঘড়ি শেষ, সময় সসীম, নাও গেট লস্ট!
ফের বিগ ব্যাং! কী বিরাট জ্যাম, নিউ জার্সি টার্নপাইকে হাঃ হাঃ
আমি তো কোথাও যাচ্ছি না, আমি জন্ম নিইনি, নিছক একটা স্বপ্ন হয়তো
টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি, এই স্বপ্নের ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ো না
এই মুহূর্তে এক্স-ওয়াই নামে ক্রোমোজোম ছুটে যাচ্ছে আমার নারীর গর্ভে
ওদের থামিয়ে দিয়ো না, প্লিজ, মানুষ না থাক, স্বপ্ন বাঁচুক!

এই রাত শেষ হতে

এত পলিউশন খাচ্ছি সারাদিন, এবার এক টুকরো চাঁদ
খেতে হবে
এখন না, শেষ রাতে মেঘের প্রাসাদগুলো ভেঙে-চুরে গেলে
ততক্ষণ কী যে করি, জেগে থাকা চাই
লেখার টেবিলে বসা আমার নিয়তি।
ডান দিকের দেরাজের ছবিটা কোথায় গেল, কেনই বা বন্ধ করা আছে?
আর সব কিছু খোলা, এমনকী সাদা পৃষ্ঠা, এমনকী মদের বোতল
প্রেম যদি ভেঙে যায়, তা হলে দু'-একটা রাস্তা মন থেকে
মুছে দিতে হয়
যেমন চিড়িয়ামোড়, যেমন বকুলবীথি, মানচিত্রে নেই।

টেবিলের ও দেরাজ চিরতরে বন্ধ থাকবে জানি
চাবিটা পেলেও আর খুলবে না, চাবি-মিস্তিরিরা ব্যর্থ হবে
জানি না কী আছে ওর অন্ধকারে, কিছু কি সুগন্ধময় ছবি?
রাত একটা চুয়াল্লিশ, ন'তলায় জানালায় কে এসে দাঁড়াল
আকাশের ফ্রেম, তার চুলে বুঝি হিরে-কুচি, চক্ষে নীল জল
এক পলক, সঙ্গে সঙ্গে কাচ ভাঙার শব্দ, এরকমই হয়, যদি
কলম নিস্তব্ধ পড়ে থাকে
এ সময় আস্তে আস্তে খুলে ফেলতে হয়
পা-জামার দড়ি
গ্রাম বাংলার ঘ্রাণ ভেসে আসে নদীর বাতাসে
এই রাত শেষ হতে আর কতক্ষণ?

অধৈর্য

তুমি কি ফুলের পাশে মুখ
নিয়ে যাও?
না কি, ফুল এসে তোমার মুখের
ঘ্রাণ-লোভী?
কিছু কিছু ফুল আছে ঘ্রাণহীন, যেমন করবী—
তারা যায়
সভ্যতার সাময়িক পাঁশুটে হাওয়ায়
সেতুর নীচের শিশুরক্ত স্নানে।
ফুল বা মুখের ঘ্রাণ নয়, তারা শরীরের—
শরীরে নিচু চোখ, দু' চোখে হিরের মতো লোভ
আয়ুষ্কাল ভিত্তিভূমি, বাসনা
আরোপ করা হলে
আমি সেই ফুল নাম্নী মেয়েদের পাতা ছিঁড়ি দাঁতে।
এবার তোমার মুখ আনো, আমি ঘ্রাণ নেব
একান্ত বিরলে।

অগ্নিকাণ্ড

অরুণাংশু ভেবেছিল, দেখা হবে অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে
আগুন লাগবেই, সেটা জানা কথা, কবে বা কখন
শুধু তারই অপেক্ষায়, হাওয়ার দাপটে
একদিন শোনা যাবে সুতীব্র সংকেত, ঘুম ভেঙে
শরীরে হলকার আঁচ, চতুর্দিকে খুব ছুটোছুটি

অরুণাংশু ভেবেছিল, দেখা হবে অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে
কেন না অজস্র গ্লানি, ছেঁড়া জামা আগে সাফ হোক
ছায়াগুলো সরে যাক, ধোঁয়াগুলো গিলে খাক রাত
চিঠির বান্ডিলগুলি ছাই হোক, মুখখানি অশ্রুধোয়া হোক
তার সঙ্গে দেখা হবে, নতুন ভাষায় কথা হবে
আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে নতুন খেলার শিল্প গায়ে মাখা হবে

অরুণাংশু ভেবেছিল, দেখা হবে অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে
আগুন লাগবেই, শুধু সংকেত আসেনি।

চক্ষে গোলকধাঁধা

ছন্নছাড়া বিকেল একটা টানছে ঘূর্ণিমায়ায়
শরীরটা রোদ্দুরে দগ্ধ, মন রয়েছে ছায়ায়।

এখন একটা রাস্তা, তাতে যায় না মোটে হাঁটা
মানুষ নেই, কোথায় গেল, সবার পায়ে কাঁটা?

যাওয়ার কথা আরও দূরে, সময় নেই হাতে
সময় আর দূরত্বও মেতেছে মরা খাতে।

সব রাস্তাই নদীতে যায়, নদীর বুকে চড়া
এক জীবনে এত বন্যা। এবং এত খরা!

একটা নদী পেরুতে হবে, সামনে হাজার বাধা
বিকেল, না কি মাঝ রাত্তির, চক্ষে গোলকধাঁধা।

ধাঁধা

এ ওকে চায়, সে তাকে চায়, কে কাকে পায়
এর কী নাম, ও কেউ না, তৃতীয় লোক
এ চোখে জল, ও হাতে ছুরি, কে কোথা যায়
নীল হাওয়া, রোদ ঝলক, ভুল শহর
স্বপ্ন দেখে কে, স্বপ্ন ভাঙে কে, কে কাকে চায়
এ বাড়ি কার, দরজা খোলা, সিঁড়িতে ভয়
কখনও দেখা, যেন অচেনা, চোখ নিমিল
পাশে কে কার, ভালোবাসার অন্ধ প্রেত
চিঠি অনেক, ছেঁড়া এখন, আরও চিঠি
চিঠি নতুন, বিয়ের দিন, শিশুর দিন
এ একে চায়, সে তাকে চায়, সেই চাওয়া
ভাসে বাতাস, দীর্ঘশ্বাস, ভুল আকাশ
খালি বিছানা, কে জানলায় দেখে সুদূর?
ছায়া শরীর, ছায়া গোপন, ছায়া অতীত
তুমি আমার, আজও আমার, দেয়ালে দাগ
অফিস বাড়ি, বাড়ি অফিস, গোলকধাঁধা
হঠাৎ বৃষ্টি, সেখানে বৃষ্টি, সে কি ভাবছে
আমার কথা, কথা দেওয়া, কথা ভাঙা
আবার রোদ, রোদের ঝাঁঝা, সব অলীক!

সবচেয়ে হালকা অস্ত্র

বইখানির ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন পেত্রার্ক
জন্মদিনেই তাঁর শেষ ঘুম
পাশেই পড়ে আছে একটা পালকের কলম
মানব সভ্যতার সবচেয়ে হালকা অস্ত্র

সাভোনারোলা যখন আগুন নিয়ে খেলা করছিল
পোড়াচ্ছিল বই, চোখ রাঙাচ্ছিল একে তাকে
তখন একটু দূর থেকে ওই অস্ত্রটির নতুন শব্দ তরঙ্গ
ধরাশায়ী করে দিল মধ্যযুগকে।

বইয়ের ওপর মাথা রেখে শেষবার চোখ বুজেছেন কবি
পাশে পড়ে আছে তাঁর কলম
এইবার কলমটি উড়বে, বেরিয়ে যাবে জানলা দিয়ে
হাওয়ায় ভাসছে, দোল খাচ্ছে, মাঝে অদৃশ্যও মনে হয়
কিন্তু তা শুধুই দৃষ্টিভ্রম!

পাখির চোখে দেখা ৩

১

রেললাইনের পাশে একটা লাশ
পুরুষ না রমণী? পুরুষ হলে চার পাঁচ লাইন
নারী হলে ছবি সমেত পৌনে এক কলম
আর যদি যুবতী, ছিন্নবসন, নির্ঘাত প্রথম পৃষ্ঠায়
নারীবাদীরা তবু বলবেন, তাঁরা অবহেলিতা
এ যে এক উলটো ধরনের সত্য
জীবন যাদের ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে,
মৃত্যু তাদের তুলে আনে খবরের কাগজে!

২

গোরু চরানো রাখাল বালক দুটি বাঁশি বাজায় না, বাঁশি নেইও সঙ্গে
গাছতলায় বসে এ ওর নুংকু ছোঁয়
ওরা দু’জনেই এক জাদুকরী মোহিনীকে চেনে যার নাম বিপাশা বসু
বড় রাস্তার পোস্টারে সে দেখিয়েছে বিনা পয়সায় অনেকখানি ঊরু
ওদের মনের কথা আমি জানলাম কী করে?
আরেঃ, আমিই তো ওদের মধ্যে একজন
আমারও হাতে বাঁশি নেই, কিন্তু সারাদিন ওই ঊরুরও অতীত রহস্য
ছুটে যাওয়া হাসি
আমাকে চনমনে রেখেছে
ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখ!

রেলস্টেশনে নীরা

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া, নৌকাগুলি দোলে
নদীর ধার ঘেঁষে পুরনো রেললাইন
ভাঙনে ওপড়াবে নতুন গড়া সেতু
না না না এই ট্রেনে আসবে আজ নীরা

হাজারো যাত্রীরা ঘুমিয়ে থাকো সুখে
কোনওই ভয় নেই বজ্র বিদ্যুতে
একলা জানলায় যে আছে জেগে বসে
সে এক জাদুকরী, ওষ্ঠে মৃদু হাসি।

আঙুলে মায়াজাল, চক্ষে ধ্রুবতারা
আঁচলে সুবাতাস, বক্ষে গাঢ় আঁচ

এ নারী শিল্পের, এ নারী বাস্তব
এ নারী চুল খোলে আকাশগঙ্গায়

এই তো ট্রেন এসে থামল জংশনে
প্রথমে দেখা গেল সে নীলবসনাকে
ঝড় ও বজ্রের প্রবল মাতামাতি
দু'বাহু মেলে বলি, এবার ধরা দাও।

হে সুখ দুঃখের অতীত, ধরা দাও
বাসনা ভোগময়ী, এবার ধরা দাও
রক্ত মাংসের, কখনও স্বর্গের
অলীক বিদেশিনী, দৃষ্টি বিভ্রম
এবার ধরা দাও!

আলাদা আয়না

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে
আর বেশি দিন লাগবে না
এর মধ্যে যার যা দেনা-পাওনা আছে সেরে নাও
অন্ধকারে ছোটাছুটি... নাঃ, ওয়াচ টাওয়ার থেকে
জ্বলবে তীব্র সার্চলাইট
'অনু' ছিঁড়ে ছিঁড়ে রুটি আর 'প্রবেশ' ঘেঁটে ঘেঁটে তরকারি
আর খাওয়া-টাওয়া চলবে না
গোটা সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া এই শেষ হল বলে
এরপর চিড়িয়াখানার জন্তুর মতন দু'দিকে থাকবে
একই রকম চেহারার মানুষ
শুধু আয়না আলাদা!

এ কোন ঘাটে

এ কোন ঘাটে নৌকো ভিড়ছে
ঝুপ ঝুপ শব্দ আর অগুনতি হাতির শুঁড়ের মতন অন্ধকার
পৌঁছোবার জন্য এতই উতলা ছিলাম যে
জুতোটুতোও খোলা হয়ে গেছে
এখন কেন ঝাপটা মারছে হিমেল হাওয়া
দাঁড়ি-মাঝিরাও সব কোথায় গেল
কেউ তো লণ্ঠন হাতে ওপরে অপেক্ষা করে নেই
আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র পিঁপড়ে
এ রকম কথা ছিল?

এ কোন ঘাটে নৌকো ভিড়ছে
যাই হোক, উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে তো হবেই
একবার গলা ফাটিয়ে হেসে নেওয়া যাক!

উপমা

বহুদিন পর দুই ঊরুর মাঝখানে প্রিয় পরপুরুষের জিভের মতন...
মতন কী?
সব কিছুর উপমা দেওয়া এত সহজ নাকি?
ঠিক সেই অবস্থানে পুরুষের মাথাটিকে মনে হয়
কী মনে হয়?
একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল, মনে হয় মঙ্গল গ্রহের মতন
এটা কি উপমা হল? আকৃতি, প্রকৃতি বা রঙের মিল, কিছুই নেই
সুতরাং লেখা হবে না
এ রকম কত মনে হওয়া ভাষা পাবে না কোনওদিন
বজ্র বিদ্যুতের মধ্যেও উড়বে কার্পাস তুলোর মতন...

তিরতিরে স্রোত

সমস্ত ব্যস্ততা ও হুল্লোড়ের মধ্যেও সব সময় একটা তিরতিরে মন খারাপের স্রোত। যারা বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছে, তাদের কথা জানি না। বিমান চালক ও আলুর ব্যাপারীদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, ট্যাক্সির জানলা থেকে ছুড়ে দেওয়া পয়সা কুড়োয় যে ভিখিরি, আমি তাকে দেখি না, খবরের কাগজের রক্তস্রোত আমার আঙুলে লাগে, আমি বাথরুমে গিয়ে হাতে সাবান ঘষি, উত্তর না দেওয়া চিঠি জমতেই থাকে, মনে পড়ে না। জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়েছে একজন নিষাদ, কোন গ্রামের একটাও উনুনে আগুন জ্বলেনি, জুতোর প্রখর শব্দ তুলে সেও নামছে সিঁড়ি দিয়ে, বিশাল প্রাসাদের সব অন্ধকার, শুধু একটি ঘরে আলো, নদী এসে খেয়ে নিচ্ছে ইস্কুল বাড়ি। না, না, এসব নয়, এসব নয়...

শুধু সর্বক্ষণ একটা তিরতিরে স্রোত বয়ে চলেছে বেঁচে থাকার মধ্যে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি একটা বিশাল কালো রঙের সমুদ্রের ঢেউ!

জানতে ইচ্ছে করে

ওরা জঙ্গলে থাকে, কিন্তু জংলি মানুষ নয়
বাড়ি ঘর বানায়নি, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে যখন তখন
ঠিক যেন গল্পের মতন, অথচ গল্প নয় মোটেই
রাত্তিরের দিকে বেরিয়ে আসে আচমকা জনপদে
অশরীরী নয়
সঙ্গে থাকে বোমা, বন্দুক আর ল্যান্ডমাইন, এ ছাড়া দেশলাই
হতভম্ব পুলিশদের ওরা উর্দি খুলে নেয়, অথবা উড়িয়ে দেয় মুন্ডু
কখনও দিনের আলোতেও ভাঙে জেলের গরাদ, বিপথে
ঘুরিয়ে দেয় ট্রেন
ওরা জঙ্গলে ফিরে যায়, কিন্তু জংলি মানুষ নয়

দুপুরবেলা ওরা কী খায়, খিচুড়ি না হতে গড়া রুটি
রোজই নিরামিষ, না কি মাঝে মাঝে ডিমসেদ্ধ বা চুনো মাছ জুটে যায়
জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে
প্রত্যেকের কি একটাই প্যান্ট-শার্ট, না কি আরও কিছু থাকে গাছের কোটরে
দাড়ি কামায় না নিশ্চয়ই, নোখ বড় হলে তাও কি কাটে না
গান গায় মাঝে মাঝে? শুধু আদর্শের কথা নয়
চটুল রসের ইয়ার্কি
জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে

ধরা যাক একদিন দেখা গেল, পান্তা আছে কিন্তু নুন নেই
তখন নুন ছাড়াই বিশ্বমানবতা হজম করা যায়
কেউ কি ঘুমের মধ্যে কথা বলে? কেউ একা হিসি করতে গিয়ে কাঁদে?
টিলার ওপাশে সূর্যাস্ত দেখে কেউ কি থমকে দাঁড়ায়
ঢুকে যায় মেঘের খুনখারাবি প্রাসাদে
ওরা যে ভবিষ্যতের কথা ভাবে, সেই পথ কতখানি লম্বা
ওরা কি জানে না, বিপ্লব তার প্রথম ব্যাচের সন্তানদের চিবিয়ে চিবিয়ে
খেয়ে ফেলে
আর দ্বিতীয় ব্যাচ বিপ্লবকে উলটো দিকে ঘুরপাক খাওয়ায়
আর যারা আড়ালে গিয়ে বাঁচে, তারা আত্মজীবনীতে কাটাকুটি
করে বারবার
ওরা জঙ্গলের প্রতিটি পাতার শব্দ চেনে, মেয়েদের কথা বুঝি
ঘুণাক্ষরেও মনে আনে না
অবশ্য দলে দু'চারটি মেয়েও থাকে শুনেছি, তা নিয়ে বুঝি রেষারেষি নেই
লূতাতন্তু জালে কেউ জড়ায় না
জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে

বান্দোয়ান, বেলপাহাড়ির ওই সব জঙ্গলে গেছি তো কতবার
আর যাওয়া হবে না, আমি আর সেই আমি নই
আমি আর আকাশের নীচে কখনও ঘুমোতে যাব না
তবু ওদের কথা এত মনে পড়ে কেন

যদি কানু সান্যাল বা অসীমের মতন ওরাও
কোনও একদিন বলে, আমরা ভুল করেছিলাম সেই সময়ে
সেদিন আর আমি বেঁচে থাকব না!

পর্তুগিজ ভূত

স্তব্ধতার ভাষা নিয়ে কেউ কথা বলে
জলের শরীর নিয়ে কেউ বসে থাকে উপকূলে
শরীর বিলাসী, তুমি ওদিকে যেয়ো না।

ছোট ছোট দণ্ডে বাঁধা কয়েকটি প্রাণ
ওদের জীবন নেই, মুক্তি ছাড়া জীবনের কোনও মানে নেই
এই আসে, চলে যায়, পড়ে থাকে কয়েকটি অক্ষর
বারুদ রঙের ধুলো ঢেকে দেয় সব।

মাঝে মাঝে ভয় হয়, এ কার কবিতা?
আমারও মাথায় ভর করল নাকি কোনও এক
পর্তুগিজ ভূত?

মফস্‌সলের মেয়ে

বারবারই সে আঁচল ঠিক করে
ঠিকই ধরেছে, তার সামনে বসে আছে এক বুভুক্ষু স্তন-খাদক
যদি শুক্কুরবার বিকেল হয়, তার ফেরার বাস ধরার ত্বরা

দুটি কবিতার একটিতে বৃষ্টির জলের ফোঁটা
বৃষ্টিই ভাবা ভালো, কান্না টান্না দিয়ে কবিতা হয় না
কী চমৎকার লম্বা লম্বা পেলব আঙুল
আলি আকবর খান তোমাকে পেলে লুফে নিতেন
তুমি সেতার বাজাতে লস এঞ্জেলিসে

মেঘ গজরাল নাকি, ঈশান কোণে ঝড়ের ঝমক?
কেঁপে ওঠে মফস্‌সলের মেয়ে, দরজা-জানলা সব খোলা
একজন বৃষস্কন্ধ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে হাতে খড়্গ নিয়ে
কিন্তু আজ তো শনিবার সকাল, স্কুল বন্ধ, কোনও ভয় নেই!

আগুন দেখেছি শুধু

বাচ্চা বয়েসে লিখেছিলাম, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা
ধ্বনি মাধুর্য, ছবিটি ছিল না তীব্র
পেলিং পাহাড়ে দেখেছিলাম, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা
রভস চিন্তা, রূপের আড়াল বুঝিনি।

ভাঙা বিকেলের মেঘলা আলোয় পাহাড়ে পবনপদবী
সে কি শুধু নীল, স্বর্ণ উদ্‌ভাসন
থরথর করে কেঁপেছে স্বর্গ, পক্কবিম্বাধরা
ঊরু বিভঙ্গে আগুন দেখেছি শুধু।

জন্মদিনের ভাবনা

পাহাড়ের ঢালে এক পা মুড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে
কৃপাসিন্ধু মাহাতো
ওর সঙ্গে আমার কখনও চেনাশুনো হবে না
মনে মনে প্রায়ই কথা হয় অবশ্য
তালগাছের পাতার আড়ালে ডাকছে কুবো পাখিটা
কবিতার পঙ্‌ক্তিতে অনেকবার দেখা হয়
গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া একজন নির্দোষ মানুষ, যে দেশেরই হোক না
কিছুতেই দেখতে চাই না তার ছবি, তবু দেখাবেই দেখাবে
সকালের সংবাদপত্র
দেখার চেয়ে অদেখা জগতে আমি চলে যাই বারবার
যে-নদী আমি চিনিই না, তাতে পিঠ ফিরিয়ে স্নান করছে
এক একাকী কন্যা
তার সম্মুখ কেমন তা জানি না
তবু তার ভালোবাসা পাব না বলে মনটা আজও হু হু করে
এই বয়েসে, হ্যাঁ, এই বয়সেও, এমন কী আর বয়েস
বাহাত্তর ওলটালেই তো সাতাশ!

সে তো শুধু রূপকথা

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
যেতে হবে যেতে হবে চলো যাই চলো যাই
ধুলো ওড়ে ধুলো ওড়ে কালো ধুলো ঢাকো মুখ
চলো যাই, পড়ে থাক সব কিছু, মায়া থাক
ছায়াটাও ফেলে যাব, রোদ নেই, দিন নেই
শুধু রাত, ধুলো ওড়ে কালো ধুলো চলো যাই

বিছানায় ছাপ ফেলা শরীরের ছবি থাক
দেয়ালের রেখাগুলি ঝুরু ঝুরু ঝরে যাক
দরজায় কার নাম, সব কিছু ক্ষয়ে যাক
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই

এইখানে দেশ ছিল, আর কারো দেশ নেই
এইখানে স্নেহ ছিল, প্রেম ছিল, সব ভুল
দু' চোখের জল ছিল, শিশুমুখে হাসি ছিল
বিষ ধুলো বিষ ধুলো, মোহময় ভুল ছিল
ছিল কত রণনীতি, আগুনের ইতিহাস
দাঁতে দাঁত চোখে চোখ হাতে হাত দিন রাত
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
মা'র হাতে পোঁতা গাছ ফুলে কোনও রং নেই
ফলে নেই কোনও বীজ, জলে নেই কোনও প্রাণ
মাঠ আছে মাটি নেই মেঘ আছে ধারা নেই
পাহাড়ের বুক চিরে ঝর্নার সাড়া নেই
যেতে হবে যেতে হবে রব ওঠে যাই যাই

ফের যাওয়া চলে যাওয়া, সব কিছু ফেলে যাওয়া
দেশে দেশে ভেদ নেই, সীমারেখা গেছে মুছে
এ পৃথিবী সাদা কালো মানুষেরই সমভাগ
নেই আর ছুরি ছোরা কামানের নল নেই
বড় গলা কারো নয়, ছোটরাও ছোট নয়
কারো চোখ লাল নয়, সব চোখে চোখে ভয়
দেশ নেই তবু ভয়, পায়ে পায়ে এত ভয়
চলো যাই চলো যাই পা চালিয়ে চলো ভাই
একটুও দেরি নয়, করো ত্বরা, যদি চাও
ভোমরাটা জেগে থাকে, ওই শোনো দ্রিম দ্রিম!

হাতে কিছু নাই থাক, শরীরেও নেই সাজ

সবকিছু খুলে ফেলো, সব সুতো ফেলে দাও
পোশাকেও বিষ ধুলো থাকবে না এক কণা
নারীরাও আবরণ, ছুড়ে ফেলো আভরণ
সোনা-রুপো শিখী পাখা সব কিছু বিষমাখা
মানুষের গড়া বিষ মানুষের সারা গায়
মানুষের প্রিয় ভূমি গরলের কালো ছাই
এ তো নয় আশীবিষ, তার বেশি কোটি গুণ
চলো যাই চলো যাই, চলো পলাতক দল
ধরাতল ছেড়ে যেতে হবে আর দেরি নয়।

ওই দ্যাখো শ্বাস নেয় শূন্যের মহাযান
দ্বার খোলা, দলে দলে ছুটে চলে কালো মাথা
চলো যাই চলো যাই যদি পেতে চাও ঠাঁই
কোনওদিকে তাকিয়ো না, কেউ কারও বন্ধু না
ভাই বোন দারা সুত ধরে নাও সব মৃত
শুধু বাঁচা নিজে বাঁচা শুধু নিজ দেহ খাঁচা
কাছাকাছি মুখগুলি সবই যেন চোখ বোজা
কে যে নারী কে পুরুষ, তাও যেন নেই হুঁশ
গায়ে কোনও তাপ নেই চাপ নেই হাঁপ নেই
মাংসের পুত্তলি, কথা নেই সব চুপ।

কেঁপে ওঠে মহাযান, এইবার দেবে পাড়ি
বৃদ্ধেরা পড়ে থাকে, আছে শিশু, আছে নারী
এ কী মহাগর্জন, আগুনের ফুলঝুরি
বাতাসের হুড়োহুড়ি, কানে তালা, কানে তালা
তবু সব ঢেকে যায় কান্নার কলরব
বুকফাটা কান্নার ভাষা নেই গান নেই
কবরের পাশে বসা, শ্মশানের আঁচে বসা
জননী ও জায়া আর প্রিয়জন অভাজন
বুক খালি করা শোক, তবু বুক ভেঙে যায়

চোখে এত জল থাকে, বুকে এত ঢেউ থাকে
শত শত শতাব্দী জমে থাকা সব শেষ
স্বপ্নের, জেগে থাকা কৈশোর, যৌবন
শূন্যের মহাযান, কান্নার মহাযান!

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
বিষ ধুলো বিষ হাওয়া পৃথিবীতে পড়ে থাক
সাগরের ঘন নীল, ছোট ছোট দ্বীপগুলি
দ্বীপ নয়, ওই সবই, এক কালে দেশ ছিল
দেশ ছিল, কত গান, আরও কত প্রেম ছিল
এক দেশ ছেড়ে সব ফেলে গেছি একদিন
যার নাম দেশ তাও মানুষকে ঠেলে দেয়
কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা বন্দুক পিঠে তাক
সেদিনও তো চোখে জল, বুক ভরা অভিমান
ওই যেন দেখা যায়, ছোট থেকে একাকার
সব দেশ মিশে গেল, সবই আবছায়াময়
অস্ত্রের কারবারি হিংসার মহাজন
সবই আজ পথহারা, কে এসেছে কে আসেনি
যে-ঘাতক সেও আজ কেঁদে কেঁদে ধরে হাত
কার হাত, আহত বা আততায়ী কারও হাত।

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
এ পৃথিবী ছেড়ে যাই, চিরতরে ছেড়ে যাই
যেতে হবে যেতে হবে বিষ ধোঁয়া, যেতে হবে
একদিকে বাঁকা চাঁদ, আরও দূরে যেতে হবে
আরও কোনও গ্রহ আছে, নিশ্বাসে বাঁচা যায়
মানুষের অধিবাস পৃথিবীতে শেষ হল
ভিন কোনও গ্রহ ছাড়া মানুষের আশা নেই
বাসভূমি নেই আর মুক্তির পথ নেই
চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই

ধরা যাক পেয়ে গেছি ছিমছাম মনোভূমি
আলো আছে, হিম আছে, প্রতিরোধ নেই কিছু
বড় তারা রোদ দেবে, বর্ষণ প্রাণ দেবে
শূন্যের মহাযান, এইখানে থেমে যাবে?

থামুক না, কতদিন স্নান নেই খাওয়া নেই
চক্ষেও জল নেই, শরীরেও সুতো নেই
হোক না এ অচেনায় মানুষের বসবাস
ভ্রমরের আয়ুটুকু ধুকধুক টিকে থাক
করতলে আমলকী থাকবে কি থাকবে না
ফের এক ঘর বাঁধা নড়বড়ে খুঁটিনাটি
উনুনের ব্যস্ততা, আরও কিছু আছে বাকি
সবই হল ঠিকঠাক, ধরা যাক ধরা যাক
এ নতুন বসতিতে জীবনের চলা শুরু
চোখ মুছে পথ চলা, চোখে নেই কোনও জ্বালা
সব ভাষা ভুলে গেছি, ভাষাহীন নীরবতা
হৃদয়েরও ভাষা নেই, অতীতেরও ভাষা নেই,
তাই ভুলে যাওয়া সোজা, ফেলে আসা সব বোঝা

শুধু এক খোঁজাখুঁজি কী গোপন, কী গোপন
আমরা কি আজও আছি, মানুষ, না আর কিছু
আমরা কি আজও আছি, মানুষ, না আর কিছু?
আমরা কি আজও আছি...
আমরা কি আজও আছি...
অথবা কি অনাগত কাল এসে বলে দেবে
মানুষেরা ছিল নাকি কোনও দিন কোনও দেশে
ইতিহাসে লেখা নেই, সে তো শুধু রূপকথা!

প্রাণের প্রহরী
(কাব্যনাটক)

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। সাহেবপাড়ায়। সন্ধের পর এ অঞ্চল নিঝুম হয়ে আসে। চেম্বারটি বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার ছাড়াও একটি কালো রেক্সিনে মোড়া গদির বিছানা। সেখানে দু'জন বয়স্ক যুবক বসে আছে। এদের নাম প্রতীক ও সংবরণ। এরা অপেক্ষা করছে ডাক্তারের জন্য, নিচু গলায় কথা বলছে।

ডাক্তারের দশাসই চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। তাঁর নাম হৃষীকেশ। সবাই ঋষি বলে ডাকে। তিনি একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, অনেকটা নাটুকে ধরনের। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রৌঢ় চেহারার শিশু।]

দূর থেকে ডাক্তারের গলার আওয়াজ শোনা যায়:
ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?

প্রতীক : ঐ আসছে ঋষি, সারা পাড়াটা কাঁপিয়ে

সংবরণ : সারাদিন এত খাটনি, তবু ওকে ক্লান্ত হতে
দেখি না কখনও!

ডাক্তার: ব্যাপারটা কী হে! সব এত চুপচাপ
বসে আছো কেন? দূর থেকে ভাবলাম
কেউ নেই, আলো জ্বলছে, যেন কোনও বাগানের মধ্যে একটা ঘর।
কী রে সংবরণ, তুই কী যেন ভাবছিস মনে মনে?

প্রতীক: চুপচাপ থাকব না কি নাচানাচি করব দু'জনে?
কতক্ষণ ঠায় বসে আছি!

সংবরণ: আর ঠিক পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর ভাই
কেটে পড়তাম।

ডাক্তার: আরে বোস বোস, এত রাগারাগি কেন,
আমি একা বহুক্ষণ এখানে ছিলাম। এ সময়

কোনও সুস্থ মানুষের দেখা পেতে খুব
মন চায়। সারাদিন রুগি আর রুগি!
ক'টা বাজল?

প্রতীক: সাড়ে আটটা, না, না, তার পাঁচ মিনিট কম

ডাক্তার: যথেষ্ট হয়েছে! আজ রুগি দেখা এখানে খতম!
কানাই, কানাই, কেউ এলে বলবি, আটটার পর
সব অসুখের ছুটি। আমি নেই, দরজা বন্ধ কর,
এখন আনন্দ হবে, ফুর্তি হবে...
কে ওখানে?

সংবরণ: কেউ না তো?

ডাক্তার: মনে হল একটা ছায়া

সংবরণ: কিছু নেই

ডাক্তার: ওফ এক পার্শি মহিলাকে দেখে আসছি এক্ষুনি,
মাগীর অসুখ নেই কোনও

সংবরণ: ল্যাঙ্গোয়েজ! ল্যাঙ্গোয়েজ!

ডাক্তার: যত বলি, মা জননী। তোমার তো অসুখ কিচ্ছু না!
ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে তবু বলে, ডাক্তার, আমায় তুমি
ঠিক মতন ওষুধ দিচ্ছ না!
এখানে সেখানে ব্যথা, প্রতিদিন ঘুম যাচ্ছে কমে,
টাকার বান্ডিল, অতি বড়লোক ঘুম হয় টাকার গরমে?
প্রেসার নর্মাল, স্টুল, ইউরিন, কিংবা রক্তে চিনি,
সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা হল, স্বাভাবিক। তবু
প্রতিদিনই
ডাক পড়ে

প্রতীক: আহ্ ঋষি, রাত্তির অনেক হল, আমরা এখনও
পেচ্ছাপ বাহ্যির কথা শুনব? এর মানে হয় কোনও?

ডাক্তার: না, না, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আমারই সবচেয়ে বেশি। কে ওখানে?

সংবরণ: কেউ না তো?

ডাক্তার: মনে হল, ঠিক যেন কোনও

মেয়ে, বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে কেন এ রকম?

প্রতীক: টাকার ধান্দায় রোজ এত পরিশ্রম!
এরপর চোখে সর্ষেফুল দেখবে কোন্‌দিন, ঋষি!

ডাক্তার: (নিচু গলায়, আগেকার ভাষায় যাকে বলা হত
'জনান্তিকে'। অর্থাৎ তাঁর এ কথাটা অন্য কেউ শুনতে
পাবে না)
না, না, সে রকম নয়। বাবলুর অসুখের পর
একটি মেয়ের ছায়া দেখতে পাই ক'দিন অন্তর
চুপ করে দরজার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়
আবার চোখের এক পলক ফেলার আগে চলে যায়
আমি তো চিনি না, ও কে?

প্রতীক: মেয়েটি কেমন দেখতে?

ডাক্তার: (চমকে) কোন মেয়েটি?

প্রতীক: ঐ যে পার্শি মেয়েছেলে, যার কথা তুমি বলছিলে!

ডাক্তার: অসুন্দর পার্শি আমি এ পর্যন্ত দেখিনি কখনও,
ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে যে শরীরে রোগ নেই কোনও
তবুও অসুখ থাকে সেখানেও। এই যে মহিলাটি,
রোগ নেই, তবু তিনি অসুস্থ যে সে কথাও খাঁটি!

সংবরণ: তোমাদের প্রচণ্ড সুবিধে,
শুধু ভাই আমাদেরই যা কিছু দুর্ভোগ
যে অসুখ সারাতে পারো না, বলে দাও,
'ওটা মানসিক রোগ!'

ডাক্তার: হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সকলেরই খুব রাগ ডাক্তারের প্রতি,
অথচ ডাক্তার ছাড়া চলেও না, কিছু হলে কাকুতি মিনতি!
অন্যান্য সময়ে দুর্‌ শালা!
মনের অসুখ চিনে নিতে
ভুল তো হতেই পারে। ইচ্ছে আছে এই মনটাকে
একদিন ঠেসে ধরব ল্যাবরেটরিতে।
পঞ্চভূত মানুষের দেহে
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু আর ব্যোম। অত্যন্ত সস্নেহে

শরীর এদের পোষে। এর মধ্যে পঞ্চমটি বাদে
বাকি চারটিকে ঢের নেড়ে চেড়ে দেখা হয়ে গেছে,
কিন্তু গোল বাধে
অদ্ভুত জিনিসটি নিয়ে, ঐ ব্যোম, অর্থাৎ শূন্যতা
তার কোনও দিশা নেই, কোনও শাস্ত্রে নেই তার কথা।

সংবরণ: রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে এ বিষয়ে, সে সব পড়োনি বুঝি?
তা পড়বে কেন? ডাক্তারেরা বই-টই পড়েন না। শুধু মাত্র
রুজি-রোজগারের ধান্দাতেই মত্ত সমস্ত সময়

প্রতীক: সারা দিনে অ্যাভারেজ ঠিক কত হয়?
দশ, বিশ হাজার, না বেশি?

ডাক্তার: বাজে কথা বোলো না হে! প্রতিদিন দশ কি বারোটি
গ্রন্থপাঠ করি আমি। মানুষের নোখ থেকে মাথার করোটি,
হাড় মজ্জা রক্তের জীবন, এর চেয়ে বড় আর গ্রন্থ আছে?

প্রতীক: এ সমস্ত সস্তা দার্শনিকতা দিয়ে কি পেট টেট ভরবে ভাই?
ঢের হল! মালকড়ি ছাড়ো কিছু মাল-টাল খাই?

ডাক্তার: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আছে খুব আমার নিজেরই। মন ভালো নেই।
দিতে হবে এক ডুব ফুর্তির সাগরে কিছুক্ষণ।

(বোতল থেকে মদ ঢালা হয়। তিন বন্ধু চিয়ার্স বলে পান শুরু করে।)

ডাক্তার: কে, কে কে ওখানে?

প্রতীক: জ্বালালে দেখছি আজ? থেকে থেকে বারবার কে, কে?
ভুল হতে হতে তবু মানুষ তো খানিকটা শেখে!
রাত্তিরে ঘুমোও না বুঝি?

ডাক্তার: না, না, ভুল নয়, খুব স্পষ্ট চোখে দেখা
বাবলুর অসুখের পর থেকে

সংবরণ: বাবলু, তোমার ছেলে,
তার কী হয়েছে?

ডাক্তার: কী হয়েছে...

আমি নিজেই যে
জানি না উত্তর—

প্রতীক: ধুত্তোর!
খালি শুধু অসুখ,
অসুখ!

[নেপথ্যে একজন কেউ ডাকল, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!
নদীতে মাঝিরা যে-রকম সুর করে করে জল মাপে, সেই রকম কণ্ঠস্বর।]

সংবরণ: ঐ তো এসেছে কেউ
প্রতীক: ফের কোনও রুগি-টুগি
সংবরণ: এ লোকটিই বহুক্ষণ থেকে আছে দরজার পাশে?
ডাক্তার: না, না, এ সে নয়। একে জানি। চিনি এর
গলার আওয়াজ
মাঝে মাঝে আসে। সাত দিন পর আবার এসেছে বুঝি আজ।
[আগন্তুকের প্রবেশ। বৃদ্ধ, মুখে সাত দিনের পাকা দাড়ি। একটা রং-জ্বলে-যাওয়া নীল জামা গায়, সে আর কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে।]
আগন্তুক: ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: কে, ধরণী?
আবার এসেছ, তুমি এখনও মরোনি?
আগন্তুক: (সাগ্রহে) মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: মরার কি অন্য কোনও জায়গা পেলে না?
আমার কাছেই বুঝি আছে শুধু দেনা?
আগন্তুক: মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: সাত দিন কোথা ছিলে? ফের চাড়া দিয়ে উঠে এলে?
আগন্তুক: মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: চুপ করো! মরণের উচ্চারণ এখানে নিষেধ!

[ডাক্তার পকেট থেকে তিরিশ-চল্লিশটা টাকা বার করে দিলেন। লোকটি কোনও কৃতজ্ঞতা বা নমস্কার না জানিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।]

প্রতীক: কী ব্যাপার লোকটাকে দিলে এত টাকা?
আমাদের ফুর্তির খোরাক সব ফাঁকা?
সংবরণ: আগেও দেখেছি, তুমি ঐ বুড়োটাকে টাকা দাও,
ব্ল্যাকমেল নাকি?
ডাক্তার: ব্ল্যাকমেলই বটে! এই বুড়ো লোকটি প্রাক্তন নাবিক,
ছিল জলে ভ্রাম্যমাণ। এখন ডাঙায় এসে দিক
হারিয়েছে। ও চেনে না শহরের বাঁধা পথ; মাটির নিয়ম
ও জানে না। সংসারের বুদ্ধি ওর কম
ও বোঝে না নিজের সুবিধে
বাড়িতে পাঁচটি বাচ্চা, রোগা বউ, আর আছে খিদে
বেকারের খিদে পাওয়া অতি বড় দোষ
বেকারের সন্তানের খিদে পাওয়া আরও বেশি দোষ!
প্রতীক: আবার দুঃখের গপ্পো! আজ শুধু অনন্ত ঝামেলা।
ডাক্তার: না, না, না, না; এবারই তো শুরু হবে খেলা!
সংবরণ: ও বেকার, কিন্তু তুমি কেন দিতে যাবে ওর অন্ন?
তুমি কি সমাজ? নাকি রাষ্ট্র? নাকি খোদ দাতা-কর্ণ?
ডাক্তার: সে সব কিছু না।
আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনচর্যায়
এ রকম ফাঁক থাকে। ঐ লোকটা শূন্য-হাতে বাড়ির দরজায়
যদি ফেরে, ঠিক পাখির ছানার মতো, পাঁচটি হাঁ-করা মুখ
মেলে আছে। ওরা রোগী, এর নাম খিদের অসুখ!
ও তো পয়সা চায় না,
বিষ চায়! দু'-তিন বার ওর বাড়ি গেছি।
যা দেখেছি,
মনে হয়, এতকাল বইপত্রে যা কিছু শিখেছি
সেখানে উত্তর নেই এ সব প্রশ্নের।
এ পর্যন্ত খিদের ওষুধ কিছু বেরিয়েছে? তবে?
নাকি বিষ দেব?
আমি তো ডাক্তার, কিছু একটা দিতে হবে—
প্রতীক: ওসব বাতেলা ছাড়ো, মাল আনো

মালের উৎসবে
বুঁদ হয়ে থাকি! তুমি অতি বুদ্ধু তাই এখনও উত্তর
চাও, এখনও বিবেক নিয়ে প্যানপ্যান করে চলেছ, ধুত্তোর

ডাক্তার: কানাই, নিয়ায়, আরও মাল আন্ আজ ফুর্তি করি,
মন ভালো নেই
আমার নিজের ছেলে হাসপাতালে দিনের পর দিন...

সংবরণ: এমন ফুটফুটে ছেলে, তার কিছু হতেই পারে না

ডাক্তার: সুইডেন থেকে তার জন্য কিছু অ্যামপিউল কেনা
বিশেষ দরকার

প্রতীক: 'মাই সান, মাই এক্সিকিউশানার'

ডাক্তার: (চমকে) তার মানে?

প্রতীক: 'ওরে পুত্র, জল্লাদ আমার!'

ডাক্তার: কার পুত্র? কে জল্লাদ?

প্রতীক: প্রত্যেক পিতার পুত্র, পিতার জল্লাদ
এক ছোকরা এই নিয়ে লিখেছে কবিতা।
দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু, আর দিনে দিনে বড় হয় ছেলে
আর তুমি, তার পিতা ততই মৃত্যুর দিকে যাও তুমি হেলে!

ডাক্তার: এক্ষেত্রে আমিই বুঝি পুত্রহন্তা, সেই বুঝি ভালো...
মাত্র ন'বছর, এর মধ্যে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াল।
একি প্রতিশোধ?
আমি বহুবার বহু বাড়ি থেকে
মৃত্যুকে ফেরাই
মরণের সঙ্গে হয় পাশাখেলা
আমি জিতে যাই
তাই মৃত্যু এবার কি জাল ফেলে ছেঁকে
আমারই সংসারে দেবে থাবা?

সংবরণ: কী রকম আছে বাব্‌লু?

ডাক্তার: যখন ঘুমন্ত থাকে, ভালো থাকে,
হাসে, কথা বলে,
সত্যিই ঘুমের মধ্যে হাসে কথা বলে। যখনই সে জেগে ওঠে,

অসহ্য যন্ত্রণা,
যেন কাকে দ্যাখে
ক্যাবিনের বাইরে, কেউ নেই তবু দ্যাখে

সংবরণ: কী ঠিক অসুখ ওর?

ডাক্তার: নেফ্রটিক সিন্‌ড্রম। তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না,
দুটি কিডনিতেই ওর অজানা অসুখ

সংবরণ: অজানা অসুখ?

ডাক্তার: আশ্চর্য হলে কি? শুধু মন নয়,
মনুষ্য শরীরে
এখনও অচেনা কিছু রয়ে গেছে

প্রতীক: বিশ্বাস করি না! তুমি চিকিৎসা ছেড়ে মন্ত্রতন্ত্র নাও

সংবরণ: কিডনির অসুখ? আজকাল প্রায়ই শুনি
মাদ্রাজে ভেলোরে,
চমৎকার সেরে যায় সব...

প্রতীক: আরও একটু সরে
হোয়াইট ফিল্ড গ্রামে যাও, সাধু সন্ন্যাসীর দেওয়া ছাই ভস্ম,
হাওয়া থেকে ফুল...

ডাক্তার: ও সমস্ত কথা থাক, এসো খাই

সংবরণ: ঋষি, তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছো ভাই

ডাক্তার: হয়তো বাঁচানো যায়, আজ থেকে মাস দেড়েক আগে
ডাক্তার লোম্যান নামে একজন সেন্ট পিটার্সবার্গে
পরীক্ষা চালিয়েছেন বাঁধা-মৃত্যু দশ জন রোগীর শরীরে
নতুন ওষুধ কিংবা বিষ-ফল, ঠিক যেন মেঘ চিরে
হঠাৎ বিদ্যুৎ কিংবা বজ্রপাত কিংবা আশীর্বাদ,
শুভ কিংবা অশুভ সংবাদ...
পাঁচ জন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি!

সংবরণ: পাঁচ জন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি?
এ যে সাংঘাতিক
একি সার্থকতা নাকি ব্যর্থতারই আর এক দিক

ডাক্তার: যাক আর ও কথা নয়। ভুলে থাকতে চাই

ফুর্তি হোক। শালা মরণের মুখে ছাই
দাও, তুড়ি মারো, এই তো এসেছে, সব গ্লাসে ঢালো
কে ওখানে?
কে ওখানে?

[ঝনঝন করে গেলাস ভাঙার শব্দ ও জলতরঙ্গ বাজতে থাকে।]

প্রতীক ও সংবরণ: একসঙ্গে
কেউ নেই, কাছাকাছি আর কেউ নেই
আমরা তো কিছুই দেখছি না

ডাক্তার: আমিই কি শুধু দেখি? মনে হয় যেন খুব চেনা

একটি নারীর কণ্ঠস্বর: ঋষি, ঋষি

ডাক্তার: কে তুমি? তুমি কে?

প্রতীক: ঋষি, তুই এত চ্যাঁচাচ্ছিস কাকে দেখে?

নারীকণ্ঠ: ঋষি ঋষি

ডাক্তার: কে তুমি? দেখাও মুখ, এসো, কাছে এসো

নারীকণ্ঠ: আমি তো রয়েছি ঠিক তোমারই সম্মুখে

ডাক্তার: কুয়াশায় ঢাকা কেন, কায়া নেই বুঝি?
শুধু যেন ছায়া

নারীকণ্ঠ: চোখের কুয়াশা! ঋষি, এসো একবার
তুমি আর আমি শুধু মুখোমুখি বসি
দু'জনে মনের কথা এক মনে বলি

ডাক্তার: তোমাকে চিনি না, তবু দু'জনে মনের কথা হবে বলাবলি?
তুমি কোনও পাগলিনী বুঝি?
পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছ?

প্রতীক: আমাদের বন্ধুটি যে একা একা কথা বলছে
হঠাৎ পাগল হল নাকি।

সংবরণ: ঋষি, তোর কী হল, কী হল?

ডাক্তার:	তোরা আয় তো মেয়েটাকে ধরি

নারীকণ্ঠ:	না, না, ঋষি, আমাকে ছুঁয়ো না! তুমি, না, না ছুঁতে নেই
(দু’-তিন বার এই কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাসপাতাল, ক্যাবিনের মধ্যে খাটে ঘুমিয়ে আছে বাবলু। ন’-দশ বছর বয়েস। তাকে ঘিরে চার-পাঁচ জন ডাক্তার। সকলের মুখ মেঘলা, ঋষি তাঁর অধ্যাপক এক প্রবীণ ডাক্তারকে শেষবার অনুরোধ করলেন।]

ঋষি:	স্যার, নতুন ওষুধ এইমাত্র আমি নিজে দেখে
সব ঝুঁকি নিয়ে, সব ভেবে চিন্তে ভরেছি সিরিঞ্জে
আপনি দিন

স্যার:	ঋষি, তুমি ক্ষমা করো, আমাকে বোলো না
বুড়ো হয়ে গেছি, আজকাল হাত কাঁপে

ঋষি:	স্যার, কে না জানে আজও কলকাতা কিংবা সারাদেশে
আপনার তুল্য চিকিৎসক বেশি নেই

স্যার:	তবু তুমি ক্ষমা করো এই বৃদ্ধটিকে!
যে ওষুধ পরীক্ষিত নয়, তা আমি কী করে জেনেশুনে
দিই?
তোমার সন্তান সে যে আমারও অনেক আদরের।
ওকে আমি কী করে অজানা পথে নিয়ে যাব, বলো?

ঋষি:	(অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) ডক্টর লাহিড়ী, আমি
আপনাকে যদি

লাহিড়ী:	না, না, ঋষি, ক্ষমা করো

ঋষি:	ডক্টর সামন্ত? আপনিও ভয় পেয়ে

সামন্ত:	ভয় নয়, ঋষি, এ যে অর্ধেক হত্যার
ঝুঁকি নেওয়া

ঋষি: অর্ধেক জীবন? তার ঝুঁকি নেওয়া যায় না বুঝি?
ঠিক আছে। তা হলে আমিই নিজে পুত্রঘাতী হব,
নিজ হাতে এই বিষ আমি ওর শরীরে মেশাব।
আপনারা সবাই বাইরে যান তবে
[ঘর খালি। ঋষি ছেলেকে ডাকলেন]

ঋষি: বাবলু, বাবলু, ঘুম থেকে উঠে আয়,
আমরা দু'জনে ফের ভোরবেলা বাগানে বেড়াব

বাবলু: বাবা—

ঋষি: বাবলু, বাবলু

বাবলু: বাবা, তুমি কত দূরে আছো?

ঋষি: এই তো এখানে আমি, শিয়রের কাছে

বাবলু: ভীষণ যন্ত্রণা! বাবা, তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও,
আমাকে অনেক দূরে এমন কোথাও
যেখানে একটুও ব্যথা নেই—

ঋষি: এই দ্যাখ, আমার ডান হাতে ছুরি, আমি
চোখের নিমেষে
তোকে নিয়ে যাব সব যন্ত্রণার শেষে
এক শান্ত অন্য দেশে

বাবলু: খুলতে পারি না চোখ, এত ব্যথা,
কেন এত ব্যথা?

ঋষি: চোখ যে খুলতেই হবে, অন্ধকারে কী করে না দেখে
যাবি সেই অন্য দেশে?

বাবলু: ছুরি কই? এ যে ইঞ্জেকশান!

ঋষি: বাবলু, বাবলু, শোন,
খুব মন দিয়ে তুই শোন,
সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়তো উঠবি বেঁচে, কিংবা চলে যাবি পরপারে
যদি পরপার বলে কিছু থাকে,
সেখানে আমাকে দোষ দিস,
ভেবে নিস, বাবা তোকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়

পাঠিয়েছে সেইখানে। আর যদি কোনও ক্রমে বেঁচে
উঠিস তা হলে সেটা তোরই নিজের জয়

বাবলু: বাবা, তুমি সব যন্ত্রণার শেষ করে দাও

ঋষি: দেব, তাই দেব, তোর মা আমাকে মাথার দিব্যিতে
নিষেধ করেছে, বুঝি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে।
আত্মীয় বন্ধুরা, চিকিৎসক, কেউ রাজি নয়
তুই রাজি? তুই ছেলেবেলা থেকে দারুণ সাহসী

বাবলু: আমি রাজি। আমাকে ওষুধ দাও, কিংবা বিষ

ঋষি: তাই হোক। চোখ চেয়ে থাক

[মৃত্যুর প্রবেশ। মহাভারতের বর্ণনার মতন অনেকটা তার রূপ। সে একটি নারী। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। নতুন তামার বাসনের মতন গাত্রবর্ণ। পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের মতন কোঁকড়ানো চুল। তার চোখে জল।]

মৃত্যু: একটু দাঁড়াও ঋষি। কথা আছে

ঋষি: কে তুমি?

মৃত্যু: চেয়ে দেখো। খুব কি অচেনা লাগে? বহুবার
দেখা
হয়েছে তোমার সঙ্গে

ঋষি: তুমি সেই? খরা মাঠে বিমানের ছায়ার মতন
চকিতে মিলিয়ে যাও

মৃত্যু: বারবার ফিরে আসি

ঋষি: আমাকে না দেখে বুঝি মন কাঁদে? এমন প্রণয়?
আপাতত বাইরে যাও

মৃত্যু: আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী
আমি তমসার মধ্য দিয়ে ওর হাত ধরে
নিয়ে যাব

ঋষি: তুমি এই ছেলেটিকে জননীর কোল থেকে ছিঁড়ে
নিয়ে যেতে চাও

মৃত্যু: আমি এই শিশুটিকে কালের সীমানা ভেঙে শুধু

অসীমে পাঠাব

ঋষি: ওর মা'র স্নেহ, আর আমার বুকের ভালোবাসা
তাও কি অসীম নয়? পৃথিবীর এই মায়াপাশ
যদি ছিন্ন করো বারবার, তবে কেন তা বেছাও?

মৃত্যু: ঋষি, তুমি দেখেছ অনেক মৃত্যু, শুভ ও অশুভ
তবু কেন অস্থিরতা? সব মিথ্যে, আমি শুধু ধ্রুব

ঋষি: তুমি অহংকারী, তবু তোমার দু'চোখে
কেন জল? তোমার কি চক্ষুরোগ?

মৃত্যু: আমার হৃদয় নেই, তবু আমি দুঃখী।
আমি একা।
আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, তবু আমি নিত্য ভ্রাম্যমাণা,
অনধিকারিণী আমি, অথচ আমিই হাত পাতি

বাবলু: বাবা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?

ঋষি: কেউ না, বাবলু সোনা! নিছক মনের ভুল,
ছায়া।

বাবলু: বাবা, তুমি সব ব্যথা শেষ করে দাও

ঋষি: এই তো এক্ষুনি দিচ্ছি, দেখি ডান হাত

মৃত্যু: ঋষি, থামো

ঋষি: আঃ, বিরক্ত কোরো না, যাও!

মৃত্যু: ঋষি, তুমি হেরে যাবে

ঋষি: যাই যাব। তবু আমি কোনও দিন না লড়ে
ছাড়িনি
তুমি নয়, মৃত্যু নয়, জীবনের কাছে আমি ঋণী!
তুমি নারী, তুমি সরো, যমরূপী পুরুষ পাঠাও
যার সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তুমি যাও!

মৃত্যু: শোনো ঋষি, কেন এই চঞ্চলতা, এখনও দু'মাস
দিতে পারি ওর আয়ু, এখনও রয়েছে ওর শ্বাস
কেন তা থামাবে তুমি? এই পৃথিবীর রূপ রস
আরও কিছুদিন ওর প্রাপ্য, ওর নবীন বয়স
দ্বিগুণ শক্তিতে সব নিতে পারে, ততটুকু নিক

আমি ওকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখব জননী অধিক!

ঋষি: কে চায় তোমার কৃপা? আমি আছি প্রাণের প্রহরী।
শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে লড়ে যাই, মুষ্টি মধ্যে ভ্রমরকে ধরি।
এই যে তরল বিষ, এর মধ্যে অর্ধেক জীবন,
অথবা অর্ধেক মৃত্যু, দেখি আমি এর মধ্যে কোন
অর্ধাংশটি জিতে যায়, আমি আছি জীবনের দিকে
—তোমার সন্তান নেই, রাক্ষসিনী, তাই তুমি এই শিশুটিকে
নিয়ে জয়ী হতে চাও?
রাক্ষসিনী, রাক্ষসিনী!

মৃত্যু: ঋষি, শান্ত হও

বাবলু: বাবা, বড় ব্যথা, তুমি ব্যথা শেষ করে দাও

ঋষি: দেব রে, বাবলু সোনা, দেখি ডান হাত

মৃত্যু: ঋষি, শোনো

ঋষি: চুপ!

[ঋষি ইঞ্জেকশানের সুচ ছুরির ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন বাবলুর হাতে। বাবলু দু'বার বাবা বলে ডেকেই থেমে গেল হঠাৎ। তার গলায় সেতারের তার ছেঁড়ার মতন শেষ শব্দ হল। ঋষি সে দিকে একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে সিরিঞ্জটা ছুড়ে ফেলে দিলেন।]

মৃত্যু: ঋষি, তুমি হেরে গেলে

ঋষি: (শান্ত ভাবে) জানি। ওর ব্যথা শেষ হয়ে
গেছে

মৃত্যু: আগেই বলেছি হেরে যাবে

ঋষি: খেলতে এসেছি তাই আমি জানি খেলার নিয়ম,
হারজিত আছে। শুধু তুমি আর তোমাদের যম
কখনও হারো না, শুধু জয় নিয়ে দারুণ উল্লাস।
এবার তো সুখী হলে? নিয়ে যাও শিশুটির লাশ।
আমার প্রাণের টুকরো এই শিশু

মৃত্যু: সুখী নই, সুখী নই

যতবার জিতে যাই, ততবার মনে মনে হারি
অনন্ত কালের মধ্যে
আমি এক সুখশূন্য নারী।
এই হাত দুঃখ দিয়ে গড়া, চোখ দুঃখের সমাধি
এসো ঋষি, তুমি আমি দু'জনেই একসঙ্গে কাঁদি।

ঋষি: তোমার চোখের জল, প্রতিটি বিন্দুই মৃত্যু বিষ
তুমি যাও, আমার সন্তানটিকে নিয়ে যাও
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, এর পরও প্রতি অহর্নিশ
লড়ে যাবে
আমার বাবলুর মতো আরও শত সহস্রকে নিশ্চিত বাঁচাব
কখনও তোমার সঙ্গে আমার লড়াই থামবে না

মৃত্যু: তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী নই আমি, আমি আসি কালের নিয়মে
সমস্ত সংগীত এসে থামে এক সমে
গাছের পাতারা ঝরে যায়
সকালের ফুলগুলি সন্ধেবেলা সুষমা হারায়

ঋষি: এই সব ছেঁদো কথা, বস্তা পচা সান্ত্বনার ভাষা
শুনলে মাথায় রক্ত জ্বলে ওঠে, যাও, যাও
নাকি আমাকেও সঙ্গে নিতে চাও?
দেব গলা টিপে?

মৃত্যু: ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁতে নেই
বিশুদ্ধ কুমারী আমি, কোনও জীবিতের স্পর্শ
এই ভাগ্যে নেই
আমার একমাত্র সুখ পরাজয়ে

[হঠাৎ যেন বাবলু ঘুম থেকে জেগে উঠে বাবা, বাবা বলে ডাকে]

ঋষি: বাবলু, বাবলু, তুই ফিরে এসেছিস?

বাবলু: বাবা, সব ব্যথা সেরে গেছে

ঋষি: আঃ আঃ, এ কী স্বপ্ন, নাকি সত্যি?

মৃত্যু: ঋষি, তুমি বীর যোদ্ধা, হাতে তলোয়ার

গর্ব দৃপ্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ, এই দৃশ্যে
কী যে সুখ, কত সুখ হল যে আমার...

ঋষি: অর্ধেক মৃত্যুর ঝুঁকি, অর্ধেক জীবন
আমি জীবনের দিকে, আমি জেদি জীবনের দিকে!

এর পর ঋষি ও মৃত্যু দু'জনে বাবলুর দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসে।
দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

[এই কাব্যনাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে।]

মালঞ্চমালা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন।

রাজার ভাণ্ডার ভরা মণি-মাণিক্য, হাতিশালে কত হাতি, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া, রাজ্যে নেই চুরি-ডাকাতি, তবু রাজার মনে বড় দুঃখ। তাঁর কোনো সন্তান নেই।

কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত যোগী আর জ্যোতিষীর কাছে পরামর্শ নিলেন রাজা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত রাজা ঠিক করলেন, রাজ্যপাট ছেড়ে রানীকে নিয়ে বনে চলে যাবেন। রানীও মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে রাজি হয়ে গেলেন। সব ঠিক ঠাক। সেই রাত্রে রাজা আর রানী সোনার পালঙ্কে পাশাপাশি শুয়ে আছেন, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। শেষ রাতে যেই একটু ঘুম এসেছে অমনি স্বপ্নের মধ্যে দু'জনেই শুনতে পেলেন দৈববাণী:

(কালপুরুষের গান)

শোনো শোনো মহারাজ, শোনো মহারানী
এখনি যেওনা ছেড়ে এই রাজধানী
ভাবেন দেখি মনে মনে কী করেছ পাপ
পাপের খণ্ডন হলে যাবে অভিশাপ
কারে বা দিয়ছ দুখ কারে দিলে ছাই
কারাগারে কারা আছে, ভেবে দ্যাখো তাই
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি তবু করে গান
কে আছে এমন তার করহ সন্ধান।

যেই না গান শেষ হল, অমনি রাজা জেগে উঠে বললেন, কী শুনলাম, কী শুনলাম। রানী, ওঠো ওঠো।

রানীও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে বললেন, কী শুনলাম, কী শুনলাম। রাজা, আপনি কী পাপ করেছেন?

রাজা: রানী তুমি কী পাপ করেছ?

রানী: কিছু তো পাপ করিনি আমি কিছু তো পাপ করিনি। এমনকী এই জীবনে একটা পিঁপড়ে অবধি মারিনি। না, না, ভুল বলেছি, একবার একটা পিঁপড়েকে জলে ছেড়ে দিয়েছিলুম।

রাজা: ছি, ছি, ছি, রানী, তুমি একটা পিঁপড়েকে জলে ছেড়ে দিয়েছিলে? খুব অন্যায়, ভারী অন্যায়! আজ থেকে এই রাজ্যে আর কেউ পিঁপড়ে মারবে না।

রানী: মহারাজ, আপনি কোনো পাপ করেননি?

রাজা: উঁহুঃ!
যদিও আমি লোক মেরেছি বহু
কিন্তু সে তো যুদ্ধ
যুদ্ধে তুমি যা করো তা সমস্তটাই শুদ্ধ।
তবে
সত্যি কথা আজ বলতেই হবে
দোষ করেছি একটা
কালো হাঁড়িতে ঘষে দিয়েছি হুলো বেড়ালের নাকটা।

রানী: ছি, ছি, ছি, রাজা, আপনি বেড়ালের নাক ঘষে দিয়েছেন? সে যে অন্যায়, ভারী অন্যায়। আজ থেকে বেড়ালের নাক ঘষা নিষিদ্ধ।

রাজা: রানী, তুমি আর কী দোষ করেছ?

রানী: মহারাজ, আর তো কিছু না। আপনি আর কী দোষ করেছেন?

রাজা: আর কিছু না। আর কিছু না।
রাজা চেঁচিয়ে ডাকলেন, মন্ত্রী। মন্ত্রী।
মন্ত্রী তক্ষুনি হাজির।

মন্ত্রী: দণ্ডবৎ হই মহারাজ। এত রাতে ডেকেছেন, আজ আমার কী সৌভাগ্য।

রাজা: মন্ত্রী, কহ দেখি মন খুলে
কখনো মনের ভুলে
আমি কি করেছি কোনো পাপ?

মন্ত্রী: এ কী কথা শুনি আজ

পাপ করবেন মহারাজ
এ যে কানে শোনাও মহাপাপ অতি
সে জন্য তো আমরা আছি তৈয়ার
আদেশ পেলেই মাথা কাটি যার তার
মহারাজ তো সবাকার অগতির গতি।

রাজা: বলো দেখি সত্য করে
কারাগারে আছে ক'জনা?

মন্ত্রী: কেহ নাই মহারাজ
প্রজারা সবাই করে আপনার ভজনা।

রাজা: হাতে পায়ে বেড়ি তবু কে বা করে গান?

মন্ত্রী (চিন্তিত) বন্দিদশায় গায় গান কার এমন শখের প্রাণ?
ওঃ হো মহারাজ, মনে পড়েছে। এ সেই কোটাল ব্যাটা।
সাত বছর আগে তাকে আপনি কারাগারে পাঠালেন দিয়ে হ্যাটা।

রাজা: নগর রেখে শুনশান
কোটাল কেন গায় গান।
বাড়ি তাহার নদীর ধারে
যাবে কেন সে কারাগারে?

মন্ত্রী: ভুলেই গেছেন মহারাজ
কোটাল অতি জাঁহাবাজ
জলের ওপর দিয়ে হাঁটে
মুখের ওপর কথা কাটে।
সেই জন্য আপনি একদিন রাগ করে
তাকে ভরে দিলেন জেলখানায়।

রাজা: তাই নাকি, চলো তো দেখে আসি কোটালকে।

(কোটালের গান)

লোহা ঝনঝন বেড়ি ঝন ঝন
শীতে কনকন খিদে চনচন

মাছি ভনভন ব্যথা টনটন
গলা খনখন মাথা বনবন
হাওয়া শনশন রোদ গনগন
বাজে ঠনঠন কাজে ঢনঢন
হাঁটে হনহন...
দূর ছাই আর মনে পড়ছে না।

মন্ত্রী: ও কোটাল, কে এসেছেন, দ্যাখো মেলে চোখ।
কোটাল: ওরে বাবা, এ যে মহারাজ, জয় হোক জয় হোক।
এ যেন রাতের বেলা সূর্য, আমার জীবন ধন্য।
আদেশ করুন প্রভু এবার কী শাস্তি দেবেন অন্য!
রাজা: আজ থেকে তুমি মুক্ত হলে
আমি জ্বলেছি অনেক অনুতাপ অনলে।
যাও, বাড়ি চলে যাও
খাও দাও, প্রাণের আনন্দে গান গাও।
তবে একটি অনুরোধ শোনো
মুখের ওপরে কথা আর যেন বোলো না কখনো
কোটাল: কক্ষনো না কক্ষনো না।
আজ থেকে আর পায়ের ওপরেও কথা কবো না।

কথক: পরদিন রাতে আবার রাজা আর রানী
একই স্বপ্নে শুনলেন দৈববাণী।

(কালপুরুষের গান)

শোনো শোনো মহারানী, শোনো মহারাজ
কেমনে লভিবে পুত্র তা বলিব আজ
তিন দিন তিন রাত্রি থাকো উপবাসে
চতুর্থ প্রভাতে যেও মালঞ্চের পাশে
মালঞ্চে যুগল আম সোনার বরণ

সেই দুটি ফলে রাজা করিও পারণ।
পাকা ফল রানী খাবে, কাঁচা ফল রাজা
ভুল যদি করো তবে, পাবে ফের সাজা।

কথক: শুনে সেই দৈববাণী
আনন্দে আটখানা হলেন রাজা আর রানী।
উপবাসে কেটে গেল তিনটি দিন রাত
অবশেষে এল সেই আনন্দ প্রভাত।
ব্যাকুল হৃদয়ে রাজা ছুটলেন মালঞ্চের পানে।
সঙ্গে এল পাত্র মিত্র যে ছিল যেখানে।
সেই মালঞ্চে কচি পাতার নীচে এক বোঁটায় দুটি আম
ফলে আছে। একটি পাকা সোনার বরণ, অন্যটি কাঁচা।
রাজা ছুড়লেন তির
চতুর্দিকে সে কি ভিড়
তবু আম তো পড়ে না।
একটি নয় দুটি নয়
তির ছুড়লেন শয়ে শয়
তবু আম তো পড়ে না।

রাজা হুকুম দিলেন: যে পারো আম পাড়ো। তবে এক বোঁটায় একসঙ্গে দুটি থাকা চাই। নইলে রক্ষা নাই।

কথক: পাত্র মিত্র মন্ত্রী সেনাপতিরা অতি উৎসাহে আম পাড়তে গেলেন। কারুর ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে গেল, কেউ গাছে উঠতে গিয়ে হাত পা ভাঙল, তবু আম পড়ে না। ভিড়ের এক কোণে লুকিয়ে ছিল সেই রোগা লিকলিকে কোটাল। সে এবারে সামনে এসে বলল,

কোটাল: যদি অনুমতি পাই,
আম দুটিরে নীচে নামাই।

পাত্রমিত্ররা সবাই হে হে করে হেসে উঠল। একজন বলল,

হাতি ঘোড়া গেল তল
ফড়িং বলে কত জল
কত এল জ্ঞানী গুণী
এল এবার হাত-বাঁধুনী।

রাজা বললেন: দেখো কোটাল
না পারো তো শূল, পারো তো শাল।

কোটাল: মারি তো গণ্ডার
লুটি তো ভাণ্ডার
কাদায় পড়লে হাতি
ব্যাঙেও মারে লাথি।

কথক: মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট একটি পাথর
কোটাল এমন মন্ত্র পড়ে সবাই ভয়ে কাতর

কোটালের মন্ত্র: ক্রিং ঘ্রিং হ্রি ত্রিং
ছক্কা না ফক্কা
কথাটি কেউ কইলেই
অমনি পাবে অক্কা।

কোটাল ঢিল ছুড়তেই ঝুপ করে আম দুটি পড়ল রাজার পায়ের কাছে। সবার মাথা হেঁট।

রাজা গা থেকে নিজের শালখানা যেই কোটালকে দিতে গেলেন, অমনি মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, কোটালের শেষ কথাটার অর্থ কী?

রাজা বললেন: তাই তো, তাই তো, কী যেন বলেছে। কোটাল বলো তো আবার।

কোটাল: কাদায় পড়লে হাতি
ব্যাঙেও মারে লাথি

রাজা: অ্যাঁ? ফের আমার মুখে মুখে কথা কও?
মন্ত্রী এই দুর্বিনীত কোটালকে জেলখানায় ভরে দাও।

তারপর রাজা একাই ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন রাজপুরীর দিকে। যেতে যেতে

হাতের আম দুটি একবার দেখেন, একবার রাখেন। একবার দেখেন, একবার রাখেন। দেখে দেখে আর আশ মেটে না। শেষ পর্যন্ত রাজা আর লোভ সামলাতে পারলেন না, টপ করে খেয়ে ফেললেন একটি আম। মনের ভুলে রাজা খেলেন পাকা আমটি আর কাঁচাটি দিলেন রানীকে।

রাজার ঘোড়ার শব্দ শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রানী। রাজা বললেন, রানী, রানী, এই দেখো এনেছি সেই পরমাশ্চর্য ফল!

কথক: দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নিল রাজার ঘরে
অপরূপ সুরূপ রাজকুমার।
শত চাঁদ হার মেনে যায়
সারা অঙ্গে অমৃত গড়ায়
এমনটি দেখেনি কেউ আর।

রাজ্য জুড়ে ধুমধাম, নাচ গান অবিরাম, কত ফুর্তি কত মজা, দান ধ্যান করলেন রাজা, রানী দিলেন ষোড়শ উপাচার, প্রজাদের আনন্দ অপার।

তার পর এল ছয় ষষ্ঠীর রাত।

কথক: আঁতুড় ঘর আলো করে আছেন রাজকুমার
সেপাই মন্ত্রী পাহারা দেয় ঘিরে চারি ধার
আসবেন আজ কালপুরুষ দেবেন তিনি ললাটের লিখন
একবার যা লেখা হবে আর তা না হবে খণ্ডন
ফুলের মালা, সোনার ঝালর, জ্বলে ঘিয়ের বাতি
মা মাসি আর দাস-দাসীরা জেগে পোহাবেন রাতি।

(মহিলাদের কথাবার্তা)

রাত হল নিঝুম
সবার চোখে ভেসে এল সহসা কাল ঘুম।

(সেপাই শান্ত্রীদের নাক ডাকার আওয়াজ)

তিনটি প্রহর পেরিয়ে গেল, এল কালপুরুষ
দেখল না কেউ তারে সেথায় কারুর নেই হুঁস।

কালপুরুষ: সোনার বরণ রাজকুমার হীরের টুকরো মন
হাতে পতাকা, পায়ে পদ্ম অতি সুলক্ষণ
যা দেবার তা সবই আছে নতুন কি বা লিখি?

(হঠাৎ কালপুরুষ চমকিয়ে)

এ কি।
না, না, না, না, হায় হায় আমি এক্ষুনি চলে যাই
যা দেখলাম তারপর আর লেখার কিছু নাই।

সেই ঘরের দ্বারের কাছে শুয়ে ছিল মালিনী মাসি। কালপুরুষ তাকে ডিঙিয়ে যেতেই পায়ের ছোঁয়া লেগে গেল। অমনি জেগে উঠে সে পা চেপে ধরল কালপুরুষের।

মালিনী: রাজার দুলাল নয়নমণি ঘুমে আছে সে
দুয়ারে শোয় মালিনী মাসি তারে ডিঙায় কে?
কে তুমি কও সত্য করে দস্যু কি দানব
কি বা অভিসন্ধি তব, দেব কি মানব?

কালপুরুষ: ওরে মালিনী, পা ছাড়, আমি কালপুরুষ

মালিনী: রাজার দুলাল, নয়নমণি, রাঙা চাঁদের কণা
কী লিখিলে না কহিলে পা ছাড়ব না

কালপুরুষ: ওরে ছাড় ছাড়

মালিনী: কী লিখিলে না কহিলে ছাড়বই না আর

কালপুরুষ: নাছোড়বান্দা, জানাই শুধু তোরে
দ্বাদশ দিন পরেই কুমার যাবে যমের দোরে
ফল করেছে অদল বদল
পাকা ফলটি নিজে খেয়েছে রাজা
সেই ভুলে তার এমন হল সাজা।

নিজের দোষে সুখের আশা করল রাজা ছারখার
মালিনী তুই আমার পা ছাড়।

মালিনী: বারো দিন? হায় হায় হায় হায়

সকলে জেগে উঠে কী হল কী হল বলতে লাগলেন। তারপর একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। রানী মূর্ছা গেলেন।

রাজা: করেছি ভুল, করেছি পাপ
শাস্তি নেব তার
চাই না এই রাজ্যপাট চাই না কিছু আর
কত আশায় পূর্ণ চাঁদ
এনেছিলাম ঘরে
রাহুতে গ্রাস করবে তারে
বারো দিনের পরে।
হায় নিয়তি এমন ক্ষুধা
শিশুরে নেবে কেড়ে
দেখব না সেই দৃশ্য আমি
পৃথিবী যাব ছেড়ে।

কথক: মালঞ্চের পাশে রাজা ভূমিতে শয়ান
যদি না কুমার বাঁচে ত্যজিবেন প্রাণ
পাত্র মিত্র সবাই কাঁদে কেহ নাই বাকি
রাজার দুঃখে কেঁদে ওঠে বনের পশু পাখি
তাই দেখে কালপুরুষের দয়া হল মনে
ব্রাহ্মণের বেশে তিনি এলেন সেই বনে।

রাজা: কে আপনি দিব্য কান্তি জ্যোতির্ময় প্রভু?
মোর রাজ্যে আপনারে দেখি নাই কভু।

কালপুরুষ: আমি অত সাধারণ ব্রাহ্মণ
যেথা সেথা ঘুরি ফিরি যখন যেদিকে চায় প্রাণ মন।

রাজা: গ্রহ তারা আছে যেন তব দেহে মিশি
অন্ধকার দূর হল এল শুক্লা নিশি

সহসা পেলাম দেখা কোন পুণ্যবলে
নিরাশায় আশা যেন শান্তি শোকানলে।
ধন রত্ন সব দেব, যত খুশি চান
আঁতুড়ে কুমার মরে, তাহারে বাঁচান!

কালপুরুষ: পূর্ণচাঁদ রাহুতে খায়, সূর্যে গ্রহণ হয়
বিধাতার বিধান রাজা, মিথ্যে হবার নয়।

রাজা: তা হলে দেখুন প্রভু, এই তলোয়ার
এখনি বসাব বুকে নিজ প্রাণ রাখিব না আর।

কালপুরুষ: আরে আরে, করো কি করো কি
উপায় আছে কি কিছু দেখি।
যদি পাও সুলক্ষণা কন্যা এক দ্বাদশ বর্ষীয়া
রাজকুমারের সাথে দাও তার বিয়া
আঁতুড়ে বিবাহ হলে পুত্র রক্ষা পাবে
বধূ এসে সেবা যত্নে স্বামীরে বাঁচাবে।

কথক: যাবার আগে কালপুরুষ নিলেন একটি হীরে
আকাশ পথে যেতে যেতে সেই হীরেটি ছুড়ে দিলেন
নদীর অন্য তীরে।

(ঢাক ঢোলের শব্দ)

কথক: মহানন্দে রাজা ফিরলেন নগরে
ধ্বনি উঠল ঢাক-ঢোল-কারা-নগরে
চতুর্দিকে ছুটল রাজার চর
বারো বছরের কন্যা আছে কাহার ঘর
সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কত রাজ্যে
দূতেরা সব ঘুরে বেড়ায় এই জরুরি কার্যে
কিন্তু হায়, কোথাও নেই বারো বছরের কন্যা
যাঁদের ঘরে আছে তাঁরাও বিবাহ দিতে চান না
বারো বছরের মেয়ের সাথে আঁতুড় ঘরের ছেলের হবে বিয়ে

যারাই শোনে, তারাই হাসে ঠোঁট মুখ বেঁকিয়ে!
তা হলে কী উপায়?
রাজা-রানী-পাত্র মিত্র সবাই করেন হায় হায়
এদিকে দিন যায়
রাজকুমারের আয়ু মোটে আর একটি মাত্র দিন
শ্বাসপ্রশ্বাস হয়ে এসেছে ক্ষীণ

(মালঞ্চমালার গান)

মালঞ্চমালা: আকাশ থেকে খসে পড়ল হীরে
বিকেলবেলা বিজন নদীর তীরে
ও চাঁপা গাছ, ও শেফালি, বলতো তোরা বল
এই হীরেটি কোন্ দেবতার এক বিন্দু চোখের জল?

কথক: শুনে সেই গান
সহসা আকুল হল রাজার পরাণ
নদী তীরে যান ছুটে উথাল পাথাল
আশার তরঙ্গ হয় হৃদয়ে উত্তাল
সেখানে—
খাটের পৈঠায় আছে বসি
সোনার প্রতিমা এক যেন স্বর্ণশশী
পায়ের নূপুরে তার ভ্রমর গুঞ্জন
গান শুনে মনে হয় কোকিল কূজন
তখন—

রাজা: ওকে? ওকে? মন্ত্রী, বলো, ওকে?
দেবী না মানবী, নাকি ভ্রম দেখি চোখে?
মন্ত্রী: মহারাজ
মনে হয় এল বড় শুভদিন আজ
ওই সুলক্ষণা কন্যা, কোটালের বালা

দ্বাদশবর্ষীয়া মাত্র রূপ-গুণের ডালা!

রাজা: অ্যাঁ? সেই কোটালের কন্যা?
না না, না, না, চাই না ওকে চাই না।

মন্ত্রী: মহারাজ, সময় তো আর নেই মোটে
মন ঠিক করে নিন নিদারুণ এমন সংকটে।

রাজা: তবে যাও
কোটালকে কারাগার হতে দ্রুত মুক্ত করে দাও
কী করি যে নিরুপায়, নিয়তিকে ধিক
ফাজিল কোটাল হবে মম বৈবাহিক!

মন্ত্রী: (কারাগারে এসে) কোটাল ভায়া কোটাল ভায়া,
বেঁচে আছ কি
এবার তোমার জন্য জবর খবর এনেছি।

কোটাল: বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি
জেল খানাতে বেশ তো আছি
আসল কথাটি বলো তো খুলে
এবার বুঝি চাপাবে শূলে?

মন্ত্রী: সময় নাই তাই সংক্ষেপে জানাই
রাজার ছেলে হবে তোমার জামাই
হাত পায়ের বেড়ি খুললাম, শীঘ্র বাড়ি যাও
আঁতুড় ঘরে বাসর হবে, কন্যারে সাজাও!

কোটাল: হে— হে— হে— হে— হে!
শোনো শোনো পাড়া পড়শি কে কোথায় আছ কে হে!
মন্ত্র পড়ে ঢিল ছুড়লাম ফল পাড়লাম আমি
তাই আজ কন্যার আমার রাজপুত্র স্বামী
রাজার বেহাই হতে চল্লাম, নজর-খাজনা দে
হে— হে— হে— হে— হে— হে!
কোটালনী, দ্বার খোল, ও কোটালনী
তোমার কন্যা হবে যে আজ রাজবাড়ির ঘরনী

কোটালনী: না, না, না, না
দেব না আমি কন্যা

স্বামী রইলেন কারাগারে আমরা কুঁড়ে ঘরে
কেউ খবরও নিত না এক নজরে
ছেলের আয়ু বারো দিন মোটে
দেব না কন্যা যদি ভাতও না জোটে!

মালঞ্চমালা: মাগো তুমি বারণ কোরো না, আমি যেতে চাই
আমার কারণে যদি কেহ পায় প্রাণ, তার চেয়ে বড় কিছু নাই!

কোটালনী: দুখিনীর ধন তুই, ওরে তোরে কী করে ছাড়ি
যমের দুয়ার ও যে, নয় রাজবাড়ি!

মালঞ্চমালা: কী করেছি পাপ যমেরে শুধাব আমি
কেন হরিবেন আমার জীবন স্বামী;
বাবা তুমি যাও, রাজারে শুধাও আগে
দাবি আছে কিছু যদি তার মনে লাগে
বাসর শয়নে আমি যাব চলে আজই
তিনটি শর্তে যদি তিনি হন রাজি

কোটাল: কী কী তিনটি শর্ত আছে বলতো শুনি মা তোর
আঙুল তুলে নাচাই যদি তাও নাচবেন রাজা এমন কাতর

মালঞ্চমালা: হোক না রাজার কুমার তবু আমার স্বামী কোটাল ঘরের জামাই
বিয়ের পরে একটি দিন এই কুটিরে আসা চাই
আমার হাতের রাঁধা অন্ন রাজা রানী খেতে চাইবেন কিনা
বাসর ঘরে যা চাইব মেনে নেবেন কোনো প্রশ্ন বিনা

কোটাল: ঠিক ঠিক বলেছিস, তিনটি কথাই অতি ন্যায্য
না যদি মানেন রাজা উৎসন্নে যাবে তাঁর রাজ্য

(রাজসভায় কোটাল)

কোটাল: মহারাজঃ
রাজার রাজা মোহন রাজা
এক বংশী হাজা এক বংশী বাজা
আজ হলেও বেহাই কাল হলেও বেহাই
শর্তে আছে তিন তিনটি নইলে কোনো কথা নাই

প্রথম শর্তটি হল...

রাজা: কী এতবড় বেল্লিক নচ্ছার
শর্ত শোনাতে চায় আমাকে;
হবে রাজার বেহাই শুনে মাথা ঠিক নাই
কে কোথায় আছিস রে বাঁধ একে;
মন্ত্রী, কোটালকে ছুড়ে ফেলো গর্তে
মরুক সে বে-আদপি শর্তে
শূন্যে উড়িয়ে আনো মেয়েটিকে ওর
এখনি বিবাহ হবে না ফুরাতে এই নিশি ভোর

কথক: না হল গায় হলুদ, না বাজল সানাই
কেমন এ বিবাহ কন্যাপক্ষ নাই
নেই ফুল মালা আতর গন্ধ
নিঝুম রাজপুরী অতি নিরানন্দ
পুরুত মন্ত্র পড়ে ওম নমো নমো
বর শুয়ে কাঁদে ওঙা, ওঙা, ওঙা
ঘুরল সাত পাক শিশু স্বামী বক্ষে
নতুন বধূটির জল নেই চক্ষে
এসে বাসরঘরে যেই খিল দিল
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা এসে আকাশ ছাইল
সে কি মেঘ বৃষ্টি আগুন লেলিহান
প্রাসাদ-কুটির ভেঙে খান খান
ওঠে চতুর্দিকে দারুণ হাহাকার
সৃষ্টি বুঝি যায় সব ছারখার
মূর্ছা যান রানী দৌড়ে আসেন রাজা
সভয়ে ব্যাকুল যত ছিল প্রজা
বধূ না এ ডাইনি খেল বুঝি সব
এদিকে রাজপুত্র নিথর নীরব।

রাজা বাসরঘরে এসে দেখলেন মরা স্বামী কোলে নিয়ে চুপ করে বসে আছেন মালঞ্চমালা!

রাজা: ডাইনি ডাইনি,
দূর হয়ে যা সর্বনাশিনী!

মালঞ্চমালা: শর্ত মেনেছেন মহারাজ
বাসরঘরেতে আমি যা চাইব সকলি দেবেন আজ
আমি শুধু এইটুকু চাই
স্বামীকে বুকে নিয়ে বাড়ি চলে যাই!

রাজা: কী, এমন সাহস রাক্ষসীর
এখনও যে উচ্চে তোলা শির!
আমার পুত্রের প্রাণ খেয়েছিস
রাজপুরী, দেউল, প্রাকার ভেঙেছিস
আর তোর নাহিক নিস্তার
ওরে কে আছিস, জ্বলন্ত চিতায় এই ডাইনিকে
এখনই পুড়িয়ে তোরা মার।

॥ দুই ॥

বজ্রের গর্জন আর প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। একদল লোকের কোলাহল।

কথক: এত ঝড় এত বৃষ্টি। তবু জ্বলে চিতা
জীবন্ত পুড়িবে আজ কোটালদুহিতা

(আবার প্রচণ্ড শব্দ)

কথক: গুরু গুরু ওঠে রব, মাটি কেঁপে ওঠে
হুড়মুড় গাছ পড়ে, নদী জল ছোটে
শুরু হল ভূমিকম্প কে কোথা পালায়
তখন মালঞ্চমালা চিতা ছেড়ে যায়
প্রাণপণে দিল দৌড় ঘন অন্ধকারে
পহুঁছিল শেষে এক বনের মাঝারে

বিরাট এক বন সেইখানে স্বামী কোলে নিয়ে বসে রইল মালঞ্চমালা।

(ভূতপ্রেতদের শব্দ)

এক পেত্নি: চাকুম চাকুম চাকুম লো
মানুষের গন্ধ পাইলো।
এক ভূত: ঐ যে দেখি একটা খুকি
বাচ্চা-কোলে কাঁদে।
পেত্নি: চাকুম চাকুম চাকুম চাকুম
পড়েছে বেশ ফাঁদে
ওরে কে তুই ওরে কে তুই
মালঞ্চমালা: ছিলাম কোটাল কন্যা মালঞ্চমালা আমি
কপালের লিখনে পেলাম রাজপুত্র স্বামী।
ভূত: রাজপুত্তুরের মাংস, আহা, তার তুলনা নাই
পেত্নি: দে দে দে, আগে খোকাটারে খাই!
মালঞ্চমালা: যদি বা কিছু পুণ্য করে থাকি
না করে থাকি পাপ
তা হলে কেউ ছুঁয়ো না এসে আমাকে
দেব যে অভিশাপ
ভূত ও পেত্নি: ওরে বাপরে!
এ যে অভিশাপের ভয় দেখায়!
পেত্নি: ও মালঞ্চমালা, তোর পতি ঘুমে না যমে?
মালঞ্চ: ঘুমে!
ভূত: বলে কি! চোখ উলটে পড়ে আছে ও খোকা তো আমাদের!
পেত্নি: ও মালঞ্চ, ভালো করে দ্যাখ,
তোর পতি ঘুমে না যমে!
মালঞ্চ: ঘুমে!
ভূত: বলে কি! দে দে আগে ওর হাড় মাংস খাই
তারপর ওকে খোকা ভূত বানাই!
পেত্নি: আমাদের একটাও ছানা নাই!

(দূরে দু'জন পুরুষের গলার শব্দ)

পেত্নি: মালঞ্চ লো, বসে আছিস না?
মালঞ্চ: হ্যাঁ।
পেত্নি: পতি দিয়ে কী করবি মরা পতিটা দে না
মালঞ্চ: না

কথক: গন্ধ পেয়ে আসে ধেয়ে আরও কত ভূত
তারই মধ্যে এল ছুটে দুই যমদূত
১নং যমদূত: হঠো হঠো সব তফাত যাও
আমাদের জিনিস আমাদের নিতে দাও

(ভূতেরা গোলমাল করতে করতে পিছিয়ে যায়)

মালঞ্চ: কে তোমরা?
২য় যমদূত: আমরা কালদূত আর শালদূত!
১নং যমদূত: মালঞ্চ, যমের আজ্ঞা, স্বামী ছাড়ো!
মালঞ্চ: নাও দেখি কেড়ে কী করে পারো!
যদি বা কিছু পুণ্য করে থাকি
না করে থাকি পাপ
তা হলে কেউ ছুঁয়ো না এসে আমাকে
দেব যে অভিশাপ!
১নং যমদূত: হে— হে— হে— হে— হে— হে
অভিশাপের ভয় দেখায় এই মেয়েটা কে হে?
দে মরা স্বামী দে!
মালঞ্চ: পাই নাকো ভয় তোমাদের এই ধমকে
ডেকে নিয়ে এসো তোমাদের রাজা যমকে
২য় যমদূত: ওরে দাদা,
আমরা ছাপোষা প্রাণী নিতান্তই যমের পেয়াদা।
যদি অভিশাপ দিয়ে বসে, এসব ঝঞ্ঝাটে নেই কাজ

সদরে জানাই গিয়ে সব, যা বোঝার বুঝবেন যমরাজ!

(তারপর শন শন করে বাতাস বইতে থাকে, গাছপালা নিচু হয়ে আসে। ফিস ফিস করে শব্দ শোনা যায়: ও মালঞ্চ, মালঞ্চ লো, মরা পতিকে ছাড়, দ্যাখনা পচে উঠেছে, ফুলে উঠেছে, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, ওকে ছুড়ে ফেলে দে, তোকে সোনা দেব হীরে দেব, ভালো ভালো জামাকাপড় পাবি, আহার বিহার সুখ পাবি)

মালঞ্চ: না, না, না!

দূরে নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ। ক্রমে শব্দ কাছে এগিয়ে এল। খুব মিষ্টি গলায় একটা মেয়ে কথা বলে উঠল:

মেয়েটি: কে এখানে, মালঞ্চ নাকি লা? তাই বলি
তোতে আমাতে ছোট বেলা থেকে কত গলাগলি
তা বোন, ওটা কি দেখছি পড়ে আছে তোর কোলের কাছে
ওমা ও যে বাসি মড়া! ফেলে দে ফেলে দে, ও নিয়ে কি খেলতে আছে?
মালঞ্চ: কে রে এল গত জনমের বোন, আগে তো কখনো দেখিনি।
পতিকে ছাড়তে বলিস রে তুই কোন প্রেতিনী বা ডাকিনী?
দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা!
মেয়েটি: আহা, তোর পতি; মাগো তা বুঝিনি,
রাগ করিস নি বোন
যদি ভালো চাস তা হলে যা বলি মন দিয়ে আগে শোন
পতিরে আমার কোলে দিয়ে তুই চলে যা নদীর ওপারে
ওষুধ গাছের পাতা নিয়ে আয় তাতে সব রোগ সারে।
মালঞ্চ: তোরে দেব পতি? খেতে চাস বুঝি? কে তুই সর্বনাশিনী
যত অসহায় হই তবু আমি অকূল পাথারে ভাসিনি।
দেব অভিশাপ পুড়ে হবি ছাই
মেয়েটি: না, না, অত রাগ করিস নি ভাই
মালঞ্চ: সাক্ষী থেকো চন্দ্র তারা সাক্ষী থেকো অন্ধকার রাতি
পতি যদি না বাঁচে তো নিশি শেষে হব আত্মঘাতী

মেয়েটি:	ও মালঞ্চমালা, চেয়ে দ্যাখ
	ভোরের বাতাস এল
	দুঃখ নিশি ঘুচে গেল
	আর তোর কোনো নেই ভয়
মালঞ্চ:	ওমা, একে?
	হস্তে গলে ফুল মালা
	কে গো তুমি বনবালা
	দেখে খুব চেনা মনে হয়।
	কুকথা বলেছি কত
	মাথা ঠিক ছিল না তো
	ক্ষমা করো আমায় ভগিনী
বনদেবী:	সকলি বুঝেছি আমি মোটেই রাগি নি
	তুমি যে মালঞ্চমালা বনদেবী আমি
	দ্যাখো দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো জাগে তব স্বামী।

(বাচ্চার খিলখিল হাসি)

মালঞ্চমালা:	ওমা ওমা এযে সত্যি, এযে সত্যি!
বনদেবী:	যা বোন, এবার ঘরে ফিরে যা
	আহা কি সুন্দর তোর পতি, আমি ওরে নাম দিলাম চন্দ্রমানিক!

কথক:	বাতাস বইছে মন্দ মন্দ
	তাতে যেন চন্দনের গন্ধ
	মিঠে রোদ্দুর সোনার চাদর
	গায়ে লাগে যেন মায়ের আদর
	ফুলের বাহারে চোখ যায় ভরি
	পাখির কূজনে সুরের লহরী
	মালঞ্চমালা যায় বনপথে
	মন যেন তার স্বর্গ জগতে

চন্দ্রমানিক কোলে শুয়ে হাসে
কত প্রজাপতি ঘোরে চার পাশে

(বাচ্চার খিলখিল হাসি)

কিন্তু মালঞ্চমালা পথ ভুল করল। নিজের রাজ্যে না ফিরে সে আরও গভীর জঙ্গলে চলে গেল। আবার রাত্রি এল।

মালঞ্চ: এ কোন অচেনা দেশ, গহন কান্তার
সর্ব অঙ্গ বড় ব্যথা শক্তি নেই আর

(শিশুর কান্না)

মালঞ্চ: কোথা বনদেবী, সই বলে দাও তুমি
কেমনে যে পার হব এই বনভূমি

(শিশুর কান্না)

মালঞ্চ: রাজপুত্র স্বামী মোর সোনার থালায়
কোথায় খাওয়াব তারে, আমি অভাগিনী
এখন কাঁদেন তিনি ক্ষুধার জ্বালায়
বনবালা, বনবালা, কোথায় ভগিনী!

(দূরে বাঘের গর্জন)

মালঞ্চ: কে কোথায় আছ সব দেবদেবীগণ
দিতে পারি নিজের জীবন
যদি এক ফোঁটা দুধ পাই
কোনোক্রমে পতিরে বাঁচাই।

(বাঘের গর্জন কাছে চলে এল। একটা নয়, অনেকগুলো বাঘ)

বাঘ: হালুম! হালুম!
কাছাকাছি মানুষের গন্ধ পেলুম!

বাঘিনী: হালুম! হালুম!
এই তো গাছের তলায় দেখলুম
ফুটফুটে এক মেয়ের সাথে ছোট্ট একটি বাচ্চা
শিকার অতি সাচ্চা।

বাঘ: আমি মেয়েটাকে খাই, তুমি বাচ্চাটাকে খাও।

মালঞ্চ: বাঘমামা, বাঘমামা, একটি মিনতি করি শোনো
আমার সোয়ামি অতি শিশু, এরে খেয়ে লাভ নেই কোনো
একে তোমরা ছেড়ে দাও
তার বদলে আমাকে খাও!

বাঘ: এই রে মাটি করলে, প্রথমেই মামা বলে ডেকে ফেললে।
ভাগনীকে এখন কি করে খাই
তা হলে আর কাজ নাই
চলো বাঘিনী, অন্য শিকারে যাই!

বাঘিনী: আহা রে, তোমার স্বামী এমন শিশু হেন
তারে নিয়ে এই বনে এসেছ মা কেন?

মালঞ্চ: ভাগ্য যদি মন্দ হয়
সব পথই ভুল হয়!

বাঘ: চলো চলো, আমরা অন্য শিকারে যাই রাত রয়েছে বাকি

বাঘিনী: দাঁড়াও, আমরা চলে যাব, এরা খাবেটা কী?

মালঞ্চ: ব্যাঘ্র হলেন মামা, তুমি মোর মামী
বলে দাও, কী করে বাঁচাব মোর স্বামী।

বাঘিনী: তাই তো! এদের বাঁচাবার কী উপায়?
মানুষের ছানা কী খায়?

মালঞ্চ: উপায় একটি আছে মাত্র
যদি পাই দুধ এক পাত্র।

বাঘ: দুধ? দুধ? আহা বাছা, স্বামীকে খাওয়াবি?
গ্রাম থেকে ধরে আনি তবে একটা গাভী!

বাঘ আর বাঘিনী ডাকতে ডাকতে চলে গেল তারপর মালঞ্চমালা স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়।

মালঞ্চ: চাঁদের গায়ে মেঘ জমেছে ফুঁ দিয়ে সরাই
সাথী আছে বনের বাতাস কোনো চিন্তা নাই
দুধের নদী ক্ষীরের সাগর পিঠে পুলির পাহাড়
এখনি তোমায় এনে দেব কী চাই বলো আর?
আবার বাঘ-বাঘিনীর গর্জন। ওরা ফিরে এসেছে।

মালঞ্চ: কী হল বাঘমামা, দুধ পেলে না?

বাঘ: গ্রাম অনেক দূরে,
তাতে দেরি হবে দুধ আনতে
হাতের কাছেই রয়েছে তো বাঘিনী,
তার দুধ দুয়ে নে না, ভাগিনী।

মালঞ্চ: বাঘের দুধ?

বাঘিনী: দ্যাখ না খাইয়ে! দেখবি কত শক্তিমান
হবে তোর সোয়ামী যেন কার্তিকের সমান।

চ্যাঁক চোঁক করে দুধ দোওয়ানোর শব্দ। সেই দুধ খেয়ে চন্দ্রকুমার হেসে ওঠে।

কথক: বনের মাঝে কুটির বেঁধে থাকে মালঞ্চমালা
চন্দ্রমানিক পতি তাহার রূপে গুণে দশ দিকে উজালা
সদাই তাদের ঘিরে রাখে পশু পাখি সেথায় ছিল যত
সবার মাঝে মানুষ দুটি যেমন মৌচাকের মধুর মতো।
বাঘের দুধের এমনি গুণ বাঘ-বাঘিনী এমন প্রতিপালক
উনিশ দিনেই রাজার কুমার হল যেন দশ বছরের বালক।

মালঞ্চমালা: এই এই কোথা গেলে? প্রাণপতি, যেও না!

চন্দ্রমানিক: টুকি; মালঞ্চমালা আমায় ধরতে পারো না! আমায় ধরতে পারে না।

মালঞ্চ: অত দূরে যেও না প্রভু! বিপদ হতে পারে!

চন্দ্রমানিক: এই তুমি প্রভু বলো
তুমি আমার কে?
বলো না, তুমি আমার কে?

মালঞ্চ: ছিলাম কাহার কন্যা আমি গেলাম কাহার ঘরে
স্বপন সম সেসব কথা খানিক মনে পড়ে

চন্দ্রমানিক: কী আছে এই বনের শেষে, ওগো কন্যা বলো না!
জঙ্গল আর ভাল্লাগে না দূরে কোথাও চলো না!

মালঞ্চ: দূরে যেতে ভয় হয়, পাছে কেউ কেড়ে নেয় তোমাকে

চন্দ্রমানিক: কে আবার কেড়ে নেবে? কেনই বা কেড়ে নেবে আমাকে?
কী আছে বনের শেষে, আমার বাপ-মা থাকে কোথায়?
যদি তুমি পথ চেনো, চলো তবে চলে যাই সেথায়।

মালঞ্চ: ভয় হয়, দূরে যেতে ভয় জাগে মনে
কেন যাব, তার চেয়ে কত সুখে আছি এই বনে।

কথক: কিন্তু মালঞ্চমালার এই সুখ আর বেশিদিন সইল না।
একদিন সেই পথে এসে হাজির হল মালিনী মাসি।

মালিনী:   চেনা চেনা লাগে যেন, ওগো কন্যা তোমার কী নাম?

মালঞ্চ: আমি সেই মালঞ্চমালা, মালিনী মাসি তোমায় প্রণাম।

মালিনী:   চিতায় পুড়ে মরিস নি তুই? কেমন করে বেঁচে ফিরে এলি?
সঙ্গে এই বালকটি কে? একে আবার কোথায় পেলি?
হাতে পতাকা, পায়ে পদ্ম, ছেলেটি বড় সুলক্ষণ
সন্দেহ নেই এ আমাদের রাজপুত্তুর বিলক্ষণ!
ওরে ওরে কী আনন্দ, কী আনন্দ আজ
লক্ষ টাকার পুরস্কার আমায় দেবেন মহারাজ!
চল, চল, চল...

কথক: তারপর তো মালিনী মাসির হাত ধরে মালঞ্চমালা আর
চন্দ্রমানিক ফিরে এল রাজ্যে। রাজা রানী শোকে তাপে
আধমরা হয়ে ছিলেন, খবর পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে

উঠলেন। রাজ্য জুড়ে শুরু হল উৎসব। কিন্তু—

মালঞ্চমালা: এমন সুখের দিনে কাঁপে কেন ক্ষণে ক্ষণে
আমার চোখের দুটি পাতা
বিপদ আছে কি আরো, কেউ বলে দিতে পারো
কোথায় আমার পিতা মাতা?
মহারাজা—

(ঢাক ঢোলের মহড়া, মালঞ্চমালার কথা কেউ শুনছে না।)

মালঞ্চ: মহারাজ, আছে মোর কিছু নিবেদন
রাজা: হবে হবে পরে শুনব খন
মালঞ্চ: মহারাজ, কোথায় আমার পিতা মাতা?
রাজা: আছে তারা ভালো আছে, পরে শুনো সেসব কথা!
মালঞ্চ: মহারাজ, যদি অনুমতি পাই
একবার আগে যাই মম পিতৃগৃহে
রাজা: হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও না, চলে যাও, যতদিন খুশি
থাকো সেথা গিয়ে।
মালঞ্চ: মহারাজ, আমি একাকী যাব কি অতদূর পথ
এমন গহন রাতে
কথা ছিল সেই দীনের কুটিরে রাজার কুমার
যাবেন আমার সাথে!
রাজা: কথা ছিল? কার কাছে?
মালঞ্চ: আরও দুটি শর্ত বাকি আছে
রাজা: শর্ত? এমন সাহস কি তোর রাজাকে শোনাস শর্ত
কে কোথায় আছিস, এই ডাইনির চুলের মুঠিটা ধর তো!
মন্ত্রী: সে কি মহারাজ, এ মেয়েটি রাজবাড়ির পুত্রবধূ
পিতার কুটিরে একবার যেতে অনুমতি চায় শুধু!
রাজা: এত আয়োজন এত উৎসব ছেড়ে
আমার কুমার চলে যাবে আজ কোটালের কুঁড়ে ঘরে?
তোমরা শুনেছ এই মেয়েটির আহ্লাদ
যাও এক্ষুনি ডেকে আনো জহ্লাদ!

কোটালের মেয়ে বিষম কুটিলা আগে থাকতেই জানি!
দেখো ভালো করে এ মায়াবিনীর আসল চেহারাখানি
রাজকুমারের সাথে ছিল কত বয়সের ব্যাবধান
কী করে বা আজ হল দুইজনে এমন সমান সমান?
ডাইনি ছাড়া কি আর কেউ পারে ঘটাতে এসব কাণ্ড
যাও জল্লাদ, বনে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলো ওর মুণ্ড!

কথক: মাথাটি মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়ে মারতে মারতে তাহারে
ঘাতকেরা বেঁধে টেনে নিয়ে এল খুব উঁচু এক পাহাড়ে
বিষম গভীর খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল সজোরে
মালঞ্চমালা খাদের মাথায় ঝুলে থেকে কাঁদে অঝোরে।

(মালঞ্চমালার কান্না)

এক দিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায়...
তারপর সেখানে এলেন বনদেবী

বনদেবী: গাছের মাথায় শুয়ে শুয়ে
কাঁদছে দেখি একটি মেয়ে,
তুমি কে?
মালঞ্চ: কেউ নাই যার এ সংসারে
সব গেছে যার ছারে খারে
আমি সে!
বনদেবী: ওমা, এযে মালঞ্চ, মোর বোনটি
কী করে হল দশা তোমার এমনটি
খুলে কও তো সব!
মালঞ্চ: কিছুই তো নেই জানাবার
সুখ-দুঃখ কোনো কিছু আর
এখন করি না অনুভব।
বনদেবী: হুঁ, এবার সব বুঝেছি

ধ্যান নেত্রে সব কিছু দেখেছি
সেই রাজা এত পাপী, এত অকৃতজ্ঞ?
তার রাজ্যে এখনি বাধাব দক্ষযজ্ঞ!
আয় তো রে সিংহ, হস্তী, ভল্লুক, ব্যাঘ্র
কে কোথায় রয়েছিস চলে আয় শীঘ্র!

(নানারকম জন্তুজানোয়ারদের ডাক। এর মধ্যে বাঘ-বাঘিনী ডাকতে ডাকতে কাছে আসে।)

বাঘ: এ তো দেখি মালঞ্চমালা আমার ভাগিনী
চিনতে পেরেছিস একে বাঘিনী?

বাঘিনী: কেন, চিনব না ওকে আমি
ও মালঞ্চ, গেল কোথায় তোর সোয়ামী?

(মালঞ্চের কান্না)

বনদেবী: তোরা সবাই সাথে করে মালঞ্চকে নিয়ে যা
দেখিস যেন উচিত শাস্তি পায় সে পাপী রাজা!

কথক: ব্যাঘ্র বাহিনী মালঞ্চমালা আরও সব আসে সঙ্গে
নখী ও শৃঙ্গী যত প্রাণী ছিল ধায় সবে রণ রঙ্গে।
তাই দেখে সেই রাজার রাজ্যে পড়ে গেল হুড়াহুড়ি
প্রজারা সভয়ে যে-যেদিকে পারে দৌড় দিল ঘর ছাড়ি
শেষে রাজা এসে অতি দীন বেশে দাঁড়ালেন করজোড়ে

রাজা: (কম্পিত কণ্ঠে) মালঞ্চমালা, ওগো মা মালক্ষ্মী ক্ষমা করো
তুমি মোরে

(বাঘের গর্জন)

মালঞ্চ: আরে রাখো রাখো আমাকে প্রণাম করতে দাও
অরণ্যের ভাই বন্ধু, এবার অরণ্যে ফিরে যাও।

কথক: তারপর?

ভয় দূর হল, ঘরে ফিরে এল পলাতক প্রজা সবে
এ রাজ্যখানি মেতে ওঠে ফের নতুন মহোৎসবে
কিছুদিন পরে রাজা সন্ন্যাস নিলেন, গেলেন বনে
চন্দ্রমানিক সবাকার প্রিয় বসল সিংহাসনে
মালঞ্চমালা সে দেশের রানী রূপে গুণে আলো করা
এমন সে দেশ হাসিতে খুশিতে সকলের মন ভরা।
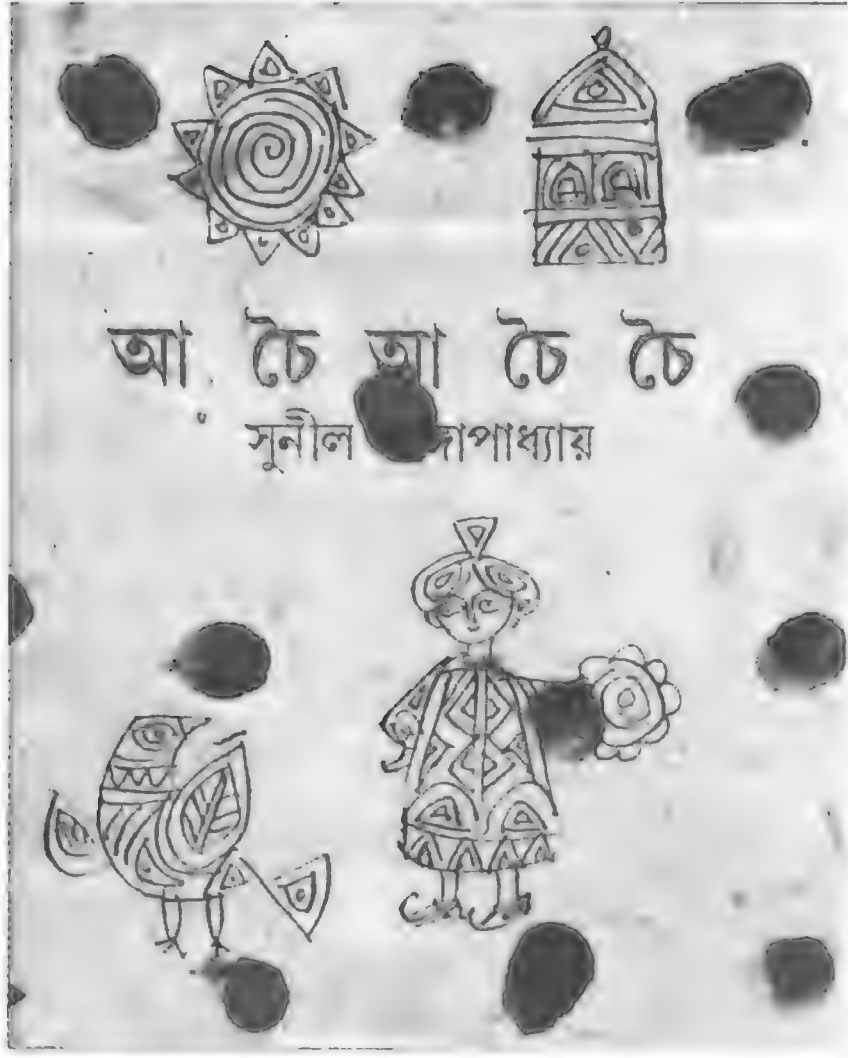
আ চৈ আ চৈ চৈ

সূচি

সিমলা যাত্রা

বাবামশাই সিমলা যাবেন
বেজায় হুলুস্থুলু
রাত জেগে মা বাক্স সাজান
চক্ষু ঢুলু ঢুলু।
শীতের জামা চাদর ছাতা
লিস্টি অতি বৃহৎ
মৌরি ভাজা, সুচ সুতো চাই
এবং উপনিষৎ!
খাজাঞ্চি ও গোমস্তারা
যাবেন জনা বারো
এবং রবি? মা বলেছেন
তুমিও যেতে পারো।

রবির এখন ন্যাড়া মাথা
তাই নিয়ে খুব লজ্জা
জ্যোতিদাদা পরিয়ে দিলেন
যুদ্ধে যাওয়ার সজ্জা।
জোড়াসাঁকোর পাল্কি এল
গঙ্গা নদীর ধারে
পাহাড় চূড়ায় যাবে এবার
সোজা ইস্টিমারে।

আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ

আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
হিঙ্গুল পুকুরের হাঁসগুলো কৈ?
দুধ সাদা দই সাদা চিনি আর খৈ
হিঙ্গুল পুকুরের হাঁসগুলো কৈ?
পুকুরের ধারে এক বাড়ি ছিল সই
তিনখানা গোরু আর সাতখানা মই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
পুকুরের ধারে সেই বাড়িখানা কৈ?
বাড়ি ভরা ছেলে মেয়ে হৈ হৈ হৈ
গাছগুলো ছুঁয়ে আছে নৌকোর ছই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
চারদিক শুনশান জলে ভাসে বই
আ চৈ, আ চৈ চৈ, চৈ চৈ চৈ
বান এল সব গেল থৈ থৈ থৈ!

রাজা আর সেপাই

সেপাই এসে যেই দাঁড়াল,
রাজা বললেন, সেলাম!
সেপাই বলল, হঠাৎ যেন
বিড়ির গন্ধ পেলাম?

রাজা বললেন, রামো, রামো
বিড়ি তো নয়, মুলো!
সেপাই বলল, গোঁফের ডগায়
জমছে কেন ধুলো?

রাজা বললেন, কমলা-আপেল
আনব কয়েক ঝুড়ি?
সেপাই বলল, কোথায় আমার
পেঁয়াজ-লঙ্কা-মুড়ি?

রাজা বললেন, বসুন আগে,
এই যে সিংহাসন,
সেপাই বলল, নোংরা ওটা
মাছিতে ভন্‌ভন্‌!

রাজা বললেন, মাছি কোথায়,
ওগুলো সব পাখি,
সেপাই বলল, কাজে-কম্মে
দিচ্ছ খুবই ফাঁকি!

রাজা বললেন, নাচার হুজুর
দেখাচ্ছি পা তুলে,
কত বড় ফোস্কা, আমার
জুতো দিন-না খুলে!

সাত-পাঁচ ভাবনা

একদিন ঘোর বর্ষার দিনে ছুটি-ছুটি ভাব দেখে
হলুদ রঙের কম্পিউটার ঘুম দিল নাক ডেকে।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে অ্যালজেব্রার ধাঁধা
হঠাৎ কে যেন বোতাম খুঁচিয়ে বলল, ওঠো তো দাদা!
হলুদ রঙের কম্পিউটার চোখ মেলে পাশ ফিরে

ছোট ভাইটিকে দেখে ধমকাল, কেন ঘুম ভাঙালি রে?
ছোট ভাই মিনি-কম্পিউটার নীল মুখ কালো করে
বলল, দাদা হে, ডেকেছি তোমায় বিষম বিপদে পড়ে!
একটা বাচ্চা ফুটফুটে মেয়ে নাম তার মধুবন
সকাল থেকেই করছে আমায় নিদারুণ জ্বালাতন।
সাত আর পাঁচে কত হয় তাকে বলতেই হবে আজ
এমন অঙ্ক জীবনে শুনিনি, নেই কোনো আন্দাজ!
থিটা-বিটা-গামা লগারিথমের সব কিছু জানা আছে
কিন্তু এটা কী? সাত-পাঁচ ভেবে এসেছি তোমার কাছে।

তাই শুনে মহা গর্জন করে বলল হলুদ, সাত?
আকাশে না জলে, তরল-কঠিন, আগে বল কোন জাত,
আর পাঁচ তার মাথায় না পায়ে, ফর্সা না কালো চাবি
এসব না জেনে প্রশ্ন করিস, একখানা চাঁটি খাবি?
প্যারাবোলা আর ইনফিনিটির জানি আগাপাশতলা
কী সাহস তোর আমার সামনে এলেবেলে কথা বলা?
এখনো বাচ্চা রইলি, কম্পু, শিখলি না ভদ্রতা
বড়দের কাছে বলা উচিত না, এসব ক্ষুদ্র কথা!

নীল-মিনি মাথা চুলকিয়ে বলে, আমি সাতে-পাঁচে নেই
বিচ্ছু মেয়েটা তবু যে আমায় ছাড়বে না কিছুতেই
হোমটাস্কের খাতা ফেলে উঠে আসছে বারংবার
দেখে যাই যদি আর দুই দাদা করে দেন উদ্ধার!

আর দুই দাদা মেগা ও সুপার, অতি জাঁদরেল তারা
কাছে আসতেই দপদপে লাল চোখ মেলে দিল সাড়া
কে আসে, কী চাই? পৃথিবী না চাঁদ, শুক্র না মঙ্গল?
মহাশূন্যের সঙ্গে আরেক শূন্যের যোগফল?
বলল কম্পু, অত কিছু নয়, শুধু পাঁচ আর সাত
শোনামাত্রই এল উত্তর লম্বা তিনশো হাত!

আরও কড়কড়, আরও ঘড়ঘড়, এবং ঘটাং ঘট
কাগজের ঢেউ দেখে নীল-মিনি সটান স্পিকটি নট!
মেগা যত বলে সুপার দ্বিগুণ, দু'জনের রেষারেষি
বোঝা সোজা নয় দুই পালোয়ান কে যে কার চেয়ে বেশি!

এমন সময় মধুবন এল দুলিয়ে মাথার চুল
হাসতে হাসতে বলল, কম্পু, আমারই হয়েছে ভুল।
সাত আর পাঁচে যোগ নাকি গুণ সেটাই দেখিনি আগে
সব অঙ্কটা ফের শুরু হবে, বলো তো কেমন লাগে?
পাঁচ কেন পাঁচ, সাত কেন সাত? বলো দেখি তাড়াতাড়ি
তা শুনে সবাই চুপ করে গেল, যেন সকলের আড়ি
মিনি ও হলুদ, মেগা ও সুপার চক্ষু রইল বুজে
লোডশেডিং-এর ধাক্কা! মেয়েটি তক্ষুনি গেল বুঝে।

খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়

খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ
বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ!

ভালোয় ভালোয় জাদুমণি
গোল পাঠাও বলকে
হাত ঘুরঘুর নাড়ু দেব
আস্ত গোটা দলকে!

যত ইচ্ছে হাত পা ভাঙো
নিজের নয় অন্যের
বোকা হলেই জোকার শুনবে
হাজার পঁচিশ সৈন্যের।

বল্‌কে যদি চ্যাপ্টা করো
গোলকে করো লম্বা
তখন তোমার কি যে হবে
জানেন জগদম্বা।

বাঙাল-ঘটি দাঁত কপাটি
ধূম্রলোচন ক্রুদ্ধ
খেলাচ্ছলে খেলা তো নয়
মরণ বাঁচন যুদ্ধ!

কায়দাটা শিখে নেবে?

এক লাফে বোম্বাই পাঁচ লাফে লন্ডন
টাকাকড়ি নেই কিছু পকেটটা ঢন্‌ঢন্।
বিমানে ও জাহাজেতে যায় এত কাহারা?
আমি ভাই চলে যাই তিন লাফে সাহারা।
নাম্বিয়া জাম্বিয়া নাইরোবি কঙ্গো
দেড় লাফ লাগে মোটে ছেড়ে যেতে বঙ্গ।
যেদিকেই যেতে চাই নাই কোনো শঙ্কা
যদি চায় পাসপোর্ট, দিই লবডঙ্কা।
জাপান বা আমেরিকা, চীনদেশ, রাশিয়া
যবে খুশি যাওয়া যায় অনায়াসে হাসিয়া।

এ এমন কিছু নয়, কত গেছি হিমালয়
ঘুরে-ফিরে চলে আসি স্বর্গ বা যমালয়।
কোনো দিকে বাধা নেই, পাহাড় বা জঙ্গল
চাঁদ-ফাঁদ ঘোরা আছে, এমনকী মঙ্গল।
আরও বার বার যাব, দিইনিকো ক্ষান্ত
ভেবো নাকো, মনে-মনে, যাই জলজ্যান্ত।
কায়দাটা শিখে নেবে? করো দেখি অনুমান
তোমাকেও হতে হবে মাঝে-মাঝে হনুমান!

নদীর ধারে একা

একলা একলা বসেছিলুম চূর্ণী নদীর ধারে
একটা দুটো জোনাকি-ফুল ফুটছে অন্ধকারে
আর তো কিছুই দেখা যায় না, আকাশে নেই তারা,
খেয়ার ঘাটও বন্ধ এখন, নিঝুম জেলেপাড়া।
গাছের ডালে ফুরফুরিয়ে দোল খাচ্ছে হাওয়া,
কেমন করে ওপারে যাই, হল না বুঝি যাওয়া
ছলাতছল ঢেউয়ের শব্দ, নদী ভাঙছে কূল
ভরা বর্ষায় চূর্ণী যেন খুশিতে মশগুল।

একলা বসে কী যে করি, সামনে সারারাত,
পেট জ্বলছে খিদেয়, আজ কপালে নেই ভাত
একটা যদি বাঁশি থাকত লাগিয়ে দিতুম সুর,
কদমগাছের তলায় না হয় হতুম কেষ্টঠাকুর!
রূপকথার গল্পগুলো হঠাৎ সত্যি হলে
মনপবনের নৌকোখানি ভেসে উঠত জলে।
কিংবা তেমন মন্ত্র যদি জানা থাকত আমার
শূন্য পথে পেরিয়ে যেতাম নদী ও খেত-খামার!

মেঘ ডাকল দারুণ, দেখি বিদ্যুতের ছটায়
একটা কাগজ পড়ল আমার পায়ের কাছটায়,
কাগজ তো না, চিঠি একটা, আকাশ থেকে এল?
নিশুত রাতে আমায় এমন চিঠি কে লিখল?
সত্যি-সত্যি চিঠিই সেটা বাংলা অক্ষরে,
আবার বিজলি চমক দিতেই নিলুম সেটা পড়ে।
খিদে-তেষ্টা রইল না আর জুড়োল প্রাণমন,
সেই চিঠিটার মানে বুঝতেই কাটবে সারাজীবন!

খাদ্যাখাদ্য

তোমার আমার খিদে পেলে
খাই পেয়ারা কলা,
ওস্তাদজি সেই সময়ে
সাধতে বসেন গলা!
শান্তিপুরের জামাইবাবু
মানুষ অতি শান্ত,
খাবার দেখলেই বলেন, ওরে,
আয়নাখানা আন তো!

আছেন মস্ত সওদাগর
হিম্মতসিং খান্না,
হিরে-মুক্তো গুঁড়ো ছাড়া
আর কিচ্ছুই খান না!
পাশের ফ্ল্যাটের ছোট্ট মেয়ে
বায়নার নেই অন্ত,
টুথপেস্ট সে খাবেই খাবে,
পায়েসে মাজে দন্ত!

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজান
রামমনোহর পাত্র
চায়ের মধ্যে চিনি দিলেই
জ্বলে তাঁহার গাত্র!
গজেনবাবু ম্যাজিক দেখান
জ্যান্ত আগুন খাওয়া,
পদ্য যাঁরা লেখেন, তাঁদের
খাদ্য দখিন হাওয়া!

এর চেয়ে ভাই তুমি আমি
আছি দেদার মজায়,
মনের সুখে খিদে মেটাই
মণ্ডা-মিঠাই-গজায়!

হ্যালির কমেট

হ্যালির কমেট

হ্যালির কমেট হ্যালির কমেট এত দিনের পরে
পৃথিবীখানা দেখছ কেমন, বলো না সত্যি করে।
সেই যে তুমি এসেছিলে অনেক বছর আগে
তখন বাতাস মিষ্টি ছিল, এখন কেমন লাগে?
তখন ছিল সবুজ ধরা, এমন কেমন ধারা?
অন্য কোথায় আছে এমন? আমরা সৃষ্টিছাড়া?

দেখছ কত নতুন কিছু লম্বা লম্বা বাড়ি
বিজলি রেলের পাশ দিয়ে যায় রিক্সা, গোরুর গাড়ি
আকাশ জুড়ে বিমান রকেট করছে হাঁকাহাঁকি

অ্যাটম বোমার ধোঁয়ায় তোমার চোখ জ্বলছে নাকি?
সাহেব কমেট, সাহেব কমেট, একটা কথা বলো
এখন সবাই খারাপ এবং আগের সবাই ভালো?
এই কথাটা মানতে আমি কিছুতেই পারবো না
কালোর মধ্যে আলোও থাকে, ছাইয়ের মধ্যে সোনা।

মুন্নির বেড়াল

সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি
দিনের বেলায় এদিক ওদিক যায় না
ভাজা মাছটি উল্টে খেতে চায় না
সবাই বলে আহা কেমন লক্ষ্মী
কোথায় থাকে জানেও না কাকপক্ষী
দুপুরবেলা গড়ায় আমার বালিশে
মুচকি হাসে আমার শত নালিশে
বিকেলবেলা রোদ্দুরে গা শুকোয়
ইঁদুর দেখলে ঘরের কোণে লুকোয়।

সত্যি কথা বলছি তোকে মুন্নি
তোর বেড়ালটা আসলে শাঁকচুন্নি
সন্ধে হলেই চেহারাখানি অন্য
রোঁয়া-ফোলানো যেন বিষম বন্য
গোমড়া মুখ, চক্ষু দুটি অগ্নি
বাঘের মাসি, বা সিংহের ভগ্নি
দেখেছি আমি প্রতিটি মাঝরাত্রে
কোথায় যায় অন্ধকার সাঁতরে

ফিরলো যখন ঠোঁটের কোণে রক্ত
মানুষ-খেকো নয় যে, বলা শক্ত!
তাই তো বলি সবই উল্টোপাল্টা
যা ভাবিস তা নয় ভিজে-বেড়ালটা।

বৃষ্টির রূপকথা

মেঘের মুলুকে আজ কি যে কোলাহল
কে যেন ঝরায় তার দু’ চোখের জল
বাড়ির কর্তা কাকে রেগে গরজায়
ভীষণ চাবুক দেখে চোখ ঝলসায়।
ফাজিল ভাইপো তার উত্তুরে হাওয়া
হি-হি-হু-হু হেসে শুধু করে আসা যাওয়া।

আকাশের বাড়ি ঘর ভেঙে চুরমার
সেই ভাঙা জমে হল বিরাট পাহাড়
টিম্‌টিম্‌ জ্বলছিল চাঁদ-লণ্ঠন
হঠাৎ ঢাকলো তাকে মেঘ-পল্টন
আঁধারেতে ঢেকে গেল সব কোলাহল
শুধু শুনি ঝরে কার দু’ চোখের জল।

বাবা আর মা

বাবাও নাকি ছোট্ট ছিলেন
মা ছিলেন একরত্তি
ঠাম্মি দিদু বলেন, এসব
মিথ্যে নয় সত্যি।
বাবা ছিলেন আমার সমান
টুয়ার সমান মা
বাবা চড়তেন কাঠের ঘোড়ায়
মা দিতেন হামা!

বাবা ছিলেন দস্যি ছেলে
মা খুব ছিঁচকাঁদুনে
বাবা খেতেন কানমলা খুব
বিশ্বাস হয় শুনে?
আমি ছোট, বুবুন ছোট
টুয়া, জিয়া আর ভাই
মায়েরা সব মায়ের মতন
বাবারা সব বাবা-ই।

ঘুমের ছড়া

ডিংডা ডিডাং ডিং ডাং
পুপলু যাবে কার্শিয়াং
কু ঝিক ঝিক ছোট্ট গাড়ি
সাহেব মেমের মামার বাড়ি

ডিংডা ডিডাং ডিং ডিং
পুপলু যাবে দার্জিলিং
শীতে হু হু গা হিম হিম
পাহাড় চুড়োয় আইসক্রিম

ডিংডা ডিডাং ডিং ডং
পুপলু যাবে কালিম্পং
টাট্টু ঘোড়া চালাও জোরে
পক্ষীরাজ হাওয়ায় ওড়ে

ডিংডা ডিডাং ডিং ডুং
পুপলু এবার যাবে ঘুম
ঘুম পাহাড়ে যাবে ঘুম
ঘুম পাহাড়ে যাবে ঘুম...

শিবঠাকুরের আপন দেশে

ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার শেষে
এলেম কোথায় এ কেমন দেশে
ঘুটঘুটি রাত হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড়
কারা ঘোরে সব ডাকাত না চোর
হাতে হারিকেন মাথায় গামলা
তবে কি উকিল, তবে কি আমলা
বেড়ালের মুখে শেয়ালের ডাক
জোনাকির পেট ফুলে জয়ঢাক
ডিগবাজি খেয়ে সামনে কে যায়
কারা ঢুঁসো মেরে ছুটছে বেজায়

হেঁকে বলি, দাদা, কোথায় যাচ্ছো
জবাব পেলুম, একুশ হ্যাঁচ্চো!

দিনের বেলায় মন্তর ফুস
সব ঠিকঠাক জ্যান্ত মানুষ
ঘুমোচ্ছে কেউ ঠ্যাং দুটো তুলে
নামতা পড়ছে কেউ কান মুলে
ছেলে হেসে খুন মাস্টার কাঁদে
চিংড়ি পড়েছে বোয়ালের ফাঁদে
গোয়ালার গোরু চিড়িয়াখানায়
বাঘের দুধের মিষ্টি বানায়
শুনি ঢুস্ ঢাস্ ধড়াস ধ্যাদ্দো
কুস্তিওয়ালারা লিখছে পদ্য
পালাবো কোথায় রাস্তা পাইনে
ধরা পড়ে গেছি একুশ আইনে।

খেলার নাম

খেলার নাম ধুন্ধুমার
নিয়ম এই রকম
বাইশ জোয়ানে বল ছোটাবে
যতক্ষণ না দম
ফুরোয় এবং দর্শক হয়
দশটি হাজার যম।
দম ফুরোলেই অন্য খেলা
সোডার বোতল ইটের ঢেলা

গোলের কাছে গন্ডগোল
হর হর বম্ বম্।
খেলা ফুরুলে বাড়ি ফিরবে
দু’-তিন জন কম।

পায়ের তলায় সর্ষে

আমার বাবার ঠাকুরদাদা এক শুক্কুরবারে
হঠাৎ যেন বদলে গেলেন বসে নদীর ধারে।
আমার বাবার ঠাকুরদাদা দারুণ স্বাস্থ্যবান
একটি ধামা মুড়ির সঙ্গে দশটা লঙ্কা খান।
গায়ের রংটি কালো হলেও রাগলে পরেই লাল
তন্ত্র মন্ত্র জানেন অনেক, নাচান কঙ্কাল!
সেই তিনি এক দুপুরবেলা ঝামরে মাথার চুল
বললেন, ওঃ, জীবনখানাই মস্ত বড় ভুল!
একই বাড়ি, একই উঠোন, মানুষজনও চেনা
প্রত্যেকদিন সব-কিছু এক, আর তো ভাল্লাগে না!
শুয়ে শুয়ে দেয়াল দেখা, দেয়াল নয়তো খাঁচা
খাইদাই আর বগল বাজাই, এর নাম কি বাঁচা?
এই না বলে নৌকো খুলে জোয়ার-জলে ভেসে
আমার বাবার ঠাকুরদাদা গেলেন নিরুদ্দেশে।

কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন, কেউ জানে না আর,
সবাই বলে গেছেন তিনি তিন সাগরের পার!
নতুন কোনো দ্বীপের মধ্যে বানিয়ে নিলেন দেশ
তিনিই রাজা, তিনিই প্রজা, একলা আছেন বেশ।
কেউ বা বলে গেছেন তিনি কিউবা, হনুলুলু

এখন নতুন নাম হয়েছে কার্ভালো কোভুলু!
এক পাদ্রি ছবি দেখেই বললেন, কে ইনি?
সুবিখ্যাত ভূপর্যটক বিলক্ষণ চিনি!
রাশিয়াতেই দেখেছি শেষ, মাথায় পাগড়ি বাঁধা
লেনিন-সাহেব আদর করে ডাকেন 'ঠাকুরদাদা'!
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন পৃথিবী খান খান
তিনিই হিটলারের গোঁফে মেরেছিলেন টান!
বৃদ্ধ তিনি হননি মোটেই মন্ত্র-তন্ত্র বলে
অমর হয়ে আজও ঘোরেন সারা ভূমণ্ডলে।
এমনটিও হতেই পারে হঠাৎ মনের সাধে
তিনিই প্রথম পা দিয়েছেন মঙ্গলে আর চাঁদে!

স্বপ্নে আমি দেখেছি সেই আজব মানুষটিকে
কেমন যেন অবাক চোখে তাকান আমার দিকে
ফিসফিসিয়ে বলেন, ওরে ঘরবন্দী খোকা
আরাম করে ব্যারাম করিস, এমন তোরা বোকা?
সারা জীবন কাটিয়ে যাবি নরম বিছানায়?
এই দুনিয়া দেখবি যদি আমার সঙ্গে আয়!
লাফিয়ে উঠি, কেউ নেই তো, শুধুই অন্ধকার,
বাতাসে তবু ফিসফিসানি শুনি বারংবার।
সেদিন থেকে বনে-পাহাড়ে নানান নদীর বাঁকে
পায়ের তলায় সর্ষে আমার, খুঁজে বেড়াই তাঁকে।

দেওয়া-নেওয়া

আমার আছে একটা সোনার হরিণ
একটা কিংবা দুটো
কারুর কি চাই? তা হলে এই নিন
খুলুন হাতের মুঠো!

আমার আছে ডজনখানেক পাখি
ঠোঁটে রুপোর পাত
চাই সেগুলোও? ইচ্ছে আছে নাকি
কোথায় ডান হাত?

আমার আছে প্রকাণ্ড এক বাগান
ফুল না হীরের কুচি
সেটাও কি চান? ভালো লাগলো ঘ্রাণ?
আছে তো বেশ রুচি!

দিলাম সবই, মিথ্যে মোটেই না ভাই
চেয়ে দেখুন সোজা
তবে ফেরত চাইলে যদি না পাই
দেখিয়ে দেব মজা!

তিনটে কোকিল

তিনটে কোকিল সন্ধেবেলা ডাকে
বসন্তে নয়, প্রচণ্ড বৈশাখে
শিরীষ গাছে, কৃষ্ণচূড়ায়, তেঁতুল পাতার ফাঁকে
এ এখানে, সে সেখানে, কে যে কাকে ডাকে!

সারাটা দিন আগুন গলা, আকাশ যেন পাথর
কাঠবিড়ালি, পিঁপড়েরাও কাতর
হাওয়ায় দোলে চোখ-ঝল্‌সা ধপধপে এক চাদর
নদীর মধ্যে নদীও নেই, পাথর!

এই গ্রীষ্মে সমস্ত গান মানা
পুড়ে যাচ্ছে চাতক পাখির ডানা
এর মধ্যেই হঠাৎ এমন দুরন্ত এক বসন্তের হানা
তিনটে কোকিল মানল নাকো মানা!

দোকানদারের নাতনী

এক যে ছিল দোকানদার
তার ছিল এক নাতনী,
সকাল বিকাল মাংস ব্যাচে
নেই তাতে তার খাটনি।

নাতনীটি তার খেলে বেড়ায়
দূরের পাড়ায় পাড়ায়,
সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতে
রোজই রাস্তা হারায়।

(আসলে সে) সন্ধে হলেই বিকট সাজে
আগুন ভাটা চোখে
এমন জোরে চ্যাঁচায়, ভয়ে
পালিয়ে যায় লোকে।

একটা যদি ভ্যাবলা ছেলে
আছাড় খেয়ে পড়ে
অমনি তাকে এই মেয়েটি
কপাৎ করে ধরে।

আদর করে বলে, “আহা
মুখটি চাঁদপানা,
দুষ্টু ছেলে, এবার তুমি
হওতো ছাগল ছানা।”

এমনি করে দোকানদারের
আদুরে সেই নাতনী
রোজই একটা ছাগল আনে
সাঁঝে সেজে পেতনী।

খোকার ভাবনা

নদী যদি হতে চায় দূরের আকাশ
তবে কি বৃষ্টি হবে গোটা বারো মাস?
খোকা বলে, বলো না মা, এ কি হয় না কি?
মা বলেন, থাম্ বাপু, ঢের কাজ বাকি।
যা এখন খেলা কর, আঁচলটা ছাড়
রোদ্দুরে দিতে হবে আমের আচার।

খোকা ভেবে ভেবে মরে পায় না তো মানে
কত যে অভাব আছে কেউ তা কি জানে?
মাথার পেছনে যদি হয় দুটো চোখ

চাপা পড়ে মরতো কি রোজ এত লোক?
মনে মনে খেলে যদি যেত পেট ভরে
তাহলে কি অনাহারে এত লোক মরে?
এ রকম আরো কত আছে যে অভাব
কখনো কি মিটবে তা, কে দেবে জবাব?
ভগবানই জানে না তো তুমি আমি ছার
তার চেয়ে খাওয়া যাক আমের আচার।

বৈশাখের পয়লা দিনে

একটা নদী হারিয়ে গেল
কাশের বনে মিলিয়ে গেল
দুলতে-দুলতে কোন খেয়ালে
ঝুপুস করে পালিয়ে গেল কেউ জানে না

আকাশ থেকে রামধনুটি
হঠাৎ তাকে দিল ভ্রূকুটি
বলল, ওরে আহ্লাদীটি
ছুটির খেলা ফুরোল, তোর মন মানে না?

সবাই এখন ব্যস্ত কত
ফুল ফোটাবে কয়েক শত
মৌমাছিরা ইচ্ছেমতো
সকাল কিংবা বিকেলবেলা শোনাবে গান

চৈত্রমাসে বসন্তকাল
চতুর্দিকে জলের আকাল
শুকনো ঠোঁট দু’ চক্ষু লাল
এমন দিনে গান শুনে কার জুড়োবে প্রাণ?

এমন সময় থাকত যদি
জল-ছলছল পার অবদি
দুষ্টু মেয়ের মতন নদী
হায়রে হায় সে হারিয়ে গেল কোথায়

সারাটা মাস দমসমিয়ে
ডাকল মেঘ গমগমিয়ে
নামল বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে
আয়রে আয় ও নদী ফের ধরায় আয়!

ডাকঘরের অমল

তোমরা কি দেখেছ সেই অমলকে?
ওগো দইওলা, তুমি তো পাড়ায় পাড়ায়
দই নিয়ে ঘোরো
কত মানুষের বাড়ি বাড়ি যাও
দেখোনি?
যখন দূরের পাহাড়ে বৃষ্টি নামে
ঝর্নার পারে খেলা করে প্রজাপতি
অমলকে মনে পড়ে

ওগো পাখিওলা, তুমি দেশে দেশে যাও
অচেনা দেশের অচেনা পাখিরা
জানে অমলের কথা।

যেখানেই যাও
একবার খুঁজে এসো!
যদি অমলের দেখা পাও তবে
তোমরা সবাই বোলো
সুধা তাকে আজো ভোলেনি।

রাজ-যোটক

একটি মানুষ কালো কুচকুচ চটপটে কাজকম্মে
আর একজনা সাদা ফুটফুট দন্ত মাজে না জন্মে।
কালোটির নাম কেষ্টকমল মাথায় মস্ত বাবরি
অন্যজনটি ধূম্রলোচন টাকের ওপর পাগড়ি।
কেষ্টকমল বেহালা বাজায় মাঘের শীতের রাত্রে
ধূম্রলোচন তুর্কি-নাচুনে, চুলকুনি সারা গাত্রে।
একজন যদি শনিবার খায় খই বাতাসা ও সিন্নি
অন্যটি তবে সেইদিনই খাবে কোপ্তা-কাবাব ফিরনি।
রে-রে রোদ্দুরে একজন যায় জলায় শাপলা তুলতে
বাকিজন সেই ফাঁকে শিখে নেয় তালা ভেঙে ঘর খুলতে।
একটি মাত্র ভাই আছে, তাকে অতি ভালোবাসে কেষ্ট
সেই ভাই তাকে চাঁটি মেরে বলে, মাথাটি নরম বেশ তো।
আরও সবদিকে মিল খুব যেন আদা আর কাঁচকলাতে
কেষ্ট ধূম্র যমজ দু'ভাই বড় ভাব গলা-গলাতে।

ছড়্‌রা

(১)

তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া পিড়কা পিটাং
নাচ থো মাঝি নাচরে মেঝেন্ ধিড়কা ধিতাং
ধিতাং মারু মহুল দারু মুর্গাশুখা
শহর থেকে বাবু আলেন ঘুর ঘুর না নাচ দেখা-আ!
পয়সা দিবে কাম দিবে বাবুর বাড়ি নাস্তা হবে
ঘুর ঘুর না ধিড়কা ধিতাং নাচরে মেঝেন্ ধিড়কা ধিতাং!

(২)

মেঘপাহাড় আলুঝালু জষ্টি মাসে বিষ্টি
ছিল আকাশ গোমড়ামুখো ভাসলো এবার ছিষ্টি
টুপটুপাটুপ টিনের চালে টোঁয়া টোঁয়া কান্না
পিসশাশুড়ি হেঁকে বলেন, দে খ্যামা দে, আর না!
ধর ধর ব্যাং উল্টে শোয়া, এসো রোদ্দুর দাদা
বিদেশ থেকে বর আসবে,—হাঁটু সমান কাদা!

(৩)

নৌকার মাঝি চারজনা হাল দাঁড় মোট তিনখানি
ছয় চোখ করে জল ঘোলা দুই চোখ মুদে রয় ধ্যানী!
সাদা পাল চায় পশ্চিমে যায়, না-এর গলুই দক্ষিণে
দুইজনা হাসে দুইজনা কাঁদে বায়ু চলে যায় পথ চিনে!
বিজ্‌লি হাসলো আকাশ দু'খান্ জল উঠে পড়ে গম্বুজে
কবি কয়, ওরে মূর্খ মাল্লা, ঘুমায়ে পড় গা চোখ বুজে।

(৪)

ছিল নিঝ্‌ঝুম পুষ্করিণী জলে নামলো কে?
এল যে আজ অভিমানিনী ওলো জোকার দে!
চাঁপার বন্ন ঠোঁট দু'খানি ভোমরা পানা অক্ষি
অভিমানিনী ঘাটে রইলে দেখবে না কাক পক্ষী।
বুক জ্বলে যায় আড় পানে চায়, যা না ঠাকুরঝি
অভিমানিনী একা নাইবে দেখবে এক সূয্যি।
ওমা ওমা সূয্যিও যে মুখ লুকিয়ে সাদা
চোখের মাথা খেয়ে রইলো মৌরলা আর চাঁদা!

চুনী-পান্না

অনেক শুনেছি তোমাদের নাকি কান্না
থামাও, আর না!
দেখো রোদ্দুরে ঘাসের ডগায় ঝলমলে
চুনী-পান্না!

বেগুন ভাজার মতো মুখখানা ঘুচিমুচি
ভুরু কোঁচকা
সিন্ধুবাদের মতন মাথায় সাড়ে
সাতমন বোঁচকা?
কেন গো তোমার ঠোঁটে ব্যাঁকা হাসি, চোখে
আগুনের ফুল্‌কি
যাকে পাও তার গায়ে এঁকে দাও নানা
নিন্দের উল্কি?

অনেক শুনেছি তোমাদের নাকি কান্না
থামাও, আর না
দেখো রোদ্দুরে পুকুরের জলে ঝলমলে চুনী-পান্না!

আজব নগর

হলদিয়া কি সন্দেশ, না
নতুন কোনো মিষ্টি?
হলদিয়া কি হলুদ শাড়ি
কিংবা কোনো রান্না!
সে-সব কিছু নয় নয় রে বাপু
এ যে আর-এক সৃষ্টি
জাহাজ ঘেরা আজব নগর
অঙ্গে চুনী-পান্না।

প্রশ্ন ও উত্তর

চাকরি পাবে মোহনকুমার সব-কিছু ঠিকঠাক
প্রথম দিনেই আছাড় খেয়ে নাক ফুলে জয়ঢাক!
দু’ দিন বাদে অফিস গেলে কী হল তার দশা?
নাক-সরু এক স্বপনকুমার তার চেয়ারে বসা!
কেন এমন হল, আহা, কেন এমন হল
কোন দোষে হায় মোহনবাবুর চাকরিখানা গেল?

রকেট চালিয়ে বাঙালির ছেলে পাড়ি দেবে নাকি চাঁদে?
বিজয়কুমার পুরোপুরি রেডি, তবু কি ফ্যাসাদ বাধে?
জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে, সে খেয়াল নেই তার
বেলুনের মতো ফোস্কা পড়ল পায়ে জুতো রাখা ভার
খালি পায়ে কেউ চাঁদে যায় নাকি, রকেট নিল না তাকে
বিজয়কুমার ফ্যালফ্যাল করে আকাশে তাকিয়ে থাকে!
কেন এমনটি হল যে আহা রে, কেন এমনটি হল?
বাঙালির কত নাম হত, তবু সুযোগ ফস্কে গেল!

লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল পুঁটিরাম
এইটুকু কাগজের পাঁচ লাখ টাকা দাম!
আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচে ধেই ধেই
টিকিটটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে যেই
কোথা থেকে ঝড় এল, পুঁটিরাম নিঃস্ব
টিকিটটা পাখি হয়ে হল অদৃশ্য।
হায় হায় একী হল, এমনটি কেন হল?
পুঁটিরাম ভ্যাবারাম, সব টাকা জলে গেল!

উত্তর: সাড়ে এগারো বছর বয়েসে পর পর দু দিন তিনতলার
জানলা থেকে রাস্তায় আমের খোসা ছুঁড়ে ফেলেছিল কে?
মোহনকুমার, আবার কে?
দশ বছর তিন মাস বয়েসে একটা বেড়ালছানার গায়ে আলপিন
ফুটিয়ে দিয়েছিল কে? বিজয়কুমার, আবার কে?
তেরো বছর পাঁচ মাস বয়েসে এক বন্ধুর একটা ডিটেকটিভ গল্পের
বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা চুপিচুপি ছিঁড়ে দিয়েছিল কে? পুঁটিরাম, আবার কে?
এতদিন পর সেই রাস্তা, বেড়ালছানা ও বই প্রতিশোধ নিল!

পেন্নাম

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা।
ঘুম ঘুম ঘুম শালিক বলে, সবাই তোরা ঘুমো
এমন নরম রোদের ফোঁটা কপালে দেয় চুমো।
শির শির শির বাতাস হাসে, চোখ ভর্তি জলে,
টুকরো ছেঁড়া মেঘের তুলো ফিসফিসিয়ে বলে
বাবা আছেন যেমন তেমন—মায়ের বুক ফাটে
চল আমরা পালাই দূর সমুদ্দুর পাটে
ফুরফুরিয়ে ভাসল মেঘ বাতাস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
কাপড় কাচা জলের মতো আকাশ থাকে শুয়ে।

দুধের বরণ হাতির শুঁড়ে পারিজাতের মালা
আহা এমন রূপের ডালি কে যায় দুপুরবেলা!
নদীর জল খুশির তোড়ে বাজায় রিনিঝিনি
ঘাসের ফুল, শিশির ফোঁটা বললে যেন চিনি।
একটি সাদা কাশের গোছা বললে, পেন্নাম!
চিনি তোমায় হে মহারাজ, শরৎ তোমার নাম!

লুপুসুংশান

একদিন কেউ তোমাকে বলল, লুপুসুংশান!
তুমি কি ভাববে, এ কী উদ্ভট, লুপুসুংশান?
এর মানেটা কী? নাকি কিছু নেই, এমনিই যা-তা
ছেলেটাকে দেখে মনে হয় বুঝি ছিটভরা মাথা?
তা তো নয় ঠিক, আয়নার মতো ওর মুখখানি

দু’ চোখে হাসিতে যেন সে বলছে, পারবে না জানি!
কেন পারবে না? ভাবো ভাবো ভাবো, কুঁচকিয়ে ভুরু
ভাবনা-যুদ্ধে হেরে যাবে তুমি, বুক দুরুদুরু?

লুপুসুংশান কীরকম কথা, রুশ না ফরাসি?
এই পৃথিবীতে রয়েছে তো ভাষা কত রাশিরাশি
সংস্কৃত না সাঁওতালি, নাকি হিন্দি, মারাঠি?
শব্দটা কিছু গোঁজামিল, নাকি একদম খাঁটি?
কিংবা এমনও হতেও তো পারে, বাংলা বা চিনে?
গোটা-পঞ্চাশ অভিধান তবে আনবে কি কিনে?
দেখেশুনে যদি নানান ভাষার হরেক হরফ
মাথা বনবন, চাপাবে কি তবে ঠাণ্ডা বরফ?
লুপুসুংশান, লুপুসুংশান, শুনেছ কি আগে?
ভালো করে ভাবো, মনে কিছু সুর জাগে কিনা জাগে!

লুপুসুংশান পুলিশ কিংবা অতি পচামাছ?
গেলাস ভাঙার শব্দ? অথবা ন্যাড়া তালগাছ?
হারানো বোতাম, চিঠির বাক্স, পুতুলের বিয়ে?
মহা মুশকিলে পড়া গেল এই কথাটাকে নিয়ে
অ্যালজেব্রা না ঘড়ির অঙ্ক লুপুসুংশান?
ইতিহাসে কোনো শক-হূন দল, আর্য, কুষাণ?
এ কী এ কী এ কী, হাত-পা ঝাঁকিয়ে বলে, ধুত্তোর
হাল ছেড়ে দিলে? পারলে না আর দিতে উত্তর?

শোনো তবে বলি, এমন সহজ কথা বুঝলে না?
আর একটু মাথা চুলকে বুঝতে, এ যে খুব চেনা!
কেউ যদি এসে বলে হাসিমুখে লুপুসুংশান
তুমিও বলবে দু’ হাত বাড়িয়ে দুরুক দিটাং
আর যদি কেউ লুপুসুংশান বলে রাগ করে
তুমিও ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলবে ডিংফরগরে!

লুপুসুংশান এই শব্দের দু'রকম মানে
দুটোই সরল, তবে কথা এই যে-যেমন জানে।
লুপুসুংশান, লুপুসুংশান, কোন্ মানে চাও?
দুরুক দিটাং, ডিংফরগরে, নাও বেছে নাও!

মনে পড়ে সেইদিন

মনে পড়ে সেইদিন শ্রী নামে সিনেমায়
পথের পাঁচালী ছবি দেখা
সঙ্গে ছিল না কেউ, বৃষ্টি বাদলা ছিল
গোটা হল ঘরে যেন একা।
ভেতরেও বৃষ্টিতে ভিজ্‌ছে দুর্গা-অপু
মাঠে ঘাটে কাটে সারাবেলা
পুকুরের জল কাঁপে, বাতাসে সেতার বাজে
আকাশ ও পৃথিবীর খেলা।

একটু পরেই আর সিনেমা দেখি না আমি
নিজেই তো হয়ে গেছি অপু
কাশবনে লুটোপুটি, আরও দূরে যেতে যেতে
বাজাচ্ছি আম আঁটির ভেঁপু।
ইন্দিরা ঠাকরুণ আমারই তো বুড়িপিসি
মায়ের বকুনি খেয়ে হাসি
দিদির পেছনে আমি ছায়া হয়ে ঘুরিফিরি
পাঠশালা ফেলে ছুটে আসি।
বাবা বহুদিন নেই, আমাদের কিছু নেই
মায়ের আঁচলখানা ভিজে

ঠিক এরকম ছিল আমাদের ছেলেবেলা
বুঝেছি খিদের জ্বালা নিজে।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে বাদলধারার মতো
আমার দু'চোখে নামে জল
এমনই কান্নায় ভেজা, কাঁপে বুক থরথর
চারদিকে আঁধার অতল।
হল ছেড়ে ছুটে যাই বাইরে একলা কাঁদি
আজও মনে পড়ে সেইদিন
তারপর বহুবার বলেছি সে স্রষ্টাকে
আমার চোখের জল নিন।

মনে পড়ে সেই দিন

সূচি

মামার বাড়ি যে অনেকটা দূর

মামা লিখেছেন, নতুন বাড়িতে
পাঁচটি পেয়ারা গাছ
আঙুর ফলেছে টুসটুসে থোকা থোকা
বাগানে ফুলের কত সাজগোজ
পুকুর ভর্তি মাছ
মা-বাবাকে নিয়ে কবে আসবি রে, খোকা?

মামিমার চিঠি আরও প্রাণ হরা
সোনালি কালিতে লেখা
যেন ফিসফিস কথা বলা কানে কানে
খোকন মনিরে, মন হু-হু করে
কবে হবে আর দেখা
আকাশে তাকিয়ে বসে থাকি এই খানে।

মামাতো বোনটি সদ্য শিখেছে
বাংলায় লেখা পড়া
দু'-তিনটে ভুল বানান লিখেছে মোটে
খোকা তুই এলে গল্প বলবো
শোনাবো নতুন ছড়া
এখানে সবাই গান শুনে জেগে ওঠে।
আমরা এখানে পাখির মতন
মাঝে মাঝে উড়ে যাই,
মধু খাই, আর দুধ দিয়ে দাঁত মাজি
ডালে ডালে ঝোলে কেক, সন্দেশ
যখন যা খুশি চাই
এসব শুনেও আসতে হবি না রাজি?

চিঠিগুলো পড়ে মন ভেঙে যায়
কী দারুণ সংকট
মামার বাড়ি যে অনেকটা দূর পথ
মঙ্গল গ্রহে যাওয়া কি সহজ
রকেট ধর্মঘট
এখন উপায় নিজস্ব মনোরথ!

আমার খেলা

ব্যাডমিন্টন শিখিয়েছিল পল্টু নামের বন্ধুটি
প্রত্যেকবার হারিয়ে আমায় হাসত মনের সুখে
ক্রিকেট খেলায় প্রথম দিনেই চক্ষু চড়ক গাছ হল
পঞ্চম বল এমন জোরে লাগল আমার বুকে।

ফুটবলে পা দিয়েছি ঠিকই, পা হড়কেছে অনেক
শোনা হয় না নিয়ম কানুন এত হরেক রকম
ফাউল করার জন্য নাকি আমার বেশ নাম ছিল
সেম সাইডে গোলটি করে সর্ব অঙ্গ জখম।

একটি মাত্র খেলায় আমি জয় পেয়েছি বারবার
যেমন তেমন খেলা সে নয়, কঠিন ডাংগুলি
সবাই বলত, এ আর এমন আশ্চর্যের কী আছে
ব্যাটাচ্ছেলের নামেই মিল, পদবি গাংগুলি!

ফুটবল

ফুটবলে ছিল বাঙালির খুব
হাঁক ডাক, চেনা নাম
চুনী-পিকে আর শান্ত, সুভাষ
ঘরে ঘরে উদ্দাম!

এখনও মোহন বাগান রয়েছে
মহামেডান, ইস্টবেঙ্গল
কারা খেলে, হায়, কিছুই জানি না
ক্লাব নামটাই সম্বল।

এতকাল ধরে ছিল বাঙালির
ফুটবলে কত গর্ব
ওগো মতিদাদা, তুমিই বলো না
কী করে বাঙালি
হয়ে গেল এত খর্ব?

মঙ্গলগ্রহে

মঙ্গলগ্রহে আছে
হুঁকো মুখো হিজবিজ
একা নয় দোকা নয়
চারিদিকে গিজগিজ!

হিজবিজ খিদে পেলে
হাসে শুধু ফিকফিক
যত মিছে কথা বলে
সব মেলে ঠিক ঠিক!

উল্টোপাল্টা

লঙ্কা গাছে বেগুন ফলে
চালতাগাছে আম
মাটির তলায় আলু কোথায়?
ছেঁড়া চিঠির খাম।
ব্যাঙ্কে নাকি টাকা থাকে?
আছে মাটির ঢেলা
মাটিই টাকা, টাকা মাটি
কে করছে এই খেলা?

মেঘ ডাকল কলকাতায়
বৃষ্টি হল মালদায়
নতুন মামী তেঁতুল পুঁতে
নিজের মাথায় জল দেয়।

এক যে ছিল বাহাত্তুরে
একদিন চাঁদ দেখে
কী যে হল নাইতে গেল
সাবান গায়ে মেখে।
তারপর সে হাত-পা ছুঁড়ে
ডুকরে কেঁদে ওঠে
বললে, বয়েস মাত্র বাইশ
দাঁড়াব এবার ভোটে!

গ্রীষ্মের জয়

দুপুরবেলায় পাখা ঘুরলেও প্রাণ হাঁসফাঁস
মধ্যরাতেও গরম কমে না মশা ঠাসঠাস।

একশো বছর আগেও এমনি ছিল এই দেশ
ঘামাচি, কলেরা, পান বসন্ত, কষ্ট অশেষ।

ছিল না বিজলি, ফ্রিজ-পাখা আর ঠান্ডা মেশিন
কী করে যে লোকে প্রবল গ্রীষ্মে বাঁচতো সেদিন

চামড়ায় জ্বালা, ফোঁড়ায় ফুঁ দেয় জনসাধারণ
বিদ্যাসাগর সে সময় লিখেছেন ব্যাকরণ!

সাহেবি পোশাক ভিজে জবজব, কুলকুল ঘাম
মাইকেল দেবী সরস্বতীকে করেন প্রণাম।

মেয়েরা মেঝেতে গড়ায়, শিশুরা করে ছটফট
বঙ্কিমবাবু লিখে ফেললেন আনন্দমঠ।

বীরভূমে হাওয়া আগুন ছড়ায়, ব্যাঙ চিৎপাত
তার মধ্যেই গানে সুর দেন রবীন্দ্রনাথ।
শিলাইদহেও গরম কি কম? ফুটিফাটা মাঠ
কথা ও কাহিনী লিখে চলেছেন কবি সম্রাট।

তা হলেই বলো, গরমই তো ভালো, ঘামের গন্ধে
অমর কাব্য লেখা হয় কত নতুন ছন্দে!

বাঘের মাসি

যারা কুকুর পোষে তারা পুষুক, তারা
পুষুক যত খুশি
আমরা একটা বেড়াল বড্ড ভালোবাসি
নামটাও তার পুষি।

পাশের বাড়ির কুকুর দুটো যমের দূত
নিষ্ঠুর মাংসাশী
আমাদের এই মোটকা পুষি গাবগুবাগুব
খাঁটি বাঘের মাসি!

কুকুর দুটো রাস্তা ভুলে এক বিকেলে
ওদের বাড়ি ছেড়ে
আমাদেরই ছাদে ঘুরছে জগাই মাধাই
আর বাঁচাবে কে রে!

দুই দিকে দুই নেকড়ে মুখো হামলে এল
এবার বুঝি মলুম!
ঠিক তখুনি সাদা বেগুনি রোঁয়া ফোলানো
পুষি ডাকল, হালুম!

বাঘের মাসি ঘোগের পিসি ছোট্ট পুষির
চোখে ছুরির ধার।
কুকুর দুটো কুঁইকুঁইয়ে লেজ গুটিয়ে
হল পগার পার।

ছোট আর বড়

একটু একটু ভয়ের রাত, অনেকখানি ঘুম
সন্ধেবেলায় ঝড় বাদল, দুপুরে নিঝ্‌ঝুম
চড়-বকুনি একটুখানি আদর অনেক বেশি
একটু একটু ঝগড়া-আড়ি অনেক মেশামেশি
পেয়ারা হবে একটু ডাঁশা নিটোল পাকা আম
পরীক্ষায় একলা লেখা পুজোয় ধুমধাম
ডিমের নুন এক চিমটে পায়েসে ঢালো গুড়
গলা সাধার সা রে গা মা থামলে সুমধুর
প্রসাদ পাবে শশা টুকরো বিয়েতে লুচি মন্ডা
কাঁচা লঙ্কা একাই একশো মুড়ি হাজার গন্ডা
দেশলাইয়ের একটা কাঠি তুলো বস্তা বস্তা
আসল হিরে এক খণ্ড পাথর অনেক সস্তা
চাঁদ ডুবলে দেখা যায় না জমকালো সূর্যাস্ত—
কবিতা বেশ ছোট্টমতন উপন্যাস মস্ত!

কোহিমার যুদ্ধ

একটি গ্রাম্য কিশোর একদিন নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছিল।
নিঝুম দুপুর, শুনশান, আর সবাই ঘুমন্ত
পুকুরের জলের মতন সেখানে সব কিছু নিস্তরঙ্গ
শারদীয় ধান খেতের ওপর সেখানে বোমারু বিমানের ছায়া পড়ে না
শুধু দূরের উষ্ণ বাতাসে ভেসে আসে এক এক সময়
সামরিক হল্কা...
আল পথে একা একা হেঁটে যাচ্ছিল কিশোর ছেলেটি
পিঠে তার বাঁখারির তির ধনুক, হাতে গাছের ডালের বন্দুক

তার বুক ভরা জয়ের অভিমান
সে চলেছে এক মরণ-পণ যুদ্ধ যাত্রায়।
সে শুনেছে কোহিমায় লড়াই করছে ভারতীয় সৈনিকেরা
বলদৃপ্ত ইংরেজদের সঙ্গে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রাম
তলোয়ার তুলে ছুটে আসছেন নেতাজি
কিশোরটিও ছুটছে, তাকে যেতে হবে, কোহিমায় যেতে হবে
কোহিমা কোথায়, কত দূরে তা সে জানে না
তবুও তাকে যেতে হবেই
সেতুবন্ধনের সময় যেমন গিয়েছিল এক কাঠবিড়ালি।

অন্য ভাষায় কথা বলে

নাম জিজ্ঞেস করলে বলে, সকাল কিংবা রোদ্দুর
সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে
তেঁতুল গাছের তলায়
পুঁচকে ছেলে, ন-দশ বছর, ভয় ডর নেই চোখে
হাফ প্যান্টুল, সারা গা খালি,
পুঁতির মালা গলায়।

এ ছেলেটা কাদের বাড়ির? একলা কেন এল?
কোথায় যাবে তাও জানো না
মুচকি হাসি ঠোঁটে
ঠিকানা জানিস? মাথা দুলিয়ে বলল, ভূগোল বই
খুব শক্ত, পড়েছি আমি
তিনটে পাতা মোটে!
বাবা কে তোর? চোখ কুঁচকে ভারিক্কি ভঙ্গিতে
জানাল সে, সবাই জানে,

আষাঢ় মাসের মেঘ
ভাই বোন নেই? আছে আছে, পারুল আর চম্পা
বোঝা যায় না কিছুই শুধু
বাড়ায় উদ্বেগ!

কোন রাস্তায় এলি রে তুই? বলল, খুব ঢেউ
খিদে পায়নি? কী খেতে চাস?
বলল, ফুলের গন্ধ
গায়ে জামা নেই, শীত করে না? দেখিয়ে দিল মালা
এখান থেকে কোথায় যাবি!
বলল স্কুল বন্ধ।

ঐ ছেলেটার কথা শুনলে ঠিক মনে হয় ধাঁধা
আমরা সবাই একটা কথার এক মানেতে বাঁধা।

দুই বোন

রুমুনা: আমাদের সোনা নেই
রোদ্দুর সোনালি
ঝুমুনা: তাতে বুঝি মন ভরে
কী কথা যে শোনালি!
রুমুনা: আমরা খাইনি ভাই
জল ভরা সন্দেশ
ডুমুর, পেয়ারা, কলা
তাই খেয়ে লাগে বেশ!
ঝুমুনা: মোটেই না, শুধু ফল
খেয়ে আশ মেটে না

রোজ রোজ ডাল-ভাত
মাছ কেন জোটে না?
রুমুনা: আমাদের ছোট ঘরে
জ্যোৎস্নার মতো আলো
ফুরফুরে হাওয়া দেয়
তা যে কত লাগে ভালো!
ঝুমুনা: দূর দূর, ভাঙা ঘর,
গা-ঢাকে না কাপড়ে
শীতকালে হি হি করি
রোদ্দুরে গা-পোড়ে!
রুমুনা: যা পেয়েছি তাই ভালো
আর সব যাক গে
যার যেটা জোটে ভাই
লেখা আছে ভাগ্যে!
ঝুমুনা: ভাগ্য না কচু পোড়া
জীবন তো একটাই
না-পাওয়াটা মানব না
আমি চাই সব চাই!

সওদাগরের হরিণ

আমাদের এই ছোট্ট পাহাড়
বন-জংলায় ঢাকা
দিনের বেলা ফুলের বাহার
রাত্রে ছবি আঁকা।
পাহাড়খানার মালিক এক
বৃদ্ধ সওদাগর

একলা একলা ঘুমিয়ে থাকে
　　বনের মধ্যে ঘর।
সওদাগরের বন্ধু শুধু
　　একটা হরিণ ছানা
আমরা যাই যেখানে খুশি
　　সেখানে যেতে মানা।
দূরের থেকে গাছের ফাঁকে
　　কখনো দিয়ে উঁকি
ঠোঁটে কুলুপ, স্পিকটি নট
　　ওদের কাণ্ড দেখি।

সওদাগর মন্ত্র জানে,
　　যে-ই মন্ত্র পড়ে
হরিণ ছানা পদ্য বলে
　　বাংলা অক্ষরে।
সেই হরিণের পদ্য কেউ
　　শুনবে একটুখানি।
শুনেই মনটা খারাপ হবে
　　আগের থেকেই জানি!

আমার খুব ইচ্ছে করে
　　কলকাতায় যাব
মনের সুখে গড়ের মাঠে
　　নধর ঘাস খাব।
মানুষ আসে পাহাড়-বনে
　　কত ফুর্তি করে
বনের হরিণ শহরে গেলে
　　অমনি কেন মরে?

তিনটি প্রশ্ন

এক

মানুষের শিশু দুধ খায় খুব
দুধ চাই খুব খাঁটি
সকালেও দুধ, বিকেলেও দুধ
দুধে ভরা থাকে বাটি।
মা'র দুধ খেয়ে পেট তো ভরে না
গোরুর দুধও যে চাই
গোরুর পা বেঁধে, বাছুর সরিয়ে
দুধ দোওয়া হয় তাই!
একদিন এক ছোট্ট বাছুর
মা'র কাছে শুয়ে বলে,
'তোমার দুধ তো ওরা নিয়ে যায়
আমার যে পেট জ্বলে!
ওরা যদি খায় আমাদের দুধ
আমরাও কেন তবে
মানুষের দুধ খাবো না বলো তো
তাতে কোনও দোষ হবে?'

দুই

বনের মধ্যে গাড়ির শব্দ
লোক আসে দলে দলে
ছুটির সময় বেড়াবার ধুম
ছুটে আসে জঙ্গলে।
কচি-কাঁচা আর বুড়ো-বুড়িরাও
বাবা, কাকা আর মামা

কত সাজগোজ, রোদের চশমা
　　কত না রঙিন জামা।
শহুরে মানুষ অরণ্যে এসে
　　এদিক ওদিক ছোটে
ঝোপ-ঝাড়ে কোনও হরিণ দেখলে
　　হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।
একদিন এক হরিণ শাবক
　　জিজ্ঞেস করে মাকে,
'আমরাও কেন বেড়াতে যাই না
　　যে শহরে ওরা থাকে?'
মা-হরিণ বলে, 'চুপ চুপ চুপ—
　　করিস না পাগলামি!'
হরিণ শিশুটি তবুও মানে না,
　　'কী ভুল বলেছি আমি?
ওরা এসে কত ডালপালা ভাঙে
　　ছেঁড়ে ফড়িং-এর ডানা
আমরা শুধুই শহরে বেড়াব
　　তাতেও রয়েছে মানা?'

তিন

ট্রেনে ভিখিরির টিকিট লাগে না
　　কত জালিয়াত, চোর
দিব্যি আরামে দূরে দূরে ঘোরে
　　অনেক রাত্রি ভোর!
ফিরিয়ালা আর মন্ত্রীমশাই
　　বিনা টিকিটেই যান
সাধু সেজে নাও, টিকিট চাই না
　　ধরো একখানা গান!

কিংবা যদি-বা হও তুমি কোনও
রেলবাবুদের ছেলে
বিনা ভাবনায় হিল্লি-দিল্লি
যখন ইচ্ছে গেলে।
ক্লাস সেভেনের একটি ছাত্র
জিজ্ঞেস করে মাকে,
'এবার ছুটিতে কানপুর যাব?
দিদি কানপুরে থাকে।'
মায়ের মুখটা ম্লান হয়ে গেল
বললেন চোখ ঢেকে,
'ট্রেনের ভাড়া যে অনেক রে খোকা
টাকা পাব কোথা থেকে?
তোর বাবার যে চাকরিটা গেছে
অভাবের সংসার
দু' বেলা অন্ন জোটানোই দায়
সাধ্য কী বেড়াবার!'
ছেলেটি বলল, 'দিদির জন্য
মনটা কেমন করে
দিদির মেয়েটা কত দিন ধরে
ভুগছে প্রবল জ্বরে।
টাকা নেই, তাই পারব না যেতে
মুখ করে থাকি কালো
এর চেয়ে চোর, ভিখিরি কিংবা
ফিরিয়ালা হওয়া ভালো?'

মাঠের মধ্যে

মাঠের মধ্যে নামল বৃষ্টি হঠাৎ বৃষ্টি
দারুণ বৃষ্টি
যেতে হবে আরও দূরে
ফিরব বাড়িতে নিজের বাড়িতে ছোট্ট বাড়িতে
বহুদিন পর
বহু দেশ ঘুরে ঘুরে।

মেঘ কালো কালো মেঘের যুদ্ধ, হুংকার দেয়
মেঘের দৈত্য
কিছুই যায় না দেখা
কোন পথে যাব, পথ মুছে গেছে, পথ ভোলা এক
নিঝুম পথিক
মাঠের মধ্যে একা!

এমন দেয়াল, সামনে দেয়াল, দু'পাশে দেয়াল
মাথা ঠুকে যায়
কঠিন অন্ধকারে
কোথায় আকাশ, ওপরে বা নীচে, দু'পাশে আকাশ
পৃথিবী ডুবছে
আকাশের পারাবারে।

আর দেরি নেই, পথ চিনে গেছি, আর দূর নেই
আকাশে এখন
হোক না বজ্রপাত
এই তো আসছি, সাঁতরে আসছি, লাফিয়ে আসছি
সব বাধা ঠেলে
ধরব মায়ের হাত!

সংযোজন: ছড়া

সূচি

বিকেল

বিকেলগুলো হলুদরঙা ফুলের মতো যেন
বাড়ি ফেরার পথের ধারে ঝলমলিয়ে ফোটে
এক-একদিন ছুটির ঘণ্টা দেরিতে বাজে কেন?
বিকেল-ফুলের গন্ধে মন ছটফটিয়ে ওঠে।

খেলার মাঠ হাত বাড়িয়ে সবার নামে ডাকে
মেঘেরা খেলে অনেক খেলা আকাশ জোড়া মাঠে
হঠাৎ যেন আঁধার আসে পশ্চিমের বাঁকে
নানান রঙ কুড়িয়ে নিয়ে সূর্য যান পাটে।

কি নিষ্ঠুর অন্ধকার, বাজপাখির মতো
বিকেলটাকে এক নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যায়
সন্ধে নামে গাছের ফাঁকে পাখিরা ক্রমাগত
একই সুরে সকলে মিলে ঘুমের গান গায়

বিকেল ফুল, হলুদ ফুল, আজ ঘুমোও তুমি
এবার আমি বাড়িতে ফিরে যাবো বইয়ের দেশে
কোথায় আছে পাহাড় নদী সাগর মরুভূমি
আবার যেন দেখি তোমায় কাল ছুটির শেষে...

তোমার জয়জয়কার

মাউজ মানে আর ইঁদুর নয়
উইন্ডোও নয় জানালা
নেট মানে আর মশারি নয়
উলটে গেছে বাংলা।

কি বোর্ডে কোথায় চাবি
খুঁজে নাও যা প্রাণ চায়
কম্পিউটার দেখায় ছবি
কম্পিউটার গান গায়

কম্পিউটার টিকিট কাটে
আরো কত কী পারে
যা নেই মহাভারতে তাও
পাবে কম্পিউটারে

কম্পিউটার হে তোমার
জয়জয়কার আজ
আমি যখন ঘুমোই, তুমি
করে যাও সব কাজ!

মুরারই গ্রামে আজ

মুরারই গ্রামে আজ দেখি খুব হই আর চই
মাছ, এত মাছ, আর কিছু নেই শুধু মাছ-বই
খালে-বিলে পুকুরেও ইলিশেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে সই
ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টিতে গাছে ওঠে বড়-বড় কই!

বেহালার বড় চাচা লিখেছেন মোটামোটা বই
মুরারই গ্রামে বাস, বয়েসই তো হল নব্বই
বাপ-দাদা, মা-বোনেরা খায় ফেনাভাত, গুড়, খই
পুঁটি আর ট্যাংরার চেয়ে ভালো ঘরে-পাতা দই!

মুরারই গ্রামে আজ মানুষের ঘাড়ে-ঘাড়ে মই
যার মই নেই তার উইধরা ঢেঁকিটাই সই
গাছে-গাছে, ছাদে-ছাদে, কই গেল ইলিশ ও কই
বউ-ঝিরা বলে তেড়ে, আমরাও কেন তবে ঘরে বসে রই!

মিজানুর চাচা বলে, কেন শুনি চারদিকে এত হইচই
মুরারই গ্রামে কেন এল এত ইলিশের ঝাঁক আর কই
ইলিশ খাইনি কভু, যদিও বয়েস হল পঁচানব্বই
কিনে আন চেখে দেখি! হায় চাচা, সব শেষ, তুমি খাও দই
আর লিখে যাও বই!

বাইশে শ্রাবণের আগে

হায়রে শহর, প্রাণের শহর
মেলে রেখেছিস হাঁ
পথে ও বিপথে আঁধার আদাড়
টেনে নিয়ে যায় পা।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চাঁদ ঢেকে যায়
গলিতে ঘুমোয় দিন
পাখিরা ডাকে না, মশারা রেখেছে
সকলকে পরাধীন!

হায়রে শহর, প্রাণের শহর
কবিতায় মুড়ে রাখা
এত ভালোবাসা দিতে চায় যারা
তাদেরও যে বুক খাঁ খাঁ।

সিংহ-কাহিনি

দুর্গা ঠাকুর পুজোর সময় সঙ্গে আনেন সিংহটাকে
সারা বছর সে সিংহটা একলা একলা কোথায় থাকে?
কার বাড়িতে? চিড়িয়াখানায়
জঙ্গলেই তো তাকে মানায়
কিংবা সে কি খেলা দেখায় সার্কাসে কোন এক ফাঁকে?

মহিমবাবুর সার্কাসে এক সিংহ ছিল এককালে
মুখটা ছিল হাঁড়ির মতন, চুন-কালি তার দুই গালে।
প্রত্যেকদিন সে সিংহটা
খেত একটা ছাগল গোটা
ব্যবসাপাতি মন্দ এখন, ভাত-রুটি খায় সক্কালে!

পুজোর আগে মা দুর্গার ছোট্ট ছেলে কার্তিকটা
সিংহের খোঁজে ও যে কতবার যায় উত্তর, পুব দিকটা।
সিংহ পাওয়া সহজ নাকি
খানিকটা রং, অনেক ফাঁকি
সব্বাই বলে এ বছর যা তা, আগের বছরই ছিল ঠিকটা!

সত্যি কি রবি ঘোষ আকাশটা চেটেছে?

সীতানাথ বন্দ্যো'র এক মাসতুতো ভাই
মনে ভাবে আকাশটা চেটে দেখা চাই
বলে গেছে সীতানাথ, হলে পরে বৃষ্টি
টকটক থাকে নাকো, আকাশটা মিষ্টি
কাল রাত ভরে এত বৃষ্টির ঝমঝম

আজ তবে দেখা যাক স্বাদখানা কী রকম
ফটফটে নীল রং কিছু ঢাকা কুয়াশায়
যে ছেলেটা চেয়ে থাকে বুক ভরা দুরাশায়।

তার নাম রবি ঘোষ, নাম শুনে চেনা যায়?
তখনো সে বেশ ছোট, নামেনি তো সিনেমায়।
মোটে বারো, ছোটখাটো, ইশকুলে ফাঁকিবাজ
লেখাপড়া ছাড়া তার আছে আরও কত কাজ
এক পরি তার চেনা, ভূত টূত মানে না
পরি কত কথা বলে, অনেকেই জানে না
সেই পরিটির নাম মিনিমিশু মানতা
এরকম নাম কেন পরিরাই জানে তা!

রবি বলে, মিনিমিশু আজ তুমি একবার
মেঘ আর নীল রং যেখানেতে একাকার
সেইখানে নিয়ে চলো, লক্ষ্মীটি, সোনামন
মিনিমিশু বলে, আহু, সিটিকোনা সাটুবোন!
এরকমই ওর ভাষা, আরও সব পরিহুরি
বাংলা পড়ে না, বলে ইংলিশ তবু পড়ি!

যাইহোক, শেষমেশ মিনিমিশু রবিকে
বাতাসের সাথে ওড়া মন্ত্রটা দিল লিখে
টুবি আর নট টুবি টুং টাং কিংকিনা
এটুকুই জানি শুধু, জানি না তা ঠিক কিনা।
অতি ভোরবেলা রবি উড়ে গেল আকাশে
আর কেউ দেখল না, কেননা যে একা সে।

সত্যি কি রবি ঘোষ আকাশটা চেটেছে
মেঘ আর নীল রং ঠোঁটে জিভে মেখেছে?
আমরা সবাই জানি, আকাশটা কিছু না

শুধু চোখে ধাঁধা লাগে, শূন্যের বিছানা
কিছু নেই তাই নীল, এটাই তো বিজ্ঞান
রবি কি জানে না তাও, এতই সে অজ্ঞান?
পরি টরি সব ভালো আরও কম বয়েসে
বয়েস দ্বাদশ হলে রূপকথা হয় সে!

এরপর দুটি মাস রবি হয়ে গেল হাওয়া
ইশকুলে দেখা নেই, পথে নেই আসা-যাওয়া
বাড়িতেও খোঁজ নেই, নেই কোনো শব্দ
রবি বুঝি সবাইকে করে গেল জব্দ!

নামকরণ

একটা পেঁচা রেগে আগুন তেলে বেগুন
চোখ পাকিয়ে আছে
আমার নামটা কে রেখেছে? ধরে আন তো
তাকে তেঁতুল গাছে!
শকুন বললে, আমি তো ভাই কোনও খেলার
জানি না জুয়া চুরি
দুর্যোধনের মামার সঙ্গে আমার নাম
কে দিয়েছে জুড়ি?
শেয়াল বলল, শোনো সবাই, এখন থেকে
আমার নাম শ্রীগাল
ডাক নামে কেউ ডাকে যদি কামড়ে দেব
মজা বুঝবে কাল!
ঘোড়ার থেকে একটু ছোট সেই দুঃখে
নামটি বোকা গাধা

গান গাইতে বড্ড ভালো লাগে তবু
 নিষেধ গলা সাধা!
কোকিল বলল, যা বলো তাই বলো আমায়
 সবাই বাসে ভালো
কাকের সঙ্গে তুলনা কেউ দেয় না ভাই
 যদিও রং কালো।
মোরগ বলল, ফুলের সঙ্গে নামের মিল
 হল না এ জীবনে
আপন মনে ফুটে উঠে ঝরে যেতাম
 গভীর কোনও বনে!

সরল গাছের ছায়া

এ ঘরের ভুল ও ঘরে লুকিয়ে রাখি
 বিকেলের আলো আধো হাসি দিয়ে ডাকে
চিঠি জয়ে যায় পলকা বছর পেরিয়ে
 কপালের ভাঁজে জমে আছে বহু কাজ।
 সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে পতনের মূর্ছনা
 পাতাল জেনেছে আসন্ন উৎসব
 বড় পিছু টান কুসুম হাতের মায়া
 রূপের কাঙাল জন্মান্ধের যমজ।
কথা ছিল যেন এ জীবনে কিছু চেনা
 আকাশ ভাঙল নীলিমার নৈরাজ্য
একটি দেখার বিপরীতে এত ভ্রান্তি
 জলের উপর সরল গাছের ছায়া।

দূর থেকে দেখা

ঘরের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য ঘর
গৃহিণী আর কর্তামশাই, বাচ্চাদের কল কণ্ঠস্বর
এই নিয়েই তো ঘরের প্রাণ
যখন তখন গান
নতুন রং, খাট-বিছানা, স্বপ্ন লেগে থাকে
দুষ্টু সোনামণি কখন হাতের ছাপ আঁকে
ভোরের আলো, বিকেলবেলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া
ভালোবাসার মানুষজন করছে আসা যাওয়া
রান্নাঘর, ঝুলবারান্দা, ব্যস্ত হয়ে ঘোরা
আলাপ করতে এসে পড়ল পাশের বাড়ির ওরা
প্রতিটি দিন নতুন দিন ঘুম ভাঙার পর
ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘর!
ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘর!

উল্টোপাল্টা

শুধু বৈশাখ মাসে
বরফ পড়ে কলকাতায়, সারা দুনিয়া হাসে
হাসেন না শুধু একজন
তিন বছরে একটি বার তাঁর হাসির রেশন।
ইস্কুলে হয় লঙ্কা চাষ
ইঁদুর খায় গোলাপ ফুল, ছিঁচ কাঁদুনে পাতি হাঁস
ফুটবল খেলা দেখতে চান
রসগোল্লার লোফালুফি ঘটি-বাঙাল-মুসলমান।
লেকের ধারে মস্ত ইঁটের পাঁজা

সাধুরা পান বেকার ভাতা, বেকাররা টানে গাঁজা।
রুমাল খানা ডোবাও যদি জ্যোৎস্না মাখা চাঁদে
বিয়ে নিষেধ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে লবণ হ্রদে।
চাঁদের কথায় নতুন বৃন্দাবন
আ-আ-আ মোদের সব হতে আপন!

কানা শালিকের গান

চালতাতলায় ঝাঁকড়া একটা ফুরুশ ফুলের গাছের কাছে
কানা শালিকটা সকাল থেকেই সেখানে লুকিয়ে আছে।
ডাক শুনে তার বোঝাই যায় না, মনের সুখে না কান্না
সে ডাক শুনে শংকা মাসি নদীর ধারেও যান না
নদীর নাম অজয় তার রাগ হয়েছে ভারি
এই বর্ষায় দু'পার ভেঙে সে এক কেলেংকারি
আস্ত একটা পুরুষ, তবু সবাই বলে নদী
তাই তো গণেশ উল্টে গেল আত্মারামের গদীর।
আত্মারামের মামাতো ভাই মুরারইতে থাকে
রোজ সকালে সব পাখিদের পাখির ভাষায় ডাকে।
রামপুরহাট থেকে মদন এল চালতাতলায়
কানা শালিকটা তখনো ডাকছে প্রচণ্ড জোর গলায়
আত্মারামের মামাতো ভাই যে-ই না এসে ধরতে গেল গান
কী যে হল, চুপসে গলা, চক্ষু উল্টে অজ্ঞান।
কানা শালিকটা এবার ফুরুৎ ছুটল নদীর ধারে
ধর ধর ধর সবাই বলল, কেউ গেল না ওদিকে অন্ধকারে।
মামাতো ভাই চোখ রগড়ে উঠল একটু পরে
কী হল রে, কানা শালিকটা... সবাই মিলে শুধোয় সমস্বরে
সেদিন থেকে মামাতো ভাই ভুলেই গেল কথা বলার ভাষা
দিনরাত্তির গান গায়, মাথার চুলে শালিক পাখির বাসা!

কবে যে আমি বড়ো হব

কবে যে আমি বড়ো হব
দাদার মতন লম্বা হব

কবে যে আমি বড়ো হব
বাবার মতন প্যান্ট পরব

কবে যে আমি বড়ো হব
একলা একলা খেলতে যাব

কবে যে আমি বড়ো হব
পার্কে গিয়ে ফুচকা খাব

কবে যে আমি বড়ো হব
মোটা মোটা বই পড়ব

কবে যে আমি বড়ো হবে
ভূত-পেতনির ঝুঁটি ধরব

কবে যে আমি বড়ো হব
ঘোড়ায় চড়ব, গাড়ি চালাব

কবে যে আমি বড়ো হব
সব বড়োদের ফিলম দেখব

কবে যে আমি বড়ো হব
সন্ধের পর বাড়ি ফিরব

কবে যে আমি বড়ো হব
ছোটভাইটার পড়া ধরব

কবে যে আমি বড়ো হব
দেশ-বিদেশে ঘুরতে যাব

কবে যে আমি বড়ো হব
বড়ো অফিসে কাজ করব

কবে যে আমি বড়ো হব
ছোটো ছেলেদের তুমি বলব

যখন আমি বড়ো হব
সত্যিকারের বড়ো হব

একটা কিছু করতে হবে
যাতে নিজেই শান্তি পাব

যদি-বা দেখি আমার পাশে
কেউ দুঃখে কাঁদছে বসে

তার চক্ষের জল মোছাতে
পারব না কি বড়ো বয়সে?

কাব্যপরিচয়

ভালোবাসা খণ্ডকাব্য

দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১০। পৃ. ৭২। মূল্য ৮০.০০
প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
উৎসর্গ: পিনাকী ঠাকুর/ও/ শিবাশিস মুখোপাধ্যায়-কে

বাংলা চার অক্ষর

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৩। পৃ. ৬৪। মূল্য ৬০.০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: মুনিয়া ও গৌতম দত্ত-কে

যার যা হারিয়ে গেছে

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৫। পৃ. ৭২। মূল্য ৭৫
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী
উৎসর্গ: অনিন্দিতা ও রূপক চক্রবর্তী-কে

শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৭। পৃ. ৮০। মূল্য ৮০.০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: বিপ্লব মণ্ডল
উৎসর্গ: সেই আড্ডার আড্ডাধারীদের

প্রাণের প্রহরী

প্রথম প্রকাশ: মাসিক শারদীয় কৃত্তিবাস, ১৩৮৩

ভূমিকা: স্টপ প্রেস: এই নাটকটির অনেক সংলাপ ছন্দ মিলে লেখা। ছাপাখানার ভুল বোঝাবুঝিতে সব গদ্যের মতন হয়ে গেছে। কারুর গোয়েন্দাসুলভ তীক্ষ্ণ চোখ থাকলে অন্ত্যমিলগুলি খুঁজে দেখতে পারেন।

একেবারে শেষে লেখা ছিল: এই কাব্য নাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি, কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে হবে। এবং দক্ষিণাস্বরূপ লেখককে দিতে হবে একটি নীল রঙের জামা।

মালঞ্চমালা

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা জানুয়ারি ১৯১৪। পৃ. ৪৬। মূল্য ২০.০০
দে'জ পাবলিশিং
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: দেবাশিস আর রত্নারানী শী-কে/ স্নেহ উপহার

আ চৈ আ চৈ চৈ

প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ ১৩৩৯। পৃ. ৪০। মূল্য ২৫.০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: শাম্মী, মিতি, শিল্পী, সীমা, ডোরিস, সুমাইয়া,/সামি, রাজীব, সইফ, সজীব, আরফি, আসিফ,/অমিত, লিজা ও শানু.../ বাংলাদেশের অল্পবয়েসী বন্ধুদের

মনে পড়ে সেই দিন

প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ ১৪০৮। পৃ. ২৪। মূল্য ৩০.০০
পত্র ভারতী
প্রচ্ছদ: সন্দীপ দাশ
অলংকরণ: জুরান নাথ
এই গ্রন্থের খাদ্যাখাদ্য এবং আজব নগর কবিতাদুটি আ চৈ আ চৈ চৈ গ্রন্থে সন্নবেশিত হয়েছে।

ছড়া

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২। পৃ. ৮০। মূল্য ১০০.০০
দে'জ পাবলিশিং
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দেবাশিস রায়
উৎসর্গ: স্নেহের উপাসনা দাশগুপ্তকে/একটু বড়ো হয়ে পড়বার জন্য

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র, ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। শিক্ষা: কলকাতায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। আমৃত্যু আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ: 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।
২০০৪-এ সরস্বতী সম্মান।
ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দু'টি ছদ্মনাম— 'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
প্রয়াণ: ২৩ অক্টোবর, ২০১২।

....

প্রচ্ছদ সুনীল শীল

কবিতাসমগ্র ১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আ ন ন্দ